চৈতন্যলীলামৃত।

পূর্ব্বভাগ।

(অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের জীবনলীলার জন্ম
হইতে সন্ন্যাসযাত্রা পর্য্যন্ত।)

শোকে, [illegible] উপদেশ দেন—
জননীর [illegible] দাসের [illegible]
নেব গূঢ় [illegible] র্পণ পর্য্যন্ত
[illegible]

"[illegible]তচি[illegible] বদন্ত্যা লৌকিকাঃ।
[illegible] পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥"
ভাগবত।

কলিকাতা,
[illegible]দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী দ্বারা প্রকাশিত এবং
[illegible]ট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
[illegible] রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৭।

উৎসর্গ।

সেচনক শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়

সোদর প্রতিমেষু।

সুহৃদ্!

ধর্ম্মের যদি কিছু সার বুঝিয়া থাকি, তবে তাহা প্রেম। ব্রহ্মাণ্ড এই ম শিক্ষার বিশাল বিদ্যালয়; এখানে শিক্ষার আরম্ভ, অনন্ত জীবনেও শেষ হয় না। সখ্য-প্রেম আবার আমার কাছে পরম উপাদেয়। দাস্য, কেন? বাৎসল্য ও মধুর প্রেমও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। সখা, রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে তো উপদেশ দেন—ভালবাসেন; ড়া জননীর ন্যায় অকপটে স্নেহ করেন, দাসের ন্যায় সেবা দেন, এবং নর গূঢ় কথা খুলিয়া বলিয়া আত্ম-সমর্পণ পর্য্যন্ত করিয়া ন। তাঁ নিকট সখার কিছুই ছাপা থাকে না। দুঃখের মধ্যে সখ্যপ্রেম জগতে দুর্লভ। আপনাতে সেই প্রেমের ছবি চৈতন্যের সমস্ত ই আমার ন্যায় অপ্রেমিকও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে ন আমার বয়সে ছোট হইলেও আপনার কাছে কত পাইয়াছি, সামাজিক ছি; বলিতে কি—আপনার প্রেম-ঋণে আমি চির ঋণী; প্রতি-ধ দিবার ক্ষমতা নাই। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় আপনার প্রেমই র একমাত্র প্রতিশোধ। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের জীবনলীলাপূর্ণ চৈতন্যলীলামৃত' আপনারই সখ্যপ্রেমের ফল; আপনার সাধু মন্ত্রণাই চ জগতে আনিয়াছে। আমার মানসপুত্র হইলেও আপনার কম র পাত্র নয়। তাই আজ আনন্দমনে ইহাকে আপনার করকমলে ণ করিয়া সুখী হইলাম। ইতি।

কুষ্টিয়া,
১২৯৭ সাল।

আপনার স্নেহের
জগদীশ।

বিজ্ঞাপন।

হরি ওঁ।

ইতি পূর্ব্বে 'নব্যভারত' নামক মাসিক পত্রিকায় 'চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম' নামে শ্রীচৈতন্যের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সব প্রবন্ধ সংশোধিত ও কোন কোন অংশ পুনর্লিখিত হইয়া এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গ সমাজের অবস্থা সম্বন্ধীয় কতকগুলি পরিচ্ছেদ ব্যতীত চৈতন্যদেবের জীবন-ইতিহাসের সন্ন্যাসযাত্রা পর্য্যন্ত ঘটনা সন্নিবেশিত হইল। উত্তর ভাগে তদীয় জীবন লীলার শেষাংশ পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীমল্লোচনদাস ঠাকুর, শ্রীমদাচার্য্য কবিকর্ণপুর, শ্রীমন্নরহরি দাস ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় গ্রন্থকর্ত্তৃগণের গ্রন্থাবলম্বনে গ্রন্থের মূল বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই সকল মহানুভবদিগের উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহাদের চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম। স্বকীয় অনুভব যাহা গ্রন্থের অনেক স্থানে মিশ্রিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বক্তব্য যে, জানিয়া শুনিয়া আমার অহঙ্কার-জনিত বিকৃত জ্ঞানে কোন কথা লিখি নাই। অন্তর্যামী অন্তরে বসিয়া যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, লেখনী তাহাই প্রকাশ করিয়াছে মাত্র। আমার লেখা শুক পাখীর পড়া ও ছায়াবাজীর পুত্তলিকার নাচের ন্যায় উপলক্ষ মাত্র। আমার কি সাধ্য যে, যুগ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের জীবন-লীলা স্পর্শ করি? বামন কি আকাশের চাঁদ ছুঁইতে পারে?

গ্রন্থের অনেক স্থানে বিশেষতঃ প্রথমাংশে যে সকল ভ্রম ও ত্রুটি থাকিয়া গেল, তাহা আমার দুর্ব্বল বুদ্ধির দোষে ঘটিয়াছে। সে জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে সাধারণের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি।

কুষ্ঠিয়া,
ভাদ্র, ১২৯৭ সাল। } শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

চৈতন্যলীলামৃত।

পূর্ব্বভাগ।

সূচিপত্র।

পত্রাঙ্ক।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যলীলামৃত।

পূর্ব্বভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

আজকাল এদেশে ধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রকার আলোচনা চলিতেছে। সহরে, পল্লিগ্রামে, নগরে, উপনগরে, যেখানে যাই সেইখানেই দেখি সাকার; নিরাকার, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, উপাসনা প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় সকল উৎসাহের সহিত আলোচিত হইতেছে। স্কুলের ছাত্রদিগের মুখেও এখন ঈশা, মুসা, নানক, কবির, শাক্য, চৈতন্যাদি ধর্ম্মবীরগণের ধর্ম্মজীবনের অতি উচ্চ উচ্চ কথা সকল শুনা যাইতেছে। শুধু বঙ্গদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে এবং ভারত সীমা অতিক্রম করিয়া সুদূরস্থিত সভ্যতম ইউরোপেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী মহা আন্দোলন চলিতেছে। ইউরোপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা মানব জীবনের প্রহেলিকা ও ঈশ্বর তত্ত্বের মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া গভীর চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ নিচয় জগৎকে উপহার দিতেছেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রত্যেক ঈশ্বর-বিশ্বাসীর মনে বড় আশার সঞ্চার হয় যে, বুঝিবা এই দুঃখময় অবিশ্বাসী জগতে বিশ্বাস রাজ্য স্থাপিত হইবার দিন আগতপ্রায়। যে সকল নাস্তিক ও সন্দেহবাদীগণ বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এমন দিন আসিবে, যখন ভগবানের নাম পর্য্যন্ত মানবীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে চির দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিবে, বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মান্দোলন তাঁহাদের কথার অলীকতা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। সুবিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সার তাঁহার Ecclesiastical institution নামক গ্রন্থে এক্ষণে একথা স্পষ্টরূপে স্বীকার

করিতেছেন যে, ভগবানের অস্তিত্ব ও উপাসনা যে কেবল চিরকাল মানব-মনে অঙ্কিত থাকিবে, তাহা নহে, আমরা যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই উপাসনার ভাব পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে। উপাসনাকে তিনি ঐশীভাবের সঙ্গীতময় উচ্ছ্বাস (musical expression of sentiments) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "That a sphere will exist for those who are able to impress their hearers with a due sense of the mystery which enshrouds the universe, and that *musical expression to the sentiment accompanying this sense will not only survive but will undergo further development.*" ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ যুগান্তর উপস্থিত না হইলে, আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে সাহসী হইতাম না।

এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেব ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এখন আর সেকালের ন্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও ভক্তি শাস্ত্রের কথা শুনিলে কাহাকেও উপহাস করিতে শুনা যায় না। কিন্তু ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা কখন বিশ্বাস করিতে পারিতেন না যে, শিখাকণ্ঠীধারী স্থূলকায় বাবাজীদের শাস্ত্রে আবার শিখিবার যোগ্য জিনিষ কিছু আছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে দিন চলিয়া গিয়াছে; আজকাল ধর্ম্মযাজকগণ বৈষ্ণব শাস্ত্রের সার উদ্ধার করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিতেছেন, ধর্ম্ম মন্দিরের বেদী হইতে প্রেম, ভক্তি, ভাব, মহাভাব সম্বন্ধে উপদেশ সকল প্রদত্ত হইতেছে, বৈষ্ণব সাধুগণের জীবনের জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও প্রেমের কথা সংবাদ পত্রে নিনাদিত হইতেছে, এবং বৈষ্ণব গ্রন্থের মর্ম্ম সকল সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম যে, এ সময়ে চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিলে কেহ উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন না।

যদিও ভক্ত চূড়ামণি শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম সম্পর্কীয় অনেক বিষয় সভ্য জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি এমন অনেক কথা আছে, যাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, অথবা যাহা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদিগের মতে তদ্দ্বারা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়। কেন না, এক্ষণকার পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে বসিয়া সুমার্জ্জিত রুচির সহায়তায়

তাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিতে গেলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। বৈষ্ণবীয় গ্রন্থের বৃত্তান্তগুলিকে সমুজ্জ্বল বিধানালোকে দেখিতে না পারিলে তদীয় জীবনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা এই গ্রন্থে এইরূপ আলোকের সাহায্যে তাঁহার চরিত্র সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে আমাদের স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত অতি অল্পই থাকিবে। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উক্তি অনুযায়ী নিঃসন্দিগ্ধরূপে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়, তাহারই উপর আমরা বিশেষ নির্ভর করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মজীবনের বিকাশ, পরিপুষ্টি ও পরিণতিও যাহা, ভক্তি-শাস্ত্রের বিকাশোন্নতিও তাহাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং পাঠক মহাশয় মনে করিয়া লইতে পারেন যে, বৈষ্ণবীয় ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনাও এ গ্রন্থের এক প্রধান উদ্দেশ্য। "বৈষ্ণবীয় ভক্তি শাস্ত্র" অর্থে আমরা চৈতন্য-প্রণোদিত ভক্তিকেই নির্দ্দেশ করিতেছি। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশে ভক্তি বিষয়ে কোন আলোচনা হয় নাই। বাস্তবিক ঘটনা এরূপ নহে। কারণ চৈতন্য জন্মিবার বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে এবিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছিল। পৌরাণিক সময়ের অভ্যুদয় কালে ভক্তিপ্রবণ ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থে, তাহার পরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব সময়ে বা কিছু পরে বৌদ্ধধর্ম্মের তীব্রগতি প্রতিরোধের জন্য রামানুজস্বামী, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক, তৎপরে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ও জয়দেব গোস্বামী দ্বারা, এবং অবশেষে মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈতাচার্য্য ও যবন-কুল তিলক হরিভক্ত হরিদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক এ শাস্ত্র আলোচিত, শুধু তাহা নহে, স্বস্ব জীবনে সংসাধিত হইয়াছিল। তবে চৈতন্যের প্রবর্ত্তিত ভক্তি ও প্রেম ইঁহাদের প্রেমভক্তি হইতে যে অনেকটা ভিন্ন ছিল, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

নানাবিধ অত্যুক্তি ও রূপকালঙ্কারের মধ্য হইতে চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমত সকল নির্ব্বাচন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। একে তাঁহার নিজের রচিত গ্রন্থ বা পদাবলী অতি বিরল, তাহাতে আবার তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহাকে যে ভাবে দেখিতেন, তাহাতে তাঁহার সামান্য সামান্য কার্য্য পরম্পরাকেও তাঁহারা স্বয়ং ভগবানের কার্য্য বলিয়া অদ্ভুত ও অতিরঞ্জিত ভাবে প্রকাশ করিয়া

গিয়াছেন; সুতরাং চৈতন্য জীবনের প্রকৃত ঘটনা নির্ব্বাচন করা যে বড় সহজ হইবে না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় ইতিহাসের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ইহার ঘটনাপুঞ্জ দুষ্প্রাপ্য নহে। বৈষ্ণবেরা তাঁহার জীবনের ও ধর্ম্ম মতের প্রায় সমস্ত ঘটনাই বজায় রাখিয়াছেন, কেবল তাহার অনেক স্থল অলৌকিক অত্যুক্তিতে আচ্ছন্ন করিয়াছেন মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যের সাক্ষাৎ অনুচর অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন, তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিতেন ও উপদেশ শুনিতেন, তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ অতি অল্পই দেখা যায়। যাঁহারা তাঁহার জীবনবৃত্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য বা অনুশিষ্য ছিলেন না। তাঁহার তিরোভাবের অনেক পরে অর্থাৎ যখন চৈতন্যের অবতারত্ব এক রূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনই এই সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। সুতরাং এবিষয়ে আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ অতি অল্পই দেখিতে পাইব; দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইবে।

চৈতন্যদেবের নিজের বাক্যকেই আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ বলিতেছি। তাঁহার কার্য্য কলাপ পরিদর্শন ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া যে সকল লিপি গ্রথিত হইয়াছে, তাহাকে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিব। ব্যবস্থা শাস্ত্রের বিধান মতে ইহা যদিও প্রথম শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে; কিন্তু দর্শক ও শ্রোতাদিগের নিজ নিজ মনের ভাব, ও ভাবব্যঞ্জক বর্ণনা, বক্তা ও অনুষ্ঠাতার ভাবের সহিত এরূপ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, কোন্‌টী কাহার, তাহা বাছিয়া লওয়া দুষ্কর। সে জন্য আমরা এখানে প্রমাণ শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি, ব্যবস্থা শাস্ত্র-বিশারদ পাঠক ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে ও চৈতন্যের সাক্ষাৎ শিষ্য প্রশিষ্যের বাচনিক শ্রুত হইয়া যে সকল গ্রন্থ রাশি রচিত হইয়াছে, তাহাই আমাদের মতে তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ।

"আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত,
সূত্ররূপে মুরারী গুপ্ত করিলা গ্রথিত।
প্রভুর মধ্য শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর,
সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর।
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া।"

চৈতন্য চরিতামৃত।

"বেদগুহ্য চৈতন্য চরিত কেবা জানে?

তাহা লিখি যেই শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে।"

চৈতন্য ভাগবত।

"শ্রীচৈতন্য কথা যথা মতি যথা দৃষ্টং যথা বর্ণিতং

স্বগ্রন্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।"

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরিত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কি কি প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চৈতন্যদেবের স্বপ্রণীত গ্রন্থ বা আনুপূর্ব্বিক পদাবলী পাওয়া যায় না। কেবল এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত গুটী কয়েক সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গলা পদাবলী যাহা তাঁহার মুখ-বিনির্গত বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তদ্দ্বারা তাঁহার চরিত্র সম্পর্কীয় সর্ব্বাঙ্গীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করা যাইতে পারে না। কারণ তত্তৎ শ্লোক বা পদ বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুভাবিত হইয়া বিশেষ বিশেষ সময়ে উচ্চারিত হইত, সুতরাং সমস্ত জীবনের ঘটনাবলীর পরিচায়ক বলিয়া তাহাকে সমর্থন করা উচিত নহে। তবে তদ্দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মভাবের অনেক তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে বুঝা যায়। এইরূপ কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

নাম সঙ্কীর্ত্তনকে তিনি ঈশ্বর সাধনের পরম উপায় মনে করিতেন। তদ্বিষয়ে তাঁহার উক্তি এই—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি

স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি

দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ।"

হে ভগবন্! আমাদের উপর তোমার এমনি কৃপা যে, তোমার

নামেতে তুমি তোমার সর্ব্বশক্তি বহুপ্রকারে অর্পণ করিয়া রাখিয়াছ এবং ঐ নাম স্মরণের জন্য সময়ও নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছ; কিন্তু আমার এরূপ দুর্দ্দৈব যে এমন নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

যেরূপে ভগবানের নাম লইলে প্রেমভক্তি উৎপন্ন হয়, তৎ সম্বন্ধে উক্তি।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিবসহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন,কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণের ন্যায় নীচ ও বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করতঃ হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।

প্রার্থনা বিষয়ে তাঁহার উপদেশ, যথা—

"ন ধনং, ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।"

হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী বা পাণ্ডিত্য এ সব কিছুই যাচ্ঞা করিতেছি না, আমার জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি অহেতুকী ভক্তি থাকে।

কিরূপ বাহ্য লক্ষণ হইলে প্রকৃতরূপে ভগবন্নাম গ্রহণ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, স্থানান্তরে তিনি তাহা প্রার্থনা বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদা রুদ্ধয়া গিরা
পুলকৈর্নিচিতংবপুঃকদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।"

হে প্রভো! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকিবে, গদ গদ বাক্যে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিবে; এবং পুলকে সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইবে।

ঈশ্বর বিরহে তাঁহার কীদৃশ অবস্থা ঘটিত, তাহা পশ্চাল্লিখিত শ্লোক পাঠে জানা যায়।*

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে।"

গোবিন্দ বিরহে আমার নিমেষকাল যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয়;

* এই শ্লোকটী তাঁহার রচিত কিনা ঠিক জানা যায় না। সর্ব্বদা তিনি এই শ্লোকাবলম্বনে উপদেশ দিতেন।

বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় চক্ষু হইতে বারিধারা পতিত হয় এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বোধ হয়।

সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে প্রেমে বিভোর হইয়া এই পদটী এক সময় গাইয়াছিলেন :—

"সেই ত পরাণ নাথ পাইনু,
যাঁহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু।"

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণের মধ্যে কড়চা গ্রন্থ গুলিই প্রধান। এক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সভ্য সমাজে দৈনন্দিন বিশেষ বিশেষ ঘটনার ডাইরি ও স্মৃতি লিপি (Memorandum) রাখার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে কন্থাকরঙ্গধারী অর্দ্ধসভ্য বৈষ্ণব সমাজে যে ঐ প্রথা প্রচলিত থাকিবে, ইহা সামান্য বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। অনেক পাঠক হয় তো মনে করিতে পারেন যে, এরূপ বলা কেবল বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষার আবিষ্কার মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা এই যে, শ্রীচৈতন্যের শিষ্য ও অনুচরগণের মধ্যে স্মৃতিলিপি রাখার প্রথা বহুল রূপে বিদ্যমান ছিল। এইরূপ স্মৃতিলিপিকে তাঁহারা কড়চা গ্রন্থ বলিতেন ও রচয়িতার নামানুসারে তাহার নামকরণ হইত। যথা ;—রূপ গোস্বামীর কড়চা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা ইত্যাদি। অনুমান হয়, কড়চা নামটী পারস্য ভাষার জমিদারী কাগজ বিশেষের নাম হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। এক্ষণেও জমিদারী সেরেস্তায় একটী কাগজ প্রচলিত আছে, তাহার নাম কড়চা কাগজ; ঐ কাগজে প্রতি প্রজার জমি ও তাহার জমার পরিমাণ ও যত টাকা যে যে সময়ে উসুল দিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে ; তাহা দৃষ্ট মাত্রেই বলা যাইতে পারে যে, ঐ প্রজার জমি জমা কত ও তাহার নিকট কত টাকা বাকী আছে। যাঁহার জলন্ত ধর্ম্মভাব হইতে ধর্ম্ম জগতে কত নূতন নূতন তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে ; ও তৎকালের সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারের জন্য যিনি কতই অভিনব উৎকৃষ্ট রীতি চালাইয়া ছিলেন, সেই পণ্ডিতাগ্রগণ্য চৈতন্যদেব যে পারস্য ভাষা হইতে এই কড়চা নামটী গ্রহণ করিয়া তাহা অন্য ভাবে প্রবর্ত্তিত করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

উপরি উক্ত কড়চা গ্রন্থে চৈতন্যের সাক্ষাৎ শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী আপন আপন রুচি বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে তাঁহার কার্য্য বিবরণ, উপদেশ ও আচার আচরণ, পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিয়া রাখিতেন এবং সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা

তন্মধ্যে বহু পরিমাণে সংস্কৃত শ্লোকও রচনা করিয়া রাখিতেন। রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামীর কড়চায় সংস্কৃতের ভাগ অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রূপ, সনাতন ও জীব সর্ব্বদা পুরুষোত্তমে চৈতন্যের নিকট বাস করিতেন না সত্য; কিন্তু তথাপি তাঁহারা কড়চা লিখিতে অমনোযোগী ছিলেন না। চৈতন্যের সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই তাঁহাকে স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের প্রণীত কড়চা সকলও সেই ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে।

এ সম্বন্ধে মহর্ষি ঈশা ও ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্যের জীবনেতিহাস অতি আশ্চর্য্য রূপে ঐক্য। জন, মথি, লূক প্রভৃতি খ্রীষ্টীয়ানাচার্য্যগণ ঈশার সমসাময়িক থাকিয়া যেরূপে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই যোগীশ্রেষ্ঠ ঈশাকে স্বয়ং ব্রহ্ম, দেবনন্দন রূপে পৃথিবীর পাপীগণের উদ্ধার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, বলিয়া যেরূপে বিশ্বাস করিতেন, ভগবদ্ভক্ত চৈতন্য সম্বন্ধে পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবাচার্য্যগণও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। উভয় স্থলেই গ্রন্থকারগণ প্রকৃত ঘটনার সহিত এত অলৌকিক ও অদ্ভুত ঘটনাবলী চিত্রিত করিয়াছেন যে, সময়ে সময়ে তাহা হইতে সত্য নির্ব্বাচন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। অথচ এই সকল ব্যক্তি অতি জ্ঞানী ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য অপ্রত্যয় করাও কঠিন। সাধারণতঃ আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, কি খ্রীষ্টীয়ানাচার্য্যগণ কি বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ, কেহই ইচ্ছা পূর্ব্বক অসত্যকে আশ্রয় দেন নাই। মহীয়সী-ক্ষমতা-সম্পন্ন ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের প্রতি সাধারণের অবিচলিত ও দৃঢ় বিশ্বাস নিবন্ধন দুর্ভাগ্য ক্রমে ধর্ম্ম জগতে এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

মুরারিগুপ্ত নামক নবদ্বীপবাসী জনৈক চিকিৎসক চৈতন্যের বাল্যসখা ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর চৈতন্যদেব সর্ব্ব প্রথমে যে সকল বন্ধুর নিকট আপনার ধর্ম্মভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনিও একজন। চৈতন্যের আদিলীলা বিষয়ে তিনি এক কড়চা লিখিয়াছিলেন। এই কড়চাতে গৌরাঙ্গের জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা সূত্র অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত রূপে বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তী সময়ে চৈতন্যমঙ্গলরচয়িতা বৃন্দাবন দাস ইহাই অবলম্বন করিয়া স্বীয় গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত
সূত্ররূপে মুরারীগুপ্ত করিলা গ্রন্থিত।"
চৈতন্য চরিতামৃত।

শেষাবস্থায় চৈতন্যদেব নীলাচলে বাস করিতেন। স্বরূপদামোদর নামক শিষ্য তখন সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন। তাঁহার কড়চাই শেষ জীবনের প্রামাণিক গ্রন্থ। চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহা হইতেই অধিকাংশ ঘটনা আপন পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

"প্রভুর মধ্য, শেষ লীলা স্বরূপদামোদর
সূত্ররূপে গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর।
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া।" চৈতন্য চরিতামৃত।

এই শ্রেণীর প্রমাণের মধ্যে আরও কতকগুলি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর-প্রণীত সংস্কৃত চৈতন্য চরিত ও চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক প্রধান। কিন্তু কবিকর্ণপুরের প্রাপ্ত যৌবন হইতে না হইতে চৈতন্যের তিরোভাব হয়; সুতরাং তৎপ্রণীত গ্রন্থ তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যেই পরিগণিত হওয়া উচিত।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতি মূলক যত গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বৃন্দাবনদাস কৃত চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত চৈতন্য চরিতামৃত, কবিকর্ণ-পুরকৃত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকাদি ও লোচনদাস কৃত চৈতন্য মঙ্গলই প্রধান। তদ্ভিন্ন রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বহুবিধ গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সে সমুদায় চৈতন্যের অবতারত্ব সংস্থাপন ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যত, তত তাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে নহে। অতএব সে সমুদয় গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

চৈতন্যের স্বর্গারোহণের পর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বৃন্দাবনদাস চৈতন্যমঙ্গল নামে এক বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশ করিলেন। বৃন্দাবনদাসকে বৈষ্ণবেরা ব্যাসের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস;
চৈতন্য চরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।

বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল;
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল।"

চৈতন্য চরিতামৃত।

ইনি শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সময় শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দ ব্যাস পূজা করিয়াছিলেন; সে সময়ে নারায়ণীর বয়স ৪ বৎসর।

"শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান,
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান।
চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত,
হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত।"

চৈতন্য এই বালিকাটীকে বড় ভাল বাসিতেন। ব্যাসের উদ্দেশে নিবেদিত প্রসাদ আপনি খাইয়া ভুক্তাবশেষ নারায়ণীকে দিয়াছিলেন। অতএব বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন যে, চৈতন্যদেবের শক্তি সঞ্চার হেতু বৃন্দাবন দাস ব্যাসের অবতার হইয়া উত্তর কালে নারায়ণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

"নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিল শ্রীদাস বৃন্দাবন।"

চৈতন্য চরিতামৃত।

বৃন্দাবন দাস প্রণীত বলিয়া চৈতন্যজীবন সম্বন্ধে এক্ষণে যে গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম চৈতন্য ভাগবত। অথচ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উহার নাম চৈতন্য মঙ্গল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ নাম পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে এই কিম্বদন্তী আছে যে, পরবর্ত্তী সময়ে লোচন দাস নামক জনৈক বৈদ্যবংশীয় বৈষ্ণব চৈতন্য জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া চৈতন্য মঙ্গল নামে তাহার নামকরণ করেন। তৎকালের প্রথানুসারে গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রন্থকারকে আপন গুরুর অনুমতি লইতে হইত। লোচনের ইষ্ট দেবের নিকট প্রকাশার্থে ঐ পুস্তক আনীত হইলে তিনি দেখিলেন যে, বৃন্দাবনের গ্রন্থের নামে এই গ্রন্থ অভিহিত হইয়াছে; তজ্জন্য শিষ্যের উপর বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন যে "বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে তোমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা যতক্ষণ নিরাকৃত না হয় ততক্ষণ এ গ্রন্থ প্রকাশ করিবার অনুমতি দেওয়া দূরে থাকুক, তোমার মুখদর্শন করিব

না।" বৃন্দাবন দাস তখনও জীবিত ছিলেন। লোচন দাস অগত্যা বৃন্দাবনের নিকট যাইয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করাতে বৃন্দাবন দাস প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন ও আপন গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "চৈতন্য ভাগবত" রাখিলেন।

চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃত। যদিও ইহা চৈতন্যভাগবতের পরে বিরচিত হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিকরূপে চৈতন্যের ধর্ম্মমত সমর্থন, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ও ঘটনাবলীর বৈচিত্রতা প্রদর্শন ও রচনার ওজস্বিতা ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি ধরিলে ইহা সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। বাস্তবিকও বৈষ্ণব সমাজে ইহা তদ্রূপেই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ইহা বাঙ্গলাসাহিত্যসংসারের একটী অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডার ও প্রেম ভক্তির অমৃত প্রস্রবণ। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যে সকল গ্রন্থকার পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, চৈতন্য-চরিতামৃত-রচয়িতা তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির এমনি দুর্দ্দশা যে, তাহারা আপনাদের জ্ঞান ভাণ্ডারে কি রত্ন আছে তদনুসন্ধান বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া উপবিভাগের অধীন ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পারে ঝামটপুর নামে এক খানি পল্লী গ্রাম অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। এই গ্রামই চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম স্থান।

"নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর গ্রাম,
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম।" চৈঃ চঃ।

কথিত আছে যে তিনি অল্প বয়সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও স্বপ্নে নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করত বৃন্দাবনে যাইয়া সমস্ত জীবন যাপন করেন। সে সময়ে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ প্রত্যহ অপরাহ্নে বৃন্দাবনবিরচিত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন; কিন্তু ঐ গ্রন্থে চৈতন্যের শেষ জীবনের বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত না থাকায় তাঁহাদের আশা পরিতৃপ্ত হইত না। তজ্জন্য মদন মোহন মন্দিরের অধ্যক্ষ হরিদাস পণ্ডিত প্রভৃতি কৃষ্ণদাসকে ঐ সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণদাস যদিও তখন বৃদ্ধ, কিন্তু নবোৎসাহে উৎসাহিত

হইয়া ঐ গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন; এবং উদ্যমের ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ ব্রজবাসাদিগকে উপহার দিলেন।

"বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল,
তাহাতে চৈতন্য লীলা বর্ণিল সকল।
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন;
পাছে বিস্তারিয়ে তাহা কৈল বিবরণ।
চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার;
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার।
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন;
চৈতন্যের শেষ লীলা না কৈল বর্ণন।"
চৈঃ চঃ।

"আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ;
শেষ লীলা শুনিতে সবার হইল মন।
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া;
তাঁ সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া।"
চৈঃ চঃ।

১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবার কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে বৃন্দাবন নগরীতে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। তৎসম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন।

"শাকে সিন্ধ্বগ্নিবানেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽশিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।"

১৪৫৫ শকে চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয়। সুতরাং তাঁহার স্বর্গারোহণের প্রায় ৮২ বৎসর পরে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত হইলে জীব গোস্বামীর অনুমতি লইয়া প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে 'কৃষ্ণদাস' তাঁহাকে ইহা পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য ও চৈতন্যোপদেশ সকল বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে; তাহা অবলীলাক্রমে সাধারণের আয়ত্তাধীন হইবে, অথচ আপনাদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইবে না, এই আশঙ্কায়, কৃষ্ণদাসের উপর রাগান্বিত হইয়া জীবগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ লুকাইয়া এক কুঠরীর মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন ও কবিরাজকে কটূক্তি করিলেন। বৃদ্ধ কবিরাজ ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া মথুরায় গমন করিয়া সর্ব্বদা এই দুঃখ করিতে লাগিলেন যে,

সাধারণে পড়িবে বলিয়া তিনি পুস্তক রচনা করিলেন, তাহা প্রকাশিত হইল না ও গৌরাঙ্গের শেষ লীলাও অপ্রচারিত রহিয়া গেল।

"আমি যে করিনু গ্রন্থ সবার কারণে,
বিদ্যা না হইলে ধর্ম্ম বুঝিবে দর্শনে।
প্রভুর যে শেষ লীলা কেহ না জানিবে,
প্রেমভক্তি আচরণ কেহ না শিখিবে,
হেন গ্রন্থ দৈবে গেল কেহ না পাইবে;
দয়াল চৈতন্য লীলা কেহ না জানিবে।"

বিবর্ত্ত বিলাস।

এই সময়ে মুকুন্দ দত্ত নামে কবিরাজের জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জানাইলেন যে, চৈতন্য চরিতামৃত যখন রচিত হইয়াছিল, তাহার এক এক পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইলে তিনি (মুকুন্দ) এক এক প্রস্ত নকল করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত গ্রন্থের নকল তাঁহার নিকট রহিয়াছে।

"মুকুন্দ কহিল প্রভু করি নিবেদন,
যে কালে আপনি করেন গ্রন্থের লিখন।
পরিচ্ছেদ সাঙ্গ হৈলে লৈয়াছি মাগিয়া—
পড়িয়া লিখিয়া প্রভু দিতাম আনিয়া।"

বিবর্ত্ত বিলাস।

ইহা শ্রবণে বৃদ্ধ কবিরাজের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি ঐ প্রতিলিপিটী আদ্যোপান্ত পড়িয়া ও সংশোধন করিয়া মুকুন্দকে গোপনে রাখিতে বলিলেন, যেন জীব তাহা জানিতে না পারেন।

"মুকুন্দে আনন্দ হইয়া কহিল বচনে,
প্রকাশ না করিও এবে রাখ সাবধানে।"

পরে মুকুন্দ দ্বারা কবিরাজ ঐ নকল গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। তদবধি তাহা ক্রমে ক্রমে এদেশে প্রচার হইয়া পড়ে।

"গ্রন্থ লৈয়া যাও বাপ শ্রীগৌর মণ্ডল,
লিখিয়া লয়েন যেন বৈষ্ণব সকল।
যারে তারে দিবা বাপ কহেন বচন॥" বিবর্ত্ত বিলাস।

কৃষ্ণদাসের স্বহস্ত লিখিত আসল গ্রন্থ অদ্যাবধি বৃন্দাবনে রাধা দামোদরের মন্দিরে আবদ্ধ রহিয়াছে; তাহা এদেশে কখন আইসে নাই।

ধর্ম্ম সমাজে চিরকালই ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য কত না বিবাদ কলহ হইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাটী এরূপ ঘটনা-পুঞ্জের একটী অংশ মাত্র। এক দিকে জীবগোস্বামীর ও ঈর্ষা, অপর দিকে কৃষ্ণদাসের উদার ভাব তুলনা করিতে গেলে মনে হয় যে, এইরূপে ধর্ম্ম জগতে কতই না অনিষ্টপাত হইয়া গিয়াছে। যদি ভাগ্য ক্রমে মুকুন্দ দত্তের নিকট একটী নকল না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্ম জগতে একটী প্রধান রত্ন কীটদষ্ট পুঁথির আকারে বিগ্রহ মন্দিরে লুক্কায়িত থাকিত ও অবশেষে বিনষ্ট হইয়া যাইত, কেহ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিত না।

চৈতন্য চরিতামৃতের পর লোচন দাস চৈতন্য মঙ্গল নামে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থে বিশেষ নূতনত্ব কিছুই নাই। তাহা চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতের ছায়ামাত্র। তবে তাঁহার প্রণীত পয়ার ও ধুয়া গীতি কাব্য আকারে লিখিত হইয়াছে। যেরূপ কীর্ত্তিবাস ওঝার রামায়ণ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গলের গান বৈষ্ণবপ্রধান রাঢ় দেশের অনেক স্থানেই গীত হইতে দেখা যায়। বোধ হয় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এইরূপে চৈতন্যের জীবন লীলা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে।

চৈতন্যের জীবন সম্বন্ধে কবিকর্ণপুর প্রণীত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক একখানি প্রধান ও বোধ হয় প্রাচীনতম গ্রন্থ। গ্রন্থপ্রণেতা পুরীদাস চৈতন্যপার্ষদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছানুসারে শিবানন্দ বালকের নাম পুরী দাস রাখিয়াছিলেন। পুরীদাসের যখন সাত বৎসর মাত্র বয়স তখন তিনি পিতার সঙ্গে নীলাচলে যাইয়া শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইয়াছিলেন। কথিত আছে অতি শৈশব হইতেই বালকের অদ্বিতীয় বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। চৈতন্য দেব তাঁহাকে শ্লোক পড়িতে বলিলে তিনি নাকি সংস্কৃত ভাষায় এক সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক পরবর্ত্তী সময়ে ইনি কবিকর্ণপুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সংস্কৃত গদ্য পদ্যে শ্রীচৈতন্যের জীবন সম্বন্ধে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামে নাটক ও চৈতন্যচরিত নামে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ১৪৯৪ শকে অর্থাৎ চৈতন্যান্তর্ধানের ৩৯ বৎসর পরে চন্দ্রোদয় নাটক রচিত হয়।

"শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজি যুক্তে,
গৌরহরি ধরণীমঙ্গল আবীরাসীৎ
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজিতলীয়লীলা
গ্রন্থোহয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ।"

বিশ্বমঙ্গলকারী বিশ্বম্ভরদেব ১৪০৭ শকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার লীলা যুক্ত এই গ্রন্থ ১৪৯৪ শকে কোন ব্যক্তির মুখ হইতে প্রকটিত হইল।

গ্রন্থখানি নাটকাকারে লিখিত হইলেও গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে ইহাতে তাঁহার স্বকপোল কল্পিত কিছুই নাই। তিনি যেমন দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে প্রেমভক্তি মৈত্রী প্রভৃতি কল্পিত চরিত্রের যথেষ্ট সমাবেশ দেখা যায় এবং ৭ বৎসরের বালক যে চৈতন্য চরিত্রের ঘটনাবলী সম্যক প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন তাহাও সম্ভব বোধ হয় না। সুতরাং সময় গণনায় কর্ণপুরের গ্রন্থ প্রাচীন হইলেও ইহাকে তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ ভিন্ন উচ্চতর শ্রেণীতে গণনা করা যাইতে পারে না।

চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম বিষয় আলোচনার জন্য যে প্রমাণ প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থ নিচয়ে পাওয়া যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন ভক্তমাল প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে, যাহাতে এসম্বন্ধে অনেক আলোক লাভ করিতে পারা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গসমাজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থা।

চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে বঙ্গসমাজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থা কিরূপ ছিল, তখন কোন্ কোন্ আধ্যাত্মিক শক্তিরদ্বারা ইহা পরিচালিত হইতেছিল, তাহা বলিবার পূর্ব্বে ভারতে হিন্দুধর্ম্মের উত্থান, বিস্তার ও অধঃপতন বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। সে জন্য আমরা সে বিষয়ের স্থূল স্থূল বিবরণ বিবৃত করিয়া পরে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করিব।

শক্তি উপাসনাই মানব হৃদয়ের প্রথম ধর্ম্মভাব, একথা স্থির সিদ্ধান্ত। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় জড় জগতের যে কোন পদার্থের সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়, তাহাই তখন অলৌকিক ঐশীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত

হয়; সুতরাং তত্তৎ বস্তুকে মানুষ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করিয়া থাকে সমস্ত মানব জাতির আদিম ইতিহাস এই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। আমাদের আর্য্য-পূর্ব্ব-পুরুষগণ এদেশের আদি নিবাসী ছিলেন না। যখন তাঁহারা মধ্য-আসিয়া হইতে ভারতসীমায় পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহারা এই ধর্ম্মভাব লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। তজ্জন্যই আমরা ঋগ্বেদের প্রথমে "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" প্রভৃতি সূক্ত সকল দেখিতে পাই। তাঁহারা শীত প্রধান দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া অগ্নির প্রভাব ও উপকারিতা বিলক্ষণরূপে বুঝিতেন। সেজন্য তৎকালে অগ্নিই তাঁহাদের প্রধান দেবতা ছিল। পরে ভারতে আসিয়া যতই তাঁহারা প্রকৃতির বৈচিত্র্য দেখিতে লাগিলেন, শ্যামল শস্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সকল, সুবিশাল তরঙ্গ-ময়ী স্রোতঃস্বতী নিচয়, নানাবর্ণে সুরঞ্জিত মেঘমালা ও নানাজাতীয় সুগন্ধ ও সুন্দর কুসুমাবলী প্রভৃতি এখানকার বিচিত্র পদার্থপুঞ্জ যতই তাঁহাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল, তাঁহাদের দেবতার সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালক্রমে আর্য্যঋষিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি জড় পদার্থ সকলে দেবত্ব নাই; কিন্তু ঐ সকল পদার্থের অন্ত-রালে এমন এক একটী শক্তি অলক্ষিত ভাবে কার্য্য করিতেছে যে, তাহারই প্রভাবে ঐ সকল ভৌতিক পদার্থ এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী হইয়াছে। এইরূপে জড় পদার্থ হইতে জড়ের আধারভূত পৃথক্ পৃথক্ শক্তিতে দেবত্ব আরোপিত হইল। তখন ইন্দ্র, বরুণ, পবন, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি অসংখ্য বৈদিক দেবগণ এক একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পূজিত হইতে লাগিল। ঋগ্বেদসংহিতার আদিদেবগণ জড়জগতের প্রাকৃতিক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু পরবর্ত্তী মন্ত্র সকলে আবার ঐ সকল দেবতার দেবত্ব সেই সেই পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির প্রতি আরোপিত হইয়াছে। জড়ময় অগ্নিই ঋগ্বেদের প্রথম দেবতা, কিন্তু উত্তরকালে জড়কে পরিত্যাগ করিয়া তাহার অন্তরালবর্ত্তিনী শক্তিতে অগ্নির দেবত্ব নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

কালসহকারে আর্য্যগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই সকল দেবতা কখন অনুকূল কখন প্রতিকূল। কখন কালে বৃষ্টি হইয়া শস্যাদি জন্মায়, আবার কখন অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি হইয়া শস্য সকল বিনষ্ট হয়। তখন ঐ সকল দেবতাকে সন্তুষ্ট করা, তাহাদের অত্যাচার ও প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। সে জন্য নানাপ্রকারে যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোম, বলিদান

প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পদ্ধতি সকল রচিত হইতে লাগিল। পরিশেষে বেদসকলের মন্ত্র, সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইয়া একটী সুবিস্তীর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে পরিণত হইল।

এইরূপে যুগ যুগান্ত চলিয়া গেল, আর্য্যগণ ক্রমেই অবিদ্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং গভীর চিন্তা ও গবেষণায় নিমগ্ন হইয়া জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বর তত্ত্বান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে ভারতে উপনিষদের যুগ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আর্য্য মহর্ষিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, যে অসংখ্য শক্তির দ্বারা এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, তাহা পৃথক পৃথক দেবতার পৃথক পৃথক শক্তি নহে, একই কেন্দ্র স্থান হইতে সমুদ্ভূত হইয়া সমস্ত বিশ্ব মণ্ডলে ওতঃপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যে শক্তি হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে ও যাহা হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তাহার আধার একই। এই ভাবটী যেই হৃদয়ঙ্গম হইল, অমনি তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন যে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" ক্রমে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আরও অগ্রসর হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, এই আদ্যাশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি কেবল জড়শক্তিনিচয়ের নিদানভূতা নহেন, তাঁহাতেই সমস্ত জ্ঞান, চৈতন্য, আনন্দ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; ও প্রাণীবৃন্দের প্রাণও তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত আছে। তিনি অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয় ও এক। এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হওয়া মাত্র আর্য্যগণ বলিয়া উঠিলেন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যু মেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

এক্ষণে বহু সহস্র শতাব্দী পরে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে তত্ত্বলাভ করিতে কতই যত্ন করিতেছেন, এবং যাহার অল্পাভাস পাইয়া যাহাকে জড়শক্তি, কেহ বা অজ্ঞেয় শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কত যুগ পূর্ব্বে সেই মহান্ তত্ত্ব লাভ করিয়া অতি দার্ঢ্য সহকারে বলিয়া গিয়াছেন যে "বেদাহ মেতং" আমি নিশ্চয় রূপে জানিয়াছি। হায়! আমা-

দের কি দুরদৃষ্ট যে, আমরা তাঁহাদেরই বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দি; অথচ তাঁহাদের সঞ্চিত রত্নকে পদ দ্বারা দলিত করিতে লজ্জিত হই না।

এই রূপে আর্য্যসমাজে ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণীত হইল বটে; কিন্তু তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইল না। কতিপয় চিন্তাশীল পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যতীত জন সাধারণে এই মত গ্রহণ করিল না। এক্ষণকার ন্যায় প্রচার করিবার জন্য যে কোন চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাও বোধ হয় না। বর্ত্তমান্ সময়ে যেরূপ দেশ সাধারণে শিক্ষাপ্রণা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সময়ে সেরূপ সাধারণ শিক্ষার নিয়মও কিছু ছিল না। সুতরাং শিক্ষা ও প্রচারের অভাবে এই ধর্ম্ম মত যে অপ্রচারিত থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আপামর সাধারণ লোক পূর্ব্বের ন্যায় জড় পূজক ও কুসংস্কারাবিষ্ট থাকিয়া গেল। এই ভাবে বহুকাল কাটিয়া গেল, ভারত ধর্ম্ম শূন্য হইয়া পড়িল এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের অভাবে কতিপয় যাগ, হোম, বলিদান প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠানই তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদের যুগের অন্তর্ধান এবং পৌরাণিক যুগের অভ্যুদয় হইল।

খ্রীষ্ট জন্মিবার ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে রাজকুমার সিদ্ধার্থ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি দেখিলেন যে, এত যাগ যজ্ঞ করিয়াও মানুষ শান্তি পাইতেছে না। ইহার কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া রাজপুত্র গৃহসংসার সকলই পরিত্যাগ করিলেন এবং সাংসারিক সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর তপস্যা ব্রত গ্রহণ করিলেন। ভগবৎস্বেচ্ছায় কালক্রমে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। প্রচলিত ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি বাসনানিবৃত্তিকেই পরমধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। ক্রমে তাঁহার ধর্ম্ম দিগদিগন্ত ব্যাপী হইয়া উঠিল এবং তাহার প্রবল তরঙ্গে বৈদিক ধর্ম্ম যায় যায় হইয়া পড়িল। তখন ব্রাহ্মণাচার্য্যগণ অনন্যোপায় হইয়া জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য অভিনব তত্ত্ব সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অমনি অসংখ্য পুরাণ ও উপপুরাণ সকল রচিত হইয়া দেশময় ব্যাপিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা এই সকল পুরাণের দ্বারা এখন এইমত প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন যে, ঈশ্বর বাক্যমনের অগোচর, নিরাকার ও নির্ব্বিকার হইলেও সাধকের সাধনা সিদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে মূর্ত্তি বিশেষ পরিগ্রহ করত জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; সুতরাং এই সকল মূর্ত্তি পূজা করিলেই ঈশ্বরের পূজা করা হইল; এবং তাহাতেই মানুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" যমদগ্নি।

চিন্ময় অদ্বিতীয়, অংশরহিত এবং অশরীরী হইলেও সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে। নিরাকার-বাদীগণ এই শ্লোকের 'কল্পনা' শব্দের অবস্তুতে বস্তুত্ব আরোপ করা অর্থ করিয়া সাধক কর্তৃক ঈশ্বরের রূপ স্বকপোলকল্পিত হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সাকার-বাদিগণ 'কল্পনা' অর্থে 'পরিগ্রহ' ধরিয়া সাধকের সাধন সৌকর্য্যার্থে ঈশ্বর কর্তৃক সাকাররূপ গৃহীত হইয়া থাকে, এই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; এবং এই মূল সূত্র ধরিয়া অবতারবাদ ও ঈশ্বরবিগ্রহের নিত্যসিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। যাহা হউক, এইমত সংস্থাপিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং ঘোরতর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধদিগকে এদেশ হইতে উন্মূলিত করিতে সক্ষম হইলেন। সেই সময় হইতে নানাপ্রকার উপাসনাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের এক একটী শক্তিকে এক একটী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, অথবা ক্ষমতাশালী ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষে ঐশী শক্তি ও ঐশী গুণ আরোপ করিয়া নানাপ্রকার রূপকালঙ্কার ও অত্যুক্তিতে পূর্ণ করতঃ দেবোপাখ্যান সকল রচিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব, এই পাঁচটী প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া আর্য্যগণ বহুবিধ উপধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে ষষ্ঠীমাখাল প্রভৃতিও দেবাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া তেত্রিশ কোটী দেবতার দুর্ভেদ্য দুর্গ সংগঠিত হইয়া উঠিল। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দরিদ্র ব্যক্তি যেমন সংসারিক অভাব মোচন ও সুখ সচ্ছন্দতা সম্বর্দ্ধন জন্য প্রথমে অর্থো-পার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় ও পরে যেমন সে, সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া, অর্থকেই সার বস্তু জ্ঞানে রাশি রাশি সঞ্চয় করিয়া সুখানুভব করিতে থাকে; তদ্রূপ আর্য্যব্রাহ্মণগণ মূর্ত্তিপূজাকে পরমার্থসাধনের সহজ উপায় বলিয়া জনসাধা-রণে প্রবর্ত্তন করিয়া পরিশেষে তাহাকেই সারবস্তু করিয়া প্রকৃত পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন!

এই পাঁচটী উপাসক সম্প্রদায়মধ্যে বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব মতই প্রধা-নতঃ গৃহীত হইয়াছিল। এই যুগের শাক্তগণ আর উপনিষদের সময়ের শক্তিপূজকদিগের ন্যায় জড়প্রকৃতির অন্তরালে সেই আদ্যাশক্তিকে দেখিতে পাইতেন না, তাঁহাদের উপাস্য আর অসীম আকাশে ও মানবের অন্ত-

রাত্মার তেজোময় অমৃতময় রূপে প্রকাশিত হয়েন না, তাঁহাদের ভগবতী এখন মৃণ্ময়ী বা পাষাণময়ী জড়মূর্ত্তিতে পরিণতা। তাঁহারা এক্ষণে শাস্ত্র সকলের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, দেবাসুরের যুদ্ধ ও মধুকৈটভরক্ত-বীজবধোপাখ্যান সকল প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কাহার সাধ্য যে সে সকলের অবান্তর ব্যাখ্যা করে? সেই হইতে অবতারবাদের ও মূর্ত্তি পূজার ভাব দৃঢ়তর কুসংস্কাররূপে ভারতবাসীর হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

শক্তি মন্ত্র সাধন ও তাহাতে সিদ্ধি লাভের জন্য এই সময়ে আবার নানাপ্রকার তন্ত্র শাস্ত্র সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সকল তন্ত্র কাহা কর্ত্তৃক ঠিক কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া জানিবার উপায় নাই। কারণ অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় এই সকল শাস্ত্রে গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল তন্ত্রই শিববাক্য বলিয়া বর্ণিত আছে, তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, এই সকল তন্ত্র অতি আধুনিক। শিব-বাক্য বলিলে সকলের আশু বিশ্বাস ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবেন বলিয়া, গ্রন্থকারগণ স্বস্ব নাম অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। এই সকল তন্ত্র যে কেবল একজনের লেখনীসম্ভূত, ইহা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে; নানা সময়ে নানা ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, ইহাই ঠিক যুক্তি।

তন্ত্র সকলের অভ্যুদয় কাল হইতেই শাক্তসম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। একদল পূজা, হোম, বলিদান করিয়াই ক্ষান্ত; অপর দল সুরা ও গণিকা পর্য্যন্ত লইয়া সাধন আরম্ভ করিয়া ধর্ম্ম ব্যভিচারের চরমদৃষ্টান্ত দেখাইলেন। প্রথমোক্তগণ পশ্বাচারী, অর্থাৎ তাঁহারা মদ্য ও গণিকা ব্যবহার করেন না বলিয়া পশু-প্রকৃতি, আর শেষোক্তগণ বীরাচারী বা বামাচারী বলিয়া আখ্যাত হইলেন। অধিকাংশ তন্ত্রই বীরাচার মত সমর্থন করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার অর্থাৎ মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুনের পাঁচটী উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। যাহাই থাকুক না কেন, তান্ত্রিক সাধকদিগকে দেখিলে সে কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্মই যে প্রবল ছিল এবং শাক্তগণ বৈষ্ণবদিগের উপর যে বিবিধ অত্যাচার করিত বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

"ভবানী পূজার সব সামগ্রী লইয়া
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া,
কলার পাত উপরে থুইল ওড় ফুল,
হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্ত চন্দন, তণ্ডুল।
মদ্য ভাণ্ড পাশে রাখি নিজ ঘরে গেল।" চৈঃ চঃ।

শাক্তগণ যেমন ঈশ্বরের রুদ্রভাব ও ধ্বংসকারিণী শক্তিকে অবলম্বন করত আপনাদের উপাস্যদেবতার গঠনকল্পনা করিলেন, স্বত্ব গুণাবলম্বী বৈষ্ণবগণ সেই রূপ তাঁহার পালনী ও স্থিতিকারিণী শক্তি লইয়া বিষ্ণু পূজার মত প্রচার করিলেন। কাল সহকারে এই মত সর্ব্বত্র আদৃত হইতে লাগিল, এবং সাত্ত্বিক ভাবের লোক সকল ইহাতে যোগদান করিলেন। তখন ভক্তি-প্রবণশাস্ত্র সকল বিরচিত হইয়া জন সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিল। বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, হরিবংশ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র এই যুগের ধর্ম্মান্দোলনের ফল। ক্রমে বিষ্ণুর দশাবতার ও মর্ত্ত্যলীলা সকল ব্যাখ্যাত হইল এবং বিষ্ণু ও তাঁহার অবতার শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি, মনোমোহন-কারী পরম সুন্দর দেবাকারে পরিগণিত হইলেন। বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবগণও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রাম করিয়া ছিলেন। দাক্ষি-ণাত্যদেশে বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য, সম্প্রদায় সকল সংস্থাপন পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্মকে নিয়মবদ্ধ আকারে পরিণত করিলেন। বোধ হয়, ব্যভিচারী শাক্তদিগের অত্যাচার হইতে জনগণকে রক্ষার জন্য সম্প্রদায় প্রণালী প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

"পর মত বিরুদ্ধাংশে ছেদন করিয়া
স্বমত যাথার্থ্য স্থাপে বিচার করিয়া।" ভক্তমাল।

চারিটী সম্প্রদায়ের নাম শ্রী, চতুর্ম্মুখ, রুদ্র ও চতুঃসন। শ্রীসম্প্রদায়ের আদিগুরু রামানুজস্বামী, চতুর্ম্মুখ সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্যের স্থাপিত, বিষ্ণু স্বামী রুদ্রসম্প্রদায়, এবং নিম্বাদিত্য চতুঃসন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহারা সকলেই বিষ্ণূপাসক ছিলেন; কিন্তু পরম্পরে বিষ্ণুর বিভিন্ন অব-তারের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। রামানুজ সম্প্রদায় রামের এবং মধ্বা-চার্য্য সম্প্রদায় কৃষ্ণের প্রাধান্য মানিয়া থাকেন। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ই শুদ্ধাচার, অহিংসা, ভক্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিক ধর্ম্ম সকল শিক্ষা দিয়াছেন। সম্প্র-

দায়ী বৈষ্ণব সকলেই গৃহত্যাগী উদাসীন। তাঁহারা একটী একটী দল বাঁধিয়া গুরুর অধীনে বাস করিতেন, এবং দেশপর্য্যটনে অধিক সময় ক্ষেপণ করিতেন। ইহারা যে যে স্থানে থাকিতেন, তাহাকে মঠ বলে। এক্ষণেও রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব আছেন, কিন্তু প্রথমকালের ন্যায় তাঁহাদের ধর্ম্মের আর আধ্যাত্মিক ভাব নাই। নানাপ্রকার কদাচার ও কদনুষ্ঠান ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সম্প্রদায় ধর্ম্ম এক সময়ে এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে সম্প্রদায়বিহীন হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মই গ্রহণ করা হইত না, এই বিশ্বাস বৈষ্ণব জগতে বদ্ধ মূল হইয়াছিল। বোধ হয় এই বিশ্বাস হেতু চৈতন্য দেবকেও সন্ন্যাস গ্রহণ সময়ে মধ্বাচার্য্য মটের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

"বিনা সম্প্রদায় গুরু উপদেশ ব্যর্থ;
কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু না যায় অনর্থ।" ভক্তমাল।

সম্প্রদায় ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই প্রথমতঃ ভক্তি ও প্রেমের ধর্ম্মের উদয় হয়। মাধবেন্দ্রপুরী, যামুনাচার্য্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ পরম ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁহাদের জীবনে যে নদীর প্রথম প্রস্রবণ উন্মুক্ত হয় এবং যাহা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া মৃদু মন্দগতিতে বহিতে বহিতে শ্রীবাস, অদ্বৈত ও হরিদাস প্রভৃতির হৃদয় ক্ষেত্র অভিষিক্ত করে, সাগর সদৃশ চৈতন্য হৃদয়ের বিপুল ফোয়ারা খুলিয়া গিয়া তাহারই কলেবর বৃদ্ধিকরত এক মহা প্লাবন উপস্থিত করিয়াছিল। সম্প্রদায়ীগণের ঈশ্বর বিশ্বাস কি রূপ উজ্জ্বল ছিল, তাহা যামুনাচার্য্য কৃত নিম্নোদ্ধৃত স্তোত্রটী পাঠ করিলে জানা যাইতে পারে।

"উল্লংঘিত ত্রিবিধ সীম সমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরি ব্রঢ়িম স্বভাবম্।
মায়া বলেন ভবতাপি নিগুহ্য মানম্
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্য ভাবাঃ।" অলকমন্দার স্তোত্র।

হে ভগবন্! আপনার গোপনীয় চরিত্র স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সীমার পরাকাষ্ঠা অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে এবং আপনিও মায়াবলে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন; কেবল আপনাতে অনন্য ভাব ভক্তেরাই তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত পাঠে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ

কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রথম স্থাপিত হয়। বিষ্ণু পূজার পদ্ধতি পূর্ব্ব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সম্প্রদায়ীগণ কেবল তাহারই মত সকল লইয়া এক একটী পৃথক দল গঠন করেন; এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাব কালক্রমে বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়ে। সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বে এদেশে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব গোস্বামী কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। তবে সম্প্রদায়ীগণের ভাবের সহিত ঐ ভাব মিশিয়া গিয়া একটী অভিনব আকার ধারণ করে। চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতি বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ এই অভিনব ভাব লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাজন করিতেছিলেন। মধ্বাচার্য্য-মঠের অধস্তন সপ্তম আচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরী দেশ পর্য্যটন উপলক্ষে এদেশে আগমন করতঃ অদ্বৈতকে ভক্তির ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া যান; তদবধি প্রেমভক্তির জ্বলন্ত ভাব সকল অদ্বৈতান্তঃকরণে উদ্দীপিত হইয়াছিল।

"তাঁর ঠাঁই উপদেশ করিলা গ্রহণ,
হেনমতে মাধবেন্দ্র অদ্বৈত মিলন।" চৈতন্য ভাগবত।

তৎকালে অদ্বৈতভবনেই বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইতেন। অদ্বৈতাচার্য্যের টোল ছিল; সেখানে অধ্যাপনা উপলক্ষে তিনি ভক্তি শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। যবন কুলোদ্ভব ভক্ত হরিদাস যবন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহারই বাটীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গসমাজ যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিল না, তাহাতে সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দিকে ভক্তি ও বিশ্বাস শূন্য লোক গুলা ধর্ম্মের নামে কেবল কতগুলি বাহাড়ম্বরে মত্ত হইয়া পরিত্রাণের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, দেখিয়া অদ্বৈত বড়ই ব্যাকুল হইতেন এবং কবে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া পাষণ্ডীদিগকে উদ্ধার করিবেন, সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন।

"বিষ্ণু ভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার,
অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার।" চৈতন্য ভাগবত।

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ,
ভক্তি গন্ধ নাহি যাতে যায় ভব রোগ।
লোক গতি দেখি আচার্য্য করুণ হৃদয়;
বিচার করেন লোকের কৈছে গতি হয়?" চৈতন্য চরিত।

কথিত আছে যে প্রেম ভক্তির বিশুদ্ধ ধর্ম্ম অবতীর্ণ করাইবার জন্য তিনি সেই হইতে বিশেষ সাধনা আরম্ভ করিলেন ও আপনিও প্রাণপণ যত্নে ভক্তি শাস্ত্র অধ্যাপনা ও নাম সংকীর্ত্তন প্রচার প্রভৃতি উপায় সকল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা বলেন যে, তাঁহারই সাধনার বলে পরবর্ত্তী সময়ে স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্য দেহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"এই মতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার।" চৈতন্য চরিত।

ক্ষুদ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রতি তখন সর্ব্বদাই উৎপীড়ন ও অত্যাচার হইত; এবং ইতর ভদ্র সকলেই বৈষ্ণবদিগকে উপহাস করিত। চৈতন্যভাগবত-কার তখনকার ভাব অতি সুন্দররূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

"হাততালি দিয়া যে সকল ভক্তগণ
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন;
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে,
'ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে?
আমি ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নারায়ণ;
দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ?
সংসারী লোকেরে বলে মাগিয়া খাইতে;
ডাকিয়া বলয়ে হরি লোকে জানাইতে।
এ গুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।'
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মেলিয়া।" চৈতন্য ভাগবত।

বৌদ্ধধর্ম্মের গতিরোধ জন্য যতগুলি আধ্যাত্মিক বল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সর্ব্বাপেক্ষা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদই প্রধান। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই শঙ্কর অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন এবং অল্প বয়সে নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার মত এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই; জীবের অস্তিত্ব কেবল মায়া মাত্র; মায়াত্যাগ হইলেই জীব ও ব্রহ্মে কিছুই প্রভেদ থাকে না। এইভাবে তিনি সমস্ত বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিলেন। এক্ষণেও ঐ সকল শাঙ্করভাষ্য বেদবাক্যের ন্যায় মান্য হইয়া আসিতেছে। বোধ হয়, শিক্ষিত ও জ্ঞানীব্যক্তিদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করার জন্য এই মত উদ্ভাবিত হইয়াছিল। বাস্তবিকও

তাহাই ঘটিয়াছিল। তৎকালের পণ্ডিত সমাজে এইমত সম্মানিত হওয়ার পর, বৌদ্ধগণ পরাজিত হইয়া সমুদ্র পারে ও হিমালয় পারে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চৈতন্যের পূর্ব্বে এইমত বহুল প্রচার হইয়াছিল। এই মতের বিরুদ্ধে তাঁহাকে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে মত অবলম্বন করিয়া শ্রীমান শঙ্করাচার্য্য বিধর্ম্মী বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারক শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আবার তাহারই মূলোৎপাটনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বৈষ্ণব সমাজে এই মত এতই দূষণীয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছে যে আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবগণ শঙ্করের নাম শুনিবামাত্র খড়্গহস্ত হয়েন। চৈতন্য "সোঽহং" 'তত্ত্বমসি' মত সকলের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি ও তর্ক দেখাইয়া কাশীবাসী পরমহংস ও সন্ন্যাসীগণকে নিরুত্তর করিয়াছিলেন। তিনি উপনিষদ ও বেদসূত্রকে তত্ত্বজ্ঞানের আকর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; কেবল শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখাই দূষণীয় মনে করিতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি শঙ্করকে তিরস্কার করেন নাই, বরং বলিতেন যে, তিনি ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিবার জন্য এই অর্থ করিয়াছিলেন।

"উপনিষদ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব;
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব।
গৌণবৃত্ত্যে যেই ভাষ্য করিল আচার্য্য;
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সব কার্য্য।
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা,
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া।" চৈতন্য চরিতামৃত।

কালে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ মধ্যে আবার নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করিতে লাগিল; তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম শৈবধর্ম্মরূপে পরিণত হইল।

বৈষ্ণবগণ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন ও তাহা তখনকার শিক্ষিতদলে, কিরূপ সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা পশ্চাল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ পাঠে জানা যাইতে পারে।

"সন্ন্যাসীর সনে না করেন আলাপন;
সেই আপনাকে মাত্র বলে নারায়ণ।"

জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, বিরক্ত খ্যাতি যার;
কারও মুখে নাহি দাস্যমহিমা প্রচার। চৈতন্য ভাগবত।
"ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস;
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস?
মায়াধীশ, মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ;
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ?"

এই ত গেল সম্ভ্রান্ত লোক ও শিক্ষিত পাণ্ডিতদিগের কথা। ইতর সাধারণ লোকে না শাক্ত, না বৈষ্ণব, না অদ্বৈতবাদী; ইহার কিছুই ছিল না। তাহারা সকল মতেরই সকল কথা মানিত কিম্বা না মানিত। যখন যে সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা পরিচালিত হইত, তখনই সেইরূপ চলিত। ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মও মানিত, মাংস, সুরা প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও যোগ দিত, আবার মায়াময় জগৎ, ঈশ্বর ভিন্ন জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা দায়িত্ব নাই, ইহাও বলিত। তদ্ভিন্ন জনসাধারণে কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত দেবতাপূজার পদ্ধতি প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ইহাতেই তাহাদের অধিক আমোদ ও কৌতুক দেখা যাইত। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, ষষ্ঠী প্রভৃতি কতকগুলি দেবতার পর্ব্বেই তাহাদের বিশেষ উৎসাহ ছিল। এক্ষণকার ন্যায় দুর্গোৎসবের প্রথা তখনও প্রবর্ত্তিত ছিল; তাহা বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। নিষ্কাম ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা চৈতন্যের পূর্ব্বে কি ইতর, কি ভদ্র কেহই জানিতেন না। পশ্চাদুদ্ধৃত কবিতাটী তখনকার সামাজিক ধর্ম্ম ভাবের একটী সুন্দর ছবি।

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এইমাত্র জানে;
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি:
তাহা যে পূজেন সেই মহা দম্ভ করি।
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে;
মদ্য মাংস দানে পূজে কোন কোন জনে।
যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপাল গীত;
ইহা শুনিতে লোক সব মহা আনন্দিত।" চৈতন্য ভাগবত।

বিষহরির গান, রামায়ণের গানের ন্যায় গীত হয়; তাহা এক্ষণেও কোন

কোন ইতর শ্রেণীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যোগীপাল গীতাদি কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার যো নাই।

যে সকল ধর্ম্মের কথা বলা হইল, তদ্ভিন্ন মুসলমান ধর্ম্মও তখন বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অর্থ লোভেই হউক, আর বল প্রয়োগ দ্বারাই হউক, অনেক এ দেশবাসী তখন মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; মুসলমান-দিগের ভাষা ও ভাব বহুল পরিমাণে সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; এবং মহম্মদীয় ব্যবহারাদিও গৃহীত হইয়া ছিল। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে সকল আধ্যাত্মিক শক্তি তখন সমাজ মধ্যে কার্য্য করিতেছিল, তন্মধ্যে মুসলমানের ধর্ম্মভাবও একটী। তবেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শাক্ত ধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদ, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, শাস্ত্র বহির্ভূত নানা প্রকার সামাজিক উপধর্ম্ম এবং কতক পরিমাণে মুসলমান ধর্ম্মের ভাব দ্বারা তদানীন্তন বঙ্গসমাজ পরিচালিত হইতেছিল। চৈতন্য ও তাঁহার সহযোগী ধর্ম্মাচার্য্য-গণকে এই সমস্ত মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রেম ও ভক্তির ধর্ম্ম স্থাপিত করিতে হইয়াছিল। ইহাতে কি প্রকার আধ্যাত্মিক বলের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা চৈতন্য জীবনের ঘটনাবলী সাক্ষ্য দিতেছে। ফলতঃ তাঁহার আধ্যাত্মিক বলের সহিত এই সকল আধ্যাত্মিক শক্তির যে সংগ্রাম, তাহাই তাঁহার জীবনের গূঢ় রহস্য।

এত গুলি শক্তির ক্রীড়াভূমি হইয়া বঙ্গসমাজ সময়ের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া চলিল, বঙ্গবাসীগণ স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমে নিস্তেজ, অবসন্ন ও অসার হইয়া পড়িল, প্রাচীন আর্য্য সমাজের দৃঢ় বন্ধন ও ধর্ম্মভাব সকল শিথিল হইয়া পড়িয়া সমাজকে আধ্যাত্মিক অবনতির চরমাবস্থায় উপনীত করিল, এবং অচিরকাল মধ্যে সোনার বঙ্গদেশ প্রেত-ভূমিতে পরিণত হইল। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে? বাঙ্গালী, বল বীর্য্য, সৎসাহস প্রভৃতি মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণ-সমূহ ও পার্থিব উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইল বটে, কিন্তু ভগবান্ বাঙ্গালীর হৃদয় দিয়া যে ভাগবতী লীলা প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহা তখন কে জানিত? সেই অন্ধকারময় পিশাচভূমিতেই যে উত্তরকালে সত্য ধর্ম্মের সূর্য্য উদিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আলোক দান করিবে, তাহা কোন্ মানব বুদ্ধির আয়ত্তাধীন ছিল? সেই জন্যই বুঝিবা বিধাতার মঙ্গলময় হস্ত বাঙ্গালী জাতির সমস্ত ঐহিক সুখ কাড়িয়া লইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের জন্য তাহাকে অল্পে অল্পে প্রস্তুত করিতে-

ছিল। ফলতঃ যেমন মহর্ষি ঈশার আগমনের পূর্ব্বে সংসারবিরাগী যোহন আসিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন যে, "আমার পরে যিনি আসিতেছেন তাঁহার দ্বারা স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে," তদ্রূপ ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্যের প্রেম ভক্তির ধর্ম্ম আসিয়া যেন এই বলিয়া গেল যে "বঙ্গদেশ প্রস্তুত হও। ভক্তি বন্যার জলে অজ্ঞান অন্ধকারের আবর্জ্জনা সকল ধৌত কর, আমার পর যে আলোক এখানে আসিতেছে তাহা হইতেই স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে; অতএব সেই আলোক গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।" ফলে আমরা চৈতন্যচন্দ্রের উদয়কে পরবর্ত্তী বিধান বিকাশের প্রথম উষা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি। তিনি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন বঙ্গের আকাশ প্রান্তে তেজঃপুঞ্জ ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হইয়া ৪৮ বৎসর কালযাবৎ প্রেমভক্তির আলোকে বঙ্গবাসীর হৃদয় আলোকিত করতঃ পুনরায় অনন্তের বক্ষে অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছেন। এই ৪৮ বৎসর মধ্যে এ দেশের ধর্ম্ম জগতে যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই পূর্ব্বাভাস আমরা এই পরিচ্ছেদে কিছু কিছু বর্ণন করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনা।

১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ইংরাজী ১৪৮৫ অব্দে চৈতন্য'দেব জন্ম-গ্রহণ করেন, এবং ১৪৫৫ শকে অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অন্তর্ধান হয়।

"চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ;
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান।" চৈতন্য চরিতামৃত।

এই অর্দ্ধ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক বৃত্তান্ত আমরা এক্ষণে বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থাবলম্বনে কতক কতক প্রদর্শন করিতেছি।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে হিন্দুরাজত্ব লোপ হইল; পৃথ্বীরাজের অধিকৃত সিংহাসন যবনকরতলন্যস্ত হইল। সুলতান সাহাবুদ্দীন দিল্লীর সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া আপন সৈন্যাধ্যক্ষ কুতবুদ্দীনকে তাহার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে সাহাবুদ্দীনের মৃত্যু হইলে গজনীর সাম্রাজ্য উৎসন্ন হইল। তখন কুতবুদ্দীন সম্রাট উপাধি গ্রহণ করতঃ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১১০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রধান সেনাপতি

বখ্‌তিয়ার খিলিজী সেনবংশীয় বৃদ্ধ নরপতি লাক্ষণেয়কে কৌশলক্রমে রাজ্য-চ্যুত করিয়া বঙ্গদেশে যবন পতাকা উড্ডীন করিলেন, এবং দিল্লীশ্বরের নামে স্বয়ং ইহা শাসন করিতে লাগিলেন। গৌড়নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। সেই হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ক্রমান্বয়ে মুসলমান সুবাদারগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্‌ আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক এই দেশ দুইভাগে বিভক্ত হইল। পূর্ব্বভাগে বাহাদুর খাঁ সুবাদার নিযুক্ত হইয়া সোনার গ্রাম নগরে আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন। নাজীরুদ্দীন ইহার পূর্ব্ব হইতে সমস্ত বঙ্গের সুবাদার ছিলেন। বিভাগের পরও তিনি গৌড় নগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাল সহকারে দিল্লীর সম্রাট্‌গণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় তাঁহাদের অধীনস্থ সুবাদারগণ দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীনতা পরিত্যাগ করতঃ স্বাধীন হইতে লাগিলেন। ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে লোদী-বংশীয় সম্রাট মহম্মদ সাহার অধিকার সময়ে সোনার গ্রাম বিভা-গের সুবাদারের জনৈক সামান্য ভৃত্য কৌশলক্রমে সমস্ত বঙ্গদেশ হস্তগত করতঃ সুলতান সেকেন্দার নামে বঙ্গের একেশ্বর হইলেন; এবং দিল্লীশ্বরের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিচিত করিলেন। দিল্লীশ্বর তখন ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং তিনি সেকেন্দরের কিছুই করিতে পারিলেন না। সেই হইতে সম্রাট আক্‌বর সাহার অধিকার অর্থাৎ ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুই শত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশ দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন ভাবে মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, পাঠান রাজগণের এইরূপ স্বাধীনতার কালেই নবদ্বীপে শচীনন্দন জন্মগ্রহণ করেন।

চৈতন্যচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে বারিক নামে বঙ্গে-শ্বরের জনৈক খোজা স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া সুলতান সাজাদা নাম গ্রহণ করত গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ৮ মাস গত হইতে না হইতেই মুলুক আণ্ডিল নামক তাঁহার একজন সেনাপতি তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেরোজ সাহা উপাধি গ্রহণ করতঃ বঙ্গসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ফেরোজের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সাহা এক বৎসর রাজত্ব করিলে ১৪৯৫ সালে একজন আবিসিনীয় রাজপুরুষ তাঁহার জীবন নাশ

করিয়া মজঃফর সাহা উপাধি গ্রহণ করতঃ বঙ্গরাজ্য অধিকার করিলেন। এই ব্যক্তি অতিশয় নিষ্ঠুর ও ঘৃণিত স্বভাবের লোক ছিল। তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অচিরকাল মধ্যে ওমরাগণ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং মহম্মদীয় বংশজাত মন্ত্রী সৈয়দ হোসেনকে সেনাপতি করিয়া বঙ্গেশ্বরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌড় নগরের প্রান্তরে এক মহাসমর হইল; তাহাতে মজঃফর সসৈন্যে নিহত হইলে, দ্বিতীয় আলা-উদ্দীন নাম গ্রহণ করতঃ সৈযদ হোসেন বাঙ্গলার মজনদে উপবেশন করিলেন। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, এবং ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সৈয়দ হুসেন রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং চৈতন্য জীবনের দ্বাদশ হইতে পঞ্চত্রিংশবর্ষ পর্য্যন্তের ঘটনা তাঁহারই রাজত্বকালে সংঘটিত হইয়াছিল। এই রাজার রাজত্ব সময়ে রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রজাগণ নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতে লাগিল এবং অনেক সুনিয়মও সংস্থাপিত হইল। ইনি এক ডালার দুর্গ সংস্কার করিয়া সেখানে আপন বাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং রাজ্যের অহিতকারী আবিসিনীয় ও অন্যান্য দুষ্ট লোকদিগকে দমন করিলেন। ইহার পুত্র নশরৎ সাহা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার অধিকার সময়ে গৌড় নগরে অনেক সুন্দর সুন্দর সৌধ মালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে বৎসরে চৈতন্যের তিরোধান হয়, ইনিও সেই বৎসরে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। 112785

গৌড়েশ্বর সৈয়দহুসেনের নাম চৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত আছে। দ্বিতীয় আলাউদ্দীনের পূর্ব্বনাম সৈয়দহুসেন ছিল ও সে সময়ে তিনিই বঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। সুতরাং চৈতন্যভাগবতের সৈয়দহুসেনই যে দ্বিতীয় আলা-উদ্দীন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। যখন রাজধানীর সমীপবর্ত্তী রামকেলি গ্রামে চৈতন্য হরিনামের মহিমা প্রচার করিতেছিলেন, কোটি কোটি নরনারী তাঁহাকে দেখিতে ও নামসঙ্কীর্ত্তন শুনিতে আসিতেছিল, মৃদঙ্গ করতালের নিনাদে দিগন্ত কম্পিত হইতেছিল এবং প্রেমভক্তির বন্যাতে সমস্ত বঙ্গভূমি ভাসিতেছিল, গৌড়ের সহর-কোতয়াল রাজাকে সেই বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন।

"কোতয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে;
এক সন্ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলি গ্রামে।

নিরবধি করয়ে ভূতের সঙ্কীর্ত্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কত জন।" চৈতন্য চরিতামৃত।

এই সম্বাদ পাইয়া সৈয়দহুসেন হিন্দু সভাসদগণকে বিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎকালে কেশবছত্রী ও রূপ এবং সাকর মল্লিক এই তিন জন সর্ব্ব প্রধান হিন্দু সভাসদ্ ছিলেন। রূপ ও সাকর মল্লিককে বীরখাস ও দবীর খাস বলিত। চৈতন্যের প্রেমমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ও মহোচ্চপদ-মর্য্যাদাকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করতঃ পরবর্ত্তী বৈরাগ্যাশ্রমে ইঁহারাই রূপ সনাতন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহারা এই বলিয়া চৈতন্যের বিষয় উড়াইয়া দিলেন যে, "কোথা হইতে একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আসিয়াছে, তাহার এত মহত্ব কি যে আপনি তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন?" তাঁহারা ভাবিয়া ছিলেন, যবন জাতি ঘোর অবিশ্বাসী, এক্ষণে যদিও সাধুভাব প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু পরে অন্যের মন্ত্রণা শুনিয়া বিপদ ঘটাইতে পারে, এই বিবেচনায় চৈতন্যকে রাজধানীর নিকট হইতে চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ভগবানের নামের কি মহিমা ও সাধুগণের প্রকৃতি কি মনোহর! হোসেন সাহা চৈতন্যের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা দূরে থাকুক, তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধার জন্য ও গোঁড়া কাজীগণ তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিতে না পারে, তজ্জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন।

"রাজা বলে এই মুই বলি যে সবারে;
কেহ যদি উপদ্রব করয়ে তাঁহারে।
যেখানে তাঁহার ইচ্ছা থাকুন সেখানে;
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে।
সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন;
বিরলে থাকুন কিম্বা যেবা লয় মন।
কাজী বা কোটাল কিম্বা অন্য কোন জন,
যে কিছু বলিবে তার লইব জীবন।" চৈতন্য ভাগবত।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, হোসেন সাহা একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন; সুতরাং হিন্দুর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। বৈষ্ণব গ্রন্থেও ইহার যথেষ্ট পোষকতা পাওয়া যায়।

"যে হোসেন সাহা পূর্ব্বে উড়ীয়ার দেশে,
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।" চৈতন্য ভাগবত।

তবে যে চৈতন্যের প্রতি তিনি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের ইচ্ছায় বলিতে হইবে।

এই সময়ে রূপ ও সাকর মল্লিক, দুই ভ্রাতা চৈতন্যচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চৈতন্যের প্রজ্বলিত বৈরাগ্যভাব তাঁহাদের অন্তরে অন্তরে বিঁধিল। চৈতন্যদেব রামকেলি গ্রাম হইতে চলিয়া গেলে উভয় ভ্রাতারই বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। রূপ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বাগ্রে চৈতন্যসন্নিধানে চলিয়া গেলেন। তখন সাকর সংসার ত্যাগের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন; ও সমস্ত রাজকার্য্যের ভারার্পণই তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি অমনোযোগী হইয়া পীড়ার ভান করত বাটীতে বসিয়া থাকাতে রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। এক দিন হঠাৎ গৌড়েশ্বর তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।

"রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল।
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা,
কার্য্য ছাড়ি রৈলা তুমি ঘরেতে বসিয়া।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ।" চৈতন্য চিরতামৃত।

ইহা শুনিয়া সনাতন বলিলেন যে তাঁহার দ্বারায় আর রাজকার্য্য চলিবে না। তাঁহার স্থানে দ্বিতীয় লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাতে গৌড়েশ্বর সৈয়দ হুসেন রাগান্বিত হইয়া সনাতনকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কতক দিন পরে রাজ মন্ত্রী উৎকোচের দ্বারা কারাধ্যক্ষকে বশীভূত করতঃ বারাণসীনগরে যাইয়া চৈতন্যের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তদবধি উজীরীর পরিবর্ত্তে তাঁহার ফকীরী অবলম্বন হইল।

এই বৃত্তান্ত পাঠে সুরুচিসম্পন্ন পাঠক মনে করিতে পারেন যে, সনাতনের ন্যায় ধার্ম্মিক লোকের পক্ষে পীড়ার ভান করিয়া বাটীতে বসিয়া থাকা ও উৎকোচ দিয়া কারামুক্ত হওয়া অতি অন্যায় হইয়াছিল। তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, সনাতনের সেই ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ। সত্যাসত্য, পাপ পুণ্যের প্রভেদ তখনও ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তীব্র বৈরাগ্যের উত্তেজনায় সংসার পরিত্যাগ করা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ও তাহা সাধন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন। আমরা এরূপ বলি না যে, সনাতন

তখন সমস্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। যদি তাহা হইত, তবে তাহার পর দুই মাস পর্য্যন্ত কাশীতে চৈতন্যের নিকট তাঁহাকে উপদেশ লইতে হইত না।

চৈতন্য জীবনের শেষ অষ্টাদশবর্ষের ঘটনাবলী উড়িষ্যার নীলাদ্রিতে সংঘটিত হইয়াছিল; এবং উৎকল রাজ ও তাঁহার প্রধান সভাসদ্‌গণ চৈতন্যের প্রিয় ভক্ত ছিলেন। সুতরাং সে দেশের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এ গ্রন্থে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নহে। চৈতন্য জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশ যেরূপ স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়া যবন করতলন্যস্ত হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে উড়িষ্যার অবস্থা তখন সেরূপ ছিল না। তখনও নীলাচলের রাজ প্রসাদে হিন্দুস্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড়িতেছিল এবং সমস্ত উৎকল দেশবাসী স্বাধীনভাবে কাল যাপন করিতেছিল। অধিক সৌভাগ্যের বিষয় এই যে চৈতন্য দেবের সময়ে বঙ্গদেশীয় রাজগণ উড়িষ্যার নৃপাসনে আসীন ছিলেন।

ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উৎকলের সিংহাসনে কেশরীবংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষোক্ত বৎসরে কেশরীবংশ ধ্বংস করতঃ গঙ্গাবংশের জনৈক রাজকুমার উৎকল সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। সেই হইতে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ একাদিক্রমে উড়িষ্যার রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজাগণের সময়ে কেবল কয়েক বৎসর সিংহাসন লইয়া গোলযোগ বাধিয়াছিল। সে যাহা হউক চৈতন্যের সময়ে গঙ্গাবংশীয় প্রতাপরুদ্র নামে নরপতি উড়িষ্যার রাজাসনে আসীন ছিলেন। অধ্যাপক উইলসন সাহেব সাব্যস্ত করিয়াছেন যে মেদিনীপুর ও তমলুকের মধ্যবর্ত্তী স্থান বিশেষ হইতে গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ প্রথমে উৎকলে গমন করিয়াছিলেন; সুতরাং এই রাজাগণ যে জাতীতে বাঙ্গালীছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে রাজা প্রতাপরুদ্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও উইলসন সাহেবের কথাই দৃঢ়ীভূত হয়। কারণ এই রাজা অতিশয় বাঙ্গালীর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার প্রধান সভাপণ্ডিত ও প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। প্রধান সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ক্ষমতা অদ্বিতীয় ছিল।

রাজা প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত

ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনগত ইচ্ছা পত্রের দ্বারা সার্ব্বভৌম ভট্টা-চার্য্যেকে জানাইলে ভট্টাচার্য্য প্রসঙ্গতঃ ঐ কথা চৈতন্যকে জানাইলেন। স্ত্রী ও রাজদর্শন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ, সুতরাং সন্ন্যাসী চূড়ামণি চৈতন্য এই কথা শ্রবণ মাত্রে (বিষ্ণু) (বিষ্ণু) বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন ও সার্ব্ব-ভৌমকে বলিলেন যে যদি তিনি পুনরায় ঐরূপ কথার প্রসঙ্গ করেন তবে আর তাঁহাকে নীলাদ্রিতে দেখিতে পাইবেন না। সার্ব্বভৌম পরাস্ত মানিয়া অগত্যা ঐ কথা রাজাকে জানাইতে বাধ্য হইলেন। প্রতাপরুদ্র গৌরাঙ্গের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে ঐ কথা শ্রবণে মর্ম্মা-হত হইলেন এবং চৈতন্যের সাক্ষাৎকার না পাইলে রাজ্যাদি সমস্ত বিষয় বৈভব পরিত্যাগ করতঃ বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। ভগবৎপ্রেমিক রামানন্দ রায় গোদাবরী প্রদেশে প্রতাপ রুদ্রের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ কালে গোদাবরী তীরে চৈতন্যের সহিত তাঁহার মিলন হওয়ার পর রামানন্দ রায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল চৈতন্যের সহবাসে কাটা-ইবেন। এই মনোগত ইচ্ছা তিনি রাজাকে নিবেদন করিলে রাজা প্রতাপরুদ্র আহ্লাদ সহকারে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ও তাঁহার নির্দ্ধা-রিত বেতন তাঁহাকে পেন্সন্ স্বরূপ মাসে মাসে দেওয়া হইবে তাহারও আদেশ করিয়া দিলেন; এবং সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎ দর্শনের ইচ্ছা জানাইলেন।

"তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাও সে বর্ত্তন;
নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্য চরণ।
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই ভজে তাঁর সফল জীবনে।" চৈতন্য চরিতামৃত।

রামানন্দ রায় চৈতন্য সমীপে রাজার এই কাতরোক্তি বিজ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু ফলোদয় হইল না। তখন গজপতি প্রতাপরুদ্র আপন রাজধানী কটকনগর হইতে সার্ব্বভৌমকে এই দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন যে যদি তিনি গৌরাঙ্গের দর্শন না পান তবে নিশ্চয়ই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া চলিয়া যাই-বেন। এই পত্রে তিনি মহাপ্রভুর সমস্ত পার্ষদগণকেও অতি দীন ভাবে আত্ম নিবেদন জানাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার নিমিত্ত চৈতন্যের

নিকট অনুরোধ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। এই পত্র পাঠ করিয়া নিত্যানন্দপ্রমুখ সমস্ত ভক্তগণ চৈতন্যকে চটেপটে ধরিলেন; কিন্তু ধর্ম্মবীর চৈতন্য কিছুতেই আপন বিশ্বাস হইতে টলিলেন না। অবশেষে সকলে মিলিয়া এক রকা-বন্দোবস্ত করিলেন যে চৈতন্যের এক খানি বহির্বাস রাজসমীপে পাঠান হইবে; চৈতন্যের পরিবর্ত্তে রাজা ঐ বহির্বাসকে আলিঙ্গন করিতে পাইবেন। তাহাই করা হইল। তাহাতে রাজা কতক শান্ত হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনের ক্ষোভ মিটিল না। তখন চৈতন্যদেব রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলে রাজা আপন তনয়কে গৌরাঙ্গ সন্নিধানে পাঠাইলেন। গৌরাঙ্গ মহানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজাও পরে সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু বঙ্গদেশ দিয়া বৃন্দাবন যাইবার মনস্থ করিয়া কটক নগরে চলিয়া আসিলেন এবং নগরের বহিরুদ্যানে আপন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর সমভিব্যাহারে ছিলেন; তিনি প্রভুর আগমন বার্ত্তা রাজস্থানে জানাইলে রাজা প্রতাপ রুদ্র যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন এবং বহুকালের সঞ্চিত মনের গাঢ় অনুরাগ এখন অনায়াসে চরিতার্থ হইতে পারিবে ভাবিয়া অতি ব্যস্ততার সহিত যাইয়া চৈতন্যের চরণ বন্দনা করিলেন ও প্রণয়বিহ্বলে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চৈতন্য তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তখন তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

"শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা;
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয় বিহ্বল;
স্তুতি করে পুলকাঙ্গে পড়ে অশ্রুজল।
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন;
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।" চৈতন্য চরিত।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন উড়িষ্যারাজ ও বঙ্গেশ্বরে যুদ্ধ হইতেছিল। উৎকল সীমার পর পারে যবন রাজ্য। পথে দস্যুভয় ও যবন-সৈনিকগণের প্রচুর অত্যাচার ছিল। বঙ্গদেশে যাইতে পথিমধ্যে চৈতন্যের কোন অসুবিধা না হয় ও যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে বঙ্গদেশে পৌঁছিতে পারেন এই উদ্দেশে রাজা প্রতাপরুদ্র প্রদেশস্থ ও বিভাগীয় রাজকর্ম্মচারীগণকে পত্র

লিখিয়া দিলেন, এবং পথের দুই পার্শ্বে সামগ্রীসম্ভার প্রস্তুত থাকে ও জলপথে নৌকার সুব্যবস্থা হয় এরূপ উপায় করিয়া দিয়া রামানন্দরায় ও আপনার প্রধান অমাত্য শ্রীহরিচন্দন ও মঙ্গরাজকে তাঁহার সমভিব্যাহারে দিয়া পাঠাইলেন। সচিবদ্বয় যাজপুর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রামানন্দ রায় রেমুণা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। চৈতন্যের সঙ্গে বহু ভক্ত মণ্ডলী যাইতে লাগিলেন। যেখানে যান রাজকর্ম্মচারীদের সুব্যবস্থায় সেইখানে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গ বহু ভক্ত সমাকীর্ণ হইয়া উৎকলের সীমান্তঃপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে উৎকলরাজের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে ৩।৪ দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহার নিরাপদে বাঙ্গলায় যাইবার জন্য যবন রাজকর্ম্মচারীর সহিত সন্ধিস্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন।

"দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে ;
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে।" চৈতন্য চরিত।

এই সময়ে যবনরাজের এক অনুচর উড়িয়াদিগের কটকে আসিয়া মহাপ্রভুর ভক্তিভাব ও নামসংকীর্ত্তন দেখিয়া গিয়া আপন প্রভুকে জানাইল। যবনাধ্যক্ষ তাহা শুনিয়া চৈতন্যকে দেখিতে ইচ্ছুক হওতঃ আপন বিশ্বাসী অনুচর দ্বারা আপন অভিলাষ বলিয়া পাঠাইলেন। উৎকল রাজাধ্যক্ষ মহাপাত্র প্রত্যুত্তরে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে যদি নিরস্ত্র হইয়া কেবল দুই চারি জন ভৃত্য সঙ্গে আসিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পারেন; নচেৎ নহে। যবনরাজ সেই প্রকারেই আসিয়া চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং তাঁহার স্বর্গীয় প্রেমভক্তির ভাবাবলোকনে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই দাম্ভিক যবন আপন পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন, এবং বালকের ন্যায় পরিত্রাণের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়াগেল। তখন যবনাধ্যক্ষ চৈতন্যের বঙ্গগমনের সকল সুবিধা করিয়া দিলেন এবং জলপন্থায় উত্তম উত্তম নৌকা সজ্জিত করিয়া দিয়া জলদস্যুগণ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে, সেই জন্য পিছলদা পর্য্যন্ত স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। সেখান হইতে তিনি বিদায় হইয়া গেলে চৈতন্যদেব তাঁহার প্রদত্ত নৌকারোহণে নির্ব্বিঘ্নে পানীহাটী গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন।

"জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল,
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল।
মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদী পার করাইল;
পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল।
সেকালে তার প্রেম চেষ্টা না পারি বর্ণিতে;
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হইতে।" চৈঃ চঃ।

এক্ষণে যে জমিদারী প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইহার মূলান্বেষণ করিতে গেলে মুসলমান্ রাজাদিগের অধিকার সময় নির্ব্বাচন করিতে হয়। ইতিহাস পাঠে জানাযায় যে মুসলমান রাজগণ বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড সকল উৎপন্ন শস্যের অংশের গড় পড়তা ধরিয়া করাবধারণ করতঃ ভূম্যধিকারীগণকে বিলী করিয়াদিতেন; ও তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ কর আদায় করিয়া লইতেন। ভূম্যধিকারীগণ কারাদায়ে অশক্ত হইলে বা দুষ্টামি করিলে সরকার হইতে ক্রোধ সাঁজোয়াল নিযুক্ত করিয়া আদায়ের চেষ্টা হইত। ইংরেজাধিকারের প্রথমাবস্থাতেও এই প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের শাসন কালে ঐ নির্দ্দিষ্ট করে জমিদারী সকল চিরকালের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল; এবং অদ্যাবধি তদনুসারে করাদায় হইয়া আসিতেছে। জমিদার, তালুকদার, মকররীদার প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদ হইতে কর্ষণকারী কৃষক পর্য্যন্ত এক্ষণে বহুবিধ স্বত্বের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারও অঙ্কুর মুসলমানদিগের আমলে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। বৈষ্ণবগ্রন্থের অনেক স্থানে এইরূপ ভূম্যধিকারীর উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে এস্থানে যে ঘটনাটী লিপিবদ্ধ করাযাইতেছে, তাহা হইতেই পাঠক মহাশয় তৎকালের রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহার আভাস পাইতে পারিবেন।

চৈতন্যের সময়ে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস নামে দুই সহোদর সপ্তগ্রাম জমিদারীর ভূম্যধিকারী ছিলেন। এই জমিদারীর বার্ষিক আয় বার লক্ষ টাকা ছিল। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন অতিশয় বদান্য, সদাচার নিষ্ঠ ধার্ম্মিক এবং ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে নবদ্বীপে এমন ব্রাহ্মণ ছিল না, যাঁহারা তাঁহাদের ব্রহ্মত্তর খাইতেন না বা অর্থে প্রতিপালিত হইতেন না। চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্র ইঁহাদিগকে উত্তমরূপ জানিতেন। উভয় ভ্রাতা তাঁহাদের সেবায় বিলক্ষণ তৎপর ছিলেন। কালক্রমে গোবর্দ্ধন ও হিরণ্য, অনেক টাকার

জন্য বাকীদার হইলে একজন মুসলমান্ চৌধুরী হিরণ্যদাসের জমিদারী ডাকিয়া লইল। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয় দখল ছাড়িয়া না দেওয়ায় সে ব্যক্তিও রাজ-সরকারে বার লক্ষ টাকার দায়ীক হইল। তখন সে অনন্যোপায় হইয়া রাজসরকারে দরখাস্ত করিয়া উজীরকে সরেজমিনে আনাইল। ভ্রাতৃদ্বয় এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পলায়ন করিলেন। উজীর আর কাহাকেও না পাইয়া গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাসকে কারাবদ্ধ করিলেন। এই রঘুনাথ দাস পরবর্ত্তী সময়ে সমস্ত বিষয় সংসার পরিত্যাগ করতঃ বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এবং চৈতন্যদেব মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করার পর বৃন্দাবনে যাইয়া অবশিষ্ট জীবন ভগবানের আরাধনায় যাপন করিয়াছিলেন। যাহাহউক রঘুনাথ কারাবদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছচৌধুরীকে পিতৃসম্বোধন করতঃ এরূপভাবে বিনয় করিলেন যে যবন ভূম্যধিকারী তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথের কারামোচন করাইয়া দিলেন; এবং তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের সহিত আপোষে মীমাংসা করতঃ সমস্ত দেনাপাওয়ানার হিসাব পরিষ্কার করিতে পারিলেন।

"রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল;
ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল, সব শান্ত হৈল।" চৈতন্য চরিত।

যবন কুল তিলক ভক্ত হরিদাসের জন্মস্থান বূঢ়ন গ্রাম। অল্প বয়সে হরিদাস গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন বেণাঝোপের মধ্যে বাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট করতঃ হরিনাম সাধন করিতে লাগিলেন। দেশের ভূম্যধিকারী রামচন্দ্রখান একজন দুর্দ্ধর্ষ ও বৈষ্ণবদ্বেষী লোক ছিল। লোকে হরিদাসকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত; তাহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। সে জন্য সে হরি-দাসের তপস্যা ভঙ্গ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়া রাত্রি যোগে একজন বারাঙ্গনা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিল। ইহাতে ভক্তের তপস্যা ভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক সেই বেশ্যা সাধু ভক্তের ভক্তিভাব ও নিষ্ঠা দেখিয়া কুমতি পরিত্যাগ করতঃ নবজীবন লাভ করিল। স্থানান্তরে এই প্রসঙ্গ বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইবে; এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই অধার্ম্মিক ও উপ-দ্রবকারী দেশাধ্যক্ষ শীঘ্রই স্বীয় অনুষ্ঠিত পাপের ফল ভোগ করিল। আর এক সময়ে বহুসংখ্য লোক সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দপ্রভু হরিনাম কীর্ত্তনের জন্য ইহার বাটীতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক এই পাষণ্ড তাঁহাদিগকে কুবাক্য বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিল এবং

বৈষ্ণবদিগের প্রতি তাঁহার যে আন্তরিক ঘৃণা ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য নিত্যানন্দ তাহার চণ্ডীমণ্ডপের যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানের ও আঙ্গিনার মৃত্তিকা খনন করিয়া ফেলাইয়া দিল ও ঐ স্থান গোময় দ্বারা লেপাইল।

"তবে রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞাদিল;
গোঁসাই যাঁহা বসিলা তার মাটী খোদাইল।
গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গন।" চৈতন্য চরিত।

এই রামচন্দ্র খান সুবিধা পাইলেই দস্যুবৃত্তি করিতে ছাড়িত না এবং জমিদারীর দেয় রাজস্ব আদায়ে পরাঙ্মুখ ছিল। ইহাতে রাজাজ্ঞায় উজীর আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য তাহার বহির্বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বাসা করিয়া থাকিল; এবং ভক্তসমাবেশ হইয়াছে বলিয়া যেস্থানের মাটী ইত্যগ্রে সে খনন করিয়া ফেলাইয়াছিল, সেই স্থানে অবধ্যবধ ও গোমাংসাদি রন্ধন করিতে লাগিল। পরে সপরিবারে রামচন্দ্রকে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া গেল, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত সেই গ্রাম উজাড় করিয়া দিল। এইরূপে সাধুর অপমানের জন্য সমস্ত গ্রাম দণ্ডনীয় হইল। রামচন্দ্র খানের বিবরণ নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর।
ক্রোধ হয়ে ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর;
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল;
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রাঁধিল।
স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বাঁধিয়া;
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া।
মহন্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
এক জনের দোষে সব দেশ উজাড়য়।" চৈতন্য চরিত।

এক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুসভ্য ইংরাজাধিকারে বাস করিয়াও যখন ভূম্যধিকারীগণের নানা প্রকার অত্যাচার উপদ্রবের কথা নিতান্ত অবিরল দেখা যায় না, তখন যে রামচন্দ্র খানের ন্যায় অত্যাচারী ও পাষণ্ড জমিদার পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ প্রকারে সমাজকে দূষিত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে তখন মুসলমানের আমল-

দাবী; সে সময়ে তাহার প্রতি যেরূপ দণ্ড হইয়াছিল, একালে সেরূপ দণ্ড দিবার নিয়ম নাই। স্ত্রী পুত্র সহিত বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া ও ঘরবাড়ী লুট-পাট করিয়া লওয়ার পরিবর্ত্তে এক্ষণে রাজকীয় দণ্ডবিধি ও শাসনবিধি অনুসারে কার্য্য হইয়া থাকে।

তখনকার সময়ে নাম মাত্র মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা-শাস্ত্র দেশের রাজকীয় আইন রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু কার্য্যেতে তাহার কিছুই হইত না। এক্ষণে যেমন দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্টরী প্রভৃতি বিভাগ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে কার্য্য শৃঙ্খলা সংগঠিত হইয়াছে, তখন সেরূপ কিছুই ছিল না। রাজধানীতে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কিন্তু রাজার সানুকূল আদেশ লাভ তাঁহার প্রিয়পাত্রদিগকে উৎকোচের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। প্রিয়মন্ত্রী বা অনুচর যেরূপ বুঝাইয়া দিতেন রাজা তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। রাজা ব্যতীত রাজধানীতে এক জন কাজী ও একজন সহর কোতয়াল থাকিতেন। তাঁহারা সামান্য সামান্য অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। রাজধানী ব্যতীত প্রধান প্রধান নগরেও এক এক জন কাজী থাকিত। এই সব কাজীগণের ক্ষমতা অদ্বিতীয় ছিল। তাঁহারা দেওয়ানী, ফৌজদারী প্রভৃতি সকল বিষয়েরই শাসন কর্ত্তা ছিলেন; এবং আপনাদের ইচ্ছানুসারে দণ্ড পুরস্কার দিতে পারিতেন। চৈতন্যের সময়ে এইরূপ একজন কাজী নবদ্বীপে নিযুক্ত ছিলেন।

চৈতন্যচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে ভক্তিপথাবলম্বী যে সকল বৈষ্ণবগণ নবদ্বীপে বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে গঙ্গাদাসপণ্ডিত নামে একজন ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ তিনি এক সময়ে যবনের কোপে পড়িয়াছিলেন। যবন প্রতিনিধি কাজী এই আদেশ দিয়াছিলেন যে রাত্রি প্রভাতে সপরিবারে তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে ও তাঁহার বাটীঘর কাটিয়া গঙ্গাজলে ফেলাইয়া দিতে হইবে। গঙ্গাদাস কোন বিশ্বস্তসূত্রে এই বিপদপূর্ণ সংবাদ জানিতে পারিয়া সেই গভীর রজনীযোগে সপরিবারে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং কোন মতে গঙ্গাতীরে আসিয়া পারে যাইবার সুবিধা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য ক্রমে তত রাত্রে খেয়াঘাটে নৌকা পাওয়া গেল না; এবং চারিদিক অন্বেষণ করিয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এদিকে রাত্রি প্রভাত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া গঙ্গাদাস অতিশয় কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার

সাক্ষাতে যবন তাঁহার পরিবারবর্গকে স্পর্শ করিবে এই ভাবনায় আকুল হইয়া অবশেষে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিবেন স্থির করিলেন। এই সময়ে তাঁহার নয়নগোচর হইল যে এক জন নাবিক একখানি ক্ষুদ্র তরণী লইয়া মধ্য গঙ্গা দিয়া বাহিয়া চলিয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে তিনি তাহাকে আহ্বান করতঃ একটী টাকা ও এক জোড়া বস্ত্র দিতে অঙ্গীকার করায় তাঁহার নৌকারোহণে গঙ্গা পার হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা বলেন যে স্বয়ং ভগবান্ খেয়ারীর রূপ ধারণ করিয়া গঙ্গাদাসের পরিত্রাতা হইয়াছিলেন। কাজীদিগের এরূপ দৌরাত্ম্যের কথা তৎকালে বিরল ছিল না। যখন চৈতন্যের আদেশে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মৃদঙ্গকরতালের ধ্বনির সহিত হরিনাম সংকীর্ত্তনের ধুম পড়িয়া গেল, তখন যবন ও অন্যান্য নাগরিক লোক কাজীর নিকট ঐ কথা জানাইলে কাজী স্বয়ং গৃহে গৃহে যাইয়া খোল করতাল ভাঙ্গিয়া দিলেন ও নাম সংকীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়া দিয়া সর্ব্ব সাধারণকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

"শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন ;
কাজী পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন।
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল ;
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল :—
এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানি ;
এবে উদ্যম চালাও সবে কার বল জানি ?
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে ;
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে।" চৈঃ চঃ।

এই সম্বাদ চৈতন্যের কর্ণ গোচর হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত নগর প্রতিধ্বনিত করিয়া এক মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র লোক মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, কাঁশর ইত্যাদি লইয়া তাঁহার দলে যোগ দিল ; এবং সহস্র সহস্র মশালের আলোকে নগর দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। চৈতন্যের প্রকাশ্য সংকীর্ত্তনের এই আরম্ভ। সে রাত্রির সংকীর্ত্তনের প্রতাপে কাজী লুক্কায়িত হইতে বাধ্য হইয়া পলায়ন পর হইলেন। তৎপরে যখন তিনি চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও ঈশ্বর প্রেমের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি রূপে তাঁহাকে অনুভব করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার বিদ্বেষ ভাব কোথায় চলিয়া গেল ? তদবধি তিনি

একজন বিশ্বাসী ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন ; এবং নানা প্রকারে চৈতন্য-দেবের সংকীর্ত্তন বিলাসের সুবিধা করিয়া দিলেন।

বঙ্গে মুসলমানাধিকারের কিছু কম তিনশত বৎসর পরে চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হয়েন। এই দীর্ঘকাল জেতা ও জিতগণ এক দেশে বাস ও এক ভাষায় কথোপকথন করা ও পরস্পর সংযুক্ত থাকা হেতু পরস্পরের মধ্যে এক প্রকার সৌহৃদ্য ভাব জন্মিয়াছিল। উভয় জাতীয় লোকের মধ্যে সম্পর্ক পাতাইয়া পরস্পরকে সম্বোধন করা হইত, ইহাতেই সে ভাব সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। নবদ্বীপের চাঁদ কাজী চৈতন্যকে ভাগিনেয় বলিয়া সম্বোধন করিতে কিছুমাত্র অপমান বোধ করেন নাই।

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা ;
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাচা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা ;
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয় ;
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়।" চৈতন্য চরিতামৃত।

নদীয়া জেলার জজ কি মেজেষ্টর সাহেবের পক্ষে নবদ্বীপ নগরবাসী সামান্য একজন ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত এইরূপে কথোপকথন করা সামান্য মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে। এক্ষণে কি আমাদের রাজপুরুষগণ আমাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন? অসভ্য মুসলমানগণের অধিকার সময়ে নানা প্রকারে প্রজাগণের উপর অত্যাচার হইত সত্য ; কিন্তু তথাচ বাঙ্গালী মুসলমানের নিকট যে সকল অধিকার পাইয়াছিল, সুসভ্য ইংরাজ গণের নিকট তাহা পাওয়া যাইবে কি না জানি না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সামাজিক অবস্থা।

চৈতন্যের সময়ের সামাজিক রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার বর্ত্তমান সময়ের আচার আচরণ হইতে যে অনেক পরিমাণে ভিন্ন ছিল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন প্রথমতঃ পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর জাতীয়ভাব ও রুচি যে এক্ষণে

ভয়ানক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি সে সময়ের যদি কোন অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ পুনর্জীবিত হইয়া মর্ত্ত্য লোকে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন, তবে তাঁহার অধস্তনবংশীয়কে দেখিলে তাঁহার বংশসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। কোথায় এক্ষণকার সার্ট, কোট, মোজা, পেন্টুলেন, বিলাতি জুতা চশমাধারী ছোট বড় কর্ত্তিতকেশ ইয়ং বেঙ্গল, আর কোথায় তখনকার থবকাটা শূন্যপদ, শূন্যগাত্র, জানূর্দ্ধ পরিধেয়ী বঙ্গীয় যুবা! কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদাদি যে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সহর বাজারে এক্ষণে মেয়েদের জুতা, মোজা ও বডী পরিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে এক্ষণেও সেকালকার ভাব অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তবে গহনা সম্বন্ধে এক্ষণে সেকালের ন্যায় রুচি নাই। যাহা হউক এক বিষয়ে কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মহিলার পরিচ্ছদ এক্ষণ হইতে অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না যে তখনকার সম্ভ্রান্তভদ্রমহিলাগণ কেবল সাটীকে ভদ্রোচিত পোষাক মনে করিতেন না; সাটীর উপরে তাঁহারা ওড়নার ন্যায় বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ঐ বস্ত্রকে তখন ভুনি দোগজা বলিত। চৈতন্যের জন্ম হইলে অদ্বৈতের স্ত্রী সীতাদেবী কি রূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শিশুকে দেখিতে যাইতেছেন দেখুন।

"অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগত বন্দিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পেয়ে, চলে উপহার লয়ে,
দেখিতে বালক শিরোমণি!
সুবর্ণের কড়ি বউলি, রজতের পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কন;
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক,
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হার গণ।
ব্যাঘ্র নখ হেম জড়ি, কটি পট্টে সূত্র ডোরি,
হস্ত পদের যত আভরণ;
চিত্র বর্ণের পট্টসাড়ী, ভুনি দোগজা পট্টপাড়ি,
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু ধন।

দুর্ব্বা ধান্য গোরচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্র ভরিয়া;
বস্ত্র গুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লয়ে দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কারে পেটবা ভরিয়া।
ভক্ষ্য যোগ্য উপহার, সঙ্গে লইল বহু ভার,
শচী গৃহে হইল উপনীত।" চৈঃ চঃ।

আহারাদি ও খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে যে সেকালে ও একালে বিশেষ কিছু ব্যত্যয় হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তখন ও ডাল, ভাত, তরকারী, শাক সবজী, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, মৎস্য প্রধান খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল; এক্ষণেও তাহাই আছে। তবে এখন যে কালিয়া পোলাও খাওয়ার রীতি কোন কোন শিক্ষিত দলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না। এতদ্ভিন্ন শাক্ত ও বামাচারীগণ ছাগমাংস আহার করিতেন। দধি ও ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধের সহিত চিপীটক ও রম্ভা চিনি সংযোগে ফলাহারের ঘটাটাও বিলক্ষণ ছিল। পাণিহাটীতে নিত্যানন্দ যে চিড়া মহোৎসব দেন, তাহাতে এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণকার মত নানা প্রকার মিষ্টান্ন ও পিষ্টকাদিও তখন প্রস্তুত হইত; কিন্তু সর্ব্বত্রই রন্ধনের ভার স্ত্রীলোকগণের উপর অর্পিত থাকিত। আচার্য্য পত্নী সীতাদেবী চৈতন্যের নিকট কিরূপ দক্ষতার সহিত পাক বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন, একবার দেখা যাউক।

"মধ্যে পীত ঘৃত সিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ;
চারি দিকে ব্যঞ্জন দোনা আর মুদ্গ সূপ।
বাস্তুক শাক পাক করি বিবিধ প্রকার;
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মান কচু আর।
চৈ মরিচ সুক্তা দিয়া আর মূল ফলে;
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্তঝালে।
কোমল নিম্ব পত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী;
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।
নারিকেল শস্য ছানা শর্করা মধুর;
মোচাঘণ্ট, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর।

মধুরাম্ল বড়অম্ল অম্ল পাঁচ ছয় ;
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়।
মুদ্গ বড়া মাস বড়া কলা বড়া মিষ্ট ;
ক্ষীর পুলি, নারিকেল পুলি, যত পিটা ইষ্ট।
সঘৃত পায়স মৃৎ কুণ্ডিকা ভরিয়া;
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখেত ধরিয়া।
দুগ্ধ চিড়াউ, দুগ্ধ লকলকী কুণ্ডি ভরি ;
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি।" চৈঃ চ

লুচি কচুরির প্রথা বোধ হয় বড একটা চলিত ছিল না। কারণ ঐরূপ খাদ্যের বর্ণনা কি চৈতন্য চরিতামৃত, কি চৈতন্য ভাগবত, কি অন্য কোন গ্রন্থে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রচলিত ধর্ম্মের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ ভদ্র সকল লোকই ভূত, প্রেত উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত; এবং সাপের মন্ত্র, ডাইনের মন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রের বলবীর্য্য দৃঢ়রূপে মানিত।

"কেহ রক্ষা বাঁধে, কেহ পড়ে স্তুতিবাণী।
কেহ বিষ্ণু পাদোদক অঙ্গে দেয় আনি।" চৈতন্য ভাগবত।
"ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল নিমাই।" চৈতন্য চরিতামৃত।

আমোদ প্রমোদের মধ্যে মঙ্গল চণ্ডী, হরির গীতাদি শ্রবণ, ঢোল ঢক্কাদির বাদ্য শ্রবণ, কুস্তি মালামো করা প্রধান ছিল। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের প্রথা এক্ষণেও যেরূপ, তখনও সেইরূপ ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্নপ্রাশন, উপবীত ধারণ ও বিবাহের যে বর্ণনা আছে, তাহা এক্ষণকার ব্রাহ্মণ বালকের তত্তদনুষ্ঠানের সহিত কোন অংশে বিভিন্ন বোধ হয় না। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের কোন প্রমাণ উদ্ধার করা গেল না।

শিক্ষা সম্বন্ধে তখনকার তুলনায় এক্ষণে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। তখন সাধারণ লোকের কোন শিক্ষা হইত না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্র ব্যবসা করিতেন, তাঁহারা ভিন্ন অপরে ভালরূপ সংস্কৃত শিখিতেন না। সাধারণ ভদ্রলোক আপন আপন বালকদিগকে প্রথমে পাঠশালায় ও পরে মৌলবীর নিকট পার্শী শিক্ষা দিতেন। তখন বাঙ্গলা ভাষায় কোন পুস্তকাদি ছিল না। ঐরূপ পুস্তকাদি রচনা করা

চৈতন্যের সময়েই প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। সুতরাং তখনকার লোক কেহই মাতৃভাষায় সুশিক্ষিত হইতে পারিতেন না। চলিত কথা বার্ত্তা ও পত্রাদি লেখা বাঙ্গলাতে হইত বটে, কিন্তু তাহাকে শিক্ষা বলা যায় না। এক্ষণকার মত তখনও বিদ্যারম্ভের দিন হাতে খড়ি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল; এবং ফলা বনানাদি বঙ্গ ভাষায় মূল শিক্ষাও দেওয়া হইত।

"শুভ দিনে শুভক্ষণে মিশ্র সুন্দর;
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর।
দিন দুই তিনে শিখিলেন বার ফলা;
নিরন্তর লেখেন কৃষ্ণের নাম মালা।" চৈতন্য চরিতামৃত।

যাঁহারা শাস্ত্র ব্যবসায়ী হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ ধর্ম্ম শাস্ত্র, কেহ দর্শন শাস্ত্র, কেহ বেদ বেদান্তাদি আপন আপন রুচি ও সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষা করিতেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রথা তখন আদৌ চলিত ছিল না। চৈতন্যের সময়েই যে স্ত্রী শিক্ষার দ্বার প্রথম উদ্ঘাটিত হয়, তাহা একরূপ বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণেরা শূদ্র ও স্ত্রীদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন চৈতন্যদেব ঐ প্রথার বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করিয়া আচণ্ডাল সকলেই হরিনামের অধিকারী, এই উদার মত প্রচার করিলেন, সেই দিন হইতেই বঙ্গীয় মহিলা ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে অধিকার লাভ করিলেন। এবং শিখি মাইতির ভগিনী ও করমাবাই প্রভৃতি অনেক অনেক ভদ্র মহিলা উত্তর কালে বিদ্যাবতী রমণী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের আমলদারীর কাল হইতে এদেশে অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। চৈতন্য দেবের সময়েও বঙ্গীয় মহিলাগণ অবরোধে অবরুদ্ধা ছিল। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে অদ্বৈত পত্নী "বস্ত্র-গুপ্ত-দোলা" আরোহণে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তখনকার কুলকামিনীগণ কিরূপে কালযাপন করিতেন ও তাঁহাদের পতিভক্তি ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি কিরূপ ছিল তাহা পশ্চাদুদ্ধৃত আদর্শ চিত্র পাঠে বুঝা যাইতে পারিবে:—

"একেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী করেন রন্ধন;
তথাপিও পরম আনন্দ যুক্ত মন।
উষাকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম্ম;
আপনে করেন সব এই তাঁর ধর্ম্ম।

দেবগৃহে করেন যত স্বস্তিকমণ্ডলী ;
শঙ্খচক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল ;
ঈশ্বর পূজার সজ্জা করেন সকল।
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন ;
ততোধিক শচীর সেবনে তাঁর মন।
কোন দিন লই লক্ষ্মী পতির চরণ ;
বসিয়া থাকেন পাদমূলে অনুক্ষণ।" চৈতন্য ভাগবত।

স্বভাব চরিত্রের বিষয় দেখিতে গেলে বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ হইতে আমরা এই নির্ব্বাচন করিতে পারি যে, তখনকার লোক অধিক সরল প্রকৃতি, সত্যপ্রিয় ও ধর্ম্মভীরু ছিল। এক্ষণে যেমন কপটতা, কলহপ্রিয়তা ও বঞ্চনার ভাব বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন ততদূর ছিল না। প্রায় সকল লোকই আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিত এবং শান্তভাবাবলম্বনে, কাল যাপন করিতে ভালবাসিত। বিলাস পরায়ণতা তখন বঙ্গসমাজকে এখনকার ন্যায় কলুষিত করে নাই। যাঁহারা ধনী ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা যে একবারেই বিলাসী ছিলেন না এরূপ নহে; তবে তখনকার বিলাসে আর এখনকার বিলাসে প্রকৃতিগত অনেক বিভিন্নতা আছে। আর এক্ষণে যেমন সমাজ শুদ্ধ সকলেই বিলাসী, তখন সেরূপ ছিল না। তখনকার বিলাসিতার চিত্র দেখিলেই, পাঠক ইহার মীমাংসা আপনা আপনি করিতে পারিবেন।

'দিব্য খট্টা হিঙ্গুলে পিতলে শোভা করে ;
দিব্য তিন চন্দ্রাতপ তাহার উপরে।
তঁহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মবাসে ;
পট্টনেতে বালিস শোভয়ে চারিপাশে।
বড় ঝাড়ি ছোটঝাড়ি গুটি পাঁচ সাতে ;
দিব্য পিতলের বাটা ; পাকা পান তাতে।
দিব্য আলবাটী দুই শোভে দুই পাশে।
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই জনে ;
বাতাস করিতে আছে দেখে সর্ব্বক্ষণে।
কি কহিব সেবা কেশভাবের সংস্কার ;
দিব্য গন্ধ আমলকি বহি নাই আর।

সমুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবানা ;
বিষয়ীর প্রায় যেন সকল শোভনা।" চৈতন্য ভাগবত।

ইহা অতি উচ্চবংশীয় ধনীর আসবাব। সুতরাং সাধারণ লোকের লওয় জিমা কিরূপ ছিল, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

হিন্দু জাতি স্বভাবতঃই অতিথি প্রিয়। এখন হইতে সেকালের লো অধিক পরিমাণে আতিথ্য করিত। চৈতন্যের সময়ে অতিথি সৎকা গৃহস্থের পক্ষে অবশ্য করণীয় ছিল ; না করিলে মহা প্রত্যবায় হইত। বৈষ্ণ দিগের মধ্যেও এই ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখা যায় ; তখনকা অতিথি সেবার এই মূল মন্ত্র ছিল :—

"অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি ;
তাহা করিলেই বলি অতিথিরে ভক্তি।" চৈতন্য ভাগবত

পক্ষান্তরে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল জুয়াচুরি, ব্যভিচার সমাজ মধ্যে বহু পরিমাণে সংঘটিত হইত, সন্দেহ নাই। তাহা না থাকিলে আর জগাই মাধাই, চাঁপাল গোপালের উপাখ্যান বিবৃত হইবে কেন? তবে তখন এই সকল পাপাচারীর প্রতি সামাজিক দণ্ড প্রয়োগ করা হইত এবং শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্তাদি করিলেই, সে সকল পাপ হইতে মুক্তি দেওয়া হইত। এক্ষণে সমাজবন্ধন ও ধর্ম্মবন্ধন কিছু শিথিল হইয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ ; তাহা ছাড়া সেকাল ও একালে এরূপ পাপ সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে তাহা বোধ হয় না।

যে সকল ভীষণ পাপের স্রোত বঙ্গসমাজের অন্তস্তরে স্তরে এক্ষণেও প্রবাহিত হইতেছে, চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও সেই রূপ হইতেছিল। কেবল চৈতন্য হৃদয়ের প্রবলতর প্রেমভক্তির তরঙ্গে কিছু কালের জন্য ঐ সকল দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা কতক পরিমাণে বিধৌত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু অচির কাল মধ্যেই তাঁহার ধর্ম্ম লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া মলিন ও কলঙ্কিত হইল ; তখন ঐ সকল পাপরাশি পুনরায় এই দুর্ভাগ্য সমাজকে পঙ্গপালের ন্যায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পুনরায় যুগ ধর্ম্মের প্রচণ্ড অগ্নিশিখা ব্যতীত তাহা নির্ম্মূলিত হইবার নহে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যের অবতার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার ও পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে সাধু ভক্ত ভিন্ন ঈশ্বরাবতার বলিয়া কখনই গ্রহণ করেন নাই। এই জন্য চৈতন্যের তিরোভাবের পর হইতে এ পর্য্যন্ত দেশ মধ্যে এই বিষয়টী লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে লোকের মনের কুসংস্কার ও জড়তা দূর হইতেছে; শিক্ষিত সম্প্রদায় চৈতন্যাবতার কেন, অবতারবাদের মূল সূত্রেই আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না; সুতরাং এই আন্দোলনে তাঁহাদের কোনই সহানুভূতি নাই। কিন্তু প্রাচীন সম্প্রদায় ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন; তাঁহারা ইহাতে অতি আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া আসিতেছেন।

চৈতন্যের দেহত্যাগ হইতে এপর্য্যন্ত চারিশত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ই দীর্ঘকাল মধ্যেও এই তর্কাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। এখনও প্রাচীন-গের মধ্যে এই বিবাদ অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই বিবাদের ন এই দাঁড়াইয়াছে যে, এক দিকে বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব স্থাপন রিতে গিয়া গোঁড়ামার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন; অপরদিকে শাক্তগণ াহার অসাধারণ প্রেমভক্তি, ঈশ্বর বিশ্বাস ও বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী স্মৃত হইয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা ও তিরস্কার করিতে ত্রুটি করেন নাই। ক্ষণে শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ দেশ মধ্যে একটী সাধারণ প্রবাদ হইয়া াড়াইয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এতই বিদ্বেষ ভাব প্রজ্জ্বলিত হইয়া-ল যে, উভয়ে উভয়ের ছায়া স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচি মনে করি-ন। শাক্তের ব্যবহৃত পূজা সামগ্রী ব্যবহার করা দূরে থাকুক, বৈষ্ণব-তাহার নাম পর্য্যন্ত করিতে চাহেন না। বিল্বপত্র ও জবার ফুল শাক্তের দুর্ব্বের জিনিষ; সুতরাং বৈষ্ণব তাহাদিগকে বিদ্বেষভাবে তেকাড়ানা ও ওড়ফুল বলিয়া থাকেন। আবার নিম্বকাষ্ঠের দ্বারা গৌরাঙ্গের তিমূর্ত্তি গঠিত হয় বলিয়া, ও বৈষ্ণবগণ মাংসাদি আহার করেন না বলিয়া

শাক্তগণ সে সকল লইয়া কতই বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে দেশমধ্যে এতই রহস্য জনক গল্প প্রচলিত আছে যে, তাহা সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে গেলে, এক সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ইহার উপরে আবার কবিগণ শাক্ত বৈষ্ণবের কাহিনা সকল কাব্যাকারে প্রকাশ করতঃ সাধারণের কৌতুক বর্দ্ধন ও স্ব স্ব মত প্রতিপন্ন করিতে ছাড়িতেন না। ভক্তবর রাম প্রসাদ সেন ও অচ্যুদানন্দ গোস্বামীর বিবাদ ও উত্তর প্রতিউত্তর বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন এবং দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে শাক্ত বৈষ্ণবের লড়াই আপামর সাধারণ সকলেই বিদিত আছেন। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এই বিবাদ এতই প্রচণ্ড হইয়াছিল এবং সমাজে শান্তি স্থাপনের জন্য তাহার মীমাংসা করা এতই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রবাদ আছে এক সময়ে ইহার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে করলিপি করাইতে হইয়াছিল। করলিপি বা হস্তলিপির অভ্রান্ততায় প্রায় তখনকার সকল লোকেরই বিশ্বাস ছিল। সংক্ষেপে তাহার প্রক্রিয়া এই:—কোন গুণী ব্যক্তি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, এবং তাহার নিকটে বসিয়া একটী অশিক্ষিত বালক ভূমিতে হস্ত সঞ্চালন করিবে। ঐ বালকের হস্ত দিয়া যে লেখা বাহির হইবে, তাহাই প্রস্তাবিত বিষয়ের সৎ মীমাংসা মনে করিয়া লইতে হইবে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় কি প্রকারে এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা কিছুই জানি না। তবে ঐ লিপিতে যে উত্তর পাওয়া গিয়াছিল তাহা অতীব কৌতুক জনক। নবদ্বীপের রাজবংশ চিরকালই প্রসিদ্ধ বামাচারী শাক্ত; সুতরাং তাঁহারা গৌরাঙ্গ দেবকে কোন প্রকারেই ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হস্তলিপিতে যে উত্তর পাওয়া গেল, তাহাতে তাঁহাদের মতই দৃঢ়ীভূত হইল। সে উত্তর এই:—

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো নচ পূর্ণো ন চাংশকঃ।"

অর্থাৎ গৌরাঙ্গ ভগবানের ভক্ত, তিনি পূর্ণও নহেন ও অংশাবতারও নহেন। যখন করলিপিতে এই উত্তর উত্থিত হইল, তখন শাক্তগণের আর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। তাঁহারা নানা প্রকারে বৈষ্ণবদিগের নিন্দা করিয়া এই মত সর্ব্বত্র ঘোষিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের বাধা জন্মিতে লাগিল। তদ্দর্শনে শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতবংশোদ্ভব জনৈক শাস্ত্রবিশারদ গোস্বামী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের

সত্বর আসিয়া এই জানাইলেন যে, করলিপিতে যে উত্তর পাওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা চৈতন্যের অংশত্ব ও ভক্তত্ব দূরীভূত হইয়া তাঁহার পূর্ণত্বই স্থাপিত হইতেছে। এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের এই ব্যাখ্যা করিলেন যে, "গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন, অংশকো ন, স এব পূর্ণ ইতি।" এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। এদিকে শাক্তগণেরও মস্তক অবনত হইল, এবং বৈষ্ণবেরা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

এই সকল বিবাদের মধ্যে পড়িয়া চৈতন্যের প্রকৃত মহিমা দেশ হইতে তিরোহিত হইয়া গেল; এবং বাঙ্গালী জাতির প্রধান গৌরব পাত্র অবশেষে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে নীচ ও অন্ত্যজ শ্রেণী লোকের উপাস্য হইয়া থাকিলেন; ভদ্র সমাজে আর তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান থাকিল না। ইহার জন্য তাঁহার শত্রু পক্ষ অপেক্ষা তাঁহার মতাবলম্বীদিগেরই দোষ অধিক। তাঁহারা যদি গোঁড়ামী ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও শান্তভাবে তাঁহার প্রণোদিত মত সকল প্রচারে যত্নবান্ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অভিনেতাকে আজ আর এ তিরস্কার ও নিন্দাভার বহন করিতে হইত না। তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া লোকে গ্রহণ না করুক, একজন অসাধারণ সাধুভক্ত বলিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইতে কোন সম্প্রদায়ই পশ্চাৎ-পদ হইত না।

অবতারবাদের মত সকল হিন্দুজাতির অস্থিমাংসের সহিত জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে; এমন হিন্দু নাই, যিনি পরমেশ্বরের অবতারে বিশ্বাস করেন না। নিরাকার ও নির্গুণ ঈশ্বরকে মানুষ জানিতে পারে না ও তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না; তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য সময়ে সময়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, প্রভৃতি মত হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে নিঃশঙ্ক ভাবে রাজত্ব করিতেছে। আজকাল এই মতের বিরুদ্ধে কখন কখন কথা শুনা যাইতেছে বটে; কিন্তু পূর্ব্বকালে কাহার সাধ্য ইহার বিরুদ্ধে বাক্যব্যয় করে? সুতরাং চৈতন্যাবতার সংস্থাপন জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিতে হয় নাই। অবতারবাদের দুর্গ তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাঁহারা কেবল তাহার মধ্যে চৈতন্যকে প্রবেশ করাইয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন মাত্র। তাঁহাদের মতে অন্য অন্য সকল

অবতারই ঈশ্বরের অংশাবতার, কেবল কৃষ্ণই স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। সেই কৃষ্ণই আবার গৌরাঙ্গ হইয়া প্রকাশ হইয়াছিলেন। সুতরাং গৌরাঙ্গের পূর্ণত্ব স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণেরও পূর্ণত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ইহাতে অনুমান হইতেছে যে, তখন কৃষ্ণের পূর্ণাবতার সম্বন্ধে লোকের মনের সন্দেহ একেবারে দূর হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণ ব্যতীত কোন প্রাচীন শাস্ত্রে কৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া পরিচিত করা হয় নাই। বিষ্ণু পুরাণের তো কথাই নাই; মহাভারতেও তিনি একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও যোগবিদ্যা পরায়ণ আদর্শ চরিত্র বৈ আর কিছুই নহেন। এমন কি, শ্রীমদ্ভাগবতেরও স্থানে স্থানে তাঁহাকে ভগবান্ হরির অংশাবতার বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। যথা :—

"তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ।" ভা। ৪ স্ক।

"ভগবান্ হরির সেই অংশ ভূভার হরণ নিমিত্ত সম্প্রতি এই দুই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইহার মধ্যে একজন যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, অন্য জন কুরুপ্রবীর অর্জ্জুন।"

ইহার উপর আবার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সমগ্র হিন্দুসমাজে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত বলিয়া সর্ব্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত হয় নাই। প্রাচীনকালের কথা থাকুক, সে দিন আমাদের চক্ষুর সমক্ষে মুরশিদাবাদের খ্যাতনামা পণ্ডিত স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থ যে ব্যাস প্রণীত নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বহুবিধ শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গভীরতর বিচার করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রথমে কৃষ্ণের পূর্ণত্ব স্থাপন জন্য চেষ্টা করিয়া, তৎপরে চৈতন্যের পূর্ণাবতারত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। জীব গোস্বামী প্রণীত কৃষ্ণসন্দর্ভগ্রন্থে ও চৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই বিচারের অবতারণা হইয়াছে। যদি কখন অবকাশ হয়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থে বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার আন্দোলনে পড়িয়া অবতারবাদ মতের মূলে যে সত্যটুকু নিহিত রহিয়াছে, তাহাও লোপ পাইতে চলিয়াছে। সেই জন্য আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমে অবতারবাদের মূল সূত্র কি? কোন্

সত্যকে অবলম্বন করিয়া তাহার মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? এবং তাঁহার কোন্ অংশই বা ভ্রম প্রমাদের সহিত জড়ীভূত হইয়া গিয়াছে? তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাহা হইলে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত আপনা হইতে হইয়া উঠিবে। সৃষ্ট বস্তুতে পরমেশ্বরের অবতারত্ব আরোপ করার মত, সকল দেশে ও সকল সময়ে একই উপাদান লইয়া সংগঠিত হইয়াছে। যে সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া খৃষ্টীয়ানগণ ঈশার পূর্ণত্ব স্থাপন করিতে চাহেন, হিন্দুগণের কৃষ্ণাদির অবতারত্বও ঠিক সেই সংস্কারমূলক। সুতরাং তাহার মূলান্বেষণ করিতে পারিলে, চৈতন্যের কেন, সকল অবতারেরই ভাব আপনা হইতেই বুঝা যাইতে পারিবে।

বিশ্বস্রষ্টার প্রকৃত স্বরূপ মানব জ্ঞানের অতীত। তবে বিশ্ব সৃষ্টিতে তিনি যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছেন, মানুষ কেবল তাহাই বুঝিতে পারে। এই সৃষ্টি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; জীব সৃষ্টি ও ভূত সৃষ্টি। জড় জগতেও তিনি যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, জীবগণের জীবনেও তিনি অনুগ লীলা বিস্তার করিতেছেন। বিশ্বাসীব্যক্তি যখন তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, চারি দিক অবলোকন করিতে থাকেন, তখন তিনি কি জড় জগতে, কি মানব জাতির জীবনে, এবং কি নিজ আত্মায়, তাঁহার প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। তখন তাঁহার হৃদয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া, চতুর্দ্দিকেই ভগবানের পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ভক্ত তখন সৃষ্টি রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া সকলই ঈশ্বর দেখিতে থাকেন। তখনই পরমেশ্বর তাঁহার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ রূপে অবতীর্ণ হয়েন। 'অব' পূর্ব্বক 'তৃ' ধাতুর অর্থ অবতরণ করা অর্থাৎ ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে আগমন করা। ঈশ্বর পদার্থ মহোচ্চ ও স্বর্গের জিনিষ, তিনি যখন ভক্তহৃদয়ে অবতরণ করেন বা প্রকাশিত হয়েন, তখনই তাঁহার অবতার হইয়া থাকে। এই ভাবে বিশ্বাসী ভক্তের নিকট চরাচর বিশ্বরাজ্য সমস্তই তাঁহার অবতার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথারই পোষকতা পাওয়া যাইতেছে। নানাবিধ অবতারের কথা বলিয়া ভাগবতকার বলিতেছেন;—

"'অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধে র্দ্বিজাঃ
যথা বিদাশিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ।' ভা। ১স্ক। ৩অ। ২৬শ্লোক।

'হে দ্বিজগণ! সত্ত্ব নিধি হরির অবতার অসংখ্য; যেমন উপক্ষয়শূন্য

জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্ হইতে অসংখ্য অবতার হইয়াছে।'

এই সকল অবতীর্ণ পদার্থের মধ্যে কাহাতেও ঈশ্বরের প্রকাশ অধিক, কাহাতে ও বা তদপেক্ষা ন্যূন লক্ষিত হইয়া থাকে। একটি সামান্য মানব-জীবনে তাঁহার যে প্রকাশ বা লীলা দেখিতে পাওয়া যায়, সাধু জীবনে তদপেক্ষা অনেক অধিক মাত্রায় উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু সকলেতেই যে তাঁহার গুণাংশ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই :—

'যদ্যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্॥' গীতা ১০ অ ৪১

যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, তেজোযুক্ত, শ্রীযুক্ত, গুণাতিশয়, তাহাদিগকে আমার তেজোংশসম্ভূত বলিয়া জান।

'এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ।'

ভা। ১স্ক। ৩অ। ৫শ্লোক।

ভগবানের অবিনাশী বিরাটরূপ, সকল অবতারের বীজস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়স্থান। ইহারই অংশ হইতে দেবজাতি, তীর্য্যক্ জাতি ও নরজাতি, সকলই সৃষ্ট হইয়াছে।

আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের আমূল আলোচনা করিতে পারিলে এ বিষয়ের অতি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। বৈদিক যুগের প্রারম্ভ হইতে উপনিষদ্যুগের শেষ পর্য্যন্ত আমরা আর্য্যদিগের মধ্যে কোন অবতারের কথা শুনিতে পাই না; কারণ এই সময় তত ঈশ্বর সম্ভোগের কাল নহে, যত ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয়ের কাল। তখন আর্য্য ঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব আবিষ্কারে যত্নশীল ছিলেন; সুতরাং তাঁহার গুণ ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্ভোগ করিবার অবসর পাইয়া উঠেন নাই। যখন ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণীত হইল, তখনই আর্য্যহৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইয়া উঠিল; এবং ভক্তিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক যুগের অভ্যুদয় হইল। এই যুগেই আমরা নানাবিধ অবতারের কথা শুনিতে পাই। অবতারবাদ-সমর্থনকারিগণ অবতারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে একটী এই যে, মানব জাতির মধ্যে ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্য পরমেশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আহা যদি

সত্য হইত, তবে আর্য্যজাতির আদিম সময়ে, যখন ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয় নাই, তখনই অনেক অবতারের আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রথম কালে কোন অবতারের কথাই ত শুনা যায় না। সে যাহা হউক যখন ভক্তির প্রবল তরঙ্গ ভারতভূমিতে বহিয়া চলিতে লাগিল, তখনই মৎস্য কূর্ম্মাদি ইতর জন্তুতে, নদীপর্ব্বতাদি জড় জগতে, এবং রামকৃষ্ণাদি মানবে অসংখ্য অবতার সকল আবির্ভূত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তেত্রিশ কোটি সংখ্যা পরিপূর্ণ হইয়া বর্ত্তমানাকারে পরিণত হইয়া গেল। সে দিন মহানগরীর কোন পল্লীতে শীতলা পূজা হইয়াছিল। দ্বিভুজা জগদ্ধাত্রী প্রতিমার ন্যায় শীতলার প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু জগদ্ধাত্রীর বাহন সিংহের পরিবর্ত্তে একটা গর্দ্দভকে তাহার বাহন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শীতলার ধ্যান ও মূর্ত্তি কোন্ শাস্ত্রে আছে জানি না; কিন্তু এটা যে মানব মনের ভয় যুক্ত ভক্তির ভাব হইতে সম্ভূত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যেরূপ সৃষ্ট বস্তুতে ভগবানের প্রকাশ ও বিলাসই তাঁহার অবতার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই রূপ আবার তাঁহার গুণের রূঢ়ভাবও (abstract quality) অবতারের আকার ও আখ্যা প্রাপ্ত হইল। জ্ঞান-পিপাসু ভক্ত, জ্ঞানপথে বিচরণ করিতে করিতে জ্ঞানরত্নাকর মধ্যে যতই নিমগ্ন হইতে লাগিলেন, সৌন্দর্য্য মুগ্ধ প্রেমিক ভক্ত, সৃষ্টি রাজ্যের সৌন্দর্য্য ও শোভা যতই সম্ভোগ করিতে লাগিলেন, ততই তিনি তাঁহাকে স্বরস্বতী ও লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল দেবতাগণের ধ্যান ও মূর্ত্তি, সাধকের মনের প্রত্যক্ষীভূত ভাব বাহিরে কথায় ও প্রতিমায় প্রকাশ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে যে জীবন্ত ভাব অনুভূত হইয়া এই সকল ধ্যান ও মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা কোথায় চলিয়া গিয়াছে? এক্ষণে কেবল তাহার মৃত কঙ্কালমাত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাই-তেছে যে, মনুষ্য বিশ্বাস ও ভক্তি যোগে পরমেশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাব যে যে বস্তুতে, পদার্থে বা মনুষ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কালে সেই সেই বস্তু, পদার্থ ও মনুষ্যকে অবতার বোধে উপাসনা করিয়াছে। যদি তাহা না করিয়া, সেই সেই বস্তুতে ভগবানের যে গুণের বা ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা-কেই পূজা করিত, এবং সেই সেই গুণ বা ভাব যে আধারকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে ঐ গুণ বা ভাব হইতে পৃথক্ রাখিতে

পারিত, তাহা হইলে অবতারবাদ মতের মধ্যে কোনই দোষ বা ভ্রম পরি-লক্ষিত হইত না। শ্রীচৈতন্য বা শ্রীমদীশার মধ্য দিয়া ভগবানের যে যে প্রেমভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, মানুষ যদি চৈতন্য ও ঈশার জীবত্ব হইতে ঐ সকল স্বর্গীয় ভাবকে পৃথক বলিয়া, সেই সেই ভাবকে পূজা করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে আর নরপূজা স্থান পাইত না। কিন্তু মানুষ দুর্ব্বল, সে সাধু জীবনের জীবত্বের সহিত তদন্তঃস্থ ঈশ্বরত্ব এবং জড়ের জড়ত্বের সহিত তদুপহিত ভগবত্তা মিশাইয়া ফেলিয়াই মহাভ্রমে পড়িয়া গিয়াছে। জীবের মধ্যে দেবতা দেখাই অবতারবাদের মূল সত্য ; আবার জীবত্বে দেবত্ব আরোপ করাই তাহার ব্যভিচার। এই সূত্রানুসারে ভগবদ্গুণের আংশিক প্রকাশ বা অংশাবতার সম্ভব ; কিন্তু পূর্ণ বিকাশ বা পূর্ণাবতার একেবারে অসম্ভব। কোন সৃষ্ট বস্তুই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশেচ্ছু ব্যক্তিকে এই বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে, যেন তিনি একদিকে জড়-পূজা ও নরপূজার ভ্রমে পতিত না হয়েন, এবং অপর দিকে ভগবানের গুণাবতার সকলকে অবজ্ঞা করিয়া আত্মাকে কলুষিত না করেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যকে স্বয়ং পরমেশ্বর পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া, বিশ্বাস করিয়া থাকেন, এবং যুক্তি ও শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের দ্বারা ঐ মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরমেশ্বর অচিন্ত্য ক্ষমতাশালী ; সুতরাং ইচ্ছা করিলে মানবরূপে অবতীর্ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে, এই পুরাতন যুক্তিটীই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বনীয়। ইহার অযৌক্তিকতা দেখাইবার আবশ্যকতা নাই। কারণ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে এই যুক্তির মধ্যে কোন সার নাই। সর্ব্বশক্তিমত্তার এইরূপ অর্থ করিতে গেলে যে পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব থাকেনা, তাঁহার স্বরূপ সকল যে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এবং তিনি যে জন্ম মরণাদি মানবধর্ম্মের আয়ত্ত হইয়া প্রকৃত মানব রূপে পরিণত হইয়া যান, ইহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। পরন্তু যদি তাঁহার ইচ্ছাতে তাঁহার স্বরূপ সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্র হইতে পারিত, তবে তাঁহার ইচ্ছা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লোপ হইতে পারিত। একি ভয়ানক মীমাংসা! অবতারত্ব রাখিতে গিয়া শেষে নাস্তিকতার সিদ্ধান্তে উপস্থিত। ইহাকেই বলে দেব গড়াইতে বানর গড়া। যাহা হউক শাস্ত্রকারদিগের চক্ষে এ যুক্তির অযৌ-

ক্তিকতা লুক্কায়িত ছিল না। নতুবা অষ্টাদশ পুরাণ প্রণেতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কেন এই কথা বলিয়া নিজ দোষ ক্ষালন করিয়া অনুতাপ প্রকাশ করিবেন?

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতম্
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ মদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্।"

হে জগদীশ! তুমি রূপহীন, অনির্ব্বচনীয় ও সর্ব্বব্যাপী; আমি বিকল চিত্ত হইয়া ধ্যানাদির দ্বারা তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, স্তুতি আদি করিয়া তোমার অনির্ব্বচনীয়তা নিরাকৃত করিয়াছি, এবং তীর্থাদিতে তোমার ব্যাপিত্ব বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছি, ইহাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তুমি তাহা ক্ষমা কর।

শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব স্থাপনের জন্য যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এ প্রস্তাবের আলোচ্য নহে। চৈতন্য সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিব। এই সকল প্রমাণের মধ্যে আবার কতকগুলি বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে; তৎসম্বন্ধেও আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাদিগেরই নির্দ্দেশ তত উপযুক্ত প্রমাণ হইতে পারে না। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। সমস্ত মহাভারতের মধ্যে চৈতন্যাবতার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই। শান্তিপর্ব্বের অনুশাসনপর্ব্বাধ্যায়ের একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া রূপগোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, উহা গৌরাঙ্গ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্লোকটি এই—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ।"

বিষ্ণুর সহস্র নাম প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, অন্যান্য নামের মধ্যে তাঁহার এই সকল নামও নির্দ্দিষ্ট আছে;—যথা, তাঁহার সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ ও সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; তিনি চন্দন তিলকধারী, সন্ন্যাসকারী ও নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণ।

মহাভারত গ্রন্থে দেখা যায় যে, ঐ শ্লোকটি কোন একটি শ্লোকের

উদ্ধৃতাংশ নহে। অনুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ের ১৪৯ অধ্যায়ের দান ধর্ম্মের ৯২ শ্লোকের প্রথমপাদ ও ৭৫ শ্লোকের দ্বিতীয়পাদ লইয়া উহা সংগঠিত হইয়াছে। ঐ শ্লোক দুইটী এই :—

"সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
বীরহা বিষমঃ শূন্যো ধৃতাশীব চলশ্চলঃ।"

তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, তিনি হেমাঙ্গ, চন্দনের অঙ্গদ ধারী, অসুরনাশকারী, তাঁহার সমান কেহই নাই, তিনি শূন্য অর্থাৎ নিরাকার এবং অগ্নির ন্যায় চঞ্চল। ৯২।

"ত্রিসামা সামগঃ সাম নির্ব্বাণং ভেষজং ভিষক্
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ।"

তিনি ত্রিবেদী, সামবেদ গায়ক, সামস্বরূপ, নির্ব্বাণস্বরূপ, ঔষধস্বরূপ, এবং ভিষক্; এবং সন্ন্যাসকারী, শমগুণ বিশিষ্ট, শান্ত এবং নিষ্ঠাপরায়ণ। ৭৫।

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন যে মহাভারত প্রণেতা চৈতন্যাবতার লক্ষ্য করিয়া, এই সকল নামাবলী বলিয়াছিলেন কিনা? এবং বিভিন্ন শ্লোকের বিভিন্ন স্থান লইয়া ঐরূপ শ্লোক সংগঠন পূর্ব্বক তাহা উদ্ধার করিলে চৈতন্যাবতার সংস্থাপিত হয় কিনা?

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে দুইটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া চৈতন্যাবতার সংস্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্লোক দুইটী এই :—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।"
"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তিহি সুমেধসঃ।"

ইহার প্রথমটী ভাগবতের দশমস্কন্ধের অষ্টমাধ্যায়ের নবম শ্লোক। নন্দভবনে গর্গাচার্য্য যাইয়া কৃষ্ণের নামকরণোপলক্ষে নন্দকে বলিতেছেন যে, "হে নন্দ, তোমার এই পুত্রটী প্রতি যুগেই শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন; ইহার শুক্ল রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন বলিয়া ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ হইবে।" বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, অতীতকালের প্রয়োগ, "আসন্" ক্রিয়ার ভবিষ্যতের ন্যায় অর্থ হইবে, এই অর্থ ধরিয়া শ্লোকের পীতবর্ণ শব্দ গৌরাঙ্গাবতারে প্রযুক্ত হইবে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া

থাকেন। বলা বাহুল্য যে, ইহা মহামান্য শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যার বিপরীত ও কষ্টার্থ কল্পনা মাত্র।

দ্বিতীয়টি একাদশ স্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়ের ২৯ শ্লোক। কলিযুগের ধর্ম্ম বর্ণনায় চমস ঋষি মহারাজ নিমিকে বলিতেছেন। শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যানুযায়ী ইহার অনুবাদ এই:—

"ইনি কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণি জ্যোতি বিশিষ্ট এবং সাঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ (অর্থাৎ কৌস্তুভ, সুদর্শন, সুনন্দাদি) সহিত অবতীর্ণ হয়েন। তখন বিবেকী মনুষ্যগণ সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন।" স্বামী স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা কলিযুগে কৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য দর্শিত হইয়াছে। অধিকন্তু যে সকল নামোল্লেখ করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে হইবে তাহা ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাহাতেও চৈতন্যাবতারের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। অথচ বৈষ্ণবাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এই শ্লোকের সংকীর্ত্তন ও সাঙ্গোপাঙ্গাদি শব্দ দেখিয়া এবং "কৃষ্ণবর্ণ" ও "ত্বিষা কৃষ্ণ" পদের বিকৃতার্থ করিয়া চৈতন্যোদ্দেশে ঐ শ্লোক প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "কৃষ্ণ বর্ণ" অর্থাৎ কাল রং যার কিন্তু "ত্বিষা কৃষ্ণ" অর্থাৎ কান্তি ইন্দ্রনীল মণির ন্যায়। বৈষ্ণবগণ বলেন যে 'কৃ' ও 'ষ্ণ' এই দুইবর্ণ যাহার মুখে উচ্চারিত হয় এবং যাহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীত। কোন্ পক্ষের অর্থ সরল ও স্বাভাবিক তাহা পাঠকেরাই বিচার করিবেন।

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে এই কবিতাটী দেখিতে পাওয়া যায়।

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্।"

সত্য যুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদি করিয়া এবং দ্বাপরযুগে পূজা অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করে, কলিযুগে কেবল মাত্র কেশবকে সংকীর্ত্তন করিলে সেই ফল পাইতে পারে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে এই শ্লোক উদ্ধার করিয়া কেহ যদি স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অবতারত্ব সংস্থাপন পক্ষে প্রয়োগ করেন, তাহা যেমন হাস্যাস্পদ হয়, বৈষ্ণবদিগের উদ্ধৃত উপরি উক্ত প্রমাণ গুলিও কি সেইরূপ হইতেছে না?

প্রকৃত কথা এই যে, যদি ভাগবতকার চৈতন্যাবতার লক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলিতেন, তাহা হইলে এরূপ অস্পষ্ট ও পরোক্ষ ভাবে কোন কথার নির্দ্দেশ থাকিত না। কলিযুগের শাক্যসিংহ কোন্ স্থানে কাহার গর্ভে জন্মিবেন, এপর্য্যন্ত যিনি লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেন, তখন চৈতন্য সম্বন্ধে কি তিনি কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না? ইহা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত হইতে পারে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপ নিবাসী পরলোকস্থ ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় কোন কোন উপপুরাণ ও উদ্ধ্যাম্নতন্ত্র নামক অপরিচিত তন্ত্রের নামকরণে আরও কতকগুলি প্রমাণ উদ্ধার করিয়া চৈতন্যের পূর্ণত্ব স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যদি কোন বচন প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল তন্ত্রে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে প্রথমকালীন মহামহোপাধ্যায় অশেষশাস্ত্রদর্শী গোস্বামীপাদ মহোদয় তাহা উদ্ধৃত করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাঁহারা যে ঐ সকল তন্ত্র ও পুরাণ পাঠ করেন নাই, তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তাঁহাদের যেরূপ শাস্ত্রানুসন্ধিৎসা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের নিকট যে ঐ সকল শাস্ত্র অবিদিত থাকিবে, তাহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। সুতরাং বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উদ্ধৃত বচন গুলি যে নিতান্ত আধুনিক, ও স্বকপোলকল্পিত তাহা বুঝা যাইতেছে।

বৈষ্ণব দিগের গ্রন্থে চৈতন্য অবতার সম্বন্ধে যে সকল আভ্যন্তরীণ প্রমাণ নিহিত রহিয়াছে, এক্ষণে পাঠকদিগের নিকটে তাহাই উপস্থিত করিতেছি। চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের নানা স্থানে তাঁহাকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে সত্য এবং তিনিও কোন কোন সময়ে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার দশাবতারগণের সহিত অভিন্নাত্মক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও সত্য; কিন্তু তাহা কি ভাবে, কোন্ অবস্থায় এবং কি প্রকারে কথিত হইয়াছে? তাহা সম্যক্ আলোচনা করিতে না পারিলে, এ বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। কেননা, যেমন কোন কোন সময়ে তিনি আপনাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া ছিলেন, তেমনি অন্যান্য বহু স্থলে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, একজন পাপী ও সামান্যব্যক্তি বলিয়া প্রকাশ করিতেন; এবং যদি কেহ তাঁহাকে পরমেশ্বর বোধে স্তুতি করিত, তবে তাহাদিগের উপর

ঈর্ষান্বিত হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। উত্তরকালে যে সকল মহাত্মাগণ তাঁহার মতাবলম্বী ও প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া ছিলেন এবং তাঁহাকে স্বয়ং পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া ছিলেন, প্রথমকালে তাঁহারাই বা তাঁহাকে কি ভাবে দেখিতেন, কি কি সূত্র ধরিয়া তাঁহার অবতারবাদে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবদ্দশায় এই মত কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, তাহাই আমরা এক্ষণে আলোচনা করিব।

বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ প্রেমভক্তিশূন্য হইয়া কতকগুলি উপধর্ম্ম ও বাহ্যানুষ্ঠান লইয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্দর্শনে অদ্বৈত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, অচিরকাল মধ্যে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের বিনাশ ও সদ্ধর্ম্মের পুনস্থাপন করিবেন। শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় লিখিত আছে যে, যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, ভগবান সেই সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সত্যধর্ম্ম উদ্ধার করিয়া থাকেন। বোধ হয়, এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের মনে ঐরূপ ভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল। সে যাহা হউক, চৈতন্যাবতার সংস্থাপন পক্ষে উত্তর কালে এই ভাবই মূল কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে শ্রীচৈতন্য দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে পিতৃকৃত্য করিবার নিমিত্ত গয়া ধামে গমন করিয়া ছিলেন। সেই স্থানে ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পুরীর অলৌকিক ভক্তিভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া চৈতন্যদেব তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন; তদবধি তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হইল। ক্রমে ক্রমে প্রেম, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের লক্ষণ সকল দেখা দিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে তিনি যে কখন ধর্ম্ম বিষয়ে বড় একটা চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবন চরিত পাঠে জানা যায় না। বরং অশেষ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া সর্ব্বদাই বহুল ছাত্র সমভিব্যাহারে অধ্যয়ন, অধ্যাপনায় নিমগ্ন থাকিতেন এবং বিদ্যার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া নানা প্রকারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেন লোকে তাঁহার অহঙ্কারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নিমাই "ঢ্যাঙ্গাতি" বলিয়া ডাকিত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, উত্তরকালে যাঁহারা তাঁহার প্রধান অনুচর হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তখন ইহা কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, ভবিষ্যতে ইনি একজন পরম ভাগবত হইয়া উঠিবেন। অবতার-

বাদের ত কথাই নাই। তাঁহার বাল্য জীবনের যে সকল অলৌকিক ঘটনা চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহা উত্তর কালীন তাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্মজীবনের আদর্শে লিখিত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়।

এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় কথিত হইয়াছে যে, চৈতন্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নবদ্বীপে একটী ক্ষুদ্র বৈষ্ণবগোষ্ঠি ছিল। শ্রীবাস, অদ্বৈত, মুরারী, মুকুন্দ প্রভৃতি সকলে এই গোষ্ঠীভুক্তছিলেন। গয়াগমনের পূর্ব্বে গর্ব্বিত নিমাইপণ্ডিত কত প্রকারে তাঁহাদের ধর্ম্মের নিন্দা করিতেন, ও তাঁহাদের ভাবুকতা লইয়া উপহাস করিতেন, এবং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহাদিগকে শাস্ত্রের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া নিরুত্তর করিতেন। ইহাতে সকলে তাঁহার উপর এত বিরক্ত হইত যে, পথে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেন। চৈতন্য-ভাগবতে এ সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন,
মিথ্যা বাক্য ব্যয়ভয়ে সবে পলায়েন।
যদি কেহ দেখে তাঁরে আইসেন দূরে,
সবে পলাবেন ফাঁকি জিজ্ঞাসার ডরে।"

স্থানান্তরে নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণবদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিতেছেন :—

"এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র,
পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানি যে মাত্র।
আমা সম্ভাষণে নাহি কৃষ্ণের কথন,
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন।" চৈতন্য ভাগবত।

একদিন ভাগীরথী তীরে শিষ্যবৃন্দের মধ্যে বসিয়া নিমাইপণ্ডিত শাস্ত্রের বিচারে মগ্ন। দূর হইতে শ্রীবাস, মুরারি ও মুকুন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছেন ;—

"কেহ বলে হেন রূপ, হেন বিদ্যা যার,
না ভজিলে কৃষ্ণ, কিছু নহে উপকার'।
মনুষ্যে এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই,
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই।

"দণ্ডবৎ হই সবে পড়িলা গঙ্গারে,
সব ভাগবত মিলি আশীর্ব্বাদ করে।
হেন কর কৃষ্ণ জগন্নাথের নন্দন,
তব রসে মত্ত হই ছেড়ে অন্য ধন।" চৈতন্য ভাগবত।

পুনশ্চ—"কেহ কেহ সাক্ষাতেই প্রভু দেখি বলে,
কি কার্য্যে গোঁঙাও কাল তুমি বিদ্যাভোলে?
কেহ বলে হের শোন নিমাই পণ্ডিত,
বিদ্যায় কি কাজ? কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত।" চৈতন্য ভাগবত।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, তখন অবতারের কথা দূরে থাকুক, তাঁহারই ভাবি শিষ্যগণ তাঁহাকে একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়াও জানিতেন না; বরং যাহাতে তাঁহার ধর্ম্মে মতি হয়, সে জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন। ইহার পরে গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ আপন মনের পরিবর্ত্তিত ভাব দুই চারিটী বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে ঐ সব বন্ধুগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিতেছেন;—

"মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার!
এমন ইহানে কভু না দেখি যে আর।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ না দেখি ইহানে,
কি বিভাব পথে বা হইল দরশনে?" চৈতন্য ভাগবত।

পরদিন প্রত্যূষে বৈষ্ণবগণ সাজি হাতে লইয়া শ্রীবাস প্রাঙ্গনে কুন্দ পুষ্প তুলিতেছেন। এমন সময়ে শ্রীবাসের সহোদর শ্রীমান পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাঁহাদের নিকট গৌরাঙ্গের ভাব পরিবর্ত্তনের বিষয় বিজ্ঞাপন করিতেছেন।

"পরম অদ্ভুত কথা বড় অসম্ভব,
নিমাই পণ্ডিত হইল পরম বৈষ্ণব।
পরম বিরক্ত রূপ নাহিক সম্ভাষ,
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ।
শেষে কৃষ্ণ বলিয়া যে কাঁদিতে লাগিলা,
হেন বুঝি গঙ্গাদেবী আসিয়া মিলিলা।
যে ভক্তি দেখিনু আমি তাঁহার নয়নে,
তাঁহারে মনুষ্য বুদ্ধি নহে আর মনে।

"শ্রীমান বচন শুনি সর্ব্ব ভক্ত গণ,
হরি বলি মহাধ্বনি করিলা তখন।
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার,
গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা সবাকার।" চৈতন্য ভাগবত।

ইহার পর দিন দিন চৈতন্যদেহে প্রেম ভক্তি প্রকাশ হইতে লাগিল, তিনি ধর্ম্ম জীবন লাভের জন্য মহা ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং অশেষ প্রকারে সাধু সঙ্গ ও সাধু সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীবাস আদি ভক্তগণকে দেখিলেই প্রণাম করিতেন ও নানা প্রকারে তাঁহাদের সেবা করিতেন। তাঁহারাও কৃষ্ণলাভ হউক বলিয়া প্রাণ মনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। তখন পর্য্যন্তও কিন্তু অবতারের কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

"শ্রীবাস আদি দেখিলে প্রভু নমস্কারে,
প্রীত হয়ে ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে।
তোমার হউক ভক্তি শ্রীহরি চরণে,
মুখে হরি বল, হরি শুনহ শ্রবণে।
আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ,
সবারে চাহে প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ।
তোমরা সে পার কৃষ্ণ ভজন দিবারে,
দাসে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।
তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণ ভক্তি পাই,
এত বলি কারু পায় ধরে সেই ঠাঁই।
নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে,
ধুতি বস্ত্র তুলি কারো দেন ত আপনে।
কুশা গঙ্গা মৃত্তিকা দেন কারো করে।
সাজি বহি কোন দিন চলে কারো ঘরে।" চৈতন্য ভাগবত।

এইরূপে চৈতন্য দেব যতই ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে লাগিলেন, দিন দিন তাঁহার অলৌকিক ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মহাভাবের লক্ষণ সকল তাঁহাতে প্রকাশ পাইল। মহাভাবে মগ্ন হইয়া কখন নাচিতেন, কখন কাঁদিতেন, হাসিতেন এবং কত সময়ে নীরবে বসিয়া থাকিতেন। আবার কখন ভাবে উন্মত্ত হইয়া মহাযোগে আপনাকে কৃষ্ণের সহিত

অভিন্নাত্মা বোধে কত কথা কহিতেন। এই সময়ে নিত্য নিত্য নূতন ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে নৃসিংহাবেশ হইত, কখন বলরামের ভাব প্রকাশ পাইত, কখন বা আপনাকে রামচন্দ্র মনে করিতেন এবং আর আর নানা ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কত প্রকারে নৃত্য করিতেন। তাঁহার সঙ্গীগণও তখন প্রেম ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া, ঐসকল প্রকাশকে ঐশ্বরিক প্রকাশ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই সকল ভাবের প্রকাশ হইতেই যে তাঁহার অবতারত্বের মত উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যোগাবসানে যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইত, তখন ঐ সকল ভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হইত না। বরং মহা দৈন্য ও ব্যাকুলতা সহকারে আপনাকে অতি হীন ও সামান্য জ্ঞান করিয়া কত দুঃখ প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে গেলে, প্রত্যেক মহাপুরুষেই এই সকল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দেবনন্দন ঈশা মহাযোগে মগ্ন হইয়া আপনাকে ও ঈশ্বরকে এক বলিয়া ছিলেন। 'I and my father are one'। যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ যোগযুক্ত হইয়া অর্জ্জুনকে সমস্ত ভগবৎগীতার উপদেশ বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল মহাত্মাগণ যোগ হইতে বিযুক্ত হইয়া আপনাদিগকে প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া পরিচিত করিতে কখনই সঙ্কুচিত হইতেন না।

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে, অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়ে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন "হে ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে যে ধর্ম্মতত্ত্ব আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি; অতএব পুনরায় সেই সমস্ত তত্ত্ব কথা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।" ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে, অতি সুস্পষ্টরূপে আমাদের কথা প্রতিপন্ন হইবে। তিনি বলিলেন, 'তখন আমি যোগযুক্ত হইয়া যে তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলাম, এইক্ষণে আর তাহা পুনরাবৃত্তি করিবার সাধ্য নাই।'

"ন শক্যং তন্ময়া ভূয় স্তথা বক্তুমশেষতঃ।
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগ যুক্তেন তন্ময়া॥"

অনুগীতা। ১৬ অ। ১২। ১৩।

শ্রীচৈতন্যের মহাভাবের মধ্য দিয়া প্রাগুক্তরূপে যে ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী অবাক্ হইয়া গেলেন, এবং

তাঁহার জীবত্ব হইতে ঈশ্বরত্ব পৃথক্ করিতে না পারিয়া, তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া ফেলিলেন। অবতারবাদের মত তখন এদেশে অক্ষুণ্ণভাবে রাজত্ব করিতেছিল; সুতরাং ইহাতে তাঁহাদের উপর বিশেষ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। এদেশে যখনই প্রাকৃতিক পদার্থে বা মানব জীবনে ভগবল্লীলা লক্ষিত হইয়াছে, ভারতের দুর্ভাগ্য ক্রমে তখনই অবতারবাদ আসিয়া ভগবানের স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মবীর চৈতন্যের মহত্ব ও গৌরব রক্ষার জন্য ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি মহাভাবের দশা ভিন্ন আপনাকে কখনই ঈশ্বর বলিয়া পরিচিত করেন নাই।

ঈশ্বরাভিমান করা দূরে থাকুক, তিনি আপনাকে ভক্ত বা ধার্ম্মিক বলিতেও লজ্জা বোধ করিতেন; এবং অন্যে যদি তাঁহার প্রশংসা করিত, অমনি 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' বলিয়া কর্ণে হাত দিতেন, ও ঐরূপ প্রশংসাকারীদিগের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। না হইবেনই বা কেন? যাঁহার মতে তৃণ হইতে আপনাকে নীচ মনে না করিলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, তাঁহার মুখ হইতে কি কখন অভিমানের কথা উচ্চারিত হইতে পারে? কাশীতে যখন তিনি মায়াবাদী ও অদ্বৈতবাদী পরমহংসগণকে অলৌকিক পাণ্ডিত্যবলে পরাস্ত করিয়া, দাস্য প্রেমের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; তখন পরমহংসগণের মুখপাত্র প্রকাশানন্দ স্বামী তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও প্রেম ভক্তির ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া প্রশংসা করিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে নিরভিমানী চৈতন্যদেব মহাবিরক্তিসহকারে বলিতে লাগিলেনঃ—

"প্রভু কহে 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' আমি জীব হীন;
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন।
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্মসম,
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন।" চৈঃ চঃ।

পুরুষোত্তমে অবস্থিতি কালই চৈতন্যজীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠার সময়। তখন তাঁহার ধর্ম্ম জীবন ষোলকলাপূর্ণ পূর্ণিমার শশধরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। প্রথম যৌবনে প্রেম ভক্তির যে জোয়ার আসিয়াছিল, তাহা অসামান্যরূপে পূরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ধর্ম্ম পশ্চিমে সিন্ধুনদ হইতে পূর্ব্বে মণিপুর ও দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সেখানকার যত সাধুভক্ত সকলই তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সম্মান করিবার নিমিত্ত লালায়িত। তাঁহার ধর্ম্মে সহস্র সহস্র লোক দীক্ষিত হইয়া, বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরিপুষ্ট করিতেছে এবং চারি দিক হইতে তাঁহার জয় বিঘোষিত হইতেছে। এ সময়ে কিন্তু তাঁহার নিজ ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা যাইত না। তখনও কোন শিষ্যের সাহস হইত না যে, তাঁহার সমক্ষে বা জ্ঞাতসারে তাঁহার স্তুতি করিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্থলে, কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। এক দিন শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, মত্ততা সহকারে তাঁহার নাম দিয়া একটী নূতন গান রচনা করত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ গান কি ভাবে রচিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না; বোধ হয় তাঁহার নামরচিত সঙ্কীর্ত্তনের এই প্রথম সূত্রপাত। যাহাহউক ইহা শুনিতে পাইয়া চৈতন্য প্রভু অশেষ প্রকারে গায়কদিগকে তিরস্কার করিয়া ছিলেন।

"এক দিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ,
মহাপ্রভুর গুণ গাইয়া করেন কীর্ত্তন।
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন :—
'কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তন ?
ঔদ্ধত্য করিতে হইল সবাকার মন,
স্বতন্ত্র হইয়া সবে শাসিবে ভুবন ?'' চৈঃ চঃ।

চৈতন্যের তিরোভাবের পর রূপ ও সনাতন গোস্বামীই তাঁহার অবতারত্ব স্থাপন বিষয়ে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং চৈতন্যাবতার যে একরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদেরই যত্নের ফলে। কিন্তু তাঁহার জীবনসময়ে ইহাঁরাও কোন কথা বলিয়া উঠিতে পারিতেন না। রূপ গোস্বামী কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নামে সংস্কৃত ভাষায় দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ঐ দুই নাটকের নান্দীতে আপন অভীষ্ট দেবের বন্দনা উপলক্ষে দুইটী শ্লোকে চৈতন্যাবতারের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া ছিল, এক দিন হরিদাসের বাসায় চৈতন্য দেব, রামানন্দ রায়, ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ সমাগত ছিলেন, হরিদাস প্রমুখাৎ ঐ দুই নাটক রচনার বিষয় অবগত হইয়া রামানন্দ রায় তাহা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন রূপগোসাই মহাপ্রভুর আদেশ লইয়া গ্রন্থের অংশ স্থানে স্থানে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রায়

রামানন্দ নান্দী ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রূপগোস্বামী মহাপ্রভুর ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইলেন।

"রায় কহে কহ ইষ্ট দেবের বর্ণন,
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন।
প্রভু কহে কহ কেন কি সঙ্কোচ লাজে?
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব সমাজে।" চৈঃ চঃ।

তখন রূপ গোস্বামী ঐ দুইটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। শ্লোক দুইটীর বাঙ্গলানুবাদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"পূর্ব্বে আর কখন যে উজ্জ্বল মধুর রস জগতে প্রদত্ত হয় নাই, সেই নিজ ভক্তি সম্পদ প্রদান করিবার জন্য, যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণকান্তি হইতেও উজ্জ্বল, সেই শচী নন্দন হরি (সিংহ) তোমাদের হৃদয় কন্দরে প্রকাশিত থাকুন।" বিদগ্ধমাধব।

"যিনি জগতে উদিত হইয়া স্বর্গীয় প্রেমসুধা অপর্য্যাপ্তরূপে বিতরণ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্বিজকুলে জন্ম গ্রহণ করত সকলের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়াছেন, যাঁহার প্রেমে সকল জগৎবাসী বশীভূত হইয়াছে, সেই শচীনন্দন শশী আমাকে অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রদান করুন।" ললিতমাধব।

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া চৈতন্য দেব রাগান্বিত হওত রূপকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন ও রামানন্দ রায় রূপের পক্ষ অবলম্বন করাতে তাঁহার উপরও মহা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মহাপ্রভু বলিতেছেন ;—

"কাঁহা তোমার কৃষ্ণ রস কাব্য সুধা সিন্ধু?
তার মধ্যে মিথ্যা কেন স্তুতি ক্ষার বিন্দু?
রায় কহে রূপের কাব্য অমৃতের পুর ;
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর।
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস?
শুনিতেই লজ্জা লোকে করে উপহাস।" চৈঃ চঃ।

অবশেষে রায় রামানন্দ এই বলিয়া মহাপ্রভুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, গ্রন্থমধ্যে মঙ্গলাচরণে গ্রন্থকারদিগের ইষ্টদেবের বন্দনা করিবার রীতি প্রচলিত আছে; রূপ ঐ প্রথানুসারে আপন ইষ্ট দেবতাকে হরি (সিংহ) ও শশীর সহিত উপমা দিয়া স্তব করিয়াছেন মাত্র; তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না।

এই সকল প্রমাণ আলোচনা করিলে, কি কারণে চৈতন্যাবতারের মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা একরূপ বুঝা যাইতে পারে। ধর্ম্ম জগতে ইহা নূতন কথা নহে; সমস্তমানব জাতির ধর্ম্ম ইতিহাসে এইরূপ ঘটনাই দেখা যায়। তবে এই প্রস্তাবে আমরা ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে, যে মত অবলম্বন করিয়া এক্ষণে বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া ঘরে ঘরে পূজা করিতেছেন, তাহা তাঁহার ধর্ম্ম মতের নিতান্ত বিরুদ্ধ। তিনি জীবিত থাকিলে, এই অনুষ্ঠান কখনই অনুমোদন করিতেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যের ধর্ম্মের সহিত বাঙ্গলা ভাষার সম্পর্ক।

কোন্ সময়ে ও কিরূপে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, প্রাকৃত ভাষা বাঙ্গলার আদিম অসভ্য অধিবাসীদিগের ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও দেশবাসীদিগের প্রকৃতির প্রভাবে কাল সহকারে বাঙ্গলা ভাষা রূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। তবে ইহা ঠিক বলা যাইতে পারে যে, এই ভাষা প্রত্যক্ষ-ভাবে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই। যদিও ইহাতে ভূরি ভূরি সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা প্রাকৃত ভাষার মধ্যে দিয়া পরোক্ষ ভাবে উপনীত হইয়াছে। সে যাহা হউক, চৈতন্য দেবের বহু পূর্ব্ব হইতে যে বাঙ্গলা ভাষাই এ দেশীয়দিগের ভাষা ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন ভাষার সুমার্জ্জিত গঠন, লালিত্য বা অঙ্গ সৌষ্ঠব আদি কিছু ছিল না। যেমন একটী বিস্তীর্ণ জঙ্গলে কণ্টকাকীর্ণ আগাছার মধ্যে সুন্দর সুন্দর কুসুম স্তবক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ফুটিয়া থাকে, তখন বাঙ্গলা ভাষারও সেই অবস্থা। কালক্রমে ঐ ভাষারূপ জঙ্গলে আগাছা কাটিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া যেখানে যে গাছটী সাজে, সেই খানে তাহাকে রাখিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে এখন একটী সুন্দর প্রমোদকানন করিয়া তুলিয়াছেন। ভাষা তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া

যায় যে, সকল দেশে ভাষাটী প্রথমে চলিত কথা বার্ত্তায় আবদ্ধ থাকে, তখন তাহাকে মৌখিক ভাষা বলা যাইতে পারে। কিন্তু কাল সহকারে সুখ দুঃখাদি ভাবব্যঞ্জক মনের নানাবিধ অবস্থা কবিতাকারে প্রকাশিত হইয়া লিপিবদ্ধ হইলে লিখিত ভাষার জন্ম হয়। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, বেদাদি ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল মনুষ্যজাতি সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে বিধাতা ছন্দো বন্ধে রচনা করত, ব্যক্তি বিশেষ, কি জাতি বিশেষকে অর্পণ করিয়াছিলেন, বিজ্ঞান তাঁহাদের কথায় সায় দেয় না। বাঙ্গলা ভাষাও যে এইরূপ কথা বার্ত্তার মৌখিক ভাষা হইতে লিখিত আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কোন্ সময়ে কেমন করিয়া বাঙ্গলা বর্ণ মালার সৃষ্টি হইল ?

এ বিষয়েরও ঠিক তত্ত্ব কেহ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। দেবনাগর অক্ষরই সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা ; বাঙ্গলা অক্ষর তাহার রূপান্তরিত অবস্থা বই আর কিছুই নহে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তন্ত্রাদিতে বাঙ্গলা বর্ণমালার উল্লেখ আছে। তাহা সত্য, কারণ অধিকাংশ তন্ত্রই অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে বাঙ্গলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তবে ন্যায়রত্ন মহাশয় যে লিখিয়াছেন, বাঙ্গলা অক্ষর ও বাঙ্গলা ভাষা একদা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

চৈতন্যের পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থ দেখা যায় না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বটে, এবং বাল্মীকি ও চসরের ন্যায় তাঁহারাই বাঙ্গলার আদি কবি ছিলেন সত্য ; কিন্তু বাল্মীকি ও চসর যেরূপ সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় আনুপূর্ব্বিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইঁহারা সেইরূপ করেন নাই। ইঁহাদের রচিত অনেকানেক পদাবলী ও গীতিকবিতা আছে বটে, কিন্তু তাহা রামায়ণ ও Canterbury Tales এর ন্যায় পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত সূত্রে গ্রথিত গ্রন্থ বিশেষ নহে। ঐ সকল কবিতার অধিকাংশই রাধা কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক নানা ভাবের ও নানা অবস্থার খণ্ড খণ্ড কবিতাবলী মাত্র। চৈতন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাই সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গ ভাষায় আনুপূর্ব্বিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন ; চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতকেই বাঙ্গলার আদি গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও কড়চা গ্রন্থ গুলি এই দুই গ্রন্থের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে কোন ঘটনা-

বশেষ আনুপূর্ব্বিক বিবৃত না হওয়ায়, সে গুলিকে গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত করা কর্ত্তব্য নয়।

যেরূপ পিতা মাতার নিকট সন্তানগণ, সেইরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিকট বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ যে এবিষয়ে যুগান্তর আনিয়া দিয়া গিয়াছেন ও অশেষ প্রকারে বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের পূর্ব্বে কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ ঘৃণা সহকারে মাতৃ ভাষাকে উপেক্ষা করত, ইহাতে গ্রন্থাদি রচনা করিতেন না। তখনও বঙ্গদেশে অনেকানেক গ্রন্থাদি রচিত হইত, কিন্তু সে সকলই সংস্কৃত ভাষায়। এমন কি বৈষ্ণব কবিগণ ও উত্তরকালে সমুদ্ভূত রায় গুণাকর প্রভৃতি বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ কবি সকলও সম্পূর্ণরূপে এই প্রথাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাই সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকেও সংস্কৃতে গ্রন্থ সকল রচনা করিতে হইত। রূপ গোস্বামী প্রভৃতির সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, চৈতন্য চরিতামৃতরচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের কৃত গোবিন্দলীলামৃত ও ভারত চন্দ্র রায়ের চৌর পঞ্চাশত, নাগাষ্টক প্রভৃতি কাব্য এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

চৈতন্যদেব ভারতীয় ধর্ম্ম জগতে যে যে সংস্কার আনিয়া দিয়া যান, তাহার মধ্যে দেশের চলিত ভাষায় ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল প্রচার করা একটী প্রধান। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণাচার্য্যদিগের মত, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্ম্মের অনেক সংস্কার করিয়াছিলেন সত্য বটে; কিন্তু এ বিষয়ে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাঁহারা উদারচেতা ও সমদর্শী চৈতন্য দেবের অনেক পশ্চাতে ছিলেন বলিতে হইবে। যিনি জাতি ও পাত্র নির্ব্বিশেষে আচণ্ডালে হরিনাম বিলাইতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব সকল সাধারণের অবোধ্য সংস্কৃত ভাষার অন্ধকারময় গভীর গহ্বরে আবদ্ধ থাকিবে, তাহা কখনই অনুমোদন করিতে পারে না। তাই তিনি ঐ সকল তত্ত্ব প্রচলিত গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। তদবধি কড়চা গ্রন্থ সকল, সুমধুর পদাবলী ও বিবিধ ভাব পূর্ণ সঙ্গীত মালা বিরচিত হইয়া মাতৃ ভাষার অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে লাগিল। ভাষার উন্নতি সাধন করা বৈষ্ণবগণের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলেও গৌণরূপে যে তাহা সংসাধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থের মধ্যে কড়চা গ্রন্থগুলি, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল, ভক্তমাল ও নানাবিধ মহাজনী পয়ার ও পদাবলী এবং নরোত্তম দাস কৃত বৈষ্ণব বন্দনা, প্রেমভক্তি ও পাষণ্ড দলন সচরাচর দেখা যায়। কড়চা গ্রন্থগুলি দুষ্প্রাপ্য। প্রথমোক্ত তিন খানি গ্রন্থ সম্বন্ধে এই প্রস্তাবের উপক্রমণিকায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে পাঠক মহাশয় তাহাদের বিষয় ও প্রকার ভেদের বিবরণ অনেকটা জানিতে পারিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে গ্রন্থকারগণ ভাষার লালিত্য ও কবিতার সৌন্দর্য্যের দিকে তত দৃষ্টিপাত করেন নাই, যত বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল সরল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহাতেই এই সকল গ্রন্থ এক্ষণকার মার্জ্জিত বুদ্ধি পাঠকের নিকট তত প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। নতুবা ইহাদের মধ্যে যে, অপূর্ব্ব ভাব ও মাধুর্য্য-সম্পন্ন কবিতা নাই, তাহা নহে। বরং ভাব ও রস মাধুর্য্যে বৈষ্ণব কবিগণ যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে এবং স্থানে স্থানে ভাষামাধুর্য্যেরও এরূপ পরিচয় দিয়াছেন যে তাহা অতি কম কবিতেই দেখা যায়। আমাদের কথা সপ্রমাণার্থে, এখানে একটী মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

"মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে, যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ ?
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম ?
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে মোর নাম ?
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি ?
কোন্ রন্ধ্রে কেকারবে নাচে ময়ূরিণী ?
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত ?
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ ?
কোন রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে ?
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফলফুলে ?
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় ?
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়।" জ্ঞানদাস।

বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থে বহুল পরিমাণে ব্রজবুলি ও "যাঞা" "খাইঞা" প্রভৃতি রাঢ়দেশীয় চলিত ভাষার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন

অধিকাংশ গ্রন্থকারের বাসস্থান রাঢ়দেশে ছিল, তখন তাঁহারা যে তাঁহাদের দেশ প্রচলিত শব্দ সকল স্ব স্ব গ্রন্থমধ্যে প্রয়োগ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে ব্রজভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে ইহা অনুমান করা ঠিক নহে যে, তৎকালে ঐ প্রকার ভাষা এ দেশে প্রচলিত ছিল। জীব গোস্বামী প্রভৃতি অধিকাংশ বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তৃগণ বৃন্দাবনে বাস করিতেন; তাঁহাদের বর্ণিত বিষয় গুলিও প্রায় রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে থাকিত; এবং ব্রজবুলি গুলি শুনিতেও সুমধুর, তাহই জন্ম বোধ হয় গ্রন্থ মধ্যে বহুল পরিমাণে ব্রজবুলি ব্যবহৃত হইত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবদ্বীপ।

নবদ্বীপ চৈতন্তের জন্ম ভূমি ও প্রথম লীলার স্থান। বঙ্গদেশের মধ্যে ইহা একটী অতি পুরাতন ও সুপ্রসিদ্ধ নগর। কোন্ সময়ে ও কিরূপে এই নগরের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার ঠিক বৃত্তান্ত নির্ণয় করা অসম্ভব। বাল্যকালে একবার প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, অতি পূর্ব্ব কালে ভাগীরথী ও খড়িয়া নদীর স্রোত-বিবর্ত্তনে উপদ্বীপাকারে একটী চর পড়িয়াছিল, লোকে তাহাকে নূতন দ্বীপ বলিত। কাল সহকারে কয়েকজন মৎস্যজীবী ধীবর ঐ নবোদ্গত ভূমিখণ্ডে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করায় ইহা একটী যৎসামান্ত ক্ষুদ্র পল্লীর আকার ধারণ করিয়াছিল। নবোদ্গত ভূখণ্ড উপদ্বীপাকারে গঠিত হওয়ায় প্রথম হইতেই পল্লীর নাম নূতনদ্বীপ বা "নবদ্বীপ" হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, নয় ঘর ধীবরের আবাস স্থান ছিল বলিয়া ইহার নাম নবদ্বীপ হয়। সে যাহা হউক পরে যখন ইহা বহুজনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী রাজধানী রূপে পরিণত হইয়া প্রাচীনাবস্থায় উপনীত হইল, তখনও কিন্তু ইহার নামের নবীনত্ব বিলুপ্ত হইল না।

একণে যে স্থানটীকে নবদ্বীপ বলা যায়, প্রাচীনকালের নবদ্বীপ যে ঐ স্থানে ছিল না, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর

পূর্ব্ব প্রায় ৫ মাইল দূরে ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘীকার কঙ্কাল একণেও নয়ন গোচর হইয়া থাকে। লোকে ঐ শুষ্ক খাতকে 'বল্লাল দিঘী' বলিয়া থাকে। এক্ষণে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য ঋতুতে উহাতে জল থাকে না। ঐ দিঘী সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে পৌরাণিক সময়ে পৃথু রাজা ঐখানে এক কুণ্ড কাটিয়াছিলেন, তাহার নাম পৃথু কুণ্ড ছিল। পরে সেন বংশীয় শেষ রাজা লাক্ষণেয় সেন তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দীর্ঘীকাকারে পরিণত করতঃ স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ বল্লাল সেনের নামে উৎসর্গ করেন। সেই হইতে উহা বল্লাল দিঘী নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। দিঘীর পূর্ব্বধারে লোকের বসতি আছে; এবং উত্তরভাগে একটু দূরে ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় ইষ্টক, প্রস্তর ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত একটী উচ্চ স্থান আছে, তাহার নাম 'বল্লালের ঢিবি'। পরবর্ত্তী সময়ে কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই স্থান হইতে অনেক প্রস্তরাদি লইয়া কৃষ্ণনগরের রাজবাটী নির্ম্মাণে লাগাইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে রাজা বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদ ঐ স্থানে অবস্থিত ছিল; তাহারই ভগ্নাবশেষ এক্ষণে 'বল্লালের ঢিবি' নাম ধারণ করিয়া বহুদিনের ইতিহাসের কথা আপনার উদরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। হিন্দু রাজত্বের সময়ে সেন বংশীয় রাজাদিগের রাজধানী নবদ্বীপ নগরে ছিল। সুতরাং প্রাচীনকালের নবদ্বীপ যে, 'বল্লাল ঢিবি' ও বল্লাল দিঘীর সন্নিধানে ব্যবস্থিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। তখন এই নগরের পশ্চিমে ও দক্ষিণে নির্ম্মল সলিলা ভাগীরথী ইহার পাদমূল বিধৌত করিয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়া গোয়ালপাড়ার নিকটে খড়িয়া নদীর সহিত সংযুক্ত ছিল; এবং পূর্ব্বে বল্লাল দিঘীর কিছু দূরে খড়িয়া নদী মৃদু মন্দ গমনে দক্ষিণ পশ্চিম বাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইত। এই নবদ্বীপই হিন্দু রাজত্বের শেষ রঙ্গ ভূমি ও লাক্ষণেয় সেনের কাপুরুষতার পরিচয় স্থান। তাই বুঝি বিধাতা ইহার উৎসন্ন সাধনে যত্নবান হইলেন।

মুসলমানদিগের আমলদারীর সুরু হইতে ক্রমে ভাগীরথীর স্রোত পশ্চিমদিকে সরিয়া যাওয়ায় সেন রাজাদিগের নবদ্বীপ শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিল। অধিবাসিগণ ক্রমে ক্রমে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ গঙ্গাতীরে যাইয়া বাস করিতে লাগিল এবং মায়াপুর আতোপুর, গঙ্গানগর, সীমুলীয়া, ব্রাহ্মণ পুষ্কর (বামন পুকুরিয়া) তারুইডাঙ্গা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি পল্লী আয়তন লইয়া উঠায়. পুরাতন নবদ্বীপ এক প্রকার স্থান ভ্রষ্ট হইয়া গেল। রাজকীয়

স্থান আবার দ্বীপভূমিরূপে উঠিয়া আসাতে উহা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। ক্রমে এইস্থান গুলিকেই লোকে নবদ্বীপ বলিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে এই সব গ্রামই নবদ্বীপ ছিল। বর্ত্তমান নবদ্বীপ যেখানে সমাবিষ্ট, তখন সেখানে দুইটী বিস্তীর্ণ চরা ছিল, লোকে তাহাকে পারডাঙ্গা ও ছিনাডাঙ্গা বলিত।

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে নবদ্বীপের অতিমাত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা দেখা যায়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিষ্ণুপুরাণের নিম্ন লিখিত শ্লোক উদ্ধার করিয়া নবদ্বীপের অলৌকিক প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। "ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়। ইন্দ্রদ্বীপং কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্। নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথবারুণঃ। অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সম্বৃতঃ। যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ।"

'সাগর সম্বৃত' পদের সমুদ্র প্রান্তবর্ত্তী অর্থ ধরিয়া এবং নবমদ্বীপের পৃথক্ নাম বলা হয় নাই বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিষ্ণুপুরাণের এই শেষোক্ত স্থান নবদ্বীপকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা অবধারণ করিয়াছেন। এই নবদ্বীপ আবার দুই চারি খানি গ্রাম লইয়া পরিগণিত হয় নাই। বৃন্দাবন লীলার অনুসরণ করিয়া ভাগীরথীর উত্তর ও দক্ষিণে উভয় পারে ষোল ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন স্থানকে গৌরলীলার নবদ্বীপ ধাম বলা হইয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে নয়টী দ্বীপে ভাগ করা হইয়াছে এবং তাহার প্রত্যেক খণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ পৌরাণিক উপাখ্যান কথিত হইয়াছে। সেই সমস্ত আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া আমরা প্রস্তাব দীর্ঘ করিতে ইচ্ছা করি না। কেবল মাত্র ঐ নয়টী দ্বীপ ও তাহার অন্তর্গত স্থানের বিষয় কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে। নয়টী দ্বীপের নাম যথাঃ—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম ও রুদ্রদ্বীপ। ইহার মধ্যে প্রথম চারিটী গঙ্গার পূর্ব্ব পারে এবং শেষ পাঁচটী গঙ্গার পশ্চিম পারে। ইহাদিগের তদানীন্তন নাম ও অন্তর্গত স্থান এইরূপঃ—

১। অন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ আতোপুর। গ্রামটী বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যস্থলে মায়াপুর যেখানে জগন্নাথ মিশ্রের বাটী ছিল। ভারুইডাঙ্গা (ভারদ্বাজ টিলা), বামুনপুকুরিয়া ইহার অন্তর্গত। এক্ষণে শিবডোবা বলিয়া যে খাত বর্ত্তমান আছে, উহা চৈতন্য চন্দ্রের সময়ে গঙ্গাগর্ভ, ...

ছিল। বামুনপুকুরিয়াতে চাঁদকাজীর বংশীয়গণ একণেও বসতি করিতেছেন।

২। সীমন্তদ্বীপ বা সীমুলিয়া। গ্রাম উৎসন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান সীমুলিয়া চরের নিকটবর্ত্তী সিমলা নামে যে স্থান আছে—তাহাই প্রাচীন সীমুলিয়ার ভগ্নাবশেষ। এখানে এখনও পৌরাণিক সীমন্তিনী (সীমন্তী) দেবীর পূজা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান রুদ্রনপুর পর্য্যন্ত সীমন্ত দ্বীপের অন্তর্গত। এইখানে মুসলমান রাজপুরুষ চাঁদকাজীর বসতি ছিল। ইনি গৌড়াধিপ হোসেন সাহার আত্মীয় ছিলেন। গঙ্গা নগর ইহার অন্তর্গত; এই গঙ্গা নগরে শ্রীচৈতন্যের অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত ও সহাধ্যায়ী সঞ্জয় বাস করিতেন। পৃথুকুণ্ড অর্থাৎ বল্লাল দিঘী ইহার নিকটবর্ত্তী।

৩। গোদ্রুম বা গাদিগাছা। এই স্থান দিয়া শ্রীচৈতন্যের নগর সংকীর্ত্তনের দল পরিক্রমাকরিয়াছিল। সুবর্ণ বিহার ইহার অন্তর্গত। সুবর্ণবিহারে গৌরচন্দ্র ভক্তগণসঙ্গে সংকীর্ত্তনে মহানৃত্য করিয়াছিলেন। গৌরকে দেখিয়া লোকে মনে করিত বুঝি সুবর্ণের বিগ্রহ নাচিতেছে।

৪। মধ্যদ্বীপ বা মাজিদা। বামন পুরা (ব্রাহ্মণ পুষ্কর), হাটডাঙ্গা (উচ্চ হট্ট), ইহার দক্ষিণে। শ্রীগৌরাঙ্গের মহা নগরসংকীর্ত্তনের দল দক্ষিণে এই পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। এই চারিটী দ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্ব পারে এবং ইহাদিগকেই প্রকৃত নবদ্বীপ বলা যাইতে পারে।

৫। কোলদ্বীপ। কুলিয়াপাহাড় ভাগীরথীর পশ্চিমে। নীলাচল হইতে আসিয়া চৈতন্যদেব কুলিয়া গ্রামে মাধব মিশ্রের আলয়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সমুদ্রগতি (সমুদ্রগড়) চম্পকহট্ট (চাঁপাই হাটী) ইহার অন্তর্গত। পারডাঙ্গা ও ছিনাডাঙ্গা নামক বিস্তীর্ণ চরা ভূমি, যেখানে বর্ত্তমান নবদ্বীপ ব্যবস্থিত, ইহার সমীপবর্ত্তী।

৬। ঋতুদ্বীপ—রাহুতপুর। বিদ্যানগর ইহার সমীপবর্ত্তী। শ্রীগৌরাঙ্গের সময়ে বিদ্যানগরে নানাবিধ বিদ্যাচর্চ্চা হইত। বেদবেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জলদর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের অধ্যাপকগণেরই এখনে টোল ছিল। কথিত আছে স্বয়ং বৃহস্পতি বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামে বিশারদের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া এখানে বিদ্যাবিলাস করিয়াছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মের পূর্ব্বেই তিনি বাসত্যাগ করিয়া উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত হইয়া নীলাচলে

গিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ বিদ্যাবাচস্পতির এখানে টোলছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ নদী পার হইয়া সময়ে সময়ে বিদ্যানগরে আসিয়া পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন।

৭। জহ্নুদ্বীপ—জান্নগর।

৮। মোদদ্রুমদ্বীপ—মাউগাছি। বৈকুণ্ঠপুর, অর্কটীলা(আকৃডালা), মহৎপুর (মাতাপুর) ইহার অন্তর্গত।

৯। রুদ্রদ্বীপ—রাহুপুর (রুদ্রপাড়া)। পূর্ব্বস্থলী, চুপী, কোকশালী ও মেড়তলা ইহার অন্তর্গত।

এই সমস্ত স্থানই গৌরাঙ্গ বিলাসের স্থান বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে মহা-তীর্থ জ্ঞানে পূজিত। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশতরঙ্গে শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুর নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমাতে পাঠক মহাশয় এই সকল স্থানের পৌরাণিকবৃত্তান্ত দেখিতে পাইবেন। সে যাহাহউক নবদ্বীপ পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে একটী সুপ্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তাহা পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপে বুড়াশিব ও পোড়ামা নামে দুইটী গ্রাম্য দেবতা দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পূর্ব্ব নবদ্বীপের বৃত্তান্ত মধ্যে এই দুই দেবতার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই দুইটী দেবতার নাম বিশেষ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন লীলায় যেমন কাত্যায়নী ও গোপে-শ্বর যোগমায়া ও কালভৈরবরূপে কৃষ্ণলীলার সাহায্য করিয়াছিলেন, গৌর লীলায় তেমনি পোড়া মা (প্রৌঢ়া মা) একাংশে ও সিমুলীদেবী "সিমন্তিনী দেবী" অপরাংশে যোগমায়ারূপে এবং বৃদ্ধ শিব (বুড়াশিব) ক্ষেত্রপাল রূপে লীলার সহায়তা জন্য প্রকাশিত হইয়া ছিলেন। ফলতঃ গৌরাঙ্গাবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে এই দুই দেবতা যে বিদ্যমান ছিলেন তাহার কিম্বদন্তী এই যে অনুমান চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন উদাসীন সন্ন্যাসী আসিয়া এই গ্রামে ভগবতীর এক ঘট স্থাপন করেন। ইনি একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবীর মাহাত্ম্যও চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। দেবীর নাম 'পোড়ামা' বা প্রৌঢ়ামা কেন হইল, জানি না; কিন্তু ঐ ঘট অদ্যাপিও এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ মূলে বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ প্রদেশের সমস্ত লোক সিদ্ধপীট জ্ঞানে ঐ স্থানে পূজা দিয়া থাকে।

অমন কি, টোলের ছাত্রগণ পাঠ সমাপনান্তে পোড়ামার পূজা না দিয়া যাইতে পারে না। এই রীতি একণে প্রচলিত আছে কি না, জানি না; কিন্তু ১৫,১৬ বৎসর পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম যে, কৃতবিদ্য ছাত্র পোড়ামার পূজা দিয়া সেই বৃক্ষ মূলে সমবেত অধ্যাপক মণ্ডলীর নিকট উপাধি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে স্বদেশে যাইতে পাইতেন। অতি প্রাচীন সময় হইতেই নবদ্বীপ সংস্কৃত বিদ্যালোচনার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তজ্জন্য নানাবিধ ও নানা দেশীয় ছাত্রগণ এখানে আসিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিত। তদ্ব্যতীত গঙ্গাস্নানোপলক্ষেও বহুবিধ লোকের সমাগম হইত। এই সকল কারণে নবদ্বীপ নগর অতি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। চৈতন্য চন্দ্রের সময়ে এই গ্রাম যে, একটী সমৃদ্ধিশালী উপনগর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা আমাদের কথাই দৃঢ়ীভূত হইতেছে। বিদ্যা, বাণিজ্য, তীর্থ ও রাজকীয় সকল অংশেই নবদ্বীপের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়;—

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই;
যাহে অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই।
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা;
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা।
নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে?
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ;
সরস্বতী দৃষ্টি পাতে সব মহা দক্ষ।
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে;
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।
নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপ যায়;
নবদ্বীপে পড়ি সে বিদ্যা রস পায়।
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বৈসে;
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।

চৈঃ ভাঃ আদি ১ অধ্যায়।

১ কর্ণপুরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিত্রের প্রথম প্রক্রমেও এইরূপই দেখা যায়।

"নবদ্বীপ ইতি খ্যাতে ক্ষেত্রে পরম বৈষ্ণবে,
ব্রাহ্মণাঃ সাধবাঃ শান্তা বৈষ্ণবাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ
মহান্তঃ কর্ম্ম নিপুণাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগাঃ
অন্যেচ সন্তি বহু শো ভিষক্‌শূদ্র বণিক্ জনাঃ।
আচার নিরতাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বে বিদ্যোপজীবিনঃ।
তত্র দেবকৃতঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠ ভবনোপমে।"

চৈতন্যের সময়ে এই নগরে একজন কাজী বা রাজকীয় কর্ম্মচারী বাস করিতেন। চৈতন্য চরিতামৃতের ও চৈতন্য ভাগবতের নানাস্থানে ঐ কাজীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তিনি গৌড়াধিপ সৈয়দহোসেনের আত্মীয়, নাম চাঁদকাজী। কাজীর দরবারে বা দেওয়ানে কোন্ দিন কি আদেশ হইত, তাহা জানিবার জন্য প্রজাগণ বড়ই উৎসুক থাকিত; এবং কোন অহিতকর আদেশ হইলে তজ্জন্য প্রভূত শঙ্কিত হইত। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, কাজীসাহেব বিচার কার্য্য ব্যতীতও দেশের শান্তি রক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই করিতেন। এক্ষণকার উপবিভাগ সমূহে যেরূপ সবডিবিজনাল অফিসার ও দেওয়ানী বিচারকগণ পৃথক পৃথক নিযুক্ত হইয়া থাকেন; তখন বোধ হয় এক কাজী উভয়বিধ ক্ষমতাই পরিচালনা করিতেন।

চৈতন্য ভাগবতের দশমাধ্যায়ে গৌরাঙ্গের নগর ভ্রমণ বলিয়া যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা নবদ্বীপের সমৃদ্ধিশালীতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। নানা জাতীয় লোক শ্রেণীবদ্ধ ক্রমে নগরের বিভিন্ন পল্লীতে বাস করিত। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আচার্য্য, তন্তুবায়, গোপ, গন্ধবণিক, শঙ্খ বণিক, মালাকার, তাম্বুলী, তরকারি বিক্রেতা, মুসলমান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই বহুল পরিমাণে উল্লেখ দেখা যায়। হাট, ঘাট বাজার, রাজপথ ও অট্টালিকা সমূহেরও বিলক্ষণ পারিপাট্য দেখা যায়। সর্ব্ব দক্ষিণে বৃদ্ধ শিবের ঘাট, তাহার উত্তর গৌরাঙ্গের ঘাট, পরে মাধায়ের ঘাট, নাগরীয় ঘাট ও বারকোণা ঘাট এইরূপ পর পর কয়েকটী নদীর ঘাটের বর্ণনা চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে রহিয়াছে। সুতরাং এই নগর যে তৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে একটী সুপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল, তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। গঙ্গার অপর পারস্থ কোন কোন পল্লীর বিষয়ও বর্ণনা আছে। নবদ্বীপবাসিগণ কার্য্যার্থ বা ভ্রমণার্থ ঐ সকল গ্রামে সর্ব্বদা গতি বিধি করিতেন। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দ

সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ঐ সকল গ্রামে যাইয়া সময়ে সময়ে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন :—

"নিত্যানন্দ সকল পার্ষদগণ সঙ্গে,
প্রতি গ্রামে ফিরেন সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
খানা চৌড়া, বড়গাছি, আর দোগাছিয়া ;
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া।"

এই সকল গ্রাম এক্ষণে নবদ্বীপ হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছে। ইহার কারণ এই যে ভাগীরথী কালধর্ম্মে প্রাচীন নবদ্বীপকে ধ্বংস করিয়া অপর পারে লইয়া গিয়াছে বলিয়া। তৎকালের পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য প্রধান নগরের মধ্যে কণ্টক নগরী (কাঁটোয়া) শান্তিপুর, বরাহনগর, কুমারহট্ট (হালিসহর), সপ্ত গ্রাম, পাণিহাটি, গৌড়, রামকেলি ; উড়িষ্যার মধ্যে জলেশ্বর, বালেশ্বর, যাজপুর, কটক, রেমুণা ও পুরী প্রভৃতি চৈতন্য বিলাসের স্থান বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণকার সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতা, কি হুগলী, ফরাস ডাঙ্গা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কোন স্থানেরই উল্লেখ নাই। তৎকালে যে এই সকল স্থান কোন অংশেই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

লীলাভেদ।

চৈতন্যের জীবনেতিহাস লেখকগণ তাঁহার জীবনগ্রন্থ খানি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী বিবৃত করিবার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহার মর্ত্ত্য জীবন ৪৮ বৎসর ব্যাপী। চৈতন্যভাগবতপ্রণেতা বৃন্দাবন দাস, চৈতন্যমঙ্গল কর্ত্তা লোচন দাস, ইহা একরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে চৈতন্যচরিতামৃতচরিতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ অন্যরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থকারগণ চৈতন্য জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুসরণ করিয়া ভক্তচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহাদের প্রণালীকে আধ্যাত্মিক

বিভাগ এবং শেষোক্ত গ্রন্থকার তাঁহার প্রাকৃত জীবন অবলম্বন করিয়া লীলাভেদ লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার অবলম্বিত প্রথাকে প্রাকৃতিক বিভাগ বলা যাইতে পারে। ২৩ বৎসর বয়সের সময় শ্রীচৈতন্য পিতৃকৃত্য সম্পাদনার্থে গয়াতীর্থে গমন করেন; সেই খানে ভক্তবর ঈশ্বর পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, ও তিনি পুরীর নিকটে দীক্ষিত হন। তদবধি তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এত দিন তিনি বিদ্যারসে মত্ত এক জন দাম্ভিক পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু এক্ষণ হইতে বিনয় ও ব্যাকুলতা অহঙ্কারের স্থান অধিকার করিল এবং তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভক্তি বিকাশের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল। এখন হইতে তিনি পূর্ব্বের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিচার বিতণ্ডা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবা রজনী প্রেম ভক্তির অনুশীলনে ও সঙ্কীর্ত্তন বিলাসে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই কারণে বৃন্দাবন দাস প্রমুখ গ্রন্থকারগণ এইখানে তদীয় জীবনের এক পরিচ্ছেদ শেষ করিয়াছেন। আবার তখন হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ ও নবদ্বীপ পরিত্যাগ পর্য্যন্ত এক সম্বৎসরকাল তাঁহার জীবনে মূর্ত্তিমতী ভক্তির অলৌকিক বিকাশ দেখা গিয়াছিল। প্রেমোন্মত্ততা, মহানৃত্য, মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তগণের সহিত বিবিধ লীলা বিলাস ও সমাধি মহাভাবের প্রগাঢ় অবস্থা, এই সময়ের প্রধান ঘটনা। সে জন্য সেই খানে তাঁহার জীবন গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে দেশ পর্য্যটন ও নীলাদ্রিতে অবস্থিতি এবং লীলা সম্বরণ পর্য্যন্ত ২৪ বৎসরের ঘটনা তৃতীয় বা শেষ পরিচ্ছেদ। এই তিন পরিচ্ছেদের নাম আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড।

লোচন দাসের বিভাগ, বৃন্দাবন দাসের ঠিক্ অনুকরণ নহে। কিছু বিশেষ আছে। ইহার মতে জন্ম হইতে গয়াগমন পর্য্যন্ত আদিখণ্ড; নবদ্বীপ বিলাস, সন্ন্যাস গ্রহণ ও নীলাদ্রিতে গমন মধ্যখণ্ড; এবং দেশ পর্য্যটন ও নীলাচলে অবস্থিতি শেষ বা অন্ত্যখণ্ড।

পক্ষান্তরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যলীলা এইরূপে বিভাগ করিয়াছেন;— জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ ও নবদ্বীপ ত্যাগ ২৪ বৎসর কালের ইতিবৃত্ত আদি লীলা, এবং শেষ জীবনের ২৪ বৎসরের ঘটনাবলীকে শেষলীলা বলিয়া তিনি অবধারণ করিয়াছেন। শেষের ২৪ বৎসরের মধ্যে আবার ৬ বৎসর কাল দেশ পর্য্যটনে ও অবশিষ্ট অষ্টাদশ বৎসর অধিক লীলা-

দিকে অতিবাহিত হয়, সে জন্য শেষলীলা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রথম ৬ বৎসর মধ্যলীলা ও শেষ ১৮ বৎসর অন্ত্যলীলা নামে অভিহিত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন;—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি,
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী।
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ;
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান।
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস;
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস।
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস;
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস।
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন;
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন।
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে;
কৃষ্ণপ্রেম লীলামৃতে ভাসাল সকলে।
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা আদিলীলাখ্যান;
মধ্য, অন্ত্য, নামে শেষলীলার দুই নাম।"

চৈঃ চঃ আদিলীলা ১৩ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার লীলাভেদ তত্ত্বতভাবে দেখিতে গেলে সুসঙ্গত ও শ্রেণী বিন্যস্ত হইলেও চৈতন্যচরিতামৃতের বিভাগ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখবোধ্য বলিয়া বোধ হয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা ও পরিচয়।

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ নবদ্বীপের আদিম নিবাসী ছিলেন না; পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসিয়া তাঁহার পিতা নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টদেশে উপেন্দ্র মিশ্র নামে একজন সম্রান্ত বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ

বাস করিতেন; কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দ্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ নামে তাঁহার সাত পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে জগন্নাথ জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বীপে আসিয়া গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। জগন্নাথের ঔরসে ও শচীদেবীর গর্ভে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথ মিশ্র অতি শান্ত ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন; এবং দেবার্চ্চনা, অধ্যয়ন, তপ জপাদি ব্রাহ্মণোচিত পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠানেই জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুরন্দর উপাধি ছিল; সুতরাং তাঁহার সম্পূর্ণ নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর। বিবাহের পূর্ব্বে কি পরে জগন্নাথ স্বদেশ পরিত্যাগ করেন, তাহা জানা যায় না; সম্ভবতঃ নবদ্বীপগমনের পরই তিনি পরিণীত হইয়া থাকিবেন। কারণ তাঁহার শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপবাসী সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত লোক ছিলেন। সমস্ত নবদ্বীপবাসীই নীলাম্বরের যথেষ্ট সম্মান ও খাতির করিত এবং সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস তাঁহার শিষ্য মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সুতরাং সুদূর দেশ শ্রীহট্টে নীলাম্বর যে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব বোধ হয় না। তবে ইহা হইতে পারে যে জগন্নাথের ন্যায় নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়া থাকিবেন।

শচী জগন্নাথের প্রথমে সন্তানভাগ্য বড় ভাল ছিল না। এক একটী করিয়া আটটী কন্যা জন্মগ্রহণান্তর গতায়ু হইলে পতি পত্নী বড়ই মনস্তাপ পাইয়াছিলেন; এবং সন্তান কামনায় বিষ্ণুপূজাদি নানারূপ দেবানুষ্ঠান করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে কিছু দিনান্তর সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত একটী পুত্র জন্মিল। পুত্রের নাম বিশ্বরূপ। বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিশ্বরূপ নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমে একজন ভগবৎপরায়ণ সাধুমধ্যে পরিগণিত হইলেন। এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য একটী ক্ষুদ্র বৈষ্ণব দলের মধ্যে প্রেমভক্তি প্রচার করিতেছিলেন। বিশ্বরূপও অদ্বৈতের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার নিকট গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপের জন্মের পর দীর্ঘকাল যাবৎ শচী জগন্নাথের আর কোন অপত্যোৎপাদন হয় নাই। পরিবারের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময় চৈতন্যচন্দ্র উদিত হইলেন। তখন বিশ্বরূপ প্রায় যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন।

এইখানে বিশ্বরূপের শেষ জীবনের কথা কিছু বলিয়া রাখা আবশ্যক

হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বিশ্বরূপ অদ্বৈতের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে বালক বিশ্বম্ভর মাতৃ আজ্ঞায় ভোজন জন্য জ্যেষ্ঠকে ডাকিতে যাইতেন এবং জ্যেষ্ঠের হস্ত ধরিয়া লইয়া আসিতেন। উভয় ভ্রাতার কমনীয় সৌন্দর্য্য ও ভাব নিরীক্ষণ করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহারা সামান্য বালক নহেন। এইরূপে কতকদিন কাটিয়া গেলে জগন্নাথ জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম লক্ষ করিয়া বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বরূপ সংসারে অনাসক্ত; একণে পরস্পর পরিণয়ের কথা শুনিতে পাইয়া রাত্রিযোগে গৃহ পরিত্যাগ করতঃ পিতামাতাকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে চলিয়া গেলেন; এবং শ্রীশঙ্করারণ্য নাম ধারণ করিয়া দেশে দেশে পরিভ্রমণ করতঃ দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকটে সন্ন্যাস লীলা সম্বরণ করিলেন।

এই সময়ে নবদ্বীপে যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিতেন ও ভবিষ্যতে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সর্ব্ব প্রধান পার্ষদ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, এখানে তাঁহাদের জীবনের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কিছু কিছু বলিয়া রাখা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই সকলের মধ্যে অদ্বৈত বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ ছিলেন। শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী নবগ্রামে কুবের পণ্ডিত নামে এক বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী নাভাদেবী। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের এক পুত্র সন্তান জন্মে। পুত্রের নাম কমলাক্ষ রাখা হইয়াছিল। কমলাক্ষের শৈশবাবস্থাতে কুবের পণ্ডিত পৈতৃক বাস পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাবাসের জন্য শান্তিপুরে উঠিয়া আইসেন। ক্রমে কমলাক্ষ কৃতবিদ্য হইলে কুবের পণ্ডিত ও নাভাদেবী পরলোক গমন করেন। পিতৃকৃত্য উদ্দেশে পুত্র গয়াগমন করিলেন এবং নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করতঃ শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিছুদিন পরে নৃসিংহ ভাদুড়ী নামে ব্রাহ্মণ শ্রীদেবী ও সীতা দেবী নাম্নী স্বীয় কন্যাদ্বয় তাঁহাকে সম্প্রদান করিলেন। কমলাক্ষ টোল খুলিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন এবং অচিরকাল মধ্যে এক জন ভগবৎ পরায়ণ সাধু পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বোধে ভক্তি ও পূজা করিত। ঈশ্বর হইতে দ্বৈত বা ভেদ না থাকা বলিয়া তাঁহার নাম অদ্বৈত হইয়াছিল; এবং আচার্য্য রূপে ভক্তিশাস্ত্রের

ধর্মব্যাখ্যা করিতেন বলিয়া 'আচার্য্য' উপাধি যুক্ত হয়। নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাটী ছিল। বোধ হয়, অধ্যাপনা উপলক্ষেই নবদ্বীপে বাসস্থান হয়। যাহা হউক শ্রীচৈতন্য জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রাণপণ যত্নে ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। ভক্তিধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্য মঠের প্রধান সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরী দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে আগমন করেন ও অদ্বৈতকে দীক্ষিত করিয়া যান। সেই হইতে অদ্বৈতের ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত। চতুর্দ্দিকে ভক্তিহীন শুষ্ক ক্রিয়াকাণ্ডে রত লোকদিগকে দেখিয়া করুণহৃদয় অদ্বৈত বড় ব্যথিত হইতেন এবং ভগবানের অবতারণার জন্য সর্ব্বদাই সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন। কথিত আছে যে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য ও অধর্ম্ম বিনাশের জন্য শীঘ্রই ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। এই আশায় আশান্বিত হইয়া তিনি একটী ক্ষুদ্র মণ্ডলী গঠনপূর্ব্বক সর্ব্বদা গীতা ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা, নিভৃতে বসিয়া ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত সদালাপ ও সঙ্কীর্ত্তনে কাল অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পত্নী সীতাদেবীও স্বামীর ন্যায় ভক্তিমতী ও পবিত্রচারিণী ছিলেন।

অদ্বৈতের ভক্তগোষ্ঠির মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিত একজন প্রধান। ইনি ও ইঁহার অপর তিন সহোদর শ্রীরাম, শ্রীপতি, ও শ্রীনিধি পণ্ডিতও চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে ভক্তিপথাবলম্বী হইয়াছিলেন। ইঁহাদের আদিবাস কুমারহট্টে বা বর্ত্তমান হালিসহরে ছিল। কোন কারণ বশতঃ ইঁহারা সপরিবারে নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব ও প্রেমিক ছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে হরিসংকীর্ত্তন করিতেন এবং প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেন বলিয়া নগরবাসী অনেকে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল এবং সুযোগ পাইলে তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে ছাড়িত না। দেবানন্দ পণ্ডিত নামে নবদ্বীপে একজন বিখ্যাত ভাগবতের পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার টোলে অনেক ছাত্র ভাগবত পাঠ করিত; কিন্তু তিনি ভাগবতের ভক্তিপক্ষে কিছুই ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না। একদিন শ্রীবাসপণ্ডিত তাঁহার টোলে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণচরিত্র শুনিতে শুনিতে ভাবে বিভোর হইয়া বহুল পরিমাণে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। দেবানন্দের তরলমতি শিষ্যগণ পাঠের

ব্যাঘাত হয় দেখিয়া শ্রীবাসকে ধরিয়া বাহিরে আনিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। দেবানন্দ উপস্থিত থাকিয়াও নিষেধ করেন নাই, এই অপরাধে উত্তরকালে চৈতন্য তাঁহাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীবাস পণ্ডিত লোকের এতই বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন যে, চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ ও নবদ্বীপ ত্যাগের পর পুনরায় কুমারহট্টে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নবদ্বীপে অবস্থিতি কালে শ্রীবাসভবনই চৈতন্যের বিলাসের প্রধান স্থান ছিল। শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী মালিনী দেবীও স্নেহময়ী ও উদারমতী ছিলেন।

গদাধর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, শ্রীমান পণ্ডিত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, বনমালী আচার্য্য এবং আরও অনেকানেক ব্যক্তি এই বৈষ্ণব দলের সভ্য ছিলেন। গদাধর পণ্ডিত নবদ্বীপের মাধব মিশ্রের পুত্র। শৈশব সময় হইতেই ইনি সংসারে বিরক্ত হইয়া ভক্তিপথ অবলম্বন করেন এবং চির কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বী হইয়া আজীবন ধর্ম্মানুশীলনেই অতিবাহিত করেন। ইনি চৈতন্যের একজন প্রিয়সুহৃদ ও প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে লক্ষ্মীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন।

নবদ্বীপের কোন সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকুলে মুরারি গুপ্তের জন্ম হয়। ইঁহাদিগকে গুপ্ত বৈদ্য বলিত। এক্ষণেও নবদ্বীপে বৈদ্যপাড়া বলিয়া একটী পল্লী দৃষ্ট হয়; বোধ হয়, ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষের নামানুসারে ঐ পল্লীর নাম হইয়া থাকিবে। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহাকে বৈষ্ণবেরা হনুমানের অবতার বলিয়া থাকেন। ইনি চৈতন্যের প্রথম জীবনের এক কড়চা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

মুকুন্দ দত্ত—ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্টে। ইনি চৈতন্যের সমবয়স্ক ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। যখন বিশ্বম্ভর বিদ্যামদে মত্ত, ইনি তখন হইতেই শান্ত ও শুদ্ধভাবে হরিভক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি অতি সুগায়ক ছিলেন। একত্র অধ্যয়ন হেতু মুকুন্দ ও সঞ্জয়ের সহিত বাল্যকাল হইতেই চৈতন্যের সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল।

শ্রীমান্ পণ্ডিত—নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর শ্রীচৈতন্যের মনের ভাব পরিবর্ত্তনের কথা ইনি বৈষ্ণবসমাজে প্রথমে জানাইয়াছিলেন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—নবদ্বীপবাসী জনৈক ভিক্ষুক। চৈতন্যের জন্মের

বহু পূর্ব্ব হইতে ইনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে আসিয়া অদ্বৈতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। গয়া হইতে আগমনের পর ইহারই গৃহে সর্ব্ব প্রথমে চৈতন্যদেব আপন মনের পরিবর্ত্তিত ভাব বন্ধুদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন ও কোন সময়ে ইহার ভিক্ষার ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া খাইয়াছিলেন; এবং অপর সময়ে ইহার পাক করা অন্ন চাহিয়া খাইয়াছিলেন।

বনমালী আচার্য্য—নবদ্বীপস্থ জনৈক ব্রাহ্মণ। কোন সময়ে রাজকীয় আদেশে ইহার বাটী কাটিয়া উঠাইয়া দিবার ও স্ত্রীলোকদিগকে অসম্ভ্রম করিবার মন্ত্র প্রচার হয়। ব্রাহ্মণ রাত্রিযোগে সপরিবারে পলায়ন করিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু ঘাটে খেয়ার নৌকা না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া বেড়াতেছিলেন; কথিত আছে যে এমন সময় স্বয়ং ভগবান্ খেয়ারীর রূপ ধরিয়া একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গী করিয়া ইহাকে পার করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সকল লোক ব্যতীত নবদ্বীপে আরও অনেক লোকের সহিত চৈতন্যের বহুতর সম্পর্ক ছিল। এস্থানে তাঁহাদের নাম মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে চৈতন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খান নামে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে তাঁহার টোল ছিল এবং বুদ্ধিমন্ত তাঁহার একরূপ মুরুব্বি ছিলেন। চৈতন্যের দ্বিতীয় বিবাহের সমস্ত ব্যয় বুদ্ধিমন্ত খান সরবরাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্য চৈতন্যের আত্মীয় ও বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং চৈতন্য ইহাকে পিতৃসম্বোধন করিতেন। কোন সময়ে ইহারই বাটীতে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া বিবিধ সাজ সাজিয়া গীত বাদ্য ও নৃত্য সংযোগে শ্রীচৈতন্য নাট্যাভিনয় করিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্য নামে ব্রাহ্মণের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত গৌরাঙ্গের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। বনমালী আচার্য্য এই বিবাহের ঘটকালী করিয়াছিলেন। সনাতন পণ্ডিত নামে কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় পরিণয় সম্পন্ন হয়। সনাতন রাজপণ্ডিত ছিলেন; কাশীনাথ মিশ্র দ্বিতীয় বিবাহের ঘটক ছিলেন। শ্রীধর নামে এক দরিদ্র ব্যক্তি নবদ্বীপে তরকারী বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; লোকে তাহাকে "খোলা বেচা শ্রীধর" বলিত। বিদ্যামদে মত্ত হইয়া যখন নিমাই পণ্ডিত সকলের সঙ্গেই বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তখনও সময়ে সময়ে তিনি শ্রীধরের ভগ্ন কুটীরে আসিয়া তাহার সহিত পরিহাস করিতেন। শ্রীধরকে তিনি এই বলিয়া ভয় দেখাইতেন

যে, যদি শ্রীধর প্রত্যহ তাঁহাকে থোড় কলা মোচা আদি না দেয়, তবে তাহার যে গুপ্ত সঞ্চিত অর্থ আছে, তাহা সকলকে বলিয়া দিবেন। শ্রীধর একজন অতি সরল প্রকৃতি সাধু পুরুষ ছিলেন। নগর সংকীর্ত্তনান্তে গৌরাঙ্গ ইহার ফুটা লৌহ পাত্রে জল পান করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের বাটীতে মহা প্রকাশের দিন চৈতন্য দেব ইহাকে বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দের বাসস্থান যদিও নবদ্বীপে নহে, তথাচ শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বিবেচনায় এস্থানে তাঁহারও কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। জেলা বীরভূমের অন্তর্গত এক চাকা বীরচন্দ্রপুর নামক গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম হাড়ো ওঝা, দ্বিতীয় নাম মুকুন্দ পণ্ডিত; মাতার নাম পদ্মাবতী দেবী। নিত্যানন্দ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার কিশোর বয়সের সময় তাঁহাদের বাটীতে একজন সন্ন্যাসী অতিথি হইয়াছিল। বালকটীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া অভ্যাগত সন্ন্যাসী কৌশল ক্রমে হাড়ো ওঝাকে সত্যে আবদ্ধ করত বালকটীকে ভিক্ষা করিয়া লইলেন এবং আপনার চেলা করিয়া নানা তীর্থে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দ মথুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং লোক মুখে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ এবং হরিনাম প্রচারের বার্ত্তা পাইয়া নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। নিতাই মহা প্রেমিক, সরল এবং করুণহৃদয় ছিলেন। চৈতন্য ইহাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় মান্য করিতেন। তাঁহাকে পাইয়া শচী দেবী কথঞ্চিৎ বিশ্বরূপের শোক সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন। কথিত আছে যে বিশ্বরূপের অন্তর্ধানের পর তদীয় তেজঃ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল সেজন্য ইনি ও বিশ্বরূপ অভিন্নাত্মক। নবদ্বীপে অবস্থিতি কালে ইনি শ্রীবাসালয়ে থাকিতেন। শ্রীবাসের পত্নী পুত্র জ্ঞানে ইহাকে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া দিতেন। নিত্যানন্দ হরি প্রেমে মগ্ন থাকিয়া বালকের ন্যায় আচরণ করিতেন; কখন গঙ্গায় সাঁতার দিতেন, কখন দিগম্বর হইয়া নৃত্য করিতেন; এবং কখন বন্ধুদিগকে প্রহার করিতেন ও ভোজন কালে সকলের পাতে উচ্ছিষ্ট অন্ন ছড়াইয়া দিতেন। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলে নিত্যানন্দ তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের সহিত নিভৃতে যুক্তি করিয়া ধর্ম্ম প্রচারার্থে তাঁহাকে

াদেশে পাঠাইয়া দিলেন। নিতাই অভিরাম দাস প্রভৃতি পরিকরগণে বেষ্টিত হইয়া প্রথমে পাণিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের আলয়ে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে এঁড়িয়াদহে গদাধর দাস গোস্বামীর ভবন হইয়া খড়দহে গমন করিলেন। খড়দহ গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া নিতাই মনে মনে সেইখানে স্বীয় ভবিষ্যৎ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন এবং তথা হইতে সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখ সুবর্ণবণিকগণকে কৃপা করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে আগমন করিলেন ও সেখানে কিছুদিন অবস্থিতি করতঃ নবদ্বীপে শচীমাতার নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাহার দারপরিগ্রহের ইচ্ছা হইলে বড়গাছীনিবাসী রাজা হরিহোড়ের বংশোদ্ভব কৃষ্ণদাস নামে তদীয় অনেক শিষ্যের চেষ্টায় বড়গাছীর নিকটবর্ত্তী সালিগ্রামের সূর্য্যদাস সরখেলের দুহিতাদ্বয় বসুধা ও জাহ্নবাদেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। সূর্য্যদাস পণ্ডিত একজন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি, গৌড়ের বাদসাহের চাকরী করিয়া বিপুল ধনসম্পত্তি উপার্জ্জন ও সরখেল উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা চারি সহোদর সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সেই হইতে নিত্যানন্দ শিষ্যবর্গের মধ্যে গণ্য হইলেন। নিত্যানন্দ ইহার পর পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে কিছুদিন নদীয়ায় অবস্থিতি করতঃ খড়দহে বাস করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে বলরামের ও লক্ষ্মণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন।

নবদ্বীপস্থ বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে যবন হরিদাস একজন অতি উচ্চ-অঙ্গের সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত অতি বিস্ময়জনক ও অলৌকিক; সে জন্য এখানে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা যাইতেছে। চৈতন্য জন্মিবার অনেক পূর্ব্বে একদিন অদ্বৈতাচার্য্য গীতা ভাগবতের ব্যাখ্যায় নিমগ্ন আছেন, শিষ্যগণ কেহ বা শুনিতেছেন, কেহ বা ভাবাবেশে সংকীর্ত্তন করিতেছেন, এবং কেহ কেহ বা প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে তাঁহারা দেখিলেন যে শ্মশ্রুধারী এক সুদীর্ঘ যুবা হরিনাম গান করিতে করিতে, পুলকাশ্রু প্রেমে গদ গদ হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গলায় ও হস্তে হরিনামের মালা, সর্ব্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত, নয়নে দর দরিত ধারা বহিতেছে, এবং মুখশ্রীতে যেন চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মনে হইল স্বর্গ হইতে যেন কোন দেবতা আসিয়া আবির্ভূত হইলেন; জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, তাঁহার জন্ম

যবন কুলে, নাম হরিদাস, নিবাস বূঢ়ন গ্রামে। তাঁহাকে পাইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নৃত্য করিতে করিতে হরিদাসের মহাভাবের আবেশ হইল; তাহা দেখিয়া অদ্বৈত বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি সাধারণ মনুষ্য নহে। তদবধি তিনি অতিযত্নের সহিত হরিদাসকে নিজালয়ে রাখিয়া দিলেন। শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে তাঁহার জন্য এক গোফা নির্ম্মিত হইল। তিনি সেখানে নামানন্দসুখে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতের গৃহে ভোজন করিতেন এবং সময়ে সময়ে নবদ্বীপে আসিয়া ভক্তমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইতেন। বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে প্রহ্লাদের অবতার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

তাঁহার পূর্ব্ব জীবন অতি কৌতুকজনক ও নানা প্রকার ঘটনাপুঞ্জে পরিপূর্ণ। বূঢ়নগ্রামে কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানবংশে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই শুষ্ক মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার বীতরাগ ও প্রেমভক্তিপূর্ণ বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থা জন্মিয়াছিল। কি প্রকারে ও কাহার সংসর্গে পড়িয়া তাঁহা এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল ও কেই বা তাঁহাকে হরিদাস নাম প্রদান করিল বৈষ্ণবেতিহাসে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র জানা যায় যে, পিতা মাতা তাঁহার হিন্দুয়ানি দৃষ্টে তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। বাটী হইতে বাহির হইয়া হরিদাস কোন নির্জ্জন বেণাবোনের মধ্যে গোফা নির্ম্মাণ করতঃ হরিনাম সাধন আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্র খান্ নামে সেই দেশের এক অত্যাচারী ও পাষণ্ড জমিদার ছিল সে হরিদাসের কঠোর তপস্যার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার উদ্দেশে এক সুন্দরী ও যুবতী বেশ্যাকে রাত্রি যোগে তাঁহার গোফায় প্রেরণ করিল। বেশ্যা যাইয়া হরিদাসকে জানাইল যে, সে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক। হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম না করিয়া কাহার সহিত আলাপ করিতেন না; সুতরাং বেশ্যাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বলিলেন যে, নাম সংখ্যা পূর্ণ হইলেই তিনি তাহার সহিত আলাপ করিবেন। এদিকে নাম জপ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল; তখন সেই বারবনিতা ভগ্নোদ্যম হইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল, ও আপন প্রভুকে সমস্ত অবগত করিল। পাপমতি রামচন্দ্র ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তৎপর দিন রাত্রিতে আবার ঐ বারনারীকে প্রেরণ করিল। সে দিন হরিদা

তাঁহাকে বলিলেন, 'কল্য বড় দুঃখ পাইয়াছ, অদ্য নাম সাঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, অবশ্য তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।' বেশ্যা তচ্ছ্রবণে গোফার দ্বারদেশে বসিয়া হরিনাম কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে আপনিও দুই চারিবার উচ্চারণ করিতে লাগিল। সে দিনও নামসমাপ্তি হইবার পূর্ব্বেই নিশাবসান হইয়া গেল। তৃতীয়রাত্রিতে বেশ্যা আসিলে ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, 'এক মাসে এককোটি হরিনাম জপ করিবার ব্রত লইয়াছি, মনে করিয়াছিলাম কল্যই নাম শেষ হইবে, তাহা হইয়া উঠে নাই ; আজ নিশ্চয় সাঙ্গ হইবে; তখন স্বচ্ছন্দে তোমার সহিত আলাপ করিতে পারিব।' বেশ্যা পূর্ব্ববৎ দ্বারদেশে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল ও আপনিও মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম ভাবে নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। সাধু সঙ্গের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! এইরূপ করিতে করিতে বেশ্যার মন পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তখন সে আপনার কুৎসিত পাপাচরণ স্মরণ করিয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং হরিদাসের চরণতলে কাঁদিয়া পড়িয়া রামচন্দ্র খানের চরিত্র আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল। হরিদাস বলিলেন "তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি এবং এদেশ পরিত্যাগ করিয়াও যাইতাম, কেবল তোমার জন্য এই তিন দিন এখানে রহিয়াছি।" তখন সেই বেশ্যা নিজ পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর হরিদাস তাহাকে বলিলেন যে, 'তোমার যথাসর্ব্বস্ব দীনদরিদ্র ও ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়া এই গোফার মধ্যে থাকিয়া একাগ্রচিত্তে হরিনাম সাধন কর, অবশ্য মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।' বেশ্যা তাহাই করিল এবং মস্তক মুণ্ডন করতঃ একবস্ত্রা হইয়া নামসাধন করিতে আরম্ভ করিল। ঈশ্বর কৃপায় অচিরাৎ সে রিপুদমনে সমর্থা হইয়া পরম বৈষ্ণবী হইয়া উঠিল।

হরিদাস সেখান হইতে চাঁদপুর গ্রামে বলরামাচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। বলরাম সপ্তগ্রামের পুণ্যশীল জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের পুরোহিত ছিলেন। তিনি হরিদাসের সৌম্যমূর্ত্তি ও ভক্তিভাব দেখিয়া তাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিলেন। এইখানে হিরণ্যের পুত্র বালক রঘুনাথ দাস হরিদাসের দর্শন পান ও এই সাধুসঙ্গগুণে ভবিষ্যতে হরিভক্তি পাইয়া উদ্ধার হইয়া যান। এইস্থানে অবস্থিতি করার সময় বলরাম একদিন হরিদাসকে জমিদারের সভায় লইয়া গেলেন। হরিদাসের সাধুব্যবহারে ও সুমিষ্ট আলাপে সভাস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত সকলেই

তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইলেন; এবং হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসও তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিলেন। কেবল গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে এক দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি অসাধু ব্যবহার করিয়াছিল। এই ব্যক্তি মজুমদারদিগের ঘরে আরিন্দাগিরি করিত এবং গৌড়ে বাদসাহের দরবারে যাতায়াত করিত। হরিদাস 'নামাভাসে মুক্তি হয়,' এই ব্যাখ্যা করিলে সে ব্যক্তি ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, 'আপনারা এই ভাবুকের কথা শুনিবেন না, কোটি জন্ম ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি হয় না, তাহা কি নামাভাসে হইতে পারে? তাহা যদি হয়, তবে আমার নাক কাটিব।' হরিদাস দার্ঢ্য সহকারে উত্তর করিলেন, 'যদি না হয়, তবে আমার নাক কাটিব।' তচ্ছ্রবণে সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল ও অশেষ প্রকারে গোপাল চক্রবর্ত্তীর নিন্দা করিতে লাগিল। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনও সেই দিন হইতে গোপালকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। সভাসদ্‌গণ গোপাল চক্রবর্ত্তীকে ক্ষমা করিবার জন্য হরিদাসকে অনুরোধ করিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'আপনারা কিছু মনে করিবেন না। এই ব্যক্তির উপর আমার কোন রাগ নাই। এ তর্কনিষ্ঠ; তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ নামের মহিমা কি বুঝিবে?' কথিত আছে যে, কিছুকাল পরে ঐ ব্যক্তির কুষ্ঠ ব্যাধি হইয়াছিল; তাহাতে লোকে মনে করিল যে, ভগবদ্ ভক্তের অপমান করার জন্য, ভগবান্ তাহাকে ঐ দণ্ড দিলেন।

চাঁদপুর হইতে হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানকার ব্রাহ্মণ সজ্জন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, আপামর সাধারণ সকলে তাঁহাকে ভাল বাসিত। কেবল স্থানীয় কাজি তাঁহার হিন্দুর আচার ব্যবহার দৃষ্টে অত্যন্ত বিরক্ত হইল ও তাঁহার প্রতি নানাপ্রকারে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। ঐ গোঁড়া কাজি দেশাধিপতির নিকট তাঁহার নামে এই বলিয়া অভিযোগ আনিল যে, হরিদাস মুসলমান হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ হিন্দুর আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন। দেশাধিপতির সম্মুখে নীত হইলে, হরিদাস অকুতোভয়ে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে অতীব বিরল। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রেরিত পিতরও, দণ্ডভয়ে আপন অভীষ্ট দেবকে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং ক্রুশে হত ধর্ম্মবীর ঈশাও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া একবার আত্মবিচ্যুত হইয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মসিংহ হরিদাস যবনের দণ্ডভয়ে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। বিচারের পূর্ব্বে তাঁহাকে এক কারাগারে রাখা হইল। সেখানে আরও

কতগুলি বন্দী ছিল। ভগবদ্ভক্ত সাধু হরিদাসের আগমনে তাঁহাদের মনে আশ্বাস হইয়াছিল যে, তবে বুঝি তাহাদেরও কারামুক্তির সময় আগত প্রায়। এই ভাবিয়া তাহারা হরিদাসকে বন্দনা করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের নাম করিতে লাগিল। হরিদাস তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন :—

"থাক থাক এখন আছহ যেইরূপে ;
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে।"

তাঁহার ঈদৃশ নিষ্ঠুর আশীর্ব্বাদ শুনিয়া বন্দীগণ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন ভক্ত হরিদাস তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, 'তাঁহাদের এখন যেরূপ ঈশ্বরে মতি হইয়াছে, এইরূপ সমস্ত জীবন যেন থাকে ; তিনি এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, এবং আরও কহিলেন যে, অচিরাৎ তাঁহাদের কারামুক্তি হইবে, কিন্তু তাঁহারা যেন পীড়ন ও অত্যাচার না করিয়া শান্তভাবে জীবন যাপন করেন।"

পরদিন রাজসমক্ষে নীত হইলে যবনাধিপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে ভাই! তোমার এ কি বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে? কত ভাগ্যে দেখ তুমি মুসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ; তোমার কি হিন্দুর আচার ব্যবহার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য? হিন্দু কাফের, হিন্দু ধর্ম্মহীন, আমরা হিন্দুর দর্শনেও আহারাদি করি না ; তুমি কেমন করিয়া এই মহা গৌরবান্বিত বংশমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে চাও? পরম পবিত্র মুসলমান ধর্ম্ম ছাড়িয়া তুমি কাফেরের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করিবে? অতএব আমার অনুরোধ রাখ ; না বুঝিয়া যে পাপ কার্য্য করিয়াছ, কলমা পড়িয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর।"

হরিদাস মায়ামুগ্ধ রাজার কথা শুনিয়া 'অহো বিষ্ণুমায়া!' বলিয়া একটু হাসিলেন এবং বিনীত অথচ নির্ভয়ভাবে উত্তর করিলেন "জাঁহাপনা! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন হিন্দু ও মুসলমানের একই ঈশ্বর কি না? যিনি হিন্দুকে ধর্ম্মজ্ঞান দিয়াছেন, মুসলমানও তাঁহা হইতেই জ্ঞানলাভ করিয়াছে কি না? তাহা যদি হয়, তবে হিন্দু ও যবন কেবল নামভেদে ঈশ্বরকে ডাকিয়া থাকে মাত্র। ধর্ম্মের চরমফল হিন্দুরও যাহা, মুসলমানেরও তাহাই। এক শুদ্ধ অখণ্ড, নিত্যসত্য বস্তু বিশ্বরাজ্য পরিপূর্ণ করিয়া জীবমাত্রেরই হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। সেই প্রভু যাহাকে যেমন বুদ্ধি দিতেছেন, সে সেইরূপ আচরণ করিতেছে। আমার হৃদয়ে লোকরঞ্জন

বসিয়া যেমন মতি দিয়াছেন, আমি সেইরূপ করিতেছি। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ত অনেকে মুসলমান হইতেছেন, কই হিন্দুরা তাহার সম্বন্ধে কি করিতেছে? যে ব্যক্তি আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক মরিবে, তাহাকে মারিয়া কি লাভ?'

এই যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ কথা শুনিয়া যবনপতি সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু পার্শ্বস্থ কাজিগণ তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, যদি হরিদাসের দণ্ড না হয়, তাহা হইলে তাহার দৃষ্টান্তে ও কুমন্ত্রণায় অপরেও মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। তখন যবনাধিপতি হরিদাসকে কলমা পড়িয়া পুনরায় স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিতে, অথবা বিধর্ম্মীর প্রতি সমুচিত রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে; ইহার অন্যতরটী মনোনীত করিতে পারেন বলায়, ধর্ম্মবীর হরিদাস বলিতে লাগিলেন;—

'খণ্ড খণ্ড এই দেহ, যায় যদি প্রাণ;
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।'

তখন নিষ্ঠুর কাজীগণ পরামর্শ করিয়া হরিদাসের প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিল যে, বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া তাঁহার জীবনান্ত করা হউক, এবং আরও বলিল যে, 'যদি তাহাতেও উহার মৃত্যু না হয়, তখন বুঝা যাইবে যে, ও যাহা বলিতেছে তাহা সত্য বটে।' পাইকগণ আদেশ প্রাপ্তি মাত্র বন্ধন করতঃ তাঁহাকে বাজারে বাজারে সাধারণের সম্মুখে নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। কথিত আছে যে, হরিদাস তখন নামানন্দে নিমগ্ন হইয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় শত্রু নির্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন এবং কেবল মধ্যে মধ্যে তাঁহার দণ্ডদাতাদিগের ভীষণ পাপের জন্য খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, "প্রভো! ইহারা জানে না যে কি পাপ করিতেছে।" তাঁহার জন্য সর্ব্ব সাধারণ লোকে হায়! হায়! করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে এবং নানাপ্রকারে নবাবকে শাপ দিতে লাগিল। পরে তিনি ধ্যানযোগে মহাসমাধিতে মগ্ন হইলে যবনগণ মনে করিল যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্তিকা প্রোথিত করিলে তাঁহার সদ্গতি হইবে বিবেচনায়, তাঁহার দেহ নদীতে নিক্ষেপ করা স্থির হইল। কথিত আছে যে, নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঠাকুর হরিদাস ভাসিতে ভাসিতে পুনরায় সেই যবনাধিপতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন যবনরাজ তাঁহাকে মহাপীর জ্ঞান করিয়া অশেষ

প্রকারে তাঁহার স্তুতি বন্দনা করিলেন ও তাঁহার স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাকে যথেচ্ছ গমনের আদেশ দিলেন।

এই প্রকারে ঠাকুর হরিদাস রাহুমুক্ত শশধরের ন্যায় যবনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ গান করিতে করিতে ফুলিয়া নগরে ব্রাহ্মণ সজ্জন মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ফুলিয়াবাসী সকল লোকেই পরম আনন্দ লাভ করিল ও আনন্দ-সূচক হরিধ্বনি করিতে লাগিল। হরিদাসও মহানন্দে তাঁহাদের মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন ও ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন যে "আপনারা আমার জন্য দুঃখিত হইবেন না। আমি অনেক সময় ঈশ্বরনিন্দা শ্রবণ করিয়াছিলাম, সে জন্য প্রভু আমাকে এই শাস্তি দিলেন। ইহাতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত আছি; কারণ কুম্ভীপাক নরকভোগ না করাইয়া তিনি যে আমাকে এত অল্প দণ্ড দিলেন, ইহা তাঁহার অতীব কৃপা বলিতে হইবে"। তদবধি তিনি গঙ্গাতীরে গোফামধ্যে থাকিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর এই গ্রামে এক দিন কোন ভদ্র ব্যক্তির বাটীতে ডঙ্কের নৃত্য হইতেছিল। তৎকালে এক শ্রেণীর লোক সর্ব্বাঙ্গে অহিভূষা ধারণ করিয়া গীত বাদ্যের সংযোগে নৃত্য করিয়া বেড়াইত; তাহার নাম ডঙ্কের নৃত্য। ডঙ্ককে তখন দেবাধিষ্ঠিত বোধে লোকে ভক্তি ও ভয় করিত। হরিদাসও ঐ নৃত্যের স্থলে ছিলেন। কৃষ্ণের কালিয়দহের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত হইতেছিল; হরিদাস শুনিয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে ডঙ্কের গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু যে কারণেই হউক, ডঙ্ক তাঁহাকে কিছু না বলিয়া এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল। তদ্দৃষ্টে এক দুষ্টবুদ্ধি ব্রাহ্মণ যুবক বাহাদুরী দেখাইবার জন্য কৃত্রিম ভাবে নৃত্য করিতে করিতে ঐ ডঙ্কের উপর যাইয়া যখন পড়িল, অমনি ডঙ্ক তাহাকে নির্ঘাৎ প্রহার করিতে লাগিলেন। সে ব্রাহ্মণ বাপ! বাপ! করিয়া পলাইয়া গেল। সকলে জিজ্ঞাসা করিলে, অহিভূষাধারী ডঙ্ক বলিলেন যে, 'ভগবদ্ভক্তকে পরিহাস করিয়া ঐ ব্যক্তি যে কৃত্রিমভাব দেখাইল, সেজন্য উহাকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া দিলাম।'

হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন। দুষ্টবুদ্ধি লোকদিগের তাহা ভাল লাগিত না। তাহারা সাধুভক্তের বিদ্রূপ করিয়া কত কথাই বলিত। কেহ বলিত 'এ পাষণ্ড বেটারা রাজ্য ছারেখারে দিবে, ইহাদের

অন্য দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে। এক্ষণে বিষ্ণুশয়নের সময়; এখন কি উচ্চ ডাক ডাকিতে আছে? হরির নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দেশে দুর্ভিক্ষ পাঠাইয়া দিবেন।' কেহবা বলিত 'আরে ভাই! যদি ধানের দাম কিছু চড়ে, তবে এ বেটাদের ঘাড় ধরিয়া কিলাইয়া দিব'। একদিন হরিনদী গ্রামের এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'ওহে হরিদাস!' বলি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কর কেন? চুপ করিয়া নাম করিলে কি ফল হয় না? কোন্ শাস্ত্রে ডাকিয়া নাম লইতে বলিয়াছে?' হরিদাস বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, 'ঠাকুর! আমি শাস্ত্রতত্ব কিছুই জানি না। তোমরা ব্রাহ্মণ; তোমরা শাস্ত্রমত সকল অবগত আছ। তোমাদের মুখে শুনিয়া আমার যাহা কিছু শিক্ষা।' এই বলিয়া তিনি বলিলেন, "উচ্চ কীর্ত্তন করিলে শতগুণ ফল হয়'। বিপ্র বলিলেন, কেন? হরিদাস বৃহন্নারদীয় পুরাণের প্রহ্লাদোক্ত 'বচন অনুসরণ করিয়া উত্তর করিলেন, "নীরবে যে নাম করে, তাহার কেবল পুণ্য হয়; কিন্তু উচ্চ স্বরে নাম করিলে শ্রোতাদেরও পুণ্য হইয়া থাকে। পরোপকার করার এরূপ ক্ষমতা থাকিতে মানুষের কি পরোপকার করা কর্ত্তব্য নহে? মনে করুন, দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন কেবল আপনাকে পোষণ করে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি সহস্র লোকের ভরণপোষণের ভারবহন করে; বলুন দেখি এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে'? এই কথা শুনিয়া বিপ্র তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল যে "ব্রাহ্মণে শাস্ত্র বুঝে না, এক্ষণে হরিদাস শাস্ত্রকর্ত্তা হইয়াছে। হায়! কালে কতই হইবে, কথিত আছে যে যুগশেষে যে সে বেদোচ্চারণ করিবে, এ যে তাহাই হইল" ইহা বলিয়া—হরিদাসকে বলিল, 'তুই বেটা যাহা ব্যাখ্যা করিলি তাহা যদি সত্য না হয়, তবে তোর নাক কাটিব'। সাধু হরিদাস ঈষৎ হাস্য করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কথিত আছে কিছু দিন পরে বসন্তরোগে এই ব্যক্তির নাক খসিয়া পড়িয়াছিল।

এইস্থান হইতে হরিদাস পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নবদ্বীপে যাইয়া অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবদলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল পরে আচার্য্যের সহিত শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে এত ভক্তি করিতেন যে, পিতৃবাসরে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণের প্রাপ্য শ্রাদ্ধ পাত্র তাঁহাকে ভোজন করিতে দিতেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ইহাতে হরিদাস তাঁহাকে বলিতেন "তুমি কুলীন ব্রাহ্মণ, কুটুম্বসাক্ষাৎ লইয়া গৃহস্থালি করিতেছ; আমি যবন, আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিও না, করিলে তোমার জাতি নষ্ট হইবে।" অদ্বৈত তাহার উত্তর করিতেন "তোমাকে ভোজন করান, বেদপরায়ণ সহস্র ব্রাহ্মণভোজনের ফল হইতেও শ্রেষ্ঠ।"

হরিদাসের সাধন অতি কঠোর ছিল। তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরি-নাম জপ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। এইরূপে ভক্ত হরিদাস হরিনাম-সাগরে নিমগ্ন হইয়া পরমসুখে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তখনও কিন্তু চৈতন্য দেব অবতীর্ণ হন নাই।

হরিদাস ঠাকুর যবনকুলোদ্ভব হইয়াও পরম ভক্ত হইয়াছিলেন; সমস্ত বৈষ্ণবসমাজ এখনও অবনত মস্তকে তাঁহার গুণগান করিতেছে ও চৌষট্টি মহন্তের মধ্যে পরিগণিত করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছে ও ভোগ দিতেছে। বৈষ্ণবেতিহাস লেখকগণ তাঁহার জাতি সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"জাতিকুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে,
জন্মিলেন নীচ কুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে।
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়,
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্ব বেদে কয়।
উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে;
কুলে তার কি করিবে? নরকেতে মজে।
এই সব বেদ বাক্য সাক্ষী দেখাইতে,
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে।
প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য, কপী হনুমান;
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম।"

হরিদাস ও পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের পরজীবনের ইতিহাস চৈতন্য-চরিত বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বিবৃত হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জন্মোৎসব ও বাল্য জীবন।

চৌদ্দশত ছয় শকের মাঘ মাসের শেষে জগন্নাথপত্নী শচী দেবীর গ সঞ্চার হইল। কথিত আছে যে গর্ভাবস্থায় শচী জগন্নাথ আশ্চর্য্য দৃশ্য সক দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতেন। এক দিন জগন্নাথ স্বপ্ন দেখিলেন যেন কো জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার সহধর্ম্মিণী হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। শচী দেবীও দেখিতেন যেন আকাশ মণ্ডলে দিব্য মূর্ত্তি লোক সকল তাঁহার বন্দনা করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয় উভয়ে অনুমান করিতেন, এবারে বুঝি কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ কর বেন। মহাপুরুষদিগের জীবন বৃত্তান্তে এরূপ অলৌকিক ঘটনাপুঞ্জ ভূরি ভূ বিবৃত হইয়াছে। ঈশা, মুসা, মহম্মদ, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সমুদায় মহাপুরুষে সম্বন্ধে কতই অদ্ভুত ঘটনাবলী দেখা যায়। এই সকল ঘটনার মূলে কতটু সত্য আছে, মীমাংসা করা বড় কঠিন। তবে ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, মহাপুরুষগণের পর জীবনের অলোকসামান্য ঘটনার আলোকে বসিয়া তাঁহাদের জীবনেতিহাসলেখকগণ তাঁহাদের চরিত্র যে নানা ব অনুরঞ্জিত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ক্রমে ক্রমে শচীর গর্ভ ত্রয়োদশ মাসে পরিণত হইল, তথাচ সন্তা ভূমিষ্ঠ হইল না। তদ্দর্শনে পিতা মাতার মনে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল যাহা হউক, তাঁহাদিগকে অধিককাল আর সন্দিগ্ধাবস্থায় থাকিতে হইল না ফাল্গুনমাসের পৌর্ণমাসীর সান্ধ্যরজনীতে পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৌরচন্দ্র উদিত হইলেন। দৈবযোগে সেই দিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল; পু বাসীগণ চারিদিকে হরিধ্বনি করিতেছিল, এবং আনন্দ কোলাহলে দিঙ্ম আন্দোলিত হইতেছিল; এই শুভক্ষণে জগন্নাথ মিশ্রের কনিষ্ঠ পু ভূমিষ্ঠ হইল। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, ভাবিজীবনে চৈতন্য প্রভু হরি নাম প্রচার করিবেন বলিয়া, হরিনামের কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে আপ আবির্ভূত হইলেন, এবং নিষ্কলঙ্ক গৌরচন্দ্র কর্ত্তৃক জগতের অজ্ঞান-অন্ধকা বিনষ্ট হইবে, সকলঙ্ক চন্দ্রের আর প্রয়োজন নাই ভাবিয়া রাহু যেন আব

পরিচন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাঁহার লগ্ন গণিয়া সর্ব্ব সুলক্ষণ যুক্ত দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তাঁহার অঙ্গে মহাপুরুষের বত্রিশটী চিহ্ন * দেখিয়া লিলেন যে, এই বালক হইতে পিতৃ মাতৃ উভয় কুলেরই উদ্ধার সাধন হইবে।

বালকের জন্মগ্রহণের পর জগন্নাথগৃহে মহোৎসব আরম্ভ হইল। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলে নানা উপহার লইয়া বালকটিকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। নর্ত্তক, বাদক, ভাটে আঙ্গিনা পরিপূর্ণ হইয়া গেল, এবং চতুর্দ্দিকে নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল হইতে লাগিল। মিশ্র পুরন্দরও যথাসাধ্য দানধ্যান করিয়া সকলের পরিতোষ সাধন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের পত্নী, শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী দেবী, অন্যান্য প্রবীণা পুরনারীগণে পরিবৃতা হইয়া ধান্য দুর্ব্বা গোরচন দিয়া বালকের রক্ষা বিধান করিলেন; নবীনারা হাস্য পরিহাস আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন, এবং অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া দোলারোহণে বালককে দেখিতে আসিলেন। তৎকালে সকলেরই ভূতপ্রেত ডাকিনীতে বিশ্বাস ছিল, তাহাদিগের উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুরন্ধ্রীগণ পরামর্শ করতঃ শিশুর নাম নিমাই রাখিলেন। 'নিমাই' নামের সহিত ভূত প্রেতের কি সম্বন্ধ, তাহার কোন ব্যাখ্যা মহিলাগণ আমাদের জন্য রাখিয়া যান নাই; কিন্তু তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন ঐ নামে ভূতের ভয় থাকিবে না। যাহাহউক, পুরন্ধ্রীগণ কয়েক দিন পর্য্যন্ত শচীগৃহে অবস্থিতি করিয়া পুত্রমাতা মঙ্গলজলে স্নান করিলে, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, চৈতন্যের পরজীবনের ভক্তগণ এই সময়েই যোগবলে তাঁহার অবতারভাবের কথা জানিতে পারিয়া স্ব স্ব রুচি অনুসারে নানা রূপ মহোৎসব করিয়াছিলেন। না পারিবেনই বা কেন? কারণ তাঁহারা সকলেই স্বর্গের দেবতা, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কলিযুগের যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও চৈতন্যচন্দ্রের লীলার সাহায্য করিবার জন্য মানব রূপে অবতীর্ণ

---

* পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব পৃথু গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্।

সামুদ্রিক।

হইয়াছিলেন। এইরূপে অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি সকলেই গ্রহণের উপলক্ষ করিয়া নানা দানধ্যান ও নামকীর্ত্তন করিয়া গৌরচন্দ্রের জন্মমহোৎসব করিয়াছিলেন। এই বর্ণনায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিশেষ লিপিচাতুর্য্য দেখা যায়। কারণ দেশের প্রথানুসারে সকলে গ্রহণের সময় যথাসাধ্য দানাদি ও হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকে। চৈতন্য ভক্তগণ এই ঘটনাকে চৈতন্যের অবতারত্বস্থাপন জন্য অনুকূল ব্যাখ্যা করিয়া লইয়া বিলক্ষণ ভাবুকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। নচেৎ ইহার মূলে যে কোন সত্য আছে, তাহা অনুমান করা যায় না। কারণ, যদি অদ্বৈতাদি ভাবিভক্তগণ এই সময় হইতেই অবতারের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইলে গয়াগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা নিমাই পণ্ডিতকে কেন সেরূপ চক্ষে দেখিতে পান নাই, তাহা বুঝা যায় না।

জনক জননীর হৃদয়ানন্দের সঙ্গে সঙ্গে শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বালকচন্দ্র দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অঙ্গকান্তির গৌরত্ব নিবন্ধন স্ত্রীগণ শিশুটীকে গৌরাঙ্গ ও কখন গৌরচন্দ্র বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; আর তাঁহারা হাত তালি দিয়া হরিধ্বনি করিলে বালক হাসিত এবং ক্রন্দন আরম্ভ করিলে হরিনাম শুনিতে পাইলে শিশুর ক্রন্দন থামিত, এজন্য মহিলাগণ গৌরহরি নামেও অভিহিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে এক দিন জনক জননী গৃহমধ্যে লঘুপদচিহ্ন সকল অঙ্কিত রহিয়াছে এবং তাহাতে ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র ও মীন চিহ্ন শোভা পাইতেছে দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। মিশ্র একজন বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন; তিনি অনুমান করিলেন যে, ঘরে বালগোপাল দেববিগ্রহ রহিয়াছেন; বোধ হয় তিনিই ক্রীড়াচ্ছলে ঐরূপ পদচিহ্ন ফেলিয়া থাকিবেন। এই সময়ে শচী দেবী পুত্রকে স্তন পান করাইতেছিলেন। তিনি পুত্রের পদতলে হঠাৎ ঐ সকল চিহ্ন দেখিয়া অবাক্ হইলেন এবং জগন্নাথকে তাহা দেখাইলে তিনি নীলাম্বরকে ডাকিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জ্যোতির্বিদ্যায় বড় পারদর্শী ছিলেন; তিনি গণিয়া বলিলেন যে, নারায়ণের পদচিহ্নে চিহ্নিত এই পুত্র হইতে জগৎ উদ্ধার হইবে। এই বলিয়া শুভদিন দেখিয়া তিনি যথা বিধি বালকের নামকরণ করিলেন, এবং 'বিশ্বম্ভর' এই নাম রাখিলেন।

ক্রমে ক্রমে শচীনন্দন জানুচক্রমণ ও পদচক্রমণ করিতে শিখিলেন। এই সময়ে একদিন শচীদেবী খই ও সন্দেশে বাটী পূর্ণ করিয়া বালক

খাইতে দিয়া আপনি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন; কিন্তু বালক খাদ্য-দ্রব্য ফেলাইয়া দিয়া মৃত্তিকা খাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে শচী তাহা দেখিতে পাইয়া বালকের হস্ত হইতে মৃত্তিকা কাড়িয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! মাটী খাইতেছ কেন?" বালক যাহা উত্তর করিল, তাহা শুনিয়া শচী অবাক্ হইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন—'মা! বিবেচনা করিয়া দেখ সকলই মাটীর বিকার মাত্র; খই, সন্দেশ, অন্নাদি যত কিছু আহারীয় দ্রব্য সকলই মৃত্তিকার অবয়বান্তর। তবে মাটী খাইতেছি বলিয়া কেন ক্ষুণ্ণ হইতেছ?" শচী আক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'এ জ্ঞান-যোগ তোরে কে শিখাইল? মাটীর বিকার অন্নাদি খাইলে শরীর পুষ্টি হয়, কিন্তু মাটী খাইলে রোগ জন্মে, শেষে শরীর নষ্ট হয়; আবার দেখ মৃত্তিকা বিকৃত হইলে যে ঘট উৎপন্ন হয়, তাহাতে কত জল রাখা যায়; কিন্তু শুধু মৃত্তিকায় জল দিলে কর্দ্দম উৎপন্ন হয়।' তখন শচীকুমার বলিলেন, 'মা! আগে কেন একথা আমাকে শিখাইয়া দাও নাই; তাহা হইলে তো আর মাটী খাইতাম না।'

একদিন এক তৈর্থিকব্রাহ্মণ জগন্নাথগৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি বালগোপালমন্ত্রে নাকি দীক্ষিত ছিলেন; পাক সমাপ্ত করিয়া যাই স্বাভীষ্টদেবে নিবেদন করিলেন, অমনি দুর্দ্দান্ত নিমাই কোথা হইতে আসিয়া স্তূপীকৃত অন্নের একগ্রাস খাইয়া ফেলিল। জগন্নাথ ও শচী দূর হইতে দেখিতে পাইয়া হায়! হায়! করতঃ দৌড়িয়া যাইয়া বালককে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দ্বিতীয় বার পাক করিতে সম্মত করিলেন। এদিকে বালককে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। সেবারেও অন্ন প্রস্তুত হইলে ঠিক সেইরূপ হইল; কোন প্রকারে কেহ বালককে নিবারণ করিতে পারেন নাই। কথিত আছে যে তৃতীয়বার পাক সমাপ্ত হইলে গৌরাঙ্গ প্রভু যোগনিদ্রায় পিতা মাতা প্রভৃতি সকলকে মুগ্ধ করিয়া গোপাল বেশে ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন।

কোন সময়ে নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া বালক বিশ্বম্ভর একাকী গঙ্গা-তীরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। দুই জন চোর বালকের গাত্রালঙ্কার অপ-হরণের বাসনায় তাঁহাকে মিঠাই সন্দেশ দিবার ও শীঘ্র বাটীতে পৌছাইয়া দিবার প্রলোভন দেখাইয়া ভুলাইয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বৈষ্ণ-

বাচার্য্যগণ এখানে এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, লোক দুইজন বিষ্ণু-মায়ার মুগ্ধ হইয়া আপনাদের গন্তব্যপথ হারা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতেই আসিয়া উপনীত হইয়াছিল এবং বহির্ব্বাটীতে বালককে নামাইয়া দিয়া আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পলায়ন পরায়ণ হইয়াছিল।

জগদীশ ভাগবত ও হিরণ্য পণ্ডিত নামে জগন্নাথের দুইজন আত্মীয় প্রতিবেশী ছিলেন। একাদশী দিনে তাঁহারা নানা প্রকার দ্রব্যসম্ভার আনয়ন করতঃ কৃষ্ণপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া আসিয়া নিমাই ব্যাধিছলনা করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন যে, পূজার অগ্রে ঐ সব নৈবেদ্য তাঁহাকে খাইতে না দিলে তাঁহার ব্যাধি আরোগ্য হইবে না। বালকের রোদনে বাটীর সকলে এত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে, ঐ কথা প্রতিবেশীদ্বয়কে জানাইতে বাধ্য হইলেন। সরলমতি প্রতিবেশী দুইজন অগত্যা দেবতার অগ্রেই বালককে নৈবেদ্য দিয়া শান্ত করিলেন।

কথিত আছে এই সময়ে বালক নিমাই অতিশয় দুষ্ট স্বভাব ও উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন; পাড়ার বালকগণের অগ্রণী হইয়া, দলবদ্ধ হইয়া, তিনি নানা প্রকারে দৌরাত্ম্য করিতেন; কখন পাড়াপড়সীর ঘরের দ্রব্য চুরি করিয়া লইতেন, কখন দলের মধ্যে অবাধ্য বালককে প্রহার করিতেন, কখন ভাগীরথীতীরস্থ সৈকতভূমিতে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে এক পদে দাঁড়াইয়া মার্কণ্ড খেলা খেলিতেন, কখন দলে দলে জল মধ্যে পড়িয়া সন্তরণ দিতেন ও অপর লোকের স্নানাহ্নিকে অশেষ প্রকারে বাধা দিতেন। শচী জগন্নাথ সর্ব্বদাই তাঁহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত রূপ নানা অভিযোগ শুনিতে পাইতেন।

"শুন শুন ওহে মিশ্র পরম বান্ধব!
তোমার পুত্রের অপন্যায় শুন সব।
ভালমতে না পারি করিতে গঙ্গাস্নান;
কেহ বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান।
আরও বলে "কারে ধ্যান কর এই দেখ!
কলিযুগে মুঞি নারায়ণ পরতেক।"
কেহ বলে মোর শিবলিঙ্গ করে চুরি;
কেহ বলে, মোর লয়ে পলায় উত্তরী।

"কেহ বলে পুষ্প দূর্ব্বা নৈবেদ্য চন্দন
বিষ্ণু পুজিবার সজ্জা বিষ্ণুর আসন;
আমি করি স্নান এথা বৈসে সে আসনে;
সব খাই পড়ি তবে করে পলায়নে।
কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া,
ডুব দিয়া লয়ে যায় চরণে ধরিয়া।
কেহ বলে আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহ বলে আমার চোরায় গীথ পুঁথি।
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার,
কাণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার।
কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কাঁদে চড়ে,
"মুঞিরে মহেশ" বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে।
স্নান করি উঠিলেই বালি দেয় অঙ্গে,
যতেক চপল শিশু সব তার সঙ্গে।
স্ত্রীবাসে পুরুষ বাস করয়ে বদল,
পরিবার বেলা সবে লজ্জায় বিকল।
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে,
দেহ বা তাহার ভাল থাকিবে কি মতে?"

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিশ্বম্ভর পাড়ার বালকের দলপতি হইয়া গঙ্গার ঘাটে স্নানোপলক্ষে যাইয়া অশেষবিধ দৌরাত্ম্য করিতেন। এই সময়ে গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা ফুলের সাজী হাতে লইয়া ও নৈবেদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভাগীরথীজলে শিবপূজা ও ব্রতার্চ্চনা জন্য গমন করিত। কন্যাগণ ঘাটের ধারে সারি সারি বসিয়া মৃত্তিকা দ্বারা মহাদেব নির্ম্মাণ করতঃ পুষ্প চন্দন ও নৈবেদ্য দিয়া পূজা করিবেন; কোথা হইতে দুরন্ত নিমাই আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে বসিতেন, ও বলিতেন যে 'আমার পূজা কর, আমি তোমাদের উত্তম উত্তম বর দিব; তোমরা জান না গঙ্গা, দুর্গা ও মহাদেব সকলেই আমার আজ্ঞাকারী ভৃত্য।' এই বলিয়া চন্দনের বাটী হইতে চন্দন লইয়া আপন কপালে দিতেন, ফুলের মালা লইয়া গলায় পরিতেন, এবং আল চাল, কলা, সন্দেশ ও উপকরণাদি লইয়া ভোজন করিতেন। যদি কন্যাগণ বলিত 'ছি নিমাই! তুমি আমাদের গ্রামসম্পর্কে ভাই হও,

আমাদের সহিত এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিও না।' তাহাতে বিশ্বম্ভর মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর করিতেন, 'আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের এই বর দিতেছি যে, তোমাদের পরমসুন্দর, যুবা, রসিক ও ধনবান্ স্বামী হইবে এবং এক একজন সাত সাতটী পুত্র সন্তান প্রসব করিবে।' যদি কোন কন্যা তাঁহার অন্যায় লুণ্ঠন হইতে আপন নৈবেদ্য রক্ষা করিয়া পলায়ন করিত, তবে তাহার উপর বিশ্বম্ভরের ক্রোধের সীমা থাকিত না; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে অভিসম্পাত করিতেন "তাহার বুড়া ভর্ত্তার সহিত বিবাহ হইবে, ও অধিক দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সাতটী সপত্নীর উপর পড়িবে।" অতিদার্ঢ্যতা সহকারে এই সকল উক্তি করাতে কন্যাগণ মনে করিত 'বুঝিবা ইহার কথা সত্য হইবে; হয় তো এ ছোঁড়া কি দৈববল পাইয়াছে; নতুবা এমন কথা কেন বলিবে।' এই বিবেচনায় কন্যাগণ বিশ্বম্ভরকে সন্তুষ্ট না করিয়া কোন ব্রতানুষ্ঠান করিত না। নিমাইর দুর্ব্যবহারে বালিকাগণ উত্ত্যক্ত হইয়া সময়ে সময়ে শচীমাতার নিকটে যাইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিত :—

"কোপ মনে সকলেতে বলেন বচন;
শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করণ।
বসন করয়ে চুরি, বলে অতি মন্দ,
উত্তর করিলে জল দেয়, করে দ্বন্দ্ব।
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল;
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল।
অলক্ষ্যেতে আসি কর্ণে বলে বড় বোল;
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল।
ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে;
কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।
প্রতি দিন এই মত করে ব্যবহার;
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার?
পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার;
সেইমত তোমার পুত্রের ব্যবহার।
দুঃখে মোর বাপেরে বলিব যেই দিনে;
ততক্ষণে কোন্দল হইবে তোমা সনে।

'নিবারণ কর বাঁট আপন ছাওয়াল ;
নদীয়ায় হেন কর্ম নহিবেক ভাল।'

বিশ্বম্ভরের অশেষ দৌরাত্ম্যের কথা শুনিতে শুনিতে পিতা মাতা ত্যিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন শচীমাতা বালককে প্রহার করিবার মানসে ধরিতে গেলেন; বালক লাফাইয়া নিকটস্থ উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে পরিত্যক্ত হাঁড়ির উপরে যাইয়া বসিয়া থাকিল; শচী বলিলেন, "অশুচি স্পর্শে তুমি অশুচি হইয়াছ; গঙ্গাস্নান না করিয়া আসিলে গৃহে প্রবেশ করিতে পাইবে না।' তচ্ছ্রবণে বালক উত্তর করিল "ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কোন স্থানই অস্পৃশ্য হইতে পারে না; ব্রহ্মের বর্ত্তমানতায় সকল স্থানই মহাতীর্থময়!" পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মুখে এই তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া পিতা মাতা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং বহুযত্নে শিশুকে শান্ত করিয়া গৃহে লইলেন।

এই সময়ে শুভদিন দেখিয়া জগন্নাথ বিশ্বম্ভরের বিদ্যারম্ভ করিয়া দিলেন। অতিঅল্প দিনেই বালক বর্ণ পরিচয়, ফলা, বানান শিক্ষা করিয়া দিন দিন জ্ঞান পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পৌগণ্ডলীলা ও বিদ্যাবিলাস.

কিছু দিন পরে জগন্নাথ মিশ্র আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিশ্বম্ভরের কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ করিলেন। এদিকে গৌরচন্দ্র দিন দিন বিদ্যা ও জ্ঞান পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ও সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়সকল পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বালচাঞ্চল্য ও দৌরাত্ম্যবুদ্ধির তিরোধান হওয়া দূরে থাকুক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃদ্ধবয়সের সন্তান বলিয়া পিতা মাতা বড় একটা শাসন করিতেন না, অথবা করিলেও বালক তাহা শুনিত না; তবে অগ্রজ বিশ্বরূপকে বড় ভয় করিতেন। পিতা মাতার সম্মুখে বা

অন্যপাড়া প্রতিবাসীর বাটীতে তিনি দৌরাত্ম্য করিতেছেন, এমন সময় যদি বিশ্বরূপ সেখানে যাইতেন, বা কেহ তাঁর আগমনের কথা বলিত, অমনি সেস্থান হইতে পলাইয়া যাইতেন।

একদিন মিশ্রবর জাহ্নবীজলে বিশ্বম্ভর দৌরাত্ম্য করিতেছেন শুনিতে পাইয়া ক্রোধভরে হাতে যষ্টি লইয়া শাসন করিতে চলিলেন। দূর হইতে চতুরচূড়ামণি নিমাই তাঁহাকে দেখিয়া বালকগণের কাণে কাণে, তিনি স্নানে আইসেন নাই, এই কথা পিতার সমক্ষে বলিতে বলিয়া অন্যপথ দিয়া পলায়ন করিলেন। জগন্নাথ বালকগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা পূর্ব্বশিক্ষিত মতে উত্তর করিল, 'কই আজ তো নিমাই স্নানে আইসে নাই! এই দেখুন, আমরা সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।' ইহা শুনিয়া মিশ্র আরও কোপাবিষ্ট হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে এদিক ওদিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; এবং কোথাও পুত্রের দেখা না পাইয়া বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে যাঁহারা তাঁহার নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, 'ভয় পাইয়া নিমাই পলায়ন করিয়াছে; আপনি আজ যান, আর যদি চঞ্চলতা করে, তবে আমরা তাহাকে ধরিয়া দিব।' মিশ্র অগত্যা বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মিশ্র দেখিলেন, অন্যান্য দিনের ন্যায় বিশ্বম্ভর হস্তে লিখনসামগ্রী লইয়া পাঠশালা হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ও স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া জননীর নিকট তৈল চাহিতেছেন; তাঁহার অঙ্গে কালির বিন্দু সকল শোভা পাইতেছে, স্থানে স্থানে ধূলা লাগিয়াছে, পূর্ব্বপরিধেয় বস্ত্র সেইরূপ রহিয়াছে এবং শরীরে স্নানচিহ্নমাত্র নাই। পিতা পুত্রকে স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন, "বিশ্বম্ভর দেখ তোমার নামে প্রতিবাসীগণ কত দৌরাত্ম্যের কথা বলে; কেন তুমি লোকের প্রতি ওরূপ দুর্ব্যবহার কর? আর কেনই বা দেবতাপূজার দ্রব্যাদি অপহরণ কর? দেবতা বলিয়া কি তোমার ভয় নাই?"

পুত্র উত্তর করিলেন, 'আমি তো আজ স্নানে যাই নাই; আমার সঙ্গী বালকগণ আগে গিয়া লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছে। আমি না গেলেও যদি আমার নাম হয়, তবে আমি সত্য সত্যই অনাচার করিব। বিষ্ণু জানেন আমার ইহাতে দোষ নাই।'

ইহা আড়ালে 'ছেলের খেলের কথা। সঙ্গীবালকগণ ও দুর্জ্জনও

তাঁহার চতুরতার প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল ;—'নিমাই আজ ভাল চতুরতা খেলিয়া মার খাওয়া এড়াইল।'

এই সময়ে পরিবার মধ্যে এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। সুখের সংসারে দুঃখের ছায়া পড়িল; কাল মেঘে সূর্য্যালোক আচ্ছন্ন করিল। জগন্নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ পরিণয়ের কথা শুনিয়া গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন ও সন্ন্যাস-গ্রহণের স্থূল বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই নিদারুণ ঘটনায় পিতা মাতা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন ; বিশ্বম্ভরও ভ্রাতৃবিরহে অনেক ক্রন্দন করিলেন। কথিত আছে যে, তিনি বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথা শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবগণও বিশ্বরূপের বিরহে অনেক বিলাপ ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রতিবাসী আত্মীয়গণ নানাপ্রকারে শচী জগন্নাথকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন "যে কুলে একটী পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে গোষ্ঠির সকলেই উদ্ধার হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে ; তাহাতে খেদ করা উচিত নহে। বিশেষতঃ বিশ্বম্ভরের ন্যায় যাহার পুত্র বিদ্যমান্, তাহার দুঃখের বিষয় কি ?" এই ঘটনা বিশ্বম্ভরের চরিত্রেও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। ভ্রাতার সন্ন্যাসের পর নিমাইকে আর কেহ পূর্ব্বের ন্যায় চঞ্চল দেখিতে পাইত না। তিনি সর্ব্বপ্রকার বালচাপল্য ও ক্রীড়াদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধীর ও শান্তভাবে সর্ব্বদা পিতা মাতাকে সান্ত্বনা করিতেন ও তাঁহাদের সেবা সুশ্রূষায় তৎপর থাকিতেন।

এক দিন গৌরচন্দ্র বিষ্ণুনৈবেদ্যের তাম্বুল চর্ব্বন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পিতামাতা আস্তে ব্যস্তে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে এক অদ্ভুত কাহিনী বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "বিশ্বরূপ আসিয়া যেন আমাকে কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম যে, আমার পিতামাতা অনাথ, বিশেষতঃ আমি বালক, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিব না ; গৃহস্থ থাকিয়া পিতামাতার সেবা করিব। তখন বিশ্বরূপ আমাকে ছাড়িয়া দিলেন।" আর এক দিন মাতাকে একাদশী তিথিতে অন্নভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

মানুষের চিরদিন কখন সমান যায় না, সুখের পর দুঃখ দুঃখের পর

সুখ, জগতের নিয়ম। অল্পে অল্পে শচী জগন্নাথের পুত্রবিরহশোক মন্দীভূত হইয়া আসিল। এ দিকে বিশ্বম্ভরও অধিক মনোযোগের সহিত অধ্যয়নাদি করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি এত সুতীক্ষ্ণ ছিল যে, একবার যে সূত্র পড়িতেন বা ব্যাখ্যা শুনিতেন, তাহা কখনও ভুলিতেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার আশ্চর্য্য জ্ঞানোপার্জ্জনের ক্ষমতা ও মেধা-শক্তির কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রতিবাসীগণ সকলেই একবাক্যে পিতা মাতার নিকট গৌরের অদ্ভুত বুদ্ধি শক্তির প্রশংসা করিতেন।

প্রশংসাবাদ শ্রবণে জননীর মনে আনন্দ ধরিত না। কোন্ জননীর তাহা না হয়? কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র ইহা শুনিয়া অতি ভীত ও শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মনে এই ভয় হইল যে, বিশ্বরূপ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বম্ভরও কি তাই করিবে? এই মনোভাব তিনি একদিন সহধর্ম্মিণীকে জানাইলেন।

জগন্নাথ বলিলেন, 'শাস্ত্রজ্ঞান মানুষের চক্ষু খুলিয়া দেয়; এ সংসার অনিত্য, এখানকার সকলই ছায়াবাজীর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, এক ঈশ্বরই সত্য বস্তু, শাস্ত্রপাঠে ইহা সুস্পষ্ট জানা যায়। বিশ্বরূপ এই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বম্ভরও শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে চলিল, আমার ভয় হয় সেও পাছে সংসারের অনিত্যতা বুঝিলে আমাদের ফেলিয়া চলিয়া যায়। এই পুত্র আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব। এ চলিয়া গেলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। সেজন্য আমি বলি নিমাইয়ের আর অধ্যয়নে কাজ নাই, মূর্খ হইয়া সে আমার ঘরে থাকুক।'

শচীদেবী স্বামী অপেক্ষা অনেক উদারভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন,—'মূর্খ হয়ে পুত্র বেঁচে থাকা অপেক্ষা, না থাকা ভাল। মূর্খ পুত্রকে কে মেয়ে দিবে?'

অবশেষে পিতার মতই প্রবল হইল। জগন্নাথ বিশ্বম্ভরকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, সেই দিন হইতে তাঁহার পাঠ বন্ধ, তিনি আর পড়িতে পাইবেন না। গৌরচন্দ্র নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত পড়া বন্ধ করিলেন। পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু পাঠবন্ধ করায় হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল। নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকায় জন্য নিমাইয়ের দুর্ম্মতি আবার স্কন্ধে চাপিল। আবার তিনি অশেষ দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ

করিলেন; এবার কিছু দুষ্টামির মাত্রাও বাড়াইয়া দিলেন। সম্মুখে যাহা দেখিতেন, চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন; পূর্ব্বে কেবল দিবাভাগে ক্রীড়াদি করিতেন, এখন রাত্রিতেও আর বাটীতে থাকিতেন না। পাড়ার দুষ্ট বালক জুটাইয়া কত রকমের নূতন নূতন খেলা খেলিতে লাগিলেন। দুইটী বালক একত্রিত হইয়া কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া বৃষের ন্যায় হইত ও অন্ধকার রাত্রে লোকের কদলী বাগানে বা কাহারও বাড়ীতে যাইয়া গাছ-পালা ভাঙ্গিত। গৃহস্বামী গরু বিবেচনায় লগুড় হস্তে তাড়াইতে আসিলেই বালকদ্বয় খিল খিল করিয়া হাসিয়া পলায়ন করিত। আবার গৃহস্থ ঘরে কপাট দিয়া শয়ন করিয়া আছে, কোন বালক বাহির দিক্ দিয়া শৃঙ্খল টানিয়া বাঁধিয়া দিয়া চলিয়া আসিত; তাহাদের শৌচ প্রস্রাব করা দায় হইত। একদিন জগন্নাথ কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছেন, নিমাই পাড়ার বালকগণে পরিবৃত হইয়া খেলিতে খেলিতে বাটীর নিকটস্থ গর্ত্ত মধ্যে উচ্ছিষ্ট হাণ্ডীর উপর যাইয়া বসিলেন ও কালী লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন। জননী এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া সেখানে যাইয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'উচ্ছিষ্ট হাণ্ডীস্পর্শে মানুষ যে অশুচি হয়, এ জ্ঞানও কি তোমার এতদিনে জন্মিল না?' গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন :—

"যে ব্যক্তি মূর্খ, সে ভদ্রাভদ্র ও শুদ্ধাশুদ্ধ কিরূপে জানিবে? আমাকে তো তোমরা পড়িতে দিলে না, আমি কেমন করিয়া এ সব জ্ঞান লাভ করিব?"

শচী তাঁহাকে স্নান করিয়া শুচি হইতে বলিলে বিশ্বম্ভর নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিলেন 'যদি তোমরা আমাকে পড়িতে না দাও, আমি নিশ্চয় বলিতেছি আর গৃহে যাইব না।'

ইহা শুনিয়া প্রতিবাসীগণ সকলেই শচী জগন্নাথকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "লোকে কত যত্ন করিয়া আপন পুত্রকে পড়ায়, আর এ বালক পড়িবার জন্য কত যত্নবান্। ছেলে মূর্খ করিতে আপনাদের এমন কুবুদ্ধি কে দিয়াছে? বালকের তো কিছুমাত্র দোষ দিতে পারি না।"

তখন সকলে গৌরাঙ্গকে সান্ত্বনা করিয়া স্নান করাইলেন এবং জগন্নাথ আসিলে সকলে অনুরোধ করিয়া ও বুঝাইয়া পুনরায় বালকের পাঠারম্ভ করাইয়া দিলেন। নিমাই মহা উৎসাহ সহকারে পুনর্ব্বার অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে উপনয়নের বয়স নিরীক্ষণ করিয়া মিশ্র মহাশয় শুভদিন দেখিয়া বালকের যজ্ঞোপবীত দিলেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার গৃহে একটী মহোৎসব হইল। গৌরের চূড়াকরণের সময় হইতেই আর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কোন কথা শুনা যায় না। বোধ হয়, তৎপূর্ব্বেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকিবে। যাহা হউক উপনয়নের পর বিশ্বম্ভরের অধ্যয়ন ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি ঘরে বসিয়া পড়িতেন, এক্ষণে গোষ্ঠি মধ্যে যাইয়া পড়িতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নবদ্বীপের গঙ্গাদাস পণ্ডিত একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ ছিলেন। তাঁহার টোলে অনেক শিষ্য পড়িত। শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ টোলে পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মিশ্র মহাশয় পুত্র সঙ্গে পণ্ডিতজীর নিকটে গমন করিলেন ও পুত্রকে টোলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই গঙ্গাদাস নিমাইয়ের আশ্চর্য্য মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং সকল শিষ্যের শ্রেষ্ঠ করিয়া দিলেন। বালকেরা কেহই তাঁহার সঙ্গে ফাঁকিতে আঁটিতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে গৌরচন্দ্র সকল শিষ্যের চালক হইয়া উঠিলেন। এই টোলে তাঁহার ভাবিধর্ম্মবন্ধু মুরারিগুপ্ত, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুকুন্দ, সঞ্জয় প্রভৃতি পড়িতেন। তাঁহাদের সঙ্গে গৌরাঙ্গের এইখান হইতেই বন্ধুত্ব জন্মে। তখন নবদ্বীপে এই নিয়ম ছিল যে, পাঠান্তে টোলের পড়ুয়াগণ দল বাঁধিয়া স্নান করিতে যাইত এবং গঙ্গার ঘাটে যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন টোলের ছাত্রদের মধ্যে পরস্পর তর্ক বিতর্ক চলিত। গৌরাঙ্গ-প্রমুখ গঙ্গাদাসের ছাত্রগণকে আর কোন টোলের ছাত্রেরা বিচারে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। নিমাই এক ফাঁকির বিবিধরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকলকে ঠকাইয়া দিতেন। প্রথমে একরূপ অর্থ করিয়া বুঝাইয়া, আবার সেই অর্থ খণ্ডন করত অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতেন। ইহাতে বিপক্ষ বালকেরা বড়ই অপমানিত হইত। দুষ্ট নিমাই ইহা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না; নানারূপ ব্যঙ্গোক্তির দ্বারা তাহাদিগের সহিত কলহ করিতেন; তাহাদের গায়ে বালি জল দিতেন ও বিবিধ প্রকারে নির্য্যাতন করিতেন। ফলতঃ তাঁহার দলস্থ পড়ুয়াদিগকে কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

এখন গৌরচন্দ্র দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকেন; স্নানান্তে বাটীতে আসিয়া বিষ্ণুপূজা করিতেন, পরে আহারাদি করিয়া

নির্জ্জনে বসিয়া পুস্তক লইয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন এবং স্বহস্তে পুস্তকাদি লিখিতেন ও টীপ্পনী দিতেন। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের এইরূপ বিদ্যামত্তা ও বিদ্যোপার্জ্জনে গাঢ় নিপুণতা দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই বিশ্বম্ভর সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তে একটা আতঙ্ক জন্মাইয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া অলক্ষিত ভাবে ঐ ভাবচ্ছায়া তাঁহার মনে পড়িত; অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি মন হইতে তাহা দূর করিতে পারিতেন না। ইহার মধ্যে একদিন স্বপ্ন দেখিয়া আরও ভীত হইয়া পড়িলেন। শচীদেবী ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সাশ্রু নয়নে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। জগন্নাথ বলিলেন, তিমি স্বপ্ন দেখিলেন যেন নিমাই শিখা মুণ্ডন করিয়া অদ্ভুত সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করিয়াছেন, ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নয়নের জলে ভাসিতেছেন, অদ্বৈতাদি সকলে যেন নিমাইকে বেষ্টন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন ও নিমাই যেন নগরে নগরে হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। শচী স্বামীকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন বিশ্বম্ভর যেরূপ আগ্রহের সহিত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে পুঁথি ছাড়িয়া তিনি যে অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন, তাহা সম্ভবপর নয়।

নবদ্বীপের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি বা কাণভট্ট শিরোমণি ও স্মৃতিকর্ত্তা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি এক জন অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। বিদ্যারম্ভকালে তিনিই বলিয়াছিলেন যে আগে 'খ' কি অন্য বর্ণ না বলিয়া 'ক' কার উচ্চারণের আবশ্যকতা কি? রঘুনাথ যখন পঞ্চম বর্ষীয় শিশু, সেই সময় তিনি যে বাটীতে থাকিতেন, সেই গৃহের স্বামী নবদ্বীপের প্রথম নৈয়ায়িক পণ্ডিত সার্ব্বভৌম বিশারদ তাঁহাকে একদিন তামাকু খাইবার জন্য আগুণ আনিতে বলিয়া ছিলেন। রন্ধন শালায় ভট্টাচার্য্য-পত্নী পাক করিতেছিলেন, বালক রঘুনাথ তাঁহার নিকট অগ্নি চাহিলে, তিনি হাতায় পূর্ণ প্রজ্বলিত অঙ্গার দিতে গেলেন। বালকের হাতে কোন পাত্র ছিলনা; সে আপন প্রত্যুৎপন্নমতিবলে অমনি অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া এক অঞ্জলি ধূলা লইয়া তদুপরি অগ্নি দিতে বলিল। ভট্টাচার্য্য বালকের এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে

তাহাকে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। কথিত আছে এই রঘুনাথ শিরোমণি একদিন এক জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া বাঁশ তলায় একটী মাদুর পাতিয়া তদ্গত চিত্তে পুঁথি দেখিতেছিলেন। পিঠে কাকে মলত্যাগ করিয়াছে, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। গৌরচন্দ্র বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে স্নান করিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া পরিহাসচ্ছলে আপন আর্দ্রবস্ত্রের জল ২। ৪ ফোঁটা রঘুনাথের পৃষ্ঠে দিলে তাঁহার চৈতন্য হইল ও তিনি গৌরাঙ্গের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'কি হে নিমাই! ব্যাপারটা কি?'

নিমাই উত্তর করিলেন 'পিঠে যে কাকে বাহ্যে করে দিয়েছে?'.

রঘু। পড়া শুনা করিতে হইলে একটু মনোযোগ না দিলে হবে কেন? তোমার মত ভেসে ভেসে বেড়ালে কি পড়া হয়?

বিশ্বম্ভরও একটু অহঙ্কারব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন 'তোমার চিন্তার বিষয়টা জানিতে পারি না কি?

রঘু। তুমি ইহার কি বুঝিবে?

নিমাই। বলই না কেন, শুনিতে হানি কি?

রঘুনাথ তখন সেই প্রশ্নটী ব্যাখ্যা করিলেন ও তাহাতে যে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, তাহাও বলিলেন। আবার ঐ পূর্ব্ব পক্ষের মীমাংসাও বলিয়া দিলেন। এইরূপ সপ্তম মীমাংসা পর্য্যন্ত বলিয়া যেখানে সন্দেহ ছিল, তাহা বিবৃত করত গর্ব্বের সহিত বলিলেন "কি মীমাংসা কর, দেখিব?" বিশ্বম্ভর অম্লানবদনে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তাহার প্রকৃত উত্তর দিলে রঘুনাথ অবাক্ হইয়া গেলেন। তদবধি তিনি বিশ্বম্ভরের প্রতি যথেষ্ট সমাদর দেখাইতেন।*

এখন হইতে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে নিমাইয়ের যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি হইতে লাগিল। তিনি এখন কেবল যে পড়িতেন, তাহা নহে; টোলে অন্যান্য ছাত্রদিগকে পড়াইতেও লাগিলেন। মুরারি গুপ্ত তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিকট পাঠ লইতে লজ্জা বোধ করিতেন; সে জন্য গৌরাঙ্গ গুপ্তকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন 'ওহে বৈদ্যরাজ!

---

* এই গল্পটী কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই; নবদ্বীপের কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট শুনিয়াছিলাম।

তুমি কেন পড়িতে আসিয়াছ? লতা পাতা লইয়া বড়ী বড়ী কর গে। ব্যাকরণ শাস্ত্র বড় বিষম ব্যাপার; ইহাতে কফ পিত্ত অজীর্ণের ব্যবস্থা নাই।'

বাক্যযন্ত্রণায় মুরারি প্রভৃতি সকলেই তাঁহার নিকট পাঠ চাহিতে আরম্ভ করিলেন।

এই অবস্থায় পরিবার মধ্যে একটী দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, যদ্দারা বিশ্বম্ভরের ভাবি জীবনের গতি আর এক রূপ আকার ধারণ করিল। এই বৃত্তান্ত পর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পিতৃবিয়োগ।

পুত্র ও পত্নীকে অকূল শোক সাগরে ভাসাইয়া জগন্নাথমিশ্র স্বর্গারোহণ করিলেন। পিতৃবিয়োগে বিশ্বম্ভর বিস্তর শোক দুঃখ করিলেন; পতিহীনা হওয়ায় শচীদেবীর দুঃখের সীমা থাকিল না। প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব আসিয়া অশেষ প্রকারে মাতা পুত্রকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। যাহা হউক, শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিশ্বম্ভর পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া পুনর্বার গৃহস্থালি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পতিবিয়োগে শচীদেবী নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন; সহস্র চেষ্টা করিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। পিতৃহীন বালকের মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের শোকসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিত; গৌরের নিঃসহায় অবস্থা মনে করিয়া কতই কাঁদিতেন, এবং দিবারাত্রি অনন্যমনা হইয়া পুত্রসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন; এক দণ্ড পুত্র মুখ না দেখিতে পাইলে মূর্চ্ছা যাইতেন। স্বর্গীয় পতির প্রতি শচীদেবীর প্রগাঢ় ভক্তি ও অকৃত্রিম সরল প্রণয় ছিল। এক্ষণে সমস্ত প্রেম পুত্রেতে অর্পিত হওয়ায় তাঁহার স্বাভাবিক পুত্র বাৎসল্য সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইল। এক্ষণে বিশ্বম্ভরই তাঁহার জীবনসাগরের একমাত্র ধ্রুব নক্ষত্র; তাঁহার মুখ দেখিয়াই তিনি কথঞ্চিত জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভরও পূর্ব্ব ঔদ্ধত্য ও অধ্যয়নাদি পরিত্যাগ করিয়া অবিচলিতচিত্তে মাতৃসেবায় তৎপর হইলেন। কত সময়ে একত্রে বসিয়া পুত্র মাতাকে কত আশ্বাসের মিষ্ট মিষ্ট কথা শুনাইতেন; এবং কত প্রকারে প্রবোধ দিতেন?

"শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার আছে, যদি আছি আমি।"

জগতে যদি এইরূপ অকৃত্রিম প্রেম ও আশ্বাসের মিষ্টকথা না থাকিত, তবে কে এই অশেষ দুঃখময় সংসারে রোগশোক সহ্য করিয়া প্রাণ ধার করিতে সমর্থ হইত?

জগন্নাথের পরলোক গমনে বিশ্বম্ভর ও শচীর ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনী অর্থ সম্বন্ধে কষ্ট উপস্থিত হইল। হইবারই তো কথা। তাঁহাদের স্থা ভূসম্পত্তি আদি কিছুই ছিল না; এক মাত্র জগন্নাথ যাজনাদি ক্রিয়া দ্বা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন। সুতরাং তাঁহার বিয়োগে সংসারের যে অ কষ্ট হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশ্বম্ভর এ পর্য্যন্ত কখন কিছু উপার্জ্জ করেন নাই; এবং ধনার্জ্জনাদি যে করিতে হইবে, সে দিকে তাঁহার চিন্তা ছিল না। ঘরে কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁহার জীবনযাপনের যা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহা না পাইলে রক্ষা থাকিত না। পিতৃ শোকে অভি ভূত হইয়া কতক দিন পর্য্যন্ত শান্ত ও স্থির ছিলেন; এক্ষণে কালসহকারে যতই শোকের তীব্রতা হ্রাস হইতে লাগিল; ততই তাঁহার দুষ্ট সরস্ব কাঁধে চাপিয়া উঠিল। পিতৃবিয়োগে মাতার অযথা আদর ও প্রশ্রয়, অগ্নি দাহ্যমান বস্তু সংযোগের ন্যায় তাঁহার দুষ্ট বুদ্ধির উত্তেজক হইতে লাগিল পুত্রবৎসলা শচী পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়া পুত্রের অযথা প্রার্থনা সকল প্রাণপ চেষ্টায় পূর্ণ করিতেন; তথাচ কোন সময়ে কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে দুর্দ্দান্ত নিমাই ক্রোধে অন্ধ হইয়া ঘর দুয়ার সকলই ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন এক্ষণে তিনি পরিণত বয়স্ক; তথাচ এই দুস্বভাবের হস্ত হইতে কিছু আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। এখানে তাঁহার রাগোদ্রেকের একটী অদ্ভুত আখ্যায়িকা দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারি বেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ স্বভাব হইয়াছিল। একদিন বিশ্ব গঙ্গাস্নানে যাইবেন বলিয়া মাতার নিকট তৈল, আমলকি এবং বিষ্ণু পূজা জন্য পুষ্প চন্দন ও মাল্য চাহিলেন। শচী তৈলাদি সমুদায় অর্পণ করি বলিলেন "বৎস! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, মালাকরের বাটী হইতে মা আনিয়া দিতেছি।" 'আনিয়া দিতেছি' শব্দ শুনিয়া বিশ্বম্ভর ক্রো অধীর হইলেন এবং ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া 'এখন তুমি মালা আনি যাইবে?' বলিয়া জননীকে তিরস্কার করিতে করিতে লগুড় হস্তে

ধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং গঙ্গাজল রাখার যত কলসী ও ভাঁড় ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন; তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, চাউল, ডাইল, ধান, লবণ, বড়ী ও দর্পণ আদি ছড়াইয়া ফেলিলেন; যে সকল সিকা টাঙ্গান ছিল তাহা এবং স্ত্রাদি যাহা কিছু পাইলেন, সব ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। যখন রের মধ্যে অন্য কোন জিনিষ পাইলেন না, তখন গৃহের উপর ক্রোধানল জ্বলিত হওয়ায় দুই হস্তে লগুড় প্রহার করিয়া ঘর দুয়ার ভাঙ্গিতে লাগিলেন; তৎপরে গৃহ প্রাঙ্গনে যে সকল বাস্তবৃক্ষ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে াগিলেন; এবং তাহাতেও ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত না হওয়ায় অবশেষে দুই াতে মৃত্তিকার উপর ঠেঙ্গা মারিতে লাগিলেন। কেহ ভয়ে তাঁহার সম্মুান হইয়া নিষেধ করিতে সাহসী হইল না। শচীমাতা মহাভীম মূর্ত্তি ত্রের ঈদৃশ ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া ভয়ে স্থানান্তরে লুক্কায়িত হইলেন। তরাং বিনা বাধায় বিশ্বম্ভর যাবতীয় গৃহদ্রব্য আপনার ক্রোধাগ্নিতে আহুতি দান করিতে পারিলেন। কিন্তু এই সকল দুষ্কার্য্যের মধ্যে বিশ্বম্ভরের নুকূলে বলিবার একটী কথা আছে; অর্থাৎ তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া য় জননীকে কখন প্রহার করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনাখ্যায়ক নেক প্রশংসাবাদ লিখিয়াছেন——

'ধর্ম্ম সংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম সনাতন;
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন।
এতাদৃশ ক্রোধাবেশে আছেন ব্যাপিয়া;
তথাপিও জননীরে না মারিল গিয়া।' চৈঃ ভাঃ।

এইরূপে সমস্তদ্রব্য সামগ্রী অপচয় করিয়া বিশ্বম্ভর যখন আর কিছু াইলেন না, তখন ক্রোধাবেশে অঙ্গনে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন; বং ক্ষণকাল মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে শচীদেবী াস্তে আস্তে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া মালাকরের বাটী হইতে সকল নর্থের মূল সেই মালা আনয়ন করিয়া স্নানের ও পূজার সমস্ত আয়োজন রিয়া ধীরে ধীরে পুত্রের অঙ্গে হস্তামর্শ করিতে লাগিলেন; এবং গাত্রের া ঝাড়িয়া সুমধুর মিষ্টবাক্যে পুত্রকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন;—

'উঠ উঠ বাপ মোর হের মালা ধর;
আপন ইচ্ছায় গিয়া বিষ্ণুপূজা কর।

'ভাল হৈল যত বাপ! ফেলিলে ভাঙ্গিয়া।
যাউক সকল তোমার নিছনি লইয়া।' চৈঃ ভাঃ

ধন্য অপত্যস্নেহ! ধন্য মাতৃপ্রেম! তুমিই জগতে ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার! তুমি না আসিলে কি জীবপ্রবাহ রক্ষা হইত? মাতৃস্নেহের প্রতি-শোধ পুত্র কি চিরজীবনে দিতে পারে?

যাঁহারা চৈতন্যচরিত্রের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, অন্যান্য অসামান্য দৈবগুণাবলীর মধ্যে ক্রোধ তাঁহার জীবনের একটী কলঙ্ক চিহ্ন স্বরূপ ছিল; কোন প্রকারে তিনি এই দুর্জ্জয় ও নিষ্ঠুর রিপুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হইতে পারিতেন না। বাল্যকালে মাতার ও গৃহসামগ্রীর উপর তাঁহার ক্রোধের সুতীক্ষ্ণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইত, যৌবনসময়ে ইহারই বশে গুরু লঘুজ্ঞান ও পাত্রাপাত্র ভুলিয়া গিয়া বৃদ্ধ অদ্বৈতের মুখে জ্ঞানপক্ষে বাশিষ্ঠব্যাখ্যান শুনিয়া ভয়ানক প্রহার করিয়াছিলেন এবং সময়ান্তরে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়া যাইতেছিলেন এবং শেষবয়সে যখন ভগবৎপ্রেমে সর্ব্বদা বিভোর হইয়া থাকিতেন, তখনও সময়ে সময়ে এই ক্রোধের আবেশ দেখা যাইত। সে যাহা হউক জননীর সুমধুর প্রবোধবাক্য শুনিয়া গৌরচন্দ্র লজ্জিতান্তঃকরণে গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। এদিকে শচীমাতা সমস্ত ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিয়া রন্ধন সমাধা করিলেন; ও বিশ্বম্ভর স্নান করিয়া আসিলে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া মিষ্ট বাক্যে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন:— "বাপ বিশ্বম্ভর! দেখ এত অপচয় কি করিতে আছে? ঘর দুয়ার সকলই তোমার; নিজের জিনিষ কি এত নষ্ট করিতে আছে? এই এখনই পড়িতে যাইবে, কাল কি খাইবে, এমন সম্বল ঘরে নাই।"

জননীর মিষ্টভর্ৎসনা শ্রবণ করিয়া গৌরসুন্দর মহালজ্জিত হইলেন এবং আপনার দুর্দ্দমনীয় ক্রোধের বিষয় স্মরণ করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলেন। আর জননীকে বলিলেন 'টাকা কড়ির জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না; ভগবান্ কোন মতে চালাইয়া দিবেন।' বৈষ্ণবেতিহাস লেখকগণ এই স্থানে গৌরের অলৌকিকত্বের পরিচয় দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে গৃহের দ্রব্য অপচয় করার নিমিত্ত লজ্জিত হইয়া বিশ্বম্ভর সেই দিন অপরাহ্নে অধ্যয়ন হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় জাহ্নবীতীরে ক্ষণকাল একাকী অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া নিভৃতে

জননীর হস্তে দুই তোলা সুবর্ণ দিয়া গৃহসামগ্রীর অভাব পরিপূর্ণ করিতে বলিলেন। এখন হইতে এইরূপে, যখন ঘরে অনাটন দেখিতেন, তখনই কিছু কিছু স্বর্ণ আনিয়া মাতার হস্তে দিতেন। ইহাতে জননীর মনে উৎকট চিন্তার উদয় হইত। শচী ভাবিতেন 'বিশ্বম্ভর, কোথা হইতে বারে বারে সোনা আনিতেছে? ধার করিয়া আনে, বা কোন মন্ত্রবলে সুবর্ণ প্রস্তুত করিয়া দেয়? অথবা কি কোন গুপ্ত ধনি পাইয়াছে?' কি জানি কৃত্রিম সোনা হইলে ধরা পড়িয়া কোন প্রমাদ ঘটে এই সঙ্কোচে দশ পাঁচ জন আত্মীয় স্থানে ভাল করিয়া না দেখাইয়া শচী তাহা ভাঙ্গাইতে দিতেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অধ্যাপনা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে পড়িতে বিশ্বম্ভরের অসাধারণ মেধাশক্তি ও শাস্ত্র দক্ষতার কথা নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল; এবং তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। টোলের মধ্যে তিনিই সকল পড়ুয়াকে চালাইতেন; সকলের পাঠব্যাখ্যা করিয়া দিতেন, এবং ফাঁকির সিদ্ধান্তও খণ্ডন করিতেন। এখন গঙ্গাদাসকে আর বড় একটা পরিশ্রম করিতে হইত না। তিনি বিশ্বম্ভরকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ক্রমে ক্রমে বিশ্বম্ভরও একটি স্বতন্ত্র টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটীতে বড় চণ্ডীমণ্ডপগৃহে তাঁহার টোল হইতে লাগিল। তিনি প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া টোলে পড়াইতে যাইতেন; শিষ্যসমবেত হইয়া মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নান করিতেন; স্নান ও আহারান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় টোলে যাইতেন, এবং অপরাহ্নে ছাত্রবৃন্দে পরিবৃত হইয়া নগর

ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নালোকে শিষ্যপরিবৃত হইয়া কখন জাহ্নবীতীরে বসিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রালাপ হইত; কত প্রকার তর্ক সহকারে নিমাই পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব করিতেন; এবং বিপক্ষ পক্ষ দেখিলে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া ঠকাইয়া দিতেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার যশে চারিদিক পরিপূর্ণ হইল; দলে দলে ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোলে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং তিনি একজন বিখ্যাত অধ্যাপক মধ্যে পরিগণিত হইলেন। প্রায় সহস্রাধিক ছাত্র এখন তাঁহার টোলে পড়ে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় এক্ষণে তাঁহার মুহূর্ত্ত মাত্র সাবকাশ থাকিত না।

এই সময়ে দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্র আসিয়া নবদ্বীপে বিদ্যাধ্যয়ন করিত, এবং গঙ্গাবাস উপলক্ষেও অনেক দেশীয় লোক এখানে অবস্থিতি করিত। এইরূপে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক লোক তখন নবদ্বীপে বাস করিতেছিল। মুকুন্দ দত্ত নামে জনৈক চট্টগ্রামবাসী নবদ্বীপের অন্যতর টোলে অধ্যয়ন করিতেন। অন্যান্য সদ্‌গুণের মধ্যে মুকুন্দ অতি সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল। তিনি নিয়মিত সময়ে টোলে অধ্যয়ন করিয়া অবকাশ কাল অদ্বৈতপ্রমুখ বৈষ্ণবগণের মধ্যে পরমার্থ চর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেন। একদিন নিমাই পণ্ডিত সশিষ্যে রাজপথে গমন করিতেছেন; এমন সময় দূর হইতে মুকুন্দকে দেখিয়া ডাকিলেন। মুকুন্দ পাশ কাটাইয়া অন্যপথে চলিয়া গেলে গৌরাঙ্গ বলিলেন "এ বেটা আমার ফাঁকির ভয়ে অন্য দিকে পলায়ন করিল। উহারা বৈষ্ণবের শাস্ত্র ও পরমার্থ তত্ত্ব আলোচনা করে; আমার ঐ সকলের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই; আমি কেবল শাস্ত্র চর্চ্চা করি; তাহা এ বেটার ভাল লাগিবে না; সেজন্য আমাকে এড়াইয়া গেল। আচ্ছা থাক্ দেখা যাবে।"

অন্য দিন মুকুন্দের দেখা পাইয়া গৌরসুন্দর তাঁহার হস্ত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে দেখিয়া পলাও কেন? অদ্য বিচার না করিলে ছাড়িয়া দিব না।"

মুকুন্দ মনে করিলেন 'এ ব্যক্তি ব্যাকরণের অধ্যাপক; অলঙ্কার জানে না; অতএব ইহাকে অলঙ্কারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরাজয় করিব।' এই ভাবিয়া তিনি কঠিন অলঙ্কারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশ্ন শেষ না হইতে হইতে বিশ্বম্ভর অম্লানবদনে তাহার যথাযথ উত্তর করিতে লাগিলেন এবং অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া মুকুন্দকে নিরুত্তর

করিয়া দিলেন। অবশেষে ঈষৎ হাস্য করিয়া নিমাই পণ্ডিত মুকুন্দকে বলিলেন 'আজি ঘরে গিয়ে এ বিষয় চিন্তা কর; কল্য আসিয়া আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিও।' ইহা শুনিয়া মুকুন্দ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন:—'মানুষের এমন অদ্ভুত পাণ্ডিত্য তো কখন দেখি নাই। এমন শাস্ত্র নাই যাহাতে ইহার অধিকার নাই। এমন লোক যদি ভক্ত হয়, তবে এক মুহূর্ত্তও ইহার সঙ্গ ছাড়া হই না।'

আর এক দিন মাধব মিশ্রের পুত্র ও তাঁহার ভাবী ধর্ম্মবন্ধু গদাধরকে পথে দেখিয়া গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে গদাধর! ভাল তুমি ত ন্যায়শাস্ত্র পড়, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি?"

গদাধর উত্তর করিলেন 'কি প্রশ্ন?'

বিশ্বম্ভর। মুক্তি কাহাকে বলে?

গদাধর। আত্যন্তিক দুঃখনাশের নাম মুক্তি।

তখন গৌরচন্দ্র তাঁহার সিদ্ধান্তে শতদোষ দিয়া মুক্তি পদের অন্য ব্যাখ্যা স্থাপন করিলেন। ফলে এই সময়ে নগরে নগরে বেড়াইয়া লোকের প্রতি ফাঁকি জিজ্ঞাসা করা তাঁহার একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। শ্রীবাস অদ্বৈত প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে দেখিলেও তিনি ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়িতেন না। তাঁহারা গৌরাঙ্গের পরম সুন্দরমূর্ত্তি ও অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান মধ্যে বিনয়ের অভাব দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইতেন।

এই সময়ে একদিন জগন্নাথ নন্দন বায়ুরোগের প্রভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া বাটীর অঙ্গনে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন; ক্ষণে ক্ষণে অলৌকিক শব্দ করিয়া উঠেন, ক্ষণে হুঙ্কার গর্জ্জন করেন, কখন বিকটহাস্য করেন, আবার স্তম্ভীকৃত হইয়া নিমগ্নভাবে থাকেন এবং কখন বা প্রচণ্ড রুদ্র মূর্ত্তিতে সম্মুখস্থিত আত্মীয়দিগকে মারিতে যান।

শচীদেবী ব্যস্তে ব্যস্তে প্রতিবাসী বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকিয়া এই আকস্মিক দুর্ঘটনা অবগত করাইলেন। বুদ্ধিমন্ত খান ও মুকুন্দ সঞ্জয় প্রভৃতি আত্মীয়গণ আসিয়া নানা রূপ প্রতিকার করিতে লাগিলেন; বিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন ও অন্যান্য সুশ্রূষা হইতে লাগিল। এই পীড়ার সময়ে গৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন "আমি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি; তোমরা আমাকে চিন না।" ইহা শুনিয়া কেহ কেহ অনু-

ম্রান করিতে লাগিলেন যে, দানব ও ডাকিনী অধিষ্ঠান হইয়াছে; তাহাতে প্রলাপ বকিতেছে; বিজ্ঞ লোকেরা স্থির করিলেন যে, বায়ু ব্যাধি হইয়াছে। কিছুতেই উপশম হইল না দেখিয়া অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে একটী দ্রোণ তৈলে পরিপূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে তাঁহাকে শোয়াইয়া রাখা হইল। এইরূপ কিছু দিন করিতে করিতে ব্যাধি আরোগ্য হইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রথমপরিণয় ও ঈশ্বর পুরীর আগমন।

পূর্ব্বে বিশ্বম্ভর যখন গঙ্গার ঘাটে বালিকাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া তাহাদের পূজার সমগ্রী কাড়িয়া খাইতেন, সেই সময়ে একদিন নবদ্বীপের বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম্নী এক বালিকা দেবতাপূজার জন্য গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, ইনি বাস্তবিক বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, লীলার সাহায্য জন্য মানবীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, লক্ষ্মীকে দেখিয়া জগন্নাথতনয় সাভিলাষ মনে তাঁহার নিকটে গমন করিয়া কহিলেন "আমাকে পূজা কর, আমি তোমাকে ঈপ্সিত বর দিব।" কথিত আছে যে, এই সময়ে উভয়ের মনের সাহজিক প্রীতি উদিত হইয়াছিল। লক্ষ্মীদেবী পূজার ছলে আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তিনি আস্তে আস্তে চন্দন টুকু গৌরের মুখকমলে মাখাইয়া দিলেন, ফুলের মালা গাছটী গলায় দিয়া দিলেন এবং হাতে সন্দেশাদি উপকরণ খাইতে দিয়া বাটী প্রস্থান করিলেন। এই প্রস্তাবের মূলে কত টুকু সত্য আছে, জানি না; কিন্তু ইহাতে যে সরল ও অকৃত্রিম বাল্য প্রেমের একটী সুন্দর ছবি প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার মধুরতা আস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রকারান্তরে বৈষ্ণবকবিগণ এই প্রস্তাবে গৌরচন্দ্রের ভাবী পরিণয়ের একটু অলৌকিকত্ব ও চমৎকারিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তখন দেশমধ্যে স্বয়ম্বর কাহাকে বলে, জানা ছিল না; সচরাচর পিতা মাতা বরকর্ত্তা

মনোনীত করিয়াই বিবাহ দিতেন, কিন্তু মহাপুরুষ বিশ্বম্ভরের বিবাহ সেরূপে হইতে পারে না, তাই এই অলৌকিক চমৎকারিত্বের অবতারণা। ইহা গৌরের বাল্যজীবনের কথা। তাহার পর কতকাল চলিয়া গিয়াছে, জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করিয়াছেন, শচীর সংসারে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বিশ্বম্ভর বয়স্থ হইয়া এখন অধ্যাপনা করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন বনমালী আচার্য্য নামক ব্রাহ্মণের সহিত গৌরচন্দ্র ভ্রমণ করিতে-ছিলেন; এমন সময়ে বল্লভাচার্য্য দুহিতা লক্ষ্মীদেবীকে দেখিতে পাইলেন; এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বসিদ্ধ ভাবোদ্গমের পরিচয় দিতে লাগিলেন। চতুর বনমালী তাহা বুঝিতে পারিয়া সময়াস্তরে শচী দেবীর নিকটে যাইয়া বলিতে লাগিলেন "আপনার পুত্র বিবাহ-যোগ্য বয়স্ক হইয়াছেন; তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন না কেন? নবদ্বীপের বল্লভাচার্য্য কুলে শীলে সর্ব্বাংশেই করণীয় ঘর; আর তাঁহার দুহিতা লক্ষ্মীও রূপে গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর সমান; আপনার বিশ্বম্ভরের উপযুক্ত কন্যা। যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমি এই সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেই।"

শচী উত্তর করিলেন—'আমার বালক পিতৃহীন ও অতিশিশু; বিশেষতঃ তাহার এখনও পাঠ সাঙ্গ হয় নাই। পড়া শুনা শেষ হউক ও বাঁচিয়া থাকুক তবে বিবাহের বিষয় চিন্তা করিব।'

শচীর উত্তরে ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন; পথি-মধ্যে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?'

বনমালী উত্তর করিল 'আর কোথায়? তোমাদের বাটীতে তোমার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ও তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে; তা তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।'

গৌরচন্দ্র ইহা শুনিয়া মৌন হইয়া থাকিলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করত জননীকে বলিলেন যে "বনমালী ঘটক কি বলিতে আসিয়াছিল? তাহাকে সম্ভাষণ করেন্ নাই, সে ব্যক্তি দুঃখিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।"

শচী পুত্রের এই ইঙ্গিত বাক্যে তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া গোপনে বনমালীকে ডাকাইলেন ও বল্লভাচার্য্যের দুহিতার সহিত পুত্রের পরিণয় সম্বন্ধ সুস্থির করিতে অনুমতি দিলেন। বিপ্রও তৎক্ষণাৎ বল্লভের

নিকট আসিয়া সমস্ত বিবৃত করিল এবং গৌরাঙ্গের রূপ গুণের কথা বলিয়া বলিল যে 'এরূপ পাত্রে কন্যা দান করা সৌভাগ্যের বিষয়।'

বল্লভাচার্য্য বনমালীর প্রস্তাব আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিয়া বলিলেন, 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিছু দিতে পারিব না; কেবল পাঁচটী হরিতকী দিয়া কন্যাদান করিব।' এই উক্তি তাঁর বিনয়ের কথা, কারণ ইহার পর দেখা যাইবে যে, তিনি কন্যাকে অষ্টাঙ্গেবিভূষিতা করিয়া সম্প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বনমালী এই শুভ সম্বাদ অচিরে শচীকে অবগত করিলেন এবং শুভ দিন দেখিয়া উভয় পক্ষ বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে বল্লভাচার্য্য বিশ্বম্ভরকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়া সুখী হইলেন। কথিত আছে, বিবাহের দিনে যখন চারিদিকে আনন্দ কোলাহল হইতেছিল, শচীদেবী তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীকে মনে করিয়া ক্রন্দন করিয়া ছিলেন। তদ্দর্শনে বিশ্বম্ভরের উল্লসিতাননেও বিষাদের কালিমা পড়িয়াছিল। যাহা হউক, অধিকক্ষণ সে বিষাদ স্থায়ী হয় নাই। আনন্দ উৎসব মধ্যে বিশ্বম্ভরের প্রথমপরিণয় সম্পন্ন হইল। পুত্রের সহিত বধূকে দেখিয়া বিশ্বম্ভরজননীর আনন্দের সীমা থাকিল না। এই সময়ে তিনি গৃহমধ্যে কত কি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইতেন; কখন দেখিতেন যেন এক দিব্য জ্যোতির শিখা বিশ্বম্ভরের মস্তক ও বদনমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে; আবার কখন বরবধূ উভয়ের অঙ্গ হইতে কমলগন্ধ নিঃসারিত হইতেছে বুঝিতে পারিতেন। সরলমতি শচী মনে মনে সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন যে, এই কন্যা লক্ষ্মী আশ্রিতা; ইঁহার আগমনেই এই সব শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

এই সময়ে চারিদিকে বিষ্ণুভক্তি শূন্য লোক সকল কেবল বাহিরের ক্রিয়াকলাপে ও মিথ্যা জাঁকজমকে রত রহিয়াছে দেখিয়া অদ্বৈতের বৈষ্ণবমণ্ডলী বড়ই মর্ম্মাহত হইতেন। তাঁহাদের আরও ক্ষোভের বিষয় এই যে, তাঁহারা মনে করিয়া ছিলেন যে, বিশ্বরূপ যেরূপ ভক্তিপরায়ণ শিষ্টশান্ত সাধু মহাত্মা ছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ বিশ্বম্ভরও সেইরূপ হইবেন। কিন্তু বিশ্বম্ভরের জ্ঞানগরিমা ও গর্ব্বিত ব্যবহারে তাঁহাদিগকে বড়ই ব্যথিত হইতে হইত; এবং কবে কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া জগতের দুঃখ দূর করিবেন, এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। কিন্তু ভক্তবর অদ্বৈতাচার্য্য এক দিনের জন্যও নিরাশ হন নাই; তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে

যখনই যুগে যুগে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তখনই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দৈত্যগণের বিনাশ সাধন করিয়া সত্য ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিয়াছেন। এবারেও অচিরে তাহাই হইবে। এজন্য তিনি সর্ব্বদাই শিষ্যমণ্ডলীকে এইরূপ আশ্বাস বাক্য বলিতেন;—

"আর দিন কত গিয়া থাক ভাই সব;
এথাই পাইবা সবে কৃষ্ণ অনুভব।
করাইব সবে কৃষ্ণ নয়ন গোচর;
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর।"

তখনও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখেই ভগবৎ শক্তির স্ফুলিঙ্গ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; ও সে দিন অতি নিকটে যে দিনের জন্য তাঁহারা আশা নেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন।

প্রত্যহ অপরাহ্নে নগর ভ্রমণ করা বিশ্বম্ভরের অভ্যাসের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি শিষ্যমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া নবদ্বীপের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া নিত্য নূতন পল্লীতে যাইয়া অশেষ প্রকারে হাস্য কৌতুক করিতেন; কোন দিন তন্তুবায় পল্লীতে যাইয়া বিনামূল্যে উত্তম উত্তম বস্ত্র আনিতেন; কখন গোয়ালাদিগের পাড়ায় গমন করিয়া দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর ভোজন করিতেন, গোপগণ পরিহাস করিয়া তাঁহাকে 'মামা' 'মামা' বলিয়া ডাকিত ও আপনাদের পক্ক অন্ন খাইতে অনুরোধ করিত; কখন আবার শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক, মালাকার ও সর্ব্বজ্ঞদের বাটীতে যাইয়া বিবিধ আমোদকৌতুক করিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা তরকারী বিক্রেতা শ্রীধরের সহিতই অধিক হাস্য পরিহাস হইত। শ্রীধরের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ঈশ্বরপুরীর আগমন।

এই মহাত্মার জন্মস্থান কুমারহট্টে; ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর সর্ব্বপ্রধান শিষ্য। দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে ইনি এই সময়ে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য একান্ত মনে বসিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তখন সম্মুখে এক তেজঃপুঞ্জ সৌম্য পুরুষ উপবিষ্ট। পুরী কৃষ্ণপ্রেমরসে সর্ব্বদাই বিহ্বল ও প্রশান্তচিত্ত। তাঁহার বেশ দেখিলে তাঁহাকে কেহ সাধু-পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিত না। কিন্তু বৈষ্ণবের নিকট কিছু লুকাইত

থাকিবার নহে। অদ্বৈতাচার্য্য পুরীর ভাবগতিক দেখিয়া পুনঃ পুনঃ আগ্রহ সহকারে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; ও অবশেষে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'আপনি কে? মনে হয় বৈষ্ণবসন্ন্যাসী হইবেন।' ঈশ্বরপুরী উত্তর করিলেন, 'না! আমি অধম শূদ্র জাতি; তোমার চরণ দর্শনে আসিয়াছি।'

তখন মুকুন্দ দত্ত অতি সুমধুর স্বরে ও প্রেমের সহিত হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী তাহা শুনিতে শুনিতে অনর্গল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিয়া পৃথিবীতে ঢলিয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে অদ্বৈতাচার্য্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। পুরীর নয়ন জলে অদ্বৈতের পরিধেয় বসন সিক্ত হইল এবং তাঁহার মহাভাবের লক্ষণ দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন। পরে ঈশ্বরপুরীর পরিচয় পাইয়া অদ্বৈতের ক্ষুদ্র বৈষ্ণব-দলের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। গোপীনাথাচার্য্যের গৃহে পুরীর বাসা নির্দ্ধারিত হইল; তথায় তিনি কয়েক মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী মহাপণ্ডিত ছিলেন জানিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকট ভক্তিশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে সংসার-বিরক্ত পরমভাগবত দেখিয়া পুরী স্বরচিত 'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ পড়াইতে লাগিলেন। একদিন বিশ্বম্ভর নগরভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে পথমধ্যে পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আপনার ভাবী অভীষ্টদেবকে দর্শন করিয়া নিমাই পণ্ডিতের গর্ব্বিত মস্তক আপনা হইতেই যেন তাঁহার চরণতলে অবনত হইল। পুরী পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, ইঁহারই নাম নিমাই পণ্ডিত, ইনি ব্যাকরণশাস্ত্রের একজন অদ্বিতীয় অধ্যাপক। 'তুমিই সেই' বলিয়া পুরী তাঁহাকে সম্ভাষণ আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিশ্বম্ভরও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনাদের বাটীতে ভিক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। ভগবানের গূঢ়কৌশলে এইরূপে ভাবী গুরুশিষ্যে অলক্ষিতভাবে পরিচয় হইয়া গেল। তাঁহাদের উভয়ের সম্মিলনে যে কি উপাদেয় ফল ফলিবে, তাহা তখন না তাঁহারা, না পৃথিবী, জানিতে পারিয়াছিল। এই হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অধ্যাপনাসমাপনান্তে বিশ্বম্ভর ঈশ্বরপুরীকে প্রণাম করিতে যাইতেন। যাঁহার জ্ঞান গর্ব্বের নিকট সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজিত, যাঁহার উন্নতমস্তক আর কাহারও নিকট অবনত হয় নাই, তিনি কেন মেষশিশুর ন্যায় শান্তভাবে একজন উদাসীন

সন্ন্যাসীকে এত ভক্তি করিতেছেন, কে বুঝিবে? আবার যাঁহার দম্ভপূর্ণ বাক্যের তেজে সকলেই শশব্যস্ত হইত, তিনি পুরীর সহিত কি ভাবে আলাপ করিতেছেন, দেখা যাউক।

পুরী বলিলেন 'তুমি মহাপণ্ডিত; আমি কৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থ করিয়াছি; তুমি ইহা পাঠ করিয়া ইহাতে যে দোষ থাকে নিঃসঙ্কোচে বলিবে। আমি অসন্তুষ্ট হইব বলিয়া ভয় করিও না।'

বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন "আপনি ভক্ত, ভক্তবাক্যে ভগবদ্ বর্ণন অতিমধুর। ইহাতে যে দোষ দেখে সে মহাপাপী। আপনার প্রেমের বর্ণনায় দোষ দিতে পারে এমন সাহস্কিক ব্যক্তি কে আছে?"

ঈশ্বরপুরী বিশ্বম্ভরের এই বিনয়বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যদি আমার কবিতায় দোষ থাকে, তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে।" গৌরচন্দ্র অগত্যা হাসিতে হাসিতে একটী কবিতার ধাতুপ্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এ ধাতু আত্মনে পদ নহে, আপনি আত্মনেপদে প্রয়োগ করিয়াছেন কেন?"

ঈশ্বরপুরীও বিদ্যার বিচার করিতে ভাল বাসিতেন; গৌরচন্দ্র ঐ কথা বলিয়া চলিয়া গেলে পুরী মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিক ঐ ধাতু পরস্মৈপদী; কিন্তু আত্মনেপদেও তিনি লাগাইতে পারেন। পুনরায় বিশ্বম্ভরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঐ কথা বলিলেন। যদিও তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত হেতু ছিল, তথাচ গৌরাঙ্গ তাহাতে আর কিছু বলিলেন না। কিছুদিন পরে কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে ঈশ্বর পুরী প্রব্রজ্যায় চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কৈশোর লীলা—দিগ্বিজয়ীজয়।

যৌবনসমাগমে বিশ্বম্ভর দিন দিন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতে লাগিলেন। একে তিনি পরমসুন্দর পুরুষ, যৌবনারম্ভে তাঁহার শ্রী যে শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তাঁহার মুখশ্রীতে কেমন এক রকম লাবণ্যময় মাধুর্য্য মাখান ছিল যাহাতে দর্শকের প্রাণমন আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে

পারিত না। এই সময়ের তাঁহার অঙ্গমাধুর্য্য লোচন দাস ঠাকুর স্বীয় জগদ্বিখ্যাত কবিতায় এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :—

'অমিয়া মাথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো,
তাহাতে পড়িল গোরা দেহ।
জগৎ ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গাড়িল গো,
এক কৈল সুধুই সুলেহ।
অখণ্ডপীযুষ ধারা কেবা আউটীয়া গো
সোণার বরণ কৈল চিনি;
সে চিনি মাথিয়া কেবা ফেনি তুলিল গো,
হেন বাঁসো গোরা অঙ্গখানি।
বীজুরী বাঁটিয়া কেবা পাথানি মাজিল গো,
কত চাঁদে মাজিল মুখানি;
লাবণ্য বাঁটিয়া কেবা চিত্র নিরমিল গো,
অপরূপ বাহুর বলনী।
এমন বিনোদিয়া কোথাও না দেখি গো,
অপরূপ প্রেমার বিনোদে;
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়া বিকল গো,
রমণী কেমনে প্রাণ বান্ধে?
মদন বাঁটিয়া কেবা বদন মাজিল গো,
বিনি ভাবে মো মন কান্দিয়া;
ইন্দ্রের ধনুক আনি গোরার কপালে গো,
কেবা দিল চন্দনের রেখা।' চৈতন্যমঙ্গল।

যৌবনের জোয়ার আসিয়া অঙ্গে অঙ্গে যেমন তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুষ্ট করিতে লাগিল, সেইরূপ মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সকলও বিকশিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বের গর্ব্বিত ভাব, ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে মাধুর্য্যপূর্ণ বিনয় আত্মাকে অধিকার করিল; তিনি কথা কহিলে শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া যাইত। চিত্তবিনোদনকারী হাসি হাসিয়া যখন তিনি শাস্ত্রবিচার করিতেন, তখন বিপক্ষগণ, পরাজিত হইয়াও তাঁহার প্রতি কিছু মাত্র বিরক্ত হইত না; বরং তাঁহার মধুর আলাপে ও কৃতজ্ঞতা ব্যঞ্জক বিনয়ে যথেষ্ট আপ্যায়িত হইয়া যাইত।

এই কালে নবদ্বীপনগরে একজন মহাদিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিবাস কাশ্মীর দেশে, মধ্বাচার্য্য মঠের শিষ্য; নাম কেশব কাশ্মীরী। তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক, ও হস্তী, অশ্ব, দোলা প্রভৃতি বহুতর যান থাকিত। যখন দলবল লইয়া তিনি গমন করিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত যেন একজন রাজা, দেশ জয়ের জন্য দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। কথিত আছে যে পণ্ডিতজী স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যপ্রতিভা-বলে দিল্লী, কাশী, গুজরাট, ত্রিহুত, লাহোর, কাঞ্চী, উৎকল, তৈলঙ্গদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া জয়পত্র লইয়া নবদ্বীপজয় করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় মহাগর্ব্বিত; ঔদ্ধত্য সহকারে প্রচার করিয়া দিলেন যে, হয় তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করা হউক, নচেৎ সমস্ত নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজয় স্বীকার করিয়া সকলের স্বাক্ষর যুক্ত তাঁহাকে এক জয়পত্র দিউন। লোকে বলিত যে, দিগ্বিজয়ী তপস্যাবলে বাগ্দেবীকে বশীভূত করিয়া ঈদৃশ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। ফলে যাহাই হউক, তাঁহার বিদ্যার প্রভাবে কেহ বিচারে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

দিগ্বিজয়ীর আগমন বার্ত্তা নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার হইলে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সশঙ্কচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের মনে এই আশঙ্কা হইল যে, কি জানি যদি তাঁহাদের পরাজয় হয়, তবে নবদ্বীপের চিরগৌরব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং সমস্ত বঙ্গদেশের মুখ হেঁট হইবে। এই ভয়ে কেহই দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে বিচারে অগ্রসর হইতে চাহিলেন না।

নিমাইপণ্ডিত নিজ টোলে, ছাত্রবৃন্দপরিবৃত হইয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন, এমত সময়ে তাঁহার কোন কোন শিষ্য আসিয়া দিগ্বিজয়ীর বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন যে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সরস্বতীর বরে সকল দেশ জয় করিয়া সম্প্রতি নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়া আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাহিতেছে; হয় তাহাকে বিচারে পরাজিত করুন, না হয় পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিউন।

এই কথা শুনিয়া গৌরচন্দ্র মধুর হাসি হাসিয়া ভাবব্যঞ্জকস্বরে ছাত্রদিগকে উত্তর করিলেন :—

'ওহে ভাই! বলি শুন; ভগবান্ কাহারও অহঙ্কার রাখেন না। দর্পহারী

গোবিন্দ পর্ব্বিত ব্যক্তির পর্ব্ব নাশ করিবেনই করিবেন। ফলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান্ লোকের নম্রভাব ধারণ করাই স্বাভাবিক। যদি তাঁহার বিদ্যার অহঙ্কার হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই তাহা চূর্ণ হইবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, গৌরচন্দ্র সন্ধ্যাসময়ে সশিষ্যে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে চলিলেন; গঙ্গাকে প্রণাম ও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া শ্যামল দূর্ব্বাক্ষেত্রে মণ্ডলী করিয়া বসিলেন; এবং শাস্ত্রালাপ, ধর্ম্মকথা প্রভৃতি নানাপ্রকার আলোচনায় সুখানুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, নির্ম্মল রজনীতে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া সুধাধারা বর্ষণ করিতে লাগিল; মৃদুমন্দ সান্ধ্যসমীরণ প্রবাহিত হইয়া নিদাঘের অঙ্গগ্লানি দূর করিতেছিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা উত্থিত হইয়া ভাগীরথীর অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছিল, এবং চন্দ্রকিরণ সংযোগে গঙ্গাজলকণা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডের ন্যায় সমুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। এমন সুখের সময়ে গৌরচন্দ্র কত সুখেই শিষ্যগণ সঙ্গে আমোদ কৌতুক ও ঘনিষ্ঠতা করিতেছিলেন। ইহাতে তাঁহার ছাত্রগণ যে প্রগাঢ়রূপে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ গৌরাঙ্গ সুন্দরের মধ্যে কি এক আশ্চর্য্য দৈবভাব ছিল, জানি না, যাহার বলে বাল্যকালে বাল্যক্রীড়া-কৌতুকে সহচর বালকগণকে; মধ্যাবস্থায়, অধ্যাপনা সময়ে ছাত্রবৃন্দকে; আর শেষসময়ে ধর্ম্মপ্রচারকালে ধর্ম্মবন্ধুদিগকে; তিনি একেবারে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার জন্য প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইত না। এক্ষণে কালেজ স্কুলে যেমন বিদ্যালয়ের বাহির হইলে আর গুরুশিষ্যে সম্পর্ক থাকে না; তখনকার নিয়ম সেরূপ ছিল না। শিষ্যগণ গুরুগৃহেই প্রায় বাস করিত ও সর্ব্বদা তাঁহার শাসনাধীনে থাকিত। গৌরাঙ্গের নিয়ম প্রচলিত নিয়ম অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র ছিল। তিনি সখ্যভাবে শিষ্যদিগের সহিত মিলিত হইতেন এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত বন্ধু ও গুরুর কার্য্য করিতেন; কাজেই ছাত্র সকল তাঁহার পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারিত না। যাহা হউক, এই সময়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে গৌরাঙ্গের সভা দেখিতে পাইলেন; এবং অনুসন্ধানে নিমাই পণ্ডিতের সভা জানিয়া আস্তে আস্তে সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন; এবং যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া গৌরচন্দ্রের সভাতে উপবেশন করিলে, নিমাইপণ্ডিত অতি সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং মধুর সম্ভাষণে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া, পরস্পর আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র ব্যাকরণের অধ্যাপনা করেন, ব্যাকরণ বালকের পাঠ্যশাস্ত্র, অথচ তিনি নিজে একজন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, ইহা মনে করিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কিছু অবজ্ঞার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

দিগ্বিজয়ী বলিতে লাগিলেন—'তোমার নাম নিমাইপণ্ডিত? শুনিলাম তুমি ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া থাক। হাঁ! বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার খুব প্রশংসা করিয়া থাকে।'

গৌরচন্দ্র অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, 'ব্যাকরণ পড়াই বলিয়া অভিমান করি বটে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য অতি অল্পই বুঝিতে পারি।'

দিগ্বিজয়ী। না! না! তোমার শিষ্যদিগের ফাঁকির সিদ্ধান্ত আমি শুনিয়াছি, তাহারা অতি উত্তম শিক্ষা পাইয়াছে। তুমি কিছু শাস্ত্রালাপ কর।

নিমাই। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত, আমি নবীন ছাত্র বইত নই; আপনার নিকট মুখ খুলি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই; শুনিয়াছি আপনি মহা কবি; আপনার পাণ্ডিত্য কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

দিগ্বিজয়ী। আচ্ছা, কোন্ শাস্ত্রের প্রসঙ্গ করিব বল?

নিমাই। কৃপা করিয়া কিছু গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।

ইহা শুনিয়া উপস্থিত কবি দিগ্বিজয়ী সগর্ব্বে জাহ্নবীমাহাত্ম্য সূচক কবিতা বর্ণনা করিতে লাগিলেন; এবং এক ঘটিকার মধ্যে শিলাবৃষ্টির ন্যায় এক শত কবিতা আওড়াইয়া গেলেন। সভাস্থ শিষ্যমণ্ডলী শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। গৌরচন্দ্র অশেষপ্রকারে কবিকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"আপনার প্রতিভাময়ী কবিতা ব্যাখ্যা করা আমাদের সাধ্য নহে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি ইহার দুই একটী কবিতা ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন।"

দিগ্বিজয়ী উত্তর করিলেন, "কোন্ শ্লোকটীর ব্যাখ্যা শুনিতে চাও?"

তখন নিমাই পণ্ডিত অম্লানবদনে আওড়াইতে লাগিলেন;—

"মহত্ত্বং গঙ্গায়া সততমিদমাভাতিনিতরাং; যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎ-পত্তিসুভগা; দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা; ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা।"

"গঙ্গার মহিমা সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে; কারণ ইনি বিষ্ণুপাদোদ্ভবাহেতু সুভগা; দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায়, সুর ও নরগণ ইহাঁর চরণ পূজা করিয়া থাকে; এবং ইনি শিবের জটাজুটে বিহার করেন বলিয়া আশ্চর্য্যগুণশালিনী।"

গৌর বলিলেন, 'এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করুন'। দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমি ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় শ্লোকগুলি আওড়াইয়া গেলাম; ইহার মধ্যে তুমি কিরূপে তাহা কণ্ঠস্থ করিলে?'

গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন—'তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কি? কেহ বা দেবতাপ্রসাদে প্রতিভাশালী কবি হয়; আর কেহ বা শ্রুতিধর হইয়া থাকে।' তখন কবিবর প্রহৃষ্টমনে কবিতাটী ব্যাখ্যা করিলে গৌরচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা বলুন দেখি, ইহাতে কোন দোষ গুণ আছে কি না?"

দিগ্বিজয়ী বলিলেন 'কবিতায় দোষ মাত্র নাই; উপমালঙ্কার ও কিছু অনুপ্রাস আছে।'

নিমাই পণ্ডিত কহিলেন 'যদি অসন্তুষ্ট না হন ও বালচপলতা মার্জ্জনা করেন, তবে আপনার এই কবিতায় কি দোষ ও গুণ আছে তাহার সম্বন্ধে আমি কিছু বলি। আপনি প্রতিভাপ্রভাবে এই কবিতা রচনা করিলেন, ইহার সম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য।'

গৌরের ঈদৃশ প্রগল্‌ভ বাক্যে, ব্রাহ্মণ ক্রোধে হতবুদ্ধি হইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, 'যা বলিলে তাই বেদ বাক্য আর কি? তুমি ব্যাকরণী পণ্ডিত হয়ে কবিতার অলঙ্কার বিচারে কি জন্য সাহস করিতেছ?'

নিমাই। 'সেই জন্যই তো আপনাকে দোষগুণ বিচার করিয়া বুঝাইয়া দিতে বলিতেছি; অলঙ্কার না পড়িয়া থাকিলেও অনেক শুনিয়াছি। তাহাতেই বলিতেছি, এ কবিতায় গুণ দোষ উভয়ই আছে।'

দিগ্বিজয়ী। আচ্ছা বল দেখি, কি কি দোষ গুণ আছে?

নিমাই। আপনি রাগ করিবেন না; আমি বলিয়া যাই, শ্রবণ করুন। এই কবিতায় পাঁচ স্থানে পাঁচটী অলঙ্কার দোষ হইয়াছে; দুই স্থলে অবিমৃষ্য বিধেয়াংশ, একস্থানে বিরুদ্ধমতি, ও দুই স্থানে ভগ্নক্রম, দোষ লক্ষিত হইতেছে।

দিগ্বিজয়ী। (বিরক্তির সহিত) দেখাইয়া দাও।

নিমাই। দেখুন গঙ্গার মহত্ত্বর্ণনাই আপনার মূল বিধেয়; কিন্তু

তাহার অনুবাদ 'ইদম্' শব্দ পরে দেওয়াতে অর্থ অপরিষ্কার হইয়াছে ; 'ইদং মহত্বং' বলায় অবিমৃষ্যবিধেয়াংশ দোষ হইয়াছে।

দিগ্বিজয়ী। তারপর।

নিমাই। তারপর "দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীঃ" প্রয়োগও ঐ রূপ। সমাসের মধ্যে 'শ্রী' শব্দ দেওয়ায় অর্থ অস্পষ্ট হইয়াছে। 'ভবানীভর্ত্তুঃ' প্রয়োগ বিরুদ্ধমতি দোষযুক্ত। 'ভবানী' শব্দের অর্থই শিবপত্নী, তাঁহার ভর্ত্তা বলিলে দ্বিতীয়ভর্ত্তা বুঝাইতে পারে। 'ব্রাহ্মণপত্নী ভর্ত্তা' বলিলে যেরূপ জ্ঞান হয়, এও তদ্রূপ। আর 'বিভবতি' ক্রিয়ায় বাক্য সাঙ্গ হইলে তাহার পর 'অদ্ভুতগুণা' বিশেষণ দেওয়ায় এবং প্রথম পাদে 'ত', তৃতীয় পাদে 'র' চতুর্থ পাদে 'ভ' এর অনুপ্রাস আছে,অথচ দ্বিতীয় পাদে তদ্রূপ কিছুই নাই ; ইহাতে ভগ্নক্রম দোষ হইয়াছে। এই শ্লোকে পাঁচটী অলঙ্কার আছে সত্য, কিন্তু শ্বিত্ররোগীর পরম সুন্দর শরীরও যেমন কুৎসিত হইয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ এই সব দোষে শ্লোকের সৌন্দর্য্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

দিগ্বিজয়ী। পাঁচটী অলঙ্কার সম্বন্ধে কি বল ?

নিমাই। অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুইটী শব্দালঙ্কার আর তিনটী অর্থালঙ্কার। প্রথমচরণে পাঁচটী 'ত' কার, তৃতীয়চরণে পাঁচটী 'র' কার ও চতুর্থপাদে ৪টী 'ভ' কার থাকায় অনুপ্রাস ; আর একার্থবোধক 'শ্রী' ও 'লক্ষ্মীঃ' শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় পুনরুক্তিবদাভাস, এই দুইটী শব্দালঙ্কার দেখা যায়। অর্থালঙ্কারের মধ্যে 'লক্ষ্মীরিব' উপমা ও বিষ্ণুচরণোৎপত্তিহেতু গঙ্গার মহত্ত্ব বর্ণনায় অনুমান অলঙ্কার দেখা যায়। তদ্ভিন্ন আপনার কবিতায় আর একটী মহাচমৎকার অলঙ্কার আছে। জল হইতে কমলোৎপত্তিই প্রসিদ্ধ; কমল হইতে কখন জল জন্মে না। কিন্তু এখানে বিষ্ণুর চরণকমল হইতে গঙ্গার জন্ম বলাতে বিরোধালঙ্কার হইয়াছে। ভাবিয়া দেখুন, ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে গঙ্গার প্রকাশ হইয়াছে ; সুতরাং আপাততঃ বিরোধের ন্যায় লক্ষিত হইলেও ইহাতে বিরোধ নাই। এই অলঙ্কারটী অতি সুন্দর হইয়াছে।

গৌরচন্দ্রের এই সকল সারগর্ভ ব্যাখ্যা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না এবং মাথা হেঁট করিয়া নিরুত্তর হইয়া থাকিলেন। গৌরের শিষ্যবৃন্দ হাসিয়া উঠাতে গৌরচন্দ্র তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বিনম্র ভাবে বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয় ! আপনি অদ্বিতীয়

কবি ও জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া এরূপ অপ্রতিভ হইতেছেন কেন? প্রতিভার কবিতায় কাহার না দোষ হইয়া থাকে? কালীদাস, জয়-দেব, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিদিগের কবিতাতেও ভূরি ভূরি দোষ দেখা যায়। সে হিসাবে আপনার কবিতায় ত অতি অল্পই ত্রুটি লক্ষিত হই-তেছে। দোষগুণে কিছু আইসে না; আপনি যে বলিতে না বলিতে এত কবিতা রচনা করিতে পারেন, তাহাই অতীব প্রশংসনীয়। আমি বালক, আপনার পড়ুয়ার সমান হইবারও যোগ্য নাই। আমার বালচাপল্য মার্জ্জনা করিবেন।'

তখন দিগ্বিজয়ী কবি অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও অপমানিত হইয়া বলিলেন, 'ওহে নিমাই পণ্ডিত! ধন্য তোমার বুদ্ধি; অলঙ্কার না পড়িয়াও তুমি কি প্রকারে এই সব অর্থ করিতে সক্ষম হইলে?'

নিমাই পণ্ডিত একটু কৌতুক করিবার জন্য বলিলেন, 'মহাশয়! শাস্ত্রাদি কিছুই জানি না, মা সরস্বতী যাহা বলান তাহাই বলিয়া থাকি।' ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনে করিতে লাগিলেন, 'তবে বুঝি সরস্বতী আমাকে বিরূপ হইয়া নিমাইয়ের স্কন্ধে ভর করিয়াছেন; যাহা হউক, আজ রাত্রিতে সকল কথা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিব, কেন তিনি বালক দ্বারা আমার এত অপমান করিলেন?' কথিত আছে সেই রাত্রিতেই বীণাপাণি স্বপ্নযোগে তাঁহাকে নিমাইয়ের ঈশ্বরত্বের বিষয় জ্ঞাপন করিলে, তিনি গৌরচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গদেশে গমন।

দিগ্বিজয়ীজয়ের পর নিমাই পণ্ডিতের যশে চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইল। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী একেবারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন; বড় বড় বিষয়ী লোক তাঁহাকে দেখিয়া দোলা হইতে নামিয়া অশেষ প্রকারে অভিবাদন করিতে লাগিলেন; সর্ব্বত্র তাঁহার নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল; এবং ধনাগমের দ্বার উন্মুক্ত হইল। এখন হইতে যাহার বাটীতে

যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত, তাহার ভোজ্যবস্ত্র দ্রব্যাদির এক এক অংশ তাঁহার বাটীতে আসিয়া পৌঁছিত।

শিশুকাল হইতেই গৌরের হৃদয় মহা উদার; দুঃখীকে প্রেম করিতে তাঁহার মত কেহ জানিত না। যেমন এক দিক্ দিয়া তাঁহার ধনাগম হইতে লাগিল, তেমনি অন্য দিকে অজস্র ব্যয় হইতে লাগিল। সঞ্চয় কাহাকে বলে তাহা তিনি তখন জানিতেন না; এবং অর্থ লইয়া যে সাংসারিক সুখ-ভোগ করিতে হয়, তাহা তাঁহার শাস্ত্রে লেখে নাই। এখন হইতে তিনি দুঃখী দরিদ্র দেখিলেই অন্নবস্ত্র দিয়া তাহাদের অভাব মোচন করিতে লাগিলেন; এবং সন্ন্যাসী উদাসীন অতিথিদিগের জন্য বাটীতে এক সদাব্রত খুলিয়া দিলেন। সংসারাসক্তি প্রথমজীবনেও তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। পর জীবনে যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে চলিয়া গিয়াছিলেন, তখনকার ত কথাই নাই। এখন যে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রম করিতেছেন, এখনও এক দিনের জন্য সংসার চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিতে পারে নাই। প্রেমই তদীয় জীবনের মহামন্ত্র; প্রেমে আরম্ভ এবং প্রেমেই শেষ। তখন নবদ্বীপে উদাসীন সন্ন্যাসী পরমহংস সর্ব্বদাই আগমন করিত এবং দুঃখী দরিদ্রেরও অপ্রতুল ছিল না। টোলে অধ্যাপনা করিতে করিতে এই সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি মহা সমাদরে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিষ্যদ্বারা জননীকে আহার-সামগ্রী প্রস্তুত করিতে বলিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে প্রতিদিন ২০।২৫ জন নিরাশ্রয় ও সাধুভক্ত লোক তাঁহার বাটীতে আহার পাইতেন। দ্রব্যাদির আয়োজনের ভার জননীর উপর ছিল। তিনি সে সমস্ত আহরণ করিয়া নব বধূকে রন্ধন করিতে দিতেন। লক্ষ্মীদেবী অল্পবয়সেই অতি সুন্দর পাক করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি সে সমস্ত রন্ধন করিলে নিমাই পণ্ডিত অভ্যাগতদিগকে লইয়া জাহ্নবীজলে মধ্যাহ্নাদি সমাপন করিয়া পরম সুখে ভোজন করিতে আসিতেন। বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন যে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গৌরাঙ্গসুন্দর দৃষ্টান্তাদির দ্বারা গৃহস্থদিগকে গৃহীর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার জন্য এই সকল অনুষ্ঠান করিতেন।

লক্ষ্মীদেবীও তখনকার বঙ্গীয় বধূকুলের আদর্শ ছিলেন। তখন তাঁহার নবীন যৌবন, সে সময়ে সামান্য স্ত্রীদিগের কত আমোদ ও বিলাসের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর তাহা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি ঈশ্ব-

মনোবাক্যে শ্বশ্রূ ও স্বামীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন ও আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা ভুলিয়া গিয়া, শ্বশ্রূর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যত্নবতী হইতেন। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহসংস্কারাদি করিতেন; তৎপরে স্নানান্তে বাটীর বিগ্রহসেবার ও স্বামী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পূজার আয়োজনাদি করিয়া রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন; এবং সকলকে আহারাদি করাইয়া ও আপনি ভোজন করিয়া গৃহকার্য্য সমাপনান্তে স্বামীর পাদ সম্বাহন ও ক্ষণকাল স্বামী-সঙ্গে অবস্থিতি করিতেন। নিমাই পণ্ডিতের নিয়ম ছিল আহারান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় টোলে অধ্যাপনা করিতে যাওয়া। এই অবসর সময়ে তিনি ভার্য্যার সহিত সম্মিলিত হইয়া পরস্পর মধুরালাপ করিতেন। তখনকার দেশের প্রথানুসারে দিবাভাগে স্বামী স্ত্রীতে একত্র থাকা দূষণীয় হইলেও উদারমতি শচীর গৃহে সেরূপ কঠোর শাসন ছিল না। বরং পুত্র ও পুত্রবধূকে একত্রিত দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না।

এই সময়ে গৌরচন্দ্রের পূর্ব্বদেশ গমনের ইচ্ছা হইল। তাঁহার সম্বন্ধে যে ইচ্ছা, সেই কাজ। তাঁহার জীবনে এই এক অসাধারণ গুণ ছিল যে, যাহা তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া একবার বুঝিতেন, তাহা হইতে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতেন না। পূর্ব্বাঞ্চল গমনে তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল, ভাল করিয়া জানা যায় না; তবে পরবর্ত্তী কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় যে, শিক্ষা বিস্তার করাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। জননীর আজ্ঞা লইয়া ও ভার্য্যাকে মাতৃ সেবার জন্য বিশেষ সতর্ক করিয়া, কতকগুলি প্রিয়শিষ্য সমভিব্যাহারে বাটী হইতে বাহির হইলেন; এবং কিয়দ্দিনান্তর পদ্মানদীর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। পদ্মানদীর কোন্ ভাগে গমন করিয়া ছিলেন ও কোন্ কোন্ দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ইহা জানা যায় যে, কয়েক মাস ধরিয়া ঐ দেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার যশঃসৌরভ সমস্ত বাঙ্গলা দেশে বিকীর্ণ হইয়াছিল; তাই তাঁহার আগমনবার্ত্তা রাষ্ট্র হইবামাত্র বহুসংখ্যক পাঠার্থী আসিয়া তাঁহার নিকট পড়িতে লাগিল। কথিত আছে এই সকল লোক তাঁহার কৃত টিপ্পনীর সাহায্যে অধ্যয়ন করিতেছিল, ও অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া নবদ্বীপে তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। একণে তাঁহাকে স্বদেশে পাইয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনিও টোল করিয়া রীতিমত শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

নিমাই পণ্ডিতের প্রণীত কোন টিপ্পনী এক্ষণে দেখা যায় না ; কিন্তু এতদ্বারা জানা যাইতেছে তিনি অনেক শাস্ত্রের ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে অবস্থিতি কালে তপন মিশ্র নামে এক নিরীহ সারগ্রাহী ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। কথিত আছে তপনমিশ্র অনেক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভের প্রকৃত পথ কি ও ঈশ্বরতত্ত্বই বা কাহাকে বলে? তৎসম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার প্রকৃত উপায় জানিবার জন্য সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছিলেন। এই সময়ে একদিন রজনীতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, নিমাই পণ্ডিতের নিকটে যাইলে তাঁহার সকল সংশয় অপনোদন হইবে। স্বপ্নের আদেশানুসারে ব্রাহ্মণ নিমাইয়ের নিকটে আগমন করিয়া আত্ম বিবরণ নিবেদন করিলে গৌরচন্দ্র বলিলেন যে "প্রতিযুগের অবস্থা ও শিক্ষানুসারে ভগবান্ যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন ; সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞাদি, দ্বাপরে ঈশ্বর সেবা ও কলিতে নাম সঙ্কীর্ত্তন, এইরূপে যুগচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম নিরূপিত আছে। আমার বিবেচনায় আর সমস্ত খুটিনাটী পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাম সংকীর্ত্তন করিতে থাকুন ; নাম সাধন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম হইবে ; তখন আপনি অনায়াসে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে সক্ষম হইবেন। ঈশ্বর তত্ত্ব কি ? তাহা কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারে না ; আপনা আপনি অনুভব করিতে হয়।" কথিত আছে যে, গৌরের এই উপদেশ বাক্যে ব্রাহ্মণের চক্ষুরুন্মীলিত হইল। তখন সে তাঁহার সহিত থাকিবার জন্য ইচ্ছা জানাইলে গৌরাঙ্গদেব তাহাকে বারাণসী গমন করিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, 'ভবিষ্যতে ঐ নগরীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।' তপনমিশ্র তদনুসারে বারাণসী নগরীতে চলিয়া গেলেন। চৈতন্যজীবনের পরবর্ত্তী ঘটনায় জানা যাইবে যে, সন্ন্যাসের পর যখন তিনি কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন দুই মাস কাল এই তপনের গৃহে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন এবং এ ব্যক্তি তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

উপরোক্ত আখ্যায়িকা পাঠে স্বভাবতঃই মনোমধ্যে কয়েকটী কথা উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ তখন পর্য্যন্ত ত গৌরচন্দ্র ধর্ম্মোপদেষ্টার ভার গ্রহণ করেন নাই ; তবে কিরূপে তপনমিশ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া সম্ভব হয় ? দ্বিতীয়তঃ তিনি কি তখন জানিতেন যে, পর জীবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীতে তপনের গৃহে অবস্থিতি করিবেন ? যদি তাহা জানিতেন,

তবে ইহার পরে পুনরায় দারপরিগ্রহ করা সম্ভব হয় কি না? বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার ইচ্ছাই ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা সে সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারি না। তবে আমরা এসম্বন্ধে কি বলিব? আমরা কি বলিব যে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত জানিয়া তপনমিশ্রকে কাশী যাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন? বড় কঠিন সমস্যা। তবে যদি উপাখ্যানটীকে অত্যুক্তিতে অনুরঞ্জিত বলা যায়, তাহা হইলে মীমাংসার বিষয় অনেকটা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। তপনমিশ্রের সহিত পরিচয় ও তাঁহার উপদেশে তপনের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়া ও বৈরাগ্যের উত্তেজনায় কাশী গমন করা, ইহার কিছুই অসম্ভব নহে। তবে গৌরাঙ্গ যে স্বীয় ভবিষ্যৎসন্ন্যাস জানিয়া তাঁহাকে কাশী যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজও ইহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন;—

"প্রভুর অনন্ত লীলা বুঝিতে না পারি;
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন পাঠান কাশীপুরী?"

গৌরচন্দ্র পরম সুখে পূর্ব্বাঞ্চলে বসতি করিতেছেন, এদিকে নবদ্বীপে তাঁহার গৃহে যে বিপদ উপস্থিত, তাহা জানিতে পারেন নাই। তাঁহার বাটী-ত্যাগের কিছুদিন পরে দৈবাৎ রজনীযোগে সর্পাঘাতে তাঁহার পত্নীর প্রাণবিয়োগ হইল; বিকাশোন্মুখ কুসুম কলিকাতেই শুকাইয়া গেল। শচীর গৃহ বিষাদের অন্ধকারে আবৃত হইল। প্রাণের সদৃশ প্রিয়তমা বধূর বিয়োগে শচীমাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং তাঁহার কাতরক্রন্দনে কঠিন পাষাণও বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে? বোধ হয়, সন্ন্যাসে গেলে পতির বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বিশ্বজননী আপনার প্রিয়কন্যাকে অমৃতময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, আত্মীয় স্বজন একত্রিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক জাহ্নবীতীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং অপ্রিয় সংবাদ দিয়া গৌরচন্দ্রকে ব্যথিত করা অবৈধ বোধে কোন সমাচার পাঠাইলেন না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সর্পদংশনে লক্ষ্মীর পরলোক যাত্রা স্পষ্টতঃ স্বীকার না করিয়া বলেন যে, স্বামীবিরহই ভুজঙ্গ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দংশন করিয়াছিল।

কিয়দ্দিন পরে গৌরচন্দ্র দেশে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে

ঙ্গদেশীয় ছাত্রগণ তাঁহাকে নানা প্রকার ধন সামগ্রী উপঢৌকন দিতে লাগি-লেন। তিনি সে সমস্ত গ্রহণ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। বোধ হয়, এই তাঁহার জীবনের শেষ উপার্জ্জন।

বহু শিষ্য ও ধন সম্পত্তিতে পরিবৃত হইয়া নিমাই পণ্ডিত স্বভবনে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার উৎসাহে হৃদয়পূর্ণ এবং অনেক দিনের পর জননী ও ভার্য্যার সহিত মিলিত হইবেন, এই আশায় প্রাণ আশান্বিত। কিন্তু হায়! তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার আশা ভীষণ নিরাশায় পরিণত হইবে। বাটী আসিয়া নিমাই জননীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার হস্তে অর্থ সামগ্রী প্রদান করিলেন। বুদ্ধিমতী শচী ঠাকুরাণী হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং তিনি যাহাতে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য পত্নীবিয়োগ সংবাদ জানিতে না পারেন, সেরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন। গৌরচন্দ্র আহারান্তে বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া আত্মীয়দিগের নিকট বঙ্গদেশের কথা বলিতে লাগিলেন এবং বাঙ্গালের কথা অনুকরণ করিয়া কতরূপ কৌতুক করিতে লাগিলেন। আত্মীয়গণ কেহই অপ্রিয় সংবাদ বলিতে সাহসী হইলেন না। ক্ষণকাল পরে তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, তাঁহার জননী অতি বিষণ্ণ চিত্তে বসিয়া আছেন। বহু দিনের পর বাটী আসিয়াছেন, ইহাতে জননীর মনে কত আনন্দ হইবে; তাহার পরিবর্ত্তে তিনি বিমর্ষ চিত্তে রহিয়াছেন দেখিয়া গৌরের মনে কতকটা সন্দেহ হইল। পরে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক প্রতিবেশী তাঁহাকে পত্নীর বিয়োগ সংবাদ বলিয়া ফেলিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে গৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; নীরবে অবিরল অশ্রুধারা গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি কিছু অভিভূত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু পরক্ষণেই জননীর কাতর ক্রন্দন শ্রবণে নিজের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া মাতাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পুত্রের মধুর সান্ত্বনায় শচীদেবী ক্রমে ক্রমে শোক সংবরণ করিতে পারিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় বিবাহ।

বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর গৌরচন্দ্র পুনরায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহার টোল বসিত; বঙ্গদেশে অনুপস্থিতি সময়ে টোলের কার্য্য বন্ধ ছিল। তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ প্রচার হইবা মাত্র পাঠার্থীগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আবার বিদ্যা-চর্চ্চায় সঞ্জয়ের বাড়ী শরগরম হইয়া উঠিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, পত্নী বিয়োগের শোকের তীব্রতা ততই হ্রাস হইতে চলিল, শাণিত ক্ষুর ধারে মর্চ্চে পড়িয়া গেল। অবশেষে হৃদয়ের অন্তরস্থলে শোকের এক কাল আবরণ পড়িয়া থাকিল; স্মৃতির আকাশে একটী বিষাদের রেখা মাত্র থাকিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে নিমাই পণ্ডিত গভীর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে, এই সময়ে তিনি তাঁহার পড়ুয়াদিগের মধ্যে সন্ধ্যা বন্দনাদি ও কপালে তিলক ধারণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের করণীয় অনুষ্ঠান করিতে না দেখিলে অথবা দুর্নীতিপরায়ণতা লক্ষ্য করিলে, পরিহাস ও উপদেশচ্ছলে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন। তাঁহার জীবনের এই এক বিশেষ ভাব দেখা যায় যে, শেষ জীবনে বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাগবর্ত্মে ধর্ম্ম সাধন করাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম ইত্যাদি মত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনধিকারী ব্যক্তিদিগকে কখন বেদবিহিত আশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম শূন্য হইতে উপদেশ দিতেন না; বরং তাহাদিগের বিশ্বাসানুসারেই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেন। যেখানে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, প্রচলিত মত পরিত্যাগ করিয়া উপদিষ্ট ব্যক্তি উচ্চতর ও পবিত্রতর সাধনাঙ্গে উঠিতে পারিবে না, সেখানে তাহার বিশ্বাসের উপর আঘাত করিয়া তাহাকে নাস্তিকতার সন্দেহ দোলায় নিক্ষেপ করা তাঁহার মতে অতীব দূষণীয় ছিল। এ সম্বন্ধে এক্ষণকার প্রচারপ্রণালী অপেক্ষা তাঁহার পথ অতি পরিষ্কার ও সমুন্নত বলিয়া বোধ হয়। উপদিষ্টের বর্ত্তমান বিশ্বাসের ভিতর দিয়া তিনি আস্তে আস্তে এমন কৌশলে তাহাকে উপরের সিঁড়িতে লইয়া যাইতেন যে, অবশেষে শিষ্যের বুঝা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত কেমন করিয়া তাহার জীবনে এত সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল।

প্রাণের প্রিয়তম ভার্য্যার পরলোকগমনেই হউক বা দুরতিক্রমনীয় স্বভাবের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারার জন্যই হউক, এ বয়সেও গৌর-

চন্দ্রের বাল্যচপলতা আবার দেখা দিতে লাগিল; একটু একটু করিয়া দুষ্ট সরস্বতী স্কন্ধে ভর করিতে লাগিল। প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া টোলে যাইতেন, মধ্যাহ্নে গৃহে আসিয়া মধ্যাহ্ন-ক্রিয়াকলাপ সমাপনান্তে বিশ্রাম না করিয়াই আবার বিদ্যালয়ে যাইতেন, এবং নিশীথ রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন; ইহার মধ্যে সায়াহ্নে কেবল একবার সশিষ্যে গঙ্গাতীরে ও নগরীর পথে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইতেন। সে সময়ে নানারূপ হাস্য পরিহাসে সময় অতিবাহিত হইত। এমন লোক ছিল না যে তাঁহার বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ না হইত। কেবল স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সমাদর ছিল। পথে ঘাটে মহিলাদিগকে দেখিলেই তিনি সসম্ভ্রমে সরিয়া যাইতেন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে গৌরচন্দ্র বাঙ্গালের কথা শিখিয়া আসিয়াছিলেন। নবদ্বীপে বাঙ্গালের অভাব ছিল না; সুতরাং পথে ঘাটে বাঙ্গাল দেখিলে আর রক্ষা থাকিত না। বাঙ্গালের কথা ও স্বর অনুকরণ করিয়া বিবিধ ভঙ্গীসহকারে বিদ্রূপ তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। কোন কোন দিন শ্রীহট্ট-বাসীদিগের সহিত ভয়ানক ঝগড়া কোন্দল বাঁধিয়া যাইত।

গৌরচন্দ্র বলিতেন 'অয়! অয়! তুমি না শ্রীঅট্টবাসী?' তাহারা উত্তর করিত 'অয়! অয়! তুমি নি কোন্ দেশী কওতো? তোমার হৌদ্দপুরুষ যে শ্রীঅট্টবাসী।' তাহাদের প্রচুর ক্রোধোদ্রেক না হইলে গৌর ছাড়িতেন না। তাহারা গালি দিতে দিতে পাছে পাছে ছুটিত; গৌরচন্দ্র পলাইয়া যাইতেন। কখন বা ধরিতে পারিলে তাঁহার কোঁচা ধরিয়া টানিয়া বাঙ্গাল-গণ শীক্‌দারদিগের দেওয়ানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত। তখন পাঁচজন মধ্যে পড়িয়া মিটাইয়া দিত।

অনেক দিন হইতে শচীমাতা পুত্রের পুনঃ দারপরিগ্রহের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। এক্ষণে তনয়ের দিন দিন চঞ্চলতা বৃদ্ধি দেখিয়া ঐ চিন্তা তাঁহার মনে আরও বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন নববধূর মুখ দেখিলে নিমাই হয়ত চাপল্য পরিহার পূর্ব্বক সুখী হইতে পারিবে। কিন্তু নবদ্বীপে পুত্রের উপযুক্ত কন্যা দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল "সনাতন রাজপণ্ডিতের একটী সর্ব্বগুণযুক্ত মেয়ে আছে; মেয়েটীকে তিনি বাল্যকালে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতে দেখিতেন। কন্যাটী যেমন সুশ্রী, তেমনি নম্র ও মধুর-

প্রকৃতি, নাম বিষ্ণুপ্রিয়া ; সেই মেয়েটীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটনা হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়।” সনাতন পণ্ডিত নবদ্বীপের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি, অতি সচ্চরিত্র, উদার সরলস্বভাব এবং সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ। তাঁহার বিষ্ণুভক্তি ও আতিথেয়তা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তাঁহার পদবী রাজ-পণ্ডিত। কি কারণে ঐ পদবী হয়, জানা যায় না ; তবে তিনি যে একজন গণ্য মান্য ও ধন সম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শচীদেবী পূর্ব্বোক্তরূপে চিন্তা করিয়া কাশীনাথ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনিলেন ও তাহার প্রমুখাৎ সনাতন পণ্ডিতের নিকট আপন প্রস্তাব বলিয়া পাঠাইলেন। মিশ্র মহাশয় পণ্ডিতজীর সভায় গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলে রাজপণ্ডিত আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিশ্বম্ভরকে কন্যাদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কাশী-নাথ এই শুভ সম্বাদ শচীকে অবগত করিলে, তিনি আত্মীয়স্বজন লইয়া মহা আনন্দের সহিত বিবাহের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। আত্মীয় দিগের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত খান্ নামে একজন ধনী ছিলেন; তিনি বিশ্বম্ভরের পরম হিতকারী বন্ধু ও হিতৈষী। তিনি এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন “ইহার সমস্ত ব্যয়ভার আমি একা নির্ব্বাহ করিব ; আর এ বিবাহ সামান্য বামুনে রকমে দেওয়া হইবে না ; রাজপুত্রের পরিণয়ের ন্যায় ঘটা করিতে হইবে।” মুকুন্দসঞ্জয়ও এই প্রস্তাব আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিলেন। অধ্যাপকের বিবাহবার্ত্তা শ্রবণে সকল শিষ্যেরাই মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ফলে গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বিবাহ প্রথম বিবাহ হইতে যে শতগুণে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ দিকে কন্যাপক্ষেও সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজনাদি হইতে লাগিল। সনাতনপণ্ডিত একজন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ; সুতরাং তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ রাজকীয় সমারোহে সম্পন্ন হইবে না কেন? এইরূপে সমস্ত আয়োজনাদি সমাধা হইলে বিবাহ সম্বন্ধ একদিন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায় যায় হইয়া উঠিল। পূর্ব্বাহ্নিক আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে রাজপণ্ডিতগণক ডাকা-ইয়া বিবাহের শুভ লগ্ন স্থির করিবার জন্য আদেশ দিলেন। গণক কহিল ‘পথে আসিতে আসিতে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাঁহাকে বিবাহের কথা বলিলে তিনি কাহার বিবাহ? কি বৃত্তান্ত?

বলিয়া, কথা উড়াইয়া দিলেন। ইহাতে আপনার যে অভিরুচি হয় করুন্।"

গণকের মুখে এই কথা শুনিয়া সনাতন পণ্ডিত দুঃখে, অভিমানে ও ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, যখন গৌরাঙ্গ তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য বড় একটা উৎসুক নহেন; তখন তিনি যাচিয়া কন্যা দান করিবেন না।

লোচনদাস লিখিয়াছেন যে, বিশ্বম্ভরকে সনাতনের ঈশ্বর জ্ঞান ছিল; সে জন্য যখন তিনি শুনিলেন যে, বিশ্বম্ভর তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণে তাদৃশ সমুৎসুক নহেন, তখন তাঁহার দুঃখের পরিসীমা থাকিল না। তিনি দিবা রাত্রি "গৌরাঙ্গ ধন হইতে বঞ্চিত হইলাম" বলিয়া ব্যাকুল অন্তরে ক্রন্দন ও বিশ্বম্ভরকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য এই চিত্রটী অতিরঞ্জিত। কারণ তখন পর্য্যন্ত গৌরাঙ্গ জীবনে এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যে তাহাতে তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে। বিশেষতঃ এ বিবাহের প্রস্তাব কিছু কন্যাপক্ষ হইতে উঠে নাই। গৌরাঙ্গের পরবর্ত্তী আচরণও এইরূপ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে লোচন দাস একজন গৌরভক্ত; চৈতন্যাবতারে তাঁহার অটল বিশ্বাস; চৈতন্যচরিতে তাঁহার গাঢ় প্রেমভাব। সেই ভাবাবেগের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থের প্রতি কথায়, প্রতি বর্ণনায় পাওয়া যায়। এ অবস্থায় তদীয় মনের উচ্ছ্বসিত ভাবের ঢেউ সনাতন পণ্ডিতের কার্য্যে ও কথায় যাইয়া লাগা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

গণকের বাক্যে এতদূর হইয়া উঠিয়াছে জানিতে পারিয়া বিশ্বম্ভর অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন; এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এক প্রিয় ও বিশ্বাসী বয়স্যকে নিভৃতে ডাকিয়া সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন এবং নিম্ন লিখিত উপদেশ দিয়া তাঁহার ভাবী শ্বশুরের নিকট পাঠাইলেন। গৌর বলিয়া দিলেন "তুমি কোন ব্যপদেশে পণ্ডিতের সভায় যাও, আমি যে তোমাকে পাঠাইয়াছি তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি বলিতে পার যে গণকের সঙ্গে আমি কৌতুক করিয়াছি মাত্র; ইহাতে তাঁহারা কেন কার্য্যে শৈথিল্য করিতেছেন? আমার কথায় তাঁদের প্রাণে যে কষ্ট হইয়াছে তাহাতে আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। আমার মা যা করেছেন,

তাহাতে আর আমার কি কথা আছে? মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করা আমা সাধ্যাতীত।”

গৌরাঙ্গের বয়স্যের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজপণ্ডিতের সকল সন্দেহ দূর হইল। তখন তিনি মহানন্দে ও উৎসাহে বিবাহের শুভ দিন ধার্য্য করিলেন। বর ও কন্যা উভয়ের বাটীতেই মহা ধূম পড়িয়া গেল প্রথমে অধিবাস। অধিবাসদিনে বাটীতে বড় চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইল, চারি দিকে কদলীবৃক্ষ রোপণ, পূর্ণঘট স্থাপন ও আম্রশাখায় বেষ্টন করা হইল। মেয়েরা আঙ্গিনাতে আলিপনা দিয়া অনুরঞ্জিত করিলেন এবং মঙ্গল কোলাহলে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। প্রাতঃকালে যত ব্রাহ্মণ সজ্জন বৈষ্ণব প্রভৃতিকে অধিবাসের পানগুপারী লওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল।

অপরাহ্ন অধিবাসের নিয়মিত সময়। একে একে নিমন্ত্রিতগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল; নানা প্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল; ভাটগণ রায়বার গাইতে লাগিল ও পুরস্ত্রীরা মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। সভার মধ্যস্থলে গৌরচন্দ্র সমাসীন হইলে পান গুপারী বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইল। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণের অন্ত নাই; সুতরাং কত লোক আসিতে ও যাইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা হইল না। বিতরণ পদ্ধতিও মন্দ নয়; প্রত্যেকের কপালে চন্দন ও মস্তকে পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া এক এক বাটা পান দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণ জাতি চিরকালই লোভী; অনেকে একবার লইয়া বেশ বদলাইয়া প্রতারণাপূর্ব্বক বহুবার লইতে লাগিল। উদারস্বভাব গৌরচন্দ্র এই উৎপাত লক্ষ্য করিয়া তাহা নিবারণের একটী চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া বন্ধুগণকে বলিয়া দিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিন জনের পরিমাণ দেওয়া হউক। এই উপায় অবলম্বন করাতে শঠতা প্রতারণা তো তিরোহিত হইল; বরং সকলে একবাক্যে জয় জয়ধ্বনি করিয়া গৌরের প্রভূত গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

তৎপরে রাজপণ্ডিত আত্মীয় ও বিপ্রবর্গে পরিবৃত হইয়া নৃত্যগীত ও অধিবাসসামগ্রী সঙ্গে লইয়া সভাস্থলে উপনীত হইলেন ও বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া গৌরের অঙ্গে গন্ধ স্পর্শ করাইয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিশ্বশুরের আত্মীয়গণও এইরূপে কন্যার আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলে সেদিনকার উৎসব শেষ হইল।

অধিবাসের রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই স্ত্রীগণ নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে জল সহিয়া আসিলেন। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া বিশ্বম্ভর আত্মীয়গণে পরিবৃত হইয়া গঙ্গাস্নান ও বিষ্ণুপূজা সমাপন করিয়া নান্দীমুখ কর্ম্মাদি করিতে বসিলেন। এ দিকে গঙ্গাপূজা, ষষ্ঠীপূজা, নারীদিগকে তৈল হরিদ্রাদি বিতরণ প্রভৃতি স্ত্রীআচার সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অপরাহ্ণে ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়দিগকে সামাজিক মান ও অবস্থানুসারে ভোজ্য বস্ত্র প্রভৃতি দান করা হইল। বেলা অবসন্ন হইলে বিবাহ যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল ও বরের বেশবিন্যাস হইতে লাগিল।

পুরস্ত্রীগণ গৌরের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া কপালে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে চন্দন তিলক দিলেন। শিরে সুন্দর মুকুট, গলায় সুগন্ধি পুষ্পের মালা রাজি, নয়নে কজ্জল, পরিধেয় পীতবর্ণের পট্ট বস্ত্র, শ্রুতিমূলে স্বর্ণ কুণ্ডল এবং হস্তে দর্পণ শোভা পাইতে লাগিল।

এক প্রহর বেলা থাকিতে বিবাহযাত্রা বাহির হইল। জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ও উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগের পদধুলি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিচিত্র দোলায় চড়িয়া বিবাহ বিজয় করিলেন ও এক প্রহরকাল নগরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া গোধুলি সময় কন্যালয়ে উপস্থিত হইবেন, পরামর্শ হইল। প্রথমে ভাগীরথীতীরে যাইয়া গঙ্গাদর্শন ও প্রণামান্তে নগরের পথে পথে বিবাহ যাত্রা মহা ধুমধামে বেড়াইতে লাগিল। সাজ সজ্জা ও বাদ্য ভাণ্ডের বর্ণনা বৃন্দাবন দাস এইরূপে করিয়াছেন:—

'বুদ্ধিমন্ত খানের আদেশে পরম সুন্দর দোলা সজ্জিত হইয়া আনীত হইলে বিশ্বম্ভর তদুপরি আসীন হইলেন; ব্রাহ্মণগণ সুমঙ্গল বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন, ভাটগণ রায়বার পড়িতে লাগিল, আগে আগে বুদ্ধিমন্তের পদাতিক ও পাটোয়ারগণ দোসারি হইয়া চলিল, তাহার পশ্চাতে নানা বর্ণের পতাকা উড়াইয়া কতক লোক, তাহার পশ্চাতে বিদূষক, ভাঁড় ও নর্ত্তকীগণ নাচিতে নাচিতে চলিল, তাহার পর জয় ঢাক, বীর ঢাক, মৃদঙ্গ কাহাল, দামামা, দগড় বংশী করতাল, বরগো শিঙ্গা ও পঞ্চশব্দী বেণু শ্রেণীবদ্ধক্রমে বাজাইতে বাজাইতে বাদ্যকরেরা চলিল এবং তাহার মধ্যে প্রায় সহস্র বালক নাচিতে নাচিতে চলিল। বিবাহযাত্রা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়া গেল ও বলিতে লাগিল 'এই নবদ্বীপে আমরা

অনেক জাঁকজমকের বিবাহ দেখিয়াছি বটে; কিন্তু এমন অমানুষী বিবা
শোভা তো কখন দেখি নাই'। যাহাদের ঘরে রূপবতী কন্যা ছিল; তাহা
এমন বরে সম্প্রদান করিতে পারিল না বলিয়া বিমর্ষ হইল।

এই সব বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও অসম্ভব নহে। তবে কথা হইতে
যে দুই বৎসর পরে এমন সাধের পরিণীতা ভার্য্যাকে যিনি পরিত্যাগ করিয়া
কাঙ্গালের বেশে পথে পথে হরিনাম বিলাইয়া বেড়াইবেন, তাঁহার পক্ষে
কি এমন ঘটা করিয়া বিবাহ করা সাজে? সাজে বৈ কি? নইলে মনুষ্যে
অদূরদর্শিতা থাকে কোথায়? গৌরচন্দ্র অসাধারণ মানুষ হইলেও মানুষ;
ভগবৎপ্রেরিত হইলেও মানবীয় দুর্ব্বলতার অধীন; তাই এই অপরিণাম
দর্শিতা। প্রিয় পাঠক! ইহাকে লোকশিক্ষার্থ অমানুষী লীলা বলিতে চাও
বল; কিন্তু তাহাতে মানবত্ব ডুবে না। ভগবত্ত্বে মানবত্ব অসম্ভব; মানবত্বে
ভগবত্বই তত্ত্বকথা।

ঠিক্ গোধূলি সময়ে বৈবাহিকদল রাজপণ্ডিতের বাটীতে প্রবেশ করিল।
তখন উভয় দলের বাদ্যতরঙ্গে, লোককোলাহলে ও আলোক মালায়
উৎসব প্রগাঢ় ভাব ধারণ করিল। কন্যাকর্ত্তা স্বদলে সমবেত হইয়া জামা-
তাকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ক্রমে বরণ, স্ত্রী আচার, সাতপাক, মালা-
বদল ও সম্প্রদান সকলই সম্পন্ন হইল। লোকের হৈ হৈ চৈ চৈ, স্ত্রীকণ্ঠে
উলুধ্বনি, উভয় দলের হাস্য পরিহাস, শঙ্খাদির মাঙ্গল্য রবে মিশিয়া
অন্তঃপুরের গাম্ভীর্য্য ও নিস্তব্ধতাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সে রাত্রি
সেই ভাবেই কাটিয়া গেল। বাসরশয্যায় পাড়ার মেয়েদের সরল ও
কুটীল নানা রকমের তামাসা, ও গণ্ডগোলে নবদম্পতীর নিদ্রা মাত্র হইল
না। প্রাতে কুশণ্ডিকাদি সমাপ্ত হইলে পণ্ডিতজী পরমসন্তোষে বর-
যাত্রীদিগকে ভোজন করাইলেন ও ধেনু, ভূমি, ধনরত্ন ও দাসদাসী প্রভৃতি
যৌতুক দিয়া অপরাহ্নে কন্যাজামাতাকে বিদায় দিলেন। পূর্ব্ব দিনের
ন্যায় স্বদলে সমস্ত নগরী প্রদক্ষিণ করিয়া গৌরচন্দ্র সন্ধ্যারাত্রিতে নবোঢ়া বধূ
লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহা দেখিয়া জননীর আনন্দ সাগর
উথলিয়া উঠিল।

'শচী প্রেমে গর গর, কোলে করি বিশ্বম্ভর
চুম্ব দেই সে চাঁদ বদনে;

'আনন্দে বিহ্বল হিয়া, এয়োগণ মাঝে গিয়া,
বধূকোলে শচীর নাচনে।'

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গয়াগমন।

কথিত আছে, এই সময়ে ধর্ম্মশূন্য জগৎ দর্শন করিয়া নবদ্বীপের ক্ষুদ্র বৈষ্ণবদল সর্ব্বদাই দুঃখানুভব করিতেন; এবং জীবের দুঃখ দর্শনে রোদন করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করে এমন কয়জন আছে? সকলেই আপন আপন সুখৈশ্বর্য্যে মত্ত। তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে দেখিলে লোকে বিদ্রূপ করিত, সঙ্কীর্ত্তনে ও ভজনে বাধা দিত, নানারূপে অত্যাচার করিত ও শক্ত শক্ত কথা শুনাইয়া দিত। করুণহৃদয় বৈষ্ণবগণ তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া কায়মনোবাক্যে জীবনিস্তারের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অসহায়ের সহায় যিনি, তিনি এই সময়ে একটী সরল প্রেমিক ও অকপট ভক্ত জুটাইয়া দিয়া ভক্ত মণ্ডলীর উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন। যে প্রকারে হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তদলে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

লোকে বলে পাতাচাপা কপাল, আর পাথরচাপা কপাল। পাথর চাপা কপালে পাথরও উঠে না, কপালও ফলে না। গৌরের কপাল পাতাচাপা; একটু বাতাসে পাতাটী উড়ে যাওয়া মাত্র কপাল ফলে গেল। স্নিগ্ধ কোমল জলগর্ভা নির্ঝরিণীর মুখ দুই চারিটী তৃণ গুল্মে আচ্ছাদিত ছিল, কোথা হইতে একটু নির্ম্মল দক্ষিণা বাতাস বহিল, তৃণ কয়টী সরিয়া গেল, আর প্রমুক্ত মুখ দিয়া শীতল নির্ম্মল জল অনর্গলধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফলতঃ গৌরের ধর্ম্ম জীবনবিকাশের গয়াগমন উপলক্ষ মাত্র। বিধাতা তাঁহার হৃদয়প্রস্রবণে প্রেমভক্তিরসের সুধারাশি স্বহস্তে পুরিয়া দিয়া উপরে শাস্ত্র-জ্ঞানের একখানি শরাব আঁটিয়া দিয়া ছিলেন। আবরণখানি সরিয়া যাওয়ায় তাঁহার স্বাভাবিক গতি অব্যাহত বেগে অনন্তের দিকে ছুটিয়া চলিল; জাতিকুল ধনমানের পর্ব্বত তাহাকে কিছুতেই আটক করিয়া রাখিতে পারিল না।

দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে পিতৃকৃত্য করিবার জন্য জননীর আজ্ঞা লইয়া গৌরচন্দ্র গয়ায় চলিলেন ; সঙ্গে অনেকগুলি শিষ্য ও কোন কোন আত্মীয় প্রতিবেশী ছিলেন। সঙ্গীদিগের সঙ্গে নানারূপ শাস্ত্র ও ধর্ম্মকথা কহিতে কহিতে শচীনন্দন বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করিলেন। নানা দেশের নানারূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে তাঁহার উদারচিত্ত আরও উদারতা লাভ করিল, মন যেন অনন্তের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল এবং তিনি অননুভূত নির্ম্মলসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। আস্তে আস্তে তাঁহার প্রাণে যে সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, তাহা তিনিও তখন বুঝিতে পারেন নাই। পণ্ডিতেরা বলেন যে, উষাগমের ন্যায় শুভ ঘটনার পূর্ব্বাভাস প্রাণের অভ্যন্তরে দেখা দেয় ; এখন বিশ্বম্ভরের জীবনাকাশে সেই আভাস লক্ষিত হইতেছিল। এক জায়গায় পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে যাইতে একটী কুরঙ্গ মিথুনের দাম্পত্য ক্রীড়া দর্শনে গৌরচন্দ্র সঙ্গীলোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেনঃ—'দেখ ভাই ! কাম, ক্রোধ, লোভ মোহাদি রিপুগণের শাসনে পশুরা নিরন্তর উন্মত্ত। পশুদিগের মধ্যে যে বুদ্ধি আছে, মানুষেও তাহাই আছে ; তবে মানুষের বিশেষত্ব এই যে তাহার কৃষ্ণজ্ঞান আছে। শ্রীকৃষ্ণ না ভজিলে মানুষ এই পশু হইতেও অধম'। গয়াপথের আর একটী বৃত্তান্ত উল্লেখ করা উচিত। চির নামে নদীতে স্নানাবগাহন করিয়া যাত্রীদল মন্দার পর্ব্বতে উঠিয়া মধুসূদন বিগ্রহ দর্শন করিলেন এবং তথা হইতে নামিয়া বিগ্রহ পূজক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন। সে দেশের ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহার এদেশের ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাহা দেখিয়া সমভিব্যাহারী যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ গৃহস্বামীকে অবজ্ঞাকরিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ তাহা লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহার প্রাণে মানুষের বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্তের অপমান সহ্য হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল। সঙ্গের শিষ্যগণ অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া তাঁহার রোগ শুশ্রূষা ও ঔষধপ্রয়োগ করিতে লাগিল ; কিন্তু কিছুতেই ব্যাধির হ্রাস হইল না। তখন রোগী আপনার চিকিৎসা আপনিই করিলেন। কথিত আছে যে, গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের পাদোদক লইয়া পান করায় তিনি ব্যাধিমুক্ত হইলেন। যাঁহারা সেই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন যে, তাঁহাদিগের শিক্ষার্থই এ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। তাঁহারা

আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিলে গৌরসুন্দর এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন ;—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ ;
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।"

অর্থ—তোমরা বামনাইর বড়াই করিও না ; ভক্তিবিহীন বামুনও চণ্ডাল ; আর ভক্তিমান্ চণ্ডালও পূজনীয়।

কিছুদিনান্তে যাত্রীদল গয়াধামে উপনীত হইল। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া যাত্রীগণ চক্রবেড়ের মধ্যে গিয়া বিষ্ণুপদচিহ্ন দর্শন করিলেন। গয়ালী পাণ্ডাগণ পাদচিহ্নের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বিষ্ণুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল ; গৌরের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অমনি ভাবোচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিল ; কত ভাবলহরীই যে প্রাণে উঠিতে লাগিল, তাহা বর্ণনায় শেষ হয় না। তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থাই ভাবময় ; এতদিন কেবল পাণ্ডিত্যের বাহ্যাড়ম্বরে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। শুভক্ষণে আবরণ উন্মুক্ত হওয়ায় হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইহার পর দেখা যাইবে যে, অল্পমাত্র উদ্দীপনাতেই তদীয় ভাবাবলি অসমোর্দ্ধভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। গয়া পথে সেই উদ্দীপনার আরম্ভ ; গয়াক্ষেত্রে তাহার গাঢ়তা এবং শেষে তাহার অদম্য উচ্ছ্বাস। ইহাই তাঁহার জীবনের উজ্জ্বল ছবি ও এই প্রগল্‌ভা ভক্তি শিখাইতেই তাঁহার মর্ত্ত্যে অবতরণ।

বিধাতার গূঢ় বিধান অতি বিচিত্র ! যে যা চায়, সে তা পায়, কথার সার্থকতা যদি কোনখানে থাকে, তবে তাহা সাধু জীবনেই লক্ষিত হইবে। হরিচরণ পাইবার লালসায় ধ্রুব ব্যাকুল হইয়া বাহির হইলেন, অমনি সদুপদেষ্টা নারদের সাক্ষাৎকার লাভ হইল ; দেবনন্দন ঈশা পিতার অন্বেষণে ব্যাকুল ; অবগাহক যোহন হাজীব। গোরাচাঁদের প্রাণে ভগবত্তৃষ্ণা যেই প্রবল হইল, অমনি সদ্‌গুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে হঠাৎ তাঁহার পুনর্ম্মিলন হইল।

"দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে ;
আইলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই স্থানে।"

সেই নবদ্বীপে সাক্ষাৎ, তাহার পর এই দেখা হইল। তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থা—আকাশ পাতাল ভেদ ভাবিয়া গৌরচন্দ্র কিছু লজ্জিত

হইলেন। পুরীকে প্রণাম করিলে পুরীগোঁসাই গাঢ়প্রেমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও উভয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শচীনন্দন পুরীকে সম্বোধন করিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "আমার গয়ায় আসা সার্থক হইল; কথিত আছে যাহার নামে গয়ায় পিণ্ড দেওয়া যায়, সেই উদ্ধার হয়; কিন্তু আপনাকে দেখিলে কোটি কোটি পিতৃপুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়। আপনি সকল তীর্থের সারতীর্থ; আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান করান্।"

ঈশ্বর পুরীও গৌরের পাণ্ডিত্য ও গুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন "ওহে নিমাই পণ্ডিত! আমি সত্য বলিতেছি যে তোমাকে দেখিলে আমার পরমানন্দ লাভ হয়; আমার বোধ হয় তোমাতে ঈশ্বরাংশ আছে; নইলে তোমাকে দেখিলে কৃষ্ণদর্শনের সুখ হইবে কেন?" এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গ ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেনঃ—হাঁ 'আপনার বড়ভাগ্য বলিতে হইবে।'

ইহার পর কিছু সময়ের জন্য উভয়ে বিদায় লইলে গৌরচন্দ্র লৌকিক কার্য্য করিতে লাগিলেন; ফল্গুতীর্থে বালীর পিণ্ডদান, গিরি-শৃঙ্গে প্রেত-গয়ায় শ্রাদ্ধ, রামগয়া, যুধিষ্ঠিরগয়া, ভীমগয়া, ষোড়শীগয়া, শিবগয়া, ব্রহ্ম-গয়া প্রভৃতি স্থানে পৃথক পৃথক শ্রাদ্ধ করিয়া অবশেষে গয়াশিরে পিণ্ডদান ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতঃ বাসায় আসিয়া রন্ধন করিতে লাগিলেন। রন্ধন সম্পূর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঢুলিতে ঢুলিতে ঈশ্বরপুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরসুন্দর রন্ধনের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরম সম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া পুরীকে বসাইলেন। পুরী গোঁসাই প্রস্তুতান্ন দেখিয়া বলিলেনঃ—'আমি ভাল সময়ে আসিয়াছি।' গৌরচন্দ্র পুরীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেনঃ—

'আমার ভাগ্যে যদি আসিয়াছেন, তবে এই অন্ন ভোজন করুন।' পুরী বলিলেন "তুমি কি খাইবে?" গৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন "আমি আবার রাঁধিব?"

পুরী। "আর পাকের প্রয়োজন কি? যে অন্ন আছে তাহা দুই জনে ভাগ করিয়া খাই না কেন?"

গৌরাঙ্গ। "তা হবে না! আপনাকে সব অন্ন খাইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি আহারের স্থান পরিষ্কার করিয়াদিয়া সমস্ত অন্নব্যঞ্জন স্বহস্তে পরিবেশন করতঃ ঈশ্বর পুরীকে ভোজন করাইলেন ও আপনার জন্য পুনঃ

ক্‌ করিয়া লইলেন এবং ভোজনান্তে মাল্য চন্দন দিয়া পুরীর যথেষ্ট অভ্য-
া করিলেন। অন্যদিনে গৌরাঙ্গদেব ঈশ্বরপুরীকে নিভৃতস্থানে পাইয়া
াহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। পুরী গোঁসাই
ত্তর করিলেনঃ—

"পুরী বলে মন্ত্র বলিয়া কোন্ কথা?
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা।"

তৎপরে ঈশ্বর পুরীর নিকট গৌরচন্দ্র দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার দীক্ষা-
হণ সাধারণ লোকের ন্যায় নহে। প্রথমে যত দিন পর্য্যন্ত ব্যাকুলতার
ায় হয় নাই, তত দিন তিনি পরমার্থ সম্বন্ধে চিন্তাও করেন্ নাই; ব্যাকু-
তা আসিলে আত্মার বলাবল ও আভ্যন্তরীণ স্পৃহা পরীক্ষা করিয়া গুরু-
কৃতি নির্ণয় করিয়া লইলেন এবং শ্রদ্ধাভক্তির উপযুক্ত পাত্রে আত্মসমর্পণ
রিলেন। দীক্ষান্তে নবশিষ্য অভীষ্টদেবকে নিবেদন করিলেনঃ—'এই
হ প্রাণ মন আপনাকে সমর্পণ করিলাম। আপনি প্রসন্ন হউন্; আমি যেন
চিরে কৃষ্ণ প্রেমসাগরে ভাসিতে পারি'।

তখন গুরুশিষ্যে প্রেমে পুলকিত হইয়া পরস্পর গাঢ়তর আলিঙ্গন
রিতে লাগিলেন। উভয়ের পুলকাশ্রুতে উভয়ের শরীর অভিসিঞ্চিত হইল;
াভাবের পূর্ব্বাবস্থা দেখা গেল।

এখন হইতে দিন দিন গৌরের ধর্ম্মরাজ্যের পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল;
ন দিন ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হইতে চলিল। পূর্ব্বের বিদ্যা গৌরব ও দাম্ভিকতা
াথায় পলায়ন করিল? ভগবৎ প্রেম সাগরে তিনি ভাসিতে লাগিলেন।
নিমাই পণ্ডিত আর নাই। তাঁহার সম্বন্ধে দিন দিন সকলই নূতন ও
শ্চর্য্য দেখা যাইতে লাগিল। বিধাতার করুণাহস্ত তাঁহার আত্মাকে
ঙ্গিয়া চুরিয়া নবভাবে গঠন করিয়া জগতে হরিভক্তি ও হরিলীলা প্রচারের
াযোগী করিয়া তুলিল। ইহারই নাম নবজীবন লাভ। দীক্ষাগ্রহণের
কতক দিন তিনি গয়াতে ছিলেন; এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণবিরহ তাঁহাকে
কুল করিয়া তুলিল। "কোথা যাই? কোথা যাইলে তাঁহাকে পাই?
মন করিয়াই বা প্রাণের তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়?" নিরন্তর কেবল তিনি এই
াই করিতে লাগিলেন। আহারে, শয়নে, ভ্রমণে, আলাপে, কিছুতেই
স্থা নাই। কি যেন পাইতে চাই, পাই না; কিসের জন্য যেন প্রাণে ফাঁক
কি লাগে; এই যেন ধরি ধরি, আবার ধরা দেয় না; কি যেন দেখি

দেখি, আর দেখিতে পাই না। এই ভাবে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। অপ্রেমিক ব্যক্তির পক্ষে ঐ অবস্থা বর্ণনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র যাহার অন্তরে এই স্বর্গীয় ব্যাকুলতা বিঁধিয়াছে, কেবল সেই ইহার বিক্রম বুঝিতে পারে। সময়ান্তরে তিনিই এ কথা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন ;— "এই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে" ইত্যাদি। এক্ষণকার অবস্থা বৃন্দাবন দাস মহাশয় এইরূপে বলিয়াছেন ঃ—একদিন নিভৃতে বসিয়া গৌরচন্দ্র নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ধ্যানানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে প্রাণে মহা ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল। তিনি কাঁদিয়া অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন ; "কৃষ্ণরে ! বাপরে ! আমার জীবন শ্রীহরি আমার প্রাণ মন চুরি করিয়া কোথায় গেলে বাপ ? হায় ! আমি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার পাইয়াও হারাইয়া ফেলিলাম।"

তাঁহার সঙ্গী শিষ্যগণ তাঁহাকে অনেক প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া দেশে যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "বন্ধুগণ ! তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও, আমি আর সংসারে ফিরিব না। আমার প্রাণনাথকে যেথানে যাইলে পাইব, সেই দেশে চলিয়া যাইব।" গভীর রজনী যোগে সমভিব্যাহারী লোকদিগকে না বলিয়া তিনি মথুরায় যাইবেন বলিয়া বাসা হইতে বাহির হইলেন এবং "কৃষ্ণরে ! বাপরে ! কোথায় পাইব ?" বলিয়া পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন। কথিত আছে যে যাইতে যাইতে তিনি প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি দিব্য কর্ণে শুনিতে পাইলেন, কে যেন মধুর অস্ফুট শব্দে বলিতে লাগিল—"এক্ষণে মথুরায় যাইবার সময় হয় নাই ; সময় হইলে যাইও। এখন নবদ্বীপে প্রতিনিবৃত্ত হও ; তোমাকে সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ করিতে হইবে ; জগৎবাসীকে প্রেমভক্তি বিলাইতে হইবে ; হরিপ্রেমে বঙ্গদেশ ডুবাইতে হইবে ; এ সব কাজ না করিয়া তোমার সংসার ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।" দৈববাণী শ্রবণ করিয়া গৌরচন্দ্র অনেক শান্তি লাভ করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই গয়া হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এইখানে তাঁহার জীবন ভাগবতের প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হইল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নবজীবন লাভ করিয়া নবপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তিনি যে নবলীলা আরম্ভ করিলেন তাহা পর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন মানুষ।

গৌরচন্দ্র গয়া হইতে নবজীবন লাভ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন রিলেন। সে মানুষ নাই, সে চেহারা নাই। স্বর্গের নূতন আলোকের ্যাতিঃ পড়িয়া সকলই নূতন হইয়া গিয়াছে। পাণ্ডিত্য গর্ব্ব ও চঞ্চল- ার স্থান ব্যাকুলতা ও বিনয় অধিকার করিয়াছে; অনুরাগে ডগমগ ও প্রমাবেগে গরগর হইয়া যখন নদীয়ার রাজপথ দিয়া তিনি স্বভবন- ভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তখনকার ভাব দেখিয়া নবদ্বীপবাসী অবাক্ ইয়া গেল। আত্মীয়গণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলে ্নি জননীর পদধূলি লইয়া সকলের সঙ্গে শিষ্টালাপ করিলেন। পুত্রের নর্ম্মিলনে শচীর মনে আনন্দ সিন্ধু উথলিয়া উঠিল; নববধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার ভৃত হৃদয়কন্দরে প্রেমোল্লাস উচ্ছ্বসিত হইল। গৌরের শ্বশুরগৃহেও ৎসব হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও কেহ বুঝিতে পারেন নাই যে াহাদের ভালবাসার পাত্র আর ক্ষুদ্র পরিবারে আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছে , অনন্তবিশ্বরাজ্যপানে ছুটিতেছে। যাহা হউক, গৌরচন্দ্র কোন মতে াপনাকে সম্বরণ করিয়া স্বীয় অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ রিলেন। পণ্ডিতজী বলিলেন, "নিমাই! তোমার অনুপস্থিতিকালে ামার পড়ুয়াবর্গ আর কাহারও নিকট পাঠ লইতে চাহে নাই; অন্যের কট পড়িয়া তাহাদের তৃপ্তি হয় না; তোমার আগমনপ্রতীক্ষায় হারা সতৃষ্ণ রহিয়াছে; কল্য হইতে তুমি আবার অধ্যাপনা আরম্ভ কর।" ৌরচন্দ্র গুরুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অধ্যাপনার স্থান মুকুন্দ সঞ্জয়ের হ আসিলেন। সেখানে তাঁহার শিষ্যবর্গ ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ল; এবং পুনরায় টোলে অধ্যয়ন অধ্যাপনা আরম্ভ করিবার বন্দোবস্ত রিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন ২।৪টী বিষ্ণুভক্ত বন্ধুগণের ঙ্গ মিলিত হইয়া গৌরচন্দ্র গোপনে তাঁহাদের নিকট গয়ায় যে ভগবানের পূর্ব্ব লীলা দেখিয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিলেন; বলিতে বলিতে াহার নয়নযুগল দিয়া অজস্র অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া দিতে লাগিলেন, অলৌকিক ভাবাবেশে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, সর্ব্ব ঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ও বাহ্য জ্ঞান শূন্য হওয়ায় তিনি আর কিছুই বলিতে

পারিলেন না। কতক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি, এই মাত্র বলিলে "বন্ধুগণ! আজ এই পর্য্যন্ত; কাল অপরাহ্নে গঙ্গাতীরস্থ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া আমার মনের সকল দুঃখ বলিব। তোমরা উপস্থি থাকিও।"

এই অলৌকিক ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া বন্ধুগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহার ভাবিতে লাগিলেন "ইহার তো এরূপ ভাব আর কখন দেখি নাই, তবে কি কৃষ্ণ ইহাকে কৃপা করিয়াছেন? অথবা গয়াপথে ইনি বা ঈশ্বরের কি ঐশ্বর্য্য দেখিয়া থাকিবেন? সরলমতি শচী দেবী পুত্রের ঈদৃশ ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া কত কি আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। যখন উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলিয়া পুত্র কাঁদিয়া উঠিতেন, তখন মায়ের প্রাণে ভয় ও আতঙ্কের সীমা থাকিত না। কখন তিনি গোবিন্দের নিকট পুত্রের শুভকামনা প্রার্থনা করিতেন; কখনও বা স্বস্ত্যয়নাদি করাইতে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং পাড়াপ্রতিবাসী ও আত্মীয় স্বজনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন।

তখনকার বৈষ্ণবমণ্ডলী পুষ্পচয়ন উপলক্ষে প্রতিদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে সম্মিলিত হইতেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় এক ঝাড় বৃহৎ কুন্দফুলের গাছ ছিল; তাহার চারিদিক্ বেড়িয়া বৈষ্ণবগণ সাজি হাতে ফুল তুলিতেন ও নানা প্রকার ধর্ম্মালাপে আনন্দানুভব করিতেন। মধ্যে মধ্যে স্থানীয় সংবাদ ও অন্যান্য নানা রূপ কথাবার্ত্তারও আলোচনা চলিত এবং ভক্তিশূন্য দেশ দেখিয়া কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশও করিতেন। যে দিন নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে বাটীতে পৌঁছিলেন, তার পর দিনে বৈষ্ণবেরা ফুল তুলিতেছেন, এমন সময় শ্রীমান পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। পূর্ব্বদিন যে যে লোকের সমক্ষে গৌরচন্দ্র শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটীতে আপন দুঃখের কথা বলিবেন বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীমান পণ্ডিত একজন। বৈষ্ণবমণ্ডলীতে এই শুভসংবাদ বলিবার জন্য আজ তাঁর হাস্যমুখ। সকলে তাঁহার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীমান কথাটীর একটু গুমর বাড়াইয়া বলিলেন, "অবশ্য কারণ আছে।"

বৈষ্ণবগণ ব্যাকুলতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি কারণ?'

শ্রীমান বলিতে লাগিলেন "বড় অদ্ভুত ও অসম্ভব কথা! নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে পরম বৈষ্ণব হইয়া আসিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বদিনের ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

শ্রীমানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী আনন্দে হরি-
নি করিয়া উঠিলেন। উদারমতি শ্রীবাস পণ্ডিত সর্ব্বাগ্রে এই
লিয়া প্রার্থনা করিলেন যে "কৃষ্ণ আমাদের দলপুষ্টি করুন"। তখন
কলে আনন্দোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ
করিলেন।

এদিকে নির্দ্ধারিত সময়ে শ্রীমান পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত, মুরারি
গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণ পূর্ব্বদিনের কথানুসারে একে একে শুক্লাম্বর ব্রহ্ম-
চারীর কুটীরে আসিয়া একত্রিত হইলেন। গদাধর পণ্ডিতকে আসিতে
না বলিলেও তিনি নিমাই পণ্ডিতের মনোদুঃখের কাহিনী শুনিবার জন্য
অতীব উৎসুক চিত্তে ব্রহ্মচারীর গৃহের প্রকোষ্ঠান্তরে লুকাইয়া থাকিলেন।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী একজন উদাসীন বৈষ্ণব; ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন
করেন। নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া তিনি জাহ্নবীতীরে
এক নিভৃত স্থানে কুটীর রচনা করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। নবদ্বী-
পের ক্ষুদ্র বৈষ্ণবদলের তিনি একজন সভ্য এবং বিশ্বম্ভরের সুপরিচিত।
তাহারই গৃহে গৌরাঙ্গের এই প্রথম সঙ্গত হইল। বন্ধুগণ সকলে উপবিষ্ট
আছেন, এমন সময়ে শচীনন্দন ভক্তি উদ্দীপক শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে
বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আসিয়া দেখা দিলেন এবং 'ঈশ্বরকে পাইয়া হারাই-
লাম', বলিয়া পাগলের ন্যায় ঘরের স্তম্ভ ধরিয়া আলুলায়িত কেশে কাঁদিতে
কাঁদিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন।

এইরূপ গভীরব্যাকুলতাসহকারে যখন শচীনন্দন কাঁদিতেছিলেন ও
পুনঃ পুনঃ অনুতাপ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন শুক্লাম্বরের গৃহ প্রেমময়
হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে কিছু সুস্থ হইয়া তিনি শুক্লাম্বরকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, 'ঘরের ভিতর কে?' শুক্লাম্বর বলিল, 'গদাধর'। গদাধরের
নাম শ্রবণে বিশ্বম্ভরের অনুতাপানল আরও জ্বলিয়া উঠিল এবং প্রাণে
ভাবান্তর উপস্থিত হইল। পাঠক মহাশয় জানেন যে, গদাধর পণ্ডিত
নবদ্বীপের মাধব মিশ্রের পুত্র ও গৌরাঙ্গের একজন বাল্যসখা। ইনি
কুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শুদ্ধশান্তরূপে ভগবদারাধনা করিতে-
ছিলেন। কুঠরী হইতে গদাধর বাহিরে আসিলে বিশ্বম্ভর কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বলিতে লাগিলেন,—"গদাধর তুমিই ধন্য; বালককাল হইতে দৃঢ়তা সহ-
কারে তুমি ভগবদর্চ্চনা করিয়া আসিতেছো। হায়! আমার দুর্ল্লভ মানব-

জন্ম বৃথা চলিয়া গেল। যদি বা শুভক্ষণে গয়ার পবিত্র ধামে অমূল্য নিধি পাইয়াছিলাম; তাহাও নিজদোষে হারাইয়া ফেলিলাম।

এই বলিয়া তিনি প্রত্যেক বন্ধুর গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং ব্যাকুলভাবে সকলকে বলিতে লাগিলেন—'তোমরা আমাকে কৃষ্ণ দিয়া আমার দুঃখ খণ্ডন কর।' তাঁহার তৎকালের ভাব দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়। সমবেত বন্ধুগণ সকলেই কাঁদিয়া অস্থির হইলেন এবং সেই স্বর্গীয়ভাব দেখিয়া কতই বিতর্ক করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিবাবসান হইলে সভাভঙ্গ হইল। গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ বৈষ্ণবসমাজে যাইয়া সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে নানা জনে নানারূপ অনুমান করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "ভগবান্ বা অবতীর্ণ হইলেন?" কোন উগ্র ভক্ত মনের উৎসাহে বলিয়া ফেলিলেন "নিমাই পণ্ডিত ভাল হইলে আগে পাষণ্ডী বেটাদের মুণ্ড ছিঁড়িব।" একজন সুবোধ ভক্ত উত্তর করিলেন, "আরে ভাই! এত ব্যস্ত কেন? ধীর চিত্তে অপেক্ষা কর; প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন কি না, দুদিন পরে অবশ্যই জানা যাইবে?" তাঁহাদের মধ্যে একজন সুচতুর ছিলেন, তিনি বলিলেন, "সাধু সঙ্গের কি মহিমা! ঈশ্বর পুরীর সঙ্গ হইতেই নিমাইয়ের ধর্ম্মজীবনে এই মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" এইরূপে আনন্দকোলাহলে ভক্তগণ বিতর্ক করিতে করিতে নৃত্যগীত প্রভৃতি নানাবিধ মঙ্গলসূচক ধ্বনি করিলেন, আর সকলে সমস্বরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন:—

"সবে মিলি লাগিলা করিতে আশীর্ব্বাদ,
হউক! হউক! সত্য কৃষ্ণের প্রকাশ।"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া শচী দেবীর দিন দিন উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সরলমতি শচী এ সকল ব্যাপারের কিছুই বুঝেন না। স্নেহময়ী জননীর প্রাণ কেবল পুত্রস্নেহই জানে। তিনি মনে করিলেন যে, নিমাইয়ের কোন উৎকট ব্যাধি হইয়াছে; শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়াও যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন নানারূপ খেদ করিতে লাগিলেন।

বধূর মুখ দেখিলে পুত্রের মন ভাল হইবে, বিবেচনায় শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন। অবোধ মায়ের প্রাণ ইহা বুঝিল না যে, বধূতে এ প্রেম চরিতার্থ হইবার নয়। এ যে বিশ্বজনীন প্রেমের তৃষ্ণা! বিন্দুতে এ তৃষ্ণা যাইবে কেন? প্রেমসিন্ধুর তৃষ্ণা কি বিন্দুতে

কি? যে প্রেমের জন্য নারদ শুক পাগল, এ যে সেই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, চী তাহা বুঝিলেন না। যাঁহাকে কত জাঁকজমক করিয়া দুই বৎসর আগে বিবাহ করিয়াছেন, গৌরাঙ্গ তাঁহাকে একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না। ছি! ইন্দ্রিয় সুখ! না, তাহা হইবে না। এই ভাবিয়া বিশ্বম্ভর বধূর পানে আ তাকাইয়া, যেরূপ ভক্তিশ্লোক পড়িতেছিলেন, পড়িতে লাগিলেন, এবং কাথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একবার তিনি এমন ভাবে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন যে, তাহা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ভীতা হইয়া লাইয়া গেলেন; শচীও স্থির থাকিতে পারিলেন না। ফলে এই সময়ে াহার অনুতাপের চরম দশা উপস্থিত; রাত্রিতে নিদ্রা নাই, প্রাণে সর্ব্বাই হুতাশ ও "কিসে পাব? কবে পাব?" এই চিন্তা সার হইল। অপরিচিত লোক দেখিলে কিন্তু তিনি ভাবাবেগ সম্বরণ করিয়া শিষ্টের ন্যায় াহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেন। তাহাতে বাহিরের লোকের পক্ষে াহার পরিবর্ত্তনের অবস্থা বুঝা ভার হইত।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অধ্যাপনা শেষ।

গুরুর অনুরোধে ও পূর্ব্বকৃত স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষার্থে, ইচ্ছা না থাকিলেও নিমাই পণ্ডিত আবার অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এবারে ার সে মন নাই, সে আসক্তি নাই; প্রাণ, মন, আসক্তি, সকলই ভগবানে র্পিত হইয়াছে; সুতরাং যাহা পড়াইতে যান, কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছু াইসে না। চিরপদ্ধতি অনুসারে শিষ্যগণ হরিনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পুঁথির ার খুলিতে লাগিল; এই হরিধ্বনি নিমাইয়ের কর্ণে কতবার প্রবেশ করিাছে; তখন ইহাতে কোনই ভাবান্তর হইত না। এবারে কাণের শক্তি রিয়া গিয়াছে; তাই শ্রবণমাত্রেই ভাবাবেশ ও মত্ততা; বাহ্যজ্ঞান নাই। যে প্রশ্ন করে ও তিনি যাহার যে পাঠ ব্যাখ্যা করেন, তাহাতেই হরিামের মহিমা ব্যাখ্যা-করিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণ নামই সত্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে ষ্ণ নামেরই মহিমা শুনা যায়। শ্রীকৃষ্ণই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। ব্রহ্মা, ব মত দেবগণ, তাঁহারই কিঙ্কর। কৃষ্ণ নাম বিনা যে ব্যক্তি শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা

করে, সে অসত্য বলে। বেদান্তাদি সকল শাস্ত্রের উপদেশ কৃষ্ণপদে ভক্তি করা। মূর্খ অধ্যাপকগণ মায়ামুগ্ধ হইয়া শাস্ত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ভাই সব! কৃষ্ণ জগতের জীবন! করুণার সাগর! ভক্তবৎসল! তাঁর নাম ছেড়ে সর্ব্ব শাস্ত্র পড়িলে কোন ফল নাই; সে পড়া দুর্গতির কারণ মাত্র। অধম জনও তাঁহার নাম লইয়া উদ্ধার হয়। তোমরা এ কথায় সন্দেহ করিও না। কৃষ্ণ ভজন ভিন্ন অধ্যাপনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। শাস্ত্রের মর্ম্ম না জানিয়া গর্দ্দভের ন্যায় শাস্ত্রের বোঝা বহিয়া মরিলে কি হইবে? অতএব আমার কথা শুন, কৃষ্ণমহোৎসবে মাতিয়া জীবন সফল কর।' এই বলিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "যাঁহার পবি[illegible]ংস্পর্শে ছলনারূপিণী পূতনা উদ্ধার হইয়াছে, পাপাত্মতার অঘাসুর আদি পরাজিত হইয়াছে, যাঁহার নামে জগৎ পবিত্র হয় ও সন্তাপিত জীবের দুঃখ দূর হয়; যাঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তনে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিহ্বল ও যাঁহার প্রভাবে মহাপাপী অজামিল পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে; হায়! জীব বৃথা ধনকুলবিদ্যামদে মত্ত হইয়া তাঁহার আস্বাদ বুঝিল না; কেবল অমঙ্গলময় গীত বাদ্যে মুগ্ধ হইয়া থাকিল। ভাই সকল! আমার কথা শুন! আর কেন বৃথা সময় নষ্ট কর। অমূল্য ধন কৃষ্ণপদারবিন্দ ভজন করিয়া কৃতার্থ হও।" পড়ুয়াগণ অধ্যাপকের নবজীবন লাভের বিষয় কিছুই জানিত না; অকস্মাৎ তাঁহার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল এবং পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। এই সময়ে বিশ্বম্ভর বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "এতক্ষণ আমি কি বলিতেছিলাম?" পড়ুয়াগণ বলিয়া উঠিল—"আজ আমরা আপনার কথা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। সকল পাঠেতেই আজ আপনি কেবল কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা করিলেন।"

বিশ্বম্ভর ভাবব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা! আজ তবে পুঁথি বন্ধ কর; চল সকলে গঙ্গাস্নানে যাওয়া যাক্; অন্য সময়ে আবার পাঠ ব্যাখ্যা করা যাইবে।"

সে দিনকার পড়ান এই পর্য্যন্ত। গঙ্গাস্নানান্তে শিষ্যগণ চলিয়া গেল। বিশ্বম্ভর যথাবিধি পূজা অর্চ্চনার পর মাতৃসন্নিধানে ভোজন করিতে বসিলেন। পুত্রের মনের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য জননী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাছা নিমাই! আজ কি পুঁথি পড়াইলে? কাহারও সঙ্গে ত কোন্দল নাই?" পুত্র উত্তর করিলেন,—"আজ কেবল কৃষ্ণনাম পড়াইয়াছি।

। শ্রীকৃষ্ণ চরণকমলই সত্য; কৃষ্ণনামগুণ শ্রবণ কীর্ত্তনই সত্য; কৃষ্ণ-বকই ধন্য। সেই সত্য শাস্ত্র, যাহা কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেয়; তদ্ভিন্ন স্ত্রপাঠ পাষণ্ডত্ব লাভের কারণ। চণ্ডালও চণ্ডাল থাকে না, ঐ পবিত্রনাম রিলে; দ্বিজও দ্বিজ থাকে না, ঐ নাম ছেড়ে অসৎ পথে চলিলে।" লিতে বলিতে ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বম্ভর জননীকে ভগবদ্ভক্তিই নবজীবনের সার, এই বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি মাতাকে ম্বোধন করিয়া বলিলেন "মা! শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ কর; কৃষ্ণভক্তের জীবনই চ! কালচক্রেও কৃষ্ণদাসের কিছুই করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ গর্ভবাসে াবের যে দুর্গতি, তাহা ত জান; এই দুঃখ হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় কমাত্র হরিভক্তি। অতএব হরিপদাম্বুজ আশ্রয় কর।"

"জগতের পিতা কৃষ্ণ; যে না ভজে বাপ!
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ!"

পরদিন প্রাতে শচীনন্দন আবার বিদ্যামন্দিরে যাইয়া বসিলেন; ড়ুয়াগণ আসিয়া আবার পাঠ চাহিতে লাগিল। কোন শিষ্য জিজ্ঞাসা রিল—"সিদ্ধবর্ণ সমন্বয় কি?" গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপ্রেমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য; উত্তর রিলেন "সকল বর্ণে নারায়ণই সিদ্ধ।"

শিষ্য। "কিরূপে বর্ণ সিদ্ধ হইল?"

উত্তর। "শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপাত হেতু।"

শিষ্য। "আপনি কি বলিতেছেন? বুঝিতে পারিলাম না।"

উত্তর। "সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ কর; আদি, মধ্য, অন্তে, সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ-জনই বুঝা যাইতেছে।"

ঈদৃশ প্রলাপবাক্য শুনিয়া শিষ্যগণ হাসিতে লাগিল ও পরস্পর বলা বলি রিতে লাগিল "পণ্ডিতের বিষম বায়ু রোগ উপস্থিত; নৈলে এমন লাপ বকিবেন কেন?" হায় রে! সংসার তুই না পারিস্ এমন কাজ নাই। হার চখে সোণা রাং, আর রাং সোণা। তা না হইলে কি আর দেবনন্দন শার ক্রুশে প্রাণ যায়? হরিদাস ঠাকুর বাইশ বাজারে প্রহারিত হন? াকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় শাক্যকে গ্রামে গ্রামে তাড়াইয়া লইয়া বেড়ায় বং গৌরাঙ্গকে পাগল সাজায়? সাবাস তোর বুদ্ধি! তোর বুদ্ধি তোতেই াক্; ভগবান্ উহা হইতে আমাদের দূরে রাখুন। এই সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত রিয়া গৌরের শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—,

"পণ্ডিত মহাশয়! আপনি আজ কি আবল তাবল বকিতেছেন? আমরা শাস্ত্রার্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। গৌরাঙ্গ একটু অপ্রতিভের ন্যায় উত্তর করিলেন "কেন আমিতো ঠিক ব্যাখ্যা করিতেছি; তবে তোমরা যদি বুঝিতে না পার, এখন থাকুক। বিকালে আসিও, ইহার মধ্যে আমিও পুঁথি দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়া ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।" শিষ্যগণ পুঁথিতে ডোর দিয়া উঠিয়া গেল, এবং দলবদ্ধ হইয়া বিশ্বম্ভরের অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট যাইয়া আদ্যোপান্ত নিবেদন করিয়া উপদেশ চাহিল।

এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গঙ্গাদাস ওঝা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন;— "বিকালে তোমরা বিশ্বম্ভরকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিও, আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব, যেন পূর্ব্বের ন্যায় ভাল করিয়া অধ্যাপনা করেন।" ছাত্রেরা নিমাইকে গুরুর ইচ্ছা জানাইলে, তিনি অপরাহ্নে গঙ্গাদাসের গৃহে আসিয়া অধ্যাপকের চরণবন্দনা করিলেন। গঙ্গাদাস সাদাসিদে লোক; সংসারে থাকিয়া শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থের কর্ত্তব্যসকল সাধন করিতেন; এবং তাহার মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানও ছিল। কিন্তু নিমাইকে যে সাপে দংশন করিয়াছে, তাহার তিনি ওঝা নহেন; সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি খুলে নাই; সুতরাং যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। সংসারের মুরুব্বিপক্ষ চিরকালই ঐরূপ উপদেশ দিয়া আসিতেছে; তিনি বলিলেন:—"বৎস বিশ্বম্ভর! দেখ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া অধ্যাপনা করা অল্পভাগ্যের বিষয় নয়। যার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, পিতা জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর, যার কোন কুলে কখন মূর্খ নাই, তার কি অধ্যাপনায় ঔদাস্য সাজে? তুমিতো পরম পণ্ডিত; আচ্ছা বল দেখি? যদি অধ্যাপনা ছাড়িলে ভক্ত হওয়া যায়, তাহা হলে তোমার বাপ মাতামহকে কি ভক্ত বলিবে না? তাঁহারা তো কখন অধ্যাপনা ছাড়েন নাই। অধ্যয়নই ধর্ম্মের জীবন। অতএব কথা মান; টোলে যাইয়া পূর্ব্ববৎ অধ্যয়ন করাও। অবান্তর অর্থ করিও না, আমার মাথার দিব্য।"

গুরুর উত্তেজনায় ও উপদেশে আবার একবার বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বভাব উদয় হইল। বিদ্যাগৌরবে নবজীবনের প্রেমজ্যোতিঃ একবার মাত্র আচ্ছন্ন হইল; কালো মেঘে প্রাতঃসূর্য্য কিরণ একবার ঢাকা পড়িল। তিনি অহঙ্কারব্যঞ্জক বিনয়ের সঙ্গে উত্তর করিলেন "দেব! আপনার শ্রীচরণকৃপায় এই নবদ্বীপে এমন পণ্ডিত দেখি না, যে আমার সঙ্গে বিচারে আঁটিয়া উঠিবে; আমি যে

াখ্যা করিব, দেখি দেখি কে আসিয়া তাহা দূষিতে পারে? আপনার াজ্ঞায় শিষ্যবৃন্দ লইয়া এই আমি অধ্যাপনায় চলিলাম।” এই বলিয়া ারু পদধূলি লইয়া নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপনা করিতে চলি-লন। গুরুর আনন্দের সীমা রহিল না; শিষ্যবৃন্দ উৎসাহধ্বনিতে চারি াক পূর্ণ করিল। গঙ্গাদাস! সাবধান, এ পড়ান তো পড়ান নয়, এ যে র্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখার আলো, অস্তমিত সূর্য্যের প্রখর কিরণ। যে দয় অনন্তের দিকে ছুটিয়াছে, তোমার সাধ্য কি যে, তাহার আবেগ ফরাও? ভাই শিষ্যবৃন্দ! তোমাদেরও বলি, এই বার মরণ খাওয়া খাইয়া ও; যত দূর পার পাঠ চাহিয়া লও; আর কিন্তু হবে না।

শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া গৌরচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় গর্ব্বের সহিত পড়াইতে াগিলেন। ছাত্রদের আনন্দের সীমা নাই; যাহার যত সন্দেহ ছিল ও নূতন াঠ লওয়ার প্রয়োজন হইল, সকলই সম্পূর্ণ হইল। নিমাইয়ের মুখশ্রীতে ্র্ব্বের ঔদ্ধত্য আবার দেখা দিল। ছাত্রেরা মনে করিল, অধ্যাপকের বায়ু-রাগ আরোগ্য হইয়াছে। সকলের পাঠ দেওয়া সমাপ্ত হইলে, গৌরচন্দ্র াচলিত বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতে লাগি-লন;—"যাদের সন্ধিকার্য্য জ্ঞান নাই, কলিযুগে তাদেরই ভট্টাচার্য্য উপাধি; াদের শব্দ জ্ঞান নাই, তাহারা তর্ক করিয়া মরে। আচ্ছা আমার খণ্ডন স্থাপন, দেখি কাহার সাধ্য অন্যথা করুক?”

ও কি ও! বিদ্যাগৌরবের মধ্যে ও কি হলো! সর্ব্বনাশ! নিমাই পণ্ডিত ্ছিত হইয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দেন কেন? শিষ্যেরা অবাক্ হইয়া কছু বুঝিতে না পারিয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিল। অবশেষে ্ছার কারণ বাহির হইয়া পড়িল। যে দরজায় বসিয়া নিমাই পণ্ডিত ড়াইতেছিলেন, রাস্তার অপর পার্শ্বে আর এক দরজায় রত্নগর্ভ আচার্য্য ামে একজন শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ একাকী বসিয়া সুমধুরস্বরে ভাগবত পাঠ রিতেছিলেন। তাঁহার উচ্চারিত ভক্তিরসাত্মক শ্লোকের আভাস বিশ্ব-রের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল। আর যাবে কোথায়! প্রচ্ছন্ন অগ্নি দ্দীপিত হইয়া উঠিল; কৃপাবাতাসে দম্ভের মেঘ কাটিয়া গেল; আর হভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। নিমাই! তুমি যে প্রভুর ফাঁদে পড়িয়াছ, ার কি তোমার স্বাধীনতা আছে? বৃথা অধ্যাপনার চেষ্টা। যাহা করিতে প্ররিত হইয়াছ, তাহা না করিয়া কি তুমি থাকিতে পার? ধন্য প্রভু! তোমার

লীলা বুঝে কে? মূর্চ্ছাভঙ্গে গৌরচন্দ্র কতক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণসুখসাগরে নিমগ্ন থাকিলেন; রত্নগর্ভও দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত শ্লোকাবৃত্তি করিতে লাগিলেন। পুলক, অশ্রু, কম্পে গৌরাঙ্গ বিভোর হইয়া গেলেন। পথে রথের লোক জুটিল। একটা মহাব্যাপার হইয়া গেল। বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া গৌরচন্দ্র শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম?" তাহারা উত্তর না করায়, তিনি সকল বুঝিলেন ও তাহাদিগকে লইয়া ভ্রমণার্থে জাহ্নবীতীরে চলিলেন।

বার বার তিনবার। পড়ুয়াগণ আজ দেখিয়াই পড়া ছাড়িবে। প্রাতে তাহারা আসিলে গৌরচন্দ্র পড়াইতে বসিলেন। পূর্ব্বদিনের ভাবে তখন বিভোর। ইহার মধ্যে একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল "ধাতুর সংজ্ঞা কি?" নিমাই উত্তর করিলেন "হরিশক্তিতেই ধাতুর প্রকাশ; জগতে যত নর নারী রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র দেখিতেছো, যাহারা যৌবনগর্ব্বে বা ধনগর্ব্বে স্ব দেহ মাল্য চন্দনে সুশোভিত করে; তাহাদের ধাতু গেলে কি অবস্থা হয় ভাবিয়া দেখ দেখি, কোথায় সে অঙ্গ সৌন্দর্য্য চলিয়া যায়? কারও দেহ ভস্ম হইয়া যায়, কাহাকেও মাটীতে পুঁতিয়া ফেলে, কাহারও শরীর শৃগাল কুকুরের উদরপূরণ করে। যাহাকে ভাল বাসি, ভক্তি করি, সে আর কিছু নয়, জীবন্ত হরিশক্তি ধাতুরূপে আবির্ভূত। এখন মহাপূজ্য জ্ঞানে যাঁহাকে প্রণাম করি, ধাতু গেলে তাঁহার স্পর্শে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়। যে বাপের প্রতি পুত্রের কতই সম্মানভক্তি, সে বাপের ধাতু গেলে পুত্র তার মুখে আগুণ দেয়। বিদ্যাবান্ অধ্যাপক কি ইহা বুঝে? কিন্তু এ কথা ঠিক কি না তোমরা বুঝিয়া দেখ। এমন পবিত্র পূজ্য যে হরিশক্তি, তাঁকে কি তোমরা ভক্তি করিবে না? বলিতে বলিতে উৎসাহে তাঁর প্রাণ নাচিয়া উঠিল; তিনি বিহ্বল হইয়া দশমুখে ভগবানের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন, এবং ব্যাকুলতা ও আগ্রহ সহকারে শিষ্যদিগকে হরিপাদপদ্ম পূজা করিতে উপদেশ দিলেন। অল্পক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নিমাই পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কিরূপে ধাতু ব্যাখ্যা করিলাম?" শিষ্যগণ উত্তর করিল, "যাহা বলিলেন তাহার একটুও মিথ্যা নয়। কিন্তু আমাদের যে উদ্দেশে পড়া, তাহার অর্থ উহা নয়।"

নিমাই। "আচ্ছা! তোমরা কি মনে কর, আমার বায়ুরোগ হইয়াছে?"

শিষ্য। "এক হরিভক্তি ও হরিনাম ভিন্ন আপনার মুখে আসিতেছে

। ইহাতে যা মনে করুন।" এই বলিয়া গয়া হইতে আগমনের পর
হার যে যে ভাব তাহারা দেখিয়াছিল, সকল বিবৃত করিল। গৌরচন্দ্র
বন্ধুদিগের কথা শুনিয়া বলিলেন "তোমরা যাহা বলিতেছ, সকলই সত্য।
ামি দিবারজনী সর্ব্বত্র কেবল শ্রীহরির বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতেছি;
মস্ত জগতে তাঁহার পবিত্র মন্দির লক্ষিত হইতেছে; শ্রবণবিবরেও তাঁহার
াম ভিন্ন আর কিছু প্রবেশ করে না। সেই জন্য সকল কথাতেই হরিনাম
হির হইয়া যায়। এ কথা আর কে বিশ্বাস করিবে? তোমাদের কাছে
বলিলে নয়, তাই বলিলাম। অতএব ভাই সকল! আমাকে ক্ষমা কর;
ামা হইতে আর অধ্যাপনা চলিবে না। তোমরা অন্যত্র যাইয়া আপন
াপন অভীষ্ট সিদ্ধ কর।" এই বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে পুস্তকে
ার দিলেন।

শিষ্যগণ তখন গৌরের অবস্থা কিছু বুঝিতে পারিল এবং সজলনয়নে
লিতে লাগিল "পণ্ডিত! আমরা আপনার কাছে যাহা পড়িলাম, তাহাই
াল; অন্য ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিতে ইচ্ছা নাই, আর পড়িবারও
াদ নাই।" বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন "যদি তোমাদের ইহাই অভিলাষ,
বে আর পড়ায় কাজ নাই; এসো সকলে এক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করি।
াহার কৃপায় আমাদের সকল শাস্ত্রের জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হইবে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ।

টোল ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার ছাত্রদিগকে লইয়াই গৌরচন্দ্র প্রথম
ীর্ত্তনদল গঠন করিলেন। মৃদঙ্গ নাই, করতাল নাই, রাগরাগিণী-
ুক্ত সুর তাল নাই, কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হইয়া ব্যাকুলতা সহকারে
ত তালি দিয়া আঙ্গিনায় বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যে
র্ত্তনের মধুরলহরী কিছুদিন পরে বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিল;
াার তরঙ্গাঘাতে কত পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া নবজীবন লাভ
রিয়াছিল এবং যাহা ধর্ম্মজগতে সাধনভজনের এক অমূল্য সামগ্রী
ইয়া আজ পর্য্যন্ত কত পাপীকে পুণ্যপথে আকর্ষণ করিতেছে, তাহার

প্রথম প্রকাশ এইরূপে হইল। জগতের যত কিছু মহদ্বিষয় এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞান জগতে মাধ্যাকর্ষণ, বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার প্রভৃতি সকলই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

পরমার্থ সাধনে সঙ্কীর্ত্তন যে একটী প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। তানলয় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে প্রাণের সুকোমল ভাবকুসুম যখন প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, যিনি তাহা সাধনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন, তদ্দ্বারা শিব সুন্দর রূপ বিদ্ধ হয় কি না। গৌরের দেহ মন প্রাণ সকলই ভাবময়; মহাপ্রেমের উৎস তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত; ভগবানের শিবসুন্দররূপে তিনি একান্ত মগ্ন; সুতরাং তদীয় সাধনপথে সঙ্কীর্ত্তন যে প্রধান সহায় হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এক সময়ে সঙ্কীর্ত্তন মাহাত্ম্য তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন;—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং, ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং, বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং, প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।'
সর্ব্বাত্মস্নপনং, পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনং॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ত্তনে চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়; সংসারদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়; ইহার কৌমুদী আলোকে শ্রেয়ঃকুমুদ বিকশিত হয়; ইহাদ্বারা (অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া) বিদ্যাবধূ সঞ্জীবিত হয়; আনন্দজলধি সম্বর্দ্ধিত হয়; ইহার প্রতিপদ অমৃতের পূর্ণ আস্বাদযুক্ত; এবং ইহা প্রাণ মন প্রভৃতি সর্ব্বাত্মার তৃপ্তিকারী।

যে সকল ছাত্র পাঠ ছাড়িয়া গৌরের সঙ্গে ভগবদারাধনা করিতে ইচ্ছুক হইল, তিনি তাহাদিগকে সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। সঙ্কীর্ত্তন কাহাকে বলে ও কিরূপে সাধন করিতে হয়, তাহারা তাহার কিছুই জানিত না। গৌরচন্দ্র নিজে পদ বাঁধিয়া, ধুয়া গাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহারা প্রথমে যে পদ গাইতেন, সেটী এই;—

"হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

হাতে তালি দিয়া সশিষ্যে এই পদের ধুয়া গাইতে গাইতে বিশ্বম্ভর নৃত্য

করিতে লাগিলেন; কখন হুঙ্কার ও উচ্চহাস্য করেন ও কখন মগ্ন অবস্থায় থাকেন। কখন কখন প্রেমে বিভোর হইয়া তিনি আছাড় খাইয়া পড়িতেন, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইত; তথাচ বাহ্যজ্ঞান হইত না। চীৎকার ও গণ্ডগোল শুনিয়া প্রতিবাসী ও পথের লোক আসিয়া জুটিত; এ সব রঙ্গের তাহারা কিছুই বুঝিত না; সুতরাং অবাক্ হইয়া দেখিত ও যাহার যাহা মনে আসিত, বলিত। অদ্বৈতের বৈষ্ণবদলেরও ২।৪ জন লোক কীর্ত্তনের সময় আসিতেন; তাঁহারা এই ভাবের ভাবুক, সুতরাং অন্য লোকের মত তাঁহারা বাজে কথা বলিতেন না। বিশ্বম্ভরের অলৌকিক ভাবাবেশ ও প্রেমদর্শনে তাঁহাদের মনে কত চিন্তারই উদয় হইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া অদ্বৈতের মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, অচিরাৎ ভগবৎশক্তি অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের দমন করিবে ও ধর্ম্ম সংস্কার করিবে। নিমাই পণ্ডিতের জীবনের এই পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের ঐ বিশ্বাস একটু একটু করিয়া উদ্দীপিত হইতে লাগিল।

মানবাত্মায় অবতীর্ণ ভগবচ্ছক্তির বিকাশই অবতার; গৌরের হৃদয়ে সেই শক্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল; এতদিন বিদ্যার মেঘে ঢাকা ছিল; এখন দিন দিন প্রকাশ পাইতে লাগিল। মানবাত্মা দুই প্রকার উপায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে সক্ষম। এক আপনার মধ্যে, দ্বিতীয় সৃষ্টির মধ্যে। আমি যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি এবং আমার মধ্যে যে সকল স্বর্গের ভাব উপলব্ধি করিতেছি, ইহা হৃদয়ঙ্গম করাই নিরালম্ব জ্ঞান। তুমি বলিতে পার, ঈশ্বর নাই বা তাঁহাকে জানা যায় না; তুমি পণ্ডিত, জ্ঞানী ও সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী। আমাকে নানা যুক্তিকৌশলে ফেলিয়া তোমার মত বুঝাইয়া দিলে। কিন্তু আমার প্রাণ তাহা মানিল না, আমি যে তাঁহাকে করামলকবৎ স্পর্শ করিয়াছি; প্রাণের প্রাণ বলিয়া অনুভব করিয়াছি এবং রস স্বরূপ তৃপ্তি হেতু বলিয়া আস্বাদ করিয়াছি। সুতরাং তোমার কথায় ভুলিব কিরূপে? কিন্তু এই জ্ঞান আপনা আপনি সকলের অন্তঃকরণে সকল সময়ে বিকশিত হয় না; আর যদিও অল্প কিছু হয়, তাহা সংসারের পাপ-প্রলোভন কাটিয়া উঠিয়া সর্ব্বাবস্থায় মানুষকে কল্যাণের পথে, পরিত্রাণের পথে অগ্রসর করিতে সমর্থ হয় না। হৃদয়ক্ষেত্রে বীজ রোপিত আছে, তাহাতে যথোপযুক্ত পরিমাণে উত্তাপ, জল, বায়ু না দিলে অঙ্কুরিত হয় না। কুসুমকলিকা গাছে আছে; কিন্তু বসন্ত মারুত না লাগিলে ফুটে না। তাই

বাহিরের আলোক প্রয়োজন, স্বাবলম্ব জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জ্ঞা সৃষ্টিরাজ্য হইতে লাভ করিতে হয়। তাহা আবার দুই প্রকারে সি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জড় জগতের মধ্য দিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, পর্ব্বত, কানন, মেঘ, গাছ, পাতা, নদী, পুষ্প, বায়ু, জল, প্রভৃতি যাবতী সৃষ্ট বস্তু নানা দেশে, নানা ভাবে ও নানা উপায়ে এই জ্ঞান মানবাত্মা ঢালিয়া দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী হইতে মানবমণ্ড পর্য্যন্ত সকলই অন্য প্রকারে, অন্য ভাষায় সেই জ্ঞান পুষ্টির সাহায্য কা তেছে। এই উভয়বিধ পদার্থ সকলই সেই বিশ্ব গুরুর ভাষারূপে তাঁহা ভাব প্রকাশ করিতেছে; স্বয়ং কেহই গুরু নয়, কিন্তু মহাগুরুর মহামন্ত্র। এ প্রভেদ টুকু স্মরণ না রাখাতেই জগতে গুরুবাদের মধ্যে মহাপাপ, অবতার বাদের মধ্যে নরপূজা প্রবেশ করিয়াছে। গাছ, পাথর, জীব, জন্তু, মানু গুরু ও দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে। যাহাহউক, জগতের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এই বিশাল জ্ঞানরাশিও মানবাত্মার পরিত্রাণের পক্ষে সকল সময়ে যথেষ্ট হয় নাই, পাপের প্রবলশক্তির নিকট এই সার্ব্বভৌমিক জ্ঞানও পরাস্ত হইয়া গিয়াছে। সেজন্য করুণাময় বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধিতে মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ আলোক আসিয়াছে, আসি- তেছে ও চিরকালই আসিবে। সেই আলোক মানবাত্মার ভিতর দিয়া আসিয়া অধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে, ধর্ম্মের পথ প্রশস্ত করিতেছে ও বিশে বিশেষ জাতির দুরবস্থা মোচন করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করি- তেছে। যে সকল পাত্র অবলম্বন করিয়া এই আলোক আসিয়া থাকে, পৃথিবীর ভাষায় তাঁহারা মহাপুরুষ, প্রেরিত বা অবতার প্রভৃতি নানা শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। শব্দে কিছু যায় আইসে না, বস্তু ঠিক থাকিলেই হইল।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়, সম্ভবামি যুগে যুগে।"

'সম্ভবামি যুগে যুগে'—তবে কি অনন্ত নিত্য সর্ব্বজ্ঞ প্রভু, জরা মরণশীল ক্ষুদ্র মানবশরীর ধারণ করেন? না, তাহা অসম্ভব। 'সম্ভূত' হওয়ার অ 'প্রকাশিত'। যে আধার অবলম্বন করিয়া তিনি প্রকাশিত হন, তাহা অ হইতে তাঁহার 'তিনিত্ব' সম্পূর্ণ পৃথক্। সমস্ত সৃষ্টিতেই তিনি প্রকাশিত সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক্।

'আমি ত জগতে বসি, জগত আমাতে ;
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে।' চৈঃ চঃ

ঈশা, মুষা, শাক্য, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের ব্যক্তিত্ব যাহা, তাহা হইতে অবতীর্ণ ভগবত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটী আধার, অপরটী আধেয়, একটী পায় আর একটী প্রাপ্য। গৌরের আভ্যন্তরীণ প্রেম যতই বিকসিত হইতে লাগিল, তদীয় শিষ্যগণ ততই উপকৃত হইতে লাগিলেন ; চারিদিকের অজ্ঞানান্ধকার কাটিয়া গিয়া ততই প্রেম চন্দ্রমার আলোকে নবদ্বীপ আলোকিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই মঙ্গলের মধ্যে অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল, কুসুমকোরকে কীট প্রবেশ করিল। গৌরের ব্যক্তিত্ব হইতে ভগবত্ব পৃথক করিতে না পারায় শিষ্যগণ গোলে পড়িলেন ; বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিনাশের বীজ লুকায়িত রহিল। যাহা হউক, এইরূপে নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন প্রচার হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভক্ত সেবা।

এই সময়ে বিশ্বম্ভর সাধুসেবা করিতে যত্নবান্ হইলেন। নবদ্বীপের অধ্যাপকদিগের আচার ব্যবহার তাঁহার নিকট কিছু অবিদিত ছিল না ; সুতরাং তাঁহাদিগকে তিনি ভক্তি করিতে পারিলেন না। তবে যাহাদিগকে তিনি পূর্ব্বে পরিহাস ব্যঙ্গ করিতেন, অদ্বৈতের দলভুক্ত সেই বৈষ্ণবদিগের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বাপরই শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহারা শাস্ত্র ব্যুৎপত্তিতে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য লাভ না করিলেও সরল বিশ্বাসী, ভক্তিমান্ ও প্রেমপিপাসু ছিলেন ; গয়া হইতে আগমনের পর তাঁহাদিগের প্রতি গৌরচন্দ্রের শ্রদ্ধা, ভক্তিতে পরিণত হইল। তখন তিনি এই সকল লোকের সহবাসে থাকিবার জন্য ও তাঁহাদিগকে সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ; প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানে যাইয়া শ্রীবাসাদিকে দেখিলেই ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেন ; তাঁহারাও 'কৃষ্ণে মতি হউক' বলিয়া দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। কাহারও পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেন, কাহারও আর্দ্র বস্ত্র নিঙড়াইয়া দিতেন, কাহারও দেবার্চ্চনার ফুলের

সাজি বহিয়া যাইতেন। ধন্য প্রেম! ধন্য তোমার মহিমা! সত্য সত্যই তুমি পাষাণ গলাইয়া জল করিতে পার। পূর্ব্বে যাঁহার ঔদ্ধত্যে বৈষ্ণবগণ অস্থির হইতেন, তোমার মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া আজ্ সেই নিমাই কি করিতেছেন! আরও কত কাণ্ড হইবে, তাহা কে জানে? নিমাই বয়ঃকনিষ্ঠ; বৈষ্ণবেরা বর্ষীয়ান্ এবং তখনও তাঁহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি হয় নাই; সুতরাং নিঃশঙ্কে তাঁহারা তদীয় সেবা গ্রহণ করিতেন এবং নানারূপে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

বিশ্বম্ভর অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তিনি এখন ভক্তি পথ অবলম্বন করিতেছেন, ইহাতে বৈষ্ণবদিগের প্রাণে মহানন্দের সঙ্গে সঙ্গে মহতী আশাতরু বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নবদ্বীপে পাষণ্ডীর সংখ্যা বড় কম নয়। পাষণ্ডীদিগের উৎপাতে ও বিদ্রূপে তাঁহারা জর্জ্জরিত। এখন বিশ্বম্ভরের দ্বারা তাহারা পরাজিত ও ভক্তি পথে নীত হইতে পারিবে, এই আশায় তাঁহারা আরও উল্লসিত হইলেন। নিমাইয়ের সেবাতে তুষ্ট হইয়া অন্যান্য আশীর্ব্বাদের মধ্যে তাঁহাদের এ বিষয়ে আশীর্ব্বাদও শুনা যাইতে লাগিল :—'বৎস বিশ্বম্ভর! শ্রীকৃষ্ণচরণে তোমার মতি হউক। দেখ কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা বুদ্ধিতে কোন ফল নাই। শ্রীকৃষ্ণ জগত্ জীবন ও জগতের পিতা। তাঁহার সেবাতেই যথার্থ শ্রেয়ঃ লাভ হয়। এই নবদ্বীপে তো কত অধ্যাপক আছেন, কত তপস্বী, সন্ন্যাসী, গৃহী আছেন, কই কাহারও মুখে তো হরিভক্তির একটী কথাও শুনা যায় না? সকলই বকধার্ম্মিক, সকলেরই ভণ্ডামী। চারিদিক ভক্তিশূন্য দেখিয়া আমাদের প্রাণ যে কি সন্তাপিত হইয়াছে, তাহা গোবিন্দই জানেন। কিন্তু এক্ষণে আশা করি যখন ভগবান তোমাকে এ পথে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, তখন অবশ্যই আমাদের মনোদুঃখ দূর হইবে, পাষণ্ডী উদ্ধার হইবে। যেমন তুমি বিদ্যাবলে সকল পণ্ডিতকে জয় করিয়াছ, তেমনি প্রেমবলে পাষণ্ডীদিগকে গলাইয়া দিবে। তুমি চিরজীবী হও, তোমা হইতে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশিত হউক, জীবনিস্তার হউক, জগত তরিয়া যাউক।'

ভক্তের আশীর্ব্বাদ শুনিয়া গৌরের সুখের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া মধুর স্বরে কত কথাই বলিলেন :—'ভক্তের আশীর্ব্বাদে সকল সিদ্ধ হয়; আপনারা যখন প্রসন্ন হইলেন, তখন অবশ্য আমি কৃষ্ণভক্তি পাইব; ভক্তাধীন ভগবান্ অবশ্যই ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।'

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থকারগণ এই সকল ব্যবহারের সহিত গৌরের পূর্ণ ব্রহ্মের

বৈষ্ণবগণ দেখিয়া কৌশল করিয়া উভয় দিক্ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'ভক্তাধীন ভগবান্' এই মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আপনাদের মত রক্ষা করিয়াছেন। ভক্তের সকল কার্য্যই ভগবান্ সম্পন্ন করিয়া থাকেন; গৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান্; অতএব তিনি আপন কিঙ্করের সেবা করিলেন। দ্বিতীয় তর্ক এই যে গৌররূপে ভগবান্ ভক্তাবতার হইয়াছেন; নিজে আচরণ করিয়া অপরকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াই এ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধু সেবা ও সাধু সম্মাননা, ভক্তি সাধনের প্রধান অঙ্গ। সেই উপদেশ দিবার জন্যই গৌরচন্দ্র এইরূপ বৈষ্ণবসেবা করিয়াছিলেন। আর বৈষ্ণবদিগের প্রোক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে এই কথিত হইয়াছে যে তখনও গৌর আপনার ঈশ্বর স্বরূপ প্রকাশ করেন নাই; তাই বৈষ্ণবগণ চিনিতে না পারিয়া সামান্য মানবের ন্যায় তাঁহার প্রতি আশীর্ব্বাদাদি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতমিলন।

অদ্বৈতের নিকট বিশ্বম্ভর চিরপরিচিত; তবে আবার অদ্বৈতমিলন কি? বাহিরের পরিচয়ে মিল হয় না; প্রাণে প্রাণে মিলই মিল। আমরা জগতের অনেক লোককে চিনি; কিন্তু সে চেনায় কি কিছু ফল হয়? যখন দুইটী আত্মা এক প্রাণে, এক ভাবে, এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনন্তের দিকে ছুটে, তখনই প্রকৃত রূপে মিলন হয়। অদ্বৈতমিলনের প্রসঙ্গেও তাহাই বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিশ্বম্ভরের অগ্রজ বিশ্বরূপ অদ্বৈতের টোলে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন। বিশ্বম্ভর তখন ৭।৮ বছরের বালক, হেলিতে দুলিতে মাতৃআজ্ঞায় কখন কখন অগ্রজকে ডাকিতে যাইতেন; অদ্বৈত তখন হইতেই বালকের মনোহর কান্তি ও স্বর্গীয় শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তদবধি তিনি বিশ্বম্ভরের প্রতি বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার পরে বিশ্বম্ভরের বিদ্যাবিলাস ও ভক্তিহীন শাস্ত্র জ্ঞান এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশের সময় তাহার সহিত বড় একটা মাখামাখি ছিল না। এখন মণ্ডলীর লোকমুখে

নিমাইয়ের অপূর্ব্ব ভক্তিলাভের কথা শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বড় সুখী হইলেন। চারি দিকে বিষ্ণুভক্তি শূন্য ধর্ম্মহীন লোক দেখিয়া অদ্বৈত প্রাণের দুঃখে কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতেন না, ভগবানকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য সর্ব্বদা সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন এবং অবশিষ্ট সময় ২।৪ জন সমদুঃখী বৈষ্ণব লইয়া ভক্তিআলোচনায় সময় যাপন করিতেন। এমন সময়ে এক দিন তাঁহার দলস্থ বন্ধুগণ আসিয়া বিশ্বম্ভরের পরিবর্ত্তিত জীবনের আশ্চর্য্য মহাভাবের লক্ষণ সকল যাহা দেখিয়াছিলেন, তাঁহার বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন। তখন অদ্বৈতও পূর্ব্বরাত্রিতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'গীতার এক স্থানের একটী পাঠ ও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মনোদুঃখে উপবাস করিয়া আমি কাল রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছিলাম; এমন সময়ে একজন আসিয়া যেন আমাকে সেই অর্থ বলিয়া দিয়া উঠিয়া পান ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং বলিলেন যে "আর দুঃখ করিও না, যাঁহাকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য এত সাধ্যসাধনা করিতেছিলে, সেই প্রভু আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বর্গের দুর্ল্লভ ভক্তি দেশে প্রচারিত হইবে, কোটি কোটি নরনারী উদ্ধার হইয়া যাইবে, আর এই শ্রীবাসের গৃহে সকল বৈষ্ণব একত্রিত হইয়া হরি সঙ্কীর্ত্তনে ও নৃত্যগীতে মগ্ন হইয়া থাকিবে।" আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল চক্ষু মিলিয়া সম্মুখে যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তব্ধ হইয়া গেলাম। দেখিলাম বিশ্বম্ভর দণ্ডায়মান। দেখিতে দেখিতে সে মূর্ত্তি অমনি অন্তর্ধান হইয়া গেল।' এই বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন ;—

"কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে।
কোন্ রূপে প্রকাশ বা হয়েন কাহাতে ?"

অদ্বৈত আবার বলিতে লাগিলেন 'বিশ্বম্ভরের যেরূপ রূপ ও আকৃতি যেরূপ ভদ্র বংশে তাঁহার জন্ম ও অশেষ শাস্ত্রে তিনি যেমন পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কৃষ্ণভক্তি হওয়াইত উচিত, আজ আমি তোমাদের কথা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। তাঁহার যে এরূপ স্বভাব হইয়াছে এ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। যে বস্তুর জন্য আমি লালায়িত, যদি সত্য সত্য তিনি সেই বস্তু হন ; তবে অধিক দিন আর অপ্রকাশ থাকিবে না অবশ্যই এক দিন সকলেই বুঝিতে পারিবে। এই বলিয়া অদ্বৈত রায় 'হা

রি!' বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিলেন ; আর ভক্তগণ 'জয় জয়' রবে প্রেমো-
ত্ত হইয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে দিনের কথা এই পর্য্যন্ত।
বেলা দেড় প্রহর হইয়াছে, অদ্বৈত প্রভু স্নানান্তে তুলসী সেচন করিতে-
ন ও মনের অনুরাগে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন ; কখন দুই নয়নে
প্রমাশ্রু বিগলিত হইতেছে ; কখন অট্ট হাসি হাসিতেছেন ; কখন ভীমরবে
ার করিতেছেন এবং পাষণ্ডীউদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেছেন ; এমন
য়ে বিশ্বম্ভর প্রিয়বয়স্য গদাধরকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈতভবনে যাইয়া উপ-
ত হইলেন। দূর হইতে আচার্য্যের তাৎকালিকের ভক্তিপূর্ণ ভাব দেখিয়া
ার প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কথিত আছে যে, অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তিযোগে ও মনোবলে বিশ্বম্ভরকে স্বয়ং
কৃষ্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি নানা উপচারে মূর্চ্ছাবস্থায়
া করিয়াছিলেন ; এবং "নমোঃ ব্রহ্মণ্যদেবায়, গোব্রাহ্মণহিতায়চ ;
াদ্ধিতায় কৃষ্ণায়, গোবিন্দায় নমো নমঃ" এই শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহার
ণ যুগলে' প্রণত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এই রহস্য বিস্তৃত
না করিয়া চৈতন্যভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। নিকটে গদাধর
াইয়াছিলেন ; তিনি অদ্বৈতের ঈদৃশ অসঙ্গত আচরণ দেখিয়া জিহ্বা
মড়াইয়া বৃদ্ধ আচার্য্যকে বলিলেন "নিমাই বালক ; বিশেষতঃ মূর্চ্ছিত ;
মবস্থায় তাহার প্রতি আপনি এমন অসঙ্গত ব্যবহার কেন করিতেছেন ?"
দ্বতভাবব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন "হাঁ! বালক! কি, কি,
র জানিবে।"

গদাধর কিছু বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'তবে
ঈশ্বর অবতীর্ণ হইলেন না কি ?' এমন সময়ে চৈতন্যের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল।
দ্বৈতাচার্য্যকে তখনও আবেশময় দেখিয়া তিনি দুই হাত যুড়িয়া স্তুতি
রিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন
আপনার দেহপ্রাণমন সকলই তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন "আচার্য্য!
মাকে কৃপা করুন। আপনার কৃপাব্যতীত আমার কৃষ্ণলাভের আশা নাই ;
মি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।"

বৈষ্ণবগ্রন্থকারদিগের মতে বিশ্বম্ভর ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার ঈশ্বরত্ব গোপন
িলেন। অদ্বৈত মনে মনে ভাবিলেন "আমার কাছে তোমার চতুরালি
ট না ; আমি আগে থাকিতে চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়াছি" ও

প্রকাশ্যে উত্তর করিলেন "বিশ্বম্ভর! তুমি আমার কাছে সকল অপেক্ষা বড়; আমার এবং সকল বৈষ্ণবগণের ইচ্ছা এই যেন আমরা সর্ব্বদা তোমাকে দেখিতে পাই ও সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণ গুণানুকীর্ত্তন করিতে পাই।"

অদ্বৈতের করুণ বাক্যে প্রীত হইয়া বিশ্বম্ভর বিদায় হইলেন। এদিকে বৃদ্ধ আচার্য্য, সত্য সত্য প্রভু প্রকাশিত হইলেন কি না? পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন; উদ্দেশ্য—যদি সত্য বিশ্বম্ভরই শ্রীকৃষ্ণ হন, তবে অবশ্যই আমাকে অচিরাৎ বাঁধিয়া আনিবেন।

কথাটা কিছু অসংলগ্ন হইল। আগে দৃঢ় ঈশ্বরজ্ঞান না হইলে ঘোর ঘটা করিয়া পূজা করা হয় না। আর যদি ঈশ্বর জ্ঞানই হইল, তবে আবার গুরু হইয়া শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ দেওয়া হয়, সেরূপ উপদেশ কেন দেওয়া হইল? আবার ঈশ্বরত্বে সন্দিহান হইয়া পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুরেই বা পলায়ন কেন? এই মাত্র কথা ঠিক হইয়া গেল যে, সকলে একত্র ভগবানের আরাধনা করিবেন; তাহারই বা ব্যত্যয় কেন? তবে কি ঈশ্বর জ্ঞানের কথা ও পূজার কথা অতিরঞ্জিত চিত্র নয়? সন্দেহ আপনা হইতে উদিত হয়। এই সময়ে অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাহার কিছু পরেই অদ্বৈতের শান্তিপুরে গমন বৃত্তান্ত সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আর প্রথম দর্শনেই নিমাইয়ের অলৌকিক ভাবাবেশ ও মূর্চ্ছা দেখিয়া অদ্বৈতের মনে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও সম্ভ্রমের উদ্রেক হওয়াও অসম্ভব নহে। তবে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজার ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত কি না? বিচার্য্য। গ্রন্থকার গ্রন্থরচনার সময়ে এ বিচার করিয়াছিলেন; তা না হইলে তিনি বলিবেন কেন?—

"অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবারে শক্তি কার?
"যাঁর শক্তিকারণে চৈতন্য অবতার।
এসব কথায় যার নাহিক প্রতীত;
অদ্বৈতের সেবা তার নিষ্ফল নিশ্চিত।"

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক্। গ্রন্থকর্ত্তা যাঁহাদিগের নিকট হইতে গ্রন্থের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই চৈতন্যের ঈশ্বরত্বে অটলবিশ্বাসী। মূল ঘটনা দেখিতে দেখিতে, স্মরণ করিয়া রাখিতে রাখিতে, পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে যে প্রেমের ও ভক্তির রঙে কল্পনা

ক দিয়া চিত্রিত হইয়াছিল, তাহা সহজ-বোধ্য। ইহাতে বিচার শক্তি
য়োগ করিলে পাছে ভক্তির রং লুকাইয়া যায়, অসামঞ্জস্য বাহির হইয়া
ড়ে, তাই বিশ্বাসের দুয়ারে আপীল করিয়া একটী ছোট রকম মাথার দিব্বি
ওয়া হইয়াছে;—অর্থ, কেহ যেন এ সম্বন্ধে তর্ক ও বিচার না করেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বায়ু রোগ ও শ্রীবাসমিলন।

এখন হইতে বিশ্বম্ভরের মধ্যে এক এক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভাব দেখা :তে লাগিল। গৌরের হৃদয় ভাবপ্রবণ; যখন তাহাতে যে ভাব উঠে, হার তরঙ্গ না হইয়া যায় না। নির্ম্মল সরসীর স্বচ্ছসলিলে ক্ষুদ্র লখণ্ড ফেলিলে যেমন কুল্যের উপর কুল্য উঠিয়া শেষে সমস্ত সরসী ঙ্গময়ী হইয়া যায়; তেমনি বাহিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা তদীয় চিত্ত-সরসীতে ক্ষিপ্ত হইলে ভাবের পর ভাববীচি উৎপতিত হইয়া প্রাণমন সকলই ময় করিয়া তুলিত। তাঁহার স্বভাবের এই মগ্ন ভাবই স্বর্গীয়। ইহারই ঃকারিত্বে সমস্ত ভারতবর্ষ সমাকৃষ্ট হইয়াছিল এবং ইহাই অবশেষে গাঢ় ভাবে পরিণত হইয়াছিল। বৈষ্ণবদিগের উপর পাষণ্ডীদিগের অত্যা- রের কথা শুনিতে শুনিতে ও ভাবিতে ভাবিতে পাষণ্ডী উদ্ধারের জন্য ়ার প্রাণের মধ্যে একটী বাসনা প্রবল হইল। তাঁর পক্ষে বাসনাও ।; আর মন প্রাণের সকল ভাব ঐ চিন্তায় পর্য্যবসিত হইয়া তদ্ভাবময় । যাওয়াও তাহাই। তাই তিনি এখন হইতে 'সংহার করিব' 'আমি ' এই প্রকার নানা রূপ অলৌকিক কথা বলিতে লাগিলেন ও এই ব বিভোর হইয়া কাঁদিতে হাসিতে ও হুঙ্কার করিতে লাগিলেন; ন ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এবং কখন ভার্য্যাকে দেখিলে তে যান। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্নেহময়ী জননীর মনে কতই দাশঙ্কা হইতে লাগিল। তিনি পুত্রের পূর্ব্ব ব্যাধির কথা মনে করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন; এবং যাহাকে দেখেন, তাহাকেই পুত্রের ভাব । বলিয়া উপদেশ চাহিতে লাগিলেন।

যাহার যেমন বুদ্ধি, সে তেমনি উপদেশ দিতে লাগিল। কেহ বলিত, বিষম বায়ু উপস্থিত, ইহাকে বাঁধিয়া রাখ ও নারিকেল জল খাইতে দাও; তাহা, হইলে উর্দ্ধবায়ু অধঃ হইবে'। কেহ বলে, 'অপদেবতার বাতাস লাগিয়াছে'; কেহ শিবাঘৃত, পাকতৈল সেবন করাইতে বিধি দেয়। এইরূপে যাহার যাহা মনে আইসে, সে তাহাই বলে। আসল রোগ কেহই বুঝিল না। মূর্খ পৃথিবীর লোক! কৃষ্ণানুরাগে শিবাঘৃতের ব্যবস্থা! প্রেমরোগে বন্ধনের ব্যবস্থা! তোমরা নইলে এমন অপূর্ব্ব বিধি আর কে দেয়? এইরূপ পাঁচ জনের পাঁচরূপ কথা শুনিয়া শচীদেবী বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং এক দিন অনেক লোক দিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকাইয়া আনিলেন। ভক্তদর্শনে গৌরের ভক্তিভাব উথলিয়া উঠিল। অশ্রু, কম্প, লোমহর্ষাদি হইয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। রোজার কাছে রোগ লুকান থাকে না; শ্রীবাস পণ্ডিত গৌরের অবস্থা দেখিয়া সকলই বুঝিলেন। বিশ্বম্ভর ও চৈতন্য লাভ করিয়া শ্রীবাসকে বলিলেন, 'পণ্ডিত! আপনি আমার সম্বন্ধে কি বুঝি-লেন? লোকে বলিতেছে, আমার বাই রোগ হইয়াছে।'

শ্রীবাস সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, 'তোমার বাইর মত আমার একটু বাই হইলে বাঁচিয়া যাইতাম। দেখিতেছ না মহাভক্তিযোগ আসিয়া তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে?' শচীকে বলিলেন "দেবি! আপনি কিছু চিন্তা করিবেন না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ বায়ু রোগ নহে, মহাভক্তির অভ্যুদয়। কাহাকেও একথা বলিবেন না; দেখুন কি কাণ্ডকারখানা হয়!'

শ্রীবাস শচীকে এইরূপে প্রবোধ দিতেছেন শুনিয়া, বিশ্বম্ভর মহাসুখী হইলেন এবং শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "আপনি আজ যাহা বলিলেন, ইহা আর কেহ বলে নাই। সকলেই বায়ুরোগ বলিতেছে। আমি আজ মহা উপকৃত হইলাম। যদি আপনিও বাই বলিতেন, তবে নিশ্চয় গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতাম।"

তখন ভক্ত শ্রীবাস বলিতে লাগিলেন 'এখন হইতে আর আমাদের বিচ্ছিন্ন থাকা উচিত নহে; সকলে একত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করিব। আমরা একত্রিত হইলে পাষণ্ডীরা কিছুই করিতে পারিবে না।'

শ্রীবাস বিদায় হইয়া গেলে শচীদেবীর মন হইতে যদিও বায়ুরোগে আশঙ্কা দূর হইল; কিন্তু তাহার স্থানে আর এক নূতন আশঙ্কা সমুপস্থিত হইল; বিশ্বরূপের কথা মনে পড়িয়া গেল। 'সেও তো এইরূপ, তবে

পিপাসু হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তবে কি বিশ্বম্ভরও সেই পথে যাইবে? কে জানে ভাঙ্গা কপাল আবার বুঝি ভাঙ্গে?' শচি! শান্ত হও, সকলই ঈশ্বর ইচ্ছা।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভক্ত দল।

যেদিন অদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বম্ভরকে কৃষ্ণের অবতার জ্ঞানে পূজা করিলেন, সেইদিন হইতে বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে অন্য চক্ষে দেখিতে শিখিলেন। ইহার উপরে বিশ্বম্ভরের নবজীবনের নূতন ভক্তির বিকাশ তাঁহাদের ঐ ভাবকে ইন্ধনে ঘৃতাহুতির ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ফলতঃ এই সময় হইতেই গৌরের ভবিষ্যৎ ভক্তদল গঠিত হইতে চলিল। ভগবদ্‌ভক্ত মহাপুরুষদিগের জীবনে এই ঘটনা অতি স্বাভাবিক দেখা যায়। তাঁহারা যত আধ্যাত্মিক রাজ্যে উন্নত হইয়া জগতের নিকট পরিচিত হইতে থাকেন, ততই চারিদিক্ হইতে পরিত্রাণের জন্য লালায়িত নরনারীসকল আসিয়া তাঁহাদের দল পুষ্টি করিতে থাকে। দেবনন্দনের প্রেরিত দল, শাক্যসিংহের শিষ্যদল ও মহম্মদের চিহ্নিত দল এই প্রকারে সংগঠিত হইয়াছিল। ধর্ম্মরাজ্যে দলবাঁধা একটী স্বাভাবিক নিয়ম। যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন জীবন লইয়া সংসারের কুটিল পথে ইতস্ততঃ পদবিক্ষেপ করিতেছিল; যখন কোন মহাপুরুষের জীবনের অসামান্য আলোকে সে আপনার জীবনের জঘন্যতা দেখিতে পায়, তখন সেই আলোকে সমাকৃষ্ট হইয়া সেই আত্মা যে তাঁহার পরিকররূপে পরিণত হইবে, ইহা অতি সহজে বুঝা যাইতে পারে। এইরূপে একটী একটী করিয়া যখন অনেক গুলি মানবাত্মা সেই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া পড়ে, তখনই একটী দল গঠিত হয়। ধর্ম্মজগতে যত কিছু মহান্ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, সকলই দল হইতে। দলেই বল, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে সেই দল যখন সার্ব্বভৌমিক পথ পরিত্যাগ করিয়া অহঙ্কার ও স্বার্থের সংকীর্ণ রাস্তা আশ্রয় করে, তখনই তাহা হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা। কিন্তু মহাপুরুষদিগের জীবনে রূপ সংকীর্ণতার ভাব কখনও দেখা যায় নাই। জগতে যত কিছু বিপ্লব

আসিয়াছে, মহাপুরুষদিগের অনুবর্ত্তীগণ হইতে। অনুবর্ত্তীগণ অনেক স্থলে মহাপুরুষের জীবনের লক্ষ্য, ভাব ও ভাষা বুঝিতে না পারিয়া, বিকৃত অর্থ করিয়া ও তাহার সঙ্গে আপনাদের কর্ত্তৃত্ব মিশাইতে গিয়া এই রূপ বিপদ আনয়ন করিয়াছে।

গৌরের ভক্তদল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতিদিন সন্ধ্যা না হইতে ভক্তগণ বিশ্বম্ভরের বহির্বাটীতে আসিয়া জুটিয়া মহাপ্রেমমত্তভাবে সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতেন; কোন্ দিক্ দিয়া রজনী প্রভাত হইয়া যাইত? কেহ টের পাইতেন না। গৌরের অপূর্ব্ব ভাববিকাশে এক এক রাত্রি মুহূর্ত্তের ন্যায় কাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন তাঁহার অলৌকিকত্বে আর কাহারও সন্দেহ থাকিল না।

এই সকল অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়া শুনিয়া ভক্তগণ কেহ তাঁহাকে অংশাবতার, কেহ ভক্তাবতার, কেহ কেহ বা শুক, নারদ বা প্রহ্লাদের অবতার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। মহিলাগণের মধ্যেও কেহ কেহ তাঁহাকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন।

গৌরের ধর্ম্মজীবনের আমূল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দুইটী প্রধান অবস্থা লক্ষিত হয়; প্রথম বিরহ বা ব্যাকুলতা; দ্বিতীয় সম্ভোগ-অবস্থা। বিরহ অবস্থার প্রথম ভাগে আপনাকে মহাকৃপাপাত্র দীন মনে করিয়া তিনি শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে নিবিষ্টচিত্ত হইতেন। এই অবস্থায় মানব স্বভাব-সুলভ দুর্ব্বলতা সর্ব্বদা চিত্তপটে অঙ্কিত থাকিত। এই বিরহ ও ব্যাকুল-ভাব আবার দুই সময়ে দেখা যাইত। সম্ভোগের পূর্ব্বে ও পরে। প্রথম-টীকে পূর্ব্বরাগ ও দ্বিতীয়টীকে বিচ্ছেদ বলা যাইতে পারে। এ অবস্থাদ্বয়ে ব্যাকুলতা, হা হুতাস, অসহ্য যন্ত্রণানুভূতি, অনুতাপ, বিষমক্রন্দন, মূর্চ্ছা, স্বেদ, স্তম্ভ, মৌনভাব প্রভৃতি সকল লক্ষিত হইত। সম্ভোগের অবস্থায় ইহার কোন কোন ভাব লক্ষিত হইলেও বিভিন্নরূপ কারণাবলম্বনে উত্থিত হইত। গৌরের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে ঈশ্বর সম্ভোগের লক্ষণ নানা অবস্থায় নানা রূপে দেখা যাইত। এই অবস্থায় প্রায় তিনি গভীর যোগে যুক্ত ও ভগবানে অভিন্ন ভাব হইয়া আপনার মানুষ স্বভাব ভুলিয়া যাইতেন। এই আধ্যাত্মিক ভাব হইতেই "আমি সেই, আমি সেই" প্রভৃতি ভাষা শুনা যাইত; এবং তাহা হইতেই তাঁহার অবতারত্বের প্রধান কারণ, তদীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, কৃষ্ণসম্ভোগকালে গৌরের নৃত্য, হাস্য

আনন্দময় প্রলাপ বাক্য, উচ্চকীর্ত্তন, অশ্রু, পুলক, স্বেদ, স্তম্ভ, ও মৌনভাব প্রভৃতি বৈচিত্র্য সকল পর্য্যায়ক্রমে দেখা যাইত। এ অবস্থাতেও তিনি উচ্চ ক্রন্দন করিতেন; কিন্তু সে অনুতাপের ক্রন্দন নহে, প্রিয়সহবাস জনিত আহ্লাদের ও প্রেমের ক্রন্দন।

এক দিন পূর্ব্বরাগের অবস্থায় গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া আপনার হৃদয়যাতনার কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন;—'হায়! কোথায় গেলে সে মুরলীবদনের দেখা পাইব? বন্ধুগণ! আমার দুঃখের অন্ত নাই। প্রাণবল্লভকে পাইয়াও হারাইয়া ফেলিলাম। হায়! আমার কি হইবে? মনের দুঃখ বলি শুন'।

পূর্ব্বে তিনি একদিন স্বীয় মনোদুঃখ বলিবেন বলিয়া ভাবাবেশে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে পারেন নাই; আবার আজ মনের রহস্য কথা প্রকাশ করিবেন শুনিয়া বয়স্যগণ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন:—'ভাই সব! গয়া হইতে আসিবার সময় কানাইর নাটশালা নামক গ্রামে এক রাত্রি ছিলাম। আহা! এক পরম সুন্দর শ্যামল বালক স্বর্গীয় ভূষায় বিভূষিত হইয়া মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমার প্রাণ মন কাড়িয়া লইয়া চকিতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন? হায়! আর কি তাঁর দর্শন পাইব?'

ইহা সকল ভক্ত জীবনেই সংঘটিত হইয়া থাকে। দেবনন্দন ঈশা অভিষেকের পর স্বর্গীয় কপোত দর্শন করিয়াছিলেন। মহম্মদ গিরিশৃঙ্গে ঈশ্বর-দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শাক্যসিংহও কঠোর তপস্যার পর দিব্যদৃষ্টিতে অভীষ্ট দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কানাইর নাটশালায় গৌরচন্দ্রও সেইরূপ দিব্যদর্শন পাইয়াছিলেন। তদীয় জীবনের তাহাই স্তম্ভ স্বরূপ। সে মূর্ত্তি তিনি আর কখন ভুলিতে পারেন নাই। তাহাই তাঁহার সর্ব্বেসর্ব্বা, ইহাতেই তিনি সঞ্জীবিত এবং ইহার দর্শনবিরহেই তাঁহার জীবনমৃত্যু। এত দিন পরে গয়ার রহস্য কথা অবগত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা তখন বুঝিলেন যে বিশ্বম্ভর কিসের জন্য পাগল হইয়াছেন। তদবধি তাঁহারা গৌরকে নায়কত্বে বরণ করিয়া আপনারা তাঁহার আনুগাত্য হইয়া নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

বিরহে কাতর হইয়া গৌরসুন্দর স্বীয় ভবনে উপবিষ্ট; তাঁহার প্রিয়-

সঙ্গী গদাধর পণ্ডিত তাঁহার জন্য তাম্বূল আনিয়া খাইতে অনুরোধ করিতেছেন; গৌরের বাহ্যজ্ঞান নাই; জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরি কোথায়?' গদাধর উত্তর করিলেন; 'হরি নিরবধি তোমার হৃদয়ে বিরাজিত।' হরি হৃদয়ে আছেন শুনিয়া মুগ্ধ গৌরাঙ্গ নখ দিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। গদাধর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া নিবারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন;—"স্থির হও, একটু অপেক্ষা কর, এখনই হরি আসিবেন।" গদাধরকে গৌর অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাঁর আশ্বাস বাক্যে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। শচীমাতা এই ঘটনা দেখিয়া গদাধরকে বহু প্রশংসা করিলেন ও নিয়ত বিশ্বম্ভরের নিকটে থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

সঙ্গীদিগের মধ্যে মুকুন্দদত্ত অতি সুগায়ক ছিলেন। ইঁহার আদিবাস চট্টগ্রামে; গঙ্গাবাস উপলক্ষে নবদ্বীপে স্থিতি। ইনি গৌরচন্দ্রের একজন সহাধ্যায়ী। মুকুন্দের মধুর কণ্ঠস্বরযোগে ভাগবতের শ্লোকাবলি উচ্চারিত হইলে গৌরের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিত। তখন তিনি উৎসাহে "বোল বোল" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন, চারিদিকে হরিধ্বনি হইত। প্রেমের তরঙ্গে নৈশগগন তরঙ্গায়িত হইয়া যাইত।

এইরূপে নিত্য নিত্য নূতন নূতন প্রেমরঙ্গে গৌরচন্দ্রের গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বহির্ম্মুখ লোকদিগের বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা কীর্ত্তনের ধ্বনিতে রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারে না; বিশেষতঃ প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি লোক ভক্তি সাধন করিতেছে; ইহা তাহাদের প্রাণে সহ্য হইল না। সুতরাং যাহার যাহা মনে আইসে, সে তাই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা রাজদ্বারে পর্য্যন্ত অভিযোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল ও ভক্তদলের মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিতই বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁহাকে জব্দ করিতে পারিলে দলটা ভাঙ্গিয়া যাইবে, মনে করিয়া তাঁহার নামে কত মিথ্যা সম্বাদ রটনা করিতে লাগিল। দেওয়ান হইতে দুইখান নৌকা আসিতেছে; শ্রীবাস পণ্ডিতকে সপরিবারে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, এই জনরব অল্পদিন মধ্যে নগরী মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। শ্রীবাসের অপরাধ কি? জিজ্ঞাসা করিলে কেহই কিছু বলিতে পারে না। এই সকল কথা শুনিয়া বৈষ্ণবদলের মধ্যে কেহ কেহ ভয় পাইয়া গেল; কিন্তু যাঁহাদের বিশ্বাস ফাঁকা নহে, তাঁহারা অটল ভাবে ঈশ্বরেচ্ছার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিলেন। গৌরচন্দ্র এই সকল

টোট্‌কা ধমকে ভীত হইবার লোক নহেন; তাই পুরুষসিংহের ন্যায় অটল ভাবে প্রকাশ্যে কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।" মতলব—লোক দেখুক, তিনি তাহাদের ভয়ে ভীত নহেন।

ধর্ম্মবীর যাঁহারা, তাঁহারা কি সংসারের লোকের ধম্‌কানিতে ভীত হন? গৌরসিংহকে নির্ভয়ে নগরভ্রমণ করিতে দেখিয়া একদিকে ভক্তদলের যেমন সাহস ও বিশ্বাস বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অপর দিকে তেমনি পাষণ্ডীদের মনে ভয় সঞ্চার হইল। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল; 'এ তো ভয়ের কথা শুনিয়াও ভয় পায় না, এ যে রাজকুমারের ন্যায় নগরে বেড়াইতেছে।' তাহাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তিনি বলিলেনঃ—'ওগো! তোমরা বুঝিতেছ না, এ পলাইবার ফিকির বই আর কিছু নয়।'

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীবাসের গৃহে।

তটশালিনী ভাগীরথীর সুন্দর পুলিনে বিশ্বম্ভর একাকী লীলা ভ্রমণ করিতেছেন; সম্মুখে প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া মৃদুমন্দ গতিতে দক্ষিণ বাহিনী হইয়া সাগর সঙ্গমে চলিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল, মেঘের লেশ মাত্র নাই; তরুণ সূর্য্যের শুভ্র আলোকে দিঙ্মণ্ডল বিধৌত, ভাগীরথীসলিল গর্ভে আকাশের ছবি খানি প্রতিবিম্বিত, কেবল মাঝে মাঝে দুই একটী ক্ষুদ্র উর্ম্মিতে, তাহার ক্রম ভঙ্গ হইতেছে। মাথার উপর আকাশবিহারী কলকণ্ঠ পাখীগুলি নূতন উদ্যমে গাইয়া চলিয়াছে, কুলে নরনারী স্নানাবগাহনান্তে দেবার্চ্চনাদি করিতেছে। অদূরে একদল গাভী গঙ্গাপুলিনে চরিতেছে; কোন কোন গাভী পিপাসার্ত্ত হইয়া গঙ্গাজল পান করিতে আসিতেছে; দুই একটী উর্দ্ধপুচ্ছ করিয়া হম্বারব করিতেছে; কেহ কেহ পরস্পর ক্রীড়া যুদ্ধ করিতেছে; কেহ বা শুইয়া রোমন্থ করিতেছে। প্রকৃতির এই হাসিমাখা ছবি দেখিয়া গৌরচন্দ্রের হৃদয়ের ভাবের কপাট খুলিয়া গেল; অনন্তের দিকে মন ছুটিল। চারিদিক্ হইতেই যেন জীবন্ত ঈশ্বর তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। প্রেমসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। সম্মুখে গাভীযূথ দর্শন, আর রক্ষা নাই; যুগপৎ বৃন্দাবন লীলাস্মৃতি

মহাভাবের উদয় ও মহাসমাধিতে প্রাণ নিমগ্ন। বাহ্যজ্ঞান নাই। ভগবানে অভিন্নাত্মক হইয়া গৌরসিংহ গর্জ্জন করিয়া "আমি সেই! আমি সেই!" বলিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন ও যে প্রকোষ্ঠে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত নৃসিংহদেবের অর্চ্চনা করিতেছিলেন, তাহার বহির্ভাগে আসিয়া সজোরে পদাঘাৎ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'আমি সেই! আমি সেই! ওহে শ্রীবাস! কি করিতেছো? একবার দেখ না?'

শ্রীবাসের ধ্যান ভঙ্গ হইলে দ্বার খুলিয়া দেখিলেন যে অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত হইয়া বিশ্বম্ভর সমাধিযোগে বীরাসনে উপবিষ্ট। শ্রীবাস গৌরের ব্যাকুলতা বা পূর্ব্ব রাগের অবস্থা ইতাগ্রে দুই একবার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সমাধিতে সম্ভোগের ভাব আর কখন দেখেন নাই; সুতরাং যাহা দেখিলেন, তাহাতে অবাক্ হইয়া গেলেন, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বিশ্বম্ভর আবার তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"ওরে শ্রীবাস! এত দিন কি আমার প্রকাশ জানিতে পারিস্ নাই? তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে ও নাড়ার হুঙ্কারে আমি বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আসিয়াছি; তুই আমাকে আনিয়া নিশ্চিন্ত হয়ে আছিস্, আর নাড়া শান্তিপুরে চলিয়া গেল। সাধুদিগকে রক্ষা করিব, দুষ্টের দমন করিব, তাও কি জানিস্ না? এখন আমার স্তব পড়।' কথিত আছে যে, শ্রীবাস বিশ্বম্ভরের ঈদৃশভাব দেখিয়া বিস্ময়ে, প্রেমে, বিশ্বাসে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া তৎকালে বিশ্বম্ভরকে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন এবং ভাগবতের ব্রহ্মমোহনের স্তোত্র পড়িয়া ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন;' পরে সপরিবারে দাসদাসী সহিত বিষ্ণুপূজার জন্য আনীত উপকরণ দিয়া গৌরের পূজা করিয়াছিলেন। গৌরচন্দ্র তখন প্রেমে পূর্ণ মাতোয়ারা; সুতরাং এসব পূজায় আপত্তি করা দূরে থাকুক, পুনঃ পুন উৎসাহ সহকারে শ্রীবাসকে কত অমানুষী কথা কহিতে লাগিলেন। গৌ বলিলেন, "শ্রীবাস! লোকে বলিতেছে, তোমাকে সপরিবারে ধরিয়া লইয় যাইবার জন্য বাদসাহ নৌকা পাঠাইয়াছেন; ইহাতে কি তোমার ভয় হই য়াছে? বিশ্বাসিন্! বিশ্বাস কর, তাহা কখন হইবে না। নৌকা যদি আইসে, তবে আগে আমি তাহাতে পদার্পণ করিব। দেখি দেখি, কে তোমাকে ধরিতে পারে? তাহাতেও যদি ক্ষান্ত না হয়; আমি তবে এই ভাবে রাজার নিকট যাইয়া তাঁহার সব কাজী মোল্লা আনিয়া ভগবৎপ্রেমে

কলকে কাঁদাইতে বলিব ; যখন তাহারা পারিবে না ; তখন হরিগুণানু-কীর্ত্তন করিয়া আমি সেই রাজা ও সভাসদগণকে কাঁদাইয়া দিব। ইহাতেও কি রাজার বিশ্বাস হইবে না ?" শ্রীবাসের মুখে সন্দেহের ছায়া দেখিয়া গৌরচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, 'শ্রীবাস! আমার এ কথায় কি তোমার প্রত্যয় হইতেছে না ? দেখিবে সাক্ষাতে এই ছোট বালিকাকে কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদাইতে পারি কি না ?' এই বলিয়া শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা চৈতন্যভাগবত প্রণেতা শ্রীবৃন্দাবন দাসের জননী চারি বছরের মেয়ে নারায়ণীকে বলিলেন:;— নারায়ণি! কৃষ্ণ প্রেমে কাঁদ দেখি ?" নারায়ণী অমনি হা কৃষ্ণ! বলিয়া প্রেমাবেগে ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

তখন গৌরচন্দ্র বলিলেন, 'কেমন, শ্রীবাস! এখন তোমার সন্দেহ দূর হ'ল তো ?'

শ্রীবাস তখন দুই বাহু তুলিয়া উৎসাহ সহকারে বলিয়া উঠিলেন, ভগবানে যদি আমার বিশ্বাস থাকে ; তবে কিসের ভয় ? বিশেষতঃ এখন তো তুমি আমার গৃহে বিরাজমান ; এখন আর ভয় কেমন করিয়া থাকিবে ? বলিতে বলিতে বিশ্বাসীর নয়ন যুগল দিয়া দরদরিত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

গৌরের মহাভাব দুই এক মুহূর্ত্তের জন্য নয় ; যখন সে ভাব হইত, যখন শ্রীকৃষ্ণে মন মগ্ন হইত ও হৃদয়মাঝে হৃদয়নাথকে পাইয়া আত্মায় আত্মায় মিশিয়া এক হইয়া যাইতেন, তখনকার ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইয়া যাইত না। সে সময়ে গৌরের স্বাভাবিক বিনয় ও দৈন্য আর থাকিত না। মহাধন লাভ হইলে কেই বা দীন থাকে ? তাই আস্ফালন সহকারে কত কথাই বলিয়া ফেলিতেন। পাঠক! বিস্মিত হইও না ; এ অবস্থা অসামান্য হইলেও অসম্ভব মনে করিও না। সাধারণ লোকের ভাব দেখিয়া মহানু-ভবদিগের বিচার করা সুবুদ্ধির কার্য্য নয়। তোমার আমার মহাভাব ও অভিন্ন ভাব হয় না বলিয়া তাহা কি অসম্ভব মনে করিতে আছে ?

ভাবাবসানে শ্রীগৌরাঙ্গ মহালজ্জিত হইলেন ও শ্রীবাসকে এই সব কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই অবধি শ্রীবাসের বাটী গৌরের নিত্য বিহার স্থান হইল।

বরাহ ভাব ও মুরারি গুপ্ত।

গৌরজীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় নিত্য নূতন ভাবাবেশ হইতে লাগিল; এবং এক একটী বিশেষ ভাব দেখিয়া এক একজন ভক্ত চিরদিনের মত আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি এক এক করিয়া এই সকল ভাব দেখিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন; ও চির দিনের মত তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। মুরারি প্রভৃতি বাকী আছেন; তাঁহাদেরও সময় হইয়া আসিয়াছে।

এক দিন বরাহাবতারের শ্লোকাবলি ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়া গৌরাঙ্গের বরাহাবেশ হইল এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে মুরারি গুপ্তের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। মুরারির প্রতি গৌরের বড় ভালবাসা ছিল। সহসা বিশ্বম্ভরকে আসিতে দেখিয়া মুরারি সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া বন্দনা করিলেন! গৌরচন্দ্র 'শূকর! শূকর!' বলিয়া বিষ্ণু মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং সম্মুখে জলপূর্ণ পাত্র দেখিয়া বরাহভাবে তাহা দন্ত দ্বারা উত্তোলন করিয়া শূকরের ন্যায় চারি পায়ে চলিতে লাগিলেন। কথিত আছে, সেই সময়ে মুরারি গুপ্ত প্রকৃতরূপে বিশ্বম্ভরকে বরাহ আকার ধারণ করিতে দেখিয়া বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরের নরদেহ অন্তর্ধান হইয়া শূকরদেহ প্রাপ্তি হইয়াছিল, কি ঈশার শিষ্যেরা যে ভাবে তাঁহাদের নেতাকে শূন্যপদে সমুদ্রলঙ্ঘন করিতে ও দুইখানি রুটী দ্বারা দুই সহস্র লোককে পরিতোষরূপে ভোজন করাইতে দেখিয়াছিলেন, মুরারি গুপ্ত সেইরূপ যোগের ও বিশ্বাসের চক্ষে গৌরের বরাহরূপ দেখিয়াছিলেন, বিবেচক পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন। মুরারি গুপ্ত অপূর্ব্ব দর্শনে স্তব্ধ ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলে গৌরচন্দ্র পূর্ণ ভাবাবেশে বলিলেন 'মুরারি! তুমি কি এখনও জানিতে পার নাই যে, আমি এখানে আসিয়াছি?'

তৎপরে মুরারি গুপ্তকে বরাহভাবে নানারূপ উপদেশ দিয়া গৌরচন্দ্র বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন;—

"এই মত সর্ব্ব লোকের ঘরে ঘরে,
কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে।
চিনিয়া সকল ভৃত্য প্রভু আপনার;
পরমানন্দময় চিত্ত হইল সবার।"

আসল কথা গৌরের ভাবময় জীবনই এই সকল আধ্যাত্মিক দর্শনের মূলীভূত কারণ। সুদক্ষ বাজীকরের বাজীতে দর্শকবৃন্দ যখন নানারূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া থাকেন, তখন একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন প্রেরিত মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক জীবনের আশ্চর্য্য প্রতিভা দর্শনে যে বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাসম্পন্ন অনুচরবর্গ অলৌকিক দর্শন করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি?

নিত্যানন্দ মিলন।

নিত্যানন্দের জন্মকথা ও তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যখন গৌরচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পরস্পর গৌরের অপূর্ব্ব ভক্তিবিকাশের কথা শুনিয়া তাঁর সহিত সাক্ষাৎ মানসে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আগমন করিয়া নন্দনাচার্য্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবধূত বেশ, প্রকাণ্ড শরীর, মদমত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় গতি; নিয়ত কৃষ্ণনাম রসনা দিয়া উচ্চারিত হইতেছে; হরিপ্রেম মদিরা পানে মাতোয়ারা, পদে পদে গতি স্খলিত হইতেছে; দেখিলে হঠাৎ মাতাল বলিয়া ভ্রম জন্মে, অথচ মুখশ্রী পবিত্র ও গম্ভীর, তাহাতে আবার বালকের সরলভাব ব্যঞ্জিত। পরম ভাগবত নন্দনাচার্য্য এই তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষকে পাইয়া যত্নের সহিত আতিথ্য সৎকার করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণবসমাজে শ্রীচৈতন্য যেমন কৃষ্ণাবতার, শ্রীনিত্যানন্দও তেমনি বলরাম, সঙ্কর্ষণ ও অনন্তের অবতার বলিয়া পূজিত। এই অবতার তত্ত্ব কি? স্বভাবতঃ তাহা জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে। বৈষ্ণবীয় অবতার তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের উত্তরভাগে বর্ণিত হইবে; সংপ্রতি তাহার সংক্ষিপ্ত অবতারণা করা যাইতেছে। সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি থাকে না; সৃষ্টির আদিকারণে ঐ গুণত্রয় নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থিতি করে। ভগবদিচ্ছার সংযোগে যখন গুণত্রয় বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়, তখন সৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেক পদার্থে ঐ ত্রিবিধ গুণ অল্পাধিক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই জন্য ভাগবতে সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুকেই ভগবানের অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপে ভগবদ্‌গুণাংশের

আধারগুলি সমস্তই গুণাবতার বলিয়া কথিত হইলেও সৃষ্টিকার্য্যের মৌলিক কতকগুলি গুণ ঈশ্বরের আদ্যাবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্যমতে ইহারাই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, বেদান্তমতে ইহাদিগকেই পুরুষাবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এগুলি গুণসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন সঙ্কর্ষণ বা অহঙ্কারতত্ত্ব একটী গুণ, যাহা সৃষ্টি বিষয়ে এক মৌলিক উপাদান। বলরামে, ঐ তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছিল বলিয়া তিনিই সঙ্কর্ষণ; আবার নিত্যানন্দে সেই গুণ দেখা গিয়াছিল সুতরাং তিনি বলরামের বা সঙ্কর্ষণের অবতার। কালক্রমে আবার কোন অসাধারণ ব্যক্তিতে কোন অসাধারণ গুণ লক্ষিত হইলে সেইটীকে আদর্শ গুণ বা সৃষ্টি লীলার একটী উপাদান বলিয়া গ্রহণ করা হইত। উত্তরকালে সমুৎপন্ন কোন ব্যক্তি বিশেষে সেই গুণ লক্ষিত হইলে সেই ব্যক্তিকে পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শগুণশালী পুরুষের অবতার বলা যাইত। হনুমান রামচন্দ্রের দাসত্বে ও সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন; চৈতন্য-ভক্তের মধ্যে মুরারি গুপ্ত রামমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন ও চৈতন্য সেবক ছিলেন; সুতরাং তিনি হনুমানের অবতার। সচরাচর কোন ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে যেমন ধর্ম্মাবতার বলা যায়; এখানেও সেই রূপ কোন নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে বলিতে হইবে।

কথিত আছে নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমনের পূর্ব্বেই বিশ্বম্ভর মনোবলে জানিতে পারিয়া সঙ্গীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ২।৩ দিন মধ্যে কোন মহাপুরুষ এখানে আসিবেন। তখন সে কথার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারেন নাই। তাহার পর যে দিন নিত্যানন্দ নন্দনাচার্য্যের বাটীতে আসিয়াছিলেন, তাহার পরদিন গৌরচন্দ্র বৈষ্ণবদলের নিকট বলিতে লাগিলেন "গত রাত্রিতে আমি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি। তালধ্বজ রথোপরি প্রকাণ্ড শরীর হলধর মূর্ত্তি এক মহাপুরুষ আসিয়া যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিমাই পণ্ডিতের কি এই বাড়ী? মহাপুরুষের নীলবস্ত্র পরিধান, অবধূত বেশ, বাম শ্রুতিতে এক বিচিত্র কুণ্ডল, মহাদুর্দ্দান্ত প্রেমিক ও স্খলিত গতি। আমি অত্যন্ত সংভ্রম সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোন্ মহাপুরুষ? তিনি উত্তর করিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি আমার ভাই, আচ্ছা কাল তোমার সঙ্গে পরিচয় হইবে।" এই কথা বলিতে বলিতে গৌরচন্দ্র হলধর আবেশে বিভোর হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন "বন্ধুগণ! আমার বোধ হইতেছে, কোন মহা-

পুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন"; শ্রীবাসকে কহিলেন "পণ্ডিত! তুমি যাইয়া তাঁহার অনুসন্ধান কর।" বর্ণিত আছে যে, শ্রীবাসপণ্ডিত তিন প্রহর কাল অনুসন্ধান করিয়া নিত্যানন্দের উদ্দেশ না পাইয়া গৌরাঙ্গকে জানাইলে গৌর তখন সদলে নন্দনের গৃহে যাইয়া নিত্যানন্দের দর্শন লাভ করিলেন। অবধূতের মুখশ্রীতে তপস্যার অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিয়া গৌরচন্দ্র গণ সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলেন।

সাধুগণের হৃদয়ে এক প্রকার বৈদ্যুতিক যোগ আছে যে, চারি চক্ষু একত্রিত হইলেই পরস্পরকে চিনিতে বাকী থাকে না। নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্রের পরস্পর সন্দর্শনে তাহাই হইল; নিতাই এক দৃষ্টিতেই গৌরকে চিনিয়া লইলেন।

গৌর নিতাইকে একজন অসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিলেও তাঁহার মহিমা সমবেত বৈষ্ণব মণ্ডলীতে প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীবাসকে ভাগবতের শ্লোকাবৃত্তি করিতে বলিলেন। শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান বিষয়ক একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলে নিতাই প্রেমে বিভোর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া গৌরচন্দ্র শ্রীবাসকে 'পড়! পড়!' বলিয়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে বলিতে লাগিলেন।

তৎপরে নিতাই নানা প্রকার ভাবাবেশে কখন হাসিতে, কখন কাঁদিতে, কখন উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে ও লম্ফ দিতে লাগিলেন দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাকে ধরিয়া কোলে করিয়া বসিলেন ও তাঁহার ভাবাবেশ দেখিয়া অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন :—'আজ আমার শুভদিন; তাই বেদের দুর্ল্লভ ভক্তিযোগ প্রত্যক্ষ করিতে পাইলাম। এ গর্জ্জন, হুঙ্কার, অশ্রু, কম্প, সাত্বিকবিকার কি ঈশ্বরচরিত্র ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবে? বুঝিলাম আপনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি প্রেমভক্তি; আপনার সংস্পর্শে মানুষ কৃতার্থ হইয়া যায়; বুঝিলাম ভগবান্ আমাকে পরিত্রাণ দিবেন বলিয়া এ হেন সঙ্গ জুটাইয়া দিলেন; আরও বুঝিলাম যে আমার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।' রতনেই রতন চেনে; প্রেমিক না হইলে প্রেমিকের মর্ম্ম বুঝা যায় না। তাই গৌর সুন্দর আবিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দের এত স্তুতি করিলেন। নিতাই সংজ্ঞা লাভ করিলে গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কোন্ দিক্ হইতে মহাশয়ের আগমন হইল?" নিতাই বালকের ন্যায় চঞ্চল, বিশেষতঃ আপনার স্তুতি শুনিয়া লজ্জিত হইয়া প্রকারান্তরে গৌরের স্তুতিবাদ করিয়া

উত্তর করিলেন; "আমি কৃষ্ণের অনেক তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছি; কিন্তু কোনখানে কৃষ্ণ না দেখিয়া দুঃখিত হইয়া ভাল ভাল লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কৃষ্ণের স্থান সব শূন্য দেখিতেছি কেন? কৃষ্ণ কোথায়?' তাঁহারা দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, কৃষ্ণ সংপ্রতি গৌড়দেশে গিয়াছেন। তাহার পর শুনিলাম যে, নবদ্বীপে বড় নাকি সঙ্কীর্ত্তনের ধূম পড়িয়া গিয়াছে; ও কত পতিত নরাধম পরিত্রাণ পাইতেছে। কেহ কেহ এরূপও বলিল যে, এখানে নারায়ণ আবির্ভূত হইয়াছেন। আমি তাহা শুনিয়া এখানে দৌড়িয়া আসিলাম, দেখি পরিত্রাণ পাই কি না?"

বিশ্বম্ভর প্রত্যুত্তরে বলিলেন 'আমরা মহাভাগ্যবান্ যে তোমার ন্যায় সাধুর সহিত আমাদের মিলন হইল। দুইজনের মিলন দেখিয়া ও কথোপকথন শুনিয়া বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে কত কি বলাবলি করিতে লাগিলেন।

শ্রীবাস আনন্দ মনে বলিয়া উঠিলেন 'ঠিক্ যেন মাধব শঙ্কর! উঁহাদের ভাব আমরা কি বুঝি?' গদাধর বলিলেন 'পণ্ডিত! বেশ বলেছো, ঠিক যেন রাম লক্ষণ!' কেহ বলিল যেন কৃষ্ণ বলরাম। অন্য জনে বলিল যেন অনন্তের কোলে শ্রীকৃষ্ণ। অপর ভক্ত বলিলেন 'না হে ঠিক্ যেন কৃষ্ণার্জ্জুন; দেখিতেছ না তেমনি মাখামাখি প্রেম। উঁহাদের সব কথা ঠারে ঠোরে; আমরা কি বুঝিব?'

নিতাই গৌরের পর জীবনের ঘটনার রঙ্গে যে এই ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর গৌর নিতাই ও সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইয়া শ্রীবাসমন্দিরে আগমন করিলেন। তখন মহানন্দে বিহ্বল হইয়া বিশ্বম্ভর কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলে বাহিরের দরজা বন্ধ হইল। মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনিতে দিগন্ত কাঁপিতে লাগিল; হরিসঙ্কীর্ত্তনের রোলে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল ও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সকলে মহানৃত্য আরম্ভ করিলেন। বিশ্বম্ভর হাসিতে হাসিতে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্রীপাদ গোঁসাই! তোমার ব্যাস পূজা কোথায় হইবে?" নিতাই শ্রীবাসকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "এই বামনার বাটীতে"। তখন বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে কহিলেন "তোমার উপর বড় কার্য্যের ভার হইল"। শ্রীবাস উত্তর করিলেন, 'কিছু ভয় নাই; পূজার আয়োজন সামগ্রী সকলই ঘরে আছে; কেবল এক পদ্ধতি পুস্তক নাই; তাহা চাহিয়া আনিলেই হইবে।'

বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'তবে আর কি? এস সকলে মিলে ব্যাসপূজার অধিবাস-উল্লাস কীর্ত্তন করি।

তখন দ্বিগুণ মাত্রা চড়াইয়া প্রমত্ততার সহিত নৃত্য কীর্ত্তন হইতে লাগিল। নিতাই ও গৌর কখন দুইজনে বাহু ধরাধরি করিয়া, কখন কোলাকুলি করিয়া নাচিতে লাগিলেন; বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন ও নৃত্যে মত্ত হইলেন। গৌর নিতাই পরস্পর পরস্পরের চরণধূলি লইতে চেষ্টা করিলেন; উভয়েই পরম চতুর, কেহই ধরিতে ছুঁইতে দিলেন না। কখন উভয়ে প্রেমানন্দে শ্রীবাসের আঙ্গিনার মধ্যে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। নিতাই ও গৌরের নৃত্য প্রেমোন্মাদ জনিত হইলেও, উভয়ের নৃত্যে কিছু কিছু বিশেষভাব দেখা গেল। বিশ্বম্ভর প্রেমে টলিয়া টলিয়া ও ঢুলিয়া ঢুলিয়া নাচাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার মস্তক গিয়া চরণ স্পর্শ করিতেছে; কিন্তু নিতাইর উদ্দণ্ড নৃত্যে পৃথিবী টলটলায়মানা। এই সকল ভাব দেখিয়া শুনিয়া কোন ভাবুক ভক্ত গাইয়াছিলেন;—

"শ্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে আমার গৌর নাচে।
আমার নিতাই নাচে রঙ্গ ভঙ্গে;
গৌর নাচে প্রেম তরঙ্গে;
হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল বলে"।

নাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে গৌরচন্দ্রের সে দিন বলরামাবেশ হইল। হইবারই তো কথা; কারণ পূর্ব্ব হইতে বলদেবকে স্বপ্নে দেখা ও নিতাইর সহিত তাঁহার অভিন্নভাব অনুভব করা হইয়াছিল। বলরামাবেশে গৌরচন্দ্র শ্রীবাসের খট্টার উপর উঠিয়া বসিয়া "মদ আন! মদ আন!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ও নিত্যানন্দকে বলিলেন, 'আমার হল মুষল দাও'। নিতাই গৌরের করে কর দিয়া বলিলেন, 'এই লও'। অনেকে উভয়ের করে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কথিত আছে, কেহ কেহ প্রত্যক্ষে হল মুষল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এই সকল ভাবময় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারায়, ধর্ম্মজগতে অলৌকিক ও অদ্ভুত কার্য্যের কতই বর্ণনা হইয়াছে। শুধু বর্ণনা নয়, এই সকল কার্য্য (Miracles) কত নর নারীর বিশ্বাসস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ উপরোক্ত বর্ণনা পাঠে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

বিশ্বম্ভর তখন "বারুণি! বারুণি!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ মর্ম্ম বুঝিয়া গঙ্গাজল পূর্ণ পাত্র তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। গৌরচন্দ্র তাহা পান করিলে সকল ভক্তগণ সেই জল অল্প অল্প চাখিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহারা ঐ জলে সত্য সত্য কাদম্বরীর আস্বাদ পাইয়াছিলেন। গৌর তখন 'নাড়া! নাড়া!' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভু! কাহাকে নাড়া বলিতেছ'? গৌর উত্তর করিলেন ;—"যাহার হুঙ্কারে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আসিলাম ; যাহার সাধনায় বিপ্রজাতীয়ত্ব ছাড়িয়া আশ্রয়জাতি হইয়াছি ; লোকে যাঁহাকে অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়া ডাকে, সেই আমার নাড়া। লোকটার রকম দেখ! আমাকে এখানে আনিয়া হরিদাসকে লইয়া সুখে শান্তিপুরে বসিয়া রহিয়াছে।'

কিছুকাল পরে গৌরচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম?' শিষ্যগণ উত্তর করিলেন ; "বড় কিছু নয়"। গৌর তখন লজ্জিত হইয়া সকলকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া কহিলেন 'ভাই সব! আমার অপরাধ লইও না।'

এদিকে নিতাইচাঁদের আবেশ আর ছাড়ে না। স্বয়ং বিশ্বম্ভর নানা প্রকার উপায়ে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে নিতাইর বাসা নির্দ্দিষ্ট হইল ও শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী মালিনী দেবীকে তিনি মাতৃ সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা।

নিত্যানন্দ শ্রীবাসগৃহে শয়ন কক্ষে শয়ান। গভীর রজনীতে তিনি হঠাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া কি মনে করিয়া হুঙ্কারশব্দে পার্শ্বস্থিত নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং কাহাকে কিছু না বলিয়া পূর্ব্ববৎ শুইয়া থাকিলেন। কি কারণে তিনি আপন সন্ন্যাসাশ্রমের চিহ্ন বিনাশ করিয়া ফেলিলেন, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। নিতাই কি ভাবিলেন যে প্রেমভক্তি না থাকিলে সন্ন্যাস গ্রহণ বৃথা

ভণ্ডামি? অথবা সন্ন্যাসগ্রহণ ভগবদিচ্ছার অনুগত নহে—কে বলিবে? বৃন্দাবন দাস মহাশয় তাঁহার একজন বিশ্বাসী শিষ্য ও তদ্গত প্রাণ, তিনিও ইহার তথ্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

প্রত্যূষে উঠিয়া শ্রীবাসের কনিষ্ঠ সহোদর রামাই পণ্ডিত নিতাইয়ের শয়নকক্ষের প্রকোষ্ঠের দ্বারে ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত হইয়া স্বীয় অগ্রজকে তদ্বিষয় অবগত করিলেন। পণ্ডিত আবার ঐ কথা গৌরের কাণে তুলিলেন। গৌর আসিয়া ভাঙ্গা কমণ্ডলু ও দণ্ড খণ্ড লইয়া, নিতাইকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীপাদ! একি?" নিত্যানন্দ ভাবাবেশে মগ্ন; গৌরের কথায় কোন উত্তর না দিয়া কেবল 'খিল খিল' করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর ভক্তগণ সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইয়া স্বহস্তে সেই দণ্ড কমণ্ডলু গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিলেন।

সদলে গৌরচন্দ্র গঙ্গাস্নান করিতেছেন। নিতাই বাল্যভাবে বিভোর; খুব সাঁতার দিতেছেন; মাঝ গঙ্গায় সাঁতার দিয়া কুম্ভীর ধরিতে অগ্রসর হইতেছেন এবং জলক্রীড়ায় কতমত চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছেন। সঙ্গীগণ নিষেধ করিলে চঞ্চল নিতাই একগুণের স্থানে দশগুণ দুষ্টামি করিতে লাগিলেন। কেবল গৌরের তাড়নায় কিছু স্থির হইলেন। অবশেষে গৌরচন্দ্র কহিলেন, "শ্রীপাদ গোঁসাই! তোমার যে আজ ব্যাস পূজার দিন; কখন পূজা হইবে?" ব্যাস পূজার কথা মনে হওয়ায় নিতাই জল হইতে উঠিয়া এক দৌড়ে শ্রীবাসালয়ে আসিয়া হাজির। এ দিকে গৌরচন্দ্র ও আর আর ভাগবতজনও একে একে আসিয়া জুটিলেন। ব্যাস পূজার সামগ্রী সম্ভার আসিয়া উপস্থিত হইলে ভক্তদল মৃদু মধুর সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত পূজার আচার্য্য হইয়া সুন্দর এক ছড়া বনফুলের মালায় গন্ধ লেপন করিয়া নিতাইর হাতে দিয়া বলিতে লাগিলেন 'নিতাই! এই মালা স্বহস্তে লইয়া আমি যে বচন বলি তাহা উচ্চারণ করিয়া বেদব্যাসের উদ্দেশে অর্পণ করিয়া নমস্কার কর। স্বহস্তে মালা দিবার বিধি আছে; নইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না।'

নিত্যানন্দ ভাবাবেশে ভোর হইয়া কি ভাবিতেছেন; পণ্ডিতের কথায় মনোযোগ নাই; বচন পড়া দূরে থাকুক, মালা গাছটী হাতে করিয়া কেবল 'হাঁ হাঁ' বলিতে ও চারিদিকে শূন্য চক্ষে চাইতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত শাদাসিদে উদার রকমের লোক; ভিতরকার গূঢ়ভাব না বুঝিতে

পারিয়া গৌরচন্দ্রকে বলিলেন; "তোমার শ্রীপাদ গোঁসাই মন্ত্র পড়িয়া ব্যাস-পূজা করিতেছেন না।"

শ্রীবাসের কথায় বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "শ্রীপাদ! পণ্ডিতের কথা শুনিতেছ না কেন? মাল্য দিয়া বেদব্যাসকে প্রণাম কর।" নিতাই সম্মুখে বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া একবার এ দিক ও দিক তাকাইলেন এবং তাঁহার কথার উত্তর না করিয়া মালা গাছটি একবারে তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিলেন।

মালা অর্পণ করিলে বিশ্বম্ভর নিতাইকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। কথাটা অতি অদ্ভুত। অন্য দর্শকবৃন্দ ঐরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন পরিষ্কার বর্ণনা দেখা যায় না। তবে গ্রন্থকার নিজেই কথাটির অলৌকিকত্ব অনুভব করিতে পারিয়া দোষ ক্ষালনার্থে প্রস্তাবান্তরের অবতারণা করিয়াছেন। ষড়্ভুজদর্শনে নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইলেন দেখিয়া গৌরচন্দ্র স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া মূর্চ্ছাপনোদন করিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ চেতনা লাভ করিয়া উঠিয়া মহানন্দে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এই ব্যাপারের এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন যে, নিত্যানন্দহৃদয়ে অনন্তের ভাবে ভগবচ্ছক্তি আরূঢ়, তাঁহার পক্ষে ষড়্ভুজ দর্শন কোন্ আশ্চর্য্য কথা?

"ছয়ভুজ দৃষ্টি তাঁরে সে কোন্ অদ্ভুত?
অবতার অনুরূপ এ সব কৌতুক।
রঘুনাথ প্রভু যেন পিণ্ডদান কৈল;
প্রত্যক্ষ হইয়া আসি দশরথ নিল।
সে যদি অদ্ভুত হয়, এ তবে অদ্ভুত;
নিশ্চয় যে এ সকল কৃষ্ণের কৌতুক।"

এ কথার সূক্ষ্ম মীমাংসার ভার পাঠক মহাশয়ের উপর দেওয়া গেল। যে হৃদয়ে অন্তর্যামী যে ভাবে আবির্ভূত হইবেন, বস্তুতত্ত্ব নির্ণয় তাঁহার নিকট তদনুরূপ হইবে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"

ইহারই নাম ব্যাসপূজা। গৌরচন্দ্র বলিলেন ব্যাস পূজা পূর্ণ হইল এখন সকলে মহাসংকীর্ত্তন কর। তখন মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল; গৌর নিতাই দুই ভাই প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গগ

ধরাধরি করিয়া নাচিতে লাগিলেন; শচীমাতা শ্রীবাসের অন্দর প্রকোষ্ঠে থাকিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া মহা আনন্দিতা হইলেন এবং মনে মনে উভয়কেই আপন আত্মজ জ্ঞান করায় স্নেহ উথলিয়া উঠিতে লাগিল। ভক্তগণ কেহ নাচিতে, কেহ গাইতে, কেহ বাজাইতে উন্মত্ত; কেহ কেহ অচৈতন্যাবস্থায় ভূমি শায়িত; আর কোন কোন ভাগ্যবান্ ভক্তদলের পদরজে গড়াগড়ি পাড়িতে লাগিলেন।

নৃত্যকীর্ত্তনে দিবা অবসান হইল দেখিয়া বিশ্বম্ভর কীর্ত্তন ভঙ্গ করিতে আদেশ দিলেন। সকলে সুস্থির হইয়া বসিলে গৌরচন্দ্র শ্রীবাস পণ্ডিতকে ন্যাসোদ্দেশে আহরিত নৈবেদ্যাদি আনিতে বলিলেন এবং ঐ সকল দ্রব্য আনীত হইলে স্বহস্তে উপস্থিত ভক্তদলকে বণ্টন করিয়া দিলে ভক্তগণ মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেদিনকার কৌতুক নিবৃত্ত হইল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈত আগমন।

গৌরের ভক্তদল দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও সংকীর্ত্তনের জমাটে নবদ্বীপ তোলপাড় হইয়া গেল। কিন্তু এই আনন্দবাজারে অদ্বৈতকে না দেখিয়া বিশ্বম্ভর দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, যেদিন বিশ্বম্ভরের মহাভাবের অচৈতন্যাবস্থায় অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার পাদপূজা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য গদাধর কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে গৌরকে তিনি অন্যচক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু পূর্ণরূপে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিবার জন্য হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরের বাটীতে চলিয়া যান; তদবধি আর নবদ্বীপে আইসেন নাই। একদিন গৌরচন্দ্র ভাবসমাধিতে ভগবানের সহিত অভিন্নযোগে যুক্ত হইয়া শ্রীবাসপণ্ডিতের ভাই রামাইকে শান্তিপুরে যাইয়া নিত্যানন্দের আগমনবার্ত্তা বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে সস্ত্রীক নবদ্বীপে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, রামাইয়ের প্রতি আদেশ ছিল যে, পূজার আয়োজন লইয়া অদ্বৈত আসিয়া যেন তাঁহাকে পূজা করেন। রামাই শান্তিপুরে অদ্বৈত-

ভবনে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে আচার্য্য প্রথমতঃ তাঁহার কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'হাঁ! ভগবানের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই যে, তিনি নবদ্বীপে কতকগুলা লোকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন? বল দেখি কোন্ শাস্ত্রে লিখেছে যে, নবদ্বীপে ভগবান্ অবতীর্ণ হবেন?'

"কোথা বা গোঁসাই আইলা মানুষ ভিতরে?
কোন্ শাস্ত্রে বলে নদীয়ার অবতারে?"

বড় উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া অদ্বৈত এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। রামাই তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কথায় উত্তর দিলেন না। ক্ষণকাল পরে আচার্য্য প্রকৃতিস্থ হইলে রামাই বলিলেন—"এখন ওরূপ বলিলে হইবে কেন? ভক্তিশূন্য জগতে ভক্তিপ্রচার করিবার জন্য যে তখন কত সাধ্য সাধনা করিয়াছিলেন, তাকি মনে নাই? আজ সেই ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়া ঘরে ঘরে ভক্তি বিলাইতেছেন; এখন উদাসীন হইয়া থাকিলে চলিবে কেন?" অদ্বৈতাচার্য্য কিছু সন্দেহব্যঞ্জকভাবে উত্তর করিলেন "দেখ রামাই! আমাকে তিনি যাইতে বলিয়াছেন; আমি যাইব। কিন্তু সত্য সত্যই তিনি যদি সেই হন, যাঁহার জন্য কঠোর সাধ্য সাধনা করিয়াছি; তবে তিনি সেই ঐশ্বর্য্য আমাকে দেখাইবেন, যাহা আমার মনে জাগিতেছে।" এই বলিতে বলিতে অদ্বৈত রায় মহা উত্তেজিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন:— "আর সত্য সত্য আমার এই পলিতকেশ মস্তকে স্বীয় পাদপদ্ম উঠাইয়া দিবেন। ইহা যদি পারেন, তবে তাঁহাকে আমি আপন প্রাণনাথ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারি; নচেৎ নহে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ আচার্য্যের অধর, ওষ্ঠ, ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। অদ্বৈত আবার বলিতে লাগিলেন—"রামাই! তুমি অগ্রসর হও, আমি সস্ত্রীক তোমার অনুগমন করিব ও গোপনে যাইয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিব। সাবধান, তুমি একথা বিশ্বম্ভরকে বলিবে না। তাঁহাকে বলিও যে অদ্বৈত আসিলেন না। দেখি, আমাকে তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন কি না?"

রামাই তথাস্তু বলিয়া চলিয়া গেলেন; অদ্বৈতও নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী লইয়া সস্ত্রীক নবদ্বীপে যাত্রা করিলেন এবং নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কথাটা একটু প্রাণে আঘাত দিতেছে। আমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক; আমাদের আদর্শ অনুসারে সাধুজীবনের

সাধুতা দেখিতে ইচ্ছা হয়। অদ্বৈতাচার্য্য একজন মহাসাধু; তবে তিনি কেমন করিয়া রামাই পণ্ডিতকে অসত্য কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন? আর রামাইও একজন ভক্ত, তিনিই বা অদ্বৈত আসিবেন না, এই মিছাকথা বলিয়া গৌরকে ভুলাইতে কেন স্বীকৃত হইলেন? তবে কি অদ্বৈতের নবদ্বীপ আগমনের বৃত্তান্ত মধ্যে যে সকল অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী সময়ে চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব স্থাপনে অভিলাষী ভক্তগণের মনের বিশ্বাস ও আবেগ, প্রেমভক্তির রঙ্গে প্রতিফলিত করিয়া ছবিখানিকে অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে?

শ্রীবাসালয়ে প্রমত্ততার সহিত সঙ্কীর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; গৌরচন্দ্র পূর্ণ মাত্রায় ভাবে বিভোর হইয়া মৌনাবলম্বনে বসিয়া আছেন, ভক্তদল তাঁহার আবিষ্ট চিত্ত বুঝিয়া চারিদিকে চুপ করিয়া আছেন, এমন সময় গৌরসিংহ হুঙ্কার [ক]রিয়া এক বারে পণ্ডিতের বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিলেন। নিত্যানন্দ নিকটে [ছি]লেন, তিনি অমনি তাড়াতাড়ি একটী ছত্র লইয়া গৌরের মস্তকে ধরি[লে]ন। আর গদাধর কর্পূর ও তাম্বূল দিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। [গৌ]রচন্দ্র স্বানুভবানন্দে মাথা ঢুলাইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন:— [“]নাড়া আসিতেছে; নাড়া আমার ঠাকুরালি দেখিতে চাহে।”

এই সময়ে রামাই পণ্ডিত শান্তিপুর হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিশ্বম্ভরকে [প্র]ণাম করিলেন। পণ্ডিত কিছু না বলিতেই আবিষ্ট গৌরাঙ্গ বলিতে [লা]গিলেন,—“কি রামাই! নাড়া বুঝি আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য পাঠা[ই]য়াছে ও আপনি নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া আছে? আর পরীক্ষার [প্র]য়োজন নাই, এখন তুমি যাও, তাঁহাকে ডাকিয়া আনো গে।” রামাই [ন]ন্দন আচার্য্যের গৃহে যাইয়া সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে অদ্বৈত সস্ত্রীক আসিয়া [গৌ]রের সভায় উপনীত হইলেন এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য [হ]ইয়া গেলেন। তাঁহার বোধ হইল, বিশ্বম্ভর মহাজ্যোতির্ম্ময় ভূষণে ভূষিত [হ]ইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, চারিদিকে মহাজ্যোতির্ম্ময় [দে]বগণ যেন তাঁহার স্তুতি বন্দনা করিতেছে; অনন্ত আপনি ছত্র ধারণ করিয়াছেন ও চারিদিকে যেন দেবোৎসব হইতেছে। অদ্বৈতের স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া গৌরচন্দ্র প্রসন্নচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—“আচার্য্য! কি দেখিতেছ? তোমারই কঠোর আরাধনায় আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, জীবের [দুঃ]খ আর থাকিবে না। আর চারিদিকে এই যে ভক্তদল দেখিতেছ, ইহারা

সকলেই দেবাংশে আবির্ভূত হইয়াছেন ?' কথিত আছে যে, অদ্বৈতের তখন আর অবিশ্বাসের কারণ থাকিল না; তখন প্রেমে, আনন্দে ও আশ্চর্য্যে বিহ্বল হইয়া "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ; জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ" শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বৃদ্ধ আচার্য্য গৌরের চরণতলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। আর বিশ্বম্ভর কি করিলেন ? এত দিন যাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন, ঈশ্বর ভাবে মগ্ন হইয়া একেবারে তাঁহার মাথায় পা দুখানি তুলিয়া দিলেন; তখন ভক্তদল একেবারে 'জয়! জয়!' ধ্বনি করিয়া একটা তুমুল আন্দোলন করিয়া তুলিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিত্রখানি অতিরঞ্জিত; পাঠক মহাশয়। অতি সাবধানে ইহার তত্ত্ব নির্ণয় করিবেন।

বিশ্বম্ভর আদেশে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে গৌরচন্দ্র অদ্বৈতকে নৃত্য করিতে আদেশ করিলেন; বৃদ্ধ আচার্য্য তখন প্রেমে ভোরপুর, সুতরাং নানারূপ অঙ্গভঙ্গিতে নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তদল হাসিয়া অস্থির হইলেন। গৌর তখনও বিভোর, অদ্বৈতকে বলিলেন—"আচার্য্য! কিছু বর লও।'

আচার্য্য উত্তর করিলেন, "আর কি বর চাহিব ? যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহাপেক্ষা অনেক বেশি পাইলাম।"

বিশ্বম্ভর। "তবু আর কোন অভিলাষ কি নাই ?"

অদ্বৈত। আছে, একটী নিবেদন আছে। প্রেমভক্তি বিলাইতে বসিয়াছ, আমার প্রার্থনা এই যে, স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ, চণ্ডাল প্রভৃতি লোকদিগকে, জাতি-বিদ্যা-ধন মদে মত্ত লোকগুলা সর্ব্বদাই ঘৃণা করে ও পীড়া দেয়; প্রেম-ভক্তি দিতে হলে আগে তাহাদেরই দিও। পাপিষ্ঠগুলা দেখুক যে, ভগবানের নিকট ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ভেদ নাই।

বিশ্বম্ভর। এই ত কথা! আচ্ছা তাহাই হইবে।

এই মতে নানা রূপ রঙ্গ ভঙ্গির পর গৌরচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন, সকল গোল চুকিয়া গেল, নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতের পরিচয় হইল এবং তদবধি অদ্বৈতাচার্য্য সস্ত্রীক নবদ্বীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদ্যানিধি না প্রেমনিধি?

একদিন সঙ্কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া বিশ্বম্ভর 'বাপ রে পুণ্ডরীক! বন্ধু রে! তোকে কবে দেখিব?' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্ডরীক নাম ধরিয়া বুঝি প্রভু কাঁদিতেছেন। ক্ষণকাল পরে গৌরের ভাবাবেগ উপশমিত হইলে কোন কোন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! আজ আমাদের মনে এক সন্দেহ হইয়াছে, কৃপা করিয়া তাহা ভঞ্জন করুন।"

বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সন্দেহ?

প্রশ্নকর্ত্তা কহিলেন, আজ আবেশ সময়ে একটী নূতন নাম শুনিয়াছি, পুণ্ডরীক বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। পুণ্ডরীক কে তাহা কি আমরা জানিতে পারি না?

বিশ্বম্ভর।—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রাম ধন্য করিবার জন্য ঈশ্বর ইচ্ছায় বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; ইনি মহাপ্রেমিক ও বিশ্বাসী। গঙ্গার মাহাত্ম্যে তাঁর এত দূর বিশ্বাস যে, পাদস্পর্শ হইলে অপরাধ হইবে ভয়ে তিনি গঙ্গাজলে স্নান করেন না; আর লোকে পরম নির্ম্মল গঙ্গাজলে কুল্য, দন্তধাবন প্রভৃতি অনাচার করে দেখিয়া তাঁহার প্রাণে এতই ব্যথা হয় যে, ঐ সকল মলিন কার্য্য দর্শনের ভয়ে দিবাভাগে গঙ্গা দর্শন করেন না। এখন তিনি চাটিগ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্রই এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদ ব্যবহারাদি ঘোরবিষয়ীর ন্যায়, দেখিলে হঠাৎ ভক্ত বলিয়া চেনা যায় না। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে; তোমরা সকলে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া আন দেখি?'

এদিকে বিদ্যানিধি মহাশয় ভক্তপ্রার্থনায় ও দেবাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নবদ্বীপে গঙ্গাস্নানে, আসিবার জন্য সমুৎসুক হইলেন এবং বহুবিধ দাসদাসী দ্রব্যসামগ্রী লইয়া একজন মহাধনাঢ্য ভোগীর ন্যায় যাত্রা করিয়া যথাসময়ে নবদ্বীপে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা গৌরের ভক্তদল কেহই জানিতে পারিলেন না। কেবল মাত্র মুকুন্দ

সে সম্বাদ জানিয়া অপ্রকাশিত রাখিলেন। বিদ্যানিধি ও মুকুন্দ দত্ত এক গ্রামে জন্মিয়াছেন ও উভয়ে বাল্যবন্ধু। সে কারণে মুকুন্দের কাছে ঐ সংবাদ অপ্রচারিত থাকিল না। গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দের হৃদয়বন্ধু, পরস্পরের নিকট পরস্পরের কোন কথা লুকান থাকিত না; কাজেই মুকুন্দ গদাধরকে ঐ সংবাদ না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। মুকুন্দ বলিলেন "গদাধর! আজ তোমাকে এক শুভ সংবাদ দি; কয়েক দিন হইল নবদ্বীপে এক জন অদ্ভুত বৈষ্ণব আসিয়াছেন। যদি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল, দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।"

গদাধর পণ্ডিত বাল্যকাল হইতে সংসারে বিরক্ত, ভক্তি-পিপাসু। বৈষ্ণব দর্শনের কথা শুনিয়া আনন্দ সহকারে "চল তবে যাই" বলিয়া গমনে উদ্যত হইলেন। দুই বন্ধুতে তখন শুভ যাত্রা করিয়া বিদ্যানিধির প্রবাস বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গদাধর বৈষ্ণবদর্শনের কথা শুনিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, একজন উদাসীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইবেন; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যখন দেখিলেন যে বহু দাসদাসী দ্রব্যসামগ্রীতে প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ ও বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত বৈঠকখানা উজ্জল করিয়া একজন রাজপুত্রের ন্যায় যুবাপুরুষ বসিয়া আছেন, তখন তাঁহার আশ্চর্য্যের পরিসীমা থাকিল না। একবার মনে করিলেন "এ ব্যক্তি বৈষ্ণব না হইতে পারে।" পরে যখন মুকুন্দদত্ত এই "পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়" বলিয়া পরিচয় করিয়াদিলেন, তখন আর ব্যক্তিত্বের প্রতি সন্দেহ থাকিল না; কিন্তু মনে করিলেন, তিনি সর্ব্বদা বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সে জন্য মুকুন্দ বুঝি তাঁহার সঙ্গে রহস্য করিয়াছেন। গদাধর বিদ্যানিধির সজ্জা আসবাবের এইরূপ পারিপাটা দেখিলেন:—পিত্তলে মণ্ডিত ও নানা বর্ণে চিত্রিত এক দিব্য খট্টার বিচিত্র চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে; বহুমূল্য কারুকার্য্য বিশিষ্ট বস্ত্রের সুন্দর শয্যা তাহাতে বিস্তৃত রহিয়াছে; তাহার চারি পাশে শোভন বস্ত্রাচ্ছাদিত কতকগুলি বালিশ সজ্জিত আছে; গুটীকয়েক ছোট বড় ঝাড়ি, দুইটী সুন্দর আলবাটী ও বাটাভরা পাকা পান শয্যাপার্শে সাজান আছে। শয্যোপরে পরম সুন্দর এক যুবা পুরুষ রাজপুত্রের ন্যায় বসিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন; দুইজন পরিচারক তাঁহাকে ময়ুরপাখা বীজন করিতেছে। যুবকের কেশসংস্কারেরই বা কত পারিপাট্য? আমলকী ও সুগন্ধে অনুরঞ্জিত হইয়া সৌরভ বিস্তার

করিতেছে। সম্মুখে এক বিচিত্র সাহেবানো দোলা পড়িয়া আছে। পরিচরবর্গ ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে।

বিদ্যানিধি মহাশয় গদাধরকে লক্ষ্য করিয়া মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'ইনি কে?'

মুকুন্দ উত্তর করিলেন, "এই গ্রামবাসী মাধবমিশ্র মহাশয়ের পুত্র, নাম শ্রীগদাধর; ইনি বালক-কাল হইতে সংসারে বিরক্ত ও ভক্তিপথের পথিক। তোমার নাম শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন।"

গদাধর নীরবে প্রণাম করিয়া বসিলেন, ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "ভাল ত বৈষ্ণব দেখিতে আসিয়াছি? এ যে দেখ্‌ছি একজন ঘোর বিষয়ী; শুনিয়া ছিলাম বটে ইনি একজন পরমভক্ত, কিন্তু দেখ্‌ছি তার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

মুকুন্দ দত্ত গদাধরের মনের ভাব কতক বুঝিতে পারিয়া তাঁহার ভ্রম দূর করিবার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। মুকুন্দ বড় সুগায়ক; ভাগবতের পূতনাবধাধ্যায়ে ছলনা-রূপিণী রাক্ষসী পূতনা কালকূট দিয়া কৃষ্ণের প্রাণ সংহার করিতে চাহিয়াও ভগবানের অপার করুণাগুণে মাতৃপদ লাভ করিয়া মুক্তা হইয়াছিল, ইত্যাদি যে শ্লোক বর্ণিত আছে, তাহা সুমধুর স্বর-সংযোগে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি ভক্তিযোগের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন; নয়নযুগল দিয়া আনন্দধারা বহিয়া যাইতে লাগিল; ক্রমে কম্প, স্বেদ, পুলক, হুঙ্কার ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি মহাভাবের লক্ষণ সকল দেখা যাইতে লাগিল; এবং 'বোল! বোল!' করিতে করিতে বিদ্যানিধি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন; ও হাত পা ছুঁড়িতে লাগিলেন। কোথাকার দ্রব্য সামগ্রী কোথায় গেল? লাথি ও আছাড়ের চোটে সব দ্রব্য ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। সে সুন্দর কেশ দাম ধূলায় লুটাইতে লাগিল; পরিধেয় বহুমূল্য বস্ত্র দুই হাতে ছিঁড়িতে লাগিলেন এবং ব্যাকুল চিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, 'হায়! প্রাণকৃষ্ণ! আমাকে কেন কাষ্ঠপাষাণের ন্যায় নীরস করিলে? আমি কেন তব পদারবিন্দে বঞ্চিত হইলাম?'

কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া বিদ্যানিধি আনন্দসাগরে ডুবিয়া গেলেন।

এই ব্যাপার দর্শন করিয়া গদাধর পণ্ডিত স্তব্ধ হইয়া গেলেন ও বিদ্যা-

নিধির প্রতি মনে মনে যে অবজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার জন্য কাতর ও অনুতপ্ত হৃদয়ে মুকুন্দকে বলিতে লাগিলেন :—'হায়! আমি কি দুর্ভাগ্য! এ হেন মহাশয়কে আমি অবজ্ঞা করিয়া কি মহাপাতক সঞ্চয় করিলাম? কি অশুভক্ষণে আমি ইঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম? বলিতে কি মুকুন্দ! তুমি না থাকিলে আজ্ ভক্তের নিকট অপরাধে আমার না জানি কি দুর্দশা হইত? তুমি ভক্ত বিদ্যানিধির ভক্তির প্রকাশ দেখাইয়া, যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করিলে। আজি আমি কি পরম সঙ্কটই এড়াইলাম? ইঁহার বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া বিষয়ীবৈষ্ণব জ্ঞানে ইঁহার প্রতি আমার মনেমনে অবজ্ঞা হইয়াছিল; তুমি বুঝি আমার মনের ভাব টের পাইয়াছিলে? তাই ভক্ত পুণ্ডরীকের ভক্তিপুণ্ডরীক প্রকাশ করিয়া দিলে। ইঁহার ভক্তিদর্শনে ত্রিলোক পবিত্র হয়; এমন ভক্ত কি আর আছে?' এই বলিয়া গদাধর মুকুন্দকে জানাইলেন যে, "আমি উঁহার সম্বন্ধে যত খানি অপরাধ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আমার এ পাপ যাইবে না। আমি এখনও দীক্ষিত হই নাই; বিদ্যানিধি কৃপা করিয়া যদি আমাকে দীক্ষিত করিয়া শিষ্যত্বে বরণ করেন, তাহা হইলে আমি এ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। কারণ শিষ্য হইলে তিনি অবশ্যই আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

মুকুন্দ 'ভাল, ভাল' বলিয়া ঐ কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। এ দিকে প্রায় দুই প্রহর কাল পরে বিদ্যানিধি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন মুকুন্দ দত্ত গদাধর সম্বন্ধীয় কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া গদাধরের মনোভিলাষ বিজ্ঞাপন করিলেন। গদাধর অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদতলে পড়িয়া গেলেন। বিদ্যানিধি হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলেন এবং বলিলেন "আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে, এমন ভগবদ্ভক্ত আমার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিলেন।"

তখন গদাধর ও মুকুন্দ মহাহৃষ্ট চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৌরের সভায় আসিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন ও বিদ্যানিধির আগমন বার্ত্তা শুনিয়া গৌরচন্দ্র মহা আনন্দ লাভ করিলেন। এ দিকে বিদ্যানিধি মহাশয়ও রজনীযোগে একাকী অলক্ষিত রূপে শ্রীবাসমন্দিরে গৌরাঙ্গ সভায় আসিয়া উপনীত হইলেন; ও গৌরের ভাবাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন দর্শন শ্রবণ করিয়া মধুর প্রেমোন্মত্ততায় আত্মহারা হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন :—

"কৃষ্ণ রে জীবন! কৃষ্ণ রে মোর বাপ!
মুই অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ।
সর্ব্বজগতের বাপ! উদ্ধার করিলে;
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে।"

ভক্তগণ আগন্তুকের ঈদৃশ বিলাপ-ধ্বনি শুনিয়া চিনিতে না পারিয়া কিছু বিস্মিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে গৌরচন্দ্র বুঝিতে পারিয়া সম্ভ্রমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও "পুণ্ডরীক বাপ! আজ তোমাকে দেখিয়া নয়ন সার্থক হইল" বলিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকিলেন। তখন ভক্তগণ বুঝিলেন যে, ইনিই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। গৌরের মত ভক্তের প্রশংসা করিতে কেহ জানে না; তাই তিনি সর্ব্ব সমক্ষে দশমুখে বিদ্যানিধির গুণ বর্ণিতে লাগিলেন:—'আজি শ্রীকৃষ্ণ আমার সকল মনোরথ সিদ্ধ করিলেন; আজি শুভক্ষণে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পুণ্ডরীক দর্শন করিলাম। আজি আমার সকল মঙ্গল হইল। ইঁহার পদবী বিদ্যানিধি, কিন্তু বিধাতা প্রেমভক্তি বিলাইতে ইঁহাকে আনিয়াছেন। ইনি তো বিদ্যানিধি নন, সাক্ষাৎ প্রেমনিধি।'

বিদ্যানিধি উপাধিটী গৌরচন্দ্রের কাণে ভাল শুনায় নাই; যেন একটু পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব মাখান। তাই ঐ উপাধি পরিবর্ত্তন করিয়া প্রেমনিধি বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সেই অবধি বিদ্যানিধি প্রেমনিধি বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হইয়া গেলেন। প্রেমনিধি মহাশয় প্রেমে মুগ্ধ হইয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত কাহাকেও প্রণাম করিবার অবসর পান নাই। এখন সমবেত বৈষ্ণবগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়া সকলকে প্রণাম করিলেন; ও সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের পাদবন্দনা করিয়া ক্রমে সকলের যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। গদাধর এই অবসরে বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা পাওয়ার প্রস্তাব করিয়া গৌরের অনুমতি চাহিলেন। গৌরচন্দ্র 'শীঘ্র শীঘ্র কর' বলিয়া মহাসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। যথা সময়ে গদাধর পণ্ডিত শ্রীপ্রেমনিধির স্থানে মন্ত্রদীক্ষা লইয়া আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শচীমাতার স্বপ্ন।

শ্রীবাসের বাড়ীতে নিত্যানন্দের বাসা। নিতাই বাল্যভাবে বিভোর; এখন আর নিজ হাতে ভাত খান না। মালিনীদেবী শিশুর মত ভাত খাওয়াইয়া দেন। প্রতিবাসী বালকদিগের সঙ্গে মিশিয়া নিতাইয়ের খেলা; নগরে নগরে ধূলা খেলা, গঙ্গাস্রোতে ডুব সাঁতার, চিৎসাঁতার প্রভৃতি নানাবিধ জলক্রীড়া এবং ভাত খাওয়ার সময় অর্দ্ধেক অন্ন সমস্ত অঙ্গে মাখিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া ফেলান প্রভৃতি ক্রীড়ায় তিনি খুব মজবুত হইয়া উঠিলেন। থাকিয়া থাকিয়া নিতাই এক দৌড়ে বিশ্বম্ভরের বাড়ী যান, শচীমাতাকে মা বলিয়া ডাকেন, বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে কত হাস্য পরিহাস করেন, আর শচীমাতাকে দেখিলেই তাঁহার চরণ-ধূলি লইতে যান। উদাসীন সন্ন্যাসী চরণ স্পর্শ করিলে অপরাধ জন্মিবে ভয়ে শচীদেবী নিতাইকে দেখিলেই পলাইয়া যান্, তথাপি নিতাইয়ের বাল্যসরলতায় শচীর মন স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া গেল; এবং নিতাইকে আপন প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানে ভালবাসিতে লাগিলেন। এক দিন শচীদেবী বিশ্বম্ভরকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ নিমাই! আমি গত রজনীতে বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি; তুমি আর নিত্যানন্দ যেন আমার দেবালয়ে প্রবেশ করিলে ও পাঁচবছরের ছেলে হইয়া সিংহাসনস্থিত কৃষ্ণবলরাম শ্রীবিগ্রহ লইয়া বাহির হইয়া এলে। তোমার হাতে বলরাম ও নিতাইয়ের হাতে কৃষ্ণ। তাহার পর চারি জনে যেন মারামারি করিতে প্রবৃত্ত হইলে। রামকৃষ্ণ ঠাকুর ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাদের দুই জনকে তিরস্কার করিয়া যেন বলিতে লাগিলেন; 'হাঁরে! তোরা দুই ঢাঙ্গাড় কে রে''? এ বাড়ী ঘর, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশাদি উপকরণ সব আমাদের; তোরা দূর হ।' নিত্যানন্দ যেন ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর দিলেন 'সে কাল আর নাই, যখন ছানা মাখন লুঠিয়া খেয়েছিলে; গোয়ালার অধিকার চলিয়া গিয়াছে, এখন ব্রাহ্মণের অধিকার। তাই বলি এ সব ছেড়ে এখন চম্পট দাও। যদি সহজে না ছাড়, ঠেঙ্গাইয়া দোরস্ত করিয়া দিব; ও জোর করিয়া কাড়িয়া খাইব।' তাহাতে রামকৃষ্ণ যেন আরও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন "কৃষ্ণের দোহাই! তোদের দুজনকে আজ মারিয়া তাড়াইয়া দিব।" নিতাই পুনর্ব্বার উত্তর করিলেন:—"তোর কৃষ্ণকে কে ভয় করে?

শুর গৌরচন্দ্র আমার প্রভু।” ইহার পর যেন তোমাদের চারি জনের ধ্যে মারামারি ও নৈবেদ্য কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল।

“কাহারও হাতের কেহ কাড়ি লই যায়;
কাহারও মুখের কেহ মুখ দিয়া খায়।”

আর নিত্যানন্দ যেন আমাকে বলিলেন “মা! বড় ক্ষুধা হয়েছে, ামাকে অন্ন দাও।” এই বলিয়া সরলহৃদয়া শচী পুত্রকে বলিলেন,— 'বৎস! এ স্বপ্নের অভিপ্রায় কি? আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই; তুমি ামাকে উহা বুঝাইয়া দাও।”

বিশ্বম্ভর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন “মা! আমার বোধ হইতেছে াপনি খুব সুস্বপ্ন দেখিয়াছেন; ইহা আর কাহাকেও বলিবেন না। আমাদের বাড়ীর মূর্ত্তি বড় প্রত্যক্ষ দেবতা; আমিও অনেক সময়ে নৈবেদ্যাদি করিয়া রাখি ও পরক্ষণে আসিয়া দেখি তাহা আধা আধি হইয়া আছে। এত দিন মনে মনে ভাবিতাম, এ সব কি হয়?' এই বলিয়া রসিক চূড়ামণি বিশ্বম্ভর মধুর হাসি হাসিয়া ও বধূর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 'মা! সত্য ত্য এত দিন আমার তোমার বধূর উপর সন্দেহ ছিল; আজ তাহা ূর হইল।' বিষ্ণুপ্রিয়া কিছু অন্তরে ছিলেন; স্বামীর ভালবাসা মাখান পরিহাস শুনিয়া সুখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কোন্ স্ত্রীই বা না হয়?

নিমাই! আমরা জানিতাম তুমি গার্হস্থ্য প্রেম জান না, কেবল বিভু-প্রেমে ভোর। আজ্ আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। অথবা যাঁহার প্রাণে হরিপ্রেম পরিপূর্ণ; তিনি দাম্পত্যপ্রেম জানেন না? এ তো হইতে পারে না। হরিপ্রেম তো আর একাঙ্গ নয়, উহা যে পূর্ণাঙ্গ। গার্হস্থ্যপ্রেম বল, দাম্পত্যপ্রেম বল, সকলই সেই বিশ্বপ্রেমের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা। যাহা হউক, বিশ্বম্ভর জননীকে বলিলেন,—'মা! নিতাই স্বপ্নে তোমার নিকট অন্নভিক্ষা করিয়াছেন; আমার বিবেচনায় তাঁহাকে ভোজন করাইয়া স্বপ্ন সফল করা উচিত।' শচীমাতা পুত্রের কথায় সম্মত হইয়া নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বলিয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর মহাহৃষ্ট চিত্তে শ্রীবাসের বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনে বসিয়া ভাত ছড়ান নিতাইয়ের রোগ; বিশ্বম্ভর তাহা জানিতেন। সুতরাং নিতাইকে সতর্ক করিয়া দিলেন। নিত্যানন্দ মহাবিজ্ঞের ন্যায় কর্ণে হস্ত দিয়া “বিষ্ণু, বিষ্ণু”

বলিয়া উত্তর করিলেন "আমি কি পাগল যে ভাত ছড়াইব। তুমি বুঝি আমাকে আপনার ন্যায় চঞ্চল মনে কর।"

গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ ও গদাধর প্রভৃতি আত্মীয়গণ লইয়া নিজগৃহে ভোজন করিতে বসিয়াছেন; শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছেন। গৌরের নিষেধ সত্ত্বেও নিতাই থাকিয়া থাকিয়া নিজপাতের উচ্ছিষ্ট লইয়া বালকের ন্যায় চারিদিকে ছুড়িতেছেন ও বন্ধুগণ মানা করিলে কত মত রঙ্গভঙ্গি করিতেছেন। শচীদেবী রন্ধনশালা হইতে একবার অন্ন দিতে আসিয়া হঠাৎ পংক্তির দিকে তাকাইয়া দেখিয়া অন্নের থালি ফেলাইয়া দিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। হস্তস্থিত অন্ন চারিদিকে ছড়াইয়া গেল; ভোক্তাগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। বিশ্বম্ভর আস্তেব্যস্তে উচ্ছিষ্ট হাত ধুইয়া জননীকে তুলিয়া ক্রোড়ে লইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ও শচীদেবী কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; 'মা! উঠ্ আচম্বিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন কেন?

শচীদেবী চেতনা লাভ করিয়া অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিলেন না; গৃহমধ্যে গিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন,—"বাছা! আমি ভাত দিব মনে করিয়া ভোজন স্থানে আসিয়া দেখি যেন তুমি কৃষ্ণবর্ণ ও নিতাই শুক্লবর্ণ দুইটী পঞ্চমবর্ষীয় বালক চতুর্ভুজ হইয়া ভোজন করিতেছ; উভয়েই দিগম্বর এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হল, মুষলধারী। আর আমার বউ যেন বাপ তোর হৃদয়ে শোভা পাইতেছেন। নিমাই! বল দেখি কেন আমি এরূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম?"

বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন 'মা! রাত্রির সেই স্বপ্নের ভাব মনে ছিল। তাই ঐরূপ বোধ হইয়াছে। ও কিছু নয়।"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশাকীর্ত্তন—পাষণ্ডীদিগের আচরণ।

এক দিন সম্মিলিত বৈষ্ণবসভায় গৌরচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন 'ভ্রাতৃগণ এক কথা বলি শুন; আমরা তো দিবাভাগে হরিনাম করিয়া থাকি

নিশাভাগটা আমোদের কেন বৃথা অপব্যয় হয়। আজ হইতে সকলে এই নির্ব্বন্ধ কর যে রজনীতে আমরা পরম মঙ্গল হরি সংকীর্ত্তন করিয়া ভক্তি-রূপিণী গঙ্গায় মার্জ্জন করিব এই মন্ত্র সার কর।

এই কথা শুনিয়া ভক্ত দল মহানন্দ ও উৎসাহ সহকারে নিশাকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এত দিন কেবল শ্রীবাসের গৃহেই কীর্ত্তন হইত, এখন হইতে অন্য অন্য স্থানেও হইতে লাগিল। কোন কোন দিন চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে, কোন দিন বা বিশ্বম্ভরের বহির্বাটীতে হইত; কিন্তু শ্রীবাস-মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান স্থান রহিয়া গেল।

এখন হইতে কীর্ত্তনের প্রকৃতিও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইল। এত দিন সকলে মিলিয়া একত্রে কীর্ত্তন হইত। এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অথবা এক সময়ে এক বাড়ীতেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল; শ্রীবাস পণ্ডিতের একদল, মুকুন্দ দত্তের দ্বিতীয়, গোবিন্দ দত্তের তৃতীয়, এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ দল গঠিত হইতে লাগিল। একাদশী রজনীর হরিবাসরে কিছু অধিক ধূম হইত।

কীর্ত্তনের পদগুলিও এখন হইতে কিছু লম্বা লম্বা হইতে লাগিল। সুপ্রসিদ্ধ চল্লিশপদী কীর্ত্তনের উৎপত্তি এই সময়ে। আর নৃত্যের ভাগটাও কিছু অধিক মাত্রায় চড়িয়া গেল। এই সময়ের সংকীর্ত্তনের প্রগাঢ়তা, গাম্ভীর্য্য, মত্ততা ও মাধুর্য্যে এতই জমাট বাঁধিয়া যাইত যে, বাহিরের লোকেরও তাহাতে গভীর ভাবাবেশ না হইয়া পারিত না। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এসময়ের কীর্ত্তনের বর্ণনা লিখিতে লিখিতে এতই আবিষ্ট হইয়াছেন যে, তিনি আক্ষেপ করিয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, "পাপ জন্ম হইলত, কেন সেই সময়ে হইল না। তাহা হইলে তো সংকীর্ত্তনানন্দে পাপ ধুইয়া যাইত।" এই রূপ নিশাকীর্ত্তন একবৎসর কাল হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এখন হইতে নৃত্যের ভাগটা কিছু অধিক মাত্রায় হইতে লাগিল। গৌরকে নাচাইবার উদ্দেশে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ নিজেও কম নয়; কতকগুলি তৃণ দিয়া আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া বিকটবেশে যখন কটী দোলাইয়া নাচিতেন, তাহা দেখিয়া ভক্তগণে হাসি সম্বরণ করিতে পারিত না।

গৌরের নৃত্য, কীর্ত্তন, ভাব, আনন্দ সকলই অদ্ভুত। পাঠকমহাশয় জানেন যে, তাঁহার হৃদয় ভাবময়; উহাতে যখন যে ভাব জাগরূক হইত,

তাহার অবধি না হইয়া যাইত না। নর্ত্তনাবেশে বিবিধ ভাবলহরী প্রকটিত হইতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে কখন কখন বন্ধুগণের স্কন্ধে উঠিয়া তিনি অঙ্গনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কখন বা বালকের ন্যায় চঞ্চলতা প্রকাশ করেন; পা নাচাইতে নাচাইতে কখন খল খল করিয়া হাসিতে থাকেন, কখন বা ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া কতমত রঙ্গভঙ্গ করেন; আবার কখন বন্ধুদিগের চরণ ধরিয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন। এমন আশ্চর্য্য ভাবাবেশ কেহ কখন দেখে নাই। আধ্যাত্মিক রাজ্যে কত নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহা কে জানে? স্থূলজগতে বাস করিয়া স্থূলের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে আমরা সূক্ষ্ম জগতের ভাব কেমন করিয়া বুঝিব? সে রাজ্যে না গেলে কে তাহার সম্বাদ আনিতে পারে? এখানে মানবের দর্শনশাস্ত্র পরাস্ত; পদার্থবিদ্যা, গণিতবিদ্যারও ক্ষমতায় কুলায় না। প্রেম-বিজ্ঞান সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; প্রেমিক না হইলে প্রেমতত্ত্বের তত্ত্ব পাওয়া যায় না। কে জানে কি কারণে ক্ষণে ক্ষণে গৌরের দেহ তুলার ন্যায় লঘু, আবার কখন লৌহাপেক্ষাও গুরু হইত? এমন শীত ও কম্পন হইত যে, যেন বিকারের কম্প। আবার কখন সমস্ত শরীর অগ্নির ন্যায় উত্তাপযুক্ত, চন্দনপঙ্ক লেপিলে তখনই শুকাইয়া যায়। কখন আবার ঘন ঘন শ্বাস বহিতে থাকে, যেন মহাশ্বাস রোগ জন্মিয়াছে। কখন কখন এমন হিক্কা হইত, যে তাহাতে সর্ব্ব অঙ্গ যেন ভাঙ্গিয়া যাইত। কখন সুন্দর গৌরবর্ণ নানারূপ রঙ্গ ধারণ করিত এবং কখন কখন তিনি দুই চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয়া চারি দিকে ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন এবং বন্ধুদিগের প্রতি অযোগ্য ভাষা প্রয়োগ করিতেন। আবার তিনি পূর্ব্বে যাহাকে সম্মান করিয়া প্রভু বলিতেন, এখন 'এ বেটা আমার দাস' বলিয়া তাহার চুলে ধরিতে লাগিলেন; পূর্ব্বে যাহার চরণবন্দনা করিতেন, এখন তাহার বুকে পা দিয়া নাচেন। কখন নিত্যানন্দের অঙ্কে পৃষ্ঠ দিয়া বসিয়া পা তুলিয়া আর সকলের দিকে তাকাইয়া হাসেন; ভাবাবেশে একবার যাহার চরণে ধরেন, আবার তাহার মাথায় উঠেন; এই যাহার গলা ধরিয়া কাঁদেন, তখনই তাহার স্কন্ধে চড়িয়া বসেন; আবার কখন বা চক্রাকারে ঘুরিয়া নাচেন, নিজ শিরে যাইয়া চরণ স্পর্শ করে।

বহির্মুখ লোকে ইহাকে পাগলামি ভিন্ন আর কি বলিবে? কিন্তু এমন পাগল হওয়া তো সহজ নয়।

এই সময়ে এক দিন এক শৈব ভিক্ষুক বিশ্বম্ভরের বাটীতে ভিক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিল। ভিক্ষুকের সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখা, শিরে জটাজূট ও হাতে শিঙ্গা ডমরু; উহা বাজাইয়া সে শিবসঙ্গীত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। শঙ্করগুণানুকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বিশ্বম্ভরের ভাবময় হৃদয় ভাবে উথলিয়া উঠিল; শঙ্করভাবাবেশে হুঙ্কার করিয়া 'আমি শিব' বলিতে বলিতে গৌরাঙ্গ এক লম্ফে আগন্তুকের স্কন্ধে উঠিলেন। সে ব্যক্তিও তাহাকে স্কন্ধে লইয়া অঙ্গনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভক্তগণ নাকি সেই সময়ে গৌরকে সত্য সত্য জটাজূটধারী শম্ভুমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে শচীনন্দন বাহ্য জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার স্কন্ধ হইতে নামিলেন এবং নিজ হাতে ভিক্ষুককে যথেষ্ট ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিলেন।

পাষণ্ডীদিগের আচরণ।

নিশাকীর্ত্তনের প্রগাঢ়তা, প্রমত্ততা ও ভাবুকতায় নবদ্বীপ টলমল করিতে লাগিল। গভীর রজনী যোগে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের বহিঃপ্রকোষ্ঠে খুব মত্ততার সহিত কীর্ত্তন হইতেছে; বিশ্বাসী ভক্তগণের ব্যাকুলতা, প্রেমানুরাগ, ও উল্লাসময় কীর্ত্তনের ধ্বনিতে লোকসকল আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে পণ্ডিতের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইতেছে; কীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বে যাহারা আসিয়াছে, তাহারা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল দেখিয়া শুনিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে; কিন্তু কীর্ত্তনের একটু জমাট বাঁধিয়া গেলেই গৌরের আদেশে কপাট রুদ্ধ হইয়াছিল, আর কেহ প্রবেশ করিতে পাইল না। লোকগুলি অগত্যা বাহিরে থাকিয়া কপাট ঠেলিতেছে; কলরব করিতেছে; কত নিন্দা কুৎসা করিতেছে ও কেহ কেহ নানা প্রকারে উৎপাত করিতেছে। এই সকল লোকের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক আছে। কতক লোক বাস্তবিক সরল প্রাণে তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্য আসিয়াছে; কতকগুলি আপনাদের কৌতূহল-স্পৃহা চরিতার্থের জন্য, আর কতকগুলি সংকীর্ত্তনবিদ্বেষী লোক কেবল ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও উৎপাত করিবার উদ্দেশে আসিয়াছে। নমুনা স্বরূপ তাহাদের দুই চারিটী উক্তি উদ্ধার করা যাইতেছে। একজন বলিল 'আরে ভাই! আমি শুনিয়াছি কীর্ত্তনচ্ছলে মদ খাইয়া এরা গোলমাল করে'। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "আর শুননি? ইহারা পঞ্চ কন্যা

আনিয়া তক্ষ্য, পেয়,গন্ধ, মাল্য লইয়া তাহাদের সঙ্গে বিবিধ রূপ রঙ্গ করে।

তৃতীয় জন বলিল 'জাত নাশারা সকল জাতি একত্র হইয়া বেশ্যা সহ মদ্য ও অখাদ্য খাইয়া জাতিধর্ম্ম নাশ করিতেছে'।

পাষণ্ডীদিগের উক্তিতে নিমাইয়ের উপর তত কোপ দেখা যায় না, যত তাঁহার সঙ্গীদিগের উপর। তাহারা মনে করিত, নিমাই পণ্ডিত খুব ভাল লোক ছিল, কেবল কুসঙ্গে পড়িয়া মন্দ হইয়া গেল। একে একটু বায়ুরোগ-গ্রস্ত, তাহাতে আবার অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়াছে; সুতরাং পাঁচজন চঙ্গের দলে পড়িয়া মন্দ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? পাষণ্ডীগণ! তোমরা লোক চিনিতে পার নাই। যত নষ্টের ওস্তাদ ঐ নিমাই। সাবধান ও বড় সহজ পাগল নয়। ওই তো দলশুদ্ধ লোককে পাগল করিয়া তুলিল।

ক্রমে ক্রমে সিদ্ধান্ত হইল যে, নিমাই পণ্ডিত বিদ্যেসাধ্যি ভুলে গিয়ে গণ্ড মুর্খের দলে পড়ে এখন একজন মহা গণ্ডমূর্খ হইয়াছে। আগন্তুকদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহারা সাব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, সংকীর্ত্তন করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ; দেশমধ্যে যত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হইতেছে, সে সব উহারই জন্য। একজন বলিয়া উঠিল 'কালি দিয়ানে গিয়া সিকদার আনিয়া উহাদের কাঁকালি ধরিয়া জনে জনে বাঁধিয়া দিব'।

কোন কোন পাষণ্ডী সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এগুলা নাচিতেছে গাইতেছে, ইহাদের মুখদর্শনে পাপ হয়। শরীরমধ্যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, আত্মসাক্ষাৎকার লাভই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; তাহা না করিয়া বল দেখি চীৎকার করিলে কি হইবে?" দ্বিতীয় পাষণ্ডী উত্তর করিল, 'তাইতো! নাচিলে গাইলে যদি ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে এই নবদ্বীপে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সকল রহিয়াছেন, তাঁহারা কি আর তাহা করিতেন না?'

আর একজন বলিল, আরে ভাই! দেখিতেছো না, নিমাইকে লইয়া এগুলা পাগল হইয়াছে; পাগলের কথায় আমাদের কাজ কি?

চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, আরে! আমরা কি আর সংকীর্ত্তন শুনিতে আসি! পাগলগুলা কি করে; তাই দেখিতে ও ঠাট্টা করিতে আসি।

উহাদের মধ্যে দুই একজন সুবুদ্ধি ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন; তাঁহারা বলিলেন, "কেন ভাই! পরনিন্দা করিতেছ? যাঁহারা সংকীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহারা ভগবানের নাম করিতেছেন; তাঁহারা পরম সুকৃতী,

তাঁহাদের নিন্দা করিলে পাপ হইবে। আমাদের কপালে নাই, তাই এমন মধুর কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারিলাম না"।

"পাষণ্ডীদিগের মধ্যে যাহারা বড়ই উদ্ধত প্রকৃতির লোক ও কীর্ত্তন বিদ্বেষী; তাহারা শেষোক্তদিগের কথা শুনিয়া "ইহারাও তবে ঐ দলের লোক" এই বলিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।

বিদ্বেষীদিগের বিদ্বেষের ও ক্রোধের প্রধানপাত্র শ্রীবাসপণ্ডিত। তাঁহাকে তাহারা থানিয়াতি অর্থাৎ আড্ডাধারী শ্রীবাসা, বাম্না, ঢাঙ্গাইত, প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করিত। তাহাদিগের মতে তাঁহা হইতেই নবদ্বীপের কুশল নষ্ট হইল ও সকল লোক খারাপ হইয়া গেল; সুতরাং স্বতঃ পরতঃ তাঁহার নিন্দা কুৎসা ও অনিষ্ট করিতে ছাড়িত না।

পাষণ্ডীদিগের উৎপাতের একটী আখ্যায়িকা আছে। গোপাল চক্রবর্ত্তী ওরফে চাঁপাল গোপাল নামে তখন একজন ষণ্ডা গোছের বামুন নবদ্বীপে বাস করিত। গভীরনিশায় ভক্তদল শ্রীবাসমন্দিরে আবিষ্টচিত্তে সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত আছেন; এমন সময়ে সে ব্যক্তি অন্য অন্য পাষণ্ডীদিগের পরামর্শানুসারে লুক্কায়িত ভাবে অঙ্গনে যাইয়া অঙ্গনের মধ্যস্থান লেপিয়া ভবানী পূজার দ্রব্য সামগ্রী রাখিয়া দিল; কদলী পত্রের উপর জবাফুল, সিন্দূর রক্তচন্দন ও মদ্যভাণ্ড সাজাইয়া রাখিল। উদ্দেশ্য এই, লোকে জানুক যে, সংকীর্ত্তনের ভাণ করিয়া ইহারা রাত্রি যোগে পঞ্চকন্যা আনিয়া মদ্যপান করিয়া কি কুৎসিৎ কাণ্ড করিয়া থাকে? পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, ভক্তগণের উপর পাষণ্ডীগণ যে যে দোষারোপ করিতেছিল, তাহার মধ্যে রাত্রিতে বেশ্যা লইয়া মদ্যপান করা একটী প্রধান। তাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই কুৎসিত কাণ্ডের অভিনয় করা হইল।

প্রাতঃকালে শ্রীবাস পণ্ডিত বহিঃপ্রাঙ্গণে ঐ সব বস্তু দেখিয়া গ্রামের বিজ্ঞ ও সুবোধ লোকদিগকে ডাকিয়া দেখাইলেন ও পরিহাস করিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন 'মহাশয়গণ! দেখুন্ রজনীযোগে আমি কি সাধনা করিয়া থাকি?' উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী শ্রীবাসকে উত্তমরূপে জানিতেন; সুতরাং পাষণ্ডীদিগের কার্য্য বুঝিতে তাঁহাদের বাকী থাকিল না। দুই চারি দিন মধ্যেই চাঁপাল গোপালকে ঐ কার্য্যের নায়ক বলিয়া সকলে জানিতে পারিলেন। কথিত আছে যে, অল্প দিন মধ্যে চাঁপাল গোপাল নিজ কার্য্যের সমুচিত দণ্ড স্বরূপ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইল।

এক সরল জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণ আর এক রজনীতে কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়া বহির্দ্বার বন্ধ থাকায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। পর দিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানে যাইয়া সে বিশ্বম্ভরের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিতে লাগিল, "দেখ নিমাই! আমি কাল রাত্রিতে তোমাদের কীর্ত্তন শুনিতে গিয়া দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি; ইহাতে আমার বড়ই মনঃকষ্ট হইয়াছে।" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল যে, "আমাকে যেমন তুমি মনঃপীড়া দিয়াছ; আমি শাপ দিতেছি, তুমিও তেমনি সংসারে সুখী হইতে পারিবে না।"

শাপ শুনিয়া বিশ্বম্ভরের উল্লাসের সীমা নাই। তিনি মনে মনে করিতে লাগিলেন 'আমি ঐরূপ শাপই চাই;' ও বাহিরে একটু হাসিয়া ব্রাহ্মণকে শান্তনা করিয়া ভক্তদলের নিকট আসিয়া অভিশাপ বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রকাশ।

পরমাত্মা অপরিসীম চিৎস্বরূপ; জীবাত্মা অতি ক্ষুদ্রাংশ চিৎকণ। অপরিমিত বৃহৎ চিদ্বস্তুর সহিত জীবরূপী ক্ষুদ্র চিৎকণ নিত্যযোগে যুক্ত; কিছুতেই উভয়ের সম্বন্ধ বিযুক্ত করিতে পারা যায় না। একটী অনন্ত, মহান্, অপরিবর্ত্তনীয়, গভীর চিদ্ঘন; অপরটী ক্ষুদ্র, বদ্ধ, যৎসামান্য চিদংশ। একটী আশ্রয়, অপরটী আশ্রিত। পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রকৃতিগত যথার্থ সত্তা এক হইলেও জীবের ঔপাধিক ব্যবহার ক্রিয়ার এত বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে আর পরমাত্মার সহিত এক প্রকৃতি বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। আবার জীবাত্মার প্রকৃতি পরমাত্মার প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্য ভেদভাব রহিয়াছে, যাহা কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। বৈষ্ণবাচার্য্য পূজ্যপাদ জীবগোস্বামী মহাশয় ইহাকে "অচিন্তনীয় ভেদাভেদ জ্ঞান" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক এই অচিন্তনীয় ভেদাভেদ জ্ঞানেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মূল নিহিত রহিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। ভ্রমর বা মৌমাছি মধুপানের জন্য ব্যাকুল হইয়া পুষ্পান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে; হঠাৎ সুন্দর একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্প দেখিতে পাইয়া তাহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তদুপরি

উপবিষ্ট হইল এবং এদিক ওদিক বেড়াইয়া তাহার পাপড়িগুলি ভেদ করিয়া ভিতরের মধুভাণ্ডারে প্রবিষ্ট হইয়া মধুপানে বিভোর হইয়া পড়িল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্রমরটী স্থির ভাবে মধুপান করিতে পারে নাই; ততক্ষণ সে আপনাকে গোলাপ-স্থিত মধু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ মনে করিতেছিল। কিন্তু যখন সে মধুকোষের মধ্যে যাইয়া নিমগ্ন হইয়া নীরবে মধুপান করিতে লাগিল, তখন তাহার নিকট কি বাহ্য জগৎ? আর কি সেই মধুভাণ্ডার? ইহার কিছুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্বজ্ঞান থাকে না; সে তখন সকলই মধুময় বলিয়া জানিতে থাকে; অথচ আত্মবোধের ও মধুবোধের এক অচিন্তনীয় ভেদজ্ঞানও বুঝিতে পারে। জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। জীব স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে পারিলে এইরূপ দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয়। সাধকের প্রাণের মধ্যে যখন সেই রসস্বরূপের অমৃতরসপানের জন্য সুপ্রবল তৃষ্ণার সঞ্চার হয়; তখন সে ব্যাকুল ভাবে সেই নিত্যসুন্দর পরমকুসুমের অনুসন্ধান করিতে থাকে; এবং যখন সৌভাগ্যক্রমে তাহা লব্ধ হয়; তখন আর জগতে দ্বৈতজ্ঞান বা স্থূলভেদ জ্ঞান থাকে না; সকলই তন্ময় হইয়া যায়, এবং সাধক সেই নিরুপম সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবিয়া গিয়া নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া কেবল 'ত্বংহি' 'ত্বংহি' দেখিতে থাকে। এমন কি আপনি পর্য্যন্তও তখন 'ত্বংহি' হইয়া যায়। হইবারই তো কথা। জীব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা কর, ইহাই জানিতে পারিবে। জীবের মূলে কোন্ শক্তি? কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। তাহা কি? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। পৃথিবীর কুটিলপথের বিভিন্ন দিকে দুইটী নরনারীর আত্মা ছুটিতেছিল; ইচ্ছারূপিণীর ইচ্ছায় তাহাদের পরস্পরে সাক্ষাৎকার হইল। সেই ইচ্ছা আবার উভয়ের হৃদয়ে অনুরাগ রূপে পরিণত হইল। সেই পবিত্র ইচ্ছাই আবার পিতৃতেজে, মাতৃশোণিতে কার্য্য করিয়া ভ্রূণরূপে পরিণত হইল। তাহাই অবলম্বন করিয়া 'আমির' উৎপত্তি হইল। এই "আমি" তেই আবার কতকগুলি শক্তি সমাবেশ হইল। কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয় "আমির" সাহায্যার্থে প্রদত্ত হইল। আমি যদি আমার স্বরূপজ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাকে কার্য্য করিতে দিতে পারিতাম, অর্থাৎ আমার শক্তিপরিচালনের ক্ষমতা পাইবার পূর্ব্বে সেই মহতী ইচ্ছা যেরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, সেইরূপে করিতে দিতে পারিতাম, আমার কর্তৃত্ববোধ বা অহঙ্কার দ্বারা বাধা না জন্মাইতাম, তাহা হইলে আমার স্বরূপবোধের অভাব হইয়া বিড়ম্বনা

হইত না; এবং দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত ভাব দেখা আমার পক্ষে কঠিন হইত না। কিন্তু আমি কি করিয়াছি? আমার কতকগুলি পার্থিব সুবিধার জন্য নিজের অহঙ্কারকে পরিচালনা করিয়া একটী কল্পিত মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি; নিজের সুখদুঃখ লইয়া অজ্ঞানভাবে সেই জগতে বাস করিতেছি। কাজেই আমার স্বরূপ বুঝিবার উপায় নাই। 'আমি' তো আর সেই আমার মূলাধারা কুলকুণ্ডলিনীর জগতে বাস করি না; আমার কল্পিত জগৎই আমার সর্ব্বস্ব। শাস্ত্রকারেরা এই কল্পিত মিথ্যা জগৎকেই, মায়া, অবিদ্যা বা সংসার নামে অভিহিত করিয়াছেন। কথাটী সুস্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য আর একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। গুটীপোকা আপন মুখ-বিনির্গত লালা দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে আপনিই স্বড়বৎ আবদ্ধ হইয়া পড়ে; দৈবশক্তিতে আবার তাহা কাটিয়া সুন্দর প্রজাপতির আকার ধারণ পূর্ব্বক প্রমুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে থাকে। জীবও সেইরূপ বাসনাপরিচালিত হইয়া স্বকল্পিত সংসার পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া আপন স্বরূপভাব বিস্মৃত হইয়া যায়। কিন্তু যখন ভগবৎকৃপায় সৎসঙ্গ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ঘটনা হয়, তখনই সে ঐ পিঞ্জর কাটিয়া আপন স্বরূপাবস্থা লাভ করতঃ প্রমুক্ত চিদাকাশে উড়িয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়। এই স্বরূপা-বস্থা লাভ হইলে সকলই ব্রহ্মময় দর্শন হয় এবং দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত বা অভিন্নতা উপলব্ধি হয়। সাধকের সাধনার গভীরতা ও ঘনীভূততার পরিমাণ অনুসারে এই ভাব অল্পকাল, বহুকাল বা চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। শুনিতে পাই, শুকাদির এই ভাব জীবনব্যাপী ছিল; ঈশা, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণে তটস্থ ভাবে থাকিত, অন্যান্য সাধকে অল্পকাল মাত্র থাকিয়া অন্তর্হিত হয় এবং অস্মদাদিতে ইহার উদ্রেকই হয় না। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের 'মামেব শরণং ব্রজ' প্রভৃতি উক্তি; বাইবেলে 'I and my father are one' এবং চরিতামৃতে 'আমি সেই' 'আমি সেই' প্রভৃতি কথা এই একই ভাবসম্ভূত।

গৌরের মহাপ্রকাশ বুঝিবার উদ্দেশে আমরা এত কথা বলিলাম। এই তত্ত্ব না বুঝাতেই ধর্ম্মজগতে অবতারবাদ, মধ্যবর্ত্তিতা, মহাপুরুষবাদ প্রভৃতি ধর্ম্মের বিরোধীভাব সকল প্রশ্রয় পাইয়াছে এবং পাইতেছে। গৌরের মহাপ্রকাশ হইতেই তদীয় ভক্তগণ তাঁহার পূর্ণত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 'মহাপ্রকাশ' অর্থে যে দিন গৌরচন্দ্র মহাভাবের বিভোর

হইয়া জীবাত্মার স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাকে 'সাত-প্রহরিয়া' ভাবও বলে; অর্থাৎ ঐ দিন তিনি বেলা এক প্রহরের সময় হইতে সমস্ত দিন ও সমস্ত রজনী ভগবদ্ভাবে নিমগ্ন ছিলেন এবং ঐ অবস্থায় আপনাকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন ভাবিয়া নানা অবতারভাব প্রদর্শন করতঃ ভক্তমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

মহাপ্রকাশের কথা বলিবার পূর্ব্বে আরও একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। ঈশ্বরভক্ত মহাপুরুষদিগের জীবনে এই একটী চমৎকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও সময়ে সময়ে মহাভাবে বিভোর হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন বোধ করিয়া ভগবদুক্তিতে কত ভগবত্তত্ত্ব বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু পাছে তদীয় শিষ্যগণের বা অপরের তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মে; সেজন্য বহু সময়ে তাঁহারা বাক্যে, উপদেশে, ব্যবহারে ও জীবনে আপনাদের মানবভাব দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। অন্য মহাপুরুষদিগের কথা এখানে বলিব না। গৌরের সম্বন্ধে এরূপ দোষারোপ করিবার উপায় নাই। এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না যে, তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই; বা এমন সকল কথা বলিয়াছেন, যাহা দ্ব্যর্থ বা অস্পষ্টার্থ। আপনার মানবত্ব বিষয়ে তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই প্রবন্ধের স্থানান্তরে সে সকল উক্তির অনেক কথা বলা গিয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রাতঃকালে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবাসের আলয়ে উপবিষ্ট; ভক্তমণ্ডলী অল্পে অল্পে আসিয়া উপনীত হইল। গৌরের ইঙ্গিতে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অন্য দিনের ন্যায় গৌরচন্দ্র দাস্য-ভাবে নাচিতে আরম্ভ করিলেন; ক্রমে ভাবপ্রকাশ আরম্ভ হইয়া ক্রমে পূর্ণ মাত্রায় ঐশ্বর্য্যময় মহাভাবে পরিণত হইল। অন্য দিন নাচিতে নাচিতে ঈশ্বরভাবে বিভোর হইয়া, তিনি বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিতেন এবং ক্ষণকাল পরে ভাব অপগত হইলে যেন না জানিয়া বসিয়াছিলেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া অপ্রতিভ হইতেন। আজ আর ক্ষণকালের কথা নহে, সাত প্রহরের জন্য গৌরহরি নরহরি ভাবে মগ্ন হইয়া বিষ্ণু খট্টা অধিকার করিয়া বসিলেন। পাঠক মহাশয় আকাশের চাঁদে গ্রহণ লাগা দেখিয়াছেন; প্রথম রাহুস্পর্শ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত গ্রহণের স্থিতি এক প্রহর দশ দণ্ডের অধিক প্রায়ই দেখা যায় না; কিন্তু আজ গৌরচন্দ্রের

হৃদয়াকাশে যে গ্রহণ লাগিল, তাহার স্থিতি সাত প্রহর। আকাশের চাঁদের গ্রহণে রাহুশক্তি চন্দ্রস্পর্শ করে; এখানে হরিশক্তি গৌরচন্দ্রকে গ্রাস করিল। খাটের উপরে বসিয়া গৌরের আদেশ হইল 'আমার অভিষেক গীত গাও।' ভক্তগণ অমনি অভিষেক সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন, আর বিশ্বম্ভর মাথা ঢুলাইতে লাগিলেন। ভক্তমণ্ডলী মনে করিলেন যে, গৌরের জলাভিষিক্ত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। তখন একশত আট কলস গঙ্গাজল আনাইয়া তাহাতে চন্দন, কর্পূর ও চতুঃসোম সংপৃক্ত করিয়া বৈদিক স্নানের পুরুষসূক্ত উচ্চারণ করিতে করিতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ তদীয় মস্তকোপরি ঢালিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের যে সকল দাস দাসীগণ গঙ্গার ঘাট হইতে জল বহিয়া আনিতেছিল, তাহাদের মধ্যে দুঃখী নামে একটী স্ত্রীলোক ছিল। সুরসিক গৌরচন্দ্র তাহার ভক্তিভাবে জল আনা দেখিয়া তাহার নাম বদলাইয়া "সুখী" নাম রাখিলেন।

স্নানান্তে ভক্তদল অঙ্গ সংস্কার ও গৌরদেহে চন্দন মাল্য পরাইয়া ও পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া বিষ্ণুখট্টা সজ্জিত করতঃ তদুপরি উপবেশন করাইলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার শিরোপরি ছত্র ধরিলেন, কেহ চামর ঢুলাইতে লাগিল, এবং আর সকলে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল গৌরের চরণতলে রাশীকৃত পুষ্প, মাল্য, ধূপ, দীপ, চন্দন, কুঙ্কুম, আবির প্রভৃতি স্তূপাকারে সজ্জীকৃত হইয়াছে, চারিদিকে স্তবপাঠ হইতেছে ও শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতির বাদ্যধ্বনিতে অঙ্গন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। একে মনসা, তাতে ধুনার গন্ধ; আর কি রক্ষা আছে? একে ভক্তিমুগ্ধ ভক্তদল, তাতে আবার সে দিন গৌরের পক্ষ হইতে বাধা পড়িতেছে না। পড়িবেই বা কেমন করে? যে বাধা দিবে, সে তো আর তাহাতে নাই। কিন্তু ভক্তদল! তোমরা ইহার দ্বারা কি করিলে কিছু বুঝিতে পারিলে না; অবশ্য তোমাদের যাহা বিশ্বাস মনের আবেগে তাহা করিয়াছ, ইহাতে বাহিরের লোকের কথা কহিবার পথ নাই। কিন্তু পৃথিবী শুদ্ধ লোক তো আর ভিতরের কথা বুঝিবে না।

ভক্তগণ এইরূপ মহাধূমধামের সহিত গৌরাঙ্গপূজা করিতেছেন; কেহ ষোড়শোপচারে, কেহ পঞ্চোপচারে, কেহ কেহ নানা উপচারে পূজার আয়োজন করিতেছেন; ইহার মধ্যে বিভোর গৌরচন্দ্র দক্ষিণ হস্ত পাতিয়া

লিলেন 'কিছু দাও খাই।' অমনি যাহার যাহা ইচ্ছা হইল, তিনি তাহা তে লাগিলেন। কেহ নারিকেল, রম্ভা প্রভৃতি ফল; কেহ দধি, দুগ্ধ, ীর ও নবনীত; কেহ সন্দেশ, মিঠাই, ও পকান্ন প্রভৃতি, যাহা যাহার ভিলাষ, তাহা খাওয়াইতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, গৌর সে দিনে কি দুই শত লোকের আহারীয় দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন।

ভোজনলীলা সাঙ্গ হইলে আর এক অদ্ভুত লীলা আরম্ভ হইল। সম ত ভক্তমণ্ডলীর এক এক জনকে ডাকিয়া আবিষ্ট গৌরচন্দ্র তাঁহার তীত জীবনের বৃত্তান্ত ও মনের গোপনীয় কথা বলিতে লাগিলেন। থমেই তিনি শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন "কেমন হে পণ্ডিত! তোমার মনে পড়ে? যে দিন দেবানন্দের টোলে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলে; মরসময় ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়া তুমি বিহ্বলচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে মিতে পড়িয়াছিলে; দেবানন্দের অজ্ঞ পড়ুয়াগণ বুঝিতে না পারিয়া উপ স করিয়া ধরাধরি করিয়া তোমাকে বাহির দুয়ারে টানিয়া ফেলিয়া দিলে, বানন্দ দেখিয়া শুনিয়াও কিছু বলিল না। তুমি মনে বড় দুঃখ পাইয়া জালয়ে আসিয়া ভাগবতের পাঠ চাহিতে লাগিলে; তখন আমি বৈকুণ্ঠ তে আসিয়া তোমার চিত্তে আবির্ভূত হইয়া ভাগবতের নিগূঢ় অর্থ াইয়া তোমাকে কাঁদাইয়াছিলাম কি না?" শ্রীবাস এই কথা হৃদয়ে ভব করিয়া কাঁদিয়া বিহ্বল হইয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে গঙ্গাদাসকে ডাকিয়া বলিলেন গঙ্গাদাস! সে রাত্রির কথা মনে নাই? রাজভয়ে ত্রস্ত হইয়া তুমি রিবারে গঙ্গাপার হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলে; কিন্তু ঘাটে কা না দেখিয়া যবনে পরিবার স্পর্শ করিবে ভয়ে তুমি গঙ্গায় ঝাঁপ ত যাইতেছিলে; তখন খেয়ারীরূপে নৌকা আনিয়া তোমাকে কে করিয়াছিল, তা জান?"

অদ্বৈতাদি সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল। এইরূপে গৌরের ভাববিভোর য় ভক্তগণের আনন্দ উৎসাহে, নৃত্য কীর্ত্তনে ও সেবার ব্যস্ততায় সমস্ত অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যাগমে কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া ও ধূপ দীপ জ্বালিয়া ঘটায় গৌরের আরতি হইল।

শ্রীধরের ভক্তিলাভ।

খোলা-বেচা শ্রীধরের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ইনি এক জ… দীন দরিদ্র, তরকারি বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিতেন। নবদ্বীপের প্রা… ভাগে ইঁহার ভগ্ন কুটীর। ইনি একজন মহাশয় ব্যক্তি; দরিদ্র হইয়াও ম… সত্যবাদী। তাঁহার কাছে বিক্রিত দ্রব্যের এক ন্যায্য দর। সমস্ত দিন প… শ্রম করিয়া জীবিকা আহরণ করিতে হয়; সেজন্য দিবাভাগে সাধন ভজনে… সময় পাইতেন না; সারা রজনী জাগিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতেন। পাষণ্ডী… গণ তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া বলিত 'বেটা মহা চাষা; ভাতে পেট ভরে না… তাই সারা রাত্রি ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে চেঁচাইয়া মরে।'

পরমাবিষ্ট গৌরচন্দ্র আদেশ করিলেন, "ভক্তগণ! শীঘ্র যাও, শ্রীধরে… ডাকিয়া আন। সে আসিয়া আমার আজ্‌কার প্রকাশ দেখুক।

আদেশ শ্রবণমাত্র দুই চারি জন ভক্ত ছুটিয়া শ্রীধরের পর্ণকুটীরে যাইয়া… উপনীত হইল এবং গৌরের মহাপ্রকাশের কথা বলিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে… লইয়া গৌরসন্নিধানে পৌঁছিল। শ্রীধরকে দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্ব… জীবনে শ্রীধরের সঙ্গে যে কৌতুকাদি হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া… বলিলেন "শ্রীধর! বল তো আজ্‌ অষ্টসিদ্ধিকে তোমার দাসী করিয়া দি।" শ্রীধর এই কথা শুনিয়া গৌরের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া… ভূমিতলে পড়িলেন। শ্রীধর বলিয়াছেন যে বিশ্বম্ভর তাঁহাকে কোমল শ্যাম… বংশীমোহন মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন; সম্মুখে লক্ষ্মীঃ যেন তাম্বূল দিতেছে… এবং পঞ্চমুখ, চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি দেবতাগণ স্তুতি করিতেছেন, অনন্ত মস্তকে… ছত্র ধরিয়াছে. সনক নারদশুক প্রভৃতি গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। গৌরচন্দ্র… শ্রীধরের গাত্রে হস্ত দিয়া মূর্চ্ছাপনয়ন করিয়া কহিলেন "শ্রীধর! তুমি… আমার স্তব পাঠ কর।" শ্রীধর কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বল চিত্তে বলিলেন… "প্রভো! আমি মূর্খ, নীচ কুলোদ্ভব, আমি কি স্তব করিব?" এই বলিয়া… শ্রীধর ভক্তিপূর্ণচিত্তে কত কথা বলিয়া ফেলিলেন; তাহাতেই এক অপূর্ব্ব… স্তবমালা রচিত হইয়া গেল। মূর্খের মুখে এই সব অলৌকিক কথা শুনিয়া… ভক্তগণ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

বিশ্বম্ভর কহিলেন"শ্রীধর! বর লও; আজ তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দিতেছি। শ্রীধর উত্তর করিলেন "আর আমাকে বৃথা ভাঁড়াইতে চেষ্টা করিতে… কেন? এত দিন ভাড়াইয়াছ বটে; কিন্তু আর পারিবে না।"

বিশ্বম্ভর অপূর্ব্ব ভাবে আবিষ্ট ; শ্রীধরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, "শ্রীধর! তোমাকে অবশ্যই বর লইতে হইবে।"

শ্রীধর উত্তর করিল "যদি নিতান্তই বর লইতে হয়, তো এই বর দাও:—

"যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত,
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ।
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল,
মোর প্রভু হউক তার চরণ যুগল।"

বলিতে বলিতে সরলমতি শ্রীধরের হৃদয় প্রেমাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; তিনি দুই বাহু তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র ঈষৎ ব্যঙ্গপূর্ণ হাসিয়া বলিলেন "শ্রীধর! বলতো এক মহারাজ্যে তোমাকে অধিপতি করিয়া দি।"

শ্রীধর প্রেমাবেগে বলিয়া উঠিলেন, "যাও আমি তোমার ও সব কথা কিছুই শুনিতে চাই না। আমার এই ইচ্ছা যে চিরজীবন তব গুণ গাইয়া বেড়াই।"

তখন গৌরচন্দ্র স্থিরগম্ভীর স্বরে সর্ব্ব সমক্ষে বলিলেন ; "শ্রীধর! ধন্য তোমার দৃঢ় বিশ্বাস ; কিছুতেই তোমার হৃদয় টলিল না। তুমিই ভক্তির উপযুক্ত অধিকারী ; আজ তোমাকে আমি বেদের গোপ্য ভক্তিযোগ দান করিলাম।"

এই কথা শুনিয়া ভক্তমণ্ডলী জয় জয় রবে গগন পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। শ্রীধরের ভক্তিলাভ সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস মহাশয় এইরূপে উপসংহার করিয়াছেন:—ধন জন পাণ্ডিত্য হীন চৈতন্যের মূর্খ ভৃত্যগণকে কে চিনিতে পারে? সে ধন মান যশে কি হইবে, যাহাতে অহঙ্কার বাড়ায়? কলা মূলাবেচা শ্রীধর যাহা পাইল, কোটিকল্পে কোটীশ্বরেও তাহা পাইবে না।

মুরারি গুপ্তের প্রতি কৃপা।

বিশ্বম্ভর মহাবিভোর অবস্থায় মাথা দুলাইতেছেন, আর গদাধর পণ্ডিতের প্রদত্ত তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন। সম্মুখে অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিয়া 'নাড়া' 'নাড়া' বলিয়া ডাকিয়া বলিলেন "কিছু বর চাহ?" আচার্য্য বলিলেন "না ; যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাইয়াছি।" অদ্বৈতের সঙ্গে কথা

কহিতে কহিতে নাটকাভিনয়ের পটপরিবর্ত্তনের ন্যায় গৌরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রামচন্দ্রাবেশে মুরারি গুপ্তকে বলিলেন "গুপ্ত! একবার চাহিয়া দেখ দেখি?" মুরারি গৌরের দিকে তাকাইয়া দূর্ব্বাদল শ্যাম রামরূপ, বামদিকে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ ও চারিদিকে বানরেন্দ্রগণ যেন স্তুতি করিতেছে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বম্ভর দ্বিগুণ উৎসাহে বলিতে লাগিলেনঃ—

"উঠ! উঠ! মুরারি আমার তুমি প্রাণ;
আমি সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি হনুমান।"

মুরারি গুপ্ত চেতনা প্রাপ্ত হইলে গৌরচন্দ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর সম্মুখে তাঁহার নাম ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন "গুপ্তেতে হৃদয়ে মুরারি বাস করেন; এই জন্য উঁহার নাম মুরারি গুপ্ত।" আর গুপ্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বৈদ্য! বর লও।"

মুরারি বলিল 'প্রভু! এই বর দাও যেন চিরদিন তোমার পার্ষদ হইয়া থাকিতে পাই।'

গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তথাস্তু।

হরিদাসের দর্শন।

এইবার হরিদাসের পালা। হরিদাস সকলের পশ্চাদ্ভাগে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন; বিশ্বম্ভর তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হরিদাস! তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা বড়, তোমার যে জাতি আমারও সেই জাতি। যখন পাষণ্ড যবনগণ তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেছিল; আমার প্রাণে তাহা শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল; আমি চক্রহস্তে বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া তোমাকে রক্ষা করিতে ও তাহাদিগকে দণ্ড দিতে কৃতসংকল্প হইলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম তাহারা তোমাকে মারিতেছে; অথচ তুমি তাহাদিগের কুশলকামনা করিয়া ভালবাসিতেছো, তখন আর তাহাদিগকে মারিতে পারিলাম না; কিন্তু তোমার পৃষ্ঠে যে প্রহার হইতেছিল, নিজ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া লইলাম। আমার প্রকাশের কিছু বিলম্ব থাকিলেও তোমার এই ব্যাপারে তাহা শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া গেল। ভক্ত নির্যাতন সহ্য না করিলে আমার প্রকাশ হয়, না; সুতরাং পাষণ্ডী নিস্তারের উপায়ও উদ্ভাবিত হয় না। হরিদাস! আমার নাড়াই তোমাকে যথার্থ চিনিয়াছে'।

বিশ্বম্ভরের ঈদৃশ করুণ বচন শ্রবণ করিয়া হরিদাস প্রেমে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে খেদ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাপ বিশ্বম্ভর! তুমি জগতের নাথ; আমি নীচকুলোদ্ভব অতি নীচ ও মহাপাতকী; আমাকে উদ্ধার করার ভার তোমার উপরেই আছে। তুমি বিপদ কালের বন্ধু! তোমার স্মরণে কি না হয়? পাপাসক্ত দুর্য্যোধন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে চাহিলে বিপন্না কুলকামিনী ব্যাকুল চিত্তে তোমাকে স্মরণ করিলেন; আর অনন্তরূপে তুমি বস্ত্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলে। দুরন্ত হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিপদসাগরে নিক্ষেপ করিলেও ভক্ত তোমার একমাত্র স্মরণপ্রভাবে হাসিতে হাসিতে নিষ্কৃতি পাইলেন। স্মরণ প্রভাবে অজামিল কি না পাইয়াছিল? আমি এমন দুর্লভ স্মরণে বিমুখ। তোমার প্রকাশ দেখার আমার অধিকার নাই।'

বিশ্বম্ভর।—তোমার যাহাতে অধিকার নাই; তাহাতে আর কাহারও অধিকার হইতে পারে না। হরিদাস! মনে যে অভিলাষ থাকে, প্রার্থনা কর, পূর্ণ হইবে।

হরিদাস।—আমি পাপাসক্ত; আমার আর কোন বাঞ্ছা নাই, কেবল এই কর, যেন আমি ভক্তের উচ্ছিষ্ট খাইয়া ও দাসানুদাস হইয়া থাকিতে পারি।

বিশ্বম্ভর।—হরিদাস! বিনয় ছাড়; তোমার সঙ্গে যে মুহূর্ত্ত কাল বাস করিবে, সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ হইবে। তোমার শরীরে আমার নিত্য স্থিতি; এবং তোমার মত ভক্ত লইয়াই আমার ঠাকুরালি। আমি আজ এই মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, বৈকুণ্ঠের ভক্তিভাণ্ডার তোমারই।

অদ্বৈতের প্রতি।

বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের প্রতি পুনর্ব্বার কটাক্ষ করিয়া তাঁহার মনের কথা বলিতে লাগিলেন "আচার্য্য গোঁসাই! পূর্ব্বের কথা কি কিছু মনে হইতেছে? জগতে ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিবার জন্য যখন তুমি গীতা ও ভাগবত অধ্যয়ন করিতে; কোন শ্লোকের ভক্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া যখন ব্যাকুলচিত্তে চিন্তায় নিযুক্ত হইতে ও যতক্ষণ সদর্থ ও সৎপাঠ আবি-

কৃত না হইত, ততক্ষণ অনাহারে উপবাসী থাকিতে; তখন কে তোমার প্রাণে আবির্ভূত হইয়া তোমাকে সত্য পাঠ ও তত্ত্বের অর্থ বুঝাইয়া দিত; তুমি তখন মনে করিতে বুঝি স্বপ্নে সিদ্ধিলাভ হইল।" এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ যত শ্লোকে পূর্ব্বে আচার্য্যের দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছিল, সে গুলি নাকি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন ও পুনরায় বলিলেন "আচার্য্য! সকল পাঠই পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি; কিন্তু একটী বলি নাই; আজ তাহা বলিব; গীতার ১৩ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকের যথার্থ পাঠ এইঃ—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।"

"তাঁহার (ব্রহ্মের) হস্ত ও চরণ সর্ব্বত্র; তাঁহার চক্ষুঃ ও মুখ সর্ব্বত্র; এবং তাঁহার কর্ণও সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; তিনি সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।"

অদ্বৈতের চিরদিনের সন্দেহস্থল মীমাংসা হইল; মনের মধ্যে এক স্বর্গের আলোক জ্বলিয়া উঠিল। তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেনঃ—'আমি আর কি বলিব? আমার মহত্ত্ব এই যে তুমি আমার প্রভু।'

ইহার পর বিশ্বম্ভর ভক্তদলকে সাধারণ ভাবে বলিলেন যে "যাহার যে অভিলাষ থাকে বর যাচ্ঞা কর; আমি পূর্ণ করিব।" তখন যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহা বলিতে লাগিলেন ও বিশ্বম্ভরও হাসিতে হাসিতে তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

মুকুন্দ দত্তের দণ্ড।

যে ঘরে এই সব রঙ্গ অভিনীত হইতেছিল, তাহার প্রকোষ্ঠান্তরে সুগায়ক মুকুন্দ দত্ত অধোবদনে আসীন। যাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বরে ভক্তদল মুগ্ধ হইতেন; যিনি কীর্ত্তন করিলে গৌরচন্দ্রের পুলক, অশ্রু, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি মহাভাবের তরঙ্গ সকল উঠিয়া পড়িত; আজ মহাপ্রকাশের মহানন্দের দিনে সেই প্রিয় মুকুন্দ কেন নির্ব্বাসিতের ন্যায় বিষণ্ণচিত্তে উপবিষ্ট! এ কথার রহস্য গৌরচন্দ্র ভিন্ন কেহ জানে না। মুকুন্দ জানিতেন; কিন্তু বিনানুমতিতে তাঁহার প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই। বিশ্বম্ভর একে একে সকলকেই ডাকিলেন অথচ মুকুন্দের নাম পর্য্যন্ত করিলেন না দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত সাহসে ভর করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—

'প্রভু! আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই; এ আনন্দের দিনে সকলেই আনন্দ করিতেছে; মুকুন্দ কেন বিষন্নহৃদয়ে প্রকোষ্ঠান্তরে বসিয়া আছে? মুকুন্দ তোমার প্রিয়, আমাদের সকলের প্রাণ; তাহার গানে কে না মোহিত হয়? তার যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, দণ্ড দিয়া সংশোধন করিয়া লও; নিজ ভক্তকে পরিত্যাগ করা কি উচিত?' বিশ্বম্ভর ক্রোধভরে উত্তর করিলেন 'ও বেটার জন্য তোমরা কেহ কিছু বলিও না; উহাকে আমি সম্মুখে আসিতে দিব না। খড় লওয়া, জাঠি লওয়ার কথা কি পূর্ব্বে শুন নাই? এ বেটার প্রকৃতি সেইরূপ। ও একবার দন্তে তৃণ লয়, আবার জাঠি মারে। আমি ও খড় জেঠিয়াটাকে দেখিতে চাই না।'

শ্রীবাস পুনর্ব্বার কহিলেন "তোমার প্রহেলিকা কথা বুঝিতে পারিলাম না; আমরা তো মুকুন্দের কোন দোষ দেখিতেছি না।"

বিশ্বম্ভর। "তোমরা কি বুঝিবে? ও বেটা যখন যে মজলিসে যায়, তখন সেই মত কথা বলিয়া গোড়ে গোড় দেয়। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে থাকিয়া যখন সে যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করে, তখন ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া দন্তে তৃণ করিয়া ভক্তিভাবে নাচিতে থাকে; আবার ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সভায় অন্যপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া আমার হৃদয়ে জাঠি মারে। ও বেটা ভক্তিস্থানে ঘোর অপরাধী; সে জন্য তাহার দর্শন বাধ পড়িয়াছে।"

মুকুন্দ বাহির হইতে এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া চিরকালের জন্য গৌরদর্শন হইতে বঞ্চিত হইতে হইল ভাবিয়া অঝর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন; এবং শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "পণ্ডিত! সত্য সত্যই আমি গুরুর অনুরোধে বাশিষ্ঠ ব্যাখা করিতে গিয়া ভক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়াছি; ইহাতে সত্য সত্যই আমার ভক্তি স্থানে মহা অপরাধ হইয়াছে। আমার এই অপরাধী প্রাণ রাখা যুক্তিযুক্ত নহে; অবশ্যই আমি এ শরীর ছাড়িব।" মুকুন্দের রোদনে ভক্তমণ্ডলী কাঁদিতে লাগিল দেখিয়া গৌরপ্রভু বলিয়া উঠিলেন "আর কোটি জন্ম পরে মুকুন্দ আমার দর্শন পাইবে।"

এই কথা শুনিবা মাত্র বিশ্বাসী মুকুন্দ 'পাইব' 'পাইব' বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুকুন্দের বিশ্বাসভাব দর্শন করিয়া গৌরচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সুতরাং তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি করিলেন। তথাচ মুকুন্দের গৌরসম্মুখে আসিবার সাহস হইল না। ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া আনিলে মুকুন্দ নির্ব্বেদ সহ-

ক্কারে বিশ্বম্ভরচরণে লুটাইয়া পড়িলেন। গৌরাঙ্গ কহিলেন "মুকুন্দ! আর কাজ নাই, উঠ। তোমার দৃঢ়বিশ্বাস তিলার্দ্ধ মধ্যে আমার সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ করিয়াছে; আমার পরাজয়, তোমারই জয়। সঙ্গদোষে তোমার যে পাপ হইয়াছিল, আজ তোমার সুদৃঢ় বিশ্বাসে তাহা দূরীভূত হইল। তুমি আমার পরিহাস পাত্র, পরিহাসচ্ছলে যাহা বলিলাম, তাহাতে দুঃখ করিও না। আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, তোমার কণ্ঠস্বরে ও রসনায় আমি নিরন্তর বাস করিতেছি"।

গৌরের এই সব প্রেমের কথা শুনিয়া মুকুন্দের নির্ব্বেদ দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল; তখন তিনি ভক্তির মাহাত্ম্য ও আপনার দোষ কীর্ত্তন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর কিছু লজ্জাবনত মুখে নানা প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

নারায়ণীর সপ্রাদভোজন।

শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রেমের হাট বসিয়াছে; এই আনন্দবাজারে যে যাইতেছে, সে আর রিক্ত হস্তে ফিরিতেছে না। প্রেমাম্রে, আনন্দান্নে তাহার আত্মার উদর পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। শ্রীবাসের দাসদাসী যত ছিল, সকলেই এ আনন্দের অংশীদার হইল। কেবল শুষ্ক জ্ঞানাভিমানী ভট্টাচার্য্যগণ ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না। না পারিবারই তো কথা; অহঙ্কার ও পাণ্ডিত্যাভিমানের নিকট ভক্তিদেবী অপ্রকট থাকেন। যাহা হউক, রজনী প্রভাতে গৌরের ভাবতরঙ্গ থামিয়া আসিল; পূর্ণিমার জোয়ারে ভাটা আরম্ভ হইল; মহাভাবের আবেগ কমিয়া স্থায়িভাবে পরিণত হইল। তখন আপনার গলদেশস্থিত পুষ্পমালা লইয়া গৌরচন্দ্র ভক্তগণকে একে একে বাঁটিয়া দিলেন এবং নিজ ভোজনের অবশেষ শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা চারি বৎসর বয়স্কা বালিকা নারায়ণীকে খাইতে দিলেন।

বালিকা মহানন্দে প্রসাদ খাইতে লাগিল দেখিয়া ভক্তগণ তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তাহার ভোজন সমাধা হইলে গৌর বলিলেন 'নারায়ণি! একবার কৃষ্ণানন্দে কাঁদ দেখি?' কথিত আছে নারায়ণী 'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া প্রেমে কাঁদিয়া ভক্তগণকে বিস্মিত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই নারায়ণী চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস মহাশয়ের গর্ভধারিণী। এইরূপে সে দিনকার মহালীলা শেষ হইল।

পাঠক মহাশয় এই প্রস্তাবে অনেক অলৌকিক বৃত্তান্ত, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি এবং ভাবুকতার পরিচয় পাইলেন। স্থানে স্থানে যে অলৌকিক কথা বলা হইল, ইহাতে সাধারণের বিশ্বাস জন্মিবে না, এ কথা গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন; এবং তদ্রূপ অবিশ্বাসনিরাকরণ জন্য এই প্রস্তাবের বহুল স্থানে অবিশ্বাসীদিগকে বিধিমত প্রকারে ভর্ৎসনা করিয়াছেন ও নরকের ভয় দেখাইয়াছেন।

"এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত;
অধঃপাত হয় তার জানিহ নিশ্চিত"।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লীলা রহস্য।

একদিন শ্রীবাসমন্দিরে ভক্তবৃন্দের সমক্ষে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দকে ডাকিয়া পরিহাসচ্ছলে কহিলেন, 'নিতাই! তুমি বড় চঞ্চল হয়েছো; আমার ভয় হয় পাছে তুমি কাহার সহিত ঝগড়া কর'।

নিতাই তদ্রূপ পারিহাসব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করিলেন "বিষ্ণু! বিষ্ণু!" আমি মহাগম্ভীর ব্যক্তি, আমার উপর তোমার এরূপ দোষারোপ করা অন্যায়। তুমি কিসে আমার চঞ্চলতা দেখিলে? গৌরচন্দ্র কহিলেন,—'চঞ্চলতা আর কিসে? কেবল আহারের সময় ঘরময় অন্নবৃষ্টি করা।'

নিত্যানন্দ। 'পাগলেই ভাত ছড়ায়; আমি কি পাগল যে ভাত ছড়াবো? তা বুঝেছি এই ছলে আমাকে ঘরে ভাত না দিয়ে তুমি সুখে একাকী খেতে চাও? আচ্ছা খাবে খাও, নিজের অপকীর্ত্তি নিজে বলে আর কেন টলাচ্ছো।'

গৌর। 'ওহে তা নয়; তোমার অপকীর্ত্তি দেখিলে আমার কি না লজ্জা হয়; তাই এত গলা ফাড়া ফাড়ি করি'।

নিত্যানন্দ তখন ভাবান্তর পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন "আচ্ছা! ভাল ভাল; আমার চপলতা দেখিলে তুমি খুব শিক্ষা দিও। ওহে গৌর! তুমি ঠিক বলেছো ভাই! আমি নিশ্চয় বড় চঞ্চল হয়েছি।"

বলিতে বলিতে মহানন্দে নিতাইয়ের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন

দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি পরিধেয় বস্ত্র মস্তকে বাঁধিয়া দিগম্বর হইলেন এবং অঙ্গনমধ্যে যোড় পায়ে লম্ফ দিতে দিতে হাসিতে লাগিলেন।

গদাধর, শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতি এই রঙ্গ দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইলেন। গৌরচন্দ্র কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন:— "নিতাই! সাবধান, এ ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী, বুঝিয়া কাজ কর। এখনই বলিলে যে, আমি কি পাগল? সে কথা কি ভুলে গেলে? এ পাগলের কাজ নয় তো আর কি? এই বলিয়া স্বহস্তে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দ আনন্দসিন্ধুতে মগ্ন হইয়া সে সব কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

বেলা দুই প্রহর। বিশ্বম্ভর নিজ গৃহের নিভৃত প্রকোষ্ঠে দিব্য খট্টায় আসীন। নিকটে পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া বসিয়া এক দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে তাকাইয়া আছেন এবং মাঝে মাঝে স্বামীর করকমলে তাম্বূল দিতেছেন। গৌরচন্দ্র তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে কত ধর্ম্মের কথা, প্রেমের কথা, সংসারের কথা, কত মিষ্ট মিষ্ট কথা শুনাইতেছেন। সরলমতি অবলা স্বামীর মধুমাথা কথা শুনিতে শুনিতে বৈকুণ্ঠের সুখ অনুভব করিতেছেন; মাঝে মাঝে মৃদুমোহন স্বরে দুই একটী কথার উত্তর করিতেছেন; এবং আপনার অতুল রূপরাশি বিকাশ করিয়া ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন। গৌর! এ রূপ কি তোমার মনে ধরে? লোকে যে বলে তুমি তোমার স্নেহময়ী জননী ও প্রেমময়ী পত্নীকে ভালবাস না; বাসিলে তাঁহাদিগকে সংসারের অকূল-সাগরে ভাসাইয়া সন্ন্যাস লইতে না। এ কথা কি সত্য? আমরা সংসারের ক্ষুদ্রচেতা জীব, তাই তোমার প্রেমের গভীরতা বুঝিতে না পারিয়া এরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকি। অথবা প্রণয়িনী বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ তোমার মনে ধরে বইকি? নইলে আজ এমন ক'রে তাঁর সঙ্গে মিষ্ট আলাপ করিয়া সুখানুভব করিবে কেন? বুঝিয়াছি, এই ভালবাসা ভগবৎপ্রেমসিন্ধুর বিন্দু বলিয়া তোমার নিকট এত খাতির।

পুত্র ও পুত্রবধূকে এক সঙ্গে থাকিতে দেখিলে শচীমাতার মনে বড়ই আনন্দ হইত। তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া গৌরচন্দ্র আরো এইরূপ করিতেন। আজ বধূর সঙ্গে গৌর যে ভাবে বসিয়া কথা কহিতেছেন, শচীদেবী তাহা প্রকোষ্ঠান্তর হইতে দেখিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন। "নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া ঘর ছাড়িয়া যাইবেন—" বহুদিন পূর্ব্বে তিনি এই

স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা মধ্যে মধ্যে স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া তাঁহাকে বড়ই যন্ত্রণা দিত। আজও তাঁহার সে স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু আজ তাহা তিনি অমূলক বোধে উড়াইয়া দিলেন। কেন না, যখন বধূর সঙ্গে পুত্রের এত ভালবাসা হইয়াছে, তখন কি আর সন্ন্যাস সম্ভবে? আহা! সরলমতি জননী বুঝিলেন না যে তাঁহার পুত্রের দাম্পত্যপ্রেম মাতৃভক্তির তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। যদি এই প্রগাঢ় মাতৃভক্তিই তাঁহার গৃহে থাকার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দাম্পত্যপ্রেমে কি তাঁহাকে আট্‌কাইতে পারে?

এই সময়ে বাহির প্রাঙ্গণে মনুষ্যের পদশব্দ শুনা যাইতে লাগিল। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া একটু কুণ্ঠিত হইলেন। আর কিছু বলিবার অবসর না হইতেই প্রেমানন্দে বিহ্বল ও বাল্যভাবে চঞ্চল হইয়া নিত্যানন্দ দিগম্বরবেশে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। লজ্জাবনত মুখে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া কোন্ দিকে যাইবেন ঠিক না পাইয়া কপাটের আড়ালে বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; আর গৌরচন্দ্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া এক খণ্ড বস্ত্র লইয়া নিতাইয়ের কটিদেশে পরাইতে গেলেন। অন্য কোন ব্যক্তি হইলে আজ গৌরের নিকট সমুচিত শিক্ষালাভ না করিয়া যাইতে পারিত না। কিন্তু নিত্যানন্দচরিত্র গৌরের নিকট অব্যক্ত ছিল না। তিনি জানিতেন যে, নিতাই হরিপ্রেমে বিভোর, ভেদাভেদজ্ঞানশূন্য ও অমায়িক সরলতায় পরিপূর্ণ। নিতাইয়ের বিশাল হৃদয়ে ভগবৎভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাব স্থান পায় না; তাই আজ এরূপ অসহনীয় ধৃষ্টতা সত্ত্বেও গৌরচন্দ্র তাঁহাকে প্রেমচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। নিতাইয়ের প্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল এবং প্রেমভাবে ও সস্মিত বদনে নিত্যানন্দের সঙ্গে হাস্যকৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নিতাই তখন হরিপ্রেমে পূর্ণ হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য; সুতরাং অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্যের ন্যায় কি বলিতে লাগিলেন, গৌরচন্দ্র তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না।

গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিত্যানন্দ! দিগম্বর হয়ে এসেছো কেন?"

নিতাই কিছু না বলিয়া, হাঁ! হাঁ! এইমাত্র উত্তর করিলেন।

গৌরচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিতাই? কাপড় পরিবে না কি?"

নিতাই। 'আমি যা—বো।'

গৌর ঈষৎ কোপের সহিত বলিলেন ;—'তোমার এ কি ব্যবহার ?'

নিতাই। 'আর খাইতে পারি না।'

গৌর। 'এক কথার অন্তরূপ জবাব দাও কেন ?'

নিতাই। 'দশ বার যাবো' ?

তখন গৌরচন্দ্র পরাস্ত হইয়া কৃত্রিমকোপ প্রকাশ করিয়া বলিলে দেখ নিতাই ! ইহার পর আর আমার দোষ দিতে পারিবে না'।

নিত্যানন্দ তখন একটু সাব্যস্ত হইয়া চমকিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"মা কোথায় ? তিনি তো এখানে নাই।" শচীমাতাকে নিত্যানন্দ জননী সম্বোধন করিতেন। গৌরচন্দ্র তখন বধূকে লক্ষ্য করিয়া একটু মিনতি-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "নিতাই ! যথেষ্ট হয়েছে, এখন কৃপা করে বস্ত্র পরিধান কর।"

নিতাই সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন—"আমি কিছু খাবো।"

গৌরচন্দ্র তখন স্বহস্তে নিতাইকে বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। দূর হইতে শচীমাতা এই রঙ্গ দেখিয়া হাসিতেছিলেন। যে দিন হইতে নিতাই তাঁহাকে জননী সম্বোধন করিতেন, সেই দিন হইতে তিনি তাঁহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। নিতাই ভোজনের অভিলাষ জানাইলে শচীমাতা গৃহ হইতে পাঁচটী সন্দেশ আনিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। নিতাই বাল্যভাবে মগ্ন; সন্দেশ পাইয়া আনন্দের সীমা নাই ; কতক খাইতে লাগিলেন ও কতক চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন। শচী এই ব্যবহার দেখিয়া একটু তিরস্কার করাতে নিতাই বলিলেন "আরও আনিয়া দাও।"

শচীমাতা বলিলেন, ঘরে আর সন্দেশ নাই।

নিতাই। যাও তো, অবশ্য পাইবে।

তখন শচীদেবী গৃহ মধ্যে যাইয়া যথাস্থানে সজ্জিত ঐরূপ পাঁচটী সন্দেশ দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং নিতাইকে তাহা আনিয়া দিয়া ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁহার চরণ ধরিয়া প্রণাম করিতে অগ্রসর হইলেন। নিতাই 'দূর ! দূর!' বলিয়া হাসিতে হাসিতে পলাইয়া গেলেন।

বৃন্দাবন দাস মহাশয় নিত্যানন্দশিষ্য ; সেজন্য তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থের অনেক স্থানে স্বীয় অভীষ্টদেবের অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক অনেকগুলি অদ্ভুত আখ্যায়িকা বলিয়াছেন। তাহার সবিস্তর বর্ণন নিষ্প্রয়োজনীয়

সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা যাইতেছে। শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী মালিনী দেবীকে নিত্যানন্দ জননী-জ্ঞানে মা বলিতেন ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে পিতৃ সম্বোধন করিতেন। মালিনী দেবীও তাঁহাকে পুত্রজ্ঞানে লালনপালন ও সেবা শুশ্রূষা করিতেন। কথিত আছে যে, নিতাই নিরবধি মালিনীর স্তনপান করিতেন। নিতাই নিজ হাতে ভাত খাইতেন না; ছোট ছেলেকে যেমন করে ভাত খাওয়ায়, মালিনী তেমনি করিয়া ভাত খাওয়াইয়া দিতেন।

একদিন ঠাকুরসেবার ঘৃতপাত্র, একটী ছোট পিতলের বাটী কাকে লইয়া গিয়াছিল; ক্ষণকাল পরে সেই কাক ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল যে, তাহার শূন্যমুখ, বাটী নাই। শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরসেবার জিনিষপত্র সম্বন্ধে অতি যত্নশীল; তাহার কিছু অপচয় হইলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিত না। মালিনী বাটীর জন্য অত্যন্ত আকুল হইলে নিত্যানন্দ হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সকল অবস্থা অবগত হইলেন এবং মালিনীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, কিছু চিন্তা নাই, তিনি বাটী আনাইয়া দিবেন। তৎপরে নাকি তিনি কাককে বাটী আনিতে বলিলে কাক উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল ও ক্ষণকাল পরে বাটী মুখে করিয়া প্রত্যাগমন করতঃ যথা স্থানে রাখিয়া চলিয়া গেল। মালিনী দেবী তখন নিত্যানন্দপ্রভাব অবগত হইয়া যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের তত্ত্ব বিলক্ষণ বুঝিয়া ছিলেন। ভক্তমণ্ডলীতে তাঁহার সম্মান বাড়াইবার জন্য তিনি এক দিন নিতাইয়ের এক খানি পরিধেয় কৌপীন চাহিয়া লইলেন এবং তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া সকল ভক্তকে বিতরণ করিয়া দিয়া মস্তকে বাঁধিতে বলিলেন এবং শত মুখে নিতাইয়ের গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রচার আরম্ভ।

এতদিন গৌরচন্দ্রের ধর্ম্মসাধন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হইতেছিল। বাহিরের লোক ইহার ভিতরের তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারে নাই। নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা ছাড়িয়া বৈষ্ণবদলে মিশিয়া নাকি সংকীর্ত্তন করিতেছেন,

ইহা ভিন্ন তাহারা আর কিছু জানিত না। তাঁহার অলৌকিক ভক্তি উচ্ছ্বাস, মহাভাবের প্রকাশ, প্রেমবিহ্বলতা প্রভৃতি গুণ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কেবল সুবিদিত ছিল।

এক দিন ভাবাবেশ কালে গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুন নিত্যানন্দ! হরিদাস! তোমরা দুই জন আজ হইতে এই নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া হরিনাম প্রচার করিতে আরম্ভ কর। যাহাকে দেখিবে, তাহাকে মিনতি করিয়া হরিনাম সাধন করিতে উপদেশ দিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণ চণ্ডালের, স্ত্রীপুরুষের ভেদ করিবে না। সকলেই সমান অধিকারী। আর দিনান্তে তোমাদের প্রচারবৃত্তান্ত আমার নিকট আসিয়া বলিবে।

প্রচারের আদেশ শুনিয়া ভক্তমণ্ডলী মহা আনন্দলাভ করিল। নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়া নদীয়ার ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই উদাসীন সন্ন্যাসী; বাহিরের পরিচ্ছদও তদ্রূপ; সুতরাং তাঁহাদের প্রচারে কিছু কিছু ফললাভও হইতে লাগিল। তাঁহাদের ব্যাকুলতা ও সরলতাপূর্ণ উপদেশে অনেক লোকের মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তাঁহারা যে গৃহস্থের বাটীতে যান্ বা পথে যাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেনঃ—'শুন ভাই! যে হরি প্রাণের প্রাণ, যাঁহা হইতে জীবন, ধন, পিতা মাতা সকলই পাইয়াছ, সেই হরির নাম, প্রাণ মন ভরে বল। তোমাদের পায়ে ধরে মিনতি করে বলি একবার হরিগুণগান করো, হরিভজন করে তাপিত প্রাণ জুড়াও, মানবজীবন সার্থক কর'।

যে প্রচারের ক্ষেত্র বৃদ্ধি হইয়া এক সময়ে ভারতের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়াছিল; যাহার প্রভাবে কোটি কোটি লোক সাধুজীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিল, তাহার সূত্রপাত এইরূপে হইল। বঙ্গদেশে এরূপ ধর্ম্মপ্রচার করা তখন নূতন; সুতরাং নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রচার যাত্রা লইয়া নগরে অনেকটা আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। যাঁহারা সুবুদ্ধি ও নিরীহ প্রকৃতির লোক, তাঁহারা এই সাধু অনুষ্ঠান দেখিয়া বৈষ্ণবদিগের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ চিরপ্রথার বিরুদ্ধাচরণে চিরকালই অসহিষ্ণু; তাঁহারা এই অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতাদিগের ভূয়সী নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহারা চৈতন্যের কীর্ত্তনের বিদ্বেষী, যাহারা কীর্ত্তন শুনিতে

গিয়া প্রবেশ পাই নাই, তাহাদের বাড়ীতে প্রচারকদ্বয় গেলে তাহারা 'মার, মার' করিয়া আস্ফালন ও কটুকাটব্য বলিয়া বিদায় করিয়া দিত। কেহ বলিত 'তোমরা সঙ্গদোষে পাগল হইয়াছ, আমাদেরও কি পাগল করিতে এসেছো না কি?' অপর গৃহস্থ আবার প্রথম ব্যক্তিকে বলিত 'ওহে! বুঝিতেছ না, বেটারা চোর, রাত্রিতে চুরি করিবে বলিয়া দিনে গৃহস্থের বাড়ীর খোঁজতলাস করিতে আইসে, বেটাদের দেয়ানে ধরিয়া দেওয়া উচিত'। কেহ বা বলিত বেটাদের বাড়ীঘর কোথায় ঠিক নাই, ছত্রিশ জাতি এক হয়ে এক কাণ্ড কর্‌তে বসেছে; যা বেটারা তোদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হবে না। চোরের মুখেসাধুর কথা!' নিত্যানন্দ হরিদাস হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেন।

এ দৃশ্য জগতে নূতন নয়। চিরকালই লোকে ধর্ম্ম প্রচারকের নামে এই পুরস্কার দিয়া আসিতেছে। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কটূক্তি বর্ষণ তো সামান্য কথা। কাঁটার মুকুট শিরে, জুতার মালা গলায়, প্রজ্জলিত হুতাশনে নিক্ষেপ, ক্রুশে হত্যা, বাইশ বাজারে প্রহার, আর কত বলিব? এই সকল সুন্দর সুন্দর ব্যবহার ভগবদ্ভক্তের জন্য। অপরাধ এই, তাঁহারা জগতের দুঃখে কাতর হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য ভগবৎ মহিমা প্রচার করেন। এ অতি ভয়ানক অপরাধ বটে; সুখ ভোগাভিলাষ ও ইন্দ্রিয়সেবার মধ্যে হরিনাম! একি সামান্য অপরাধ যে উপেক্ষা করা যায়? সাবাস্ সংসার! তোমার ব্যবহারে বলিহারি যাই! আর তোমরা ভগবৎপ্রিয় সাধুগণ! লোকে হরিনাম বলিবে না, তোমরা কি বল করিয়া বালককে তিক্ত ঔষধ খাওয়ানের ন্যায় গিলাইয়া দিবে? ধন্য তোমাদের অধ্যবসায় ও ভগবন্নিষ্ঠা! দণ্ড? দণ্ড তো তোমাদের বাঞ্ছনীয়, তোমরা কি দণ্ডভয়ে ভীত? ঈশ্বরের দণ্ড, প্রসাদ বলিয়া আদর করে বুক পেতে লও। তা না হলে কি, যে বংশে নির্যাতন করে, তাহাদেরই পরবংশীয়েরা তোমাদের পূজা করে? মনে করিলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়; তোমাদের সম্বন্ধে জগতের ব্যবহার যেন মনসার স্তুতি।

"যে মুখে বলেছিলাম চাঁই মুড়ি কাণী;
সেই মুখে বলিতেছি জয় ব্রাহ্মণী।"

জগাই মাধাই।

নিত্যানন্দ ও হরিদাস পূর্ব্বোক্তরূপে সমস্ত নগরে হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়ান এবং সন্ধ্যার সময় ভক্তগণ পরিবেষ্টিত শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট আসিয়া সমস্ত দিনের বৃত্তান্ত বিবৃত করেন। এক দিন গঙ্গার পথে আসিতে আসিতে তাঁহাদের নয়নগোচর হইল যে, দুইটা বিকটাকার মাতাল রাজপথে ছুটাছুটি করিতেছে; কখন বা বিকট হাস্য করিয়া পরস্পর কোলাকুলি করিতেছে, কখন উভয়ে কিলাকিলী করিয়া মল্লযুদ্ধ করিতেছে, কখন পথে গড়াগড়ি যাইতেছে, আর দূরস্থিত সমবেত লোকদিগকে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করিয়া গালি দিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া ক্রোধভরে প্রহার করিতে ধাবিত হইতেছে।

নিত্যানন্দ মহাকারুণিক; দুই জনার এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে পথিকদিগকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আগন্তুকের মধ্যে কেহ বলিল, 'মহাশয়! ইহারা অতি উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বংশ মর্য্যাদায় ইহারা নবদ্বীপ মধ্যে অতি গণ্য মান্য; কিন্তু বাল্যকাল হইতে মদ্যপের সঙ্গে সঙ্গ করিয়া দেখুন ইহাদের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। ইহারা না করিয়াছে এমন পাপই নাই; মদ্যপান, গোমাংসভক্ষণ, চুরি, ডাকাতি, পরস্ত্রীহরণ, লোকের ঘর পোড়াইয়া দেওয়া প্রভৃতি পাপ ইহাদের অঙ্গের আভরণ; আর নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা, প্রভৃতিরও অন্ত নাই। ইহাদের আত্মীয় স্বজন ইহাদিগকে সংশোধন করিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে; এখন ইহারা এইরূপ করিয়া বেড়ায়। সমস্ত নবদ্বীপ ইহাদের ভয়ে সশঙ্কিত, কখন কাহার কোন্ সর্ব্বনাশ করে। ইহাদের ভয়ে লোকের গঙ্গা পথে আসাই দুষ্কর; স্ত্রীলোকদের তো মোটেই আসিবার যো নাই।'

নিতাই প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা রাজা তো আছেন; ইহাদের কেন রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া সংশোধন করা হয় না?

আগন্তুক।—আর মহাশয় রাজদণ্ড! রাজদূত ধরিতে পারিলে তো জগাই মাধাইকে ধরে দিয়ানে এমন লোক নাই।

নিতাই।—বলুন দেখি, ইহাদের চরিত্রে কোন গুণভাগ আছে কি না! আমার বিবেচনায় মনুষ্য-চরিত্র এরূপ কলঙ্কিত হইতে পারে না যে, একবারে গুণশূন্য হয়।

আগন্তুক।—সাধুর যেমন মন, তেমনি কথা। আপনার মনের ভাবানুসারে আপনি বলিতেছেন; কিন্তু কৈ! জগাই মাধাইয়ের তো কোন গু

দেখিতে পাই না।" একটু চিন্তা করিয়া আগন্তুক কহিলেন, "শুনুন মহাশয়! হাঁ! আপনি ঠিক বলেছেন; ইহাদের একটা গুণ আছে, তাহা বলা উচিত। ইহারা নিন্দা-পাপ-বর্জ্জিত। পরনিন্দা মহাপাপ; ইহারা পরনিন্দা করিয়াছে, এমন কেহ কখনও শুনিতে পায় নাই। সম্মুখে দেখিলে যাহা বলুক, কিন্তু পরোক্ষে কাহারও নিন্দা করে না।

নিতাই। তবে দেখুন দেখি? আপনি বলিতেছিলেন, ইহাদের কোন গুণ নাই। এই বলিয়া মহাপ্রেমিক শ্রীনিত্যানন্দ জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের জন্য চিন্তিত হইলেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন ইহাদের কি নিস্তারের কোন উপায় নাই? শ্রীগৌরাঙ্গ তো প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া পাপী উদ্ধার করিবেন বলিয়া কৃতসংকল্প। এ দুইজনকে কি তাঁহার কৃপা হইবে না? যদি না হয় তবে এমন পাপীই বা আর তিনি কোথায় পাইবেন, যাহাতে প্রেমের মহিমা পরীক্ষা হইতে পারে? আচ্ছা; আমি আজ প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এই দুই পাপীকে ভাল করিবই করিব। এখন যেমন ইহাদের লোকে ঘৃণা করিতেছে, এইরূপ ইহাদের দর্শনে যদি পুণ্য মনে না করে, তবে বৃথা আমার সন্ন্যাস! বৃথা গৌরের ভক্তি প্রকাশ! আমার মনে আশা হইতেছে যে, এমন দিন আসিবে যখন এই দুই মাতাল এখন যেমন মদ্যপানে মাতলামি করিতেছে, তখন তেমনি শ্রীহরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতাই হরিদাসের মন পরীক্ষার্থ কহিলেন "হরিদাস! দেখ দেখ এ দুই জন লোকের কি দুর্গতি! আহা! পরকালে ইহাদের কি দশা হইবে? চিন্তা করিতেও আমার মন ব্যাকুল হইতেছে। তুমি মহাপ্রেমিক! যবনগণ তোমার প্রাণান্ত করিতেছিল, অথচ তুমি তখন তাহাদের শুভকামনা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলে। এ দুইজনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহাদের শুভানুসন্ধান কর, তাহা হইলে ইহাদের ভাল হইতে পারে। বিশেষতঃ প্রভু তোমার কথা অন্যথা করেন না; তুমি ইহাদের নিস্তারের জন্য প্রার্থনা করিলে অবশ্যই ইহারা উদ্ধার হইবে।"

হরিদাস নিত্যানন্দের মনের অভিলাষ বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "শ্রীপাদ গোঁসাই! আপনি যখন উহাদের উদ্ধার কামনা করিয়াছেন, তখন আর তাহাদের পরিত্রাণের বাকী কি? আপনার ইচ্ছা ও প্রভুর ইচ্ছায় কি ভেদ আছে? আমাকে আর কেন বিড়ম্বনা করিতেছেন? নিতাই হরিদাসকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ওহে হরিদাস! তবে এক

কর্ম্ম করা যাক্; আমাদের প্রতি আদেশ আছে, আচণ্ডালে কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে; চল এই দুই জনের নিকট প্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিগে।"

এই পরামর্শ স্থির করিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস জগাই মাধাইয়ের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদিগের ঈদৃশ দুঃসাহস দেখিয়া নিষেধ করিতে লাগিল "মহাশয়! সাবধান, কদাচ ঐ দুটা মাতালের নিকট যাইবেন না। উহাদের নিকট গেলে প্রাণসংশয়। উহারা কি সন্ন্যাসীর মান্য, না ধর্ম্মপ্রচার বুঝিবে? কত ব্রহ্মবধে গোবধে যাহাদের চৈতন্য নাই, তাহারা কি তোমাদের খাতির করিবে? ধর্ম্মবীর দুইজন এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও যেখানে জগাই মাধাই ভূলুণ্ঠিত রহিয়াছে, সেইখানে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন:—"ভাইরে! দুর্ল্লভ মানবজীবনের এমন অসদ্ব্যবহার কেন করিতেছ? পরকালে কি হইবে? একবার ভাবিয়া দেখ। শ্রীকৃষ্ণই সকলের পিতা, মাতা, ধন প্রাণ সকলই, অনাচার কুবুদ্ধি ছাড়, শ্রীকৃষ্ণ ভজ, প্রাণ শীতল হবে, দুঃখ চলে যাবে।"

এই উপদেশ বাক্য শুনিয়া পাপী দুইজন 'ধর তো বেটাদের' বলিয়া লম্ফ দিয়া উপদেষ্টাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ও ভীম-রব শুনিয়া উভয়ে অনন্যগতি হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। পার্শ্বস্থ দর্শকবৃন্দ হায়! হায়! করিয়া বলিতে লাগিল "আহা! বিদেশী সন্ন্যাসী দুইটী প্রাণে মারা যায় দেখিতেছি।" কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "সাবধানবাক্য না শুনিলে এইরূপ দুর্দ্দশা হয়। ধর্ম্ম প্রচারের আর জায়গা ছিল না যে, ঘোরতর দৈত্য দুইটার নিকটে গেলেন।" পাষণ্ডীগণ হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল "খুব হয়েছে; এমনি করে ভণ্ড বেটাদের প্রাণ যায় তো আপদ্ যায়।" নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাড়িত হইয়া পলাইতে পলাইতে কৌতুক আরম্ভ করিয়া দিলেন। মাতাল দুইটা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে বটে; কিন্তু নেশার ঝোঁকে পদস্খলিত হওয়ায় প্রচারকদিগকে ধরিতে পারিতেছে না।

নিত্যানন্দ দৌড়িতে দৌড়িতে হরিদাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"ভাল বেটাদের বৈষ্ণব করিতে গিয়াছিলাম; আর যদি ইহাদের হাত এড়াইয়া যেতে পারি, তবেই মঙ্গল।"

হরিদাস ততোধিক রহস্য ব্যঞ্জকস্বরে উত্তর করিলেন, "আরে যাও

তোমার বুদ্ধিতেই তো আজ অপমৃত্যুতে প্রাণ গেল। যেমন মাতালের কাছে কৃষ্ণনাম উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম, তেমনি শাস্তি হইল। আমারই দুর্বুদ্ধি যে জেনে শুনে চঞ্চল লোকের সঙ্গে এসেছিলাম।”

নিতাই কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া কহিলেন “ওহে হরিদাস! আমাকে তুমি কিসে চঞ্চল দেখিলে? তুমি কি আমার কথায় না সেই বামুনের কথায় এসেছিলে? যেন রাজপুত্রের মত হুকুম! তারই কথায় তো গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর হুকুমই বা কেমন? যত চোর বদমাইস লোকের নিকট কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে হইবে। যদি না শুনি তাহা হইলে রক্ষা থাকে না, আর শুনিলেও এই দশা। তুমি তাহার দোষ না দেখে মিছা-মিছি আমাকে দোষভাগী কর্‌ছো কেন?” এই বলিয়া নিত্যানন্দ খল খল করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

হরিদাস বলিলেন, ‘আমি বুড়ো মানুষ, আর চলিতে পারি না; ওই দেখ এলো।’ এই সময়ে দস্যু দুইজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল “আর যাবে কোথা! জগা মাধার হাত থেকে উদ্ধার হয়ে যেতে হবে না।” যাহা হউক, এই সময়ে বিশ্বম্ভরের বাটীর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় উভয়ে বাটী প্রবেশ করিলেন। মাতাল দুইজন প্রবেশপথ না পাইয়া অনেকক্ষণ চীৎকার করিল; পরে উভয়ে জড়াজড়ি ও কিলাকিলী করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন হরিদাস ও নিত্যানন্দ পরস্পর আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া হাসিতে হাসিতে গৌরাঙ্গ সভায় চলিলেন।

ভক্তমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া গৌরচন্দ্র বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসীন। এমন সময়ে হরিদাস ও নিত্যানন্দ যাইয়া সে দিনের রহস্য কথা আমূল বিবৃত করিলেন। গৌরের প্রশ্নমতে গঙ্গাদাস শ্রীবাস প্রভৃতি জগাই মাধাইয়ের জীবনের সমস্ত পরিচয় দিলে গৌরচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন:—“আবার যদি মাতাল দুইটা এখানে আসে, তবে তাদের কেটে খণ্ড খণ্ড করিব।’

এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ বলিয়া উঠিলেন, “আচ্ছা! তুমি খণ্ড খণ্ড কর; আমি কিন্তু তাদের ছেড়ে কোথাও যাইব না। কিসের তোমার ভক্তির বড়াই? যদি এই পাপী দুইটাকে তরাইতে না পারিবে। ধার্ম্মিক লোক ত স্বভাবতঃই হরিভজন করে; তাতে ভক্তির মহিমা বুঝা যায় না। এমন পাপী উদ্ধার না হলে হরিনামের মহিমা কোথায়?”

বিশ্বম্ভর এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন “যখন তাহারা

তোমার দর্শন পেয়েছে ও তুমি তাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন অবশ্যই কৃষ্ণ তাহাদের উদ্ধার করিবেন।"

গৌরাঙ্গের আশ্বাস বাক্যে নিত্যানন্দ আনন্দিত হইলেন; ভক্তগণ সকলে জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহানন্দের কোলাহলে বাটী পূর্ণ হইয়া গেল। আজকার আনন্দবাজারে বৃদ্ধ হরিদাসও চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাই অদ্বৈতের নিকটে নিত্যানন্দ প্রচার যাত্রায় বাহির হইয়া যে যে কাজ করিয়াছেন, রসিকতার বুকনি চড়াইয়া তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন:—"মহাশয়! প্রভুর যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, তাই মহা চঞ্চলটার সঙ্গে আমাকে প্রচারে পাঠাইয়াছিলেন। আমি কোথায় থাকি, আর সে বা কোথায় যায়? গঙ্গায় কুমীর ভাসিতে দেখিলে সাঁতার দিয়া ধরিতে যায়, পথে ছেলে দেখিলে ধরিতে যায়, আর তাদের মা বাপ ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসে; আমি তাদের চরণে ধরিয়া মিনতি করিয়া বিদায় দিই। গোয়ালা ভারে করিয়া দধি ঘৃত বেচিতে যাইতেছে দেখিয়া সে কাড়িয়া লইয়া পলায়, তাহারা উঁহাকে ধরিতে না পারিয়া আমাকে মারিতে আইসে। ছোট ছোট মেয়ে দেখিলে তাদের বিবাহ করিতে চায়; কখন ষাঁড়ের উপর চড়িয়া আপনাকে শিব বলিয়া পরিচয় দেয়; কখন বা গাভীর দুধ দুহিয়া খাইতে যায়; আমি নিষেধ করিলে বলে তোর অদ্বৈতকেই বা কে মানে? গৌরাঙ্গকেই বা কে ডরায়? এমন পাগলের সঙ্গেও মানুষ যায়? তার কথায় ঘোর মাতাল দুটার কাছে হরিনাম প্রচার করিতে গিয়ে কি বিপদেই পড়ে ছিলাম।"

অদ্বৈতাচার্য্য হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন "মাতালের সঙ্গে মাতালের যোগ হইবারই কথা; মাঝখানে নৈষ্ঠিক চরিত্র তুমি কেন? ও নিজে মাতাল, দলশুদ্ধ মাতাল না করিয়া ছাড়িবে না। দিন দুই পরে দেখিবে, সেই মাতাল দুইটা এসে নিতাই ও নিমাইয়ের সঙ্গে নাচিবে। এই বেলা এসো তুমি আমি জাত লইয়া পলাই।"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জগাই মাধাই উদ্ধার।

পুণ্য সত্বাবাচক; পাপ অসত্বাবাচক বা অভাবাত্মক। আলোক সত্বা বাচক, অন্ধকার অভাবাত্মক। আলোকের অভাবই অন্ধকার, পুণ্যের অভাবই পাপ। পাপ অবস্তু, শূন্য, প্রকৃত পক্ষে কিছুই নয়। পুণ্য বস্তু বা সত্বা। পুণ্যময়ের পুণ্যরাজ্যে পুণ্য বা ধর্ম্ম মানবাত্মার চিরসহচর বা অচ্ছেদ্য গুণরূপে প্রতিষ্ঠিত। যাবৎ সৃষ্টি লীলা তাবৎ ইহার স্থিতি। জীব প্রকৃতির সহিত ইহা ওতপ্রোতরূপে অনুস্যূত। জীবাত্মা হইতে কেহ পুণ্যের সত্বা একবারে উন্মূলিত করিতে পারে না। যিনি যত ইহা হইতে দূরে থাকুন, তিনি যে একেবারে পুণ্যহীন হইবেন, তাহা অসম্ভব। জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতা, রতি, মতি, দয়া, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষমা, আনন্দ প্রভৃতি যে সমুদায় অসংখ্য বিচিত্র শক্তির বীজ মানবাত্মার অন্তর্ভূত আছে, যাহাদিগের বিকাশ হইলেই জীবের বিকাশ হয়, সে সকল সৎগুণকেই আমরা পুণ্যনামে অভিহিত করিলাম। সুতরাং সৃষ্টিতত্বের নামই পুণ্যতত্ব। এই অর্থে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা প্রভৃতি নিকৃষ্ট শক্তি গুলিও পুণ্যপদ বাচ্য; কারণ তাহারাও সৃষ্টির অন্তর্গত। পাপের প্রকৃতি কিন্তু এরূপ নহে; পাপ সৃষ্টি ছাড়া, বিধাতার রাজ্যমধ্যে তাহার স্থান নাই। উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট সমস্ত প্রকৃতির অপরিস্ফুট অবস্থা যে পাপের অবস্থা, তাহা নহে; কিন্তু ঐ সকলের অযথা প্রয়োগই পাপ। তবেই দেখা যাইতেছে যে পাপের রাজ্য কল্পনার বা মোহের রাজ্য। কল্পনা কখন বস্তু নয়, সুতরাং পাপ অবস্তু। পুণ্যবান্ ব্যক্তি যেমন বস্তু লাভ করিয়া লীলাময়ের লীলা রাজ্যে অগ্রসর হইতে থাকেন, পাপী তেমনি পাপ করিয়া ভগবানের রাজ্য ছাড়িয়া মরীচিকাময় স্বীয় কল্পনার ও স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। একজন বস্তুলাভ করে, আর একজন অবস্তুতে ডুবিয়া মরে। এই জন্য প্রকৃত ভগবৎপরায়ণ সাধু পাপের নিত্যত্বে কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। যাঁহারা পাপের বস্তুত্বে বিশ্বাস করেন, পাপের সৃষ্টি বিষয়েও সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাস করিতে হয়। আবার অনন্ত পুণ্যের আধার ভগবান্ পাপের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা পাপপ্রসবিতা সয়তান বা পাপপুরুষের নিত্যত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হন। ইহার ফল সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, পাপীর পাপ দূরীভূত না হইলে উহা

জীবাত্মার অনন্ত কালের সহচর হইল। কাজে কাজেই দুর্ভাগ্য জীবের কপালে অনন্ত নরক ভোগ বই আর কি হইতে পারে? প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম এই মতের পক্ষপাতী। ঐ ধর্ম্মে এই পাপ মোচনের যে উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা যিনি অবলম্বন করিতে পারিলেন, তিনি সৌভাগ্যবান্। কিন্তু যাঁহারা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না, বা সেই পরিত্রাণ বিধান যাঁহারা জানিতে পারেন নাই, অথবা যাঁহাদের জীবিতকালে ঐ বিধান পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই, তাঁহাদের কপালে অনন্ত নরক লিখিত হইল। মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান কিন্তু এই মতে সায় দিতে পারে না। ভগবত্তত্ত্বের নিকট পাপ অবস্তু, সুতরাং চিরস্থায়ী নহে। মরীচিকার স্থায়িত্ব কোথায়? স্বপ্নের স্থায়িত্ব অসম্ভব। সুতরাং চিরকাল কেহ পাপী থাকিতে পারে না। যে যতই কেন মনুষ্যত্ব বিহীন দুরাচার পাপী হউক না, তাহার মোহ ছুটিবেই ছুটিবে, স্বপ্ন ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে, ভ্রান্তি যাইবেই যাইবে। এ জীবনে না যায় তাহাতে কি? অনন্ত জীবন পড়িয়া আছে।

কি সুখের সংবাদ! কি আশার কথা! এমন না হইলে কি পাপীদের মাথা রাখিবার স্থান থাকিত? পাপের এই আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দুরাচার পাষাণ হৃদয় কঠিন পাপীদেরও আশু উদ্ধারকল্পে নিরাশ হওয়া যায় না। যেমন স্বপ্ন সঞ্চারণকারীর স্বপ্নটী ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলেই তাহাকে প্রকৃতিস্থ করা যায়, তেমনি পাপের মোহ ছাড়াইতে পারিলেই পাপী আপন জীবনগতি দেখিতে পায়; পুণ্য পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, এবং এত দিন কল্পনা ভ্রমণের জন্য অনুতাপ করে। এই রোগের সাধু চিকিৎসক যাঁহারা, তাঁহারা এই চমক্ ছাড়াইবার জন্যই যুগে যুগে যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ভূতের রোজা মন্ত্র পড়িয়া ভূত ছাড়ায়, এ কথায় আজ কাল সকলে বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু পাপ ভূতের রোজাগণ অলৌকিক মন্ত্রবলে যে মহাপাপীর উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন, তাহাতে কে অবিশ্বাস করিতে পারে? এক দুই দশ দিনে বা দু'বছর, দশ বছরে নহে, এক মিনিটের মধ্যে পাপের মরীচিকা দূরীভূত হইয়াছে; কল্পনা-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তাহার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। পাপ বস্তু বা সত্তা হইলে ইহা কখনই সম্ভব হইত না। রত্নাকর—বাল্মীকি, দুরাত্মা সল—সাধু পল, লম্পট বিল্বমঙ্গল—প্রেমিক লীলাশুখ, নৃশংস ব্যাধ—পরম ভক্ত, হইতে পারিত না। যে মহামন্ত্র বলে এই

কেন অদ্ভুত ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছে, তাহা ভগবানের নাম। নিত্যা-নন্দ এই সমস্ত তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন; তাই জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার সাধনে পূর্ণ আশা করিতেছিলেন।

নিত্যানন্দ যে দিন হরিদাসের সঙ্গে নাম প্রচারে যাইয়া মদ্যপদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তাহাদিগের উপর তাঁহার কেমন একটা টান হইয়াছিল; তাহাদের উদ্ধারের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যখন তখন তাহাদিগের নিকট যাইতেন ও গোপনে থাকিয়া তাহাদের কার্য্য কলাপ পরীক্ষা করিতেন। জগাই মাধাই তখন ঘোর উন্মত্ত অবস্থায়, সুতরাং নিতাইয়ের এই সব সাধু চেষ্টা জানিতে পারে নাই। এই অবস্থায় এক দিন রজনীযোগে নিত্যানন্দ নগরভ্রমণ করিয়া আসিতে আসিতে পাপী দুইটার সমীপবর্ত্তী হইলেন। আগন্তুকের পদশব্দ শুনিয়া মাতাল দুই জন, 'কে রে?' 'কে রে?' করিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর নাম কি?' নিত্যানন্দ প্রেমভাবে উত্তর করিলেন 'আমার নাম অবধূত'। 'আর যাস্ কোথা' বলিয়া মাধাই নিকটস্থিত কলসীভাঙ্গা মুট্‌কী কুড়াইয়া লইয়া তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুররূপে ছুড়িতে লাগিল। মুট্‌কী নিতাইয়ের মস্তকে লাগিয়া ফুটিয়া দর দরিত ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল।

নিতাই মুট্‌কীর আঘাত খাইয়া ব্যথিত হওয়া দূরে থাকুক প্রেমে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন, আপনার মাথা দিয়া যে দর বিগলিত ধারে শোণিত পড়িতেছে, তাহা গ্রাহ্য নাই; জগাই মাধাইয়ের দুষ্কৃতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি যে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, শুধু তাহা নহে; সেই রুধিরাপ্লুত কলেবরে তাহাদের আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের মার খাইয়া যেমন স্নেহভাবে তাহাকে আদর করে, মহাপ্রেমিক নিতাই তেমনি বাহু বিস্তার করিয়া আলিঙ্গন করিতে গেলেন:—

"মাধাই রে! আয় ভাই! মেরেছিস্ কলসীর কাণা; হাঁরে! তা বলে কি প্রেম দিব না?"

ধন্য প্রেম! জগতীতলে তুমিই ধন্য! ভগবানের জীবন্ত শক্তি! তুমিই ধন্য! আর নিতাই! ধন্য তোমার প্রেম শিক্ষা! এ প্রেম কি তুমি প্রেম-ময়ের পাঠশালায় শিখেছিলে? নইলে স্বার্থপর জগতে ইহার ছবি তো দেখিতে পাই না। প্রেমময়! তুমিই ধন্য যে মুহূর্ত্ত মানবজাতীর মধ্যে

এমন স্বর্গের জিনিষ পাঠাইয়াছিলে। এ প্রেম না হইল কি অসুরকু উদ্ধার হতো? সাধুর রক্তে যে পাপীর পরিত্রাণ, একথা আর অবিশ্বাস করি কেমন করে? ঈশার রক্তে পৃথিবী উদ্ধার হইল, হরিদাসের শোণিতে কি যবনকুল দ্রবীভূত হইল, আর নিত্যানন্দের শোণিতে আজ জগাই মাধা তরে গেল; তবে আমরা পাপীদের উদ্ধার হইতে আর বাকি কি থাকিল। তাই আজ আনন্দে সকলে হরি! হরি! বল।

নিকটে থাকিয়া জগাই এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে ছিল; বিদ্যুদ্বেগে যে এক মহাশক্তি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার মাথা ঘুরাইয়া দিল। চকিতালোকে তাহার পাপজীবনের পাপপূর্ণ প্রতিকৃতি যুগপৎ মনশ্চক্ষুর নিকট উপস্থিত হইল; কে যেন জোর করিয়া তাহার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া নিত্যানন্দের স্বর্গীয় প্রেমপূর্ণ জীবনচ্ছবির সহিত তাহার ঘৃণিত ও কলঙ্কি জীবনের তুলনা করিয়া দিল। অমনি পাপের বিঘোর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, মোহের চট্‌কা ছুটিয়া গেল এবং স্বপ্ন সঞ্চারীর স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমত হয়, সে আপনার অবস্থা তেমনি দেখিতে পাইল। পাপের প্রলেপ যত কেন ঘনীভূত হউক না, উহা অবস্তু, ভুয়া বই তো নয়; তাই অস্তিত্বপূর্ণ পুণ্য-রূপিণী ভগবচ্ছক্তিকে কখন চিরকাল আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। সেই জন্য মাধাই নিত্যানন্দকে বিনা দোষে যে নির্ঘাত প্রহার করিল, তাহা দেখিয়া জগাইয়ের প্রাণে দয়া হইল; সে মাধাইকে পুনর্ব্বার মারিতে উদ্যত দেখিয়া মারিতে না দিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল:—'ওরে মাধাই! দেশান্তরী সন্ন্যাসীকে এমন করে মারিলি কেন? ইহাকে মেরে তোর কি লাভ হইল? ইহার মাথায় শোণিত ধারা পড়িতেছে দেখিয়া তোর প্রাণে কি একটু দয়া হয় না?'

যেখানে এই ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল, সেখান হইতে বিশ্বম্ভরের বাড়ী অধিক দূর নহে। গৌরচন্দ্র তখন বহির্ব্বাটীতে স্বদলে বসিয়া ভগবৎ প্রসঙ্গ করিতেছিলেন; এমন সময়ে এক জন লোক যাইয়া মাধাই কর্ত্তৃক নিত্যানন্দের প্রহারবৃত্তান্ত জানাইল। গৌরচন্দ্র সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া তৎ ক্ষণাৎ ঘটনাক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলেন, বহুজন সমাকীর্ণের মধ্যে নিত্যানন্দ দণ্ডায়মান, মস্তক দিয়া দরদরিতধারে রক্ত পড়িতেছে। অদূরে জগাই মাধাই দাঁড়াইয়া আছে, আর নিতাই সেই রক্তাক্ত কলেবরে হাসিয়া হাসিতে আততায়ীদিগকে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছেন।

নিতাইর অঙ্গে রক্ত-ধারা দেখিয়া, গৌরচন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া পাপীদিগকে সংহার করিবার জন্য 'চক্র! চক্র!' বলিয়া সুদর্শন চক্রকে ডাকি স্মরণ করিলেন। কথিত আছে যে, ভক্তগণ চক্রের আগমন দেখিতে পাইয়া প্রমাদ গণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে নিত্যানন্দ গৌরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে "মাধাই মারিতেছিল বটে, কিন্তু জগাই করুণা-পরবশ হইয়া মাধাইকে মারিতে দেয় নাই; আমি বিশেষ কোন আঘাত পাই নাই; দৈবে রক্ত পড়িয়াছে; তাহাতে কিছু হানি হয় নাই। যাহা হউক, তুমি স্থির হও; আমার অনুরোধ এ দুই জনকে কিছু বলিতে পাইবে না।' 'মাধাই মারিতে জগাই রাখিয়াছে' এই কথা শুনিয়া গৌরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল; তাঁহার প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের প্রেম উথলিয়া উঠিল। তখন তিনি জগাইকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন:— জগাই রে! তুই আজ কি কাজই করেছিস্, নিতাইকে বাঁচাইয়া তুই আমাদের কিনিয়াছিস্; কৃষ্ণ তোরে কৃপা করুন, স্বর্গের প্রেমভক্তি তোর লাভ হউক।'

নিত্যানন্দের স্বর্গীয় প্রেমপ্রভাবে ইতিপূর্ব্বেই জগাইর প্রাণে সুমহৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল; যে টুকু বাকী ছিল, তাহা গৌরের প্রেমালিঙ্গনে পূর্ণ হইয়া গেল। সত্য সত্যই জগাইয়ের পাপ মোহ ছুটিয়া গেল; চিরকালের সঞ্চিত পাপরাশি স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে তাহার প্রাণ দগ্ধ হইতে লাগিল; জীবনের জঘন্যতা স্মরণ করিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; এবং সাক্ষাৎ পাপ পুরুষ বিকটাকার দেহ ধরিয়া তাহাকে যেন গ্রাস করিতে আসিল। জগাই মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পড়িয়া গেল। ধন্য শ্রীহরি! তোমার প্রেমের মহিমা; মুহূর্ত্তমাত্র যুগপ্রলয় উপস্থিত। একনিমিষে ঘোরতর মহাপাপী উদ্ধার হইয়া গেল। মূর্চ্ছিতাবস্থায় জগাই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে সকল সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিল, তাহারা রাক্ষসীর মূর্ত্তি ধরিয়া আলুলায়িত কেশে বিকট হাস্য করিতে করিতে তাহাকে যেন বিষ্ঠাগর্ত্তে চুবাইতেছে; যে অবলার অবৈধ গর্ভোৎপাদন করায় কলঙ্কিনী কলঙ্ক লুকাইতে আত্মহত্যা করিয়াছিল, সে যেন তপ্ত লৌহ শলাকা তাহার চক্ষুর গহ্বরে ফুটাইয়া দিতেছে; যেন ভয়ানক তৃষ্ণায় তাহার গলা শুকাইয়া গিয়াছে; আর ইতিপূর্ব্বে যাহাদের সে যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহারা হাসিতে হাসিতে যেন দুর্গন্ধময় আগ্নেয় সুরা

আনিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিতেছে, সে যেন দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতেছে। ইহার মধ্যে সে দেখিল যেন অতি দূর হইতে "ভয় নাই! ভয় নাই!" বলিয়া রুধিরাক্ত কলেবরে নিত্যানন্দ তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছেন এবং ক্ষণকাল পরে দেখিল যেন বিশ্বম্ভর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম চতুর্ভুজধারী বিষ্ণুরূপে হাসিতে হাসিতে আসিয়া শ্রী পাদপদ্ম তাহার বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন; অমনি সেই পিশাচ রাক্ষস সকল অন্তর্হিত হইয়া গেল ও নরকের ভীষণ দৃশ্যের পরিবর্ত্তে স্বর্গের অনুপম শোভা চারিদিকে প্রকাশিত হইল। এই অবস্থায় চৈতন্য লাভ হইলে পুরাতন ও কঠিন পাপী জগাই বিশ্বম্ভরের চরণ ধরিয়া নিস্তারের জন্য বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। জগাই ও মাধাইয়ের শরীর মাত্র পৃথক, দুইজনে একপ্রাণ; বাল্যাবধি যত পাপ করিয়াছে, দুইজনে একত্র। যেমন জননীর এক স্তন্য-ধারায় যুগল-তনয় পুষ্ট হয়, তেমনি পাপপিশাচীর একই কলুষ কালকূটে উভয় পাপী সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। একজন পুণ্যবান্ হইল; আর একজন পাপী থাকিয়া যাইবে; তাহা তো হইতে পারে না। মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করিয়া কিছু অপ্রতিভ হইয়া নিকটে বসিয়াছিল; জগাইর ঈদৃশ অবস্থা পরিবর্ত্তন দেখিয়া ও অনুতাপের ক্রন্দন শুনিয়া তাহারও ভাবান্তর উপস্থিত হইল। জগাইয়ের প্রাণের পরিবর্ত্তনের ঢেউ আসিয়া যেন তাহার হৃদয়েও লাগিল। কে জানে কি শক্তি প্রভাবে তাহারও পাপের নেশা ছুটিয়া গেল। তখন সে ব্যাকুল চিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিতে লাগিল:—"আমরা দুইজনে এক সঙ্গে চিরকাল পাপ করিয়া আসিতেছি; সুখ দুঃখ যখন যাহা ঘটিয়াছে, উভয়ে সমানাংশে ভোগ করিয়াছি; এখন জগাই পুণ্যবান্ হবে, আর আমি পাপী থাকিয়া যাইব, তাহা হইতে পারে না; আর তোমারই অনুগ্রহ বা কেমন যে এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিবে? আমি দুরন্ত পাতকী; গৌর! তুমি ভিন্ন আমাকে আর কে উদ্ধার করিবে? আমাকে রক্ষা কর।"

বিশ্বম্ভর বজ্র গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, 'তোমার নিষ্কৃতি নাই; তুমি সাধু-দেহে রক্তপাত করিয়াছ; সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই।'

মাধাই দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে কহিল, 'আমার উদ্ধার না হইলে তোমাকেই বা ছাড়ে কে? শুনিয়াছি, তুমি পাপ রোগের সুচিকিৎসক; আমার রোগের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কিসের তোমার চিকিৎসানৈপুণ্য? এখন আমার গতি কি হবে, বলিয়া দাও।'

বিশ্বম্ভর মর্মে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'সাধুর রক্তে পাপীর পাপ-প্রায়শ্চিত্ত হয় শুনিয়াছি; তাই আজ নিত্যানন্দের রক্তপাতে পাপী দুইটা উদ্ধার হইতেছে।' প্রকাশ্যে মাধাইকে বলিলেন, 'তুমি নিত্যানন্দস্থানে অপরাধী; তিনি ভিন্ন তোমার পাপ ক্ষমা করিতে কাহারও সাধ্য নাই।"

মাধাই তখন কাঁদিতে কাঁদিতে নিত্যানন্দের চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

বিশ্বম্ভর বলিলেন 'শুন নিতাই! তোমার অঙ্গে ও রক্তপাত করেছে; উহাকে ক্ষমা করা না করা তোমার হাত; আমি বলি যখন ও চরণে পড়ছে তখন তোমার ক্ষমা করা উচিত।'

উদার প্রেমিক নিতাই হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন 'এই তো কথা। শুন গৌর! আমি বলি আমার যদি কোন জন্মের কিছুমাত্র সঞ্চিত পুণ্য থাকে সে সব মাধাইর। আমার স্থানে ইহার অপরাধ থাকার ভাবনা তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। তুমি এখন চতুরালি ছেড়ে ইহাকে কৃপা কর।'

বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'আচ্ছা! নিতাই! তবে মার খেতে খেতে যে আলিঙ্গনটা দিতে গিয়েছিলে, সেটা আর বাকি থাকে কেন? যদি, হলো তো ভাল করেই হউক'। "সে তো অনেক দিন হয়ে গিয়েছে!" এই বলিতে বলিতে নিত্যানন্দ অনুতপ্ত মাধাইকে কোলে করিয়া লইলেন। সাধুদেহ-সংস্পর্শে মাধাইর দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। তখন পাপী দুইজন কাঁদিতে কাঁদিতে গৌর নিতাইয়ের স্তব করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর বলিলেন "শুন জগাই! মাধাই! আর তোমরা পাপ করিও না।"

তাহারা অনুতাপের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল "বাপ! আবার?"

বিশ্বম্ভর পুনরায় তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"শুন! তোমরা যদি আর পাপপথে গমন না কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্মজন্মান্তরের কলুষরাশি কৃষ্ণ মার্জ্জনা করিয়া পরম মঙ্গল করিবেন, তোমাদের দেহে নিত্য বিরাজ করিবেন; এবং পূর্ব্বে তোমাদের স্পর্শে যাঁহারা গঙ্গাস্নান করিয়াছেন, এখন তোমাদের অঙ্গ স্পর্শে, তাঁহারা গঙ্গাস্পর্শের ন্যায় পুণ্য মনে করিবেন। ভক্তের ইচ্ছা কখন বিফল হইবার নহে; নিত্যানন্দের অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হইবে।"

জগাই মাধাই গৌরের ঈদৃশ প্রেমপূর্ণ ভাষা শুনিয়া আনন্দে মোহপ্রাপ্ত হইল। তখন বিশ্বম্ভর ভক্তগণকে আদেশ করিলেন, 'সকলে এ দুই

জনকে তুলিয়া আমার বাড়ীতে লইয়া চল। আজ এ দুই জনের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে নাচিতে হইবে।” ভক্তগণ তাঁহাই করিলে গৌরচন্দ্র সবলে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া বৈষ্ণব দল লইয়া মহা সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল লোক রাজপথে এই ব্যাপার দেখিতেছিল, তাহারা অবাক্ হইয়া গেল। অচিরকাল মধ্যেই নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, নিমাই পণ্ডিত দুর্দ্ধর্ষ জগাই মাধাইকে সাধু করিয়াছে। হাতে পাষণ্ডীদিগের অহঙ্কার চূর্ণ হইল ও নিমাইয়ের প্রতি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল।

জগাই মাধাইয়ের গলা ধরিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনে মাতামাতি হইলে গৌরের প্রেমভক্তির জীবন্ত আবির্ভাব দেখিয়া পাপী দুই জন একেবারে গলিয়া গেল, এক দণ্ডে নরক হইতে স্বর্গে উঠিয়া পড়িল; কত প্রকার দৈন্য করিয়া পাপের জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিল এবং অশেষ প্রকারে নিতাই গৌরের স্তুতি বন্দনা করিল। কীর্ত্তনান্তে বিশ্বম্ভর সকল বৈষ্ণবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমাদের যাঁহার নিকট এ দুই জন যত অপরাধ করিয়াছে, তোমরা কায়মনোবাক্যে তাহা মার্জ্জনা করিয়া ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হও; আর আজ হইতে কেহ ইহাদিগকে মদ্যপ কি পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারিবে না; ইহাদের শরীরে আর পাপ নাই; তোমরা সকলে ইহাদিগকে আপন কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় দেখিবে, ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আহার দিবে। যদি কখন কেহ ইহাদিগকে পরিহাস কর, আমি বলিতেছি, নিশ্চয়ই তাহার সর্ব্বনাশ হইবে’।

প্রভুর আজ্ঞায় তখন জগাই মাধাই একে একে প্রত্যেকে বৈষ্ণবের চরণতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চরণধূলি লইতে লাগিল এবং সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

গৌরচন্দ্র তখন সেই গভীর রজনীযোগে ভক্তদল লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন, এবং গঙ্গার প্রশস্ত জল মধ্যে অঙ্গমার্জ্জন ও শিশু বালকের ন্যায় পরস্পর জলকেলি ও সন্তরণ করিয়া সকলকে মাল্যচন্দন পরাইয়া বিদায় দিলেন। জগাই মাধাই ইহার আগে কত দিন গঙ্গাস্নান করিয়াছিল। কিন্তু আজিকার ন্যায় তাহারা গঙ্গাজল একদিনও শীতল ও পবিত্র বলিয়া অনুভব করিতে পারে নাই। আজি যেন আকাশে চন্দ্র মধুধারা বর্ষণ করিতেছিল, এবং প্রকৃতির ছবিতেও সুধা মাখান ছিল। সত্য সত্যই

আজ তাহারা জলাভিষিক্ত হইল। স্নানান্তে বিশ্বম্ভর নিজ হস্তে তাহাদের মালা চন্দন পরাইয়া দিলেন। সে রাত্রি জগাই মাধাই ভক্তদিগের আলয়েই যাপন করিলেন।

জগাই মাধাই সেই অবধি সাধু সঙ্গে বাস করিতে লাগিল এবং কঠোর সাধনব্রত গ্রহণ করিয়া তাহাতেই সমস্তদিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। অল্পদিন মধ্যেই তাহারা সাধনায় কৃতকার্য্য হইয়া পরম ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিল। তাহাদের দৈনিক সাধনের নিয়ম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জন স্থানে বসিয়া দুই লক্ষ হরিনাম জপ করিত; আপনাদের পূর্ব্ব পাপ স্মরণ করিয়া কাঁদিত ও আপনাদের ধিক্কার দিত; সাধুদিগকে প্রণাম বন্দনা করিয়া পদধূলি লইত ও আপনাদের পাপের কাহিনী বলিয়া কাঁদিত। সদলে বিশ্বম্ভর নিরন্তর তাহাদের আশ্বাসবাণী শুনাইতেন ও উপদেশ দিতেন। মনের গ্লানিতে তাহারা পান ভোজন করিতে চাহিত না। বিশ্বম্ভর সম্মুখে বসিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন। ইহাতেও উহারা প্রথম প্রথম প্রাণে সোয়াস্তি পাইত না।

মাধাই নিত্যানন্দকে যে প্রকার মারিয়াছিল, তাহার জন্য সে নিরন্তর অনুতাপ ও ক্রন্দন করিত। নিতাই যদিও সে অপরাধ গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু মাধাইয়ের তাহাতে চিত্তে শান্তি হইত না। ইহার জন্য সে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিত ও কখন কখন ছুটিয়া নিত্যানন্দের নিকট যাইয়া ক্রন্দন করিত। এক দিন নির্জ্জনে নিতাইয়ের দেখা পাইয়া সে আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল ও অশেষ প্রকারে নিতাইয়ের স্তুতি করিতে লাগিল। মার খাইয়া যে প্রেম দিতে পারে, তাঁহাকে সে আর সামান্য মানুষ জ্ঞান করিতে পারিল না। নিতাই বলিলেন—'মাধাই! তুমি আমার পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়; পুত্র মারিলে কি পিতার তাহাতে ব্যথা লাগে?'

মাধাই বলিল, 'প্রভো! যদি আমায় এত দয়া করিলেন, তবে আমাকে আর একটী উপদেশ বলিয়া দিন্। আমি যত প্রাণীর হিংসা করিয়াছি, তাহাদের সকলকে চিনি না, চিনিলে প্রত্যেকের চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম। সেই সকল অপরিচিত জনের সম্বন্ধে আমার অপরাধ কিসে যাইবে?"

নিতাই ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ইহার জন্য চিন্তিত হইও না, এই নবদ্বীপ নগরে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই গঙ্গা স্নান করিয়া থাকেন;

তুমি স্বহস্তে গঙ্গার ঘাটগুলি সুন্দররূপে পরিষ্কার করিয়া রাখিবে যাহাতে সকলে অনায়াসে ঘাটে বসিয়া স্নান করিতে পারেন, এবং যাঁহারা স্নানে আসিবেন, তাঁহাদের সকলকেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দৈন্যভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। এই পর-সেবাতেই তোমার সকল পাপ অন্তর্হিত হইবে।"

মাধাই আর বাক্যব্যয় না করিয়া নিত্যানন্দকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সেবায় ব্রতী হইল। স্বহস্তে কোদালি লইয়া সে ঘাটে ঘাটে ঘাট পরিষ্কার করিতে লাগিল এবং যাহাকে দেখে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় অপরাধের কথা বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল। মহাত্মা মাধাই গঙ্গাতীরে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিল। যেখানে ভাগ্যবান্ মাধাই তপস্যা করিত, এখনও লোকে তাহাকে মাধাইয়ের ঘাট বলে।

এদিকে গ্রামের মধ্যে একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। লোকে বলিতে লাগিল, যে এ দুই মহাপাপীকে সচ্চরিত্র সাধু করিতে পারে, সে কখনই সামান্য মানুষ নহে। পাষণ্ডীদিগের মস্তক অবনত হইল; এবং লোকে বিশ্বম্ভরের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। আর জগাই মাধাই নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের প্রেমের কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে বিরাজ করিতে লাগিল।

চৈতন্য ভাগবত-গ্রন্থাবলম্বনে উপরি উক্ত ঘটনা বিবৃত হইল। চৈতন্যমঙ্গলের বৃত্তান্ত ইহা অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন। চৈতন্যমঙ্গলকার লোচন দাস বলেন যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গ সদলে নগরসংকীর্ত্তন করিতে বাহির হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সংকীর্ত্তন মধ্যস্থিত নিত্যানন্দের মস্তকে মাধাই কলসীর মুটকী প্রহার করিয়াছিল। নিত্যানন্দ তাহাতে কোপ করা দূরে থাকুক, ক্রুদ্ধ গৌরচন্দ্রকে সান্ত্বনা করিয়া পাপীদিগকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পরে সংকীর্ত্তনের দল চলিয়া গেলে জগাই মাধাই অনুতপ্ত হৃদয়ে বিশ্বম্ভরের আলয়ে যাইয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল। তখন গৌরসুন্দর তাহাদিগকে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া গঙ্গাজল ও তুলসী সংযোগে তাহাদিগের পাপ উৎসর্গ করাইয়া নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাপী দুইজন নবজীবন লাভ করিল। পাপের অসারত্ব প্রতিপন্ন হইল; পুণ্য-প্রেমভক্তির জীবন্ত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল; এবং জগতের সকল পাপীর নিকটে আশাপ্রদ সুমঙ্গল সমাচার প্রচারিত হইল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নানা কথা।

শ্রীবাস মন্দিরে নিশাভাগে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তন হইতেছে। নিজগণ ব্যতীত আর কাহারও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই। কাহারও বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইলে একজন দুয়ার খুলিয়া দিয়া আবার তখনি রুদ্ধ করিতেছেন। আর বাহির হইতে কাহারও আসিবার প্রয়োজন হইলে, নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত করিলে বা পরিচয় দিলে কপাট মুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। আজ গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তনে নাচিতেছেন বটে; কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় তাঁহার উল্লাস মত্ততা হইতেছে না, এবং কীর্ত্তনও জমিতেছে না। গৌরচন্দ্র থাকিয়া থাকিয়া বলিতেছেন "আজ কি জন্য আমার প্রেমোল্লাস হইতেছে না? গৃহমধ্যে কেহ কি লুকাইয়া আছে?"

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ একে একে বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণ খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন খানে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল; শচীনন্দন আবার নাচিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবারেও তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায় তিনি বলিতে লাগিলেন "উঁ হুঁ! প্রাণে সুখ পাই না কেন? আজ কি কৃষ্ণ আমারে কৃপা করিবেন না?" প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া ভক্তদল সকলেই চিন্তিত হইলেন, এবং মনে মনে করিতে লাগিলেন, হয় তো তাহাদের মধ্যে কাহারও কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে।

যে গৃহে কীর্ত্তন হইতেছিল, তাহার এক কোণে তণ্ডুলাদি রাখিবার জন্য একটী প্রকাণ্ড ডোল ছিল। বিশ্বম্ভরের চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একেবারে সেই ডোলের নিকট যাইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ও খুঁজিতে খুঁজিতে দেখেন যে, তাঁহার শাশুড়ীঠাকুরাণী সেখানে লুকাইয়া রহিয়াছেন। শ্রীবাসের বৃদ্ধা শাশুড়ীর গৌরের নৃত্য দেখিতে বড় সাধ হইত; কিন্তু কীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বেই পণ্ডিতজী বাড়ীর পরিবারদিগকে সাবধান করিয়া প্রকোষ্ঠান্তর করিতেন; সে জন্য এত দিন তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। আজ তিনি কৌশল করিয়া বেলা অপরাহ্ন হইতেই এই ডোলের পশ্চাতে লুকাইয়া ছিলেন। প্রভুর নৃত্যসুখ ভঙ্গ হইলে শ্রীবাসের দুঃখের অবধি থাকিত না; গৌরাঙ্গকে

সুখী করিবার জন্য তিনি আপন প্রাণকেও যৎসামান্য মনে করিতেন; সুতরাং বাড়ীর স্ত্রীপুত্রদিগকে একেবারে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, প্রভুর নৃত্যকীর্ত্তনের সময় তাহাদের কর্তৃক কিঞ্চিন্মাত্রও উৎপাত উপস্থিত হইলে তিনি তদ্দণ্ডেই জাহ্নবীজলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। তাই তিনি আজ স্বীয় শাশুড়ীর এই সামান্য অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া আজ্ঞা দিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ীর কেশাকর্ষণ করিয়া বাহির করাইলেন।

গৌরচন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধা মহিলা গৃহমধ্যে লুক্কায়িত আছেন। বোধ হয়, কেবল কৌতুক করিবার অভিপ্রায়েই তিনি এইরূপে রহস্যভেদ করাইলেন। বুড়ীকে গুপ্তস্থান হইতে কেশাকৃষ্টা হইয়া বাহির হইতে দেখিয়া গৌরের আনন্দের সীমা নাই; তিনি উল্লসিত মনে কীর্ত্তনমধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তদলও হাসিয়া ঢলিয়া পড়িলেন। আর শ্রীবাস পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে কীর্ত্তনে নাচিতে লাগিলেন। তখন একটা মহা রঙ্গ রসের আন্দোলন উঠিয়া গেল।

বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তা এই প্রস্তাবের অবান্তর ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, গৌরের নৃত্যদর্শনে ও কীর্ত্তন শ্রবণে ভক্ত বিনা বহির্ম্মুখ লোকের অধিকার নাই; তাই শ্রীবাসের শাশুড়ী এত করিয়াও পূর্ণকাম হইতে পারিল না।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর পরিচয় পাঠক মহাশয় জানেন। ইনি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া নবদ্বীপের গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করেন। কিন্তু ইনি এক জন অকৈতব বৈষ্ণব, গৌরের ভক্তদলের এক জন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং এমনই অন্তরঙ্গ যে, গৌরের নৃত্যের নিশল অবস্থাতেই থাকিবার অধিকার পাইয়াছেন। আজ গৌরচন্দ্র ঈশ্বরভাবে বীরাসন করিয়া বসিয়া আছেন; ভক্তদল মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ও ঝুলিটী স্কন্ধে লইয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাচিতেছেন, হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, এবং থাকিয়া থাকিয়া বিবিধ রঙ্গভঙ্গী করিতেছেন। তাঁহার শ্বেতশ্মশ্রু বহিয়া অনর্গল ধারে অশ্রুধারা পড়িতেছে, পরিধেয় গৈরিক বস্ত্র ভিজিয়া যাইতেছে, এবং উল্লম্ফনের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষার ঝুলি আন্দোলিত হইতেছে।

বিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারীকে স্নেহব্যঞ্জক স্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "শুক্লাম্বর! এ দিকে এসো"। ব্রহ্মচারী নিকটে আসিলে গৌরচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "তুমি

যুগে যুগে আমার দরিদ্র সেবক, সর্ব্বস্ব আমাকে সমর্পণ করিয়া ভিক্ষা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছ; কেমন তোমার মনে হয়? দ্বারিকার রাজপ্রাসাদে তুমি একবার গিয়াছিলে; আমি তোমার দত্ত ক্ষুদ খাইয়াছিলাম, আর লক্ষ্মী আমার হস্ত হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। আজ আমাকে আর চারিটী তণ্ডুল দাও; আর যদি না দাও আমি বল করিয়া কাড়িয়া লইব।” এই বলিয়া ঝুলির মধ্যে হস্ত দিয়া তিনি মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর ব্যস্ততা সহ নিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন:—

“প্রভু! কর কি? ও তণ্ডুলে যে কত ক্ষুদ ও কোণ আছে? উহা কি তোমার যোগ্য?”

‘ভক্তের ক্ষুদই আমি ভালবাসি; অভক্তের অমৃতও ভাল লাগে না। ভক্তের জীবন পরমানন্দময়; তাঁহার ক্ষুদও আনন্দ মাখান; সে ক্ষুদ খাইতে আনন্দ হইবে না কেন? তুমি কি জাননা যে, তোমার হৃদয় আমার অভিন্ন; তুমি ভোজন করিলে আমার ভোজন হয়, তুমি পর্য্যটন করিলে আমার পর্য্যটনক্লেশ হয়। তুমি কি আমার পর যে তোমার ক্ষুদ খাইব না’?

শুক্লাম্বর কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন;—“আর না, ঢের হইয়াছে। এই অযোগ্য পাত্রে এত কৃপা কেন? আমি যে প্রেমভক্তিবিহীন অতি-কৃপা পাত্র।” গৌর উত্তর করিলেন ‘তুমি প্রেমভক্তিবিহীন, তো ভক্তিমান্ কে? তুমি নিশ্চয় জানিবে যে স্বর্গের অতুল প্রেমভক্তি তোমারই।” শুক্লাম্বরের বর শুনিয়া বৈষ্ণবগণ প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

পাঠক মহাশয় দেখিয়াছেন যখন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভাবে মত্ত হইয়া আত্মতত্ত্বের নিগূঢ় যোগে যুক্ত হইয়া ঈশ্বরভাবে বিভোর হইতেন, অথবা লীলাময়ের লীলাতরঙ্গে মগ্ন হইয়া থাকিতেন; যখন আমি, তুমি, আমার, তোমার, ইত্যাদি বিকল্প বুদ্ধি লোপ হইয়া কেবল এক সৎপদার্থে মন ডুবিয়া যাইত; তদীয় বন্ধুবর্গ কেবল তখনই তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিবার ও ভগবানের প্রাপ্য ভক্তি সম্মান দেখাইবার সুযোগ পাইতেন। এ অবস্থা ভিন্ন অন্য সময়ে তিনি কিছুতেই আপনার প্রতি পূজা অথবা অযোগ্য সম্মান প্রদর্শন সহ্য করিতে পারিতেন না; যদি কাহাকেও তদ্রূপ আচরণ করিতে দেখিতে পাইতেন, অমনি, সমুচিত উপদেশের দ্বারা তাঁহার চৈতন্যোদয় করাইয়া দিতেন। গৌরচরিতের এই দুই ভাবকে বৈষ্ণবেরা দ্বিবিধ

নামে অভিহিত করিয়াছেন; একটীর নাম ঐশ্বর্য্যভাব, দ্বিতীয়টীর নাম দাস্যভাব। কিন্তু তাঁহারা এই উভয়কেই গৌরের ঈশ্বরত্বের পরিচায়ক বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

গৌরচন্দ্র ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভাবাবেশ কালে তাঁহার ধর্ম্ম বন্ধুগণ ঈশ্বরবুদ্ধিতে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করেন এবং বিবিধ প্রকারে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। ইহাতে তিনি মনে মনে বড় কষ্ট অনুভব করিতেন এবং নানা সময়ে নানা প্রকারে বন্ধুদিগকে তাহা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু কে বা তাঁহার উপদেশ শুনে? এ বিষয়ে তাঁহার বয়স্যগণ এক প্রকার অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। গৌরের ধর্ম্ম-জীবনের অসামান্য প্রতিভাই যে তাঁহাদিগকে অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাম্যাবস্থায় কোনরূপ অবিহিত আচরণ দেখিলে বিশ্বম্ভরের ক্রোধের সীমা থাকিত না। এ জন্য অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তগণ কেবলই তাঁহার মহাভাবের অবস্থার সুযোগ খুঁজিতেন এবং চুরি করিয়া পদধূলি গ্রহণ, পদতলে মস্তক লুণ্ঠন, পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতি করিয়া আপন আপন মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিতেন। অদ্বৈতই এইরূপ প্রেমিক দলের অগ্রণী জানিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এক দিন কীর্ত্তনে নাচিতে নাচিতে কৌতুকচ্ছলে বলিতে লাগিলেন "আজ আমি নৃত্যে সুখ পাইতেছি না কেন? বোধ হয় কাহারও স্থানে আমার অপরাধ হইয়াছে; কেহ কি চুরি করিয়া আমার প্রতি অযথা আচরণ করিয়াছ বা আমার পদধূলি লইয়াছ? যদি কেহ তাহা করিয়া থাক প্রকাশ করিয়া বল।"

সকলেই ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেন এবং উত্তর দিতে সাহসী না হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন অদ্বৈতাচার্য্য সাহসে ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া যোড়হস্তে বলিতে লাগিলেনঃ—'শুন প্রভু! সাক্ষাতে না পেলেই চুরি করিতে হয়। আমি চুরি করিয়া তোমার পদধূলি লইয়াছি, ইহাতে যদি অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা কর। তোমার যাহাতে অসন্তোষ, তাহা আর কখন করিব না।'

এই কথা শুনিয়া বিশ্বম্ভরের ক্রোধের সীমা থাকিল না; তিনি ক্রোধ-ব্যঞ্জক স্বরে অদ্বৈতকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

'আচার্য্য গোঁসাই! আপনার এ কি ব্যবহার? আপনি কি সংসার শুদ্ধ সংহার করিতে বসিয়াছেন? আমিই কেবল সংসারের অবশেষ আছি

মাকে সংহার করিতে পারিলেই বুঝি আপনার সুখ পূর্ণ হয়? যে আপনার নিকট কৃতার্থ হইতে আইসে, তাহার চরণে ধরিয়া বুঝি সংহার করাই আপনার ব্রত। নির্দ্দয়! আপনার কি মনে নাই পূর্ব্বে মথুরানিবাসী এক পরম বৈষ্ণব আপনার কাছে ভক্তি শিক্ষার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল, আপনি তার কি দুর্দ্দশা করেছিলেন? তাহার চরণ ধূলি লইয়া তাহার চিরন্তনশক্তি ক্ষয় করিয়াছিলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত ভক্তিযোগ ছিল, ভগবান্ কৃপা করিয়া সবই তো আপনাকে দিয়াছেন। তথাপিও আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিদিগের উপর অত্যাচার কেন? আমাকে কি সংহার করিবেন? আপনি চোরের বড় চোর, মহা ডাকাইত! আপনিই আমার প্রেমসুখ চুরি করিয়াছেন।'

শ্রীগৌরাঙ্গের বলিবার অভিপ্রায় এই যে, "আপনি এক জন বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ বৈষ্ণব, মহাভক্ত এবং কৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপাত্র। আপনার এ কোন্ ব্যবহার যে সামান্য ভক্তিপ্রার্থী আপনার নিকট ভক্তিলাভ জন্য আসিলে অযথা বিনয়ে তাহাকে পূজা করেন? তাহাতে তাহার ভক্তিলাভ হওয়া দূরে থাকুক, আপনার স্থানে অপরাধ হইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।" কিন্তু বৈষ্ণবেরা অদ্বৈতকে সংহারকর্ত্তা রুদ্রের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাই বৃন্দাবন দাস মহাশয় বিশেষ নিপুণতা সহকারে কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে যে কেবল দ্ব্যর্থ আছে তাহা নহে; এক 'সংহার' শব্দ বিভিন্নার্থে প্রযুক্ত হইয়া ভাব বৈচিত্র্যের সুকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা হউক, বিশ্বম্ভর অল্পে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি অদ্বৈতকে বলিলেন,—'তুমি আমার প্রেম চুরি করিয়াছ; আমি কি পারিনে? এই দেখ চোরের উপর বাটপাড়ীকরি'।

যে কথা সেই কাজ; গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে অদ্বৈতের চরণ যুগল ধরিয়া বল পূর্ব্বক আপন মস্তকে লইয়া ঘসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপিতে লেপিতে বলিতে লাগিলেন "বন্ধুগণ! দেখ দশ দিন চোরের, এক দিন সাধুর। আজ চোর ধরিয়াছি, অল্পে ছাড়িব না; পূর্ব্বাহৃত সকলই আদায় করিয়া লইব।"

অদ্বৈত গৌরের সহিত বলে না পারিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন না; তখন অনন্যোপায় হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! ছাড়; তোমার ইচ্ছার অন্যথাচরণ করা কাহার সাধ্য? তুমি যাহার শাস্তি দাও,

কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। আমার এ প্রাণ মন দেহ সকলই তোমার, বিনা অপরাধে আমাকে কেন অপরাধী করিয়া নষ্ট করিতেছ?"

বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন "এমন কথা মুখে আনিবেন না; আপনি ভক্তি ভাণ্ডারী ও সকলের গুরু; ভক্তিলাভ জন্য আপনার সেবা করিতেছি। আপনার চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে কৃষ্ণপ্রেমরসসাগরে ভাসিতে পারা যায়। আমি সত্য বলিতেছি, আপনি ভক্তি না দিলে আমাদের উহা পাইবার উপায় নাই।"

শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিলে দর্শকমণ্ডলী মনে করিলেন "অদ্বৈতের প্রতি প্রভুর অপার কৃপা, আর আমরা ধন্য যে এইরূপ ভক্তের উপদেশ লাভ করিতেছি।" যে উদ্দেশে বিশ্বম্ভর এই কার্য্য করিয়াছিলেন, ভক্তগণের অন্ধবিশ্বাসে তাহার বিপরীত ফল ফলিল। গৌরাঙ্গ আপনার সামান্যত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই আচরণ দেখাইলেন; ভক্তগণ তাহা অসামান্যত্বে পর্য্যবসিত করিয়া ফেলিল। এই রূপেই ধর্ম্ম জগতের কুসুমকাননে কুসংস্কার কণ্টকলতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

নিত্যানন্দের সমভিব্যাহারে শচীনন্দন মধ্যে মধ্যে অপরাহ্ন সময়ে নগর ভ্রমণে যাইতেন। এক দিন ভ্রমণ সময়ে এক দল পাষণ্ডীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের এক জন বলিল "ওহে নিমাই পণ্ডিত! ভাই তোমার একটা অমঙ্গল সংবাদ শুনিলাম; তাই বন্ধুভাবে তোমাকে জানাইতে যাইতেছিলাম। তুমি রাত্রিতে গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সংকীর্ত্তন না কি কর? লোকেরা বাড়ীর মধ্যে যাইতে না পারিয়া তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়াছে; শুনিলাম দেওয়ান হইতে তোমাকে ধরিবার জন্য পাইক আসিতেছে।" গৌর হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "অনেক দিন হইতে আমারও রাজদর্শন করিতে ইচ্ছা আছে; এত পরিশ্রম করিয়া শাস্ত্রাদি পড়িলাম, বালক জ্ঞানে কেহ তাহার আদর করে না; রাজসমীপে বিদ্যালোচনা করিতে পাইলে আমার বিদ্যার পুরস্কার হইতে পারিবে।"

পাষণ্ডী বলিল—"রাজা যবন, তোমার বিদ্যাচর্চ্চা শুনিবে না, তোমার কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া দিতে রাজদূত আসিবে।"

"আচ্ছা! দেখা যাইবে" অবজ্ঞার সহিত এই কথা বলিয়া বিশ্বম্ভর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাত্রিকালে যথা সময়ে শ্রীবাসগৃহে ভক্তগণ একত্রিত হইলে গৌরচন্দ্র বলিলেন, "আজ নগরে পাষণ্ডী সম্ভাষ হইয়াছে; ভাল করিয়া

ীর্ত্তন কর, হৃদয়ের অবসাদ ঘুচিয়া যাউক।" কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে বিশ্বম্ভর ুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আজ আমার হরিনামে প্রেম হই-তছে না কেন? পাষণ্ডীসম্ভাষা হইয়াছে বলে? না তোমাদের কাহারও ম্বন্ধে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া? যদি তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে অপরাধ ইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর।"

অদ্বৈতাচার্য্য এক দিকে নৃত্য করিতেছিলেন, তিনি পরিহাসব্যঞ্জক ভাবে লিলেন, "প্রেম আর কোথা পাবে? তোমার সব প্রেম যে অদ্বৈত শুষিয়া ইয়াছে?" তাহার পর একটু অভিমান ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিতে াগিলেন:—"এখন আর শ্রীবাস, অদ্বৈত কোথায় প্রেম পাইবে? এখন ্র তিলি মালীর সঙ্গে বাজারে বাজারে প্রেমের বিলাস হচ্চে; আর অবধূত প্রেমের ভাণ্ডারী হয়েছে। দেখ প্রভু! যদি সত্য সত্যই আমাদের প্রেম-যোগে বঞ্চিত হইতে হয়, তবে নিশ্চয়ই তোমার সব প্রেম শুষিয়া লইব।"

গৌরচন্দ্র কাহারও কোন অযথাচরণ দেখিতে পারিতেন না। অদ্বৈতের এই স্বার্থ ও হিংসাপূর্ণ বাক্যে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিল না। সভাস্থ সকলেই এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। গৌরচন্দ্র কাহাকেও কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে দ্বারমুক্ত করিয়া বেগে দৌড়িয়া চলিয়া গেলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁহার হৃদয়ের গভীরভাব বুঝিতে পারিয়া পাছে পাছে দৌড়িয়া চলিলেন; কিন্তু তাঁহারা যাইবার পূর্ব্বেই বিশ্বম্ভর "প্রেম-ন্য দেহ রাখিয়া কি কাজ?" বলিয়া গঙ্গার জলস্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া-ছিলেন। নিত্যানন্দ, হরিদাস পাছে আসিতে আসিতে শব্দ শুনিয়া সেই স্থানে লম্ফ দিয়া পড়িলেন ও নিতাই তাঁহার দীর্ঘ কেশ ধরিয়া টানিয়া আনিলেন, আর হরিদাস সাঁতার দিতে দিতে চরণ যুগল ধরিয়া স্কন্ধে করিয়া ়লেন। সৌভাগ্য, ক্রমে কোন অত্যাহিত হইল না। অন্ধকার রজনী, জন্য বাহিরের লোক কেহ জানিতে পারিল না। যখন দুই জন াহাকে তীরে তুলিলেন, তখন গৌরচন্দ্র বলিতে লাগিলেন:—'তোমরা ামাকে তুলিলে কেন? প্রেমহীন জীবন রাখার ফল কি?' নিতাই উত্তর ়রিলেন:—"মরিবে কেন?"

গৌর। তুমি পরম উদার, সদাই হরিপ্রেমে বিহ্বল; তাই এরূপ ়ছো।

নিতাই। প্রভু ক্ষমা কর; যাহাদের অপরাধের সকল শাস্তি দিও

পার, তাদের একটা কথার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন দেওয়া কি শোভা পায়, অদ্বৈত না হয় অভিমান করিয়া দুকথা বলেছেন, তা বলে কি এরূপ কা করা উচিত? তুমি মরিলে কি তিনি বাঁচিবেন? অসময়ে এই প্রেমের হা ভেঙ্গে দিলে যে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না।

গৌরাঙ্গ মনে মনে নিত্যানন্দের উদার প্রেমের শত প্রশংসা করি বলিলেন, "নিত্যানন্দ! হরিদাস! তোমরা আমার পরম বন্ধু; তোমাদে কথা আমি কখন অন্যথা করিতে পারি না। কিন্তু তোমাদিগকে আমা এই অনুরোধ যে, আজকার বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারি না; আমার সঙ্গে যে তোমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, এ কথাও যেন অদ্বৈ প্রভৃতি জানিতে না পারেন; আর তোমরা এখনই এস্থান হইতে প্রস্থা কর, আমি আজ এইখানে কাহারও বাড়ীতে রজনী যাপন করিব।"

নিত্যানন্দ হরিদাস অগত্যা এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া চলিয়া গে বিশ্বম্ভর ধীরে ধীরে নিকটস্থ নন্দন আচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন। আচার্য গৌরের ভক্তদলভুক্ত; তাঁহাকে আর্দ্রবস্ত্রে উপস্থিত দেখিয়া অতি যত্নে বস্ত্রত্যাগ করাইলেন এবং সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত অতিথি সৎকা করিলেন। সমস্ত রাত্রি গৌরচন্দ্র নন্দন আচার্য্যের সঙ্গে কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন।

এ দিকে শ্রীবাসের গৃহে ভক্তদলমধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল অদ্বৈতাচার্য্য দুঃখে, অনুতাপে বড়ই অপ্রতিভ হইয়া গৃহে যাইয়া অনশ শয়ন করিয়া রহিলেন। ভক্তদল অনেক অনুসন্ধান করিয়া গৌরের দে না পাইয়া শোকে বিমর্ষে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোন মতে রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। পরদিন প্রাতেঃ গৌরচন্দ্র পূর্ব্ব রাত্রির অনুষ্ঠিত গী বিকর্ম্ম স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইলেন, এবং অল্প কারণে অদ্বৈতের মনে দিয়াছেন মনে করিয়া লজ্জিত ও সন্তপ্ত হইয়া নন্দন আচার্য্যকে বলিলে "তুমি গোপনে একা শ্রীবাস পণ্ডিতকে এখানে ডাকিয়া লইয়া আইস কিছুকাল পরে নন্দন পণ্ডিতজীকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলে শ্রী গৌরচন্দ্রের দর্শনমাত্র কাঁদিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন, "রোদনে প্রয়োজন নাই, আচার্য্য কেমন আছেন বল।"

"আরও আচার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা কর? তিনি কাল হইতে উপবা [illegible] কি আছে যে কাঁদিয়া আছেন, তাহা বর্ণনাতীত। শুধু আচা

কন? ভক্তগণ সকলেই শোকসাগরে মগ্ন। তুমি যে সকলের প্রাণ, তাও জান না? তোমাকে ছাড়িয়া কি জীবিত থাকা যায়?"

"আচ্ছা তবে চল আচার্য্যের ওখানে যাইয়া মিলজুল করা যাক্।"

অতঃপর তিন জন অদ্বৈতভবনে যাইয়া দেখেন যে, আচার্য্য শয়নকক্ষে শায়িত; আপনাকে মহা অপরাধী জ্ঞানে মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন এবং থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন। গৌরচন্দ্র শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আচার্য্য! উঠিয়া দেখুন বিশ্বম্ভর অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাহিতেছে।" অদ্বৈত প্রথমতঃ লজ্জায় কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না; গৌরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ ডাকিলে উত্তর করিলেন, "আমি আর কি বলিব প্রভু? আমার কি আর কথা কহিবার মুখ আছে?"

গৌর। "গত ব্যাপার সব ভুলিয়া যান্; উঠিয়া নিত্যকৃত্য সমাধান করুন্ এবং সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করুন্।"

অদ্বৈত্য। "আমার এই পাপমতি বিশুদ্ধ না হইলে আর কিছুই করিব না। তুমি প্রভু! আর আর সকলকে কেমন দাস্যভাব দিয়েছ; আর যত কুমতি, অহঙ্কার, রাগ আমার ভাগ্যে দিয়েছিলে; যাহা কিছু মন্দ, তাই আমার কাজ! তা তুমি যখন এই সব কুপ্রবৃত্তি দিয়া কুকার্য্যে মন লওয়াও, তাহার সমুচিত দণ্ড না দিলে উদ্ধার হইব কেন? আর সে দণ্ড বহন করিতে পরাঙ্মুখ হইলেই বা চলিবে কেন? আমি সত্য বলিতেছি এই দেহ, মন প্রাণ, ধন সকলই তোমার। এ সব লইয়া তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার। তবে আমার প্রার্থনা এই যে, আমাকে দাস্যভাব দিয়া দাসীপুত্র করিয়া চরণে স্থান দাও।"

গৌর। 'আমাকে আপনি এরূপ কেন বলিতেছেন? এক কৃষ্ণই মহারাজ রাজেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের সকলই তাঁহার শাসনাধীন; ব্রহ্মা, শিব, সকলেই তাঁহার আজ্ঞাকারী ভৃত্য; তিনি যাহাকে যাহা করিতে শক্তি দিয়াছেন, সে তাহাই করিতে পারে। শুভ কর্ম্মের পুরস্কর্ত্তাও তিনি, মন্দ কর্ম্মের দণ্ডদাতাও তিনি। কিন্তু তাঁহার দণ্ড জীবের মঙ্গল উদ্দেশেই হইয়া থাকে। আমি মনে করি, তাঁহার প্রসাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপেক্ষা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি অধিক সৌভাগ্যশালী। দণ্ড না পাইলে মোহমুগ্ধ জীবের প্রভুর আজ্ঞা পালনে ইচ্ছা হয় না; মঙ্গলের দিকে চেতনা হয় না। কোন দণ্ড না পাইয়াই বা তাঁহার কোন্ দাস জগতে তাঁহার মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিছে

পারিয়াছেন? যাঁহারা তাঁহার প্রিয় ভৃত্য, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া কেবল তাঁহাদেরই দণ্ড দিয়া থাকেন; দণ্ড তাঁহাদের নিকট প্রসাদ।" দাস ভিন্ন এই মহা প্রসাদ অন্যের পাইবার অধিকার নাই।

"অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে,
জন্মে জন্মে দাস সেই, বলিনু তোমারে।"

বিশ্বম্ভরের এই সার গর্ভ উপদেশ শ্রবণে অদ্বৈতের বিমর্ষ ভাব চলিয়া গেল, হৃদয় হঠাৎ উৎসাহে পূর্ণ হইল। এবং তিনি এক লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে ভূমিতে নামিয়া হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে উপরোক্ত মহাবাক্য আবৃত্তি করিতে লাগিলেন:—

"অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে,
জন্মে জন্মে দাস সেই বলিনু তোমারে।"

অদ্বৈত তখন উৎসাহপূর্ণবাক্যে সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভক্তগণ! সুসমাচার শ্রবণ কর, তোমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলে যে, কৃষ্ণ কেবল পাপীরই দণ্ড দাতা; তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ যে তাঁহার দণ্ডার্হ, তাহা আর কখন শুন নাই। তোমরা এখন বুঝিতে পারিলে যে দণ্ড মহাপ্রসাদ। যখন আমরা দণ্ড পাইব, তখনই সৌভাগ্যশালী কৃষ্ণদাস মনে করিব। আর চিন্তা কি? পাষণ্ডীদিগেরই বা ভয় কি? আমরা যখন দণ্ড প্রসাদ পাইয়াছি, তখন আমাদের ন্যায় সৌভাগ্যশালী আর কে আছে! বন্ধুগণ! এস গগন মেদিনী পূর্ণ করিয়া আজ সিংহরবে হরিনাম সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই।"

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব নাট্য-রঙ্গ।

একদিন বৈষ্ণব সভায় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচার করিয়া দিলেন "আজ বিবিধ সাজে সজ্জিত হইয়া খুব ঘটা করিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে হইবে; আমি রুক্মিণী ও আদ্যাশক্তির বেশে নৃত্য করিব; নিত্যানন্দ আমার বড়াই সাজিবেন। গদাধর গোপিকা হইবেন, ব্রহ্মানন্দ সুপ্রভা নামে তাঁহার সখী সাজিবেন; এবং ভক্তগণকে যথোপযুক্ত সাজ সাজিতে হইবে।" গৌরের এ অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া ভক্তগণের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না, সভামধ্যে

মানন্দ পূর্ণ কোলাহল হইতে লাগিল এবং সকলেই নূতন উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া আপন আপন সাজের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! আমি কি সাজিব?"

"তুমি বৈকুণ্ঠের কোটাল।"

শ্রীবাস বলিলেন "আমার সাজটা কি?"

"তুমি দেবর্ষি নারদ।"

অদ্বৈত অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়?"

বিশ্বম্ভর হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন "আপনারই তো সব, যখন যে সাজ পরিতে ইচ্ছা হইবে, তাই পরিবেন।"

অদ্বৈতের আনন্দের সীমা নাই; বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া তখন ভ্রূকুটি করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন; এবং মহা বিদূষকের ন্যায় পরিহাসজনক অসম্বদ্ধ কথা কহিতে লাগিলেন, শুনিয়া বৈষ্ণবদলের মধ্যে হাসির তরঙ্গ উঠিয়া গেল। শ্রীবাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ শ্রীমান্ পণ্ডিত সভার এক প্রান্তে বসিয়া ছিলেন; একে একে যখন সকলেরই সাজের কথা শেষ হইয়া গেল, অথচ কেহই তাঁহার নাম করিল না; তিনি হর্ষবিষাদে বলিয়া উঠিলেন, তবে আমি আর কি সাজিব? আপনারা সকলে সাজিয়া গুজিয়া নাচিবেন, আমি হাড়ীর মত মশালজী হইয়া আপনাদের মশাল ধরিব।"

এই কথায় একটা মহা হাসির প্রবাহ উঠিয়া পড়িল।

তখন বিশ্বম্ভর একটু গম্ভীরভাবে কার্য্য প্রণালীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দলের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত খান ধনাঢ্য ও গণ্যমান্যব্যক্তি; তাঁহার দিকে তাকাইয়া গৌর বলিলেন "আপনাকে এই ব্যাপারের অধ্যক্ষতা করিতে হইবে, শঙ্খ, কাঁচুলি, পট্টবস্ত্র, অলঙ্কারাদি বেশভূষা, যাহা লাগিবে, সে সমুদায়ের আপনি সরকরাহ করিবেন; চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বৃহৎ প্রাঙ্গণে রঙ্গভূমি হইবে; সেখানে দশ বারটী চন্দ্রাতপ খাটাইয়া একটী নাটমণ্ডপ করিতে হইবে এবং অভ্যাগতদিগের আসনের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আর আমাদিগের দলস্থ বৈষ্ণবদিগের পরিবারের মহিলাদিগকে দর্শন শ্রবণ জন্য নিমন্ত্রণ করা হইবে; তাঁহাদিগের বসিবার জন্য উপযুক্ত স্থান যবনিকাচ্ছাদন দিয়া রাখিতে হইবে। আপনার সাহায্যের জন্য যাঁহাকে যাঁহাকে প্রয়োজন, লইয়া সত্বরেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।" বুদ্ধিমন্ত খান, সদাশিব প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ কার্য্যোদ্যোগে যাত্রা

করিলেন। তখন গৌরচন্দ্র মুকুন্দ দত্তকে বলিলেন "সংকীর্ত্তন, গান, বাজনার ভার তোমার উপর থাকিল; যে প্রকারে তাহা সুসম্পন্ন হয়, তাহার দায় তোমার।" এই বলিয়া যে যে ভাবের যেমন যেমন গান করিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিলেন। অপরাহ্নে বৈষ্ণবগণ চন্দ্রশেখরের গৃহে একত্রিত হইলে বুদ্ধিমন্ত খান গৌরচন্দ্রকে লইয়া রঙ্গস্থল, সাজঘর, সাজসজ্জা, ও বসিবার স্থানাদি একে একে সকল দেখাইলে, তিনি সকল কার্য্যের অতি সুবন্দোবস্ত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সকল ঠিক্ ঠাক্ হইলে গৌরচন্দ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী মধ্যে বলিলেন, 'কিন্তু একটা কথা আছে; জিতেন্দ্রিয় ভিন্ন এই অভিনয় দেখিতে কাহারও অধিকার নাই। যাহারা ইন্দ্রিয় ধারণে অসমর্থ, এবং রমণীয় রমণী মূর্ত্তির লাবণ্যকলা, হাব ভাব কটাক্ষ, এবং নৃত্যগীত দর্শনে যাহাদের মনে কুভাব উত্তেজিত করে; অদ্যকার রঙ্গস্থলে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই।'

নুতন বিধানে নূতন রঙ্গ হইবে শুনিয়া বৈষ্ণবদলের অতিশয় আনন্দ হইয়াছিল; কিন্তু এই কথা শুনিয়া এখন সকলেই বিষণ্ণভাবে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি অজিতেন্দ্রিয়; এ রঙ্গ দর্শনসুখ তবে আমার কপালে নাই।' অদ্বৈতাচার্য্য প্রথমে নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা ভূমিতে একটী রেখা টানিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তবে আমার নৃত্য দর্শনে কাজ নাই, আমি তো ইন্দ্রিয় ধারণে সমর্থ নই।'

শ্রীবাস বলিলেন 'আমারও ঐ কথা।' তখন আর আর বৈষ্ণবেরাও বলিয়া উঠিলেন, 'আমাদেরও ঐ কথা।'

গৌরচন্দ্র তখন হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন "তোমরা না গেলে কাহাকে লইয়া নৃত্য? তোমাদের লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলা হয় নাই; বহির্মুখ লোকদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তোমরা মহা যোগেশ্বর, তোমাদের কেন মোহ হইবে?" গৌরের এই কথা শুনিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। এ দিকে সন্ধ্যা হইলে সকলে রঙ্গস্থলে সমাগত হইলেন; গৌরের সংকীর্ত্তনদলের পূর্ণশক্তি আজ উপস্থিত; লোকে পটমণ্ডপ পূর্ণ হইয়া গেল। শচী মাতা বধূ সঙ্গে, মালিনী দেবী মাতা ও ভ্রাতাদিগকে লইয়া, সীতা ঠাকুরাণী পরিজনদিগের সমভিব্যাহারে একে একে আসিয়া যবনিকার অন্তরালে বসিলেন; এবং আর আর বৈষ্ণবমহিলাগণও আসিয়া নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের পত্নী তাঁহাদের যথাযোগ্য

সমাদর করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরি আচার্য্যের গৃহদেবতা গোপীনাথ-বিগ্রহকে সাজাইয়া সিংহাসনে বার দিয়া বসান হইল। প্রথমে বন্দনা সংকীর্ত্তনের পর নাট্য আরম্ভ হইল। পালাটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম প্রহরের নাট্য ও দ্বিতীয় প্রহরের নাট্য। পাঠক মহাশয় মনে করিতে পারেন যেন একখানি নাটকের দুইটী অঙ্ক। বন্দনা-সংকীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে রঙ্গস্থল নীরব, সকলেই সাজঘরের দিকে তাকাইয়া পাত্র সন্নিবেশের অপেক্ষা করিতেছেন; অদ্বৈতাচার্য্য বহির্ভাগে দর্শক-দীর মধ্যে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ ঝম্প দিয়া নাচিতে নাচিতে কত মত ভঙ্গি করিতে লাগিলেন। তাহাতে দর্শকমণ্ডলী হাসিয়া অস্থির হইল, : সকলেই আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে হাস্যতরঙ্গ রাহিত হইলে হরিদাস ঠাকুর মুরারি গুপ্তকে সঙ্গে লইয়া কোটালবেশে স্থলে প্রবেশ করিলেন। কৃত্রিম মহা গোঁপ ওষ্ঠোপরি বিরাজ করি-ছে, মস্তকে একটী বৃহৎ পাগড়ী, পরিধেয় মালকোচামারা ধটী, এবং হস্তে গাছি স্থূল বৃহৎ যষ্টি শোভা পাইতেছে।

প্রবিষ্ট হইয়াই হরিদাস চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বলিতে গিলেন, "আরে ভাই! সাবধান! আজ জগৎপ্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ লক্ষ্মী-শ নাচিবেন; তোমরা সাবধানে রিপু সংযম কর; আর কৃষ্ণ বলে গে থাক।"

হরিদাসের বেশ ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী হাসিতে লাগিলেন। জন উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "তুমি কে? এখানে কি জন্য?" হরিদাস হাতে গোঁপ মুচড়াইতে মুচড়াইতে উত্তর করিলেন:—"আমাকে চেন? আমি বৈকুণ্ঠের কোটাল; চিরকাল লোক জাগাইয়া বেড়ান আমার জ। ভগবান্ সম্প্রতি প্রেমভক্তি লুটাইতে আসিতেছেন; আজি লক্ষ্মীর নৃত্য হইবে। তোমরা সব সাবধান পূর্ব্বক ভক্তিভাণ্ডার লুট।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" বলিতে বলিতে তিনি ভূমি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীবাসপণ্ডিত দেবর্ষি নারদের বেশে সভাস্থলে উপনীত লেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তিলক, মালা শোভা পাইতেছে; আবক্ষলম্বিত র্পক শ্মশ্রুতে মুখমণ্ডল সজ্জিত; স্কন্ধে বীণা লম্বিত এবং হস্তে কুশাবলি। মাই পণ্ডিত কক্ষে আসন ও হাতে কমণ্ডলু ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ ভৃত্য বেশে আসিলেন। সভামধ্যে আসিয়া রামাই আসন বিস্তার করিলে দেবর্ষি তদুপরি সমাসীন হইলেন।

শ্রীবাসের নারদবেশ দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তখন মহাগম্ভীর ভাবে দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"আপনি কে? এখানে কি নিমিত্ত আসিলেন?"

নারদবেশী শ্রীবাস উত্তর করিলেন, "আমি কৃষ্ণের গায়ক, নারদ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই আমার গতিবিধি, হরিনামগান করিয়া সকলকে শুনাইয়া থাকি। সম্প্রতি আমি বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলাম, সেখানে শুনিলাম যে কৃষ্ণ এখন নদীয়া নগরে আসিয়াছেন। তাই অতি ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলাম।"

অদ্বৈত। আমাদের একটা হরিনাম শুনান না কেন?

তখন শ্রীবাস বীণাঝঙ্কার দিয়া অতি মধুর স্বরে হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিকের ঐকান্তিকতামিশ্রিত সংগীত শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ফলতঃ নারদের সাজটী শ্রীবাসকে এমনি সুন্দর মানাইয়াছিল যে, তাঁহার রূপ দেখিয়া, কথা শুনিয়া এবং প্রয়োগ-পটুতা লক্ষ্য করিয়া কেহই তাঁহাকে দেবর্ষি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি ভাবিতে পারেন নাই। মহিলামহলে পণ্ডিতের ভাবদর্শনে মহা আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। সকলেই মালিনী দেবীর দিকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে লাগিলেন। শচীমাতা সোজা সরলমতি; তিনি আস্তে আস্তে মালিনীর নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "ও বউ! এই কি পণ্ডিত?"

মালিনী মাথা হেঁট করিয়া উত্তর করিলেন, "লোকে তাই ত বলিতেছে।"

এদিকে রুক্মিণীর ভাবে বিভোর হইয়া ও রুক্মিণীর বেশধারণ করিয়া শচীনন্দন আস্তে আস্তে রঙ্গস্থলে আসিয়া উপনীত হইলেন; তাঁহার সঙ্গে সুনন্দ নামে ব্রাহ্মণ অল্প দূরে দণ্ডায়মান। বিদর্ভাধিপতি রাজা ভীষ্মকের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রুক্মী ও কন্যার নাম রুক্মিণী। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপটে দর্শন করিয়া ও তাঁহার রূপ, গুণ, শৌর্য্য, বীর্য্যের কথা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী অনেক দিন হইতে তাঁহাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। রাজা ভীষ্মক পরম্পরায় কন্যার এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঐ বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু [illegible] রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের [illegible] বিদ্বেষী। তিনি নানা প্রকারে

পিতার মত পরিবর্ত্তন করিয়া দামঘোষের পুত্র শিশুপালের সঙ্গে ভগিনীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন এবং বিবাহের দিন সুস্থির করিয়া মহা সমারোহে তাহার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ব্যাপারে বিদর্ভদুহিতার পরিতাপের অবধি থাকিল না। তিনি কৃষ্ণানুরাগে অনুরাগিণী হইয়া প্রাণমন সকলই কৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়াছেন; সুতরাং দামঘোষের পুত্রকে বিবাহ করিতে হইবে শুনিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তায় প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল; নয়ন দিয়া অবিরল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল; এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবেন, তাহার চিন্তায় দিনযামিনী অতিবাহিত হইতে লাগিল। রাজপুরীতে এমন কেহ নাই যে, তাঁহার সহিত সহানুভূতি করে বা তাঁহাকে সৎপরামর্শ দেয়। অবশেষে বালিকা এক দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। সুনন্দ নামে একজন বৃদ্ধ পরিচিত ব্রাহ্মণ বাল্যকালে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন; তাঁহাকেই তিনি গোপনে আপন শয়নকক্ষে ডাকাইয়া সমস্ত অবগত করিয়া স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত দ্বারিকায় পাঠাইলেন। এই শয়নকক্ষের দৃশ্য নাটকে দেখাইবার জন্য শচীনন্দন রঙ্গস্থলে উপনীত। গৌর যখন যাহা করিতেন, তাহার সহিত একেবারে মনপ্রাণে মিশিয়া যাইতেন; সুতরাং তাঁহার অভিনয়ে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নাই। তিনি সত্য সত্যই আপনাকে বিদর্ভদুহিতা জ্ঞান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আকুল হইয়া উঠিলেন। এবং ভাগবতের যে সাতটী শ্লোকে রুক্মিণীর পত্র বর্ণিত আছে, কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারই ভাবে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"হে ভুবন সুন্দর! তোমার সুশীতল গুণের কথা শ্রবণবিবর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিলে, কাহার প্রাণ না পরিতৃপ্ত হয়? তোমার রূপ দর্শনে কোন্ নিধি না লাভ হয়? বিধাতা যাহাকে চক্ষুঃ দিয়াছেন, সে চিরদিন উহা দেখুক। আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, তোমার রূপ গুণের কথা শুনিয়া আমার হৃদয় লজ্জা ত্যাগ করিয়া তোমাতে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। হে মুকুন্দ! তুমি কি আমাকে নির্লজ্জ বলিয়া ঘৃণা করিবে? না—তা তুমি পার না। বুদ্ধিমতী কন্যারা কি তোমাকে পতিত্বে বরণ না করিয়া থাকিতে পারে? হে বীর! আমি প্রাণমন সকলই তোমাতে সমর্পণ করিয়া তোমার বস্তু হইয়াছি; নিজ বস্তু গ্রহণ কর। দেখো যেন চেদিরাজ আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। সিংহের বস্তু কি শৃগালে লইবে? হে

অজিত! কল্য বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। তুমি শীঘ্র আসিয়া বিপক্ষের সৈন্যনাশ করিয়া ভবানীর মন্দির হইতে আমাকে হরণ করিয়া রাক্ষস বিধানে বিবাহ কর। উমাপতি প্রভৃতি দেবগণ তোমার চরণ রজে স্নান করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। ঐ পদধূলি দিয়া যদি দাসীকে এ সঙ্কটে রক্ষা না কর; তবে আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, উপবাসাদি দ্বারা আমার এই শরীর কৃশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। তাহাতে এক জন্মে না পাই, বহু জন্মেও তো তোমাকে পাইতে পারিব।" শচীনন্দন সজল নয়নে পত্রখানি পাঠ করিয়া সুনন্দের হাতে দিয়া মৃদু মন্দ স্বরে তাহাকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র কৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়া দুঃখিনীর এই কথাগুলি জানাও।"

গৌরচন্দ্র নীরব হইলেন, চারিদিকে উল্লাসের সহিত হরিধ্বনি হইতে লাগিল; যবনিকার অন্তরাল হইতে পুরস্ত্রীরা শঙ্খ নিনাদ করিতে লাগিলেন; মৃদঙ্গ করতাল যোগে মুকুন্দের দল সংকীর্ত্তন জুড়িয়া দিল; শ্রীবাস পণ্ডিত নারদ বেশে নাচিতে লাগিলেন; হরিদাস কোটাল বেশে 'জাগো! জাগো!' করিয়া উঠিলেন এবং দেখিতে দেখিতে প্রথম প্রহরের নাট্য শেষ হইয়া গেল। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর দ্বিতীয় প্রহরের নাট্য আরম্ভ হইল। এবারে মাধবনন্দন গদাধর পরম সুন্দরী গোপীবেশে রঙ্গ স্থলে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ সুপ্রভা সখী সাজিয়া আসিয়াছেন। অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রহরের পাত্রগণ আপন আপন বেশে শ্রোতৃমণ্ডলী মধ্যে আসীন; কেবল নিতাই গৌর সভাস্থলে নাই। রমণীদ্বয় রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলে হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? এত রাত্রে এখানে যুবতী স্ত্রীলোক কেন?"

সুপ্রভাবেশী ব্রহ্মানন্দ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "রামচন্দ্র খানের আদেশে তোমার বৈরাগ্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতে আসিয়াছি।" এই কথায় একটা হাস্য তরঙ্গ উঠিয়া গেল।

হরিদাস গম্ভীর স্বরে পুনরায় বলিলেন, "কে তোমরা বল?"

"আমরা বৃন্দাবনের আহীর নন্দিনী।"

"কোথায় যাইতেছ?"

"মথুরায়।"

শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিলেন—"গোকুলের কাহার বনিতা?"

"জানিবার প্রয়োজন আছে।"

ব্রহ্মানন্দ শ্রীবাসের কথা পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন, "জানিবার প্রয়োজন থাকিলেও আমরা তোমার কথার উত্তর দিব না।"

গঙ্গাদাস পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ রাত্রিতে থাকিবে কোথায়?"

"কেন তোমার বাড়ীতে?"

গঙ্গাদাস। 'স্ত্রীলোকটা বাচাল দেখ! দূর দূর।'

ইত্যবসরে অদ্বৈতাচার্য্য উঠিয়া বলিলেন, "তোমরা কি বাক্‌চাতুরী করিতেছ? পরনারী মাতৃসমা, ইহাদের সঙ্গে কলহ করা ভাল দেখায় না।" এই বলিয়া রমণীদ্বয়কে বলিলেন. "ওগো বাছারা! তোমরা কি নৃত্যগীত করিতে জান? আমার বোধ হচ্ছে তোমরা সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদা।"

সুপ্রভা। কিসে আপনার বোধ হলো?

অদ্বৈত। এই রকম সকমে।

সুপ্রভা। আপনার তো খুব নাড়ীজ্ঞান দেখ্‌ছি?

অদ্বৈত। কম দেখ্‌লে কিসে?

সুপ্রভা। গৃহস্থের মেয়েকে নাচ্‌তে গাইতে বল্‌ছ, তাইতে?

অদ্বৈত। তোমরা গোপকন্যা। গোপীগণের মধ্যে হরিগুণ গান না করিতে পারেন, এমন কাহাকেও দেখি না। কেন মহারাসের রজনীর কথা কি মনে নাই?

গদাধর গোপীবেশে এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, এখন বলিলেন 'মহাশয়! কৃষ্ণ ভিন্ন তো আমাদের নাচ গান হয় না। কৃষ্ণ কই যে নাচিব গা'য়িব?'

অদ্বৈত। কৃষ্ণ এইখানেই আছেন; তোমরা নৃত্য গীত আরম্ভ করিয়া দিলেই তাঁর আবির্ভাব হইবে।

এবার রমণীদ্বয়ের আর কথা বলিবার যো নাই। আচ্ছা বলিয়া তাঁহারা মৃদু মন্দ কণ্ঠ ধ্বনিতে সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন; মুকুন্দ দত্তও আপনার কলকণ্ঠ তাঁদের স্বরের সহিত মিশাইয়া দিলেন। তখন মৃদঙ্গ মন্দিরা তাড়িত মনোহর বাদ্যধ্বনির সঙ্গে মধুর সঙ্গীতলহরী নৈশ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল; শ্রোতৃমণ্ডলী নিস্পন্দ বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। গদাধর রাধিকা আবেশে বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত সঙ্গীত ধানশীরাগে গাইতে লাগিলেন।

"সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়?
সোই পিরীতিঅনুভব বাখানিতে অনুক্ষণ নৌতুন হোয়।
জনম অবধি হাম্, রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল;
লাখ লাখ যুগ হাম্, হিয়া হিয়ে রাখিনু,
হৃদয় না জুড়ন গেল।
বচন অমিয়া রস, অনুক্ষণ শুনমু;
শ্রুতিপথে পরশ না ভেলি;
কত মধুযামিনী, রভসে গোঁয়াইনু,
না বুঝনু কৈছন কেলি।"

গাইতে গাইতে গদাধরের অশ্রু, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি সাত্তি
ভাবের উদয় হইল; নয়নযুগল দিয়া অবিরল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল
তখন তিনি মহাভাবে বিভোর হইয়া আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গি
আবার গাইতে লাগিলেন:—

"বঁধু কি আর বলিব আমি?
মরণে জীবনে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি।
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসি;
সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া,
নিশ্চয় হইলাম দাসী।"

রাধিকারূপিণী গদাধর দিশাহারা হইয়া এই নিবেদন গাইতে গাই
নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুগঠিত অঙ্গ গুলি যখন মৃদুমন্দ আন্দো
লিত হইতে লাগিল; শ্রীরাধিকার মত শ্যামবঁধুর রূপদর্শনে যখন তাঁহ
অধর ওষ্ঠ অর্দ্ধ বিকশিত কুন্দ কুসুমের ন্যায় হাসি বিস্ফারিত হইল; না
দিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল; রোমাবলি কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তখন
এক স্বর্গের ভাব আবির্ভূত হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। দর্শকমণ্ড
দেখিয়া শুনিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া গেল।

রিবারের প্রধানা প্রকৃতি। যাহা হউক, অনেকক্ষণ পরে মাধব নন্দনের
ত্যাবসান হইলে গৌরচন্দ্র আদ্যাশক্তির রূপ ধারণ করিয়া বৃদ্ধা বড়াই
পিণী নিত্যানন্দকে অগ্রে করিয়া রঙ্গে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অপরূপ
পমাধুরী দেখিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।
খিত আছে যে, গৌর এরূপ চমৎকার সাজ সাজিয়া ছিলেন যে, তাঁহার
রমাত্মীয়, এমন কি জননী পর্য্যন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। নিত্যা-
দ বড়াই সাজে অঙ্গ বঙ্ক করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে মহাপ্রভুর আগে আগে
সিতেছিলেন বলিয়াই সকলে গৌরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; নইলে
জ দেখিয়া কাহারও চিনিবার যো ছিল না। গৌরের ভাব দর্শনে কোন্
ক্তি অবতীর্ণা হইলেন, বুঝিতে না পারিয়া নানা জনে নানা রূপ চিন্তা
রিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন 'একি সিন্ধুকন্যা কমলা আসিলেন?
রামগৃহিণী জানকী? আর একজন বলিলেন, 'বোধ করি হিমালয়-
হিতা পার্ব্বতী।' তৃতীয়ব্যক্তি বলিলেন, 'না; আমার বোধ হয় বৃন্দাবন-
বাসিনী রাই।' আর এক জন কহিলেন 'আমার বোধ হয় ইনি মহা-
গেশ্বরী।' অবশেষে কতক লোক বলিলেন 'স্বয়ং ভক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া
বতীর্ণা হইয়াছেন।'

গৌরচন্দ্র তখন বিশ্বজননীর ভাবে বিভোর হইয়া নিত্যানন্দের হাত
রিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন; মুকুন্দাদি মাতৃভাবের সঙ্গীত গাইতে লাগি-
লন। অন্যান্য দিনের ভাব হইতে গৌরের আজিকার ভাব সম্পূর্ণ নূতন।
জনমণ্ডলী তাঁহার অনেক ভাব দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু এমন মাতৃভাবের
কোমল ছবি কখন নয়নগোচর করেন নাই। নির্বাত নিষ্কম্প জলধিজলের
আজ আদ্যাশক্তিভাবের জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

পাঠক মহাশয়! সমুদ্রের স্থির জলরাশিতে ঈষৎ বায়ুবিকম্পে যে
মালা ক্রীড়া করিতে থাকে, তাহার শোভা কখন দেখিয়াছেন কি?
না দেখিয়া থাকেন, তবে আজিকার গৌরাঙ্গের ভাবসাগরের দিকে
পাত করুন; মহাশক্তির জমাটভাবে সঙ্গীতাদি জনিত সাময়িক উদ্দী-
য় যে বিবিধ ভাববৈচিত্র্য তরঙ্গায়িত হইতেছে, তাহার নিকট সাগর-
ঙ্গের শোভা কোথায় লাগে? বড়াইরূপিণী নিত্যানন্দের হস্ত ধরিয়া গৌর
করিতেছেন। কখন রুক্মিণীর ভাবে নয়নধারা বহিতেছে, কখন রাধিকা-
ই তিনি [illegible]

করিতেছেন, কখন কাদম্বরীপানে উন্মত্তা হইয়া রেবতীর ন্যায় যেন ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন, কখন কখন অট্ট অট্ট হাসিয়া মহাচণ্ডীর ভাব প্রকাশ করিতেছেন, আর কখন মহাযোগেশ্বরীর ন্যায় বীরাসনে বসিয়া নয়ন নিমীলিত করিয়া প্রগাঢ় যোগে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন। ফলতঃ আজি কার ব্যাপারে সকল শক্তিই প্রকাশিত হইতে লাগিল। ভক্তমণ্ডলীর সমুচিত জ্ঞান উদ্দীপন করাই এই অভিনয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ চেষ্টার ক্রটি করিলেন না। তাঁহার প্রথম শিক্ষা এই; ব্রহ্মাণ্ডের আদিশক্তিই জগজ্জননী, মঙ্গলদায়িনী ও আনন্দদায়িনী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যত শক্তি আছে, সকলই তাঁহাতেই সমাবিষ্টা। তিনিই সকলের কেন্দ্র স্থানীয়া। কি ভৌতিকী, কি মানসিকী, কি আধ্যাত্মিকী আর কি লৌকিকী, বৈদিকী, পৌরাণিকী বা তান্ত্রিকী, সকল শক্তিরই তিনি মূলাধারা। তাঁহাকে জানিতে না পারিলে প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি হইতে পারে না।

তাঁহার দ্বিতীয় শিক্ষা, শক্তিপূজা ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণপূজা হইতে পারে না। অতএব শক্তিপূজাকে কেহ ঘৃণা করিতে পারিবে না। দেশ মধ্যে শাক্তেরা বৈষ্ণবকে ঘৃণা করেন। গৌরচন্দ্র এই ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ভাব দূর করিয়া উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য এই অভিনয়ে আদ্যাশক্তির অবতারণা করিলেন। বৈষ্ণবেরা ভগবানের আনন্দ ও প্রেমস্বরূপের পূজা করিয়া থাকেন বলিয়া শক্তি-উপাসনা জড়োপাসনার ন্যায় নিকৃষ্টবোধে বিদ্বেষচক্ষে দেখিতেন। গৌরচন্দ্র প্রতিপন্ন করিলেন যে, আনন্দ, প্রেম, শক্তিময়; শক্তি ভিন্ন আনন্দের অস্তিত্ব নাই, ও শক্তিলাভ ভিন্ন কখন আনন্দ, প্রেম লাভ হইতে পারে না। লীলাময়ের লীলারাজ্যে যিনি যতটুকু শক্তিতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই ততটুকু পরিমাণে আনন্দ, প্রেমতত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম। আবার যিনি যে পরিমাণে প্রেমানন্দ লাভ করেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার সেই পরিমাণে মঙ্গল ও কল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে। এক ভগবানেই শক্তি, প্রেম, আনন্দ, কল্যাণ শিব, সিদ্ধি, সকলই ওতপ্রোতভাবে সমাবিষ্ট; কোনটীকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যোগ ও বৈচিত্রই ভগবৎস্বরূপের ঐশ্বরিক ভাব। বিচিত্রতা থাকিবে, যোগও থাকিবে; ইহাই লীলাতত্ত্বের [illegible] ভাব। সুতরাং এ অর্থে যিনি বৈষ্ণব, তাঁহাকে শাক্ত হইতেই হইবে। আবার যিনি প্রকৃ

পারেন না। ছাড়িতে গেলেই যোগ বৈচিত্র ছিন্ন হইয়া কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হইবে।

"শক্তি দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ; শক্তিসহ কৃষ্ণ পূজা করিলে সে সুখ।"

মহাশক্তির প্রবলপ্রভাবে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন; সম্মুখে শ্রীমান্ পণ্ডিত মশালচীর বেশে মশাল ধরিয়াছেন; হরিদাস কোটালের বেশে চারি দিকে সাবধান করিয়া বেড়াইতেছেন; হঠাৎ নিত্যানন্দ মহাভাবে বিভোর হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। কোথায় তাঁহার বড়াই সাজ গেল? একেবারে সংজ্ঞাহীন হইলেন। চারিদিকে ভক্তগণ ভাবে বিভোর হইয়া প্রেমানন্দে কাঁদিতে লাগিলেন, ও কেহ কাহার গলা ধরিয়া নাচিতে লাগিলেন; আর শচীনন্দন সম্মুখস্থ গোপীনাথ বিগ্রহের সিংহাসনে উঠিয়া জগজ্জননী আবেশে শ্রীমূর্ত্তিটী কোলে করিয়া বসিলেন। দর্শকমণ্ডলী মাতৃভাবে বিভোর হইয়া কেবল চারিদিক হইতে মা! মা! শব্দে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন; মুকুন্দের দল 'জয় মা! আনন্দময়ী বিশ্বজননী' বলিয়া খোল করতাল বাজাইয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; পুরস্ত্রীগণ প্রেমানন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে 'মাগো! দয়া কর' বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং অদ্বৈত, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ মাতৃ স্তব আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। জয় জয় জগৎ জননি! সন্তাপ হারিণি! সন্তাপিত সন্তানের দুঃখ দূর কর মা! জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরি! জগৎ স্বরূপিণি! সর্ব্বশক্তিময়ি! জ্ঞান, বিদ্যা, শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা; ভক্তি প্রভৃতি শক্তি সকল তোমারই মূর্ত্তি ভেদ মাত্র! তুমি সকল প্রকৃতির পরা শক্তি! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জননী! অচিন্ত্য অব্যক্ত স্বরূপা। তুমিই যুগে যুগে অবতীর্ণা হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার কর। সৃষ্টিপ্রকাশহেতু তুমি ত্রিগুণময়ী; বেদও তোমার কথা বলিতে গিয়া পরাস্ত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বাশ্রয়া, অখিলজীবের জীবনরূপিণি! তোমার স্মরণে ভববন্ধন খণ্ডন হয়। সাধুজনগৃহে তুমি লক্ষ্মীরূপে থাকিয়া ধন, ধান্য, শোভা, সৌভাগ্য, শান্তি, মঙ্গল, বিধান করিয়া থাক; আর অসাধুর গৃহে ভীষণ ভৈরবীরূপে অশান্তি, যন্ত্রণা, সন্তাপ, বর্দ্ধিন কর। তুমি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণি! তোমাকে না ভজিলে জীবের দুর্গতির সীমা থাকে না। তুমিই বিষ্ণুশক্তি রূপে বৈষ্ণবের শ্রদ্ধা উদয় করিয়া দাও। আমাদের উদ্ধার জন্য এবার তোমার

প্রকাশ হইয়াছে; সংসারসন্তাপিত সন্তানদের চরণপল্লবের ছায়া দানে সুশীতল কর। ক্ষুধিত পুত্রদের স্তন্য দিয়া পোষণ কর। তোমার কৃপা বিনা আমাদের ভজন, সাধন, তন্ত্র, মন্ত্র, 'সব বৃথা।'

স্তবপাঠান্তে রঙ্গস্থল নীরব। সকলেই মহাসমাধিতে মগ্ন। বালবৃদ্ধ বনিতা সকলে নিস্তব্ধধ্যানানন্দে বিভোর। অত বড় প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ; কিন্তু একেবারে নীরব; সূচি পড়িলে শব্দ শুনা যায়। কথিত আছে যে ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থায় সকলেই দিব্যদর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রত্যেকে দেখিতে লাগিলেন, যেন বিশ্বজননী ভুবনমোহিনী রূপ ধরিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া হাসিতে হাসিতে স্তন্য সুধাপান করাইতেছেন। আর পুত্র কন্যাগণ এক দৃষ্টিতে মায়ের প্রসন্নমুখ চাহিয়া দেখিতেছে। এইরূপে ধ্যানানন্দে বিভোর হইয়া যখন বৈষ্ণবগণ সুখসাগরে ভাসিতেছেন, আস্তে আস্তে রজনী অবসান হইল; ক্রমে অরুণোদয় হইয়া সকলের ধ্যান ভঙ্গ করিয়াদিল। নিশি অবসান দেখিয়া বৈষ্ণবদলের যত দুঃখ হইল, লোকের শতপুত্রশোকেও তত হয় না। সকলেই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে রাত্রিকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল; কেহ উন্মত্তের ন্যায় শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল; এবং সুখরজনী চলিয়া গেল বলিয়া খেদ করিতে লাগিল।

কথিত আছে, অভিনয়ের পর সপ্তাহ পর্য্যন্ত আচার্য্য রত্নের গৃহে এক মহাতেজ প্রকটিত ছিল; যে আসিত, তাহার চক্ষু ঝলসাইয়া যাইত ও প্রাণ মনে অপূর্ব্ব ভাব সঞ্চারিত হইত।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতের দণ্ড।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদের ঘটনার পর অদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বম্ভরের নিকট বিদায় লইয়া হরিদাসের সঙ্গে শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন এবং শিষ্যমণ্ডলী লইয়া অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এবারে কিছু নূতন প্রণালীতে তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াদিলেন। যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিতে করিতে তিনি শিষ্যদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, ভক্তি হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

চবে যাইতে পায়। ভক্তিদর্পণ, জ্ঞান চক্ষুঃ স্বরূপ। যেমন চক্ষুহীন ব্যক্তির সম্মুখে দর্পণ ধরিলে সে কিছুই দেখিতে পায় না; সেইরূপ জ্ঞানহীন ব্যক্তি কেবল ভক্তি আশ্রয় করিয়া পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে পারে না। হরিদাস এই সব ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। যিনি চারিদিক্ প্রেমভক্তি শূন্য দেখিয়া পৃথিবীতে ভক্তি অবতীর্ণ করাইবার জন্য এক সময়ে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন; যিনি ভক্তিহীন জগতে ভক্তিপ্রচারার্থে গীতাভাগবতের ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া কত লোকের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন; আজ কেন তিনি ভক্তিকে খাটো করিয়া জ্ঞানকে মুখ্য সাধন বলিলেন? এ গূঢ় রহস্য কে বুঝিবে?

বিশ্বম্ভর ভক্তিবিরোধী কথা শুনিতে পারেন না, আবার আচার্য্যও তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র। তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কি এই দোকানদারী? অথবা বৃদ্ধ আচার্য্য বিশ্বম্ভরের পুরস্কারপ্রসাদ খাইয়া তাহাতে বীতস্পৃহ হইয়া আপন কল্যাণের জন্য কিছু দণ্ডপ্রসাদ খাইতে অভিলাষী হইয়া এই ছলা পাতিয়াছেন? বৃন্দাবন দাস মহাশয় এবিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন:—

"ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার;
হেন ভক্তি না মানিব এই মন্ত্র সার।
ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনা পাশরি;
প্রভু মোর শাস্তি করিবেক চুলে ধরি।"

এদিকে একদিন অতিপ্রত্যূষে নগর ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "নিতাই! চল শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে যাই, তিনি আমাদের দেখিয়া সুখী হইবেন।" নিতাই সম্মত হইলে উভয়ে সেই পথে শান্তিপুরে যাত্রা করিলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মধ্যপথে গঙ্গাতীরে মল্লকর নামক গণ্ডগ্রামের নিকট ললিতপুর নামে ছোট একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে পথের ধারে গঙ্গাতীরে একজন গৃহস্থ সন্ন্যাসীর আশ্রম।

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ আশ্রম কাহার?' নিতাই উত্তর করিলেন, 'এখানে একজন সন্ন্যাসী অবস্থিতি করেন'। গৌর বলিলেন, 'তবে চল একবার দর্শন করিয়া আসা যাউক'। উভয়ে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী গৈরিক পরিধান করিয়া

আসনে উপবিষ্ট; তাঁর দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, কপালে বৃহৎ সিন্দুর ফোঁটা, গলাতে রুদ্রাক্ষ মালা। উভয়ে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমাদের ধনলাভ, পুত্রলাভ হউক এবং সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ হউক।" বিশ্বম্ভর আশীর্ব্বাদ শুনিয়া মনে মনে কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অল্পে ছাড়িবার পাত্র নহেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, "মহাশয়! এমন আশীর্ব্বাদ করিলেন কেন? আপনার নিকট এরূপ অকিঞ্চিৎকর শুভকামনা করিয়া আসি নাই। বিষ্ণুভক্তিলাভ হউক, বলিয়া যদি আশীর্ব্বাদ করিতেন, তাহা হইলে আপনার উপযুক্ত হইত। দেখুন কেবল বিষ্ণুভক্তিই অক্ষয়, অব্যয়; আর সকলই অসার।"

বিশ্বম্ভর নিরস্ত হইলে সন্ন্যাসী ব্যঙ্গভাবে উত্তর করিলেন, 'ভাল বলিলেন লোকে ঠেঙ্গা লইয়া ধায় এইরূপ যে প্রবাদ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজ প্রত্যক্ষ করিলাম। আমি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলাম; তাহাতে কোথায় উপকার স্বীকার করিবে, না এ ছোক্‌রা রাগ করিতেছে। আরে গেল যা! আরে! এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি উত্তম কামিনীর সঙ্গে বিলাস না করিল, যার ধনলাভ না হইল, তাহার তো জন্মই বৃথা। বলি ওহে ব্রাহ্মণকুমার! আচ্ছা বলতো বাপু! ধন না থাকিলে কি খেয়ে বাঁচিবে? অন্নাভাবে মরিয়া গেলে তোমার বিষ্ণুভক্তিতে কি হইবে?"

বিশ্বম্ভর, এই কথায়, সন্ন্যাসী কি ধাতুর লোক বুঝিয়া লইলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "মহাশয়! আপনি জ্ঞানী হইয়া এরূপ কেন বলিতেছেন? গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তির চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। দেখুন সংসারের কোন্ ব্যক্তি না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইতেছে? যিনি আকাশের পাখী ও কাননের পশুদিগের জন্যও আহার দিতে কুণ্ঠিত নন; আর জীব জন্মাইবার বহু পূর্ব্ব হইতে যিনি জননীর শরীরের রক্ত মাতৃস্তন্যে পরিণত করিয়া সুসজ্জিত করিয়া রাখেন; তাঁহার রাজ্যে আবার খাইবার ভাবনা কি? পশু, পক্ষী, শিশু, তো কোন যত্ন করে না, তবে কেমন করিয়া তাহারা প্রতিপালিত হয়? তবে যার যেমন প্রারব্ধ, সে তেমনি ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি কামনা করিয়া ধনবংশ লাভ করিয়াও কেন নির্ব্বংশ ও ধনহীন হইতেছে? আবার দেখুন রোগশোকের জন্য কেহই প্রার্থনা করে না; [illegible] যদি রাখেন, শাস্ত্রে

যখন কামনাব্রতের বিধি রহিয়াছে, তখন তদ্রূপ বর দিতে হানি কি? বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখুন, এ সব কেবল মূর্খ বা অল্পবুদ্ধি লোকদিগের চিত্তরঞ্জনের জন্য কথিত হইয়াছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হরিভক্তি ভিন্ন আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, এবং হরিভক্তি ভিন্ন আর প্রার্থয়িতব্য বিষয়ও দেখেন না।'

বিশ্বম্ভরের এই সকল কথা অবোধ সন্ন্যাসীর বুঝিবার ক্ষমতা নাই। তাই সে কিছু ক্রোধের হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিল, "আরে! এ ছেলেটা কি পাগল হয়েছে নাকি? অহো! কালের কি আশ্চর্য্য গতি! নইলে কি দুধের ছেলে আজ আমাকে শিক্ষা দিতে সাহসী হইত? আমি অযোধ্যা, মথুরা, বদরিকাশ্রম, কাশী, গয়া, গুজরাট, সিংহল প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত তীর্থই পর্য্যটন করিয়াছি; আমি কিছু জানি না, আর এই চেঙড়া ছোক্‌রাটা এত জ্ঞানী হলো?'

নিত্যানন্দ হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসীকে বলিতে লাগিলেন, 'গোঁসাই! আপনি বালকের সহিত কেন বিচার করিতেছেন? ক্ষান্ত হউন, এবং আমার জন্য ইহাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে বিশেষরূপে জানি; এ বালক জানে না, তাই এরূপ বলিতেছে।'

সন্ন্যাসী এই ব্যঙ্গোক্তি বুঝিতে না পারিয়া আত্মপ্রশংসা বিবেচনায় অতি হৃষ্ট হইল এবং নিতাই গৌরকে স্নানাহার করিতে অনুরোধ করিল। নিত্যানন্দ বলিলেন, 'আমরা প্রয়োজনানুরোধে যাইতেছি, স্নানাহার করিতে গেলে কার্য্য হানি হইবে; তবে কিছু দি'ন, পথে স্নান করিয়া জল খাইয়া যাইব। সন্ন্যাসী তখন তাঁহাদের স্নান করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় দুই ভাই স্নান করিয়া জলযোগ করিতে বসিলেন। জ্যৈষ্ঠ-মাস; সন্ন্যাসী অতিথিদ্বয়কে পাকা আম্ ও দুগ্ধ জলপান জন্য দিয়া নিত্যানন্দকে সঙ্কেতে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনাদিগের মত অতিথিলাভ বহু ভাগ্যের কথা; অনুমতি করেন তবে কিছু আনন্দ আনা যাউক।" নিত্যানন্দ বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। 'আনন্দের' কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী বামাচারী, মদ্যপান করিয়া থাকে ও তাঁহাদিগকে মদ্যপান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, যে 'আনন্দ' অর্থে মদ্য। অমনি তিনি 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' বলিয়া আচমন করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিল। তখন দুই বন্ধু পথে চলিতে চলিতে যুক্তি করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ভাসিয়া চলিলেন, আর ডাঙ্গায় উঠিলেন না। সন্তরণ করিতে করিতে বিশ্বম্ভর মহাযোগে মগ্ন হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন, এবং ঈশ্বর বেশে গঙ্গাগর্ভ ভেদ করিয়া কত অলৌকিক কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। "আমি নিশ্চিন্তভাবে যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়াছিলাম, আরে নাড়া! আমাকে এখানে আনিয়া এখন ভক্তি লুকাইয়া জ্ঞানব্যাখ্যা করিতেছিস্; দেখ্ আজ তোর কি শাস্তি করি?" নিত্যানন্দ মৌনভাবে এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে চলিলেন। শান্তিপুরের ঘাটে উঠিয়া উভয়ে একেবারে অদ্বৈতের ভবনে উপনীত হইলেন। অদ্বৈত তখন ছাত্রবৃন্দ লইয়া বাশিষ্ঠের জ্ঞানব্যাখ্যায় নিযুক্ত। বিশ্বম্ভর ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আরে নাড়া! বল্ দেখি জ্ঞান ভক্তির মধ্যে কে বড়?" অদ্বৈত হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "চিরকালই জ্ঞান বড়, ইহা কে না জানে?" আর কোথা যাবি? এই শুনিয়া শচীনন্দন ক্রোধে অধীর হইয়া পিঁড়া হইতে বৃদ্ধ আচার্য্যকে টানিয়া আনিয়া উঠানে ফেলাইয়া কিল চপেটাঘাত প্রভৃতি উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন। আচার্য্যপত্নী 'প্রভু! কর কি? বুড়ো বামুন এখনি মরিয়া যাইবে; ক্ষান্ত হও,' বলিয়া কাতরস্বরে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন এবং ছাত্রবৃন্দ অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। "আরে নাড়া! যদি তোর মনে এত ছিল, তবে ভক্তিশূন্য লোক দেখিয়া তখন অত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলি কেন? আর আমাকে আনিয়াই বা এত ভক্তির ছড়াছড়ি করার কাজ কি ছিল?" এই বলিয়া ভৎর্সনা করিতে করিতে গৌরচন্দ্র অদ্বৈতকে ছাড়িয়া দুয়ারে যাইয়া বসিলেন, এবং ঐশ্বর্য্যভাবে পূর্ণ হইয়া ঈশ্বরের অভিন্নভাবে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ দিকে অদ্বৈতাচার্য্য মার খাইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং হাতে তালি দিয়া প্রাঙ্গণে নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিলেন, "যেমন অপরাধ করেছিলাম, তেমনি শাস্তি পাইলাম; ভাল হলো যে এত অল্প দিয়ে গেল"। এই বলিতে বলিতে তিনি ভ্রূকুটীভঙ্গিতে বিশ্বম্ভরের দিকে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "কেমন! আর আমাকে স্তুতি করিবে? এখন তোমার সে ন্যাকাইফিকিপোনা কোথায়

গল ? আমার নাম অদ্বৈত, তোমার শুদ্ধ দাস ; তোমার মায়ায় ভুলিবার
াত্র নই। কেমন শাস্তি করাইলাম দেখ্‌লে ? এখন এস পদধূলি দাও।”
াদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বম্ভরের পদতলে পতিত হইলে বিশ্বম্ভর সসম্ভ্রমে তাঁহাকে
কালে লইয়া বসিলেন। এই ভাব দর্শনে নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈতনন্দন
াচ্যুত, সীতাদেবী প্রভৃতি সকলেই প্রেমে কাঁদিতে লাগিলেন এবং অদ্বৈ-
তের প্রাঙ্গণ যেন কৃষ্ণপ্রেমময় হইয়া টলিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর খুব উত্তেজিত
াবে বলিতে লাগিলেন, ‘শুন আচার্য্য ! যদি কেহ আমার স্থানে সহস্র
াপরাধেও অপরাধী হইয়া তোমার আশ্রয় লয়, তাহা হইলে সেই দণ্ডেই
াহার সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া উদ্ধার করিব।’ অদ্বৈত উত্তর করিলেন “শুন !
ামারও এই প্রতিজ্ঞা, তোমাকে লঙ্ঘন করিয়া যে আমায় ভজিবে, তাহার
কছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যে তোমাকে না মানে, সে আমার পুত্র, কি
কিঙ্কর, আর যেই কেন হউক না, আমি কখনই তাহাকে নিজজন বলিয়া
ীকার করিতে পারি না।” এই কথার পোষকে আচার্য্য এক পৌরাণিক
াখ্যায়িকা বলিলেন। বিশ্বম্ভর তখনও দেবভাবে মগ্ন ; অদ্বৈতের বাক্যা-
াসানে অহঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “সকলে শুন ! আমার ভক্তকে
উপেক্ষা করিয়া যে মূঢ় আমাকে পূজা করে, তাহার সেই পূজা অগ্নিময়
শেলের সম আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। অখিল ব্রহ্মাণ্ডে আমার যত সেবক
াছে, সকলই সম্মান ও ভক্তির পাত্র ; যে কেহ তাহাদের নিন্দা করিবে,
তাহারাই নষ্ট হইবে। তবে ভাই ! হিংসা, নিন্দা, পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ
াম কর, অনায়াসে ত্রাণ পাইবে।” তখন সকলেই উচ্চৈঃস্বরে ‘জয় ! জয় !’
ধ্বনিতে গগন পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ক্ষণকাল পরে বিশ্বম্ভর বাহ্যজ্ঞান
াভ করিয়া কিছু লজ্জিতভাবে বলিতে লাগিলেন, “আমি কি কিছু চাঞ্চল্য
করিয়াছি ? যদি করিয়া থাকি, তবে আপনারা তাহা ক্ষমা করিবেন।”

অদ্বৈতপত্নীকে বিশ্বম্ভর জননী সম্বোধন করিয়া বলিলেন “মা ! আপনি
াক উঠাইয়া দি’ন, শীঘ্র ভোজন করিতে হইবে, আমরা স্নানে চলিলাম।”
তখন সকলে দলবদ্ধ হইয়া গঙ্গাস্নানে চলিলেন, এবং স্নানান্তে কৃষ্ণের
প্রণাম বন্দনার পর গৌরচন্দ্র অদ্বৈত চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিলেন
এবং একত্র ভোজনে বসিলেন। ঘরের মধ্যে তিন প্রভুর পাত হইল, দ্বারের
িকট হরিদাস বসিলেন। সীতাদেবী পরিবেশন করিতে লাগিলেন।
ভোজনের কিছু [illegible]

হইয়া নিজ মূর্ত্তি ধরিলেন এবং সকল ঘরে ভাত ছড়াইয়া ইহার পাতের এঁটো তার পাতে, উহার পাতের এঁটো ইহার পাতে দিয়া একাকার করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বম্ভর "হায়! হায়! জাতিনাশ হইল" বলিয়া পরিহাস-ব্যঞ্জক স্বরে খেদ করিয়া উঠিলেন, হরিদাস হাসিতে লাগিলেন এবং অদ্বৈত ক্রোধে অধীর হইয়া নিতাইকে গালি পাড়িতে লাগিলেন :—"কোথা হইতে মাতালটা আসিয়া জুটিয়াছে? আরে মলো! পশ্চিমার ঘরে ঘরে ভাত খাইয়া আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিল।" আচার্য্য ক্রোধে দিগম্বর হইয়া উঠিয়া হাতে তালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন; নিতাই দুইটী অঙ্গুলী দেখাইয়া হাসি জুড়িয়া দিলেন, এবং গৌরচন্দ্র হরিদাস হাসিতে হাসিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। অদ্বৈতগৃহে শুদ্ধ হাস্য তরঙ্গ উঠিয়া পড়িল। তখন সকলে উচ্ছিষ্ট হাতে কোলাকুলী করিতে আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈত ভবনে তিন দিন এই রূপে প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিয়া গৌরচন্দ্র অদ্বৈত, হরিদাস ও নিত্যানন্দকে লইয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এইতো গেল বৈষ্ণবগ্রন্থের কথা। এবিষয়ে এক জনপ্রবাদ আছে যে অদ্বৈতাচার্য্য গৌরের ভক্তদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও ভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন শান্তিপুরে জ্ঞানপ্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মাধব, শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যের অনেক শিষ্যও জুটিয়াছিল। গৌরচন্দ্র এই কথা শুনিতে পাইয়া নিত্যানন্দের সহিত শান্তিপুরে আসিয়া নানা উপায়ে আচার্য্যের মত পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় স্বমতে আনিয়াছিলেন কিন্তু অদ্বৈতের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কাহারও কাহারও মত পরিবর্ত্তন হইল না যাহারা ফিরিল না, তাহাদের মধ্যে মাধব ও শঙ্কর প্রধান। ইহারা স্বীয় গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসাম প্রভৃতি দেশে যাইয়া স্বতন্ত্র ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। আসামের বর্ত্তমান বৈষ্ণবসম্প্রদায় ইহাদের শিষ্য প্রশিষ্য। ইহারা চৈতন্যকে স্বীকার না করিয়া অদ্বৈতকেই কৃষ্ণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং জ্ঞান ভক্তিকে সংযুক্ত করিয়া আপনাদের মত গঠিত করিয়াছিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তন দিন দিন জমকাইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীবাস ণ্ডিতের বাটীতে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমস্ত নিশা সঙ্কীর্ত্তন হয়; ভক্ত ভিন্ন াধারণ লোকের সেখানে প্রবেশের অধিকার নাই। কিন্তু নগরের আবাল-দ্ধ বালিকা কীর্ত্তন শুনিবার জন্য এতই ব্যগ্র হইয়া উঠিল যে, প্রতি রজ-াতে বাটীর বাহিরে, পথে, গলিতে ও অন্তঃপুরে লোক ধরে না; সমুৎসুক চিত্তে নগরবাসিগণ নব ভক্তিবিধানের নবসঙ্কীর্ত্তন শুনিতে ব্যগ্র। এই কল লোকদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। কতক লোক কবল উপহাস বিদ্রূপ করিবার জন্য আসিত; কিন্তু অনেকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বণ করিয়া উপকার লাভের প্রত্যাশায় সমস্ত রজনী হিমভোগ করিয়া াগরণ করিত। কীর্ত্তনের মাধুর্য্য আস্বাদ করিয়া ও প্রেমের স্বর্গীয় বি দেখিয়া পক্ষপাতীগণ এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহারা পাষণ্ডী-দিগকে যথোচিত তিরস্কার করিত। মহিলাগণ গৌরের রূপ মাধুর্য্যে ও নৃত্যকীর্ত্তনে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের গুরুজনের অনেক গঞ্জনা লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতেন। তাঁহাদের তৎকালের মনের ভাব কোন বিদগ্ধা মহিলা নিম্ন লিখিত গানে প্রকাশ করিয়াছেন:—

"পাড়ার লোকে গোল করে গো!
আমায় সবে বলে গৌর-কলঙ্কিনী।
সঙ্কীর্ত্তনে গৌর নেচেছে,
তাতো পাড়ার লোক দেখেছে,
তখন আমি দাঁড়ায়ে নাছে,
(বাড়ীর বাহির হই নাই গো!)
কেবল দেখেছিলাম তাঁর চরণ দুখানি।
একদিন জাহ্নবীর ঘাটে,
গোরাচাঁদ দাঁড়ায়ে তটে,
যেন সূর্য্যচন্দ্র উভয় জোটে, গৌর অঙ্গেতে;

দেখে গৌর রূপের ছবি,
ভুলে গেল শাক্ত শৈবী,
দৈবে গেল মোর কলসী ভেসে,
এলোথেলো হলেম পাগলিনী।
আর একদিন শ্রীবাসের বাড়ী,
সঙ্কীর্ত্তনের হুড়াহুড়ি,
ভক্তগণ যায় গড়াগড়ি, শ্রীবাস অঙ্গনে ;
(ভাবে কে কার গায়ে ঢলে পড়ে গো)
তখন আমি লুকায়ে,
ছিলাম এক ভিতে দাঁড়ায়ে,
পড়িলাম অচেতন হয়ে,
চেতন করে শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী।”

নগরের কতগুলি লোক শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি এতই আসক্ত হইয়া পড়িল যে, তাহারা দিবাভাগে তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিল। গৌরচন্দ্র ঐসকল লোকের শ্রদ্ধা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া হরিনাম উপদেশ করিলেন এবং সন্ধ্যার সময় সকলকে একত্রিত হইয়া নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে বলিয়া দিলেন। তদবধি নবদ্বীপনগরে প্রতি পল্লীতে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের রোল উঠিয়া গেল। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমান্তে নগরীর লোক সকল যখন একত্রিত হইয়া মৃদঙ্গ মন্দিরাশঙ্খবাদ্য যোগে কীর্ত্তন করিতে লাগিল,—“হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমো, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন!” এই পদ সুমধুর স্বর সংযোগে যখন নৈশ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিত, আর প্রগল্‌ভ নৃত্যের প্রেমতরঙ্গে চারিদিক আন্দোলিত হইত, তখন নবদ্বীপ এক নূতন শ্রী ধরিত। পাষণ্ডীগণের বিদ্বেষানল ইহাতে শতগুণ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া গোপনে গোপনে কাজীর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, নিমাই পণ্ডিতের কুপরামর্শে নগরের কতকগুলা অসচ্চরিত্র লোক নগরের স্থানে স্থানে জোটলা করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া লোকের প্রতি উৎপাত করিতেছে; তাহাদিগকে দমন না করিলে শীঘ্রই নগরমধ্যে শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা। কাজী দৃঢ়তা সহকারে এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন কাজী সাহেব আপনার দলবল সহ [illegible]

রিনাম সঙ্কীর্ত্তনের স্রোতে নদীয়া টলমল করিতেছে। তখন ক্রোধান্ধ হইয়া কাজীসাহেব এক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন; সাধুদিগকে অশেষ প্রকারে অপমান করিলেন এবং আর কীর্ত্তন করিলে তাহাদের জাতি মারিয়া মুসলমান করিবেন, এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিলেন। দুই চারিদিন পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া এইরূপ করাতে সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল, প্রেমভক্তিপ্রচারের শাণিতাস্ত্র আপাততঃ কোষমধ্যে লুকায়িত রাখিতে হইল, পাষণ্ডীদের জয় হইল, এবং ভগবদ্বিধান সয়তানের হস্তে গ্রস্ত হইয়া গেল। সংসারে এইরূপ ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। ইহা দেখিয়া যাঁহারা অসত্যের জয় মনে করেন, তাঁহারা একদেশদর্শী অবিশ্বাসী। বিশ্বাসীগণ এরূপ বাধাবিঘ্নের এক কড়ার মূল্যও দেন না। তাঁহারা নিশ্চয় জানেন "সত্যমেব জয়তে" সত্যের জয় হইবেই হইবে। তাই কীর্ত্তনকারী লোক সকল যখন দলে দলে যাইয়া গৌরচন্দ্রের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে নিরাশ অন্তরে কাজীর আচরণের কথা জ্ঞাপন করিল, তখন গৌরচন্দ্র ক্রোধে হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দকে বলিলেন—"শুন নিতাই! সাবধানে বৈষ্ণবসমাজে ঘোষণা করিয়া দাও যে, আজ অপরাহ্নে সমস্ত নবদ্বীপে নগরসঙ্কীর্ত্তন হইবে; দেখা যাউক কোন্ কাজি, কি বাদসাহ কি করিতে পারে? আমি সত্যই বলিতেছি যে, আজ বিশাল প্রেমভক্তির বন্যা হইবে, তাহার তরঙ্গে কাজী ও পাষণ্ডীগণ ডুবিয়া মরিবে।" নগরবাসীদিগকে বলিলেন, "ভাই সব! যাও, আমার এই ইচ্ছা আজ নগরের ঘরে ঘরে প্রচার কর এবং তদুপযুক্ত আয়োজন কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আজ লীলাবিহারী ভগবানের অতি রহস্যলীলা প্রকাশিত হইবে। কিসের ভয় কাজীকে? আর কিসের ভয় বাদসাহকে? যিনি সকল ভয়ের ভয়ানক, যিনি ভীষণের ভীষণ, আমরা সেই উদ্যতবজ্র শ্রীহরির শরণাপন্ন। আমরা কি সামান্য মানুষের ভয়ে ভীত হইব? যাঁহার চরণাশ্রয় লইলে সকল ভয় চলিয়া যায়, তিনি সেনাপতি থাকিতে তাঁহার সৈন্যগণ কি ভয় করিবে? এই প্রেমভক্তির সময়ে আজ কত পাপী নিধন হইবে, সে রঙ্গ চক্ষেই দেখিবে। এখন যাও, বিকালে সাজ সজ্জা করিয়া আসিও।" গৌরচন্দ্রের সাহসপূর্ণ তেজস্বী বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া সকলে স্তম্ভিত ও উৎসাহিত হইল। নগরবাসীরা বিদায় হইয়া গেল এবং নগরে মহাসঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হইতে লাগিল।

শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিবিধানে নগরসঙ্কীর্ত্তন এক মহাব্যাপার। ভা রথীর জলস্রোত যেমন প্রথমে হিমাচলের কয়েক খণ্ড প্রস্তরমধ্যে আ থাকিয়া গোমুখী হইতে প্রবল ধারায় প্রবাহিত হইয়া ভারতের বা দেশের প্রান্তরগুলিকে শস্যপূর্ণ করিয়া ও কোটি কোটি নরনারীকে সুশী জলদানে পরিতৃপ্ত করিয়া সাগরসঙ্গমে যাইয়া মিশিয়া গিয়াছে, সেই গৌরের সঙ্কীর্ত্তন-নদী, যাহা এত দিন কয়েকটি হৃদয়ে আবদ্ধ ছিল শ্রীবাসের চণ্ডীমণ্ডপের চতুষ্কোণমধ্যেই যাহার তরঙ্গ খেলিত, আজ তা প্রবলবেগে সমস্ত নবদ্বীপে, পরে ভারতের নানা স্থানে প্রবাহিত হই অনন্ত প্রেমের সাগরে মিশিয়া একাকার হইতে চলিল। ইহা মনে করি কাহার না হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয়? ফলতঃ ধর্ম্মসংগ্রামে নগরসংকী যে এক মহাস্ত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অস্ত্রের আঘাতে ক পাপীর হৃদয় যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, কত জগাই মাধাই যে উদ্ধার হ য়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সমস্ত নগরে প্রচার হইয়া গেল যে আজ নিমাই পণ্ডি প্রকাশ্য ভাবে নগরে নগরে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইবেন। নাগরি লোক সকল মহোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া পূর্ব্বাহ্নিক আয়োজন করিতে লাগি লেন। যুবকেরা রাশি রাশি ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল; কদলী তরু, আম্রশাখা ও পূর্ণ কুম্ভ দিয়া মনোহর তোরণ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল বয়স্কেরা ছোট বড় নানা প্রকারের অসংখ্য মশাল প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন তৈলের যোগাড় করিলেন; এবং বৃদ্ধেরা মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা, রামশিঙ্গা ও পতাকাদি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; মহিলারা মালা চন্দন ও শঙ্খ লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন যে সংকীর্ত্তনের দল যখন বাটী নিকটে আসিবে, তাঁহারা তখন শঙ্খধ্বনি করিয়া মালা চন্দন বৃষ্টি করিবেন আজ আর লোক সকল কাজীর ভয়ে ভীত নয়, পাষণ্ডদের বিদ্রূপ গ্রা করে না এবং পিতা মাতা গুরুজনের নিষেধ মানে না। অনুরাগ ও উৎ সাহের বিশালতরঙ্গ উঠিয়া সমস্ত নবদ্বীপকে যেন নাচাইতে লাগিল রামের দেখে শ্যাম, শ্যামের দেখে হরি, হরির দেখে মধু, এইরূপে আবাল বৃদ্ধবনিতা নবভক্তিবিধানের নূতন মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তু হইতে লাগিল। বৃন্দাবনদাস মহাশয় এক মশাল রচনার কথাই কতরূপ

যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নানা সাজে সজ্জিত বৈষ্ণবমণ্ডলী ও নাগরিক লোক-সকলে গৌরের আঙ্গিনা পূর্ণ হইয়া গেল। সকলের মুখেই উৎসাহ আনন্দ মূর্ত্তিমান বিরাজ করিতেছে। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এক সামান্য ব্রাহ্মণকুমারের ইঙ্গিতে রাজাজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া এত লোক নগরে নগরে সংকীর্ত্তন গাইতে যাইবে? একি ভগবানের ভক্তির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে সমরযাত্রার মিছিল নাকি? বৃন্দাবন দাস সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে ভগবচ্ছক্তি বিনা ইহা কখনই হইতে পারে না। তথাচ অবিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করে না। ধন্য ভগবন্! ধন্য তোমার বিধান চক্র! ধন্য বিধান প্রবর্ত্তকগণ! যে শক্তি আজ গৌরের এই বিশাল সংকীর্ত্তনদলে প্রতিষ্ঠিত; সেই লীলাময়ী ভগবচ্ছক্তিকে আমি অবনত মস্তকে বারবার নমস্কার করি।

সকল লোক একত্রিত হইলে গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তনের পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় বাঁধিয়া দিলেন। সর্ব্বাগ্রে অদ্বৈত আচার্য্যের দল, তৎপরে হরিদাসের, তৃতীয় শ্রীবাস পণ্ডিতের, ও সর্ব্বশেষে স্বয়ং গৌরচন্দ্রের দল কীর্ত্তন করিতে লাগিল। গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিতাই কহিলেন আমার স্বতন্ত্র দলে নাচিবার শক্তি নাই; আমি তোমার পাশে পাশেই থাকিব।' সুতরাং পঞ্চমদল হইল না। সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তকদিগের বেশ-ভূষারই বা কি সৌন্দর্য্য! সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ও আবীরে চর্চ্চিত; ত্রিকচ্ছ ধুতি-পরিধান; মস্তকে, গলদেশে, বাহুমূলে সুগন্ধি পুষ্পমালা; হাতে মন্দিরা, করতাল, শঙ্খ আদি। খুব মত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। গৌরের অশ্রু, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ, প্রভৃতি ভাবোদয় হইতে লাগিল, হরি-ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং থাকিয়া থাকিয়া সেই বিস্তীর্ণ লোক সমুদ্রের মধ্যে নানা প্রকারের ভাবতরঙ্গ খেলিতে লাগিল। এইরূপে বেলাবসান হইলে ভক্তমণ্ডলী কীর্ত্তন করিতে করিতে বাড়ীর বাহির হইলেন। তখন চারিদিকে কোটি অর্ব্বুদ মশাল জ্বলিয়া উঠিল, মহিলাগণ মঙ্গল সূচক শঙ্খধ্বনি যোগে খই, কড়ি, পুষ্প, বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এবং পুরুষদিগের হরিনামমিশ্রিত উচ্চ কণ্ঠধ্বনির সহিত বামাগণের হুলুধ্বনির কোমলকণ্ঠ মিশিয়া সান্ধ্য সমীরণকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। চারি সম্প্রদায়ে চারিটী নূতন রচিত পদ গীত হইতে লাগিল। আচার্য্য-প্রমুখদল 'হরি হরয় নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমো গোপাল গোবিন্দ রাম

শ্রীমধুসূদন!’ হরিদাসের দলে ‘হরি ও রাম! রাম, হরি ও রাম! রাম’ শ্রীবাস পণ্ডিতের দলে ‘মুগধা গোবিন্দ বলরে, যাহা হৈতে নাহি হয় শমন ভয় রে” এবং গৌরের দলে “তুয়ার চরণে মন লাগহুঁ রে শারঙ্গধর! তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে” পদ প্রমত্ত ভাবে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রথমে চারিটী সম্প্রদায় স্থির গম্ভীর ভাবে গাইতে গাইতে চলিল; কি নগরের পথে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, কীর্ত্তন যতই জমাট বাঁধিতে লাগিল, লোক সকল যতই মাতামাতি করিতে লাগিল, ভাবোচ্ছ্বাসে তরঙ্গ যতই তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল, সম্প্রদায় চতুষ্টয় ততই ক্ষুদ্র ক্ষু অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া সাগর সঙ্গমোন্মুখী নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। নবদ্বীপে গঙ্গার ধারে ধারে এক প্রশস্ত পথ ছিল; এ বিশাল সংকীর্ত্তন দল সেই পথে চলিল। প্রথমে গৌরের স্নানঘাটে কতক্ষণ কীর্ত্তন হইয়া মাধাইর ঘাট ও বারকোণা ঘাট দিয়া সংকীর্ত্তন সিমুলিয়া নগরে প্রবেশ করিল। এই সিমুলিয়া নামক স্থানে কাজী ও রাজকী সমস্ত কর্ম্মচারী বাস করিয়া থাকেন; সুতরাং ইহা তখনকার অতি সমৃদ্ধি শালী ও সৌষ্ঠবান্বিত স্থান। কি আশ্চর্য্য! কাজীর নিষেধ সত্বেও লোক সকল কীর্ত্তন অভ্যর্থনার জন্য নানা প্রকারে স্ব স্ব বাড়ী ও পথ ঘাট সাজা ইয়া অপেক্ষা করিতেছে। কদলীর কাঁদি সহিত রম্ভাতরু, আম্রসার, নারি কেল, গুবাক, পুষ্পমালা, অশোকমালা প্রভৃতি নানা সজ্জায় নগরী আ সুশোভিত।

সিমুলিয়ার নিকটবর্ত্তী হইলে অসংখ্য অসংখ্য নগরীয় লোক কীর্ত্তনে যোগ দান করিল। প্রবল স্রোতস্বতী নদীজলে প্রখরবেগে নূতন বন্যা জল পড়িলে যেরূপ উত্তাল তরঙ্গ ও ফেণোদ্গম হইয়া ভীষণতর বে সমুত্থিত হয়, তখন সংকীর্ত্তনও সেইরূপ ভীষণ রূপ ধারণ করিল; আবা বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যেন কৃষ্ণোন্মাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। কে কাহাকে কি বলে? কি করে? কিছুরই ঠিক নাই। কেহ কেহ নানা রঙ্গভঙ্গীতে নাচিতে লাগিল, কেহ কেহ হরি বলিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, কে ধূলাতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, কেহ মুখে নানারূপ বাদ্য করিতে লাগিল, কেহ কাহারও স্কন্ধে উঠিয়া বসিল, কেহ মাতোয়ালের ন্যা কাহারও চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, কেহ কেহ পরস্পর কোলাকুলি

হুঙ্কার করিতে আসিয়াছি, কেহ বলে আরে ভাই! কাজী বেটাকে ধরিয়া আন, তাহাকে শিক্ষা দিব; কেহ বলে আরে! ধর ধর পাষণ্ডী বেটাদের ধর; তাহারা যেন পলাইতে না পায়; কোন কোন বীর অবতার লম্ফ দিয়া গাছে উঠিয়া ডাল পালা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল; কেহ কেহ যম রাজাকে বাঁধিয়া আনিতে আদেশ দেয়। এইরূপে গৌরচন্দ্রের কীর্ত্তনে নবদ্বীপের লোকগুলা আজ ক্ষেপিয়া গিয়াছে। যাহাদের বহুদিনের মনোমালিন্য ও অসদ্ভাব ছিল, তাহারা আজ প্রেমে গলা ধরা ধরি করিয়া গাইতেছে, নাচিতেছে ও পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছে; যে চিরজীবন পাপপথে ভ্রমণ করিয়াছে, দুষ্ক্রিয়ার মলিন পঙ্কে যাহার চরিত্রের বস্ত্র মলিন হইয়া গিয়াছে, সে অবিরল অশ্রু ফেলিয়া অনুতাপের কান্না কাঁদিতেছে; যে সৌভাগ্যবান্ আজন্ম ভগবৎসেবা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি আজ পুলকে দুই হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে ঘোষণা করিতেছেন "আরে ভাই! ভবপারে যাইবার আর ভয় নাই, পতিত পাবন শ্রীহরি স্বয়ং কাণ্ডারী সাজিয়া নাম তরী লইয়া সকলকে ডাকিতেছেন, তোরা সব চলিয়া আয়।"

পাষণ্ডীদিগের দল এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কত কি বলাবলি করিতে লাগিল। একজন বলিল "এই সময় কাজী সাহেব এখানে আসেন, তো আচ্ছা মজা হয়; কোথায় বেটাদের রঙ্গ ঢঙ্গ যায়? কোথায় বা গান বাজনা থাকে? আর কোথায়ই বা আম্রশাখা কলার গাছ পড়ে থাকে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল "তা'হলে যত দেখছো মহাতাপ, মশাল, খোল করতাল, ভাব কালী, গঙ্গাসই হয়ে যায়।"

তৃতীয় পাষণ্ডী বলিয়া উঠিল "তা'হলে ভাই! আমি গঙ্গার ধারে গিয়া নাবুক বেটাদের ঢেকা মেরে জল সই করে দি। চলনা কেন সকলে যাইয়া কাজীকে ডাকিয়া আনি।"

তাহাদের মধ্যে রসিক রকমের একজন লোক ছিল সে বলিল "আরে! তাও কি করতে আছে? তাতে যে আমাদেরও বিপদ্ ঘটিতে পারে। এসো এক কাজ করা যাক্; কীর্ত্তনের নিকটে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিগে যে ঐ কাজী আসছে। তা'হলে মজা দেখো, সকল বেটাই চম্পট দিবে।"

উত্তীর্ণ হইল। গৌরাঙ্গের তৎকালের ভাব যে দেখিল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। নয়নযুগল দিয়া দর বিগলিত ধারে অশ্রু পড়িতেছে, 'হরিবোল 'হরিবোল!' বলিয়া দুইটী বাহু তুলিয়া নাচিতেছেন, কখন ভাবাবেগে হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছেন, কখন আছাড় খাইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছেন, এবং কখন মহাভাবে গর গর হইয়া থর থর কাঁপিয়া উঠিতেছেন। এইরূপভাবে কীর্ত্তনের দল ক্রমশঃই কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরা অল্প সময়ের জন্য সঙ্কীর্ত্তনদল হইতে বিদায় লইয়া কাজী সাহেবের দরবারে যাইবার জন্য পাঠককে অনুরোধ করিতেছি।

সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবার পূর্ব্ব হইতেই কাজী কীর্ত্তনকারীদিগের চরিত্রের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য কয়েকজন পেয়াদাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাই আজ কাজীসাহেব দরবারঘরে প্রত্যাগত দূতদিগের নিকট গৌরাঙ্গের আচরণ শুনিতেছেন। একজন দূত হস্তযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল "হুজুর! কি আর বলিব? নগরের লোকগুলা এমন করিয়া নগর সাজাইয়াছে যে আমাদের বাদসা নামদার আসিলেও তেমন ঘটা হয় না। কত লক্ষ লক্ষ লোক জুটিয়া যে দলবদ্ধ হইতেছে, তাহার ঠিকানা হয় না। মশালই বা কত? বাজনার শব্দে কাণ পাতা যায় না। অধিক কি বল্‌বো, পর্দার জানানা গুলাকে পর্য্যন্ত ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। তাহারা শাঁক বাজাচ্ছে, হুলু দিচ্ছে ও খই কড়ি ছড়াচ্ছে। বেটা যেন ঠিক্ বিয়ে কর্‌তে বেরিয়েছে। কি বলে ভূতের নাকি সয়তানের কীর্ত্তন হচ্ছে। আমরা সে দিন যে সকল লোককে শাস্তি দিয়া আসিয়াছি, তাহারাই আজ মার মার বলিতে বলিতে আসিতেছে। উহাদের সর্দ্দার ঐ নিমাই পণ্ডিত; তাহাকে জব্দ করিতে না পারিলে এ ভূতের বাসা ভাঙ্গিবে না। আল্লা হো আক্‌বর! হুজুরের এখন যেমন মর্‌জী।"

আর একজন দূত দণ্ডায়মান হইয়া বলিল "ধর্ম্মাবতার! এক আশ্চর্য্য দেখিলাম; বাম্‌না কীর্ত্তন করে আর কাঁদে। তার দুই চখের পানিতে বুক ভাসিয়া যায়; আবার থাকিয়া থাকিয়া সে এমন চীৎকার করিয়া উঠে যে, দেখিলে বোধ হয় ঠিক যেন গিলিতে আসিতেছে। বাপরে! তাহাকে দেখিলে আমার বড় ভয় হয়।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিয়া উঠিল "হুজুরের আদেশ শিরে ধরিয়া আমি এক

আমি যেই লোকদিগকে শাসন করিতে উদ্যত হইলাম, অমনি কোথা হইতে এক প্রকাণ্ড অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আসিয়া আমার দাড়ী গোঁপ পোড়াইয়া দিল। এই দেখুন মুখে ব্রণ রহিয়াছে।"

এই সময়ে সভামধ্যে একজন যবন 'হরিবোল, হরে! কৃষ্ণ!' বলিয়া গান করিয়া উঠিল। কাজী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে! তোমাকেও ভূতে পাইয়াছে নাকি? হিন্দুরা কীর্ত্তন করে তাদের ধর্ম্ম, তুমি বাপু মুসলমানের ছেলে হয়ে ঐ নামগুলা কেন উচ্চারণ করিতেছ? যাও! কলমা না পড়িলে আর তোমার রক্ষা নাই।" সে বলিল "ধর্ম্মাবতার! আমি কি করিব? কীর্ত্তনের স্থানে যে যাইতেছে, সেই হরিনাম না শিখিয়া ফিরিয়া আসিতেছে না। একটী দিনমাত্র সঙ্কীর্ত্তন নিষেধ করিতে যাইয়া আমার এই দশা হয়েছে। আমি কি জানি না যে মুসলমানের পক্ষে হরিনাম করা মহাপাপ। কিন্তু কি করি? সে ভাব যে একবার দেখেছে, সে নাম না লইয়া থাকিতে পারে না। কে জানে নিমাই বাম্না কি জাদু জানে? হুজুর যদি সেখানে একবার যান, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আপনারও এই দশা হবে।"

কাজী দূতগণের মুখে এই সকল বিবরণ শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদিগকে 'ভীরু' 'কাপুরুষ' বলিয়া অশেষ প্রকারে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তিনি বজ্র গম্ভীরস্বরে বলিলেন "ধিক্ তোমাদের মুসলমানবংশে জন্ম! সামান্য কাফেরকে এত ভয়? তোমরা কি ভুলিয়া গিয়াছ যে এই মহানগরীতে ত্রয়োদশ জন মাত্র মুসলমান বীর হাজার হাজার কাফেরদিগকে পরাভূত করিয়া ইস্লামের বিজয়নিশান তুলিয়া গিয়াছেন?' তোমরা তাঁহাদের বংশীয় হইয়া এত কাপুরুষ হইয়াছ যে একজন সামান্য বাম্‌নাকে ভয় কর্‌ছো? দেখি আজ কার মাথার দশটা মাথা আছে যে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এত হিন্দুয়ানি করে?" এই সময়ে সভামধ্যে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল। রাজপ্রতিনিধির শেষ কথাগুলি কণ্ঠ হইতে নিঃশেষ হইতে না হইতে হঠাৎ তিনি বাতাহত কদলীতরুর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। চারিদিকে হৈ চৈ উঠিয়া গেল। সকলেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। এবং অনুচরবর্গ ধরাধরি করিয়া মূর্চ্ছিত কাজীকে বাটীর অভ্যন্তরে লইয়া গেল। কেহই ইহার তথ্য অনুসন্ধান [illegible]

এই কালে নগর সংকীর্ত্তনের দল কাজীর অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল; মুসলমান কর্ম্মচারিগণ ইচ্ছা সত্বেও তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না। কাজীর মূর্চ্ছা, তাঁহার বাটীর তাৎকালিকের বিশৃঙ্খল অবস্থা, সংকীর্ত্তনের গাম্ভীর্য্য ও স্বর্গীয় ছবি, আর নগরের আবাল বৃদ্ধ যুবকের প্রেমোন্মত্ততা তাহাদিগকে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় করিয়া ফেলিল। কতক লোক গোলমাল দেখিয়া পলাইয়া গেল, আর কতক লোক নিশ্চেষ্ট ভাবে দেখিতে লাগিল। এদিকে নগরবাসী লোকসকল ভাবে বিভোর ও উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া কাজীর পুষ্পবন বাগিচা প্রভৃতি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ খু মত্ততার সহিত কীর্ত্তন হইলে পর গৌরচন্দ্রের ইঙ্গিতে কিছু ক্ষণের জন্য স্থগিত থাকিল। তখন তিনি কাজীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং জনৈক ভব্য লোক দ্বারা তাঁহার আগমন বার্ত্তা বলিয়া পাঠাইলেন। ইহার পূর্ব্বেই কাজীর মূর্চ্ছাপনোদন হইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়া বাহিরে আসিলেন এবং সম্যক্ সম্মানের সহিত গৌরকে আপনার গৃহে লইয়া বসাইলেন। গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা! আজ আমি আপনার অভ্যাগত; কোথায় আপনি আমাকে অভ্যর্থনা করিবেন? না আমাকে দেখিয়া অন্দরে পলাইয়া গেলেন। এরূপ আচরণের কারণ কি?"

কাজী উত্তর করিলেন "তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গ্রাম সম্বন্ধে আমার চাচা হইতেন; সে সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল, তুমি আমার ভাগিনেয়। দেহসম্বন্ধ হইতে গ্রামসম্বন্ধ আমার কাছে গৌরবের জিনিষ সুতরাং তুমি আমার যে, সে, নও। বলিতে কি বাপু হে! তুমি ক্রো করিয়া আসিতেছিলে দেখিয়া আমি লুকাইয়াছিলাম। এখন বুঝিলা তোমার ক্রোধ শান্ত হইয়াছে; অমনি আসিয়া সাক্ষাৎ করিলাম। ভাগিনা বলিয়া যেমন আমি তোমার ক্রোধ সহিলাম, তেমনি তুমি কি মাতুলে অপরাধ মার্জ্জনা করিবে না?"

গৌর। অবশ্য করিব; মামা ভাগিনাতে কি বিবাদ রাখিতে আছে মহাশয়! আমি দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি অভয় দিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি।

কাজী। স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর।

গৌর। আচ্ছা আপনারা গোবধ করেন কেন? যাহার সুমধুর দু

আপনারা কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া সেই গাভী ও বৃষের প্রাণবধ করিয়া ভোজন করেন ?

কাজী। তোমাদের বেদাদি শাস্ত্রের ন্যায় আমাদের কোরাণশাস্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভেদে দুইটী পথ আছে। নিবৃত্তি মার্গে জীবহিংসামাত্র নিষেধ, কিন্তু প্রবৃত্তিপথে গোবধের বিধি আছে। শাস্ত্রাজ্ঞায় আমরা গোবধ করি, তাহাতে দোষ কি ? কেন তোমাদের বেদেও তো গোবধের বিধি দেখা যায়।

গৌরচন্দ্র কাজীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন 'বধ করিয়া পুনর্জীবিত করিতে না পারিলে বধ নিষেধ। পুরাকালে ঋষিগণ বৃদ্ধ বৃষকে মারিয়া খাইয়া পুনরায় তাহাকে যৌবনাবস্থায় পুনর্জীবিত করিতেন; সুতরাং তাহাদের মারা হইত না। কলিযুগে ব্রাহ্মণদের সেরূপ ক্ষমতা নাই; সেই জন্য এ যুগে গোবধ নিষিদ্ধ হইয়াছে।' এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ গোহত্যার বিরুদ্ধে অশেষ শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কাজীকে গোবধের অপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন। কাজী তাঁহার অগ্রগুনীয় যুক্তিবলে পরাজিত হইয়া গেলেন। গৌরচন্দ্র পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "মামা! আর একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঠিক উত্তর দিবেন।"

কাজী উত্তর করিলেন, "যাহা ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর।"

গৌর। আচ্ছা! আপনি তো পূর্ব্বে মৃদঙ্গ করতাল ভাঙ্গিয়া দিয়া সংকীর্তন নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহার পরে এখন পর্য্যন্ত প্রবলতর রূপে কীর্ত্তন হইতেছে, তথাচ আর বাধা দেন না কেন ? আপনারা মুসলমান, হিন্দুর আচার আচরণে বাধা দেওয়া ধর্ম্ম মনে করিয়া থাকেন; তবে কেন এখন এত সদ্ব্যবহার করিতেছেন ?'

কাজী উত্তর করিলেন "একটু নিভৃতে চল, এ কথার জবাব দিব।"

শচীনন্দন চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ সকল লোক আমার অন্তরঙ্গ, যাহা বলিবার থাকে, নিঃশঙ্কে বলিতে পারেন।"

তখন অনুতপ্ত কাজী ধীর গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেনঃ—"তোমার কীর্ত্তন আরম্ভের পর পাষণ্ডীরা তোমার বিরুদ্ধে আমাকে কত কথা শুনাইয়াছে। তাহারা বলে, "নিমাই পণ্ডিত শাস্ত্রোক্ত হিন্দুধর্ম্ম নাশ করিয়া কোথা হইতে এক অদ্ভুত কীর্ত্তন আনিয়াছে, অষ্টপ্রহর তাহা গাইয়া

মাতালের মত হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় ও ধূলায় গড়াগড়ি যায় ও অসম্বদ্ধ বকে। পূর্ব্বে মঙ্গলচণ্ডী বিষহরির পূজায় কেবল রাত্রি জাগরণ হইত, এখন প্রত্যহই রজনী জাগরণ; তাহাদের দৌরাত্ম্যে রাত্রিতে কেহ ঘুমাইতে পারে না। আপনি বিচারক। আপনিই ইহার বিচার করুন।" আমি তাহাদের অভিযোগের তদন্ত জন্য একদিন দুই এক স্থানে যাইয়া মৃদঙ্গ মন্দিরা ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন নিষেধ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু সেই রজনীতে স্বপ্ন দেখিলাম যে এক নরদেহ সিংহমুখ বিকটাকার পুরুষ আসিয়া তর্জ্জন করিয়া আমার বুকে বসিয়া বিশাল নখ ও দশন দিয়া আমার বুক বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং দন্ত কড়মড় করিয়া বলিতে লাগিল :—"আরে! দুষ্ট! আমার কীর্ত্তনে তুই উৎপাত করিস্? এত বড় স্পর্দ্ধা? মৃদঙ্গের বদলে তোর বুক ফাড়িয়া দিব। আর যদি কিছু বলিস্, তবে সবংশে যবনকুল ধ্বংস করিব। আজ আর কিছু বলিলাম না।"

গৌর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তার পর?'

কাজী। "আমি স্বপ্ন অমূলকজ্ঞানে ভীত না হইয়া কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য পেয়াদা নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু কোথা হইতে অগ্নি উঠিয়া লাগিয়া তাহাদের দাড়ি গোঁপ পুড়িয়া যাওয়ায়, তাহারা ভয় পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কেহ কেহ কীর্ত্তন শুনিয়া ভাবাবেশে মত্ত হইয়া হরে! কৃষ্ণ! বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে ও কেহ কেহ বা পাগল হইয়া গিয়াছে। আমি ইহাও আকস্মিক ঘটনাজ্ঞানে গ্রাহ্য না করিয়া আজ তাহাদের কত তিরস্কার করিতেছিলাম। কিন্তু সেই দৃশ্য! সেই ভীষণ সিংহ আবার আসিয়া যেন আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত! এবার স্বপ্ন নয়, সত্যই দুর্জ্জয়সিংহ! তখন আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া মূর্চ্ছিত হইলাম, অনুচরবর্গ ইহার রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই দেখ আমার বুকে তাহার নখ চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।" এই বলিয়া কাজী বস্ত্র উন্মোচন করিয়া বুক দেখাইলে সকলে সেখানে নখ দন্তের চিহ্ন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। কাজী আবার বলিতে লাগিলেন, "গৌরহরি! আমি এখন নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে ভগবানের শক্তি পূর্ণরূপে তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া এই সংকীর্ত্তনযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে; আমি আর ইহাতে বাধা দিতে পারি না, দিলে দেবদ্রোহী হইব।" বলিতে বলিতে কাজীর নয়ন যুগল দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

তখন শচীনন্দন কাজীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া পরমাত্মীয়জ্ঞানে বলিতে লাগি

লেন "মামা! তুমি বড় ভাগ্যবান্, তাই 'হরে কৃষ্ণ, নারায়ণ,' নাম গ্রহণ করিলে! যে নাম লইলে মহাপাপী উদ্ধার হইয়া যায়, তুমি তাহাই উচ্চারণ করিলে; তোমার শরীরে আর পাপ নাই।"

কাজী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "নিমাই! তোমার প্রসাদে আমার সব কুমতি দূর হইয়াছে; এখন আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমাতে আমার ভক্তি ও বিশ্বাস অচল থাকে।"

গৌর বলিলেন, "পতিতপাবন শ্রীহরি আপনার মঙ্গল করিবেন; কিন্তু মামা! আমাকে একটী ভিক্ষা দাও, যেন নবদ্বীপে আর হরিসংকীর্ত্তনের বাধা না হয়।"

কাজী উত্তর করিলেন, 'যাবৎ আমার বংশ থাকিবে, আমি তালাক দিতেছি, কেহই সংকীর্ত্তনে বাধা দিতে পারিবে না।'

কাজীর অধস্তন বংশীয়েরা বরাবর এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছিলেন। শুনিতে পাই এখনও ঐ বংশ বিদ্যমান্ আছে; এখনও নাকি ঐ বংশীয় মুসলমানেরা বৈষ্ণব অতিথি উপস্থিত হইলে পরম সমাদরে সেবা করিয়া থাকেন।

গৌরচন্দ্র কাজীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। অসংখ্য মৃদঙ্গ করতালের শব্দের সহিত অসংখ্য মানবকণ্ঠ সম্মিলিত হইয়া পূর্ণিমার নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল; নবদ্বীপপুরী যেন সুখতরঙ্গে ভাসিতে লাগিল; আনন্দ-বিহারী সংকীর্ত্তন-দলে জীবন্তরূপে উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন; ভক্তবৃন্দের চিত্তচকোর পরিতৃপ্ত হইয়া গেল; প্রেমবন্যার খরতর স্রোতে কত কত পাষণ্ডীদিগের চিত্তরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ হাবুডুবু খাইতে খাইতে ভাসিয়া চলিল; সকল উৎপাত শান্তি হইয়া ভগবানের মহিমা মহীয়ান্ হইল; এবং গৌরের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। গৌর আজ প্রেমানন্দে ভরপুর, কাজীর কণ্ঠ ধরিয়া হরিবোল বলিতে বলিতে রাজপথ দিয়া নাচিয়া চলিলেন। অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিয়া কাজী গৌরের নিকট বিদায় হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কাজীর উপাখ্যান সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতের বর্ণনার সহিত চৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণনার বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। ভাগবতের মতে কিছু অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হওয়ায় চরিতামৃতের মতানুসারেই বর্ত্তমান প্রস্তাব

লিখিত হইল। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে, গৌরচন্দ্র কাজীর গৃহে উপস্থিত হইয়া লোকদিগকে কাজীসাহেবের ঘর, বাড়ী, বাগান, ভাঙ্গিতে আর তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কাজী পলায়ন করিলে গৌরের উন্মত্ত দল কাজীর ঘর দুয়ার, বাগান, বাড়ী, ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন শচীনন্দন ক্রোধে অধীর হইয়া কাজীর বাড়ীতে আগুণ লাগাইয়া পোড়াইয়া ফেলিতে বলিলে ভক্তগণ নানা স্তব স্তুতি করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। তাই কাজী রক্ষা পাইয়াছিলেন। অবশেষে গৌরচন্দ্র কাজীকে দণ্ড দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল কি না ও কি করিয়াই বা তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইল, ভাগবতের বর্ণনায় তাহার কোন কথা লেখা নাই। দণ্ড দেওয়ার অর্থ যদি কাজীর ঘর বাড়ী বাগান ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়; তবে প্রস্তাবটী বড়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে ও সংকীর্ত্তন প্রচারের মূল উদ্দেশ্যে কুঠারাঘাত করা হয়। আর যদি ঘরদ্বার ভাঙ্গিয়া ও দগ্ধ করিয়া ফেলা রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কাজীর আসক্তির ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া পাপবনে আগুণ লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়; তাহা হইলে প্রস্তাবিত কথার সামঞ্জস্য হইলেও উপাখ্যানটী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; কারণ কেমন করিয়া কাজীর পাপাসক্তি নষ্ট করিয়া তাহাকে উদ্ধার করা হইল; তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। কিন্তু যে ভাবের বর্ণনা দেখা যায়, তাহা হইতে আধ্যাত্মিক ভাব উদ্ধার করা বড়ই কঠিন। আমরা জানি যে বৃন্দাবন দাস মহাশয় একজন উচ্চশ্রেণীর ভক্ত; গৌরচরিতে কঠোর অপ্রেমের দোষারোপ করা তাঁহার মনে থাকিতে পারে না; কিন্তু তাঁহার বর্ণনা দেখিয়া তাহা বুঝা যায় না। সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে এ কথা এখানে বলিতে হইল। ইহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, ভক্তপাঠক অবশ্যই মার্জ্জনা করিবেন।

সে যাহাহউক কাজী বিদায় হইয়া গেলে সঙ্কীর্ত্তনের দল শঙ্খবণিক পাড়া, তন্তুবায়পাড়া প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থান সকল প্রদক্ষিণ করিয়া গাদিগাছা, আঁতুদিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সকল নগরই শোভনীয়রূপে মণ্ডিত, পথের দুই ধারে দীপমালা, আম্রশাখা ও কদলীতরুরাজি, নানাবিধ পুষ্পমালায় শোভা পাইতেছে, পুরাঙ্গনারা উলুধ্বনি ও শঙ্খনাদ করিতেছেন, আর খই কড়ি, কুসুম স্তবক, বর্ষণ করিতেছেন; নগরবাসিগণ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আজ মহামহোৎ-

সুরে মাতিয়াছে। ভক্তদল মত্তমাতঙ্গের ন্যায় নাচিতে নাচিতে অবশেষে নগরের শেষ প্রান্তে শ্রীধরের ভগ্ন কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো উদয় হইল; ভগ্ন কুটীর রাজপ্রাসাদে পরিণত হইল। তাই তরকারীবিক্রেতা প্রেমানন্দে ঢলিয়া ঢলিয়া নাচিতে লাগিলেন। ঘরের দুয়ারে একটী নানা স্থানে তালি দেওয়া জলপূর্ণ লৌহপাত্র ছিল। বাহিরের কাজে লাগাইবার জন্য গৃহস্বামী ঐ পাত্রটী বাহির দুয়ারে রাখিতেন। গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তনের শ্রমে পিপাসিত হইয়া ঐ পাত্রের জল পান করিয়া ফেলিলেন। শ্রীধর দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া "মারিলে রে! মারিলে রে! আমাকে সংহার করিতে তুমি এখানে আসিয়াছ!" বলিতে বলিতে দৌড়িয়া আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ বলিলেন "প্রভু! উহা অপবিত্র জল, পান করিবেন না।" শচীনন্দন উত্তর করিলেন "কি? ভক্তের জল অপবিত্র? তবে পবিত্র কি? আজ আমি এই অমৃত জল পান করিয়া পরম পবিত্র হইলাম।" গৌরের নয়ন দিয়া আনন্দ ধারা পড়িতে লাগিল।

তখন শ্রীধরঅঙ্গনে একটা মহাপ্রেমের তরঙ্গ উঠিয়া পড়িল। প্রভুর ক্রন্দনে ভক্তদল সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। হাজার হাজার লোকের রোদন ধ্বনিতে আকাশ তোলপাড় হইয়া গেল। এখন আর কীর্ত্তন নাই; কেবল ক্রন্দন আর লুণ্ঠন। এই স্বর্গের দৃশ্য যিনি দেখিলেন, তিনিই কৃতার্থ হইয়া গেলেন। রজনীপ্রভাতে সংকীর্ত্তন দল গৌরের আঙ্গিনায় ফিরিয়া আসিলে, ভক্তগণ যে যাহার আবাসে চলিয়া গেলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ—বিশ্বরূপ দর্শন।

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রাতঃকালে ভক্তদলের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য গোপীভাবে নৃত্য করিতেছেন। বিশ্বম্ভর কার্য্যান্তরে নিজগৃহে অনুপস্থিত। নিত্যানন্দ নগরভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। আজ অদ্বৈতের প্রেম-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। দন্তে তৃণ করিয়া অতি দীনভাবে তিনি ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন। কখন কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন; এবং কখন মহাভাবে মগ্ন হইয়া নাচিয়া বেড়াইতেছেন। বেলা দুই প্রহর

হইয়া গেল, তথাচ তাঁহার ভাবের জমাট ছুটিল না। তখন সকল ভক্ত তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিছু স্থির হইয়া আচার্য্য বিষ্ণুমণ্ডপের দুয়ারে মৌনভাবে বসিলেন দেখিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে অদ্বৈতের ভাবসিন্ধু আবার উদ্বেলিত হইল। তিনি একাকী ভাবাবেশে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ বিশ্বম্ভর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অদ্বৈতকে ইঙ্গিত করিয়া উভয়ে বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন "আচার্য্য গোঁসাই! আজ কি দেখিতে চাও?"

অদ্বৈত উত্তর করিলেন, "যাহা দেখিবার সাধ ছিল, সে সবই তো দেখিয়াছি; নূতন আর কি দেখাবে?"

বিশ্বম্ভর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—'নূতন সাধ কি কিছুই নাই?'

অদ্বৈত। আছে—একটা সাধ; কিন্তু যদি মনে কর যে আমি তোমাকে পরীক্ষা কর্‌ছি, তবে না বলাই ভাল।

বিশ্বম্ভর। তা' হলে এ টুকুও তো না বলাই ভাল ছিল।

অদ্বৈত। তবে শুন। রথোপরি শ্রীকৃষ্ণের যে বিরাট্ রূপ দেখিয়া অর্জ্জুন্ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ দেখিতে বড় সাধ হয়। এই কথার প্রতিধ্বনি আকাশে বিলীন হইতে না হইতে আচার্য্য সেই ক্ষুদ্র গৃহে কুরুপাণ্ডবের সমরভূমি দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যস্থলে অর্জ্জুনের রথ সংস্থাপিত; তাহার উপরে ভগবান্ বিরাট্‌রূপ ধারণ করিয়া সমাসীন; কুন্তীনন্দন ভয়ে ত্রস্ত হইয়া জোড় হাতে ভগবানের স্তব করিতেছেন। ভগবানের দেহমধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, চরাচর স্থাবর-জঙ্গম সমাশ্রিত; কোটি কোটি সৌরজগতের অগণ্য সিন্ধু, গিরি, নদ, নদী, চন্দ্র, সূর্য্য, বন, উপবন, পশু, পক্ষী, নর, নারী, শোভা পাইতেছে; সহস্র সহস্র হস্ত, পদ, মুখ, নাসিকা, গ্রীবা, উর্দ্ধে তদূর্দ্ধে বিলীন হইয়াছে; মস্তক সমূহের কিরীট অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে; সহস্র সহস্র হস্ত, পদ, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; আকাশ, কাল, মাস, ঋতু, সম্বৎসর, শোভা, সৌন্দর্য্য, প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতা, কাম, ক্রোধাদি, শম, দম, তিতিক্ষাদি, অনন্ত শক্তিরাজি, ক্রীড়া করিতেছে; লোকভঙ্গনিবারণার্থে ভগবান্ সেতু-স্বরূপ হইয়া সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আচার্য্য গোঁসাই ঐরূপ

খিয়া বিহ্বল হইয়া গেলেন ও দন্তে তৃণ করিয়া বিশ্বম্ভরের চরণযুগলে ড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বাহির দিক্ হইতে কপাটে াঘাত পড়িতে লাগিল; বিশ্বম্ভর বুঝিলেন, নিতাই নগরভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন তিনি শীঘ্রগতি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলে নিত্যানন্দ গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিতাইও বিরাট্‌রূপের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং নির্নিমেষ লোচনে দেখিতে দেখিতে ভাবসাগরে ড়বিয়া গেলেন। বিশ্বম্ভরের ঐশ্বর্য্যভাব উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইতে লাগিল। তিনি প্রশান্ত বাক্যে উভয়কে সম্বোধন করিয়া 'দেখ! দেখ!' লিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ দেখিতে দেখিতে নিমীলিত নেত্রে ভূমিতে ড়িয়া গেলে, বিশ্বম্ভর কোলে তুলিয়া নানা রূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া সুস্থ করিলেন। অনন্তর কিছুকাল পরে ভাবের নেশা ছুটিয়া গেলে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে প্রেমকলহ বাঁধিয়া গেল। অদ্বৈত বলিলেন, "কোথা হইতে াতালটা আসিয়া সব গোলমাল করিয়া দিলে? ও কি দেখিতে কি দেখে? কি বলিতে কি বলে? তাহার কিছুরই ঠিক নাই। ওর জাত নাই, কুল নাই, ার তার ভাত খায়, আবার বলে আমি পরমহংস। পরমহংসগণ আত্মারাম যোগী। ওটা কেবল ব'কে ব'কে মরে ও যা'তা অসম্ভব কথা বলে।"

নিতাই জবাব দিলেন "বটে বুড়ো বামন্! তোর ভীমরথি হয়েছে; ইলে দেবতার বরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখিস্ ও আবার সাহস করে বলিস্ র ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেছিস?"

অদ্বৈত সুর করিয়া "আমি তো দেখেছি! দেখেছি! দেখেছি।" বলিতে লিতে নাচিতে লাগিলেন।

নিতাই। "তবে আমিও তো দেখেছি, দেখেছি, দেখেছি," বলিয়া তমনি করিয়া নাচিতে লাগিলেন।

বিজয়দাস আখরিয়া।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন—'ব্রহ্মচারিন্! াজ তোমার গৃহে আমাদের মধ্যাহ্ন নিমন্ত্রণ। তুমি স্বহস্তে পাক করিও, যেন আর কাহাকেও রাঁধিতে ডাকিও না।" শুক্লাম্বর ভিক্ষুক সন্ন্যাসী; বিশ্বম্ভরের এই কথা শুনিয়া মহাচিন্তিত হইলেন। কেমন করিয়া তাঁহার স্পৃষ্টান্ন নিমাইপণ্ডিতের ন্যায় ব্রাহ্মণপুত্র খাইবেন, ইহাই তাঁহার ভাবনা

হইল; অথচ তিনি প্রভুর আদেশ অন্যথাও করিতে পারেন না। ভক্ত
তাঁহার চিন্তা দেখিয়া পরামর্শ দিলেন যে, 'গঙ্গাজলে আলগোছে পাক চড়াই
দিবে, প্রভু যাইয়া স্বহস্তে তাহা নামাইয়া লইবেন।' ভিক্ষুক তাহাই করি
চলিল। গঙ্গাতীরে ঘাটের উপরে তাহার কুটীর। সেই কুটীরের পিড়া
উনুন পরিষ্কার করিয়া গর্ভথোড় ভাতে দিয়া সে পাক চড়াইয়া দিল। গ
থোড় ব্যতীত সে দিন তাহার আর কোন তরকারী সংগ্রহ হইল ন
যথাকালে নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বম্ভর স্নানান্তে আর্দ্র বস
ব্রহ্মচারীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "শুক্লাম্ব
ভোজনের কি আয়োজন করেছো?" ব্রহ্মচারী কাঁদিতে কাঁদিতে বলি
লাগিলেন—"প্রভু! আমি দরিদ্র ভিক্ষুক, তোমার ভোজনের যোগ্য সাম
কোথায় পাইব? গর্ভথোড় মাত্র সম্বল ছিল, তাহাই ভাতে দিয়া ভ
চড়াইয়াছি; তুমি নামাইয়া লও" এই বলিয়া উনুনের দিকে অঙ্গু
সঙ্কেত করিলেন। বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি নামাইয়া দ
না কেন?"

শুক্লাম্বর। "বাপ্ রে! তা পার্‌বো না; অনেক করেছি, এই পাপ হা
তোমাকে অন্ন দিতে পারিব না। তোমার চরণে ধরি প্রভু! আমা হই
এ কাজ হইবে না। তুমি নামাইয়া খাও।"

বিশ্বম্ভর ভিক্ষুকের গতিক দেখিয়া নিজেই ভাতগুলি ঢালিয়া ল
উপস্থিত কয়েক জনের জন্য পরিবেশন করিয়া ভোজনে বসিলেন।
একগ্রাস খাইয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন "অহে শুক্লাম্বর! আমি সত্য বলিতে
এমন সুস্বাদু গর্ভথোড় তো কখন খাই নাই; আচ্ছা বল দেখি অ
গোছে এমন সুস্বাদু পাক কেমন করিয়া করিলে? সন্ন্যাসী ভয়ে
সঙ্কোচে জড় সড় হইল; মনে করিল, বুঝি গৌরাঙ্গ ব্যঙ্গ করিতেছে
কিন্তু সে যখন দেখিল যে, তাহার রন্ধনের সুখ্যাতি করিতে করিতে গৌ
গণ্ড দিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল, তখন তাহার আর কোন স
থাকিল না। অপূর্ব্ব ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। এ
বিশ্বম্ভরের প্রেম-ভোজন সমাপ্ত হইলে আচমন করিয়া বন্ধুগণের সা
ভিক্ষুকের কুটীরে বসিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন এবং নানা প্র
সৎপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভক্তগণ সঙ্গে বিশ্বম্ভর সেইখা
শয়ন করিলেন। বিজয়দাস নামে জনৈক ভক্ত বিশ্বম্ভরের পার্শ্বে শুইতে

বিজয়দাসের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও পরিষ্কার; এবং তিনি অতি অল্প সময়ে অনেক লিখিতে পারিতেন। তাঁহার ব্যবসায় পুঁথি লেখা। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় এক শ্রেণীর লোককে গ্রন্থ লিখন কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইত। তাহাদিগকে সচরাচর 'আখরিয়া' বলিত। বিজয়দাস এই শ্রেণীর লোক। সে ইতিপূর্ব্বে বিশ্বম্ভরকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছে। পুস্তক লিখনবিষয়ে তাহার ক্ষিপ্রহস্ততা ও লিপিচাতুর্য্য দেখিয়া গৌরাঙ্গ তাহার নাম 'রত্নবাহু' রাখিয়াছিলেন। সে প্রভুর বড় প্রিয়পাত্র; তাই আজ তাঁহার পার্শ্বে শুইতে জায়গা পাইয়াছে। কিছুকাল পরে সকলেই নিদ্রিত হইলেন। গৌরচন্দ্র নিদ্রাবেশে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বিজয়ের অঙ্গে চাপাইয়া দিলে বিজয় অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইল। সে দেখিল, স্তম্ভের ন্যায় অতি দীর্ঘ ও সুবলিত একখানি হস্ত আসিয়া তাহার উপর পড়িল; উহাকে নানা রত্ন অলঙ্কার বিভূষিত ও সূর্য্যকান্তমণি ও চন্দ্রকান্তমণি জ্বলিতেছে; আর তাহার জ্যোতিতে সমস্ত গৃহ জ্যোতিঃপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিজয় আনন্দ ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া আর সকলকে ডাকিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে বিশ্বম্ভর তাহার মুখে হস্ত দিয়া নিবারণ করিয়া বলিলেন, "যত দিন আমি নবদ্বীপে থাকি, তত দিন এ কথা কাহাকও বলিও না।" তথাচ বিজয় সুস্থির থাকিতে পারিল না; সে লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিল। তাহার হুঙ্কার শব্দে ভক্তগণ আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া 'কি হইল? কি হইল?' জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিজয় কোন উত্তর না দিয়া পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভক্তগণ তাহাকে ধরিয়া বসাইতে গেলে অমনি সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ভক্তগণ বুঝিলেন, হয়ত সে প্রভুর কোন বৈভব দর্শন করিয়া থাকিবে। গৌরচন্দ্র এতক্ষণ শুইয়া ছিলেন; গোলযোগ শুনিয়া উঠিয়া বিজয়কে তদবস্থ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন যে "বিজয়ের গঙ্গার উপর বড় অনুরাগ, হয়ত গঙ্গার মহিমা-পূর্ণ কোন ঐশ্বর্য্য দেখিয়া থাকিবে; নচেৎ শুক্লাম্বরের এই গৃহে দেবাধিষ্ঠান আছে। নইলে এমন হইবে কেন? কৃষ্ণই ইহার গূঢ় রহস্য জানেন।" ভক্তগণ প্রভুর এই কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর বিজয়ের অঙ্গে হাত দিয়া নানা প্রকারে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। চেতনা লাভ করিয়াও বিজয় প্রকৃতিস্থ হইল না; কতক দিন পর্য্যন্ত সে আহার নিদ্রা প্রভৃতি দেহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া

জড়ের ন্যায় নির্ব্বাক্ অবস্থায় নবদ্বীপের পথে পথে বেড়াইতে লাগি
অনেক যত্নের পর বহুদিন পরে সে স্বাস্থ্য লাভ করিল; কিন্তু বিশ্বম্ভ
আজ্ঞানুসারে প্রকৃত রহস্য কাহাকেও ভাঙ্গিয়া বলিল না।

শ্রীবাসের পুত্রশোক।

সন্ধ্যার সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবাসের বাহির বাটীতে প্রমত্ত ভা
সংকীর্ত্তন হইতেছে। গৌরচন্দ্র প্রেমে বিভোর হইয়া খুব নৃত্য করি
ছেন। ভক্তগণ নিমগ্ন ভাবে প্রভুর নৃত্য দেখিতেছেন, আর সংকী
করিতেছেন। কয়েক দিন হইতে শ্রীবাসের একটী বালক ব্যাধিগ্রস্ত হই
শয্যাগত ছিল; আজ হঠাৎ তাহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় বাটীর ম
ক্রন্দনের রোল উঠিল। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে নৃত্য কীর্ত্তন করি
ছিলেন; রোদনের শব্দ শুনিয়া কারণ বুঝিতে পারিয়া কাহাকেও কিছু
বলিয়া আস্তে আস্তে দ্বার উন্মোচন করিয়া উঠিয়া আসিলেন। গৌর
কৃষ্ণানন্দে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে ছিলেন, সুতরাং কিছু বুঝিতে পারিলে
না। পণ্ডিতজী মহাজ্ঞানী, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গের একান্ত ভক্ত; বা
মধ্যে আসিয়া ধীর গম্ভীর ভাবে স্ত্রীদিগকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করি
লাগিলেন। তিনি বলিলেন "দেখ আয়ুঃক্ষয় হইলে কেহ তাহাকে রাখি
পারে না। এই শিশুর যত দিন কর্ম্ম নির্ব্বন্ধ ছিল, সে তত দিন আমা
পুত্র হইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল; এক্ষণে তাহার কর্ম্মবন্ধ শেষ হই
এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিল। ভাবিয়া দেখ, কে কাহার পুত্র
আর কেইবা কাহার পিতা মাতা? অন্তকালে যে কৃষ্ণের নাম শুনিলে মো
লাভ হয়, সেই প্রভু স্বয়ং আমাদের গৃহে নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন। ইহা
কি আর শোক করিতে আছে? এই শিশুর পরম ভাগ্য যে এমন স
পরলোকগামী হইল।" মহিলাগণ ইহাতেও ক্রন্দন সম্বরণ করিল না দেখি
শ্রীবাস কিছু দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "যদি তোমরা মায়াভি
হইয়া একান্তই রোদন সম্বরণ না করিতে পার, তবে আমার এই অনুরো
যে কিছুক্ষণ পরে কাঁদিও। তোমাদের ক্রন্দন ধ্বনিতে যদি প্রভুর নৃত্যে
ভঙ্গ হয়, তবে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ছেলে তো গেলই; আমিও সেই স
গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিব।" এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকেরা অগত্যা
করিল। মৃত শরীরের নিকট তাঁহাদের বসিয়া থাকিতে বলিয়া বিশ্বা

বাস বাহির বাটীতে যাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন, যেন কিছুই হয় নাই। ধন্য পণ্ডিত! তুমিই ধন্য! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা ও প্রভুভক্তি।

শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত একে একে ভক্তগণ সকলেই পণ্ডিতের পুত্রবিয়োগের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। কিন্তু পাছে প্রভুর নৃত্যসুখ ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কেহই কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। রজনী প্রায় শেষ হইলে মহাপ্রভুর বাহ্য জ্ঞান হইল। তিনি সকলের মুখপানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমাদের সকলেরই মুখ মলিন দেখিতেছি কেন? পণ্ডিতের গৃহে তো কোন অমঙ্গল হয় নাই?" শ্রীবাস উত্তর করিলেন, "যাহার ঘরে তোমার প্রসন্ন মুখ, তাহার দুঃখ কিসের?" কিন্তু আর সকলে পণ্ডিতের পুত্র বিয়োগের সংবাদ বলিয়া দিলেন। গৌরচন্দ্র কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতক্ষণ?" তাঁহারা বলিলেন, "চারি দণ্ড রাত্রির সময়; কিন্তু তোমার আনন্দ সুখ ভঙ্গ হইবে ভয়ে পণ্ডিতজী একথা প্রকাশ করিতে দেন নাই। আড়াই প্রহর হইল শিশু মরিয়াছে, এক্ষণেও তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয় নাই; ইহাতে যেমন অভিপ্রায় হয়।"

শ্রীবাসের এই অদ্ভুত চরিত্রের কথা শুনিয়া গৌরচন্দ্র "গোবিন্দ! গোবিন্দ!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; এবং কাঁদিতে কাঁদিতে মনের গূঢ় কথা, যাহা এতদিন কাহাকেও জানিতে দেন নাই, প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, "হায়! যাহারা আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পুত্রশোক পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়; আমি কোন্ প্রাণে তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব?"

শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে 'ত্যাগ' কথা শুনিয়া ভক্তগণ বিষম চিন্তিত হইলেন, ও ভাবিতে লাগিলেন, "কাহাকে ত্যাগ করিবেন?" কিন্তু বিশেষ কথা কিছু বুঝিতে না পারিয়া কেহ এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। এ দিকে গৌরচন্দ্র ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া সবান্ধবে মৃত পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিতে উঠিলেন এবং বাটীর মধ্যে যাইয়া মৃতকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"শ্রীবাসের গৃহ ছাড়িয়া কেন যাইতেছ?" মৃত উত্তর করিল "যাহা নির্ব্বন্ধ ছিল, হইয়া গেল; এক্ষণে অন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিলাম। নিয়তিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না আপনি কি জানেন না, কেহই কাহারও পিতা মাতা নহে? জীব স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; যত দিন শ্রীবাসের গৃহে নির্ব্বন্ধ ছিল, তত দি

এখানে ছিলাম। এক্ষণে আমি চলিলাম, তোমাকে সপার্ষদে প্রণা
আমার অপরাধ লইও না; বিদায়।" এই বলিয়া মৃত শরীর নীরব হই
দ্রষ্টৃবর্গ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গেল; শ্রীবাসের প
জনবর্গ এতক্ষণ শোক করিয়া কাঁদিতেছিল; এই অলৌকিক ঘটনায় তাঁ
দের শোক দূর হইল। সকলেই প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া মহাপ্রভুর ম
ঘোষণা করিতে করিতে প্রেমাশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডি
চারি ভাই মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন। পণ্ডি
বলিলেন—"প্রভো! তুমিই আমার পিতা মাতা ও পুত্র; এ সংসারে আম
আর কেহ নাই; বিপদে সম্পদে রোগে শোকে, যে অবস্থায় থাকি না কে
তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমাতে অচলা ভক্তি থাকে।"

গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন "শ্রীবাস! তুমি তত্ত্বজ্ঞানী পরম বিবেকী,
সংসারের অনিত্যতা তোমার কিছুই অবিদিত নাই। এ সংসারের ধ
জন যৌবন সুখ সম্পদ, সকলই বিদ্যুতালোকের ন্যায় চকিত দেখা দি
কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়? আমি আর তোমাকে কি বুঝাইব? এ সং
রের দুঃখ তোমার ন্যায় জ্ঞানীকে ত অভিভূত করিতেই পারে না;
তোমার সংসর্গ করে, সেও ইহাতে মুগ্ধ হয় না।" মালিনীর দিকে তাক
ইয়া গৌর আবার বলিতে লাগিলেন, "মা! পিতা! আজ হইতে তোম
আমার পিতা মাতা হইলে; আমি ও নিত্যানন্দ তোমাদের যুগল নন্দ
এক পুত্র গেল, দুই পুত্র পাইলে; ইহাতে আর শোক কি?"

গৌরের এই কারুণ্যময় কথা শুনিয়া শ্রীবাস মালিনীর শোক সন্ত
প্রাণ গলিয়া গেল; ভক্তবৃন্দ চারিদিকে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং শ্রীব
অঙ্গনে প্রেমতরঙ্গ খেলিতে লাগিল। যাহা হউক, শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত
সমভিব্যাহারে বালকের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া ঔর্দ্ধদেহিক ক্রি
সম্পন্ন করিলেন।

গোপীভাব।

এখন হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মভাব নিত্য নূতন শ্রী ধারণ করি
লাগিল। দিবা নিশি, গৃহে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, চত্বরে, প্রাঙ্গণে নয়
বহিয়া অবিরল ধারে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। ইহার উপরে তি
যদি কাহাকেও কোন গতিকে হরি বলিতে শুনিতে পাইতেন, অম

ভাবের ঘরের কপাট খুলিয়া গিয়া, কম্প, পুলক, ও মহাভাব তাঁহাকে আত্মহারা করিয়া তুলিত। এক হরিনামের মধ্যে তিনি এত সৌন্দর্য্যপূর্ণ মাধুর্য্য দেখিতেন যে, নাম শ্রবণে একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন; কি বলিতেন, কি করিতেন, কোথায় যাইতেন, কিছুরই ঠিক থাকিত না। কখন তিনি ভূমিতলে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেন, কখন ভাবে নিমগ্ন হইয়া তুষ্ণী-ম্ভাব অবলম্বন করিতেন, কখন মহাক্রোধাবেশে পাষণ্ডী-সংহার করিতে চাহিতেন এবং কখন স্বানুভবানন্দে বিভোর হইয়া "আমি সেই, আমি সেই," বলিয়া চীৎকার করিতেন। বন্ধুগণ এই অবস্থায় তাঁহার শরীর রক্ষার্থ সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। পান ভোজন আদি দৈহিক ক্রিয়ার কিছুই ঠিকানা থাকিত না। কেবল জননীকে দেখিলে বা তাঁহার নাম শুনিলে গৌরচন্দ্র কিছু প্রকৃতিস্থ হইতেন। এই জন্য যে, পাছে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মায়ের প্রাণে ব্যথা লাগে। এক দিন ভাবাবেশে গৌর শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন "শ্রীবাস! আমার বাঁশী কৈ?" পণ্ডিত বলি-লেন, 'তোমার বংশী গোপীগণ হরণ করে লয়েছেন।' এই কথায় শচীনন্দন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া আবেশে "বোল! বোল!" বলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিত তাঁহার মনোগতি বুঝিয়া ভাগবতের রাসাধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। প্রথমে বৃন্দাবন মাধুর্য্য বর্ণিত হইল, পরে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া যেরূপে গোপাঙ্গনারা নিকুঞ্জবনে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে যেমন করিয়া কৃষ্ণ কথোপকথন করিয়াছিলেন, যেরূপে তাঁহাদের সঙ্গে লীলা কৌতুক হইয়াছিল; কৃষ্ণান্তর্দ্ধান হইলে গোপীগণ যেমন করিয়া প্রতি তরু, লতা, পশু, পক্ষী, পর্ব্বত, নদীর নিকট ব্যাকুলান্তঃকরণে কাঁদিয়া বেড়া-ইয়াছিলেন; যেমন ভাবে মহারাসে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতি গোপীর স্কন্ধে হস্ত দিয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াছিলেন, যেমন করিয়া গোপীসঙ্গে পুলিন-ভোজন ও জলকেলই হইয়াছিল, সুবক্তা শ্রীবাস পণ্ডিত একে একে সুমধুর ভাষায় সকলি বর্ণনা করিলেন। শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর সুখসিন্ধু উথ-লিয়া উঠিল, তিনি গোপীভাবে মাতোয়ারা হইয়া কেবল "গোপী! গোপী! বৃন্দাবন, নিধুবন, মথুরা, গোকুল" প্রভৃতি নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে আবার ভাবান্তর উপস্থিত হইলে তিনি ভূপৃষ্ঠে ত্রিভঙ্গ মুরারি শ্যাম মূর্ত্তি লিখিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল পরে আবার "আমি জন্মে জন্মে কৃষ্ণদাস"

বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে স্বগৃহাভিমুখে চলিলেন। ভক্তগণ এ অবস্থায় তাঁহাকে তাঁহার গৃহ মধ্যে রাখিয়া আসিলে গৌরচন্দ্র ঘরের দা রাতে বসিয়া "গোপী' নাম উচ্চ করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। ব্রজ লীলার ছবি তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়াছিল; তাই গোপী ভাবের নে তখনও ছুটে নাই।

এই সময়ে একজন টোলের পড়ুয়া কার্য্যান্তরে আসিয়া তাঁহাকে 'গোপী নাম জপ করিতে শুনিতে পাইয়া বলিল "পণ্ডিত মহাশয়! (ছাত্রে এখনও গৌরকে পণ্ডিত শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকে।) 'গোপী' নাম জ করিয়া কি হইবে? কৃষ্ণ নাম বলুন যে পুণ্যোদয় হবে; গোপী নাম জ করিবার উপদেশ তো কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না।" অজ্ঞ পড়ুয়া প্রে ভক্তির কি জানিবে? তাই সে এইরূপে সম্বোধন করিল। গৌরচন্দ্র তখ ভাব মহলের অন্তঃপুরে; সুতরাং পড়ুয়াকে যে উত্তর দিলেন, তাহাও ভা ময়। তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণ তো চোর, লম্পট, ধূর্ত্ত ও মহাদস্যু; তাহা ভজনা করিলে কি হইবে? সে মহা কৃতঘ্ন। তা'না হলে সে বিনা দো বালী রাজাকে কেন প্রাণে মারিবে? ছলনা করিয়া বলী রাজাকে কে পাতালে পাঠাবে? স্ত্রীজিত হইয়াও কেন রমণীর নাক কাণ কাটিবে আর বাঁশীর গানে কুলবধূর কুল মজাইয়া কেন কলঙ্কিনী কর্‌বে? তা'ে ভজ্‌লে কি ফল?" এই বলিতে বলিতে বিশ্বম্ভর ক্রোধে অধী হইয়া সম্মুখস্থিত বৃহৎ যষ্টি হাতে লইয়া পড়ুয়াকে যেন মারিবার জ ধাবিত হইলেন। পড়ুয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া ঊর্দ্ধশ্বা ছুটিয়া পলাইয়া নিজ টোল মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অন্য অ পড়ুয়াদিগকে নিজ বৃত্তান্ত বলিয়া কত প্রকারে গৌরকে তিরস্কার করি লাগিল। পড়ুয়াগণ তাহার কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া নিমাই পণ্ডিতে মারিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। একজন বলিল "আরে ভাই! যে ভ বান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে, সে আবার কিসের বৈষ্ণব?"

দ্বিতীয় উত্তর দিল, "ব্রাহ্মণ সন্তানকে যে মারিতে যায়, সে ব্রহ্মহত কারী; তাহার ধর্ম্ম কোথায়?" তৃতীয় ছাত্র বলিল "ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মিথ কথা; বেটা সেয়ানা পাগল, দশটাকে উচ্ছন্ন দিবে, তাহারই চেষ্ট আছে।" চতুর্থ ব্যক্তি সাহঙ্কারে কহিল "সে মারিবে; আমরা কি অ মারিতে জানি না; মার অমনি পড়িয়া আছে আর কি।"

পঞ্চম ব্যক্তি কহিতে লাগিল "আরে! কাল তার সঙ্গে আমরা একত্র পড়িলাম; আজ সে মহা মহান্ত গোঁসাই হইয়া গেল! রাতারাতি স্বর্গে যাওয়া আর কি? সে না হয় জগন্নাথ মিশ্রের বেটা; আমরাও কর্ম্ম বরের ছেলে নই।"

এই প্রকারে দুর্দ্দান্ত পড়ুয়ার দল নগরের যেখানে সেখানে যাহার তাহার নিকট গৌরের কুৎসা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং তাঁহাকে দেখিলেই মারিবে, মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য স্বপ্ন।

রজনী ঘোরা। বিশ্বম্ভর গভীর নিদ্রায় অচেতন। তাঁহার শয্যাপার্শ্বে কেহ দাঁড়াইলে দেখিতে পাইত সে নিদ্রা কি সুখের নিদ্রা। অনিন্দ্য মুখশ্রীতে সুখ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে; ললাটে অল্প অল্প ঘর্ম্মবিন্দু, অধর ওষ্ঠ প্রকাশোন্মুখ কুসুমের ন্যায় ঈষৎ বিস্ফারিত, তাহাতে একটু হাসি মাখান, যেন জীবাত্মা কোন এক অদৃশ্য সুখজগতের সুখ-ভাণ্ডার লুঠ করিতেছে। বিশ্বম্ভর স্বপ্ন দেখিয়া আনন্দে হাসিয়া ফেলিলেন। এতদিন ধরিয়া যে চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে, সত্য সত্যই কি তাহা দেবা-দেশ? সত্য সত্যই কি তিনি নামপ্রেম প্রচারের জন্য প্রেরিত? সত্য সত্যই কি তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন আর দেবানুমোদিত নহে? আজ সুখময় স্বপ্নের মধ্য দিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা হইল বলিয়া গৌরের আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। পাঠক মহাশয়! সাবধানে গৌরের স্বপ্ন কথা শুনুন।

সেই গভীর নিদ্রার মধ্যে গৌরচন্দ্র স্বপ্ন দেখিলেন যেন, তিনি এক সুরম্য দেশে নীত হইয়াছেন, চারিদিকে কুসুম উদ্যান, তাহাতে নানা প্রকার সুগন্ধি ফুল ফুটিয়াছে, পাদমূলে কল্লোলিনী স্রোতস্বতী কল কল নাদে বহিয়া যাইতেছে; সেই ফুলবাগানের মাঝখানে একখানি পর্ণকুটীরে একজন মহাপুরুষ আসীন। গৌরচন্দ্রকে দেখিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, 'বিশ্বম্ভর! ধর্ম্ম জীবনের পথ কুসুমস্তরে বাঁধান নয়; এ পথ কণ্টকাবৃত ও বিপদসমাকুল। জাননা কি শাস্ত্রে ইহাকে শাণিত ক্ষুরধারের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে? এ পথের যাত্রীদের কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতে হয়; কল-

ক্ষের ডালি মাথায় তুলিয়া লইতে হয়; প্রাণকে তুচ্ছ করিতে হয়; তবে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করা যাইতে পারে।”

বিশ্বম্ভর সেই মহাপুরুষের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে অবনত মস্তকে বলিলেন, “আজ্ঞা এ সব তত্ত্ব তো জানি।”

মহাপুরুষ। “জান যদি তবে প্রতিপালন কর্‌ছো কই? পরিবার বা লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে গৃহস্থালী করিলে কি প্রভুর আদেশ প্রতিপালিত হইবে

বি। আমার প্রতি প্রভুর কি আদেশ?

মহাপুরুষ। ভুলেছো কি? কি জন্য তুমি প্রেরিত হয়েছো, তা কি জান না?

বি। কি জন্য?

মহাপুরুষ। কি জন্য? আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছো? দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে কামাদির সেবা করিয়া কি আত্মহারা হয়েছো?

হঠাৎ পূর্ব্ব কথা স্মৃতি-পথে উদিত হইলে যেমন হয়, বিশ্বম্ভর তেমনি সচকিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন “নাম প্রেম প্রচার কর্‌তে? বৈরাগ্য ও সেবা শিক্ষা দিতে? আদর্শ ভক্তের জীবন দেখাইতে? তা ভুলি নাই কিন্তু”—বলিয়াই গৌর কাঁদিয়া ফেলিলেন; “আমার মা—দুঃখিনী পুত্র বৎসলা মা—”

মহাপুরুষ। মোহ! মোহ! ছি! মোহ পরিত্যাগ কর। কে কার মা কে কার পুত্র? এ সকল সম্বন্ধের কর্ত্তা ঈশ্বর। তাঁহার ইচ্ছা সকলের উপর। সেই প্রভু যাহাকে যাহা করিতে বলেন, অবিচলিত চিত্তে তাহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

বিশ্বম্ভর কিছু দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন “গুরুদেব! আপনি মনে করিবেন না যে, আমি মোহের বশীভূত হইয়া কাঁদিয়াছি। সেই প্রভুই যেমন জীবনের নিয়ামক, তেমনি তাঁহারই ইচ্ছাতে, পিতা, মাতা, ভার্য্যা প্রভৃতি সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়া থাকে। এ সকল সম্বন্ধজনিত কর্ত্তব্যও অবশ্য প্রতিপালনীয়। আমি এত দিন ধরিয়া আমার জীবনের উভয় প্রকার কর্ত্তব্যের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছিলাম যে কিরূপে উভয়কে প্রতিপালন করা যাইতে পারে।”

মহাপুরুষ হাসিয়া উত্তর করিলেন, “তোমায় প্রেরণের সময় ভগবানের নামাঙ্কিত যে পত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেই এ বিষয়ের মীমাংসা করি

দেওয়া হইয়াছে। সাবধানে তাহা পাঠ করিবে। তোমার আত্মসুখের জন্য কিছুই নাই। আর তোমার সন্ন্যাসগ্রহণ অপরের ন্যায় কেবল ত্যাগের জন্যও নহে। সন্ন্যাস, বৈরাগ্য ও গার্হস্থ্য, এ তিনের সামঞ্জস্যই তোমার জীবনের প্রেরণা।"

বিশ্বম্ভর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে নিয়োগ পত্র কোথায়?"

মহাপুরুষ এবার কথা না কহিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া তাঁহার হৃদয়ের দিকে দেখাইলেন। বিশ্বম্ভর বুঝিলেন তাঁহার জীবনই সেই নিয়োগ-পত্র। ভগবান্ স্বহস্তে প্রেম, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য, একত্র মিশাইয়া তাহাতে বিবিধ সদ্গুণের রং ফলাইয়া সুবর্ণ অক্ষরে যে ত্বদীয় জীবনরূপ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই সকল তত্ত্বের মীমাংসা হইবে। ভাবিতে চিন্তিতে গৌরের দিব্য জ্ঞানোদয় হইল; ও সেই জ্ঞানের আলোকে আপনার কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়া লইলেন। তখন রাগে অভিমানে আপনার গলদেশের উপবীত খুলিয়া লইয়া ছিন্ন করিয়া বলিলেন "গুরুদেব! এই দেখুন, এই দণ্ডেই আমি জাত্যভিমানের মূল উৎপাটিত করিয়া ফেলিলাম। এক্ষণে আমাকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করুন।"

মহাপুরুষ আগ্রহ সহকারে গৌরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কাণে কি মন্ত্র বলিলেন। শচীনন্দন অমনি সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। "বিশ্বম্ভর! এদিকে দেখ" বলিয়া মহাপুরুষ ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। গৌরচন্দ্র সঙ্কেতানুসারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন নব জলধর শ্যামসুন্দর মদনমোহনরূপে বাঁশী বাজাইয়া গান করিতেছেন। সে গানের অর্থ "আয়! আয়! ধন, জন, কুল, মান, মাতা, ভার্য্যা, বন্ধু, বান্ধব, সকলই বিসর্জ্জন দিয়া আমার সেবায় আয়! আমার আদেশ প্রতিপালন ভিন্ন তোর আর কাজ নাই; যত দিন না আস্‌বি, ততদিন এমনি করে বাঁশীর গানে জ্বালাতন কর্‌বো।"

মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন, বাঁশীর গান নীরব হইল, শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি লুকাইয়া গেল, গৌরের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি জাগিয়া উঠিয়া শয্যায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন;—'আর ঘরে থাকিতে পারিলাম না; যেখানে আমার প্রাণ নাথ আছেন, সেইখানে যাইব। তিনি আমায় সত্য সত্যই ডেকেছেন। যোগীর বেশে দেশে দেশে বেড়াইয়া নাথের সেবা করিব; জীবন ধন্য হইবে।'

পরদিন প্রাতঃকালে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ প্রভৃতি হৃদয়বন্ধুদিগের নিক
এই আশ্চর্য্য স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন।

ভক্তগণ শুনিয়া চিন্তিত ও ভীত হইলেন। মুরারি গুপ্ত বলিলেন, "
মন্ত্র দানের অর্থ এই যে, তুমি স্বগোষ্ঠি লইয়া এই নগরেই হরিনাম মহা
আরম্ভ কর।"

গৌর উত্তর করিলেন "তোমরা ভাল বাসিয়া যাই বল ; আমার
কিন্তু প্রবোধ মানিতেছে না। আমি কেমন করিয়া প্রাণনাথের আ
উপেক্ষা করিব ? আমাকে তোমরা আর কিছু বলিও না। এই ব
কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরচন্দ্র উঠিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কেশব ভারতী।

দিনের পর দিন চলিয়া যায়। গৌরের প্রাণের মধ্যে সন্ন্যাসের গু
প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছে। সন্ন্যাসগ্রহণের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তাঁহ
কোন সন্দেহ ছিল না। উহা গ্রহণ করিতেই হইবে ; ঘর, দুয়ার, আত্মী
বন্ধু, মাতা, ভার্য্যার সহবাসের সুখ ছাড়িয়া বৈরাগীর বেশে দেশে দে
বেড়াইতেই হইবে ; নইলে প্রভুর আদেশ প্রতিপালিত হইবে না।
বিষয়ে তাঁহার কোন দ্বিধাই ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন সন্ন্যা
হইয়াও কি জননী ও আত্মীয়দিগের প্রতি কর্ত্তব্য করা যাইতে পারে ন
তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্ন্যাস লইয়া নিরুদ্দেশ হইলে পিতা সেই শো
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নিরুদ্দেশ হইলে তাঁহার জননীর যে
দশা হইবে না, তাহা কে বলিল ? তাই তিনি সন্ন্যাসের নূতন পন্থা ভাবি
ছিলেন। যাহাতে সন্ন্যাস ধর্ম্মও বজায় থাকে, অথচ গার্হস্থ্যের সম্বন্ধজ
কর্ত্তব্যের ত্রুটী না হয় ; এরূপ কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারা
কি না ? এই চিন্তাই এখন বিশ্বম্ভরের অন্তরে অহরহ প্রধূমিত হইতে
বন্ধুগণ ও জননী তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না। যেমন সংকী
নৃত্য, ভাব, মহাভাব হয়, সব তেমনই চলিতে লাগিল। তাহাতে ভক্ত
মনে করিলেন প্রভুর মনে সন্ন্যাসের যে ভাব উঠিয়াছিল, তাহা বুঝি নি
গিয়াছে। এই সময়ে হঠাৎ এক দিন নবদ্বীপনগরে কেশব ভারতী আ
উপস্থিত হইলেন। ইনি 'ভারতী' সম্প্রদায়ের একজন উদাসীন সন্ন্যাসী, অ
শুদ্ধমতি ও মহাতেজস্বী ভক্ত। আশ্রম—ইন্দ্রানী দেশের কণ্টক নগরীতে
ভাগীরথীতীরস্থ বর্ত্তমান কাটোয়া নগরীকেই তখন কণ্টক নগরী বলিত।

ভারতী মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছিলেন; এক্ষণে নবদ্বীপ হইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন। ইনি একজন কৃষ্ণ-ভক্ত বৈষ্ণব যোগী এবং সুসাধক বলিয়া বিখ্যাত। গৌরচন্দ্র নগরভ্রমণে বাহির হইয়া পথে ভারতী গোঁসাইকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। পাছে সঙ্গীগণ তাঁহার চাঞ্চল্য বুঝিতে পারেন, এই আশঙ্কায় অনেক যত্নে উচ্ছ্বসিত মনোবেগ দমন করিয়া গৌর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'ইনিই কি তিনি? সে দিন স্বপ্নে যে মহাপুরুষকে দেখিয়াছি, তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি এখনও হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে; এ মূর্ত্তি যে সে মূর্ত্তির প্রতিকৃতি দেখিতেছি। হায়! এখনও আমি কেন সন্দেহ করি? আমার সন্ন্যাসগ্রহণ অপরিহার্য্য। নইলে এই সব ঘটনা ঘটিল কেন?" এই চিন্তা করিয়া গৌরচন্দ্র সোদ্বেগ অন্তরে সন্ন্যাসীর নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভারতী গোস্বামী বিশ্বম্ভরের পরিচয় পাইয়া প্রীতমনে তাঁহার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। বিশ্বম্ভর অতিথিসেবা করিয়া রজনীযোগে নিভৃতে তাঁহার শয়নকক্ষে যাইয়া উপনীত। গোস্বামী মহাশয় তখনও নিদ্রা যান নাই, হরি নাম করিতেছিলেন। বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এত রাত্রে যে"।

বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন "প্রয়োজন আছে"।

ভারতী। "আমার নিকট আবার কিসের প্রয়োজন?"

বি। "শুনিলে বুঝিতে পারিবেন"। এই কথার পর বিশ্বম্ভর নিজ মনের ভাব, আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শনের কথা এবং স্বপ্নে তাঁহারই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যে যে উপদেশ পাইয়াছিলেন, সকলই বিবৃত করিয়া প্রেমাবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে ভারতীর চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন "গুরুদেব! আপনিই ভগবৎ প্রেরিত আমার সন্ন্যাসের আচার্য্য। যাহাতে আমার সংসার বন্ধন ঘুচিয়া কৃষ্ণপদে মতি হয়, তাহা আপনি করিয়া দিউন।' ভারতী তাঁহার প্রেমের আবেগ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং বিশ্বম্ভর যে একজন অসাধারণ সাধু মহাত্মা তাঁহার প্রতীতি হইল। ভারতী বলিলেন "তুমি যে সে ব্যক্তি নও; শুক বা প্রহ্লাদের অবতার"। বিশ্বম্ভর নীরবে অশ্রুধার নয়নে কাঁদিতেছেন দেখিয়া ভারতী আবার বলিলেন "উঁহু! ভক্তাবতার বলি কেন? এ যে সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার!"

বিশ্বম্ভর তখন ব্যাকুলতাসহকারে পুনঃ পুনঃ সন্ন্যাস দীক্ষার জন্য রোধ করিলে ভারতী উত্তর করিলেন "তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর; আমি তো কথার অবাধ্য নই। যা বলিবে তাই করিব।"

বিশ্বম্ভর আনন্দিত মনে বলিলেন 'তবে শুভস্য শীঘ্রং; কবে?

ভারতী। 'যে দিন তোমার ইচ্ছা।'

বিশ্বম্ভর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন "তবে এই উত্তরায়ণের সংক্রান্তির পর দিনে।"

ভারতী। তথাস্তু।

অতঃপর বিশ্বম্ভর শয়ন করিতে গমন করিলেন। উদাসীন প্রভু উঠিয়া কণ্টক নগরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

একদিন নিত্যানন্দের সঙ্গে এক নিভৃতে বসিয়া গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন:—

"করিল পিপ্পলি খণ্ড কফ নিবারিতে;
উলটিয়া আরও কফ বাড়িল দেহেতে।"

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন "তোমার এ প্রহেলিকার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না; স্পষ্ট করিয়া বল।"

বিশ্বম্ভর কহিলেন "বলিব আর কি? দেখিতেছো না; চারিদিকে কি হচ্চে? লোক সব সংসারের দাস, কর্ম্মফাঁস গলায় জড়াইয়া দুস্তর ভবার্ণবে ডুবিয়া মরিতেছে। এই রোগ নিবারণের জন্য দেখ কত চেষ্টা করিলাম সংকীর্ত্তন করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলাইলাম কিন্তু তাহার ফল কি হইল? লোকে কি কুবুদ্ধি ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজিল? না আরও উদ্ধত হইয়া আমাদের মারিতে চায়; বৈষ্ণবদিগকে উৎপীড়ন করিতে চায়; এবং চারিদিকে বৈষ্ণবদলের উপর রাগ হিংসা বাড়াইয়া দিয়া বিদ্বেষানল জ্বালিয়া দিতে চায়।'

নিত্যানন্দ গৌরের মন পরীক্ষা করিবার জন্য উত্তর করিলেন "তাহা নিবারণের উপায় কি ভাবিয়াছ?"

গৌর বলিলেন "দার জন্ত বিদ্বেষ, তাই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলার সঙ্কল্প করিয়াছি; বৈষ্ণবদিগের দলের শ্রীবৃদ্ধি ও সংকীর্ত্তনের প্রাচুর্ভাব দেখিয়া পাষণ্ডীগণের পাপবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে। সঙ্কল্প করিয়াছি, এই দল ভাঙ্গিয়া ফেলিব। তা'হ'লে আর বিদ্বেষের কারণ থাক্‌বে না।"

নি। তবে জগৎ উদ্ধার কর্‌বে কি দিয়ে? হরিনাম ভিন্ন তো জীবের নিস্তার নাই।

গৌর। হরিনাম ছাড়্‌বো বল্লেম কি? দল ভাঙ্গিব; কিন্তু হরিনাম বিলাইতে ছাড়িব না।

নি। তোমার কথা ভাল বুঝিলাম না।

গৌরচন্দ্র কিছু উত্তেজিতভাবে কহিলেন "বুঝিলে না? তবে স্পষ্ট করিয়া বলি শুন। ইহার আগেও তো কয়েকবার আভাস দিয়াছি। আমি গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব। এ ভাবে নাম কেহ লইল না। মাথার এই কেশরাশি মুড়াইব, জাত্যভিমানের চিহ্ন ও প্রেমের প্রধান অন্তরায় এই যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িব, কৌপীন বহির্ব্বাস পরিয়া দীন হীন কাঙ্গালের বেশে যাহারা এখন মারিতে চাহিতেছে, নিন্দা করিতেছে, তাহাদের দ্বারে দ্বারে গিয়া চরণে ধরিয়া কাঁদিয়া হরিনাম লইতে বলিব। তবুও কি তাহারা নাম লইবে না, পাপ ছাড়িবে না? আর কি তাহাদের মারিবার বুদ্ধি থাকিবে? তখন কে কাহাকে মার্‌বে দেখা যাইবে? নিতাই! তুমি কি জান না এদেশের লোকের গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী উদাসীনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। হইবেই বা না কেন? ঘরে বসিয়া ষোল আনা স্বার্থ বজায় রাখিয়া লোককে উপদেশ দিতে গেলে, লোকে শুনিবে কেন? তুমি আঠার আনা কামাদি বিষয়সেবা করিবে, আর সংকীর্ত্তনে দুফোঁটা চখের জল ফেলিয়া লোকদিগকে ভাবগুলি দেখাইবে; বল দেখি তাতে তাদের মন ভিজিবে কেন? তারা যে আমাদের মার্‌তে চায়, সে কি তাদের দোষ, না আমাদের চরিত্রহীনতার দোষ? তাদের তো বিষয় বিকার জন্মিয়াছে; বিকারের রোগী কি না বলে? কি না করে? কিন্তু আমরা সে রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা কি করিয়াছি? তেমন করে কি তাদের প্রাণের নিভৃত স্থান ছুঁইতে পেরেছি? সব ছেড়ে প্রাণ দিয়ে ভাল বাস্‌তে পেরেছি? তা কর্‌তে না পার্‌লে হরিনাম প্রচার হবে না, পাপী উদ্ধার হবে না, প্রভুর আদেশ প্রতিপালিত হবে

না এবং কৃষ্ণ প্রেম লাভ হবে না। তাই সঙ্কল্প করেছি গার্হস্থ্য ছাড়িব, সন্ন্যাসী সাজিব, দেশে দেশে বেড়াব, লোকের দ্বারে কাঁদিব; দেখি কৃষ্ণ পাই কি না। তুমি কি ইহাতে নিষেধ করিবে? তা পার না। যদি জগতের উদ্ধার কামনা থাকে, তবে কখনই তুমি আমাকে বাধা দিতে পার না। তুমি তো সকলই জান।"

নিত্যানন্দ পূর্ব্ব হইতেই গৌরের মনোভাব জানিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে এই দৃঢ় সঙ্কল্প শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে নবদ্বীপের লীলা কৌতুক ভাঙ্গিবে বটে, কিন্তু সমস্ত ভারতের সৌভাগ্যোদয়। নামপ্রেমের তরঙ্গে দেশ প্লাবিত হইয়া যাইবে। নিতাই প্রকাশ্যে বলিলেন "তুমি স্বাধীন পুরুষ, কে তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে? মায়ামুগ্ধ ইন্দ্রিয়পরবশ লোকই পাছে ইন্দ্রিয় সুখের হানি হয়, এই ভয়ে কর্ত্তব্যের পথে যাইতে ভীত। তুমি তো আর সে প্রকৃতির লোক নও, যে তোমাকে কেহ বাধা দিলে মানিবে? তোমার চেয়ে কয় জন লোক মাকে, ভার্য্যাকে ভালবাসিতে জানে? আমরা তোমার অনুগত, তোমার ভালবাসাতেই সঞ্জীবিত। কিন্তু সে সব ভালবাসা কি তোমাকে কর্ত্তব্য হইতে টলাইতে পারে? সাধুদিগের অন্তঃকরণ কুসুমাপেক্ষাও কোমল ও বজ্রাপেক্ষাও কঠিন, এই যে মহাজন-বাক্য, তা তোমাতে পূর্ণ হইবে না তো কোথায় হইবে? আমার সাধ্য কি যে তোমাকে বিধি দিই বা নিষেধ করি। যেমন করিয়া জগৎ উদ্ধার হবে, তাহা তুমিই ভাল জান। আমি আর কি কহিব?" বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের কথায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া বার বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নিতাই বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই গৌর! তবে সত্য সত্যই কি আমাদের ছেড়ে অগ্রজ বিশ্বরূপের ন্যায় দেশান্তরী হবে? তা'হলে পুত্রবৎসলা তোমার জননীর কি দশা হবে? বৃদ্ধবয়সে পুত্র শোকে পাগল হয়ে তিনি যখন নবদ্বীপের পথে পথে কেঁদে বেড়াবেন, কে তাঁকে সান্ত্বনা দিবে? কেই বা তাঁহার ভরণপোষণের ভার লইবে? আর সোনার প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়া? জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় যৌবন। অনাথিনীর উপায় কি হবে? শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতি প্রাণের বন্ধু; তাঁদের মায়া কি একেবারে ছেড়ে দিবে? শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন "মোহ! মোহ! ছি! ছি! তোমার ন্যায় লোকও কি মোহে অধীর হবে? নিতাই! প্রাণের নিতাই! মোহ পরিত্যাগ কর; আমার মনের

কথা শুন। তোমরা সব আমার প্রাণের বান্ধব; প্রাণ ছাড়িতে পারা যায়, তবু তোমাদের ছাড়া যায় না। মা আমার স্নেহময়ী; আমিই তাঁর প্রাণ। আমার ভার্য্যাও পতিপ্রাণা সতী, আমার হৃদয়ের ভালবাসার পাত্র। কিন্তু কি করি? আমি স্বাধীন নই; সম্পূর্ণরূপে প্রাণনাথের ইচ্ছার অধীন। তাঁর ইচ্ছা আমাকে যেমন চালাইবে, আমি তেমনি চলিতে বাধ্য। আমার নিজের সুখ দুঃখের অতীত সে ইচ্ছা। তোমাদের ছাড়িলে যদি বিষাদব্যাঘ্র আমাকে গ্রাস করে ফেলে, তা কি করবো? কিন্তু সুখের বিষয় প্রভুর ইচ্ছা নয় যে, আমি সন্ন্যাস করে তোমাদের ছাড়ি, বিশ্বরূপের ন্যায় দেশান্তরী হই।"

নিতাই প্রফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে আবার কি?'

গৌর বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই শচীদেবী আমার মাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া আমার পত্নী, তোমরা আমার প্রাণের বন্ধু। আবার তাঁর ইচ্ছাতেই আমার সন্ন্যাস। এই দুই ইচ্ছা কখন পরস্পর বিরোধী নহে। তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার বিসম্বাদী হইতে পারে না। ইহার সমাধান এই যে, এই সকল সম্বন্ধ জন্য কর্ত্তব্য যতদূর সম্ভব, প্রতিপালন করিতে হইবে, অথচ সন্ন্যাস ধর্ম্মও যাজনা করিতে হইবে। বিষয়ের মধ্যে থাকিব, অথচ তাহা ভোগ করিব না। সন্ন্যাসীর তো বিষয় ভোগ নিষিদ্ধ। আমি তোমাদের ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইব না; যথাসম্ভব পরস্পর মিলিব। মাকে ছাড়িয়া তাঁহার প্রাণে শেল মারিব না; কিন্তু যত দূর পারি তাঁহার ও পত্নীর ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ করিব। মা ভিন্ন সন্ন্যাসীর পক্ষে অন্য স্ত্রীর মুখ দর্শন নিষিদ্ধ; সুতরাং বিষ্ণুপ্রিয়াকে আর দেখিব না। এই সকল কারণে আমি সন্ন্যাস লইয়া এমন স্থানে থাকিব যে তোমরা অনায়াসে যাইতে আসিতে পারিবে; এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমিও মাকে দেখিয়া যাইতে পারিব।"

নিতাই বলিলেন "এ যে নূতন রকমের সন্ন্যাস। সে স্থান কোথায়?"

গৌর। তাহার এখনও কিছু স্থিরতা নাই; পরে জানিতে পারিবে।

নিতাই বলিলেন "আমি তোমার একান্ত অনুগত; দয়া করে সকলই তো বলিলে। এখন জিজ্ঞাসা করি, কোথায়, কাহার নিকট, কবে, সন্ন্যাস দীক্ষা লইবে? তাহা প্রকাশ করিতে কি কিছু আপত্তি আছে?"

বিশ্বম্ভর হাসিয়া উত্তর করিলেন,—'তোমার নিকট কিছুই গোপন

করিবার নাই। কিন্তু একটী অনুরোধ, আমার যাইবার স্থান ও দিন পাঁচ জন ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। আমার জননী, চন্দ্রশেখর, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ ও মুকুন্দ ভিন্ন এ কথা যেন কেহ শুনে না। ইঁহাদিগকেও আমার যাইবার শেষ মুহূর্ত্তে বলিবে; আগে ব্যক্ত হইলে কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। আমি আগামী উত্তরায়ণ দিনে কণ্টক নগরীতে যাইয়া ভক্তিভাজন শ্রীল কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিব।'

নিত্যানন্দ বলিলেন "এ কি ঠিক?"

গৌর উত্তর করিলেন "সুনিশ্চিত; আগামী কল্য বন্ধুদিগের নিকট বিদায় লইব; কিন্তু স্থান ও দিনের কথা কাহাকেও বলিব না।"

বিদায় সভা।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। শ্রীবাস পণ্ডিতের বাহির বাটীর দেব মণ্ডপে একে একে বৈষ্ণবগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর স্বায়ংকৃত্য সমাধানান্তে বন্ধুদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন! সৎপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। হঠাৎ মুকুন্দ দত্ত বলিয়া উঠিলেন; 'আমার বিশ্বাস হইতেছে যে এই প্রভু আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন; কে যেন আমার কাণে কাণে বলিয়া দিতেছে যেন ইনি আর গৃহস্থ আশ্রমে থাকিবেন না। যত ক্ষণ আছেন, এসো আমরা ইঁহার রূপ নয়ন ভরিয়া দেখি, কথা শ্রবণ ভরিয়া শুনি।'

এই কথা শুনিয়া সকলেই ভীত ও শোকার্ত্ত হইলেন; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া বিশ্বম্ভরকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইলেন না। জিজ্ঞাসা না করিলেও আর বুঝিতে বাকী থাকিল না। বিশ্বম্ভরের অবনত মস্তক ও স্থির গম্ভীরভাব সকলই বলিয়া দিল। অবশেষে গৌরচন্দ্র নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বলিয়া উঠিলেনঃ—"প্রাণের বন্ধুগণ! তোমরা কি জন্য এত উদ্বিগ্ন হইতেছ? তোমরা ভাবিতেছ আমি সন্ন্যাসী হইয়া তোমাদের ছাড়িয়া দেশান্তরী হইয়া চলিয়া যাইব? ইহা যেন তোমাদের মনে স্থান পায় না। প্রাণ ছাড়িতে পারা যায়, তথাচ তোমাদের মধুময় সঙ্গ ছাড়া যায় না। এ জন্মে কেন? জন্ম জন্মান্তরেও তোমাদের ছাড়িতে পারিব না। আরও দুই বার আমরা একত্র মিলিত হইয়া হরি-সংকীর্ত্তন করিব। আমাদের এ যোগ কখন বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। কেবল জনসমাজের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার

প্রভু আমি সন্ন্যাস করিতেছি। ইহাতে তোমাদের সঙ্গ কেন ছাড়িতে হইবে?

শ্রীবাস পণ্ডিত মহা উদার ও সরল বিশ্বাসী। গৌরের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া কাতর স্বরে বলিলেন "এ কি সত্য না স্বপ্ন? বিশ্বম্ভর! আমাদের কি সত্য সত্যই ছাড়িয়া যাবে?" এই বলিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিত কাঁদিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর শ্রীনিবাসের নিকটে আসিয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন "পিতা! কাঁদিতেছেন কেন? সাধু মহাজনের পুত্রগণ যেমন নৌকা সাজাইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে যায় এবং দেশ বিদেশ হইতে বহু ক্লেশে উপার্জ্জিত ধন আনিয়া স্বজন কুটুম্বদিগের প্রতিপালন করে; আমিও তেমনি প্রেমধন উপার্জ্জনে বিদেশে যাইয়া কৃষ্ণপ্রেম আনিয়া আপনাদিগকে উপঢৌকন দিব।"

শ্রীবাস উত্তর করিলেন "ততদিন বাঁচিলে তো তোমার প্রেমধন খাব? তুমি দেশান্তরে গেলেই যে আমরা মরিয়া যাইব। তখন তোমার উপার্জ্জিত প্রেমধন দিয়া আমাদের প্রেতাত্মার শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে কি?"

মুরারি গুপ্ত কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরের চরণতলে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন:—"স্বামিন্! প্রভো! আমি তোমার চির দাস। দাসের প্রগল্‌ভতা আজ মার্জ্জনা কর। এত যদি মনে ছিল, তবে এই সাধের কল্পতরু রোপণ করিতে গিয়াছিলে কেন? কত পরিশ্রম করে ইহাকে সেচন করেছো, কত যত্নে ইহার রক্ষা করেছো, আর কত যত্নে এই তরুর মূলদেশ বাঁধাইয়াছ; তা কি জান না? এখন যেই ফলফুল প্রসবের সময় হইল, আর হস্তে কেটে ফেলিতে চাও? এই কি বিচার? প্রভো! তোমাকে আর কি বলিব? আমি কি বলিবার যোগ্য পাত্র? তবে প্রাণের যাতনা, না বলিয়া পারিনে, তাই বলিতেছি। এখন কি তোমার দেশান্তরে যাইবার সময়? যে সুখের হাট বসাইয়াছ, তার ত এখনও কিছুই হয় নাই। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুমি চলিয়া গেলে আমরা স্বতন্ত্র হয়ে যথেচ্ছাচার করিব; সংসার-ব্যাঘ্র আমাদের গ্রাস করে ফেলিবে; এত দিন যে যত্ন করিলে, সব পণ্ডশ্রম হবে। অতএব মিনতি রাখ; নিষ্ঠুর হইও না; সুখের হাট ভেঙ্গে দিও না; আমাদের অকূল পাথারে ভাসাইও না; আমরা তোমা বই আর কিছু জানি না।"

এই বলিয়া ভক্ত মুরারি কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। মুকুন্দ বলিতে লাগি-

লেন—“প্রাণ যে ফাটিয়া যায়! তুমি দেশান্তরে যাবে? যাঁর মুখ এক দ
না দেখিলে, নদীয়া আঁধার লাগে; এ জীবনান্ধকারে যে শুদ্ধ কৌমুদী; যাঁরে
গান শুনাইতে পারিলে গান করা সার্থক হয়; আর সেই তুমি ছেড়ে যাবে
এ কি সহা যায়?” চারিদিকে সকল ভক্তগণ তখন কাঁদিয়া ব্যাকুল হইল
হরিনামের আনন্দধ্বনির পরিবর্ত্তে আজ বিষাদের ক্রন্দনধ্বনি উঠিয়া সান্ধ্য
সমীরণ আন্দোলিত করিল। গৌরচন্দ্রও ক্ষণকালের জন্য মোহে অভিভূ
হইয়া নীরবে অশ্রুধারা ফেলিলেন; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া গম্ভীর
স্বরে বলিতে লাগিলেন “বন্ধুগণ! প্রাণের সুহৃদ্‌গণ! আশ্বস্ত হও। ক্রন্দ
সম্বরণ কর। মোহ পরিত্যাগ কর। আমার প্রাণের যন্ত্রণার কথা বলি, শ্রব
কর। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আমার অন্তরে যে জ্বালা জ্বলিতেছে, তাহা ভাষায় বল
যায় না। দেহেন্দ্রিয়ে যেন বিষম জ্বর হইয়াছে, জননীর সুধামাখা আহ্বান,
তোমাদের মধুর সম্ভাষণও বিষমিশ্রিত বলিয়া বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বিনে জীব
যৌবন প্রাণ মন সকলই বৃথা। পশুপক্ষীরও তো প্রাণ আছে; মৃ
দেহেরও তো অবয়ব আছে; লতা পুষ্পেরও তো সৌন্দর্য্য আছে; কি
বল দেখি তাহা তাদের কোন কাজে লাগে? তাই প্রতিজ্ঞা করেছি কৃষ
ধন লাভ কর্‌বোই কর্‌বো। দেশে দেশে ফিরিব। দেখি কোন্ দেশে গে
প্রাণনাথের উদ্দেশ পাই? যদি বল, সংসারাশ্রমে থাকিয়া কি তাঁহা
লাভ করা যায় না; এখানে কি তিনি নাই? এই তো তাঁহাকে পাইব
জন্য আমরা নিত্য সংকীর্ত্তন করিতেছি? তাহার উত্তর এই যে, এখা
তিনি আছেন সত্য; কিন্তু তাঁহারই বিধানে আমার জীবনের গতি
প্রকার নির্ব্বন্ধিত হইয়াছে। সংসার আমাকে সুখ দিতে পারিবে ন
বিষয় আমার নিকট বিষময়। ইন্দ্রিয়গণ নিয়তই বিষয় সেবা করিতে
তথাচ শান্ত হয় না; নিত্য নূতন বিষয় ভোগ করিতে চায়। কামাদি স
চিত্ত চুরি করিয়া স্ব স্ব দিকে টানিতেছে; সংসারের সকলই যেন কৃষ্ণধন
ঢাকিয়া রাখিতে চায়। মনে দুর্ব্বাসনার অনল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে
এ অবস্থায় বল আমি কি করিব? এ সংসার ছাড়া ভিন্ন আমার গত্য
নাই। তোমরা আমার পরম বান্ধব; আমাকে মোহের গর্ত্তে ফে
না। দয়া করে আশীর্ব্বাদ কর যেন কৃষ্ণ লাভ হয়; এ দুঃখ যায়, জগ
মঙ্গল হয়; আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়।”

গৌরের করুণামুতাপ-পূর্ণ এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণ

নে করিলেন যে, তাঁহার মনোগতি ফিরানের চেষ্টা, প্রবল তরঙ্গিণীর বঙ্গ-মালী ফিরানের চেষ্টার ন্যায় বৃথা। তখন সকলে নিরাশ অন্তরে বলি-লেন "তুমি স্বাধীন প্রভু; লোক উদ্ধারের জন্য যেরূপ ধর্ম্ম প্রচার ও লীলা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার আমরা কি জানি? তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

বিশ্বম্ভর তখন সহাস্য মুখে বন্ধুদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "কে বলিল সন্ন্যাসী হইয়া তোমাদের পরিত্যাগ করিব? তোমরা আমার হৃদয়ের বন্ধু; তোমাদের কি ছাড়া যায়? আমি যখন যেখানে থাকিব, চিরকাল তোমাদেরই।"

এ কথার অর্থ যিনি যেমন পারিলেন, বুঝিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত মনে গৃহে গমন করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতা পুত্রে।

কথা উঠিলে ঢাকা থাকে না। চকিতের ন্যায় সমুদায় নবদ্বীপে রাষ্ট্র হইয়া গেল, বিশ্বম্ভর গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন। শচীদেবীর মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল; বিষ্ণুপ্রিয়া মর্ম্মাহতা হইলেন। শচীদেবী সাহস করিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না; পাছে খোটা খাঁটি সত্যে পরিণত হয়। কৃষ্ণমেঘে যেমন বিদ্যুতের আলো ঢাকিয়া রাখে, তেমনি সন্দেহ মনে সত্যের জ্যোতিঃ এখনও ঢাকা রহি-য়াছে; প্রাণে আশার আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। গৌরকে জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি বলিয়া ফেলেন 'হাঁ—জনশ্রুতি সত্য', তবেই ত সর্ব্বনাশ। তা'হলে তো সকল আলো নিবে যাবে; ভীষণ সত্যের ভীষণ ছবি বিকট মুখব্যাদানে তাঁহার আশার পুত্তলীকে গিলিয়া খাইবে। অতএব শচীমাতা বলি বলি করিয়াও জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইলেন না; কিন্তু আর অধিক দিন সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত হইতেও পারিলেন না। প্রাণের মধ্যে বড়ই যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে এক দিন গৌর-চন্দ্র মধ্যাহ্নে ভোজন সমাপনান্তে বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন, মাতা নিকটে বসিয়া হরিনামের মালা ঘুরাইতেছেন, কিন্তু মনে মনে কেবল

পুত্রের সন্ন্যাস চিন্তা করিতেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত আছেন, শচী সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে নিমাই! তুই নাকি আমাদের ছেড়ে সন্ন্যাস—" পর্য্যন্ত বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল; নয়ন দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুজল পড়িতে লাগিল এবং চৈতন্য লুপ্ত প্রায় হইয়া আসিল। গৌরচন্দ্র জননীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে দুই বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া তাঁহার মস্তক স্বীয় স্কন্ধে রক্ষা করিলেন এবং নানাবিধ মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শচীদেবী কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে বিশ্বম্ভর বলিলেন "কে বলিল আমি সন্ন্যাস করিব?"

শচী কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন, "কেন নগরের লোক কেনা বলিতেছে? কেবল আমিই জানি না। নিমাই বাপ! আমার সঙ্গে তো কখন চাতুরী করিস্ নাই; কেন এখন কর্‌ছিস্? আমি যে আর এ সন্দেহ-দোলায় দুলিতে পারি না। সত্য সত্যই কি তুই আমাদের অকুল সাগরে ফেলিয়া চলিয়া যাইবি? আজ যে আমার বিশ্বরূপের শোক দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তোর পিতার কথা যে মনে পড়ে গেল। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তুই বিশ্বরূপের ন্যায় সন্ন্যাসী হবি। সে স্বপ্ন যে সফল হইতে চলিল। তুই কথা বলছিস্ না যে? আর বলিবি কি? হাঁ বুঝিয়াছি আমার ভাঙ্গা কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

বিশ্বম্ভর জননীর বিলাপ শুনিয়া নীরবে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন; ক্ষণকালের জন্য মোহ তাঁহাকে অভিভূত করিল; অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। শচীর বুঝিতে আর বাকী থাকিল না। তিনি উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে উন্মত্তা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন "সোণার গৌরাঙ্গ আমার! হাঁরে! তোর ন্যায় পুত্র ছাড়িয়াও কি প্রাণ ধরা যায়? তোর জন্য যে আমি পতিপুত্রের শোক ভুলিয়া গিয়াছিলাম; তোর গৌরবে যে নবদ্বীপের মধ্যে গরবিণী ছিলাম, তুই যে আমার অন্ধের যষ্টি, গলার হার, নয়নের তারা, আমার ননীর পুত্তলী। হা বাপ! কেমন করে তুই বনে বনে ভ্রমণ কর্‌বি? ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় কে তোকে অন্ন জল দিবে? তুই যে আমার ভাল খেতে, ভাল পর্‌তে ভালবাসিস্। কেমন করিয়া সন্ন্যাসী হয়ে ভিক্ষা করে খাবি? পথে চল্‌তে যে পায়ে লাগ্‌বে! উঃ! কেমন ক'রে মায়ের প্রাণে এসব সহ্য হবে? একি তোর সন্ন্যাসের বয়স!

এখনও যে তোর সংসার ধর্ম্ম সারা হয় নাই; সন্তানসন্ততি কিছু জন্মে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা কি হবে? তাহার রূপ যৌবন যে জলন্ত আগুন। তা'র বিহনে সোণার প্রতিমা আমার শুকাইয়া মরিয়া যাইবে। কে তাহাকে রক্ষা করিবে?" শচীদেবী শোকে ক্রোধান্ধ হইয়া এখন নিমাইকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন "নিমাই! লোকে বলে তোর নাকি সর্ব্বজীবে দয়া আছে? এই কি তোর দয়ার ব্যবহার? বুঝিলাম, বুঝিলাম, আর সকলই তোর দয়ার পাত্র; কেবল মা ও ভার্য্যা ছাড়া। তুই সন্ন্যাসে যাবি, কে তোর ভার্য্যাকে রক্ষা করবে? আমি পার্‌ব না। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যা, সেও সন্ন্যাসিনী হোক্; তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরিতে পার্‌বো। শাস্ত্রে বলে, বৃদ্ধ পিতামাতাকে পুত্রের প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; যুবতী স্ত্রীকে স্বামীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তুই সন্ন্যাস করে ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর্‌তে যাবি; আমাকে বলতে পারিস্, এ ধর্ম্ম তোর কোথায় থাক্‌বে?" এই ভাব পরিবর্ত্তনে শচীদেবী বলিলেন—"আমি রাগ করেছি! না, না, তোর উপর আর রাগ কর্‌ব না, আর মন্দ বল্‌ব না, বাবা আমার! লক্ষ্মীছেলে, যাদুমণি! ঘরে থাক, আর মন্দ বল্‌ব না। ঘরে বসে যা ইচ্ছা তাই কর বাপ! আমি কিছু বল্‌ব না। নিমাই! কত সময়ে মন্দ বলেছি, তাই মনে করে চলে যাচ্ছিস? যাস্‌নে, যাস্‌নে; আর মন্দ বলব না। হা বাপ! সত্যই কি আমাকে ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হবে না? বউকে যে কত ভালবাসিস; তার জন্য কি মন উদ্বিগ্ন হবে না? গদাধর, অদ্বৈত, হরিদাস, মুকুন্দ, মুরারি, যে তোর প্রাণের বন্ধু, তাদের মনে করেও কি তুই ঘরে থাক্‌বিনে?" বলিতে বলিতে শচীদেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিশায়িনী হইলেন। গৌরচন্দ্র অনেক যত্নে মাতার চৈতন্য করাইয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন এবং ধীর ও গম্ভীর স্বরে নিজ সংকল্প বলিতে লাগিলেন।

"মা! বৃথা শোক পরিত্যাগ কর; মায়ামোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে বৃথা বিলাপে কেন নিজের কল্যাণ নষ্ট করছো? তোমার ন্যায় ধর্ম্মশীলা জননীর পক্ষে রূপ মোহ সাজে না। তুমি তো জান, এ সংসারের সকলই অনিত্য, সকলই অসার। এখানকার ধন, জন, সম্পদ্, সম্বন্ধ, আত্মীয়তা, সকলই জল বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, চপলা উন্মেষের মত ক্ষণিক। যাহাকে মানবজীবন ব'লে আমরা অহঙ্কার করি; ভেবে দেখো, কালো মেঘে বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায়, তাহার আদি ও অন্ত অন্ধকার পূর্ণ। জন্মের পূর্ব্বের

অবস্থাও আমাদের নিকট চিরাবৃত, পরের অবস্থাও তেমনি। কেবল পথের পরিচয়ের ন্যায় দুই চারি দিনের জন্য জীব, 'আমার পুত্র, আমার ভার্য্যা, আমার পিতা মাতা', বলিয়া অহঙ্কার ও মোহে জড়িত হইয়া পড়ে। এই 'আমিত্ব' জ্ঞান যখন একদিন ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে, এই সব সম্বন্ধ যখন একদিন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, তখন তাহার জন্য মোহে মুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্যের পথ পরিত্যাগ করা কি বুদ্ধিমানের উচিত? চিন্তা করে দেখ, আমার জন্মের পূর্ব্বে আমি তো তোমার পুত্র ছিলাম না; এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেলে তো আর পুত্র থাকিব না; তবে এই অকিঞ্চিৎকর সম্বন্ধের জন্য কাতর হইয়া সকল সম্বন্ধের জনয়িতা যিনি, সেই গোবিন্দ-চরণ ভুলিয়া সংসারে অভিভূত কেন হইবে? দুই দিন পরে যাহা ভাঙ্গিত, না হয় দুই দিন আগেই তাহা ভাঙ্গিবে; অনন্তজীবনের নিকট দুই চারি দিন কত টুকু সময়? ইহার জন্য চঞ্চলতা কেন?" শচী কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন, "মৃত্যু প্রিয়পুত্রকে লইয়া গেলে সে শোক সহা যায়; কিন্তু জীবিত থাকিতে আমার পুত্র আমার থাকিবে না, এ যে অসহনীয় শোক।"

গৌর বলিলেন, "তাহাও তো সহিয়াছ। বিশ্বরূপ চলিয়া গিয়াছে; তাহার শোক কি সও নাই? কই তাহার কি করিতে পারিয়াছ? যাক্ সে কথা বলিতেছি না। এই যে "আমার আমার জ্ঞান," এই জ্ঞানই সর্ব্ব-নাশের মূল। ইহাই কর্ম্মবন্ধনে জড়াইয়া জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসার যাতনায় নিক্ষেপ করে। এ পৃথিবীতে জীব সৃষ্ট হয় কেন? অগণ্য জীব কোলাহল-পরিপূর্ণ এই সুন্দর বিশ্বচ্ছবি কি উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে? লীলাময়ের স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া। তোমার আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা পরিপূর্ণ করার জন্য এ জগৎ সৃজিত হয় নাই। ইহার মধ্যে দেখ মনুষ্যেতর জীবপ্রবাহ এক অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া সেই প্রভুর আদেশ প্রতি-পালন করিতেছে। তাহাদের সাধ্য নাই যে, লীলাময়ের লীলাশক্তির বাহিরে যায়; লীলা-নর্ত্তকী তাহাদের যেমন নাচাইতেছে, তাহারা তেমনি নাচিতেছে। কিন্তু মনুষ্যের অধিকার অন্যরূপ। মানুষ জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, এই তাহার ব্রত। এখানেও লীলানর্ত্তকী আমাদের নাচাইতেছে বটে, কিন্তু এ নৃত্যের তাল ভিন্ন, ইহাতে একটু অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্র্য আছে। যতদিন আমরা এই

নৃত্য সুন্দর করিয়া নাচিতে না পারিব, যতদিন এখানকার নৃত্য-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া উন্নততর শিক্ষার উপযুক্ত না হইব, ততদিন পুনঃ পুনঃ এই নৃত্যই নাচিতে হইবে; এখানকার কাম ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়াই; এখানকার কাজই করিতে হইবে। পশু জীবনের ন্যায় ভোগ বাসনা তত দিন নাকে দড়ি দিয়া টানিয়া এই খানেই আনিয়া ফেলিবে। তাই বল্‌ছি আমার পুত্র, আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার ঘর, আমার বাড়ী, এই মিথ্যা অহংজ্ঞান ছাড়। কে কার পুত্র? কে কার মা? যাঁহার ইচ্ছায় তুমি আমার মা, আমি তোমার পুত্র; সেই গোবিন্দের ইচ্ছা কি সকলের বড় নয়? তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হও, ভোগ বাসনা পরিত্যাগ কর; তাহা হইলে কর্ম্মবন্ধন ছাড়িবে, বৈকুণ্ঠবাসে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে; আর সংসারে থাকিয়া কামাদির সেবা করিতে হইবে না। ভেবে দেখো, আমাকে পুত্রজ্ঞানে যে স্নেহ কর, সে টুকু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলে কত সুখ হয়?"

শচীদেবী স্বভাবতঃ বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা ছিলেন। পুত্রের ভাবি সন্ন্যাস চিন্তা করিয়া শোকে ও দুঃখে বিহ্বল হইয়া এতক্ষণ উন্মাদিনীর ন্যায় বিলাপ করিতেছিলেন; এক্ষণে গৌরের গভীর উপদেশপূর্ণ তত্ত্বকথা শুনিয়া অনেক পরিমাণে তাঁহার মোহের অবসান হইল; বুদ্ধির চঞ্চলতা চলিয়া গেল; এবং তত্ত্ব জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে এ জগৎ কি মিথ্যা? এখানকার স্বামী, পুত্র, কন্যা, কি কেহই আমার নয়? আমিই বা কে? এ সব কথার মীমাংসা কি?'

গৌরচন্দ্র জননীর জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন:—"না, এ জগৎ মিথ্যা নয়, এখানকার তুমি, আমি প্রভৃতি জীবও মিথ্যা নয়, এখানকার পরস্পর সম্বন্ধজনিত কর্ত্তব্য সকলও অবশ্য পালনীয়। কিন্তু এ সকল মিথ্যা ও কাল্পনিক না হইলেও কেহই নিত্য ও স্বাধীন নয়। এক সদ্বস্তুর প্রকাশে ইহারা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দই সর্ব্বমূলাধার ও সকলের নিয়ন্তা। তাঁহারই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের ইহারা আভা মাত্র। তিনি হাসিয়াছেন; আর এইপরিদৃশ্যমান বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার হাসিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। স্থির প্রশান্ত সাগরজলে বায়ু প্রবাহিত হইলে যেমন অগণ্য উর্ম্মিরাজি তরঙ্গায়িত হইতে থাকে, তেমনি লীলাময় ভগবানের সত্তাসাগরে লীলা করিবার ইচ্ছা-পবন সমুত্থিত হইয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বোর্ম্মি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সাগরের প্রত্যেক উর্ম্মি যেমন পৃথক্ পৃথক্ ভাবাপন্ন

হইয়াও সাগর জলের সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগে যুক্ত, তেমনি এই জড় ও জীব-প্রবাহ, বিচিত্র ভাবাপন্ন হইয়াও ভগবানের সত্তাসাগরে ওতপ্রোত-ভাবে নিমজ্জমান। তোমার আমার নিজের কিছুই স্বাতন্ত্র্য নাই। আমরা তাঁহার ইচ্ছা-সাগরের বিশেষ বিশেষ ভাব রূপ সম্পন্ন এক বিন্দু বারিকণা মাত্র।”

শচী উত্তর করিলেন, “যদি তাহাই হইল, তবে এখানকার সম্বন্ধজনিত কর্ত্তব্যপালন কেমন করিয়া সম্ভব হয়? সকলই তো তাঁহারই প্রকাশ, তিনিই সকল ইচ্ছার মূলে, তবে তোমার সন্ন্যাসে আমার যাতনা হয় কেন? তুমিই বা আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া আমার সেবায় তৎপর থাক কেন?”

বিশ্বম্ভর বলিলেন “এই টুকুইতো রহস্য। তাইতে তো বলিতেছিলাম যে, মনুষ্যেতর জীবকে তিনি এই কর্ত্তব্য জ্ঞানটুকু দেন নাই; কেবল মানুষকেই ইহার অধিকারী করিয়াছেন। মানুষ স্বীয় জীবনে তাঁহার ইচ্ছা বুঝিয়া চলিবে, এই তাহার নিয়তি। যদি তাঁহার ইচ্ছা বুঝিয়া চলিতে পার, তবেই সকল কর্ম্ম তোমার কৃষ্ণার্পিত হইল; তোমার নিজের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য কিছুই কৃত হইল না। সুতরাং তুমি কর্ম্মসূত্র কাটাইয়া এ পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের দায়ে অব্যাহতি পাইলে।”

শচী। তবে কি মনুষ্য জন্ম কষ্ট-ভোগের জন্য? জীবকে কষ্ট দিবার জন্য কি শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহা যদি হয়, তবে তাঁহার দয়া কোথায়? তাঁহাকে করুণাময় বলি কেন?

গৌর। তাহাও কি মনে করতে আছে? আমি সে সব কিছু বলিতেছি না। আমি এই মাত্র বলিতেছি যে, আমরা কেবল এ পৃথিবীর জন্য সৃষ্ট হই নাই। আমরা বৈকুণ্ঠের অধিকারী। অনন্ত জীবনে তাঁহার সেবা করিব ও প্রেমে পূর্ণ হইব, এই আমাদের জীবনের নিয়তি। কিন্তু এ পৃথিবীতে যতদিন আমরা তাঁর ইচ্ছার অনুগত হইতে না পারিব, তত দিন বৈকুণ্ঠ-বাসের উপযুক্ত হইব না। অর্থাৎ এ পৃথিবীর কার্য্য যতদিন সমাপ্ত করিতে না পারিব, ততদিন এক জন্মেই হউক আর বহু জন্মেই হউক, এ পৃথিবীতে যাতায়াত করিতেই হইবে। কারণ তাঁহার ইচ্ছা অলঙ্ঘনীয়। আমাদের জীবনে এ পৃথিবীতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ করাইবেনই করাইবেন। শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিতে পারিলে আমাদেরই মঙ্গল। বিলম্ব করা কেবল উন্নতির পথে কণ্টক দেওয়া মাত্র।

শচী। তোমার জীবনে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা কি? তা' কেমন করে বুঝলে?

বিশ্বম্ভর। তা' মা বুঝ্‌লে আর সন্ন্যাসের কথা উঠিয়াছে কেন? যদি তোমাদের নিয়ে ঘরকন্না করা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতাম, তবে কি আর তোমার মত মায়ের কোমল প্রাণে আঘাত দিই? তোমাকে ছাড়িতে কি আমার মর্ম্মভেদী যাতনা হয় না? কিন্তু আমি কি করিব? প্রভু যে আমাকে ডেকেছেন; আমি কেমন করে তাঁর আহ্বান উপেক্ষা কর্‌তে পারি? না, না, তা হবে না। ঘরে থেকে কামাদির সেবা করে তাঁর কথা বলা হবে না; বল্লে কেহ শুন্‌বে না। কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন কর্‌তে হবে; প্রেমে জগৎ ভাসাতে হবে; আপনার পর ভুলে যেতে হবে; তবে নাম প্রচার হবে, তবে তাঁর ইচ্ছা এ জীবনে পূর্ণ হবে। আমি বৈকুণ্ঠের প্রত্যাশা করি না; আমি মুক্তি মোক্ষ চাই না; প্রভুর আজ্ঞাই আমার অবলম্বন; ইহাতে বাধা দিও না। ওই দেখ, শ্যামসুন্দর বংশীবদন আমাকে ডাক্‌ছেন! আর কি ঘরে থাকা যায়? বলিতে বলিতে গৌর উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। একটু সাব্যস্ত হইয়া গৌরচন্দ্র আবার বলিতে লাগিলেন "জননি! ক্ষমা কর; আমি তোমার ঋণ এ জনমে পরিশোধ করিতে পারিব না। যেখানেই থাকি, তোমার স্নেহে আমি চিরাকৃষ্ট।"

শচী বাষ্পাকুললোচনে বলিলেন "তবে কি বাপ! তুমি বিশ্বরূপের ন্যায় নরুদ্দেশ হইয়া যাবে?"

বিশ্বম্ভর। না মা! তা যাবো না। আমি তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিব না। আমার সন্ন্যাস পরিত্যাগের জন্য নয়; কিন্তু কৃষ্ণেচ্ছা পূর্ণ করার জন্য। যেখানেই থাকি, তাহা জানিতে পারিবে; মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখা দিয়া যাইব। কেবল গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিব না, এই মাত্র। আর তুমি যখন মনে করিবে; তোমার হৃদয় মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইবে।

শচী বলিলেন "কবে সন্ন্যাস কর্‌বি?" বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন, "তাহার এখনও বিলম্ব আছে।"

এই সব কথা শুনিয়া শচীদেবী কথঞ্চিত আশ্বস্ত মনে আপনার নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পত্নী-সঙ্গে।

রজনীতে বিশ্বম্ভর নিজ শয়নকক্ষে শয়ান। অতি অল্পক্ষণ শুইয়াছেন, —

সে জন্য গভীর নিদ্রা হয় নাই, অল্প অল্প তন্দ্রা আসিয়াছে। দিবাভাগে, মাতা পুত্রে যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহা শুনিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বাকী ছিল না। তাহার পূর্ব্বেই তিনি লোকমুখে এ সব কথার কতক কতক আভাস পাইয়াছিলেন; এখন বিশ্বম্ভরের মুখে শুনিয়াছেন, শচীর রোদন ও বিলাপ দেখিয়াছেন এবং মাতা পুত্রের কথোপকথনও জানিয়াছেন। ঘরের বউ, ফুকারিয়া কাঁদিবার যো নাই, মর্ম্ম যাতনা বলিবার লোকও নাই, হৃদয়ের গভীর ব্যথা বুঝিবার ব্যথার ব্যথীও নাই। তাই বালা সমস্ত দিন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়াছে, হৃদয় বেদনায় অস্থির হইয়াছে এবং ভগ্ন-হৃদয়ে শয়নের কাল প্রতীক্ষা করিয়াছে। এখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিলেন যে, প্রিয়পতি নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া অসুখী করা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া পতিপ্রাণা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় আস্তে আস্তে পতির চরণতলে বসিয়া পা দুখানি হৃদয়ে তুলিয়া লইলেন এবং অতি সাবধানে ঈষৎ চুম্বন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। নীরব অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃবস্ত্র ভিজিয়া গৌরের পদযুগল অভিষিক্ত হইল; উত্তপ্ত নিশ্বাস বায়ু লাগিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সম্মুখে বিষাদের ছবি প্রিয়তমা ভার্য্যাকে দেখিয়া গৌরচন্দ্রের হৃদয়ে সকল কথা যুগপৎ আবির্ভূত হইল। তথাচ তিনি অতি ব্যস্তে ভার্য্যাকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে! একি? কি হয়েছে বল; এত কাঁদিতেছ কেন?" নিমাই! এত চাতুরী খেলিতেছ কার সঙ্গে? কিছু কি জাননা, বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হয়েছে? বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর কথার কোন উত্তর না দিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরে যেন চৈতন্য নাই; অঞ্চলের অধোদেশ দিয়া যে বড় বড় জলের ফোঁটা গলিয়া পড়িতেছিল, তাহাতেই তাঁহার হৃদয় বেদনার গভীরতা বুঝা যাইতেছিল। গৌরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও তিনি কোন বাক্যালাপ করিলেন না, করিবার ক্ষমতাও ছিল না। যাহার নিকট মনের কথা বলিয়া বালিকা মনে করিয়াছিল সুখী হইবে, সংসার-অরণ্যে যে তরুকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিবে, সেই আজ তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে; তবে আর কার কাছে কথা কহিবে? কেই বা হৃদয় বেদনা বুঝিবে? বালিকা সরল-মতি, সংসারের কুটিল বুদ্ধি জানে না। গৌরের ন্যায় জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত নয় যে, ভগবানের ইচ্ছার নির্ভর

করিয়া থাকিতে পারিবে। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের যত টুকু ভালবাসা, সব পতির জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। তাই আজ পতির সন্ন্যাস কথা শ্রবণে বালিকা কেবলই কাঁদিতেছে। গৌর তাঁহার মুখের আচ্ছাদনবস্ত্র সরাইয়া দিয়া চিবুক ধরিয়া মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—'প্রিয়ে! কি হয়েছে বল? তোমার ক্রন্দনে আমার হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিতেছে।'

বিষ্ণুপ্রিয়া এবারে ক্রন্দন মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "তাহা যদি লাগিত, তবে কি আর এমন করে ছেড়ে পলাইয়া যাইতে চাহিতে?" গৌর উত্তর করিলেন "কে বলিল আমি তোমাকে ছেড়ে সন্ন্যাস আশ্রমে চলিয়া যাইব?" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল; চক্ষু দিয়া বড় বড় জলের ফোঁটা পড়িতে লাগিল। সেই কালের জন্য তিনি স্নেহ-মুগ্ধ হইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সরলা বিষ্ণুপ্রিয়া মনে করিল, বুঝি তবে বিধাতা সুপ্রসন্ন; পতি তাঁহাকে ছাড়িবেন না; তাই আস্তেব্যস্তে দুই হস্তে স্বামীর দক্ষিণহস্ত ধরিয়া স্বীয় মাথায় রক্ষা করিয়া বলিলেন "নাথ! তবে আমার মাথায় হাত দিয়া বল, এ কথা কি সত্য নয়? লোকে যে কত কথা বলাবলি কর্‌ছে।" হায়! আশা-মুগ্ধ লোকে এ সংসারে কি না করে! গভীর জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ক্ষুদ্র তৃণলতা ধরিয়া বাঁচিব মনে করে; তেমনি বিপদ্‌মগ্ন লোকে ক্ষুদ্র আশালতা ধরিয়া বাঁচিতে চায়। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর অস্পষ্ট কথা শুনিয়া সেই মিথ্যা আশায় প্রতারিতা হইলেন। গৌরচন্দ্র এবারে বড় মুস্কিলে পড়িলেন, এবং আকাশপাতাল ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া কথান্তর পাড়িয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মন ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে যুবতীর মন প্রবোধ মানিল না; তিনি পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধ সহকারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র তখন আসল কথা আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিলেন "এ কথা সত্য হইলে তুমি কি করিবে?" পতিপ্রাণা ইহা শুনিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। স্বামীর ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। গৌর অনেক যত্নে মূর্চ্ছাপনোদন করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে! স্থির হও; এখন যাহা বলি তাহা শ্রবণ কর।" স্বামীর ক্রোড়শায়িনী বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তেজিত ভাবে উত্তর করিলেন "আমাকে স্থির হইতে বলা, আর ব্যঙ্গ করা সমান কথা। তোমার মতে কি আমার হৃদয়ে বল আছে যে, আমি এই নিদারুণ সংবাদে ধৈর্য্যা-বলম্বন করিতে পারিব? হায়! আমার মনে কত যে সাধ ছিল! তোমা-

হেন গুণের সাগর স্বামী পেয়ে আমি যে নবদ্বীপমধ্যে সৌভাগ্যবতী ছিলাম। বিধাতা আমার সকল সাধে বাদ সাধিল। তা' আমার জন্য এখন আর আমি ভাবিতেছি না। তোমার জন্য যে বড় ভয় হয় প্রভু! কেমন করে তুমি এ নবীন বয়সে সন্ন্যাসের কঠোর দুঃখ সহিবে? আমাকে যদি তোমার সন্ন্যাসপথে অন্তরায় মনে কর; তবে আমি এখুনি এ জীবন হাসিতে হাসিতে পরিত্যাগ করিব; তুমি ঘরে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নামপ্রেম প্রচার কর। অনাথিনী মাকে প্রাণে বধ করো না; তোমার প্রিয় বন্ধুগণকে বিষাদসাগরে ডুবাইও না। জগজ্জনে তোমাকে যে প্রেমের অবতার বলে; আমাদের ছাড়িয়া গেলে তোমার অকলঙ্ক-চরিত্রে কলঙ্ক দিয়া লোকে যে কত অপযশ করিবে? কেমন করে সে সব নিন্দার কথা শুনিব? হা বিধাতঃ! তো'র মনে এত ছিল?"

গৌরচন্দ্র তখন ধীর ও গম্ভীর ভাবে ভার্য্যাকে বলিতে লাগিলেন—"বিষ্ণুপ্রিয়ে! চিত্ত স্থির কর; একবার জ্ঞান চক্ষু মিলিয়া উপস্থিত বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির কর। যত কিছু স্থূল সূক্ষ্মাদি বস্তু দেখিতেছো, এ সকলের স্বাধীন সত্তা কিছু নাই; ইহারা একের প্রকাশে প্রকাশিত। সত্য বস্তু একমাত্র ভগবান্। তিনিই পরমাত্মারূপে সকলের আত্মা হইয়া প্রকাশিত। তিনিই চিদ্ বস্তু, আর সব চিদাভাস; তিনিই একমাত্র পুরুষ, তুমি, আমি আর আর যত কিছু, তাঁহারই প্রকৃতি। সংসারে কে কাহার পতি? কে কাহার পত্নী? তিনিই সকলের পতি। অতএব আমাকে সামান্য পতি জ্ঞান ছাড়, সেই বংশীবদন শ্যামসুন্দরই তোমার সত্য পতি। এই যোগ অভ্যাস কর; তাঁকে পতিরূপে বরণ করিতে পারিলে কখন বিচ্ছেদ হবে না। সে প্রেমের সমান আর প্রেম নাই। তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া! সে নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। চিরকাল সুখে যাবে; বিষয়গরল পান করে, সংসার আগুণে আর পুড়ে মর্‌তে হবে না।'

বিষ্ণুপ্রিয়া কিছু সহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার এমন কি তপস্যা আছে যে, কৃষ্ণ সহবাস লাভ কর্‌তে পারবো? সংসার ছাড়িতে না পার্‌লে তো তাঁকে পতিরূপে বরণ করা যায় না। আমি কেমনে তাঁতে মতি স্থির কর্‌তে পারি, তার উপদেশ বল। তা'হলে তোমার বিরহ যন্ত্রণা আর আমাকে অভিভূত কর্‌তে পার্‌বে না।"

গৌর সাগ্রহে উত্তর করিলেন "এ ত বেশ কথা; আমিও তো তোমাকে

সেই কথা বলিতেছি। প্রিয়ে! একটু চিন্তা করে দেখ, তাঁহাকে পাইবার জন্য গৃহাদি ছাড়িয়া যে বনে যাইতে হইবে, এরূপ নয়। গৃহে থাকিয়াও তাঁহাকে লাভ করা যায়। যাহাকে আমরা সংসার বলি, সে বস্তু আমাদের মনে। যেখানে থাকি না কেন, তাঁহাকে হৃদয়মাঝে রাখিয়া তাঁহার সহবাসে থাকিতে পারিলেই বৈকুণ্ঠ বাস হয়। আর তাঁহাকে ভুলিয়া থাকার যে অবস্থা, তাহাই সংসার। টাকা কড়ি, ধন দৌলত, গৃহ অট্টালিকা, বন্ধু বান্ধব, ধন মান, দাস দাসী, সুখ ঐশ্বর্য্য, পরিবৃত থাকিয়াও মানুষ যদি সেই প্রাণপতিকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া থাকিতে পারে, স্পর্শমণিতে সকল সুখৈশ্বর্য্য ছোঁয়াইয়া রাখিতে পারে, তবে তাহার সংসার কোথায়? যেমন একটু মাত্র লবণ সংযোগে স্বাদবিহীন উদ্ভিদাদি মধুর আস্বাদযুক্ত হয়; তেমনি সেই রসস্বরূপের কিঞ্চিন্মাত্র রসের প্রক্ষেপ এ সকলে দিতে পারিলে, ইহারাও আস্বাদনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু যে জন গৃহত্যাগী বৈরাগী হইয়া বনে গিয়াও তাঁহাকে চায় না; তাঁহার স্মরণ মনন ধ্যান করে না; নিজের অসার অহঙ্কারে, বাসনায়, কামনায় ডুবিয়া থাকে; সেই ত যথার্থ সংসারী। প্রিয়ে! মন এমন বস্তু নয় যে স্থির থাকিবে। তাহাকে যদি হরিপাদপদ্মে না লাগাইতে পার; সে অহং জ্ঞানে ডুবিবেই ডুবিবে; কুবাসনায় মজিবেই মজিবে। তাই বলিতেছি তাঁহার স্মৃতিবিহীন মিথ্যা সংসার-জ্ঞানকে ছাড়। এই ঘরে বসিয়াই তাঁহার দাসী হইতে পারিবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া সুযোগ পাইয়া উত্তর করিলেন "তবে তুমি কেন গৃহত্যাগ করিতে চাহিতেছো? তোমার তো মিথ্যাসংসার ছুটিয়াছে। ঘরে বসে কেন সেই স্পর্শমণিকে স্পর্শ করিয়া বিষয়ভোগ কর না? অনর্থক আমাকে কেন অকূল সাগরে ভাসাইতেছো? আদ্‌মারা মাকে মারিয়া ফেলিতেছো? প্রাণের বন্ধুদিগকে অনাথ করিতেছো?" গৌর এ কথার উপর কথা দিয়া বলিলেন "আমার প্রতি প্রভুর আদেশ অন্য রূপ; আমি নিজে স্বতন্ত্র নই, তাঁহার আজ্ঞার একান্ত অধীন।" এই বলিয়া নিত্যানন্দাদির নিকট যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা একে একে বিবৃত করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তর করিলেন—"তবে আমার জীবনে কি প্রভুর কোন আদেশ নাই? সামান্য উদ্ভিদ, কীট পর্য্যন্ত তাঁহার কাজে লাগে; আর বঙ্গনারীর জীবন কি এতই নীচ যে, ইহাতে তাঁহার কোন সেবাই হইবে না?"

গৌর। কে বলিল হইবে না? নারীপ্রকৃতি, পরমপবিত্র প্রকৃতি ইচ্ছাময়ের ভাণ্ডারে যত সুন্দর সুন্দর কোমল রত্ন ছিল, তাহা দিয়া তিনি নারী হৃদয় সাজাইয়াছেন; আর স্বয়ং মাধব, মা হয়ে তাহাতে বসে প্রেম লীলা করছেন। কিন্তু আমরা এমনি পামর যে, এমন সুন্দর ও পবিত্র বস্তু চিনিতে পারি না। ইহা তাঁহার সেবার জিনিস; তাহা ভুলে গিয়ে আমরা ইহার কি না হীন ব্যবহার করিতেছি? দেবতার ভোগের বস্তু পিশাচে অর্পণ করিতেছি। যাক্, সে কথায় কাজ নাই। তুমি যদি বংশীবদনের বংশী স্বর শুনিয়া থাক; সেইরূপে ব্যবহার করিতে পার। তাহাতে কেহ তোমাকে বাধা দিবার অধিকারী নাই। বলিতে বলিতে গৌরের অনুরাগসিন্ধু উছলিয়া উঠিল। তিনি অনুরাগ ভরে কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কথিত হইয়াছে যে, এই সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ নিরীক্ষণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ঘটনা যাহা হউক, ইহা সত্য যে, শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশে বিষ্ণুপ্রিয়ার জ্ঞানদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। গৌর প্রিয়পত্নীকে অনুরাগভরে বার বার আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "প্রিয়তমে! তোমার ও আমার আত্মায় যখন গভীর প্রেম-যোগ রহিয়াছে; তখন আমি যেখানেই থাকি না কেন? তোমার হৃদয় ছাড়া কখন হইব না। প্রভুর আজ্ঞানুসারে দেশে দেশে নামপ্রেম প্রচার করিবার জন্য সন্ন্যাসে যাইতেছি; তাই আমাদের বাহিরের যোগ ছিন্ন হইতেছে। কিন্তু আমাদের হৃদয়ের যোগ কখন যাইবার নহে। আমি তোমার প্রেমে চিরকাল তোমার হৃদয়ে বাঁধা থাকিব। বিষ্ণুপ্রিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন "ইনি স্বতন্ত্র প্রভু; আমার সাধ্য কি যে ইহার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারি? বিশেষতঃ ভগবানের আদেশপালনে ইনি ব্রতী; আমি যদি সে ব্রত ভঙ্গ করি; আমিই প্রত্যবায়ভাগিনী হইব। আমার এ সংসারের সুখ গেল গেল, প্রিয়তমের বিচ্ছেদে এ দগ্ধ হৃদয় ছারখার হবে হউক, আমি তথাচ আর নিজের দুঃখের কথা বলিয়া ইহার কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত জন্মাইব না।" বঙ্গরমণি! তোমরা কি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার এই দেবতুল্য স্বার্থ-বিসর্জ্জন শিখিবে না?

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাস যাত্রা।

পলে পলে দণ্ড, দণ্ডে দণ্ডে দিন, দিনে দিনে মাস। এমনি করে নবদ্বীপ-নগরে মাসের পর মাস কাটিয়া গেল। গৌরের সন্ন্যাসের কথা অবান্তর ঘটনারাজির মধ্যে চাপা পড়িয়া গেল। নিমাই পণ্ডিত গৃহধর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিবেন বলিয়া যে একটা জনরব উঠিয়াছিল, তাহা সকলে এক প্রকার ভুলিয়া গেল। গৌরও অতি সাবহিতে সে কথা হৃদয়ের নিভৃত দেশে লুকাইয়া রাখিলেন, আর তাহার উচ্চবাচ্য করিলেন না। তাঁহার ব্যবহার একেই অমায়িক ছিল; এই সময়ে আরও মধুরতর হইয়া উঠিল। যে কথা বা যে চিন্তা স্মৃতিতে জাগরিত হইলে মাতার মনে কষ্ট ও দুশ্চিন্তার উদয় হইতে পারিবে, তাহার দিক দিয়াও তিনি যাইতেন না। মায়ের মন ও ইচ্ছা বুঝিয়া সর্ব্বদা সাধন ভজনের ব্যাঘাৎ জন্মাইয়াও সেবা করিতে তৎপর হইলেন; নানাবিধ নির্দ্দোষ আমোদকৌতুকে ভার্য্যাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন; কত সুন্দর সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার তাঁহাকে উপঢৌকন দিতে লাগিলেন; ধর্ম্মবন্ধুদিগের যাঁহার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিত, তদপেক্ষাও মধুর ব্যবহার করিতে লাগিলেন; মুরারি, মুকুন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, প্রভৃতি বন্ধুদিগের গৃহে পান ভোজন, আমোদকৌতুকে নিরন্তর অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাড়ীর বালকবালিকা, দাস দাসী-দিগকে লইয়া গৌর কত রহস্য, প্রেমালাপে সময় কাটাইতে লাগিলেন; তাঁহার বিদ্বেষী পাষণ্ডীদিগের বাটীতে যাইয়াও বিবিধ প্রকারে আত্মীয়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়া সকলেই এক প্রকার সন্ন্যাস যাত্রার বিষয়টা ভুলিয়া গেল। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভৃতি যাঁহারা, তাঁহার মনের নিগূঢ় ভাব জানিতেন, তাঁহারা এই বাহ্য ব্যবহারে প্রতারিত হইলেন না।

আজ ১৪৩১ শকের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন। বিশ্বম্ভর আজ প্রত্যুষ হইতে শ্রীবাসগৃহে খুব উন্মত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। ভক্তমণ্ডলী ভাবে প্রেমে বিভোর হইয়া গিয়াছেন; জমাট ভাবের প্রভাবে শ্রীবাস অঙ্গন আজ সত্য সত্যই বৈকুণ্ঠের শ্রী ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সেই

দিনই যে নবদ্বীপের প্রেমমহোৎসবের শেষদিন, সরলমতি শ্রীবাস্ তাহা তখনও জানিতে পারেন নাই। আজ রজনীশেষে নবদ্বীপপুরীকে অন্ধকারসাগরে ডুবাইয়া দিয়া নবদ্বীপচন্দ্র যে অস্তমিত হইবেন, তাহা জানিতে পারিলে ভক্তগণ এ মহোৎসবে যোগ দিতে পারিতেন না। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইলে সকলে কিছুকালের জন্য স্নান-ভোজনে গমন করিলেন। বিশ্বম্ভর বাটীতে আসিয়া স্নান পূজা সমাপনান্তে জননীর পাদবন্দনা করিলেন এবং প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে ভোজনান্তে ক্ষণকাল বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিয়া সুহৃদ্বর্গসঙ্গে নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। নানা কথায় নগরের অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ভাগীরথীর তীরে আসিয়া তিনি শ্যামল দূর্ব্বাক্ষেত্রে বন্ধুগণসহ ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন এবং সেখানে সকলকে সন্ধ্যার পর তাঁহার বাটীতে যাইতে বলিয়া দিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সায়ংকৃত্য সমাধানান্তে কিছু জলযোগ করিয়া বিষ্ণুমণ্ডপের পিঁড়ায় উপবেশন করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে মুকুন্দ, মুরারি, শ্রীবাস, অদ্বৈত গদাধর, নিত্যানন্দ, হরিদাস, প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া জুটিলেন। তখন নানারূপ ভগবৎ কথার আলোচনা হইতে লাগিল। বৃন্দাবন দাস মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই সময়ে গৌরচন্দ্র নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের মালায় বিভূষিত ও অগুরু চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপ মাধুরী শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া লোকের মন আকৃষ্ট করিতেছিলেন। নগরের নানাবিধ লোকের সমাগম হইতে লাগিল। গৌরচন্দ্র তাহাদিগকে নিজের গলার পুষ্পমালা উপঢৌকন দিয়া কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন তিনি বলিলেন "বন্ধুগণ! যদি আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে তবে কেবল কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতে থাক। জীবনে, মরণে, সম্পদে, বিপদে, স্বদেশে, বিদেশে, শয়নে, ভোজনে, কেবল কৃষ্ণনাম ভিন্ন আর কিছু বলিবে না।"

এইরূপ সৎপ্রসঙ্গ ও উপদেশ চলিতেছে, এমন সময় তরকারি-বিক্রেতা শ্রীধর এক লাউ হাতে করিয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে শ্রীধর! এমন সুন্দর লাউ কোথা পাইলে?" শ্রীধর উত্তর করিল, "তোমার কৃপায় লাউর অভাব কি?" এই কালে আর এক ভক্ত দুগ্ধভেট আনিয়া দিলে বিশ্বম্ভর তখন জননীকে

ডাকিয়া বলিলেন "মা! বড় ভাল হয়েছে; এই দুগ্ধ ও লাউ দিয়া দুগ্ধ-লাউ পাক করগে।" শচীদেবী পুত্রের ইচ্ছানুসারে রন্ধনের কার্য্যে গমন করিলেন। এদিকে রাত্রি দ্বিতীয়প্রহর পর্য্যন্ত বন্ধুগণসঙ্গে বিবিধ প্রসঙ্গ করিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া ভোজনে বসিলেন। কেবল গদাধর ও হরিদাস বিষ্ণুমণ্ডপের পিঁড়ায় শয়ন করিয়া থাকিলেন। কি যেন মনে ভাবিয়া তাঁহারা সে রাত্রি শচীর মন্দিরে যাপন করিলেন। বিশ্বম্ভর আচমনান্তে শয়নকক্ষে গমন করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত একত্র শয়ন করিলেন। চৈতন্যমঙ্গলকার লিখিয়াছেন যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত গৌরচন্দ্র সেই রজনীতে নানারূপ কৌতুকক্রীড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, গৌরের আত্ম-ধারণার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বৈরাগ্যের তীব্র উত্তেজনা, অনুরাগের প্রগাঢ় তরঙ্গ, যখন হৃদয়মধ্যে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে; তখন স্থির ও অচঞ্চল ভাবে মাতা পত্নী আত্মীয় বন্ধুদিগের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে সক্ষম হওয়া, বড় কম আত্মসংযমের ব্যাপার নহে।

গৌরচন্দ্রের ইঙ্গিতে নিত্যানন্দ, শচীদেবী প্রভৃতি পাঁচ জনকে ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার সন্ন্যাসগমনের সময় অবগত করিয়াছিলেন। শচীর প্রাণে সে কথা জাগিতেছে। তাই আজ রাত্রিতে তিনি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না; নিঃশব্দে বালিশে মাথা দিয়া সমস্ত রজনী অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। শচী ডাকিয়া কাঁদিতে পারিলেন না, পাছে যাত্রাকালে পুত্র মনে কষ্ট পান, পাছে পুত্র-বধূর নিদ্রাভঙ্গ হয়।

আহা! সরলা বিষ্ণুপ্রিয়া ইহার কিছুমাত্র জানে না; আজ যে তাহার কপাল ভাঙ্গিবে জানিতে পারিলে সে কি আর সুখে পতির কোলে ঘুমাইতে পারিত? বিশ্বম্ভর একটী বারও নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। পারিবেনই বা কেন? এ অবস্থায় কি কাহারও ঘুম আইসে? রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে গৌরচন্দ্র ইষ্টদেবের পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া এবং ভগবানের হস্তে মাতা পত্নীকে সমর্পণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন, এবং গমনোপযোগী দুই একটী সামগ্রী লইয়া, এ জন্মের মত ঘর বাড়ী, মাতা, বনিতা, প্রিয় জন্মভূমি, পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। গৌর শয়নকক্ষের দ্বারের নিকটে গিয়া আবার কি ভাবিয়া ফিরিলেন; অন্ধকারের ক্ষীণালোকে আবার একটী-

বার নিদ্রিতা পত্নীর মুখারবিন্দ দেখিয়া লইলেন। গৌর! ফের! ফের! দূরে যাইও না, অবলাকে অকুল পাথারে ভাসাইও না। প্রিয়তমা ভার্য্যার সরলতা ও স্নেহপূর্ণ মুখ দেখিয়া গৌরের মন একটু চঞ্চল হইল। তিনি একটু ইতস্তত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হৃদয়মাঝে আবার সেই বাঁশী বাজিয়া উঠিল; স্বপ্নের মধ্যে যে নবঘনসুন্দর মুখে বাঁশীর গান শুনিয়া ছিলেন, আবার সেই বাঁশী তেমনি করে বাজিয়া উঠিল; "আয়! আয়! আয়! ধন, মান, কুল, শীল, মাতা ভার্য্যাকে ছেড়ে নামপ্রেম বিলাইতে আয়! যুগধর্ম্ম প্রচার করিতে আয়!" বলিয়া আবার বাঁশরী বাজিল। গৌর অমনি সিংহের ন্যায় জাগিয়া উঠিলেন, আপনার দুর্ব্বলতাকে শত ধিক্কার দিয়া জোরে দ্বার খুলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার শব্দ পাইয়া গদাধর হরিদাস নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আমরা সঙ্গে যাইব।" গৌর বলিলেন "তা' হবে না, আমি কাহাকেও সঙ্গে লইব না; সেই এক অদ্বিতীয় পুরুষই কেবল আমার সঙ্গ।" তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন।

শচীমাতা সারানিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাষাণ সমান হইয়াছেন। পুত্রের গমনোদ্যম বুঝিতে পারিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ার ন্যায় বাহির দ্বারে আসিয়া বসিয়া আছেন। মুখে বাক্য নাই, নিস্পন্দজড়ের ন্যায় বসিয়া আছেন। গৌরচন্দ্র জননীকে তদবস্থ দেখিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার কর ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা! কি আর বলিব? নিজের সুখ দুঃখ ভুলিয়া তুমি চিরদিন আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ, কত সুখে রাখিয়াছ, লেখাপড়া শিখাইয়াছ, এবং অশেষ প্রকারে সুখী করিয়াছ। তুমি আমার যত করিয়াছ, আমি কোটি জন্মেও তাহার পরিশোধ দিতে পারিব না। তোমার ঋণে আমাকে চিরদিন ঋণী থাকিতে হইবে। শুন মা! এ সংসার নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের অধীন; কাহারও সাধ্য নাই যে তাঁহার ইচ্ছার এক চুলও ব্যতিক্রম করিতে পারে। যত সংযোগ বিয়োগ, মিলন, বিরহ, সেই প্রভুর ইচ্ছাতেই হইতেছে। তাঁহার লীলা বুঝিতে কাহার সাধ্য আছে? আমি সেই নাথেরই নিয়োগানুসারে তোমাদের ছাড়িয়া যাইতেছি; ইহাতে তোমার চিন্তা করা উচিত না।" এই বলিয়া গৌরচন্দ্র জননীর বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "কিন্তু মা! তোমাকে আমি একেবারে ছাড়িব না, ছাড়িতে পারি না. তোমার ভরণ পোষণ, ধর্ম্ম যাজন,

পরমার্থ, সব আমার ভার। আমি সত্য সত্য বলিতেছি, তোমার সর্ব্বাঙ্গীন ভার, আমার—আমার।" বিশ্বম্ভর যত বলিলেন, শচীদেবী তাহার একটি কথারও উত্তর দিলেন না, দিবার সাধ্যও ছিল না। তিনি পৃথিবীর ন্যায় নিস্পন্দ জড়ভাবে কেবল অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

বিশ্বম্ভর তখন শোকাভিভূতা পতিতা জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন এবং আর কিছু না বলিয়া দুয়ার খুলিয়া একেবারে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া গেলেন ও ভাগীরথী পার হইয়া নিঃসঙ্গ পদব্রজে কণ্টকনগরী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ আঁধার করিয়া নবদ্বীপচন্দ্র অস্তমিত হইলেন; তাই যেন শীত-যামিনীর ঊষা-বধূ শিশির ছলে অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে ম্লান মুখে পূর্ব্বাচলে উঠিতে লাগিল; পশুপক্ষী শোকাভিভূত হইয়া স্ব স্ব রবে যেন কাঁদিয়া উঠিল; শ্রীবাসের অঙ্গনে অন্ধকারের ভিতর দিয়া যেন বিষাদের আবরণ পড়িয়া গেল। শচীদেবী মূর্চ্ছিতা জড়ের ন্যায় দ্বারদেশে পড়িয়া থাকিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার কালনিদ্রা তখনও ভাঙ্গে নাই, গদাধর হরিদাস মাথায় হাত দিয়া বিষ্ণুমণ্ডপের দ্বারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বর্গেতে আর এক দৃশ্য হইল। দেবগণ জীব উদ্ধারের উপায় হইল ভাবিয়া দুন্দুভি-নিনাদ ও পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যে সাধু-মহাজন ছিলেন, সেই ঊষা সময়ে কে যেন তাঁহাদের প্রাণের আনন্দ-তন্ত্রী ঝঙ্কারিয়া দিল। পাপভারাক্রান্ত পৃথিবী ভূমিকম্পচ্ছলে আনন্দে নাচিয়া উঠিল, এবং দশ দিঙ্‌মণ্ডল সুপ্রসন্নভাব ধারণ করিল। নবযুগের নবধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীব নিস্তার করিতে নবীনবয়সে গার্হস্থ্য ছাড়িয়া নব যুগাবতার বাহির হইতেছেন; স্বয়ং ভগবান্ জীবস্তভাবে তাঁহার রক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। গৌরের হৃদয়ের যত প্রেম, যত ভাব, যত আনন্দ, ভবিষ্যৎ জীবনের জ্যোতির্ম্ময় আভাস, একেবারে জাগিয়া উঠিল। পথে যাইতে যাইতে তিনি ঘর বাড়ী, মাতা, ভার্য্যা, বন্ধুগণ, এ সকলের চিন্তা একেবারে ভুলিয়া গিয়া চিদানন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া গেলেন; দুর্দ্দান্ত প্রেমানুরাগে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; এবং গাইতে, নাচিতে, হাসিতে, পড়িতে, ঢুলিতে ঢুলিতে কাটোয়ার পথে মন্থর গতিতে যাইতে লাগিলেন।

এদিকে রজনীপ্রভাতে দুই একটী করিয়া ভক্তবৃন্দ গৌরের সহিত

সাক্ষাৎ করিবার জন্য শচীর মন্দিরের নিকট আসিতে লাগিলেন। আসিয়া শচীদেবীকে জড়ের ন্যায় দ্বারদেশে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহারা ভীত হইয়া পড়িলেন এবং হরিদাস গদাধরের মুখে সকল কথা শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ ও মূৰ্চ্ছিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে জনতা বাড়িতে লাগিল। বিষাদ ক্রন্দনের রোল উঠিয়া গেল; আঙ্গিনা লোকে পূর্ণ হইয়া গেল; বিষ্ণুপ্রিয়া জাগরিতা হইয়া স্বামীকে শয্যায় না দেখিয়া এবং বাড়ীতে জনকলরব ও ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন, তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে জ্ঞানশূন্যা হইয়া উন্মত্তার ন্যায় অভাগিনী ছুটিয়া আসিয়া দ্বারদেশে যেখানে শচীমাতা পড়িয়াছিলেন,—সেইখানে পড়িয়া গেলেন। যাঁহার মুখ কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, আজ সেই কুলবধূ, শোকে নির্লজ্জা হইয়া গুরুজনের সমক্ষে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; তাহা শুনিয়া পাষাণও ফাটিয়া গেল। নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধনরনারী আজ শচীর মন্দির পূর্ণ করিয়া শচীনন্দনের সন্ন্যাস গমনে কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ভক্তগণ শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘিরিয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি যে পাঁচ জনকে গৌরচন্দ্র স্বীয় সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা একত্র মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার অনুসরণ জন্য গঙ্গাপার হইয়া কাটোয়ার পথে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য্য এবং ব্রহ্মানন্দ, এই পঞ্চজন তাঁহার নিষেধ না মানিয়া তাঁহার শরীর রক্ষার জন্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কতকদূর যাইয়া পথিমধ্যে সঙ্গ লইয়া অনুগমন করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন অতিবাহিত হইলে গৌরচন্দ্র সন্ধ্যার প্রাক্কালে বন্ধুগণ সহ কেশব ভারতীর কুটীর দ্বারে যাইয়া উপনীত হইলেন।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতের সহিত চৈতন্যমঙ্গলের কথা যথাসম্ভব ঐক্য করিয়া উপরোক্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। কিন্তু শিবানন্দসেন মহাশয়ের পুত্র কবি কর্ণপুর স্বরচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে সন্ন্যাসযাত্রার যে বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহা এই বৃত্তান্ত হইতে কিছু বিভিন্ন। কর্ণপুর গৌরচন্দ্রের নীলাচলে অবস্থিতি করার সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন কয়েক বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার পিতা, সপরিবারে নীলাচলে গিয়াছিলেন; গৌরচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে বালকের নাম পুরীদাস রাখা হইয়াছিল; এবং বালকের সহিত গৌর কত হাস্য পরিহাস করিয়াছিলেন।

এ অবস্থায় কর্ণপুরের বৃত্তান্ত বৃন্দাবনদাসের বৃত্তান্তাপেক্ষা অধিক সঠিক হইবার সম্ভব ছিল। কিন্তু কর্ণপুর নাটক লিখিয়া গিয়াছেন; গৌরের জীবনী লেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার নাটকে প্রেম, ভক্তি, মৈত্রী, প্রভৃতি কল্পিত পাত্র সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বৃন্দাবন দাসের ন্যায় তাঁহার বাসস্থান নবদ্বীপে ছিল না। তিনি স্বয়ং কিছু গৌরের বাল্য জীবনের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেন নাই। বৃন্দাবনের ন্যায় তাঁহাকেও গ্রন্থের বর্ণনীয় বৃত্তান্ত তাঁহার পিতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের নিকট শুনিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বৃন্দাবনের সংগ্রহ যেমন, নবদ্বীপস্থ ব্যক্তি-নিচয়ের নিকট হইতে গৃহীত; তাঁহার সেরূপ হইবার তত সুযোগ ছিল না। তবে কর্ণপুরের গ্রন্থ পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাহউক কোন্ বৃত্তান্ত নির্ভরণীয়, সে বিষয়ে আমাদের মতামত কিছু নাই। উভয় বৃত্তান্তই লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, পাঠকগণ স্ব স্ব সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন। কবি কর্ণপুর বলেন, গৌরচন্দ্র স্বীয় সন্ন্যাসগ্রহণের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই; কেবল তাঁহার মাতাকে একদিন ইঙ্গিতে এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, কোন প্রয়োজন সাধন জন্য গৃহ ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য তিনি তীর্থ গমন করিবেন; শচী যেন তাহাতে উদ্বিগ্না না হন। এমন কি, সন্ন্যাস গমনের পূর্ব্ব রাত্রিতে প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে নাট সংকীর্ত্তন হইয়াছিল; বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে গৌর সে রাত্রিতে করতালি দিয়া কত নাচাইয়াছিলেন, এবং অন্যান্য দিনের ন্যায় কীর্ত্তন সমাপ্তে ভক্তগণ যে যাহার গৃহে গমন করিলে গৌরচন্দ্রও স্বীয় গৃহে যাইবার উপদেশে শ্রীবাস-অঙ্গন হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে কেবল মাত্র চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন ছিলেন। তাঁহাকে গৌর 'চলুন একটু প্রয়োজন আছে' বলিয়া সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন; পথে নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকেও বলিলেন "চল, তুমিও যাবে।" তাঁহারা কিছু উত্তর না করিয়া ছায়ার ন্যায় পশ্চাদ্গামী হইলেন এবং গঙ্গা পার হইয়া কাটোয়াভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ঈদৃশ অভাবনীয় ব্যবহারের জন্য তাঁহারা উভয়ে আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিছু উত্তর দিলেন না; কখন মৌনভাবে, কখন হাসিতে, কান্দিতে প্রেমে গর গর হইয়া সমস্ত দিন পরে কণ্টক নগরীতে কেশবভারতীর কুটীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সমভিব্যাহারী দুইজন অবাক্ হইয়া গেলেন। নবদ্বীপের

লোক ইহার বাস্ত নিষ্পত্তি জানিতে পারিল না। [illegible] মনে করি
বিশ্বম্ভর শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্ত্তনে জাগরণ করিতেছেন; শ্রীবাসাদি মনে কা
লেন, প্রভু স্ব মন্দিরে শয়ন করিতে গেলেন। পরদিন প্রভাতে তাঁ
অনুসন্ধান না পাইয়া শচীর সন্দেহ ঘনীভূত হইল; ভক্তগণ ভাবিয়া কি
স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল তৃতীয় দিনে যখন আচার্য্য রত্ন কাটো
হইতে প্রত্যাগত হইলেন, তখন সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল।

সম্পূর্ণ।

চৈতন্য লীলামৃত।

উত্তর ভাগ।

(চৈতন্যের জীবন লীলার সন্ন্যাস হইতে অন্তর্ধান পর্য্যন্ত)

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত সঙ্কলিত।

"ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥"

ভাগবত।

কলিকাতা,

২।১০।৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
দ্বারা প্রকাশিত।

২ নং গোঁয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৯ সাল।

মূল্য ১॥০ টাকা।

স্বর্গীয় ভগবদ্ভক্ত জগদীশ্বর গুপ্ত।

অতি দুঃখের সহিত, অসময়ে, ভগবদ্ভক্ত জগদীশ্বর গুপ্তের মৃত্যু-সম্বাদ আমাদিগকে ঘোষণা করিতে হইল। বিগত ২৫ শে আষাঢ়, শুক্রবার, অপরাহ্ণু চারি ঘটিকার সময় তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও ধর্ম্মকাহিনী বিবৃত করাই যেন তাঁহার জীবনের বিশেষ কাজ ছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বহু পূর্ব্বে সমাধা হইয়াছে, এবার চৈতন্যলীলামৃত গ্রন্থ সমাধা করিয়া আর তাঁহাকে দীর্ঘকাল মর্ত্ত্যলীলা করিতে হইল না! এই সংসার অসার, জীবন মায়া বিশেষ। যিনি এক মাস পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে ছিলেন, তিনি আজ স্বর্গে! ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়, হৃদয় শিথিল হয়। তাঁহার বিয়োগে ব্রাহ্মসমাজ একটি অমূল্য রত্ন, বৈষ্ণবসমাজ একজন প্রকৃত বন্ধু এবং সাহিত্যসমাজ একজন নিষ্ঠাবান সেবক হারাইলেন। জগদীশ্বর বাবুর মর্ত্ত্যলীলায় বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্য ধন্য হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। এরূপ প্রকৃত চরিত্রবান সাধু ভক্তের জীবন সাধারণের সম্পত্তি। জগদীশ্বর বাবুর পুণ্যময় জীবনকাহিনী পাঠ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু এই ভক্তের জীবনলীলা বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ নহে,—সামান্য-ভাবে আরম্ভ, সামান্য ভাবে সমাপ্ত। আমরা অতি সংক্ষেপে এস্থলে তাঁহার জীবনকাহিনী বিবৃত করিলাম।

১২৫২ সালের ভাদ্র মাসে মেহেরপুর মাতুলাশ্রমে তাঁহার জন্ম হয়। শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত কুলীন-বৈদ্যবংশজাত ৺ গোপীকৃষ্ণ গুপ্ত ইঁহার পিতা, এবং মেহেরপুরের মল্লিক কুল-জাতা স্বর্গীয়া রাধা সুন্দরী দেবী ইঁহার মাতা। জগদীশ্বর গুপ্তের সহিত শ্রীখণ্ড এবং মেহেরপুরের বিশেষ সম্বন্ধ। শ্রীখণ্ড, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক শিষ্য শ্রীমৎ নরহরি সরকারের লীলাস্থল; সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্মের দুর্গ বিশেষ। মেহেরপুরের মল্লিকবংশ বৈষ্ণব ধর্ম্মের চির উপাসক। পিতৃকুল শাক্ত, মাতৃকুল বৈষ্ণব। জগদীশ্বর বাবু শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উজ্জ্বল বিশ্বাসের সুবিমল ছায়ায় আশ্রয় পাইলেন। জগদীশ্বর বিশ্বাস-ভক্তির অনুপ্রাণনে মর্ত্ত্যে আগমন করিলেন।

বাল্যকালে ভক্ত জগদীশ্বর ১১। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার বিবাহ হয়। ১২৬৩ সালে কৃষ্ণনগর

অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। ইহার পূর্ব্বেই একটু একটু ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহীন হন। এই সময়েই তাঁহার জীবনে মহা বৈরাগ্যের সূত্রপাত হয়। মাতাকে কাটোয়ার গঙ্গাতীরে শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়া ভক্ত জগদীশ্বর নবজীবন লাভ করিলেন। ভক্তের স্বলিখিত কথা এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

"১২৭১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মাবকাশে আমাদের কলেজ বন্ধ হইলে আমি কৃষ্ণনগর হইতে নপাড়া হইয়া শ্রীখণ্ডে মাতৃসদনে গেলাম। মা আমাকে পাইয়া বড় সুখী হইলেন। আমাদের দরিদ্র গৃহস্থালী তখন তিনি একপ্রকার গুছাইয়া লইয়াছেন, দরিদ্র হইলেও এখন তিনি স্বাধীন ভাবে শাকান্ন খাইয়া সুখে আছেন। আমি অপরাহ্নে পৌছিলাম। আমার পাল্কী দ্বারদেশে আসিলেই মা বাহিরে আসিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া লইয়া গেলেন ও স্বহস্তে পাক করিয়া আমাকে খাইতে দিলেন। স্নেহময়ীর স্নেহ পাইয়া আমি সুখী হইলাম। কে জানিত যে, সেই আনন্দই আমার জীবনের শেষ আনন্দ, কে জানিত যে সপ্তাহের মধ্যে মাতৃহীন হইয়া আমি সংসারবাজারে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইব ?

তৃতীয় দিবস মাকে ওলাউঠা রোগ আক্রমণ করিল। মা ডাক্তারী ঔষধ খাইলেন না। আমি বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে ঘরে বিছানা করিয়া দিয়া একটু ঘুমাইতে বলিলাম, মা শুইলেন। হায়, সেই শয্যাই তাঁহার কাল-শয্যা হইল। মা মধ্যে মধ্যে দুই একবার বাহ্যে যাইতে লাগিলেন। ১৮।১৯ বৎসর বয়সে লোক কত কাজ করিয়া থাকে, কিন্তু তখন আমার কোন জ্ঞানই জন্মায় নাই। আমি খাইতে বসিলে মা আসিয়া আমার কাছে বসিলেন। সেই বিষাদের ছবি, সেই স্নেহ-মূর্ত্তি যেন এখনও আমার চক্ষে চক্ষে রহিয়াছে। বেলা যতই অবসন্ন হইতে লাগিল, মায়ের উপসর্গ ততই বাড়িতে লাগিল। ভীষণ জল পিপাসা ও বমন আরম্ভ হইল, প্রস্রাব বন্ধ হইল ও হাত পায়ে খিল ধরিতে লাগিল, ২।১ জন কবিরাজ আনাইয়া ঔষধ দেওয়া গেল, কোন উপকার হইল না। রাত্রি-কালে কাটোয়ায় লোক পাঠান হইল না, কেননা ধন সম্বল নাই। আমি বুঝিলাম, মা এ যাত্রা বাঁচিবেন না। মাও তাহাই বুঝিয়া আমাকে বিছানার কাছে ডাকিলেন ও অনেক কথা বলিলেন। আমি কাঁদিয়া আকুল হইলাম। ১২ই জ্যৈষ্ঠ শেষ রাত্রে ডুলী করিয়া মাকে ইহজন্মের মত গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রের ক্ষীণালোকে শ্রীহরির পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সেই ভীষণ গঙ্গাযাত্রার দল বাড়ী হইতে বাহির হইল। মা সেই যন্ত্রণার অবস্থাতেও গঙ্গাদর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। একটু পরেই দেখিলাম, মা ঘুমাইতেছেন, সে যে কাল নিদ্রার পূর্ব্ব লক্ষণ, তাহা তখন বুঝিয়াও বুঝি নাই। মায়ের জ্ঞান ক্রমে বিলুপ্ত হইল। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় মা একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আমি চাহিয়া দেখিলাম, কণ্ঠ-শ্বাস হইয়াছে! তখন সকলে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া সেই প্রেমের ছবি গঙ্গাগর্ভে লইয়া গেলেন। আমি মুখে গঙ্গাজল দিয়া সে ভীষণ শ্মশানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রাণবা

দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া গেল। আমি সেই ভীষণ শ্মশানে মাতৃহীন হইয়া চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলাম। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সংসারের অনিত্যতা অনুভব করিতে লাগিলাম। আর সেই সোণার প্রতিমা, মাতৃদেহ, আগুল্ফলম্বিত কেশদাম, সেই লাবণ্যময় গৌরবর্ণ, প্রবাল-বিনিন্দিত সেই দন্তপংক্তি, সেই শোভনীয় সুন্দর মুখমণ্ডল দেখিতে দেখিতে চিতাগ্নিতে ভস্মময় হইয়া গেল। সেই মূরতিমোহন কত দিন হইল ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও আমার অন্তরে উজ্জ্বল রূপে সেই চিত্র জাগিতেছে। সেই কমনীয় মাতৃমূর্ত্তিই আমার হৃদয়ের দেবতা, জীবনাকাশে আশা-নক্ষত্র। আমি যখনই ডাকি, চৈতন্যময়ী মা আমার আত্মার নিভৃত স্থলে আসিয়া কত সান্ত্বনা দেন, কত মধুর ভাবে আশ্বাস বাণী শুনান্। তাহা আর কেহ দেখিতে বা শুনিতে পায় না। শ্মশানে মাতৃদেহ ভস্ম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। ঘর বাড়ীর চারিদিকে আঁধার দেখিতে লাগিলাম। এই দিন হইতে সংসারটা আমার নিকট যেন শূন্য হইয়া গেল।"

এই খানে ধর্ম্মের আরম্ভ, এই খানেই বৈরাগ্যের অভ্যুদয়। কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে ক্রমে ক্রমে তিনি এণ্ট্রান্স, এল-এ, বি-এ, বি-এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কলেজে থাকিতে থাকিতে তাঁহার মাতুল বুঝিয়াছিলেন, ভাগিনেয় পৌত্তলিক ধর্ম্ম রক্ষা করিবে না। কলেজে থাকার সময় এ জন্য জগদীশ্বর বাবুকে অনেক সময়ে অনেক নির্য্যাতন ও তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছিল। একবার তাঁহাকে মাতুল বাড়ী হইতে বহিস্কৃত পর্য্যন্ত হইতে হইয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৪৲ টাকা এবং এল-এ পরীক্ষায় তিনি ২৫৲ বৃত্তি পাইয়াছিলেন; নির্য্যাতনের সময় তাহা দ্বারাই চলিত। বি-এল পরীক্ষার পর কিছুদিন কৃষ্ণনগর, তারপর দিনাজপুরে ওকালতি করেন। যে রোগে তাঁহার মর্ত্যলীলা শেষ হইয়াছে, দিনাজপুরে সেই যকৃত রোগের সূত্রপাত। দিনাজপুরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় মেদিনীপুর গেলেন। সেখানে ৪ বৎসর ওকালতি করিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্ম্মবিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছিল, তাহার উত্তেজনায় তিনি দীর্ঘকাল ওকালতি করিতে পারিলেন না। এপথ পরিত্যাগ করিয়া মুন্সেফী লইলেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ২৮ সে অক্টোবর কাঁথির অস্থায়ী মুন্সেফ হন। কাঁথি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, জাজপুর প্রভৃতি স্থলে অনেক বার অস্থায়ী মুন্সেফ হওয়ার পর, ১৮৭৯ খ্রীঃ ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৲ বেতনে নেলফামারীর স্থায়ী মুন্সেফ হইলেন। ১৮৮২ খ্রীঃ ২৭ এ ফেব্রুয়ারি পটোয়ার দ্বিতীয় মুন্সেফ হন। এই বৎসর ১লা জুলাই ২৫০৲ বেতনে উন্নীত হন। ১৮৮৩ খ্রীঃ ২৬ জুন যশোহরের অধীন বাগেরহাট বদলী হন। এই

খানেই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের আরম্ভ। এই খানেই চৈতন্যচরিতামৃ- সম্পাদন কার্য্যে ব্যাপৃত হন, এবং আমাদিগের অনুরোধে নব্যভারতে "চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম" প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই প্রবন্ধ সমূহই এই "লীলামৃত" পুস্তকে পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃত মেঘ দূত বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ করেন, এবং রামমোহন রায় সম্বন্ধে এক খানি ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ ১লা এপ্রেল ৩০০ বেতন হয়। ১৩ই এপ্রেল (১৮৮৭) কুষ্টিয়া বদ্‌লি হন। ১৮৯০ খ্রীঃ ১লা অক্টোবর কুষ্টিয়া হইতে নোয়াখালি গমন করেন। ১৮৯১ খ্রীঃ ২৯ শে জানুয়ারি এক বৎসরের ফার্লো লইয়া কলিকাতা আসিয়া "লীলাশুক" প্রকাশ করেন। তৎপরে দেশে যান এবং সে স্থল হইতে বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করিতে ভারতবর্ষের নানা স্থান ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। কংগ্রেস দেখিতে তাঁহার বড় সাধ ছিল; এই যাত্রায় তাহা দেখিলেন, এবং বোম্বে, পুনা, দিল্লি, আগ্রা, কাশী, বৃন্দাবন, ভারতের প্রধান প্রধান স্থান পরিদর্শন করিলেন। ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। বিধাতার ইচ্ছা কে বুঝিবে, ভক্ত প্রাণ ভরিয়া সর্ব্বস্থানে বিধাতার নাম প্রচার করিয়া বহুদিনের মনের বাসনা পূর্ণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। ভারতভ্রমণে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইল, কলিকাতায় আসার পর উপর্য্যুপরি ৫ বার যকৃতের বেদনায় ও জ্বরে কাতর হইলেন। এক বৎসরের পর পুনঃ দুই বারে ৫ মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বিধাতা শেষ বারের ৩ মাস ছুটী তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে দিলেন না। পাছে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবিশ্বাস করেন, এই জন্যই বুঝি বা, ভক্ত ২৫শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই ১৮৯২ খ্রীঃ জীবনলীলা শেষ করিয়া অনন্ত ধামে যাত্রা করিলেন।

ভক্ত জগদীশ্বর যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, আজ সে সকল স্থানেই হাহাকার উঠিয়াছে। কলিকাতা, শ্রীখণ্ড, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া ও নোয়াখালির বন্ধুগণ আজ কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। শ্রীখণ্ডের অসমাপ্ত স্কুলগৃহ আজ চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতেছে। কুষ্টিয়া ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির ও স্কুলগৃহের ইষ্টকে ইষ্টকে জগদীশ্বর বাবুর নাম খোদিত রহিয়াছে। আজ তাঁহার পত্নী, বাল্য সহচরী, যৌবনের সহায়, কাঁদিয়া ধরা সিক্ত করিতেছেন, আর আমাদের দুঃখ কে বর্ণনা করিতে সক্ষম? এত বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়াও মহাযোগী

আজ মহাশয্যা হইতে উত্থান করিতেছেন না। মহাবৈরাগ্যের মহামেলা—মহাচক্রীর মহালীলা।

ভক্ত জগদীশ্বর কি গুণে বন্ধুবর্গকে এত মোহিত করিয়াছিলেন? যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে একবাক্যে আজ স্বীকার করিতেছেন যে, এরূপ সুলেখক বাঙ্গালায় দুর্লভ। প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব মাত্রের নিকট পরিচয় দিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রেমভিখারী মহাবৈষ্ণব ছিলেন। স্বদেশ এবং বিদেশের স্কুল প্রভৃতির সম্পাদকতা কাজে লিপ্ত থাকিয়া দেখাইয়াছেন যে, তিনি স্বদেশভক্ত, স্বদেশপ্রেমিক মহাকর্ম্মী। উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী হইয়াও দীন ভিখারীর ন্যায় অর্থ ভিক্ষা করিয়া সাধারণ হিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার অমায়িকতা, নিরপেক্ষ ও নিরহঙ্কার ভাব, আব্দারময় প্রেমগঠিতমূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এরূপ প্রেমিক এই স্বার্থ কোলাহলময় ভবসংসারে বড় দুর্লভ। কিন্তু এ সকল তাঁহার প্রকৃত মহত্ব নয়। তাঁহার প্রকৃত মহত্ব তাঁহার ভগবদ্ভক্তিতে। বিধাতার নামে তাঁহার অজস্র অশ্রুপাত হইত। প্রকৃত ভক্ত, সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে নিবদ্ধ থাকিতে পারেন না। ভক্ত জগদীশ্বর নামে ব্রাহ্ম থাকিয়াও সকল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সকল দেশের জীবিত এবং মৃত সাধুভক্তের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সকল দেশের সকল শাস্ত্রের তিনি প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন থাকায় এ দেশের শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার সকল লোকের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আদি, নববিধান, সাধারণ—সকল ব্রাহ্মসমাজের সকল লোক তাঁহাকে আপনার ভাবিয়া গভীর শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার শ্রাদ্ধের দিন সকল সমাজের লোক উপাসনায় যোগ দিয়া দেখাইয়াছেন যে, তিনি সকল দলের লোক ছিলেন। তিনি নামে গবর্ণমেণ্টের কাজ করিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ ধর্ম্মালোচনায় জীবন কাটাইতেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেই থানেই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। গত বৎসর ভারতের অধিকাংশ স্থলে তাঁহার ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। অবশেষে জীবনের অন্তিম অবস্থায় বিডন পার্কে বক্তৃতা। নববর্ষ সমাগমে নববিধান সমাজের শ্রদ্ধেয় প্রচারক বাবু প্রসন্নচন্দ্র সেন মহাশয় বিডনপার্কে যে অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা প্রদানের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বোধ হয় যেন, তাহা এই ভক্তের শেষ প্রচারের জন্য। দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার পর, ৫।৬ বার বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই পার্কে স্বাধীনভাবে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মন হরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তি-বিহ্বলতা দেখিয়া সকলে উচ্ছ্বাসে 'হরি হরি বোল' বলিয়া উঠিত। সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। হালি-লুজা নামক

জয়গায়ক দলের সহিত কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া ফিরিতেন, সে এই ভক্তের শেষ জীবনের আর এক দৃশ্য। ধর্ম্মপ্রচার ইঁহার জীবনের ব্রত ছিল, চৈতন্য-শাস্ত্রের পঙ্কোদ্ধার করা বিশেষ কাজ ছিল। যেরূপেই হউক, এই দুই কাজ যখন শেষ হইয়াছে, তখন আর ভক্ত থাকিবেন কেন? তিনি ক্রমে ক্রমে মর্ত্ত্য-লীলা-মায়া পরিহার করিয়া মহা-যোগে অনুপ্রবেশ করিতে লাগিলেন। এই সময় প্রায়ই বলিতেন, "বেশ আছি, জীবন ভালভাবেই কাটিতেছে।" যে দিন লীলামৃত লেখা শেষ হইল, সে দিন বিধাতাকে বিশেষরূপ পূজা অর্চ্চনা করিলেন, এবং প্রকারান্তরে বুঝাইলেন, তাঁহার জীবনের কাজ শেষ হইয়াছে। মোহ মায়ান্ধ বন্ধুবর্গ আমরা তাহা বুঝিলাম না। উইল করিলেন, আমরা তাহা গ্রাহ্য করিলাম না। ১৮ই আষাঢ়, শুক্রবার বাড়ীতে সসম্মানে জয়গায়ক দলকে ডাকিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনিলেন এবং তাহাতে মাতিলেন। এই দিন জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হইল। তার পর কয়েকদিন রোগ-শয্যায়, অথবা মহাযোগে নিমগ্ন। কঠিন রোগ, অসহ্য বেদনা, তাহার মধ্যে মহাযোগী মহাধ্যানে নিমগ্ন। দুটী হাত যোড় করিয়া বার বার বিধাতাকে ডাকিতেছেন। কে কবে, এই মর্ত্ত্যে এমন দৃশ্য দেখিয়াছ? কে কবে, আপন কর্ত্তব্য শেষ করিয়া এই রূপ মহাযাত্রা করিতে পারিয়াছে? হায়, শ্রীখণ্ড আজ আঁধার! কলিকাতা, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট—আজ সর্ব্বত্র বন্ধুগণ তাঁহার জন্য কাঁদিয়া আকুল, কিন্তু সেই মহাযোগী, মহা-বৈরাগী আর ফিরিলেন না। সেই উজ্জ্বল মূর্ত্তি, সেই প্রশস্ত ললাট, সেই সদানন্দ ভাব, সেই নিরহঙ্কার প্রেম-গঠিত আমর মাখা চেহারা আজ নিমতলার শ্মশানে নির্ব্বাপিত হইয়াছে! বিধাতার ভক্ত পৃথিবীর কাজ শেষ করিয়া আজ স্বর্গে বিহার করিতেছেন।

এরূপ সাধুজীবন দেশের গৌরব। ভক্ত জগদীশ্বরের পুণ্যময় জীবনে বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে। আর ব্রাহ্মসমাজের গৌরব শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্য তাঁহাকে লইয়া কত উল্লসিত হইয়াছিলেন; আজ নীরবে কাঁদিতেছেন। ভবিষ্যতে এই ক্রন্দন-উচ্ছ্বাস আরো কত যে বৃদ্ধি পাইবে, যিনি এই ভক্তের উচ্ছাসময় লীলামৃত গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তিনিই তাহা বুঝিবেন।

হরিগুণ কথনে, হরিগুণ শ্রবণে, হরি কথা কীর্ত্তনে,—হরি-হিল্লোলে এই জীবন আরম্ভ; হরি-সেবায়, হরি-মায়ায় এই জীবন শেষ। মহাবৈরাগী সাধু আজ অমরধামে ভক্তবৃন্দের সহ সম্মিলিত। স্বর্গে আজ আনন্দ ধ্বনি; আর মর্ত্ত্যে, এই আঁধার বঙ্গগৃহে আজ নিদারুণ বিলাপধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উঠিতেছে। বিধাতার ইচ্ছারই জয়।

আনন্দ-আশ্রম,
সন ১২৯৯ সাল, ২০শে শ্রাবণ।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী,
লীলামৃত-প্রকাশক।

সূচীপত্র।

চৈতন্যলীলামৃত।

উত্তর ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গৌর সন্ন্যাস।

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ কেশব ভারতীর কুটীর দ্বারে উপনীত হইলেন, তখন প্রদোষ সময়। সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে গৌর কুটীরের দৃশ্য যাহা দেখিতে াইলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন; তাঁহার গাত্র কণ্টকিত হইল। স্বপ্নের সেই ছবি;—পাদমূলে ভাগীরথী তর তর বেগে চলিয়া যাইতেছে, চারি-দিকে বৃক্ষরাজি, বিহঙ্গমগণ সমস্ত দিন দিগ্‌দিগন্ত হইতে চরিয়া আসিয়া প্রদোষ মুখে আপন আপন বাসা লইতেছে, রাখালগণ গাভীর পাল লইয়া হে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, ক্ষুদ্র একটী পুষ্পোদ্যান মধ্যে ভারতীর কুটীর শাভা পাইতেছে। প্রাঙ্গনটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দ্বারে তুলসী বেদিকা। ারতী গোঁসাই মানুষের পদ শব্দ পাইয়া বাহিরে আসিয়া সসঙ্গী নিমাই ণ্ডিতকে দেখিয়া প্রেম-পুলকিত অন্তরে আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমোন্মত্ত গীরাঙ্গ যথারীতি ভারতীর পাদ বন্দনা করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! আজ ত্তরায়ণ সংক্রমণ, আগামী কল্য আমাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিতে হইবে।" —

ভারতী উত্তর করিলেন, "তোমার সন্ন্যাস লইবার বয়স এখনও হয় নাই। নবীন যৌবনে কঠোর বৈরাগ্য কি সহিতে পারিবে? তোমাকে সন্ন্যাস তে আমার প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠে; তোমার জননী ও ভার্য্যাকে বলিয়া াসিয়াছ তো? বৎস! এখনও তোমার যে অপত্যাদি কিছু জন্মায় নাই।

শাস্ত্রে বিহিত আছে যে, গার্হস্থ্যে অপত্যোৎপাদনের পর সন্ন্যাসের প্রশস্ত কাল। তোমার তো সে অবস্থা হয় নাই; তবে কোন্ প্রাণে আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিব? তোমার জননী ও ভার্য্যা আমাকে কি বলিবেন? সত্য সত্যই তোমাকে সন্ন্যাসী করিতে আমার প্রাণ কাঁপিতেছে।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বৈরাগ্য ও প্রেমে বিহ্বল হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! আমাকে কেন বঞ্চনা করিতেছেন? আপনি কত পতিতকে উদ্ধার করিয়াছেন, আমি অতি অকিঞ্চন, আমাকে এমন দীক্ষা দিন্, যা'তে আমি কৃষ্ণদাস হইতে পারি। আপনি তো পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত আছেন, তবে কেন প্রতিজ্ঞা পালনে ইতস্ততঃ করিতেছেন?" এই বলিয়া উদ্দণ্ড প্রেমাবেগে বিশ্বম্ভর হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অবসর বুঝিয়া মুকুন্দ সুমধুর স্বরে সংকীর্ত্তন জুড়িয়া দিলেন। গৌরের নয়ন দিয়া অবিরল প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল; এবং মহাযোগে ও মহাভাবে তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন। কীর্ত্তনের কোলাহলে চারিদিক্ হইতে লোক সমাগম হইতে লাগিল এবং অপরূপ আকৃতি গৌর-মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অবাক্ হইয়া গেল। কেশব ভারতী গৌরের অমানুষী ভাব বিলাস আর কখন নয়নগোচর করেন নাই। তাঁহার মনে সন্দেহ ছিল যে, নবীন যৌবনে এ ব্যক্তি বৈরাগ্য ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবে কি না? তাহা এখন সম্পূর্ণ রূপে নিরসন হইল।—তিনি গৌরাঙ্গের ভাবতরঙ্গ দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং ইনি কোন মহাপুরুষ, স্বীয় কারুণ্যে আমার নিকট দীক্ষিত হইতে আসিয়াছেন, এইরূপ অনুভব করিতে লাগিলেন। গৌরের ভাবাবসানে ভারতী বলিলেন, "নিমাই! আমার মহা অপরাধ হইয়াছে, তোমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ, জগদ্গুরু, তোমাকে দীক্ষা দিতে পারে জগতে এমন কাহাকেও দেখি না। আমার ভাগ্যে আমার নিকট যে দীক্ষিত হইবে, সে কেবল লোক শিক্ষার নিমিত্ত। তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব, স্বতন্ত্র-মত হইব না। গৌরচন্দ্র এই আশ্বাস বাক্যে অতিশয় আনন্দিত হইয়া ভারতীকে বলিলেন, "গুরুদেব! স্বপ্নযোগে এক মহাপুরুষ আমাকে সন্ন্যাসের এক দীক্ষা মন্ত্র বলিয়া দিয়াছেন, দেখুন দেখি সে মন্ত্র সিদ্ধ কি না?" এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবী গুরুর কর্ণে মন্ত্র বলিলেন, এবং ভারতীর নিকট দীক্ষিত হইবা

পূর্ব্বে প্রকারান্তরে তাঁহাকেই দীক্ষিত করিলেন। ভারতী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'এ মন্ত্র কোথায় শিখিলে?' এইরূপ নানা সৎপ্রসঙ্গে শীতকালের দীর্ঘযামিনী পোহাইয়া গেল, কেহ আর নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। প্রভাত সময়ে বিশ্বম্ভর চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পিতঃ এ কর্ম্মের বিধিযোগ্য যাহা কিছু অনুষ্ঠান, সকলই আপনি করুন। আপনাকে আমি প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম।'

আচার্য্যরত্ন যদিও গৌরের সংকল্প অবগত ছিলেন, তথাচ নিঃসংশয়রূপে জানিবার জন্যই হউক, অথবা নিরাশ ব্যক্তি যেমন ভগ্নমনোরথকে ফিরাইতে চায়, সেইরূপেই হউক, অজ্ঞের ন্যায় উত্তর করিলেন, 'কিসের অনুষ্ঠান?'

গৌর দৃঢ়তাব্যঞ্জকভাবে বলিলেন, 'আমি গার্হস্থ্য আশ্রম ছাড়িয়া আজ সন্ন্যাসাশ্রমে নবজীবন লাভ করিব, তাহারই অনুষ্ঠানের কথা বলিয়াছি।' এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। আচার্য্যরত্ন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। শুভকর্ম্মের সহায় ভগবান্। আশ্চর্য্যের বিষয় কোথা হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্ভার আসিয়া জুটিয়া গেল, কেহ জানিতে পারিলেন না। ইতিপূর্ব্বেই গৌরের সন্ন্যাসের কথা নগরী মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। তাই পল্লিগ্রামের সরলমতি নরনারীগণ অল্পসময় মধ্যেই দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি, তাম্বূল, বস্ত্র, চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি সামগ্রী সম্ভার আয়োজন করিয়া ভারতী ঠাকুরের কুটীর দ্বারে আনিয়া সজ্জিত করিয়া দিল। এ দিকে গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে, নাচিতে মহাভাব ও মহাযোগের জীবন্ত প্রতিমারূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া চারিদিক হইতে নরনারী, বালক বালিকা আসিয়া ভারতীর কুটীর ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে; লোকে লোকারণ্য হইয়া গঙ্গাতীরের প্রশস্ত প্রান্তর ভূমি শোভা পাইতেছে। গৌরের তৎকালের ভাব ও মুকুন্দের মধুর কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া লোকসকল স্তম্ভিত হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। গৌরের নবীন বয়স ও অনিন্দ্য রূপ দেখিয়া এবং সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া কত লোক কাঁদিয়া অস্থির হইতেছে; কেহ কেহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিধাতার নির্ব্বন্ধকে দোষ দিতেছে। কতলোক ব্যাকুলভাবে সেই অপূর্ব্ব যুবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া ও তাহার মাতা ও

যুবতী ভার্য্যার কথা শুনিয়া রোদন করিতেছে, কেহ বলিতেছে; 'ধিক্ শাস্ত্রকারদিগকে, যাঁহারা এমন নিষ্ঠুর সন্ন্যাসের প্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন।' কেহ বলিতেছে, 'হায়! ইহার মাতার ও ভার্য্যার পক্ষে আজ কি কাল রজনীই পোহাইয়াছে, এ হেন ধনে সন্ন্যাসী করিয়া তাহারা কেমন করিয়াই বা বাঁচিবে?' বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সেই জনতা প্রগাঢ় হইতে লাগিল। ক্রমে বেলাবসান হইতে চলিল, তথাচ গৌরের প্রেমাবেগ সম্বরণ হইল না, সংকীর্ত্তনও থামিল না। অবশেষে নিত্যানন্দের ইঙ্গিতে গৌরচন্দ্র একটু স্থির হইয়া উপবেশন করিলে, মুণ্ডন করিতে নাপিত আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। পরম সুন্দর চাঁচরকেশের সহিত শ্রীশিখার অন্তর্ধান হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। তৎশ্রবণে দর্শকমণ্ডল মধ্যে ক্রন্দনের মহারোল পড়িয়া গেল। মধু নাপিত ক্ষুর তুলিবে কি, কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এদিকে গৌরচন্দ্রও প্রেমানুরাগে গর গর হইয়া ও ভাবী নবজীবনের নব ভাব স্মরণ করিয়া একবার উঠিতে, একবার বসিতে, একবার কাঁদিতে, একবার নাচিতে লাগিলেন। সুতরাং ক্ষৌর কর্ম্ম বড় একটা অগ্রসর হইতে পারিল না। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই কাঁদিতেছিল, কিন্তু এক ব্যক্তির ভাবানুরাগ দেখিয়া আর সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সে ব্যক্তি গৌরাঙ্গের মুণ্ডন দেখিতে দেখিতে হাহাকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার চারিদিকে লোক সকল বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার পরিচয় জানিবার জন্য অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, এ লোকটা কে?

অপর আগন্তুক উত্তর করিল, এ আমাদের গ্রামের গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। প্রথম ব্যক্তি বলিল, আপনার নিবাস? উত্তর—চাকন্দী গ্রামে।

এইকথা হইতে হইতে মূর্চ্ছাপন্ন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য চৈতন্য লাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। এদিকে বেলাবসান হইয়া আসিল, নাপিত কোনমতে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিলে গৌরচন্দ্র প্রায় সন্ধ্যাসময়ে গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের স্থানে আসিয়া বসিলেন। ভক্তগণ কাঁদিতে কাঁদিতে অরুণবর্ণের ডোর কৌপীন পরাইয়া দিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া দিয়া গলদেশ ও হস্ত কুসুমমালায় বিভূষিত করিলেন।

ভারতী গোস্বামী গৌরের হস্তে সন্ন্যাসাশ্রমের চিহ্ন, দণ্ড ও কমণ্ডলু দিয়া

পূর্ব্বে গৌরচন্দ্র স্বপ্নলব্ধ যে মন্ত্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কর্ণে প্রদান করিলেন। গৌরচন্দ্র তখন প্রেমানন্দে বোল হরিবোল বলিয়া নাচিতে লাগিলেন, দেবগণ স্বর্গে আনন্দদুন্দুভি বাজাইতে লাগিলেন, ভক্তগণ কাঁদিতে কাঁদিতে হরিবোল বলিয়া উঠিলেন, দর্শকমণ্ডলী গভীর নিনাদে হরিধ্বনি দিয়া গগণমণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিল। আর মহাভারতীয় ব্যাসোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করিল, যথা—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।"

এদিকে ভারতী গোঁসাই গৌরের সন্ন্যাসাশ্রমোপযোগী নাম রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া কিছু বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছিলেন, এমন সময়ে ভগবদাদেশের শুভ্র জ্যোতিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, বিধানালোকে তিনি ভবিষ্যতের ছবি দেখিতে পাইলেন এবং শুদ্ধা সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইলেন। তখন তিনি নব সন্ন্যাসীর বক্ষে হস্ত দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "নিমাই পণ্ডিত! শ্রবণ কর। মধুর 'কৃষ্ণ' নাম দিয়া তুমি সংসারমুগ্ধ অচৈতন্য লোকদিগকে চৈতন্য দিয়াছ এবং ভাবী জীবনে কোটি কোটি নরনারী তোমা হইতে চৈতন্য লাভ করিবে, এজন্য তোমার 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নাম প্রকাশ হইল; এখন হইতে এই নামেই তুমি পরিচিত হইবে।" এই কথার শেষ শব্দ আকাশে বিলীন হইতে না হইতে চারিদিকে আনন্দ পূর্ণ হরিধ্বনি হইতে লাগিল, শ্রীগৌরাঙ্গও নিজ নাম লাভ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। আমরাও এখন হইতে ইঁহাকে কৃষ্ণচৈতন্য নামে সম্বোধন করিতে থাকিব।

সেই প্রদোষ সময়ে গৌরের ইঙ্গিতে মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সমস্ত রজনীতে কীর্ত্তনের বিরাম হইল না। কখন একাকী, কখন গুরুশিষ্যে, কখন দলবদ্ধ হইয়া মহা নৃত্য হইতে লাগিল। প্রেমানন্দে কাটোয়া নগরী ভাসিয়া গেল; কত শত পাপী তাপী দেখিয়া শুনিয়া নবজীবন পাইল। আমাদের পূর্ব্বকথিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য গৌরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম শুনিয়া 'চৈতন্য! চৈতন্য!' বলিতে বলিতে উন্মত্তের ন্যায় গঙ্গাতীরে দৌড়িয়া চলিল; নৈশ আকাশ তাহার কণ্ঠ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং প্রভাত কালে কোন মতে সে চাকন্দী গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল। তদবধি "চৈতন্য" ভিন্ন তাঁহার মুখে আর অন্য কথা উচ্চারিত

হইত না। গ্রামবাসী লোক তাঁহার সমভিব্যাহারীর নিকট পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা শুনিয়া সে পাগল হইয়াছে মনে করিল এবং তদবধি তাঁহাকে ক্ষেপা চৈতন্য দাস নামে ডাকিতে লাগিল; তিনিও সেই নামে উত্তর দিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার পূর্ব্ব নাম লোপ হইয়া চৈতন্যদাস নামই প্রকাশ হইল। পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ ব্যক্তি কে যে ইহার কথা এত করিয়া বলা হইল? খ্রীষ্টীয় বিধানে ঈশার অন্তর্ধানের পর যেমন পলই খ্রীষ্টধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক ছিলেন, তেমনি গৌরবিধানে শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকটের পর যে মহামতি বৈষ্ণবধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছায় তদীয় শক্তিসম্পন্ন হইয়া বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, যাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অতুল্য ক্ষমতায় বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্র নূতন বিধানের নূতনালোক প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, এবং গোস্বামীদিগের গ্রন্থনিচয় প্রচারিত হইয়াছিল, যাঁহার অলৌকিক সাধুতায় বনবিষ্ণুপুরের দস্যুরাজ বীরহাম্বীর দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, আমাদের উল্লিখিত ক্ষেপা চৈতন্য দাস সেই পরমভাগবত শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পিতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসান্তে।

এই পরিচ্ছেদের লিখিত বিবরণে বৈষ্ণবগ্রন্থকারদিগের মধ্যে মত ভেদ দৃষ্ট হয়। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত আছে, চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বৃত্তান্ত তাহা অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন। আমরা প্রথমোক্ত গ্রন্থকারদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া বক্তব্য বিষয় বলিয়া পরে শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মত ব্যক্ত করিব।

সন্ন্যাসের নিশা প্রেমানন্দে অতিবাহিত হইল। গৌরের প্রেমতরঙ্গে পড়িয়া কঠোর বৈরাগী ভারতী গোসাঁইও নাকি কাঁদিয়া বিভোর হইলেন।

তাঁহার দণ্ড কমণ্ডলু কোথায় পড়িয়া রহিল; গুরু শিষ্যে হাত ধরাধরি করিয়া, কখন কোলাকুলি করিয়া নাচিয়া কৃষ্ণানন্দে বিভোর হইলেন। শীতকালের দীর্ঘযামিনী কোন্ দিক দিয়া পোহাইয়া গেল, কেহ টের পাইলেন না। রজনীপ্রভাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের পাদবন্দনা করিয়া বলিলেন, "পিতঃ! আপনি নবদ্বীপে গমন করুন; আমার শোকবিহ্বলা জননী ও প্রাণের বন্ধুবর্গকে আমার সন্ন্যাসের কথা বলিয়া বলিবেন, "যে যদিও কর্ত্তব্যপালন জন্য আমি বনগমন করিতেছি, তথাচ তাহাদের অন্তর হইতে আমি কখনই দূরে থাকিতে পারিব না। আর আপনি আমার পিতা, যখন স্মরণ করিবেন, আমায় দেখা পাইবেন।" আচার্য্যরত্নাদি শোকবিহ্বলচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং দিবাবসান সময়ে শচীগৃহে উপনীত হইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী সমক্ষে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। গৌরের গমন হইতে এই তিন দিন পর্য্যন্ত নবদ্বীপ নগর বিষাদ ধাম হইয়াছে। ভক্তমণ্ডলী মৃতকল্প, শচী মাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া গৌরগুণকীর্ত্তন করিয়া কতই কাঁদিতেছেন। মা শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া আছেন। প্রভাত সময়ে গৌর যাইবার কালে বাড়ীর অবস্থা যেরূপ ছিল, সেইরূপ সকল বাসি পড়িয়া আছে, তিন দিন পর্য্যন্ত কেহ জল-বিন্দু স্পর্শ করেন নাই। এক্ষণে আচার্য্যরত্নের কথায় তাঁহাদের শোকাবেগ শতগুণ বৃদ্ধি হইল এবং নানাভাবে সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তগণ শোকে আত্মহারা হইয়া জীবনান্ত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। পরক্ষণেই প্রত্যাদিষ্ট হইলেন 'আত্মহত্যারূপ পাপে মগ্ন হইও না, অল্পসময় মধ্যেই গৌরের সঙ্গে পুনর্ম্মিলন হইবে।' তখন তাঁহারা আপনাদের ভীষণ প্রতিজ্ঞা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বিষাদের কালিমায় নবদ্বীপের আকাশ ছাইয়া ফেলিল। দুঃখ বিষাদে মগ্ন হইয়া ভক্তমণ্ডলী কালের কুটিল গতির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এ দিকে আচার্য্যরত্নকে বিদায় দিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনগমনে উদ্যত হইলেন। ভারতী গোস্বামী গৌরের প্রেমমন্ত্রে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁর গমনোদ্যোগ দেখিয়া বলিলেন, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। এখানে একাকী থাকিয়া কি করিব? তোমার সঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে

সুখে দিন কাটিয়া যাইবে। প্রেমানন্দের কথা পাইলে শুষ্ক জ্ঞানযো ভাল লাগে না।" গৌরচন্দ্র অনুমতি দিলে অগ্রে ভারতী, মধ্যে নূত সন্ন্যাসী, পশ্চাতে নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ পশ্চিমাভিমুখে গম করিতে লাগিলেন। গৌর তখন নবজীবনের নবভাবে বিভোর। পিঞ্জরাব পাখী যেমন পিঞ্জর হইতে বাহির হইতে পারিলে প্রমুক্ত আকাশে পূ উৎসাহে বিচরণ করিতে থাকে, তেমনি সংসার পিঞ্জর কাটিয়া গৌর পাখী আজ ব্রহ্মাণ্ডের সুপ্রশস্ত আকাশে বাহির হইয়াছেন, সংকীর্ণতা নীচসীমা তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাণে অসীম অনন্তে ছায়া পড়িয়াছে, প্রেমের জ্বলন্ত অনল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং এত দিনে প্রাণনাথের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবেন বলিয়া আনন্দধারায় বুক ভাসিয়া যাইতেছে; গৌর আত্মহারা হইয়া ভাগবতো নিম্নোক্ত শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ;—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ
অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাংঘ্রিনিষেবয়ৈব।"

পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অবলম্বিত পরাত্মনিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া মুকু চরণ সেবাদ্বারা আমি দুস্তর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব।

ভ্রাতৃগণ! সংসার মোহ উত্তীর্ণ হইতে হইলে পূর্ব্বতন মহর্ষিদিগে অবলম্বিত পরাত্মনিষ্ঠাই সার। পরমাত্মাতে নিষ্ঠা স্থাপিত না হইলে তাঁহার চরণ সেবার অধিকার জন্মে না। অতএব তোমরা এখন অনুমতি কর, আমি নিভৃতে যাইয়া পরাত্মনিষ্ঠা অভ্যাস করি। এই বলিয়া অনুরাগ ভরে গৌরচন্দ্র দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। বন্ধুগণও তাঁহার সঙ্গে ছুটিয়া চলিলেন। এদিকে অপরূপ মূরতি নূতন সন্ন্যাসী দেখিয়া নগরের বহু সংখ্যক নর নারী তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং গৌরের তৎকালের জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও প্রেম অবলোকন করিয়া, তাঁহার মাতা পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া, কতরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহাদিগকে অতি মধুর ভাবে নিম্নলিখিত উপদেশ দিলেন।

"ভাই সব! গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গৃহ ধর্ম্মে মনোযোগ কর! কিন্তু দেখো যেন সংসারে আসক্ত হইও না। পবিত্র কর্ত্তব্য জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণে

দেশে সকল ধর্ম্ম সমারম্ভ কর। অনুদিন হরিনাম সংকীর্ত্তন কর এবং কৃষ্ণগত প্রাণ হও। আমি প্রার্থনা করি, শুকাদিরও দুর্ল্লভ প্রেম যেন তোমাদের লাভ হয়।" লোক সকল প্রেমানন্দে গদ গদ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া চলিল।

দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন্ধুগণ সঙ্গে রাঢ় ভূমিতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। রাঢ়দেশের উচ্চ ভূমি সকল পরম সুন্দর, সুপ্রশস্ত প্রান্তরের চারিদিকে অশ্বথবৃক্ষরাজি সারি সারি শোভা পাইতেছে, গাভীগণ মহানন্দে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া গৌরের বৃন্দাবন ভাবাবেশ হইল এবং মত্ততার সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ কীর্ত্তন জুড়িয়া দিলেন। নাচিতে নাচিতে প্রভু বলিলেন, 'বক্রেশ্বর যে বনে তপস্যা করিতেছেন, আমি সেইখানে যাইয়া নিভৃতে কৃষ্ণনাম করিব।' এই বলিয়া নবসন্ন্যাসী উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। বেলা অবসান হইল দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন, এবং কিছু জলযোগান্তে সকলে গৌরকে বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মণের বাহির বাড়ীতে শয়ন করিয়া থাকিলেন। রজনী তৃতীয় প্রহরের সময় নিত্যানন্দ জাগরিত হইয়া দেখেন, গৌরচন্দ্র শয্যায় নাই। অত্যন্ত ব্যস্তমনা হইয়া তিনি আর আর সঙ্গীদিগকে জাগাইলেন এবং সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। গ্রামখানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাঁহারা প্রান্তর ভূমিতে গমন করিলে নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সুদূর হইতে বিলাপযুক্ত রোদনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শব্দ তত সুস্পষ্ট না হইলেও তাঁহারা গৌরকণ্ঠবিনির্গত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং শব্দানুসারে গমন করিয়া লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রভাতীয় ক্ষীণালোকে ভক্তগণ দেখিতে পাইলেন, নির্জ্জন প্রান্তর ভূমিতে বসিয়া সেই নবীন সন্ন্যাসী চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া "কৃষ্ণরে প্রভুরে ওরে কৃষ্ণ মোর বাপ!" বলিয়া কাঁদিতেছেন, তাঁহার গভীর বিলাপধ্বনি নৈশ আকাশে প্রতিধ্বনিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিতেছে; এবং সাক্ষাৎ বৈরাগ্য প্রতিমূর্ত্তি ধরিয়া যেন তাঁহার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। ভক্তগণ তাঁহার তদানীন্তন বিষাদের ভাব দেখিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। মুকুন্দ অবসর বুঝিয়া মধুর কণ্ঠে সংকীর্ত্তন গাইতে আরম্ভ করিলেন। রসময় হরিনাম

শুনিবামাত্র গৌরের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তিনি অমনি উঠিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে এই অপূর্ব্ব ভক্তদল ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। হরি সংকীর্ত্তন কাহাকে বলে, তখন কেহ জানিত না। যে গ্রামের পথ দিয়া তাঁহারা যাইতে লাগিলেন, সকলে অবাক্ হইয়া তাঁহাদের ভাব গতিক দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের কথা লইয়া গ্রামে গ্রামে কতই আন্দোলন চলিতে লাগিল। এই রূপে রাঢ়দেশ ধন্য করিয়া বিশ্বম্ভর বক্রেশ্বরের আশ্রমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। চারিক্রোশ মাত্র পথ অবশিষ্ট আছে হঠাৎ তাঁহার গতি ফিরিল। যাইতেছিলেন পশ্চিমাভিমুখে, হঠাৎ পূর্ব্বাস্য হইলেন। সঙ্গীগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, 'জগন্নাথ প্রভুর আদেশ হইয়াছে শীঘ্র নীলাচলে যাইতে।' ভক্তগণ তাহা শুনিয়া পরম সুখী হইলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, যখন ইতি পূর্ব্বে পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়া শচী মাতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সন্ন্যাসান্তে তিনি কোথায় থাকিবেন? গৌর তখন জননীকে কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই, এই মাত্র বলিয়াছিলেন 'যেখানেই থাকি না কেন, তোমারে মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া যাইব, বিশ্বরূপের ন্যায় নিরুদ্দেশ হইয়া যাইব না।' ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদিগের এই একটী বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় যে, তাঁহারা চিরদিনই প্রিয়তমের শ্রীমুখের আজ্ঞার আজ্ঞাকারী। সেই আজ্ঞায় মরিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি পৃথিবীর কথায় সহস্র লাভ হইলেও তাঁহারা তাহা মানিতে প্রস্তুত নহেন। এক মাত্র ভগবদাদেশেই ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ জীবনান্তকারী বিপদকেও গ্রাহ্য করেন নাই; মহর্ষি ঈশা বুক পাতিয়া ক্রুশের আঘাত লইয়াছিলেন; আর তাহাতেই গৌরকে পথের ভিখারী করিল। যাহা হউক প্রত্যাদেশের অভ্রান্তবাণী আজ তাঁহার ভবিষ্যতের বাসস্থান যেই নির্ণয় করিয়া দিল, অমনি মত্ত মাতঙ্গের গতি ফিরিল। মেষ শিশুর ন্যায় আদেশের নির্দ্দেশানুসারে তিনি গঙ্গাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পথমধ্যে গ্রামবাসি[illegible]দিগের কাহারও মুখে হরিনাম না শুনিয়া গৌরের হৃদয় বড় [illegible]ত হইল। [illegible] তিনি বলিলেন, "এই কয়েক দিন ধরিয়া এই দেশে বেড়াই[illegible] [illegible]কন্তু [illegible] কাহারও মুখে একবার "কৃষ্ণ হেন নাম" শুনিতে পা[illegible], কি পরিতাপের বিষয়!" এই ভাবে যাইতে যাইতে গৌরচা[illegible]

সঙ্গীদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া কিছু অগ্রগামী হইলেন এবং ধ্যানানন্দে বিভোর হইয়া এক স্থানে যাইয়া নিমীলিত নেত্রে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ নিকটবর্ত্তী হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেলেন। তাঁহারা দেখিলেন, কয়েক জন গরুর রাখাল স্তিমিতনেত্র বিশ্বম্ভরকে বেষ্টন করিয়া হরিবোল বলিয়া হাতে করতালি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে; মধ্য স্থানে দাঁড়াইয়া চৈতন্য প্রভু নামানন্দে ভাসিতেছেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি মহাসুখী হইলেন এবং দেশবাসীদিগের মুখে হরিনাম না শুনিয়া প্রাণে যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহা অপনীত হইল। সহাস্য মুখে গৌরচন্দ্র রাখাল বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখান হইতে গঙ্গা কত দূর?" বালকগণ উত্তর করিল, 'এক প্রহরের পথ।'

গঙ্গা নিকটবর্ত্তী শুনিয়া গৌরচন্দ্র গঙ্গাবগাহনের জন্য দৌড়িতে লাগিলেন। সঙ্গের ভক্তগণ কেহ তাঁহার সঙ্গে চলিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেবল নিত্যানন্দ তাঁহার দেহ রক্ষার ব্যগ্র হইয়া কোনমতে তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিলেন। প্রায় সন্ধ্যাসময়ে উভয়ে গঙ্গাতীরে পৌঁছিলে গৌরচন্দ্র মনের সাধে অবগাহন ও উদর পুরিয়া গঙ্গাজল পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। গঙ্গা দর্শনে তাঁহার প্রেমাবেগ প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি গঙ্গার স্তব পড়িতে পড়িতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। 'ব্রহ্মরূপের দ্রবভাবরূপিণী গঙ্গে! তোমার জল প্রেমরস স্বরূপ, উহা পানে, স্নানে, অশেষ পাপ দূরীভূত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। জগতের মঙ্গলের জন্যই তোমার মর্ত্ত্যে আগমন।" ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া কে না গঙ্গার ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে? প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ হইবেন না কেন? নিত্যানন্দের সহিত গৌর সেই নিশা সে গ্রামে যাপন করিলে প্রভাতে অনুবর্ত্তী ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। তখন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "নিতাই! আমার বিরহে মা ও শ্রীবাসাদি ভক্তমণ্ডলী ম্রিয়মাণ হইয়া আছেন; তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত কর এবং আমার আগমন সংবাদ দিয়া বলিও যে আমি তাঁহাদের দর্শনাপেক্ষায় শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিতেছি। এখান হইতে শান্তিপুর বেশী দূর নয়, আমি গঙ্গা পার হইয়া ফুলিয়া নগরে ভক্ত হরিদাসের আশ্রম দর্শন করিয়া শান্তিপুরে যাইব।

তুমি ইতিমধ্যে নবদ্বীপ হইতে মা ও বন্ধুদিগকে লইয়া আচার্য্যভবনে আগমন করিও।" এই বলিয়া সকলে একত্র গঙ্গা পার হইলেন এবং নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া গৌরচন্দ্র ফুলিয়াভিমুখে চলিয়া গেলেন।

এই তো গেল চৈতন্যভাগবতপ্রমুখ গ্রন্থকারদিগের মত। ইহাঁদিগের মতে সন্ন্যাসযাত্রা হইতে এ পর্য্যন্ত দ্বাদশ দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে চরিতামৃতে ও চন্দ্রোদয়নাটকে কিছু অন্যরূপ বর্ণনা দেখা যায়। চরিতামৃতের মতে সন্ন্যাস গ্রহণান্তে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৌরচন্দ্র বৃন্দাবনে যাইবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন; পশ্চাতে নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন ও মুকুন্দ এই তিনজন মাত্র অনুগমন করিলেন। কবি কর্ণপূর বলেন যে, সঙ্গে কেবল মাত্র নিত্যানন্দই ছিলেন; আচার্য্যরত্নকে পূর্ব্বেই বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহাপ্রভু প্রেমে আত্মহারা হইয়া তিন দিন দিবা রাত্রি রাঢ় দেশের মধ্যে দৌড়াইয়া বেড়াইয়াছিলেন। গোপবালকদিগকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলে, নিত্যানন্দের শিক্ষামত তাহারা তাঁহাকে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। চরিতামৃতকার বলেন যে, এইখানে নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্নকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন যে, "শচীমাতাও ভক্তগণকে লইয়া তিনি যেন শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে যান। আমি কোনরূপে প্রভুকে লইয়া তথায় গমন করিব।" আচার্য্যরত্নকে বিদায় দিয়া নিত্যানন্দ প্রেমমুগ্ধ গৌরচন্দ্রের সম্মুখে যাইয়া দর্শন দিলেন। গৌর বিস্মিতের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদগোঁসাই! আপনি কোথায় যাইবেন?"

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, "তোমার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইব।"

জিজ্ঞাসা—বৃন্দাবন কত দূরে?

"এই যমুনা দর্শন কর" বলিয়া নিতাই গৌরকে গঙ্গাতীরে আনিলেন এবং কোন আগন্তুককে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের আগমনসংবাদ অদ্বৈতের সমীপে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌরচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গঙ্গাকে যমুনা জ্ঞান করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন; এবং স্নান মার্জ্জন করিয়া আর্দ্র কৌপিনে নাম কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য সবান্ধবে নূতন কৌপিন বহির্ব্বাস লইয়া নৌকারোহণে আগমন করিয়া নবীন সন্ন্যাসীর রূপ ও ভাবমধুরী দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র

অদ্বৈতকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য! আমি বৃন্দাবনে আসিয়াছি, তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

অদ্বৈত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "প্রভু! তুমি যেখানে, সেই বৃন্দাবন। আমার সৌভাগ্য, তুমি আমার দেশে গঙ্গাতীরে আসিয়াছ।" এই বলিয়া আচার্য্য কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরকে শুষ্ক কৌপীন পরাইয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন, "বুঝিয়াছি, নিত্যানন্দ আমাকে বঞ্চনা করিয়া যমুনাদর্শনচ্ছলে গঙ্গাতীরে আনিয়াছেন।"

অদ্বৈত বলিলেন, "শ্রীপাদের কথা মিথ্যা নয়। যুক্তবেণী প্রয়াগ হইতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী তিনে সম্মিলিত হইয়া এক ধারে প্রবাহিত হইতেছে, তন্মধ্যে গঙ্গার মধ্যে সরস্বতী পূর্ব্বদিকে ও যমুনার ধারা পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। তুমি যখন সেই পশ্চিম পারে অবগাহন করিয়াছ, তখন যমুনায় স্নান করা হইয়াছে। চারি দিন উপবাসী রহিয়াছ, এক্ষণে এই নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া আমার বাড়ীতে এক মুঠা রুক্ষা শুকা ভাত খাইতে হইবে।"

নিতাই হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন, "রুকা শুকার কর্ম্ম নয়। চারি চারি দিন উপবাসী আছি, ভোজনের আয়োজন টা ভাল না হ'লে তোমার বাড়ী যাওয়া হইবে না।" অদ্বৈত পরিহাস করিয়া বলিলেন, "কেন তোমার আবার উপাস কিসের? যেখানে যাও, উদর পূজা না হ'লে কি ছাড়।"

নিতাই উত্তর করিলেন, "আর পেটপূজা! উনি না হয় হরিপ্রেমরস পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছেন; আমার তো আর সে রস নাই, আমি কি খেয়ে বাঁচি বল দেখি? উনি দণ্ড নিয়ে দিনরাত্রি মাঠে মাঠে ঘুরেছেন, আমার এ কি দণ্ড যে আমি না খে'য়ে, না শু'য়ে পিছে পিছে ঘুরে মরি।"

অদ্বৈত মনে মনে নিত্যানন্দের অকৃত্রিম ও সরল সৌহার্দ্দের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "এখন চল্ বামনা! পেটে পিটে যাহা হয় খে'তে পাইবি এখন।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সকলে গৌরকে লইয়া নৌকারোহণে পর পারে চলিয়া গেলেন। এ বৃত্তান্তে ফুলিয়া যাইবার কথা নাই। এবং সন্ন্যাস হইতে শান্তিপুরে আগমন পর্য্যন্ত চারি দিন রাঢ়ে অতিবাহিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তিপুরে।

বেলা অবসান হইয়াছে। শচীমন্দিরে ভক্তগণ সমবেত। শচীদেবী ভূপতিতা, সংজ্ঞাহীনা। আজ বার দিন নিমাই সন্ন্যাসে গিয়াছেন, শচী দেবীর এই বার দিন উপবাস। গভীর পুত্রশোকে শচীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, তিনি জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছেন। রামকৃষ্ণকে অক্রূর মথুরায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, শচীদেবী যশোদার ভাবে বিহ্বলা, এক একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁ্যাগো! তোমরা কি মথুরাবাসী? আমার রামকৃষ্ণ কেমন আছেন জান?" এমন সময়ে নিত্যানন্দ আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন; শচীদেবী একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি অক্রূর এলে? ঐ শুন গোষ্ঠ মাঝে সিঙ্গা বেণু বাজিতেছে; আমি বলিয়া পাঠাইতেছি, আমার রাম-কৃষ্ণ যেন গহনবনে চলিয়া যান্, তা'হলে তো অক্রূর! তুমি তাঁদের ধরিতে পারিবে না।' নিত্যানন্দ দেখিলেন, শচী প্রলাপ বকিতেছেন। আর কিছু না বলিয়া উচ্চরবে বলিয়া উঠিলেন, "গৌর আপনাকে দেখিবার জন্য শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে অপেক্ষা করিতেছেন। আপনাদের লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" ভক্তগণ শুনিয়া বিষাদ পরিত্যাগ করিলেন, আনন্দ উৎসাহে প্রফুল্ল হইলেন। কথা শচীর কাণে প্রবেশ করিয়া অমৃত সিঞ্চন করিল; মস্তিষ্কের জড়তা দূর হইল এবং অল্পে অল্পে জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি নিত্যানন্দকে চিনিতে পারিলেন। অবিরল ধারায় নয়ন ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ শচীর দ্বাদশ উপবাসের কথা শুনিয়া বলিলেন, "মা! আমি কি জানি যে তোমাকে প্রবোধ দিব! তুমি কি শ্রীকৃষ্ণের রহস্য বুঝিতেছ না? তোমার পুত্র অলোকসামান্য; কে তাঁহার মহিমা জানিতে পারে? তিনি যখন তোমার বুকে হাত দিয়া বারবার বলিয়াছেন যে, ঐহিক পারমার্থিকের তোমার যত ভার, সকলই তাঁহার, তখন তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকা কি ভাল নয়? যাহাতে তোমার ভাল হইবে, নিশ্চয়ই তিনি তাহা করিবেন।

শোক সম্বরণ করিয়া স্নানাহ্নিক কর ও শ্রীকৃষ্ণের ভোগের আয়োজন কর; ইষ্টদেব উপবাসী থাকিলে প্রত্যবায় হয়।”

শচীদেবী নিত্যানন্দের কথায় আশ্বস্ত হইয়া স্নানাদি করিয়া পাক করিলেন; এবং ভক্তদিগকে আহার করাইয়া নিজে কিছু ভোজন করিলেন এবং পর দিন শান্তিপুরে পুত্র দর্শনে যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে নিত্যানন্দের মুখে গৌরের ফুলিয়া গমন বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপের স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সাজিল। অতি প্রত্যুষ হইতে যাত্রীগণ দলে দলে চলিতে লাগিল। খেয়াঘাট লোকে লোকারণ্য; খেয়ারী পার করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কেহ বা নৌকায়, কেহ বা ভেলায়, কেহ কেহ ঘট বুকে দিয়া এবং কেহ বা সন্তরণ করিয়া নদী পার হইয়া ফুলিয়া অভিমুখে চলিয়াছে। শান্তিপুর, ফুলিয়া, নবদ্বীপ তখন এক পারে; সুতরাং বর্ত্তমান খড়ে নদী পারের কথাই লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, যাত্রীদল ফুলিয়া নগরে যাইয়া অপরূপ সন্ন্যাসী দেখিয়া কৃতার্থ হইল। গৌরচন্দ্র আগন্তুকদিগকে যথাযোগ্য মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিয়া শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন; কিন্তু জনতার হাত এড়াইতে পারিলেন না। যাত্রীদলও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শান্তিপুরে চলিল। চৈতন্যচরিতামৃতে ফুলিয়া গমনের কোন উল্লেখ নাই। চৈতন্যভাগবতে যদিও উহা উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে কোথায় গমন করিয়াছিলেন ও কোথায়ই বা অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশেষ বৃত্তান্ত দেখা যায় না। ‘ভক্ত হরিদাসের আশ্রমে যাই’ বলিয়া গৌর তথায় গিয়াছিলেন। ইহার পরে শান্তিপুরে অবস্থিতি সময়ে হরিদাসের উপস্থিতি দেখা যাইবে। মনে হয়, হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে শান্তিপুরে লইয়া যাওয়াই গৌরের ফুলিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল।

নবীন সন্ন্যাসী শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুকুন্দ হরিদাসের সহিত অদ্বৈত ভবনে উপনীত হইলে, আচার্য্য বিস্ময়ে আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আগমনের কথা নগরে রাষ্ট্র হইয়াছিল। তিনি আসিতে না আসিতে অদ্বৈতমন্দির লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। সকলের মুখেই আনন্দ ও উৎসাহের চিহ্ন। আজ হইতে অদ্বৈত গৃহে মহামহোৎসব আরম্ভ হইল। অদ্বৈতাচার্য্যের শিশুপুত্র অচ্যুতানন্দ

দিগম্বর হইয়া ধূলিধূসরিত অঙ্গে খেলা করিতেছিল;' সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলে গৌরচন্দ্র শিশুকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "কেমন অচ্যুত! অদ্বৈতাচার্য্য আমার পিতা, তুমি আমার ভাই; এস ভাই! আমরা ভাই ভাই খেলা করি।" কথিত আছে, বালক অচ্যুতানন্দ উত্তর করিয়াছিলেন, 'হাঁ দৈবযোগে তুমি কখন কখন জীবের সখা হও বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই তুমি সকলের পিতা।' এমন সময়ে নিত্যানন্দ নবদ্বীপের ভক্তগণসঙ্গেও শচীদেবীকে দোলায় চড়াইয়া লইয়া উপনীত হইলেন। চরিতামৃতের মতে আচার্য্যরত্ন ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন; নিত্যানন্দ গৌরের সঙ্গে ছিলেন। যাহা হউক, জননীকে দেখিয়া গৌরচন্দ্র সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইলেন। শচী পুত্রকে কোলে লইয়া পুত্রের মুণ্ডিত মস্তক ও সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন; পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করিতে ও অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। শচী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা নিমাই! সন্ন্যাসী হয়েছিস্ হয়েছিস্, কিন্তু দেখিস্ বিশ্বরূপের মত আমাকে যেন ফেলে পালাস্ নে।" বিশ্বম্ভরও জননীর ব্যাকুলতা দেখিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "মা! এই শরীর, মন সকলই তোমার, আমি জন্ম জন্মান্তরে তোমার মত মায়ের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। সহসা সন্ন্যাস করিয়াছি বলিয়া তোমার প্রতি কখনও উদাসীন হইতে পারিব না। তুমি যে আজ্ঞা করিবে ও যেখানে থাকিতে বলিবে, তাহাই করিব।" শচীদেবী আশ্বস্তচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপের বন্ধুদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই মহানন্দে মত্ত হইয়া পূর্ব্বের বিরহ দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। অদ্বৈতাচার্য্য সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান ও পরিচারক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অদ্বৈত গৃহে মহামহোৎসব আরম্ভ হইল। যথাসময়ে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে গৌরচন্দ্র সবান্ধবে ভোজন করিতে বসিলেন। স্বয়ং অদ্বৈত পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আচার্য্যপত্নী সীতাদেবী আজ মনের উল্লাসে কতই পাক করিয়াছেন। চৈ মরিচের ঝালে সুক্তা, নানাবিধ শাক, বার্ত্তাকু যোগে কোমল নিম্বপত্র ভাজা, মোচার ঘণ্ট, বড়ার অম্ল, মধুরাম্ল প্রভৃতি আর দুই প্রকারের অম্ল, মুগের দাইল, নানাপ্রকার বড়া, ক্ষীরপুলি, নারিকেলপুলি,

পিষ্টকাদি সম্বৃত পায়সান্ন, ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, চাঁপা কলা, নারিকেল শস্য, ছানা-
শর্করাযোগে সুমিষ্ট পিষ্টক, সুবাসিত সূক্ষ্ম আতপের সম্বৃতান্ন প্রভৃতি
আহারের নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। এক এক জনের অন্নস্তূপের
চারিদিকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ব্যঞ্জনপূর্ণ দোনা সজ্জিত। চৈতন্য প্রভু ভোজন
করিবেন কি, অন্ন ব্যঞ্জনের পারিপাট্য দেখিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া
পড়িলেন, এবং অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বসিব?
এত ভাত তরকারী খাইতে পারিব না।" অদ্বৈত বলিলেন, "খে'তে না
পার, পাতে পড়িয়া থাকিবে।" চৈতন্য বলিলেন, "সন্ন্যাসীর পাতে
উচ্ছিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য নয়।" আচার্য্য পরিহাস করিয়া বলিলেন, "তোমার
সন্ন্যাসের ভারিভুরি আমি সব জানি, আর গোলে কাজ নাই, এখন
খে'তে বসো।" এই বলিয়া গৌরের হাত ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইয়া
দিলেন। নিত্যানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "পাঁচ পাঁচটা উপবাস ক'রে আছি,
আজ দেখ্‌ছি এই কয়টা ভাতে পেটই ভরিবে না।" অদ্বৈত বলিলেন,
"বেশ তো সন্ন্যাসী দেখ্‌ছি; সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, যে যাহা দেয়, সন্তুষ্ট চিত্তে
তাহাই লইতে হয়; অসন্তুষ্ট হইলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
এ মুষ্টিকান্ন দিয়াছি, তা'তেই সন্তুষ্ট হও, লোভ ক'রো না।" নিতাই
কৃত্রিম কোপভরে বলিলেন, "নিমন্ত্রণ করিতে গিয়েছিলে কেন? যত
খাইব, তত দিতে হ'বে।"

অদ্বৈত বলিলেন, "এটা কোথাকার ভ্রষ্ট অবধূত। এমনি করে দরিদ্র
গৃহস্থকে জ্বালাতন করতে সন্ন্যাসী হয়েছো না কি? যা পেয়েছো, তা'তেই
তুষ্ট হও। আমার ঘরে আর ভাত নাই।"

এইরূপে হাস্য কৌতুকে ভোজন চলিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য এক এক
জনের অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক খাইয়া রাখিতে লাগিলেন; অদ্বৈত পুনরায় তাহা
পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন। গৌর বলিলেন, "আর খে'তে পারি
না।" অদ্বৈত উত্তর করিলেন, "তা হ'বে না, আগে যাহা দিয়াছি, তা'
খে'তে হবে, এক্ষণে যাহা দিচ্ছি, তাহার অর্দ্ধেক খাইবে, অর্দ্ধেক রাখিবে।"
নিতাই বলিলেন, "আজ যখন পেটই ভরিল না, তখন তো'র ভাত তুই নে",
এই বলিয়া একমুষ্টি উচ্ছিষ্টান্ন লইয়া আচার্য্যের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। অদ্বৈত
তাহা গায়ে লইয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, "চন্ডটার এঁটু
গায়ে ক'রে, আজ পবিত্র হলেম; হাঁরে নিতাই! গায়ে এঁটু দিয়ে আমার

জাতকুল নাশ করিলি ?” নিতাই বলিলেন, “কৃষ্ণের প্রসাদকে তুমি অন্ন ব’লে অপরাধ কল্লে, একশত সন্ন্যাসী ভোজন না করালে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।” অদ্বৈত কৃত্রিম ক্রোধ ভরে বলিলেন, “যা ! যা ! তোরমত সন্ন্যাসীতে আমার কাজ নাই, সন্ন্যাসী গুলাই ত আমার স্মৃতিধর্ম্ম নাশ করিল।” ভোজন সমাধানান্তে সকলে বিশ্রাম করিলেন। অদ্বৈত মালা চন্দন লইয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতে উপস্থিত হইলে, গৌর বলিলেন, “আমাকে অনেক নাচাইলে, আর কাজ নাই, এক্ষণে ভোজন করগে।”

সন্ধ্যা সমাগত হইলে অদ্বৈতাচার্য্যের বাহির প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শান্তিপুরের লোক নূতন সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। ক্ষণকালে প্রাঙ্গণ, গৃহ, লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। গৌরের অপরূপ লাবণ্য, মুণ্ডিত মস্তক, পরিধেয় অরুণ বর্ণের কৌপীন বহির্ব্বাস, গলায় হরিনামের মালা, সর্ব্বাঙ্গ চন্দন মাল্যে সুশোভিত দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্য গাইতে ও নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, আনন্দ, উৎসাহ ও মত্ততা লোকে প্রেমবিহ্বলচিত্তে কাঁদিতে লাগিল। তিনি এই পদ গাইতে লাগিলেন :—

“কি কহিব রে আজ কি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।”

ক্রমে গৌর নিতাই যোগ দিলে মুকুন্দ দত্ত এই পদ গাইতে লাগিলেন :—

“হাহা প্রাণপ্রিয় সখি ! কিনা হৈল মোরে ;
কানুপ্রেম বিষে মোর তনুমন জরে।
রাত্রিদিন পো’ড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাও ;
যাহা গেলে কানু পাও, তাঁহা উড়ি যাও।”

ক্রমে গৌরের ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল, তিনি “বোল ! বোল” বলি এক প্রহর কাল উদ্দণ্ড নৃত্য করিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রম দেখিয়া ভক্ত কীর্ত্তন থামাইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র ভাবাবেশে সংকীর্ত্তন মাঝে আছাড় খাইতে লাগিলেন, তখন শচীদেবী দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “দেব নারায়ণ ! আ

বাল্যকাল হইতে তোমার সেবা করিয়া আসিতেছি, এখন এই আশীর্ব্বাদ চাই, যেন নিমাই পড়িলে তাঁর অঙ্গে ব্যথা না লাগে।”

পর দিন প্রাতঃকালে শচীদেবী আচার্য্যকে বলিলেন, ‘আমি আর নিমায়ের দেখা কোথায় পাইব? যে কয় দিন এখানে থাকেন, আমি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে চাই।’ আচার্য্য শচীর কথার মর্ম্ম বুঝিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। সেই দিন হইতে শচীদেবী স্বহস্তে পাক করিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত পুত্রকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। প্রাতে বন্ধুদিগের সহিত প্রেমালাপ, মধ্যাহ্নে সকলে একত্র ভোজন এবং সায়াহ্নে বহুজনতার মধ্যে নৃত্যকীর্ত্তনে গৌরের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। শচীমাতার স্নেহে, অদ্বৈতের যত্ন ও অনুরোধে এবং ধর্ম্মবন্ধুদিগের প্রেমের খাতিরে এক দুই করিয়া ক্রমে দশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। গৌরের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইলে যেমন বিবেকের তাড়নায় আত্মগ্লানি হয়, তিনি তেমনি অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। একাদশ দিনের প্রাতঃকালে গৌরচন্দ্র সমবেত আত্মীয় ও মাতৃসন্নিধানে বলিতে লাগিলেন, “মা! তোমার মত মা আমি যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই; তোমার প্রেমে আমি চিরবদ্ধ। প্রাণের বন্ধুগণ! তোমরা আমার চিরসঙ্গী, প্রাণ ছাড়া যায়, তবু তোমাদের ছাড়া যায় না। আমি যদিও সহসা সন্ন্যাস করিয়াছি, কিন্তু তা’বলে কি তোমাদের ছাড়িতে পারি? এই দেখ, নীলাচলচন্দ্র দেখিতে যাইতেছিলাম, তোমাদের স্নেহই আমাকে নিবর্ত্তিত করিয়া এখানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু দেখ, সন্ন্যাস করিয়া আত্মীয় স্বজন লইয়া নিজ জন্মস্থানে থাকিলে কি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট হয় না? লোকে এই সব কথা ব’লে কি নিন্দা কুৎসা রটাইতে ত্রুটি করিবে? তোমরা প্রাণের বন্ধু; যাহাতে দুই দিক্ বজায় থাকে, তাহা কর।”

কেহ কোন কথা না বলিতে শচীদেবী ধৈর্য্যসহকারে বলিয়া উঠিলেন, ‘বাপ নিমাই! তুই যদি ঘরে থাকিস্, তবেই আমার সুখ। কিন্তু তো’র সন্ন্যাসধর্ম্মের হানি হইলে ও নিন্দা রটিলে আমার কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। বাপ রে! যাহাতে তোর সংবাদ মাঝে মাঝে পাই ও কখন কখন সাক্ষাৎ পাই, এমন কোন স্থানে থাকিলে সকল দিক্ রক্ষা হয়। নীলাচলে যাবি মনে করেছিস্, সেই বেশ যায়গা। লোক যাতায়াতে সংবাদ পাইব,

অথবা শ্রীবাসাদিও মাঝে মাঝে যাইতে পারিবেন; কিম্বা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে তুইও কখন কখন আসিয়া দেখা দিয়ে যেতে পারবি। আমি বলি, সেই খানেই তোর বাস নির্দ্দিষ্ট হউক।” এই বলিয়া শচীদেবী অবিরল অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র বুদ্ধিমতী মাতার সারগর্ভ কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, “মা! তবে এখন বিদায় দিন, সময়ান্তে আবার দেখা হইবে।” অদ্বৈত প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বন্ধুগণ! তবে এখন বিদায় হই, তোমরা স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া হরিসংকীর্ত্তন কর গে; আমার সঙ্গে পুনরায় দেখা হইবে। কখন আমি গঙ্গাস্নানে আসিব, কখন বা তোমরা নীলাদ্রি যাইবে।”

ভক্তগণের মধ্যে হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, “তুমি তো নীলাচলে যাইবে; আমার গতি কি হইবে? আমার তো নীলাচল-চন্দ্র দর্শনের অধিকার নাই। তোমার বিরহে আমি কিরূপে বাঁচিব?’

চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন, “হরিদাস! আর কেঁদো না। তোমার ক্রন্দনে আমি বড় ব্যাকুল হই। আমি তোমার জন্ত জগন্নাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া তোমাকে নীলাচলে লইয়া যাইব।”

অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে অভীপ্সিত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আরও কিছুদিন রাখিবার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, “তোমার যখন যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, কাহার সাধ্য প্রতিনিবৃত্ত করিবে? কিন্তু সময় অতি দুর্ঘট। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতেছে; পথে দস্যুগণ ফিরিতেছে; অরাজকতা উপস্থিত। সে জন্য বলি, যে পর্য্যন্ত এই উৎপাতটা মিটিয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত এখানে থাকিলে হয় না কি?”

পাঠক মহাশয় জানেন এই সময়ে গৌড়ের সুবাদারের সহিত উৎকলরাজের সীমান্ত প্রদেশ লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। এ ১৪৩৩ শক অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। যাহা হউক, অনুরাগী ভক্ত এ বাধায় কি পশ্চাৎপদ হন? শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, “যতই কেন উৎপাৎ হউক না; আমি অবশ্যই যাইব।”

অদ্বৈত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “তোমার বিঘ্ন কে করিতে পারে! যাঁহার নামে সকল বিঘ্ন দূর হয়, সেই শ্রীহরি যখন তোমার হৃদয়ে, তখন কাহার সাধ্য তোমার গতিরোধ করে?”

শ্রীচৈতন্য আর কিছু না বলিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া একেবারে
াত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও
ব্রহ্মানন্দ, এই ছয় জন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত যাইতে প্রস্তুত ছিলেন।
ক্ষণে তাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে চারিজন
াত্র সঙ্গীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ,
দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত। অদ্বৈত কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে
াত্রীগণের অনুগমন করিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার হাত ধরিয়া অনুনয়
রিয়া কহিলেন, "দেখুন, আপনি ব্যাকুল হইলে সকল দিক্ নষ্ট হইবে।
কাথায় আপনি জননীকে প্রবোধ দিবেন ও ভক্তদিগের নেতা হইয়া
ক্ষা করিবেন; না আপনি শোকে বিহ্বল হইলেন। প্রতিনিবৃত্ত হউন,
ভক্তগোষ্ঠির ভার আপনার উপর।" এই বলিয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিয়া
গৌরচন্দ্র অদ্বৈতাচার্য্যকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সসঙ্গী গঙ্গার ধারে ধারে গমন
রিতে লাগিলেন।

এদিকে অদ্বৈতগৃহে মহা ক্রন্দনের রোল উঠিল। শচীদেবী বজ্রাহতের
ায় শায়িতা; ভক্তদল কাঁদিয়া ব্যাকুল। অদ্বৈত কিছুদিন তাঁহাদের
ান্ত্বনা ও শুশ্রূষা করিয়া স্ব স্ব গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

তুর্থ পরিচ্ছেদ।

নীলাচল পথে।

শ্রীচৈতন্য পথে আসিয়াই সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার সঙ্গে
আছে বল? বন্ধুগণ কাহাকেও কি পথের সম্বল দিয়াছেন?" সকলেই
ত্তর করিলেন, 'কাহারও সঙ্গে কিছু নাই। আপনার আদেশ ভিন্ন কাহারও
ধ্য নাই, কোন দ্রব্য আনিতে।' উত্তর, "বেশ করিয়াছ, বৈরাগীর
ঙ্গ কি কিছু রাখিত আছে? আহারের ভাবনা কি? ভগবান্ দিলে
ন বনেও আপনা হইতে আসিয়া উপনীত হয়; নির্ব্বান্ধব স্থানেও
স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া যায়। আর যদি তাঁহার ইচ্ছা না হয়; তবে নানা
ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিলেও এক মুষ্টি মিলে না; রাজপুত্র হইলেও

উপবাসে দিন যায়। মনে কর অন্ন ব্যঞ্জন সকলই প্রস্তুত, এমন সময়ে স্ত্রী পুত্রদিগের সহিত কলহ লাগিল; রাগ করিয়া গৃহস্থের সমস্ত দিন উপবাসে কাটিয়া গেল। অথবা ভোজনে বসিয়া হঠাৎ জ্বর আসিল, আর মুখের ভাতে ছাই পড়িল। তাই বলিতেছি, ভগবান্ না দিলে কেহ খাইতে পায় না, আর তিনি দিলে কেহই বঞ্চিত করিতে পারে না। দেখিতেছ না, সমস্ত সংসারে শ্রীকৃষ্ণ অন্নছত্র দিয়াছেন; কে কোথা হইতে আনিতেছে, কে কাহাকে দিতেছে, মনুষ্যের তো কথাই নাই; কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত অবাধে কতই খাইতেছে, কতই পাইতেছে। কেবলই 'দীয়তাং ভোজ্যতাং' বই আর নাই। এমন অন্নছত্র থাকিতে খাওয়া পরার চিন্তা কি? যাঁহারা খাওয়া পরার সকল চিন্তা চিন্তামণিকে অর্পণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সুখী। বন্ধুগণ! আমরাও যেন সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে পারি।" সমস্ত পথে এইরূপ তত্ত্ব কথা কহিতে কহিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যাত্রীদল সন্ধ্যাকালে আঠিসারা নামক গ্রামে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। সেই গ্রামে অনন্ত পণ্ডিত নামে একজন বিষ্ণু-ভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। যাত্রীদল তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সমস্ত রজনী হরিসঙ্কীর্ত্তন ও কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে যাপন করিলেন এবং প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া ভাগীরথীর কূলে কূলে গমন করিয়া যথাকালে ছত্রভোগ নামক গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। চৈতন্য-দেব যখন ছত্রভোগ দেখিয়াছিলেন, তখন সেখানে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সাগর সঙ্গমে গমন করিতেছিলেন; অম্বুলিঙ্গ নামে এক জলময় শিবলিঙ্গ ছিল, তাঁহার নামে অম্বুলিঙ্গ ঘাট সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অম্বুলিঙ্গ শিব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন।

ভগীরথ সগরবংশ উদ্ধারের জন্য অবনীতে গঙ্গা আনয়ন করিলে, শিব, গঙ্গার বিরহে আকুল হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন ও ছত্রভোগে আসিয়া জলময়ী গঙ্গা দর্শনে অনুরাগে বিহ্বল হইয়া আপনিও জলময় হইয়া গঙ্গাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়! এই আখ্যায়িকাটি পৌরাণিক হইলেও ইহার ভাবের মূলে একবার প্রবেশ করুন। জল-ময়ী গঙ্গা তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া শতমুখী হইয়া সাগর সঙ্গমে চলিয়াছে; জলোচ্ছ্বাসে দিঙ্মণ্ডল উচ্ছ্বসিত হইতেছে; ইহা দেখিলে কোন্ ভাবুকের হৃদয়োচ্ছ্বাস না জন্মে, নয়ন জলে সর্ব্বাঙ্গ জলময় হয় না? এই ভাব মূলে

রাখিয়াই মহাযোগী শিবের জলময়ত্ব। সে যাহা হউক, শ্রীচৈতন্ত অম্বুলিঙ্গ ঘাটে উপনীত হইয়া গঙ্গার শোভা দর্শন করিয়া অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন ও নৃত্য কীর্ত্তন হুঙ্কার করিতে করিতে সবান্ধবে জলাবগাহন করিলেন। একদিকে গঙ্গার শতমুখী ধারা, অপরদিকে গৌরের নয়ন দিয়া শতমুখীধারা, উভয়ধারা মিশ্রণে প্রেমানন্দের মহাতুফান উঠিয়া গেল। হরিনাম কীর্ত্তনে, আলাপনে, ধ্যানে, মহাভাবে, গৌরের জলাভিষেক স্বর্গীয় শ্রীধারণ করিল। জুডিয়ার বিজনবনে পবিত্র জর্দ্দন ধারায় এক দিন দেবনন্দনও এমনি করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। ভক্তের স্নানেও ভাবের জমাট। কে বুঝে এ ভক্তি লীলা?

জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার সবডিবিশনে মথুরাপুর নামে থানা আছে। ঐ থানার মধ্যে জয়নগর গ্রামের ৩ ক্রোশ দূরে খাড়ী নামে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ঐ খাড়ী গ্রামই প্রাচীন ছত্রভোগ। এক্ষণে তথায় গঙ্গা শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু অম্বুলিঙ্গ শিবমন্দির ও চক্রতীর্থ পুষ্করিণী আছে। প্রাচীন অম্বুলিঙ্গঘাট যে সেইখানে অবস্থিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত শিবগঙ্গার পৌরাণিক আখ্যায়িকা অনুসারে অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানে চৈত্রকৃষ্ণাদ্বাদশীতে এক মেলা হইয়া থাকে। এই স্থান একটী তীর্থমধ্যে পরিগণিত। কালের কি বিচিত্র গতি! যেখানে গঙ্গাসাগর সঙ্গম ছিল, ৪০০ বৎসর পরে সে স্থান শুষ্ক। সে যাহা হউক-স্নানান্তে গৌরচন্দ্র আর্দ্র বসনে তীরে উঠিয়া কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিকের তেজঃপুঞ্জভাব ও ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া আগন্তুক নরনারী চারিদিকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল; দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। এমন সময়ে দোলায় চড়িয়া এক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং যান হইতে অবতরণ করিয়া লোকের ভিঁড় ঠেলিয়া গৌরের নিকটবর্ত্তী হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসীর প্রেমোচ্ছ্বাস দেখিয়া ধনীর প্রাণ গলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে শ্রীচৈতন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' আগন্তুক উত্তর করিলেন, 'আমি আপনার দাস।' তখন পার্শ্বস্থ লোকে বলিয়া দিল 'তিনি দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী; নাম রামচন্দ্র খান।' গৌর বলিলেন, "আপনি এ দেশের রাজা; বেশ হয়েছে, আমরা কিরূপে নীলাচলে গমন করি, বলুন দেখি?" রামচন্দ্র খান বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, 'আপনার

আজ্ঞা আমার পালনীয়, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু বর্ত্তমান সময় বড় বিষম; উৎকল ও বঙ্গরাজ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছে; সে দেশে যাইবার আসিবার কেহ পথ পাইতেছে না। রাজাজ্ঞায় স্থানে স্থানে ত্রিশূল পোঁতা হইয়াছে, আগন্তুক দেখিলে প্রাণবধ করিতেছে। তাইতে ভাবিতেছি কোন্ দিক্ দিয়া আপনাদের গোপনে পাঠাইয়া দি। আবার আমিই এদেশের শান্তি রক্ষক, কোন স্থানে কিছু গোলযোগ বাধিলে যবনরাজ আমাকে রাখিবেন না; ধন, প্রাণ, ইজ্জত, সব যাইবে। তাহাতে মনে বড় ভয়ও হয়। সে যাহা হউক, কপালে যাহা থাকে হইবে, আমি আজ রাত্রিতে নিশ্চয়ই আপনাদের পাঠাইয়া দিব। কোন চিন্তা করিবেন না। এক্ষণে আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে লইয়া গিয়া রামচন্দ্র খান অতিথিদিগের সেবার আয়োজন করিয়া দিলেন। গৌরচন্দ্র নীলাচলচন্দ্র দেখিবার জন্য মহা উৎকণ্ঠিত, ভাল করিয়া ভোজন করিতে পারিলেন না। ভোজনান্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মৃদঙ্গ করতাল যোগে মুকুন্দ দত্ত যখন সুস্বরে হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন এক মহাভাবের তরঙ্গ উঠিয়া গেল। গৌরচন্দ্র নৃত্য জুড়িয়া দিলেন। ছত্রভোগবাসী দেখিয়া কৃতার্থ হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সংকীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে, রামচন্দ্র খান বলিলেন, "ঘাটে নৌকা প্রস্তুত, গমন করিলেই হয়।" তখন শ্রীচৈতন্য হরিনাম স্মরিয়া সশিষ্যে তরণী আরোহণ করিয়া উড়িষ্যা রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নৌকায় উঠিয়া সেই গভীর নিশীথে মুকুন্দদত্ত প্রভৃতি হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নির্ব্বোধ নাবিকগণ তাহা শুনিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে বলিতে লাগিল, "হায়! হায়! আজ বুঝি প্রাণ বাঁচিবে না। জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ, নৌকা ডুবিলে কিছুতেই রক্ষা নাই। বিশেষতঃ এদেশে জলদস্যুর ভয়ে নৌকা বাইচ করা মহাবিপদ জনক। যে পর্য্যন্ত উড়িয়ার দেশে না যাই, গোঁসাই মহাশয়েরা সে পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকুন।" তাহা শুনিয়া গায়কগণ নীরব হইলেন। তখন গৌরচন্দ্র হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি? বৈষ্ণবের আবার ভয়? কাহাকে ভয় করিব? তোমরা কি দেখিতেছ না সম্মুখে সুদর্শন চক্র আমাদের রক্ষার জন্য নিয়ত ঘুরিতেছে। কাহার সাধ্য আমাদের অনিষ্ট করে? ভাই সব! বিশ্বাসচক্ষু উন্মীলন কর, ভয় ভাবনা ছাড়, নাম সঙ্কীর্ত্তন ছাড়িও না।" তখন ভক্তগণ

আশ্বস্ত হইলেন। নৈশগগনে আবার সঙ্কীর্ত্তনের মধুর নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সুদর্শন লাভ না হইলে সুদর্শনের লীলা দর্শন করা অসম্ভব, সঙ্গীগণ তাই নাবিকের ভয়সূচক বাক্যে ভীত হইয়াছিলেন।

সমস্ত পথ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে অহিবাহিত করিয়া ভক্তদল অবশেষে উৎকল রাজ্যের প্রয়াগঘাট নামক স্থানে আসিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। গৌরচন্দ্র উড্রদেশকে নমস্কার করিয়া গঙ্গাঘাট নামক ঘাটে স্নান করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরস্থাপিত মহাদেব দর্শন করিয়া তটপন্থায় গমন করিতে লাগিলেন। প্রয়াগ ঘাট কোন্ স্থানে অবস্থিত, জানি না। অনুমান করি, হিজলীকাঁথি প্রদেশের স্থানবিশেষ হইবে। মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্য সঙ্গীদিগকে বলিলেন, 'তোমরা এই স্থানে বিশ্রাম কর, আমি ভিক্ষায় চলিলাম।' এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে যাইয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থী হইলেন। তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী দেখিয়া সকলেই সন্তোষের সহিত তণ্ডুল ও অন্যান্য উত্তম খাদ্য প্রদান করিল। সঙ্গীদিগের আহারের উপযুক্ত পরিমাণ সংগ্রহ হইলেই গৌরচন্দ্র প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বন্ধুদিগের নিকটে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ ভিক্ষাদ্রব্য দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন 'হাঁ! বোধ হচ্ছে আমাদের পুষিতে পারিবে।' জগদানন্দ এক বৃক্ষমূলে পাক করিলে গৌরচন্দ্র সবান্ধবে মহানন্দে ভোজন করিলেন ও হরিনামানন্দে সেই বৃক্ষমূলে যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথের মধ্যে এক দান ঘাট; দান না পাইলে দানী নদী পার করে না। সন্ন্যাসী দেখিয়া দানী বলিল, "আপনার সঙ্গে কয়জন লোক?' গৌরচন্দ্র, তখন মহাভাবে নিমগ্ন; উত্তর করিলেন, "জগতে আমার কেহ নাই, আমিও কাহারও নই। আমি এক, দুই নই; কিন্তু সকলই আমার।" বলিতে বলিতে গৌরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দানী বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'গোঁসাই! আপনি নৌকায় উঠুন, এ সকল লোকের কড়ি না পাইলে পার করিব না।'' গৌরচন্দ্র নিমগ্ন চিত্তে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নৌকায় উঠিয়া পরপারে যাইয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। দানী এই স্বর্গীয় ছবি দেখিয়া প্রথম পারে প্রত্যাগমন করিয়া নিত্যানন্দাদিকে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কে? কাহার লোক? আর ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরই বা কে? আমাকে ভাঙ্গিয়া বলুন"।

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, "উনি জগদ্বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর; আমরা উঁহার কিঙ্কর।"

দানী। তবে উনি আপনাদের অস্বীকার করিলেন কেন?

নিতাই। তাঁর লীলা কে বুঝিবে? তখন দানী তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিয়া ব্যাকুল প্রাণে গৌরের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল ও অপরাধ ক্ষমা চাহিলে শ্রীচৈতন্য দানীকে কৃপা করিয়া চলিতে লাগিলেন। এবং কতকদূরে সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া নদীজলে অবগাহন করিলেন ও অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিলেন। নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ পাছে পড়িয়া রহিলেন। কতকদূরে যাইয়া গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জন্য এক বৃক্ষমূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে জগদানন্দ নিত্যানন্দকে এক স্থানে বসিতে বলিয়া ভিক্ষান্বেষণে গ্রামে চলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দণ্ড গাছটী জগদানন্দ বহন করিয়া আসিতেছিলেন। ভিক্ষায় যাইবার সময়ে জগদানন্দ তাহা নিত্যানন্দের কাছে রাখিয়া গেলেন। নিতাই দণ্ড পাইয়া বসিয়া চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং দণ্ডকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওহে দণ্ড! আমি যাঁহাকে সদা হৃদয়ে বহিয়া বেড়াইতেছি, তিনি যে তোমাকে বহিবেন, এতো ভাল নয়।" এই বলিয়া বিরক্তি সহকারে নিতাই দণ্ডখানি তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া হাসিতে লাগিলেন। জগদানন্দ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভগ্ন দণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি এ! প্রভুর দণ্ড কে ভাঙ্গিল?" নিতাই উত্তর করিলেন, "যাঁহার দণ্ড, তিনিই ভাঙ্গিয়াছেন; আর কাহার সাধ্য তাহা ভাঙ্গিবে?" জগদানন্দ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভাঙ্গা দণ্ড তিনখানি কুড়াইয়া লইয়া কিছু বিষণ্ণ অন্তরে যেখানে গৌর তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেইখানে তাঁহার অগ্রে খণ্ডগুলিকে ফেলিয়া দিলেন। গৌর বলিলেন, "আমার দণ্ড ভাঙ্গিল কে? তোমরা পথে কি কাহারও সহিত কলহ করিয়াছ?" জগদানন্দ উত্তর করিল, "নিত্যানন্দ বিহ্বল চিত্তে এই কুকার্য্য করিয়াছেন।" গৌর একটু ক্রুদ্ধভাবে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য তুমি আমার দণ্ড ভাঙ্গিলে?" নিতাই বলিলেন, "হাঁ! একখান বাঁশ ভাঙ্গিয়াছি; যদি ক্ষমা করিতে না পার, যে শাস্তি উচিত মনে কর, দাও"। গৌর বলিলেন, "যাহাতে সর্ব্বদেব অধিষ্ঠিত, তাহা তোমার মতে বাঁশ হ'লো; আচ্ছা হ'লো, হ'লো; আমার একমাত্র সঙ্গী দণ্ড

খানি ছিল, তাহা যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন আমার আর কেহ সঙ্গী নাই; হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমাকে যাইতে দাও"। মুকুন্দ গতিক বুঝিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমিই তবে আগে যাও, আমরা পাছে যাচ্ছি।' 'ভাল তাহাই হউক,' বলিয়া গৌরচন্দ্র আগে আগে ছুটিয়া চলিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন দণ্ড ভঙ্গ লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য কেহই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু আগা গোড়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই মনে হয় যে, লৌকিক সন্ন্যাসের আড়ম্বরে ধর্ম্ম হয় না, তাহাই প্রতিপাদন করা গৌর ও নিতায়ের মনের উদ্দেশ্য ছিল। নিত্যানন্দের উপর যে গৌরের কোপ, সে কৃত্রিম ক্রোধ মাত্র।

চৈতন্যচন্দ্র একাকী পদব্রজে যখন জলেশ্বর নামক গ্রামে উপনীত হইলেন তখন দেবস্থানে জলেশ্বর মহাদেবের মহা ধূমধামে পূজা হইতেছিল। বহুবিধ বাদ্য কোলাহল শুনিয়া তিনি মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন, এবং পূজার ব্যাপার দেখিয়া বাদ্যের তালে তালে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ জলেশ্বরে আসিয়া দেখিলেন যে, গৌরাঙ্গ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহানৃত্যে বিভোর। মুকুন্দ কীর্ত্তন গাইত আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া গৌরের নৃত্য দ্বিগুণ মাত্রায় চড়িয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে ভাবাবেগ শমিত হইলে গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগকে প্রিয় সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের উপর ক্রোধ করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। নিতাইকে বলিলেন, "কোথায় তুমি আমাকে ধৈর্য্য শিক্ষা দিবে ও আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম যাহাতে বজায় থাকে তাহা করিবে, না আরও আমাকে পাগল করিয়া তুলো। নিতাই! আর যদি তেমন কর, তবে আমার মাথা খাও।" সে রাত্রি জলেশ্বরে অবস্থিতি করিয়া যাত্রীদল প্রাতে পথ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমানে জলেশ্বর গ্রাম অতিবাহিত করিয়া সুবর্ণরেখা পার হইতে হয়; কিন্তু চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রাম সুবর্ণ রেখার অপর পারে থাকা, এই বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে।

পথমধ্যে বাঁশদহ গ্রামে এক মদ্যপায়ী শাক্তকে কৃপা করিয়া গৌরচন্দ্র রেমুণা নগরে আসিয়া ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। জলেশ্বরের ৫ মাইল পশ্চিমে রেমুণা অবস্থিত। এখানে গোপীনাথ বিগ্রহের মহিমায় ফাল্গুনমাসে এক মেলা বসিয়া থাকে। পূর্ব্বে মাধবেন্দ্রপুরী

গোবৰ্দ্ধনে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার আদেশে নীলাচলে মলয়জ চন্দন আনিতে যাইতেছিলেন; পথমধ্যে রেমুণায় আসিয়া গোপীনাথের অমৃতকেলি নামক ক্ষীরপ্রসাদ দেখিয়া, তাহা নিজে আস্বাদ করিয়া গোপালকে ভোগ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অযাচিতবৃত্তি, কেহ স্নেহ করিয়া খাইতে দিলে ভোজন করিতেন, নতুবা উপবাসী থাকিতেন। ক্ষীর প্রসাদ খাইবার বাসনা জাগ্রত হওয়ায় পুরী মনে মনে লজ্জিত হইলেন এবং বিষ্ণু স্মরণ করিয়া অন্যত্র যাইয়া রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। এ দিকে গোপীনাথ পূজারীকে স্বপ্ন যোগে বলিলেন যে বার খানি ক্ষীরের মধ্যে তিনি এক খানি পুরীকে খাওয়াইবেন বলিয়া ধড়ার অঞ্চলে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা লইয়া গিয়া পুরীকে দেওয়া হউক। পূজারী সেই নিশীথ সময়ে বাজারে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কাহার নাম মাধবেন্দ্র পুরী? তোমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, আসিয়া ভোজন কর।" সেই হইতে গোপীনাথের নাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হইল। মাধবপুরীর এই প্রেম-কাহিনী পূর্ব্বে গৌরচন্দ্র স্বীয়াভীষ্টদেব ঈশ্বর পুরীর নিকট শুনিয়াছিলেন; সঙ্গীগণকে তাহাই বিস্তৃত আকারে বলিয়া প্রেমে গদ গদ হইলেন। এবং পূজারী প্রদত্ত ক্ষীরপ্রসাদ ভোজন করিয়া উষাকালে গন্তব্য পথে যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে যাত্রীদল যাজপুরে বিরজাক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইল। এখানে বৈতরণী নদী প্রবাহিত এবং অসংখ্য দেবালয় অবস্থিত। কিছু দূরে নাভিগয়া ও বিরজামন্দির। একে যাজপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর, তাহাতে আবার অসংখ্য দেবালয়ে দেবার্চ্চনার সময় যুগপৎ শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশর শব্দে দিঙ্মণ্ডল আন্দোলিত হইলে আপনা হইতেই প্রাণে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগকে লইয়া প্রথমে দশাশ্বমেধঘাটে স্নানাবগাহন করিয়া আদি-বরাহমন্দিরে যাইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। যাজপুরের দৃশ্যে গৌর-চন্দ্র বড়ই আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন এবং নির্জ্জন বিহারের জন্য ব্যাকুল হইয়া সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীগণ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন বিষণ্ণ চিত্তে এক বৃক্ষতলে রজনী যাপন করিলেন। এদিকে শ্রীচৈতন্য যাজপুরের দ্রষ্টব্য সকল স্থান দেখিয়া এক নির্জ্জন স্থানে যাইয়া ধ্যান সমাধিতে সমস্ত

রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বন্ধুদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন সকলে আনন্দে হরিধ্বনি দিয়া রাজপথে বাহির হইলেন এবং যথা সময়ে কটক নগরে পুণ্যসলিলা মহানদীতে স্নান করিয়া সাক্ষী গোপাল মন্দিরে আগমন করিলেন। এইখানে মহাপ্রভু নিত্যানন্দমুখে সাক্ষী গোপালের বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রেমে গদ গদ হইয়াছিলেন।*

এখান হইতে যাত্রীদল ভুবনেশ্বরতীর্থে গমন করিলেন। ভুবনেশ্বর শিবধাম ও মহাতীর্থ; পুরীর ১০।১২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ভুবনেশ্বরের মন্দির এক আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্যের স্থল। কোটি শিবমন্দির দ্বারা উহা সুবেষ্টিত।

কথিত আছে, কেশরী বংশের সুবিখ্যাত রাজা যযাতি কেশরী ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন; আর ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রপৌত্র রাজা ললাটেন্দু কেশরীর সময়ে ইহা সম্পূর্ণ হয়। ক্রমাগত ১৫৭ বৎসর ধরিয়া এই বিশাল দেবমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিয়াছিল। ভুবনেশ্বরে বিন্দু সরোবর নামে পূত সলিলা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে। কথিত আছে, ভগবান্ মহেশ্বর সর্ব্বতীর্থের জল বিন্দু বিন্দু আনিয়া এই সরোবর সৃজন করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর গুপ্ত বারাণসী। স্কন্দ পুরাণে ভুবনেশ্বর উৎপত্তি

---

* নিত্যানন্দ পূর্ব্বে তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া এই বৃত্তান্ত লোকমুখে শুনিয়া গিয়াছিলেন; াজ সুযোগ পাইয়া তাহাই শ্রীচৈতন্যের নিকট বিবৃত করিলেন।

বিদ্যানগরের দুইটী ব্রাহ্মণ তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়া কোন সময়ে বৃন্দাবনে উপনীত ইয়াছিলেন। ইঁহাদের একজন বয়োবৃদ্ধ ও সৎকুলীন; অপর জন যুবক এবং জাত্যংশে ন। যুবকের সেবায় তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোবিন্দ দেবালয়ে গোপাল বিগ্রহের সম্মুখে হাকে স্বীয় কন্যাদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু দেশে প্রত্যাগত হইলে স্বজন-গের প্রেরণায় ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা পালনে অসম্মত হইলেন এবং কবে কি বলিয়াছেন, স্মরণ নাই লিয়া যুবকের কথা উড়াইয়া দিলেন। তাহাতে সেই যুবা বৃন্দাবনে যাইয়া গোপাল গ্রহকে প্রসন্ন করিয়া সঙ্গে আনিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে সাক্ষী দেওয়াইলে বৃদ্ধ বিপ্র তাঁহাকে া দান করিলেন। তদবধি দেবতার নাম সাক্ষী গোপাল হইল ও বিদ্যানগরে তাঁহার া প্রতিষ্ঠিত হইল। পরবর্ত্তী সময়ে উৎকলরাজ পুরুষোত্তম দেব ঐ দেশ জয় করিয়া পালকে কটকে আনিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া রাজসেবার বন্দোবস্ত রয়া দিলেন। তাঁহার মহিষীকে গোপাল স্বপ্নে বহুমূল্য মুক্তা নোলক চাহিয়া লইয়া নাসাতে য়াছিলেন। এক্ষণে গোপালের মন্দির কটক হইতে প্রায় দিনমানের পথ ব্যবধানে পুরী াবার পথে অবস্থিত।

বিষয়ে লিখিত আছে যে কাশীরাজ নামে বারাণসীর রাজা কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার ইচ্ছা করিয়া তপস্তায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তল্লব্ধ বরে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে সমর যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমরে আপনি নিহত হইলেন, ও তাঁহার রাজধানী বারাণসীও ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র মহাবিক্রমে শিবের দিকে ধাবিত হইলে মহাদেব ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন ও অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় বাসস্থান বারাণসী নগরী ভস্মীভূত হওয়ায় বাস করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র স্থান ভিক্ষা করিলেন। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ সদয় হইয়া শ্রীক্ষেত্রের উত্তরে একাম্র নামক বনভূমিতে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই স্থানই উত্তর কালে ভুবনেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইল। এই আখ্যায়িকার মূলে কি সত্য আছে, জানি না; কিন্তু ইহা যে শৈব ধর্ম্মের উপর বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয় কালে রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভুবনেশ্বরের অন্নপ্রসাদ শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদের ন্যায় জাতি নির্ব্বিশেষে স্পর্শ ও ভোজন করিতে পারে; কিন্তু অন্যত্র লইয়া যাইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য ভুবনেশ্বর দর্শনে মহা সুখী হইলেন এবং বিন্দু সরোবরে অবগাহন করিয়া শিবভাবে বিভোর হইয়া কতই নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। সঙ্গীগণসঙ্গে প্রত্যেক শিবমন্দির পরিক্রমা করিয়া মহোল্লাসে নাচিতে নাচিতে তিনি কপিলেশ্বর শিবস্থানে উপনীত হইলেন। ভুবনেশ্বরের পূর্ব্ব দক্ষিণকোণে কিঞ্চিৎ ন্যূন এক মাইল ব্যবধানে কপিলেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এ মন্দির ভুবনেশ্বরের ন্যায় জমকাল না হইলেও, একটী বিখ্যাত তীর্থ।

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে কপিলেশ্বরকে কপোতেশ্বর নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কেন এইরূপ নামান্তর কথিত হইল, বলিতে পারা যায় না। কিন্তু উভয় নামই যে একস্থান নির্দ্দেশক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কপিলেশ্বর হইতে গৌরচন্দ্র কমলপুরে আসিয়া ভার্গবী নদীতে স্নান করিলেন। মহানদী হইতে কৈয়াকই নামে যে শাখা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাই আবার কিছু দূরে আসিয়া দয়া ও ভার্গবী নামে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। চৈতন্য চরিতামৃতের মতে কপিলেশ্বরের শিবদর্শনে অনুপস্থিতি সময়ে কমলপুরে নিত্যানন্দ দণ্ড ভঙ্গ করিয়া ভগ্ন খণ্ড ত্রয় ভার্গবীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। কমলপুর হইতে জগন্নাথের দেউল ধ্বজা দৃষ্টিগোচর হইয়া

থাকে। শ্রীচৈতন্য ধ্বজা দর্শনে অস্থির ও বিহ্বল হইয়া পশ্চাদুদ্ধৃত অর্দ্ধ-শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে পাগলের ন্যায় ছুটিতে লাগিলেন।

'প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দঃ।
মামালোক্য সস্মিতবদনো বালগোপাল মূর্ত্তিঃ॥'

অর্থ—প্রাসাদের অগ্রমূলে ভগবান্ বালগোপাল মূর্ত্তিতে আমাকে দেখিয়া কতই হাসিতেছেন।

গৌরের হৃদয় ভাবময়। মন্দির ধ্বজা দেখিয়া কত ভাবতরঙ্গই তাঁহার প্রাণে উঠিতে লাগিল? এইরূপে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া হাসিতে, কাঁদিতে, আছাড় খাইতে খাইতে তিনি চারি দণ্ডের পথ তিন প্রহরে অতি-বাহিত করিয়া আঠার নালায় আসিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। চরিতামৃতের মতে এই স্থানে আসিয়া নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড চাহিলেন। উহা তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন শুনিয়া পূর্ব্বের বর্ণনানুসারে নিত্যানন্দাদির সহিত কলহ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া একাকী জগন্নাথ দর্শনে অগ্রগামী হইয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য ভাগবতকার বলেন যে, আঠার নালায় আসিয়া শ্রীচৈতন্য বন্ধুদিগকে বলিলেন, "প্রিয় সুহৃদ্গণ! তোমরা আমাকে নীলাচলে আনিয়া জগন্নাথ দর্শন করাইয়া প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিলে। এক্ষণে নিবেদন, আমি একাকী যাইয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিব; হয় তামরা অগ্রগামী হও, না হয় আমাকে আগে যাইতে দাও।" মুকুন্দ বলিলেন তুমি অগ্রগামী হও, আমরা প্রাতঃকৃত্য সারিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইব।" তাহা শুনিয়া চৈতন্য গোঁসাই মহানন্দে একাকী অগ্রবর্ত্তী হইলেন এবং অচিরে জগন্নাথ মন্দিরে আসিয়া জগমোহনে দাঁড়াইয়া নীলাচলনাথকে দেখিলেন। তাঁহার প্রাণে কতই প্রেম, কতই ভাব, কতই উচ্ছ্বাস হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। সেই সময়ে উৎকলরাজের সভাপণ্ডিত সার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্যও জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। প্রথমে তিনি নবাগত সন্ন্যাসীর দিকে বড় একটা লক্ষ্য করেন নাই। দর্শন করিতে করিতে গৌরের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল; তিনি আত্মসংযম করিতে পারিলেন না। প্রেমাবেগের সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ বিগ্রহকে কোলে করিবার জন্য তাঁহার মনে দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছার উদ্রেক হইলে তিনি মন্দিরের মধ্যে যাইতে উদ্যত হইয়া এক উল্লম্ফন প্রদান করিলেন। পরিহারি-গণ ছড়ি হাতে তাঁহাকে মারিবার জন্য চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিল,

তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে পড়িয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইহা দেখিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য সমাগত হইয়া 'হাঁ! হাঁ!' করিয়া পড়িলেন, ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া পরিহারিগণ প্রহারে ক্ষান্ত হইল। সার্ব্বভৌম অপরূপ মূরতি সন্ন্যাসী দেখিয়া, তাঁহার যৌবনের সৌন্দর্য্য ও ভাবের প্রগাঢ়তা দেখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন ইনি কোন মহাপুরুষ হইবেন। তখন তিনি নানা প্রকারে আগন্তুকের চৈতন্য সম্পাদনার্থে যত্ন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ও ভোগের সময় উপস্থিত দেখিয়া, পরিহারিদিগের দ্বারা মূর্চ্ছিত গৌরচন্দ্রকে হাতাহাতি করিয়া বহাইয়া স্বভবনে আনাইলেন এবং এক নিভৃত কক্ষে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। গৌরের মূর্চ্ছার ভাবগতিক দেখিয়া ভট্টাচার্য্য একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন; কিন্তু যখন নাসিকার নিকট তুলা ধরিয়া দেখিলেন যে তুলা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, তখন ভয়ের কারণ নাই, জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সার্ব্বভৌমোদ্ধার।

নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্য অচৈতন্যাবস্থায় সার্ব্বভৌমভবনে নীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়া লোকমুখে ঐ বৃত্তান্তের কথক কথক আভাস যাহা শুনিতে পাইলেন, তাহাতে আর বুঝিতে বাকী থাকিল না যে, মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই লোকে ঐসব কথা বলিতেছিল। তাঁহারা সার্ব্বভৌমের বাড়ীর উদ্দেশে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে মুকুন্দদত্ত সেই পথে গোপীনাথ আচার্য্যকে আসিতে দেখিতে পাইলেন। গোপীনাথ নবদ্বীপের বিশারদের জামাতা ও সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। ইনি মহাপ্রভুর এক জন ভক্ত ও তত্ত্বজ্ঞ; মুকুন্দের সহিত পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। মুকুন্দকে দেখিতে পাইয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "বা! তুমি এখানে কবে এলে? প্রভু কোথায়"? মুকুন্দ উত্তর করিলেন, "প্রভু সন্ন্যাস করিয়া আমাদের লইয়া নীলাচলে আসিয়াছেন এবং আমাদের পাছে ফেলিয়া একাকী জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছিলেন। লোকমুখে শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তিনি

জগন্নাথ দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া গিয়াছেন। এখন অন্য কথা কহিবার অবসর নাই, শীঘ্র তুমি আমাদের ভট্টাচার্য্যের বাড়ী দেখাইয়া দাও।" গোপীনাথ তাঁহাদিগকে লইয়া সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে চলিলেন, যাইতে যাইতে পথে মুকুন্দ, নিত্যানন্দাদির সহিত গোপীনাথের পরিচয় করিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌমভবনে মহাপ্রভুকে অজ্ঞানাবস্থায় শয়ান দেখিয়া সকলে দুঃখিত হইলেন। সার্ব্বভৌম আগন্তুকদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় পুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া জগন্নাথ দর্শনে পাঠাইলেন। দর্শনান্তর সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মুকুন্দ মহাপ্রভুর কর্ণমূলে সুস্বরে হরিসংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিন প্রহরকাল পরে গৌরসিংহ হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তখন বেলাবসান হইয়াছে। সকলে মহানন্দে সমুদ্রস্নান করিয়া আসিলে সার্ব্বভৌম মহাপ্রসাদ আনাইয়া সকলকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন। খাইতে খাইতে গৌরচন্দ্র আনন্দোল্লাসে বলিতে লাগিলেন, আমাকে অনেক করিয়া লাফরা তরকারী দিয়া, আর সকলকে তুমি যথেষ্ট পিঠাপানা ও ছানাবড়াদি দাও।' সার্ব্বভৌম সে কথা না শুনিয়া তাঁহাকে সকল প্রকার প্রসাদ অতি যত্নের সহিত ভোজন করাইলেন। ভোজনের সময়ে অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। গৌর, নিতাইকে বলিলেন, 'তোমাদের ছাড়িয়া আসিয়া আমি জগন্নাথ দর্শন করিলাম; জগন্নাথ দেখিয়া আমার মনে ইচ্ছা হইল, ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে রাখি; এই ভাবিয়া ধরিতে গিয়াছিলাম। তাহার পর কি হইয়াছে, জানি না।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেখানে ছিলেন; তোমাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় তুলিয়া এখানে আনিয়াছিলেন; তাই তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে।" সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'আর আপনি একাকী দর্শনে যাইবেন না। গোপীনাথ! তুমি ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ দর্শন করাইয়া আনিও।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জগন্নাথ দর্শনে আমি মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইব না; বাহিরে গরুড় স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিব।" আচমনান্তে গৌরকে বিশ্রামস্থানে উপবিষ্ট করাইয়া সার্ব্বভৌম গোপীনাথের সহিত নিকটে বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। "গোঁসায়ের পূর্ব্বাশ্রম কোথায়?" সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন।

গোপীনাথ উত্তর করিলেন, "নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের ইনি কনিষ্ঠ পুত্র ও, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র; নাম বিশ্বম্ভর।" ভট্টাচার্য্য গৌরকে বলিলেন, "নীলাম্বর আমার পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী। জগন্নাথও তাঁহার ছাত্র ছিলেন। সে সম্বন্ধে আপনি আমার গৌরবের পাত্র। বিশেষতঃ যখন আপনি সন্ন্যাস লইয়াছেন, তখন বিশেষ পূজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।" শ্রীচৈতন্য বিষ্ণু স্মরণ করিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে এরূপ বলিবেন না; আপনি জগদ্গুরু, বেদান্তাধ্যাপক, পূজনীয় ব্যক্তি। আমি বালক সন্ন্যাসী, সদসৎ জ্ঞান হীন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনার নিকট আমার কত শিখিবার আছে। আজ হইতে আমি আপনাকে গুরুস্থানে বরণ করিলাম; আমাকে শিষ্যজ্ঞানে উপদেশ দিবেন।"

সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি?

গৌর উত্তর করিলেন, 'বাহিরের উদ্দেশ্য জগন্নাথ দর্শন। কিন্তু জগন্নাথ তো আর আমার সঙ্গে কথা কহিবেন না। আমার আসিবার মূল উদ্দেশ্য, আপনি এখানে আছেন বলিয়া। আপনাতে ভগবানের শক্তি পূর্ণরূপে অবস্থিত। আমি আপনার সংসর্গে থাকিয়া উপকৃত হইব বলিয়া এখানে আসিয়াছি। কিরূপ আচরণ করিলে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম বজায় থাকিবে; আর সংসার মায়ায় না পড়িতে হয়; কি খাইব, কি অধ্যয়ন করিব; এই সব বিষয় আমাকে শিক্ষা দিতে হইবে।'

সার্ব্বভৌম গৌরের মধুর সম্ভাষণে মুগ্ধ হইয়া অধিক আত্মীয়তা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার বয়ঃ কনিষ্ঠ, তোমাকে 'তুমি' সম্বোধন করিতে পারি। কিন্তু তথাচ তুমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, গৃহীদিগের বন্দনীয়। ভয় হয় এরূপ করিলে পাছে আমাকে অপরাধী হইতে হইবে।"

গৌর বলিলেন, তা' তো পারিবেনই। তাহা না করিলে মনে করিব আপনি আমাকে ভাল বাসিতেছেন না।

সার্ব্বভৌম। তোমার সকলই মিষ্ট লাগিতেছে। তোমাতে আজ যে ভক্তির উদয় দেখিলাম, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোমাতে ভগবানের বিশেষ কৃপা অবতীর্ণ হইয়াছে। অচিরে যে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি পরম সুবুদ্ধি হইয়া একটী অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ বলিয়া মনে হয়।

চৈতন্য। কি বিষয়? নিঃসঙ্কোচ চিত্তে বলুন।

সার্ব্বভৌম। সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে কেন? বিবেচনা করিয়া দেখ, মাথা মুড়াইয়া, স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলে কি লাভ? লাভের মধ্যে আর কিছু হউক আর না হউক, প্রথমেই অহঙ্কারটা বিলক্ষণ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী কাহারও নিকট মাথা হেঁট করে না, অথচ মহাসম্মানিত ভক্তগণেরও প্রণাম লইতে ভয় করে না। যদি বল মাধবেন্দ্রাদির ন্যায় মহা মহা ভক্তগণও তো সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তাঁহারা তো কই অহংকৃত হন নাই। তাহার উত্তর এই যে, তাঁহারা গ্রাম্যরস ভোগ করিয়া ও ঔদ্ধত্যকে বিনাশ করিয়া জীবনের শেষ ভাগে সন্ন্যাসাশ্রমে আসিয়াছিলেন। তোমার নবীন যৌবন; এ বয়সে তো সন্ন্যাসী হওয়া উচিত নয়।

শ্রীচৈতন্য বিনীত ভাবে বলিলেন, 'মহাশয়! আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিবেন না; বাস্তবিক আমি সেরূপ কোন অভিপ্রায় লইয়া সন্ন্যাসী হই নাই। কৃষ্ণের বিরহে অস্থির হইয়া শিখা সূত্র ফেলিয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়াছি। অহঙ্কার বিনাশের জন্যই আমার শিখা সূত্র ত্যাগ। এখন আপনার নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে, যাহাতে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম বজায় থাকে, সেরূপ উপদেশ দিবেন।'

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আমাদের বাড়ীতে প্রত্যহ বেদান্ত পাঠ হইয়া থাকে, তুমি তাহা শুনিবে। সন্ন্যাসীর বেদান্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। আর আমার বাড়ীতে তোমাদের থাকিবার বড় সুবিধা হইবে না; আমার মাতৃস্বসার বাড়ী খুব নির্জ্জন স্থান; সেই খানে তোমাদের বাসা করিয়া দিব।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য গোপীনাথকে গৌরের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাজ্ঞানী পণ্ডিত, কিন্তু ভক্তি রাজ্যের কিছুই জানিতেন না; তাই গৌরের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া বাৎসল্য ভাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য এত উপদেশ দিলেন। গোপীনাথ নিগূঢ়তত্ত্ব জানিতেন। তিনি কিছু না বলিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন এবং ভট্টাচার্য্যের মাসীর বাড়ীতে গৌরের বাসস্থানাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া কালের গতি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত জগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে আসিয়া দেখিলেন, ভট্টাচার্য্য বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন; তাঁহার ছাত্রবৃন্দ

মণ্ডলাকারে বসিয়া মনোযোগের সহিত শুনিতেছে। শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন, "ভাল হইয়াছে, তুমি আসিয়াছ। সন্ন্যাসীর পক্ষে বেদান্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, তুমি সাবহিতে বেদান্ত শ্রবণ কর। আর প্রতি দিন এই সময়ে পারায়ণ হইয়া থাকে; আমার অনুরোধ, তুমি প্রত্যহ আসিবে।" শ্রীচৈতন্য অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন "আপনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেছেন, তাহাতে আপনি যাহা বলিবেন, আমার পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া মনোযোগ সহকারে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল; চৈতন্যদেব প্রত্যহ নীরবে বেদান্ত শুনিলেন, অথচ ভাল মন্দ কিছুই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। অষ্টম দিনে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাত দিন পর্য্যন্ত বেদান্ত শুনিলে, কই কিছুই তো জিজ্ঞাসা করিলে না? কিছু বুঝিতে পারিতেছ কি না, জানিতে পারিলাম না।"

গৌর উত্তর করিলেন, 'আপনার আজ্ঞায় সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া শুনিতেছি। আমার বেদান্ত অধ্যয়ন নাই; সুতরাং আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছি না।'

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "যে বুঝিতে পারে না, তাহার তো জিজ্ঞাসা করা উচিত। তুমি সাত দিন পর্য্যন্ত শুনিলে, অথচ কোন প্রশ্নই করিলে না! কি জানি তোমার মনে কি আছে?"

গৌর এবারে লৌকিক বিনয় ছাড়িয়া কহিলেন, "ব্যাসসূত্রের অর্থ অতি পরিস্কার বুঝা যাইতেছে; কিন্তু আপনার ব্যাখ্যায় সে অর্থ প্রকাশ পায় না। সূত্রের অর্থ সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশের জন্য ভাষ্যের প্রয়োজন; যদি সেই ভাষ্যে সূত্রার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে ভাষ্যের প্রয়োজন কি! আপনার ভাষ্যে মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছে।"

সার্ব্বভৌম অতীব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে!" গৌর বলিতে লাগিলেন, "বেদান্তের উদ্দেশ্য ব্রহ্ম নিরূপণ করা। সেই ব্রহ্ম অতি বৃহদ্বস্তু। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জীবের জ্ঞানাতীত। তবে সৃষ্টিরাজ্যে তিনি যত টুকু আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন; আমরা তাঁহার কৃপায় তাহারই অত্যল্প মাত্র বুঝিতে পারি। কিন্তু যে অনন্ত শক্তি, শুদ্ধ মুক্ত অনাবৃত অবস্থায় সৃষ্ট্যতীত হইয়া আছে, তাহার নাম নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার ব্রহ্ম। তাঁহার আমরা কি বুঝি?" সার্ব্বভৌম

বাধা দিয়া বলিলেন, "সৃষ্টি তো মিথ্যা; অবিদ্যা বা মায়া বিজৃম্ভিত। মায়া ছুটিয়া গেলে জীব ও ব্রহ্ম একই। তিনি ভিন্ন কি জগতে আর কিছু আছে?"

গৌর। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই সত্য; কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছায় এই সৃষ্টি লীলা; এই হৃদয়নিহিত আত্মজ্ঞান। কে বলিল, সৃষ্টি মিথ্যা বা কল্পিত জ্ঞান মূলক? সৃষ্টি কল্পনা নহে; তবে নশ্বর মাত্র।

সার্ব্বভৌম। তিনি ভিন্ন যদি জগতে আর কিছু নাই, তবে বল দেখি সৃষ্টিজ্ঞান কল্পিত হয় কি না?

গৌর। কা'র কল্পনা? সকল কল্পনার অতীত যিনি, তাঁহাকে কি মিথ্যা জ্ঞানের আকর ভূমি বলিবেন?

সা। কখনই নয়।

গৌর। তাহা যদি না হয়, তবে একটু চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি, এই কল্পনা জ্ঞান যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি না? আমরা তাহাকেই জীব বলি। এবং এই জীব সৃষ্টি রাজ্যে ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ।

সার্ব্বভৌম বিচক্ষণ পণ্ডিত। গৌরের এই সুযুক্তি পূর্ণ কথায় জীবতত্ত্ব যে ঈশ্বর তত্ত্বের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্নাত্মক, তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই না হয় হইল; কিন্তু তাহাতেও তো প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। তুমি যাহাকে সৃষ্টিলীলা বলিতেছ; কে বলিল, তাহা সত্য?"

গৌর। আত্মজ্ঞানই তাহার সাক্ষী। নানা বৈচিত্র্য পূর্ণ, এই ব্রহ্ম-লীলা আত্মতত্ত্বেই নিহিত। ব্রহ্ম আপনিই লীলারূপে বাহিরে, আত্মারূপে অন্তরে এবং ব্রহ্মরূপে সকলের মূলে। একের মধ্যে কি সুন্দর বৈচিত্র্যময় দ্বৈতভাব ও দ্বৈতের মধ্যে কি অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জসীভূত একত্ব! বলুন দেখি, ইহাতে কা'র না প্রাণ মন গলিয়া যায়? এ হেন ঐশ্বর্য্যময়, পরিপূর্ণ ভগবান্‌কে আপনি কোন্ সাহসে শুষ্ক নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিতে চান্?

সার্ব্বভৌম গৌরের ব্যাখ্যাতে মুগ্ধ হইলেন; কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তবে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষ বাদ কেন শিক্ষা দিলেন?"

গৌর। কেন শিক্ষা দিলেন, জানি না। শুনিয়াছি, তিনি নাকি বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজের মত অন্যরূপ ছিল। এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য শঙ্করাচার্য্যের রচিত নিম্নোদ্ধৃত বচনটী ব্যাখ্যা করিলেন।

"যদ্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীয়স্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তরঙ্গে।"

"হে নাথ! ভেদজ্ঞান অপগত হইলে যদিও সৃষ্টিতে ও তোমাতে প্রভেদ থাকে না; তথাচ আমি তোমারই রচিত। তুমি কখনও আমার রচিত নও। সমুদ্রেরই তরঙ্গ হইয়া থাকে, তরঙ্গের সমুদ্র সম্ভবে না।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'তাহাই যেন হইল। কিন্তু শ্রুতিতেও তো নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ রহিয়াছে।'

গৌর উত্তর করিলেন, যেমন নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তেমনি সবিশেষ তত্ত্বের কথাও আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ধরিয়া বুঝিতে গেলে শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না। সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও অভিপ্রায় বুঝাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, হস্তপদাদি শূন্য, তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই; তিনি নাম, রূপ, উপাধি বিহীন, নীল লোহিতাদি বর্ণবিহীন, শুদ্ধ সত্ত্ব চৈতন্যময়; তেমনি অনেক স্থানে বলিয়াছেন, তিনি তেজোময়, অমৃতময়, রসস্বরূপ, পরমসুন্দর, সহস্র সহস্র তাঁহার মস্তক, সহস্র সহস্র তাঁহার হস্ত পদ, তিনি সর্ব্বত্রগামী, সকলই গ্রহণ, দর্শন ও শ্রবণ করেন, সচ্চিদানন্দরূপ, ন্যায়বান্ বিধাতা, পরম পুরুষ, পরমাত্মা। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব এই বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টাতীতে তিনি নির্গুণ নির্ব্বিশেষ; আর সৃষ্টি সম্বন্ধে সবিশেষ সগুণ, পরম পুরুষ ভগবান্। আমরা সৃষ্টি সম্বন্ধীয় জীব; সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকাশিত ব্রহ্ম স্বরূপেই আমাদের বিশেষ অধিকার।

সার্ব্বভৌম গৌরের তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতা অনুভব করিয়া, পূর্ব্বে তাঁহাকে বালক সন্ন্যাসী জ্ঞানে যেরূপ উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে ভাব আর রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উদয় হইল। ভট্টাচার্য্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি সৃষ্টিকার্য্যের সহিত ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে? তাঁহার সৃষ্ট প্রকৃতিই তো সব করিতেছে; তবে আর তাঁহার বিধাতৃত্ব মানিবার প্রয়োজন কি?"

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "বিধাতৃত্ব না মানিলে চলিবে কেন? সৃষ্টি লীলার মূলেই তো বিধাতৃত্ব। যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা সুরক্ষিত হয় এবং অবশেষে যাঁহাতে লয় হইয়া যায়; এই যে ব্রহ্ম লক্ষণ বেদে নিরূপিত হইয়াছে, ইহাতেই তো তাঁহার বিধাতৃত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন, পালন, লয়, যিনি করিতেছেন; তাঁহাকে বিধাতা বলিবেন না কেন?

সার্ব্বভৌম এরূপ তর্ক যুক্তি পূর্ব্বে আর কখন শুনেন নাই। তিনি আজন্ম মায়াবাদী ভাষ্য পড়িয়া মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদকেই ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণে চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; অন্যদিকে তাঁহার চিন্তাস্রোত কখন আকৃষ্ট হয় নাই। এক্ষণে গৌরের নিকট এই কথা শুনিয়া তাঁহার অন্তরে আর এক চিন্ত্রাজ্য খুলিয়া গেল ও নানা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তাঁহাকে না হয় বিধাতা বলিয়া মানিলাম; কিন্তু তাঁহার শক্তি অনন্ত, কোথায় কোন্ ভাবে কি প্রকারে তাঁহার শক্তি কার্য্য করিতেছে, আমরা তাহার কি জানি? দয়া, করুণা, শান্তি, পবিত্রতা, কামক্রোধাদি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, ইচ্ছা, ভৌতিক, জৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আরও কত অজ্ঞেয় শক্ত্যাদি, সকলই ত তাঁহার শক্তি। ইহাদিগের আবার অনন্ত বৈচিত্র্য, অনন্ত বিভেদ, অনন্ত সমাবেশ। এ সব ভাবিতে গেলে আত্মহারা হইতে হয়; কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারা যায় না। সে অবস্থায় শক্তিমানের পার্থক্য কিরূপে বুঝিব? শক্তি হইতে কি তিনি ভিন্ন?

গৌর বলিলেন, শক্তিতত্ত্বে তাঁহার প্রকাশ; কিন্তু শক্তি ও তিনি এক নহেন। শক্তি হইতে তাঁহাকে অভিন্নাত্মক মানিতে গেলে আবার নির্ব্বিশেষ তত্ত্বেই আসা গেল; প্রশ্নের মীমাংসা কিছুই হইল না। প্রথমে আপনি যে নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সে না হয় সত্ত্বা নির্ব্বিশেষ; আর এখন বলিতেছেন শক্তি নির্ব্বিশেষ। ফল একই রূপ, উপাসনা তত্ত্ব কি কর্ম্মের দায়িত্ব, ইহার কোনটীতেই সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু তাঁহাকে যদি সকল শক্তির কেন্দ্র স্থান বলিতে পারা যায়, তবে মীমাংসার বিষয় সুখসাধ্য হয়। সূর্য্যের একটী একটী কিরণকে যেমন সূর্য্য বলা যায় না, তাহা সূর্য্যের অত্যল্প প্রকাশ মাত্র; তেমনি ভগবানের এক একটী শক্তিকে ভগবান্ বলা অযৌক্তিক; সে সব শক্তিতে ভগবানের প্রকাশ মাত্র।

সার্ব্বভৌম। তাঁহাতে কোন্ শক্তি কিরূপে লীলা করিতেছে, কেমন করিয়া বুঝিব ?

চৈতন্য। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, অনন্তের অনন্তশক্তি জীবের বোধাতীত। সৃষ্টি রাজ্যে তাঁহার যত শক্তি প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও কেহ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তবে আত্মতত্ত্বে তাঁহার প্রকাশ। যাহার যেমন জ্ঞান ও অধিকার; শাস্ত্র ও গুরু উপদেশে যে যতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, সে তত টুকুই জানিতে পারে। সচ্চিদানন্দ ভগবানের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধানা চিচ্ছক্তির বিষয় আমরা জানিতে পারি। তিনি 'সৎ' অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমানাবস্থায় নিত্য কাল আছেন। এই শক্তির নাম সন্ধিনী; ইহাতেই দিগ্‌দেশকাল সমস্ত সৃষ্টি আশ্রিত। তিনি কিছু অচৈতন্য জড় বস্তু নহেন, চিরজীবন্ত জাগ্রত পুরুষ। এই শক্তিকে 'সম্বিত' শক্তি বলা যাইতে পারে। আর ভগবানের যে শক্তিতে প্রেম, আনন্দ, আশ্রিত; তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই তিন শক্তিকেই অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বলা যায়। উহা ভগবদ্রূপে চির প্রকাশিত। আর জীবশক্তি তটস্থা; উহা কেবল সৃষ্টি কালেই তাঁহাতে প্রকাশিতা হইয়া থাকে; সৃষ্ট্যন্তে নিদ্রিতাবস্থায় থাকে। অবশেষে, মায়াশক্তি বহিরঙ্গা; তাহা ব্রহ্ম হইতে প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মরূপকে স্পর্শ অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপের উপর আধিপত্য বিস্তার না করিয়া দূরে থাকে। সৃষ্টি লীলার উপরই ইহার প্রভাব। ইহার অর্থ এই যে, সচ্চিদানন্দ পুরুষের সৎ, চিৎ, আনন্দ, শক্তি তাঁহার ইচ্ছায় অতি অপূর্ণ রূপে সৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই অপূর্ণ শক্তি হইতে অপূর্ণ জ্ঞান; আবার অপূর্ণ জ্ঞানেই ভ্রান্তি বুদ্ধি। ইহারই নাম মায়া। সুতরাং মায়ার প্রভাব ব্রহ্মের স্বরূপে থাকিতেই পারে না। মায়াবাদ ভাষ্যে মায়াকে অবস্তু বলা হইয়াছে; প্রকৃত পক্ষে উহা অবস্তু নয়; অসম্পূর্ণ জ্ঞানমূলক মাত্র। এমন যে ঐশ্বর্য্যময় ভগবত্তত্ত্ব, ইহাকে আপনি কোন্ সাহসে নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিতে চাহেন ? যে প্রভুর ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই, জ্ঞানের অন্ত নাই; যাঁ'র চিচ্ছক্তিবিলাস ভক্ত হৃদয়ে কত সুখতরঙ্গ তুলিয়া দেয়; যিনি মায়াকল্পনার অতীত; আপনি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে মায়ামুগ্ধ জীবের সহিত অভেদ বলিতে সাহস করেন ?

সার্ব্বভৌম। তবে তাঁহার রূপ কি ?

চৈতন্য। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়, লীলাবিলাসী। পূর্ণানন্দ

বিগ্রহ, কল্পনার বিষয় নয়; প্রত্যক্ষসাধ্য। শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ডী। বুদ্ধ বেদ মানেন নাই বলিয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া থাকেন; আর শ্রীবিগ্রহ না মানিলে মানুষ যে ভীষণতর নাস্তিক হইয়া যায়, তাহা দেখিতেছেন না কেন? এক আপত্তি করিতে পারেন যে, বিকার না হইলে সৃষ্টি হয় না; ঈশ্বর কি তবে বিকারী হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? এ আপত্তি অতি অকর্ম্মণ্য। অচিন্ত্য অভাবনীয় শক্তি যাঁহার, তিনি কি সৃষ্টি করিয়াও অবিকারী থাকিতে পারেন না? মণির কথা কি শুনেন নাই? স্বর্ণ প্রসব করিয়াও মণি পূর্ব্বের অবস্থায় যদি থাকিতে পারে, তবে বিচিত্রকর্ম্মা ভগবান্ কি সৃষ্টি করিয়াও মায়াতীত থাকিতে পারেন না। ভ্রান্তিজ্ঞানমূলক বিবর্ত্ত-বাদ মত কোন মতেই টিকিতে পারে না।

সার্ব্বভৌম অনেক বিচার বিতণ্ডা করিয়াও গৌরের সূক্ষ্ম যুক্তির নিকট পরাস্ত হইলেন। শ্রীচৈতন্য অবশেষে ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভগবানের সহিত আমাদের চিরসম্বন্ধ। ভক্তি সেই সম্বন্ধ জ্ঞান বুঝাইয়া দেয়। আর প্রেমই প্রয়োজন, অর্থাৎ মানবজীবনের লক্ষ্য। ধর্ম্মের যদি কিছু লক্ষ্য থাকে, তবে তাহা প্রেম। বেদবাক্যে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অবাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন দেখিয়া গৌর বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! বিস্মিত হইও না; ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। আত্মারাম মুনিগণও ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকেন।" এই বলিয়া তিনি ভাগবতের পশ্চাল্লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে,
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থংভূতগুণো হরিঃ।"

ভা, ১।৭।১০

ভগবানের এতাদৃশ গুণ যে, যাঁহারা আত্মারাম ঋষি ও মৌনব্রতাবলম্বী; তাঁহাদের সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে; তাঁহারাও তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই শ্লোক শুনিয়া বলিলেন, "এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে আমার বড় বাঞ্ছা হয়; কৃপা করিয়া আপনি এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করুন।"

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, "আপনি মহাপণ্ডিত, আপনি আগে ব্যাখ্যা করুন্ শুনি, পরে আমি যা জানি, বলিব।

সার্ব্বভৌম তখন আপনার পাণ্ডিত্যবলে শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলে, চৈতন্য প্রভু "আপনার এ ব্যাখ্যা ব্যতীত শ্লোকের আরও অভিপ্রায় আছে" বলিয়া শ্লোকের একাদশ পদের সহিত 'আত্মারাম' শব্দ মিলাইয়া অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যার একটীও ছুঁইলেন না।' গৌরের ব্যাখ্যার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের শক্তি ও গুণের অচিন্ত্য প্রভাবে শুকসনকাদি সিদ্ধ-সাধকগণও মুগ্ধ হইয়া যান; অন্যের কি কথা? তখন ভট্টাচার্য্য পরম বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বে চৈতন্যপ্রভুকে বালক বলিয়া যে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য মর্ম্ম বেদনা পাইলেন এবং আপনার মূর্খতাকে ধিক্কার দিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বোধে স্তবস্তুতি করিয়া শরণাপন্ন হইলেন। কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব তখন ভট্টাচার্য্যের প্রতি কৃপা করিয়া প্রথমে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ ও পরে দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সার্ব্বভৌমের তখন দিব্য জ্ঞান লাভ হইল; এবং নাম, প্রেম, ভক্তিতত্ত্ব, প্রভৃতি সকল বুঝিতে পারিয়া এক দণ্ডের মধ্যে এক শত শ্লোকে চৈতন্যস্তব রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে নাচিতে শ্রীচৈতন্যের পদ ধরিয়া বলিলেন, "প্রভো! ধন্য তোমার শক্তি; তর্কশাস্ত্র পড়িয়া পড়িয়া আমার হৃদয় লৌহপিণ্ডের ন্যায় কঠিন হইয়াছিল; তাহাতেও যখন প্রেমভক্তি দিয়া গলাইয়া দিলে, তখন জগৎ উদ্ধার করা তোমার পক্ষে অতি সামান্য ব্যাপার বলিতে হইবে।" গোপীনাথ আচার্য্য পূর্ব্ব হইতেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এক্ষণে সুযোগ পাইয়া মহাপ্রভুকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কি অবস্থা করিলে?" গৌর বলিলেন, "তুমি ভক্ত; তোমার সঙ্গগুণে জগন্নাথ দেব ইঁহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন।"

পরদিন অরুণোদয়কালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জগন্নাথ দর্শন করিয়া ও পূজারী প্রদত্ত মালা মহাপ্রসাদ লইয়া সার্ব্বভৌমভবনে আসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর আগমন বার্ত্তা পাইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহার বন্দনা করিয়া বসাইলে, গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌমের হাতে মহাপ্রসাদান্ন দিলেন। ভট্টাচার্য্যের তখন স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবনাদি প্রাতঃকৃত্য না হইলেও তৎক্ষণাৎ সেই প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিয়া বলিলেন, "শুষ্কই হউক, আর পর্য্যুসিতই হউক, অথবা বহুদূর দেশ হইতে আনীতই হউক; মহাপ্রসাদ

পাইলেই ভোজন করিবে, কালাকাল বিবেচনা করিবে না।" এই কথা শুনিয়া গৌরের আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি ভট্টাচার্য্যকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বেদ, কম্প, অশ্রুতে উভয়েই ভাসিতে লাগিলেন।

তখন প্রেমাবিষ্ট গৌরচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি ত্রিভুবন জয় করিলাম; আজ আমার নিকট বৈকুণ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; আজ আমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইল। ভট্টাচার্য্য বেদধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ খাইলেন। ইহার চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? আজ তুমি নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশ্রয় করিলে; আজ তোমার ভববন্ধন ছিন্ন হইল, মায়া বিদূরিত হইল। না হ'বে কেন? যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবচ্চরণাশ্রয় করেন, স্বয়ং ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাদের মায়া হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।" সেই হইতে ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যাভিমান দূরে গেল, শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইল। তিনি এখন হইতে ভক্তি শাস্ত্র বিনা অন্য শাস্ত্রের আলোচনা ছাড়িয়া দিলেন।

সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গকে সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নাম সংকীর্ত্তনই পরম সাধন উপদেশ দিয়া বলিলেন, "আপনাকে তৃণ হইতেও নীচ বিবেচনা করিয়া ও তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া নামসাধন করিতে হইবে; নইলে নাম গুণ স্ফুরিবে না। মান, অভিমান, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, সম্পদ্, সকলই প্রভুর চরণে অর্পণ করিয়া নাম সাধন করিতে হইবে।" সার্ব্বভৌম ভাগবতের একটী শ্লোকের শেষপদে 'মুক্তিপদ' স্থানে 'ভক্তিপদ' পাঠ ফিরাইয়া আবৃত্তি করিলেন:—

'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো, ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং;
হৃদ্ বাগ্বপুর্ভি র্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্॥'

ভা ১০। ১৪। ৮

হে প্রভো! তোমার কৃপা কবে হইবে? এই আশাপথ প্রতীক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি অনাসক্ত চিত্তে স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করেন, তিনিই উত্তরাধিকারের ন্যায় তোমার ভক্তিপদে দায়াধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মুক্তিপদ' পাঠ পরিত্যাগ করিয়া 'ভক্তিপদ' বসাইলে কেন?

ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন "ভগবদ্ভক্তি বিমুখের মুক্তি তো পুরস্কার নয় দণ্ড স্বরূপ। কারণ সে ঈশ্বরের সাযুজ্য পাইয়া লীন হইয়া যায়, সেবা সুখাদির অধিকার পায় না। ভক্ত, সেবা ব্যতীত মুক্তি চাহেন না;. ব্রহ্ম সাযুজ্য তাঁর নিকট ঘৃণার সামগ্রী। সুতরাং এমন হেয় মুক্তিকে দায়াধিকার বলিলে ভক্তের প্রতি অন্যায় করা হয় কিনা?

চৈতন্য বলিলেন, "মুক্তিপদের যে ব্যাখ্যা করিলে, তাহা ছাড়া উহার অবান্তর অর্থ আছে। 'মুক্তিপদ,' বলিতে স্বয়ং ভগবান্‌কে বুঝায়। বহুব্রীহি সমাস কর না কেন?"

সার্ব্বভৌম। তথাপি ও পাঠ লইতে পারি না। কারণ উহা ব্যাখ্যা দোষযুক্ত। 'মুক্তি' শব্দটা শুনিতেই ভক্তের ঘৃণা ও ত্রাস জন্মে। 'ভক্তি' শব্দ বলিলে কেমন আনন্দ হয়।"

চৈতন্যদেব এই কথায় আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। নগরে রাষ্ট্র হইয়া গেল, মায়াবাদী পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্যকৃপায় পরম ভক্ত হইয়াছেন। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল "লোহাকে স্পর্শ না করাইলে স্পর্শ মণির গুণ টের পাওয়া যায় না। যখন কঠোর জ্ঞানী সার্ব্বভৌমের ভক্তি লাভ হইল, তখন ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সন্দেহ নাই।" সেই হইতে উৎকলরাজের অভীষ্টদেব কাশীমিশ্র ও নীলাচলের প্রধান প্রধান লোক শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হইল। তাঁহার যশে চারিদিক্ পূর্ণ হইয়া গেল।

ইহার পর একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জগদানন্দ ও দামোদর পণ্ডিতকে নিজ বাটীতে ডাকিয়া মহাপ্রভুর জন্য উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ দিলেন এবং স্বরচিত দুইটী শ্লোক একখানি তালপত্রে লিখিয়া জগদানন্দের হাতে দিয়া বলিলেন, "প্রভুকে দিও"। দুই জনে প্রসাদ ও পত্রী লইয়া বাসায় প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন মুকুন্দ দত্ত দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি জগদানন্দের হাত হইতে পত্রীখানি লইয়া পাঠান্তে বাহিরের ভিতের গায়ে শ্লোক দুইটী লিখিয়া রাখিলেন। পরে জগদানন্দ পত্রী লইয়া মহাপ্রভুকে দিলে তিনি পাঠ করিয়া বিরক্তি সহকারে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু ভক্তগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন; তাঁহারা ভিত্তিতে লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কণ্ঠস্থ করিলেন, ও সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। শ্লোক দুইটী এই:—

"বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তি যোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ;
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী কৃপাম্বুধি র্য স্তমহং প্রপদ্যে।"
"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নাম,
আবির্ভূত স্তস্য পদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।"

'যে অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ, বৈরাগ্য বিদ্যা ও ভক্তি যোগ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে দেহধারী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন; সেই কৃপানিধির আমি শরণাপন্ন হই।'

'কালদোষে নষ্ট নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী হইয়া যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন; তাঁহার পদারবিন্দে চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে অধিষ্ঠান করুক্।'

কথা কিছু অসংলগ্ন হইয়া উঠিল। গৌরের অসামান্য প্রতিভা ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানময়ী শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া পরাজিত ও মুগ্ধ হইয়া যিনি ষড়্ভুজ দেখিতে পাইলেন ও ঈশ্বর জ্ঞানে শত শ্লোকে গৌরচন্দ্রের কতই স্তব করিলেন; তাঁহার রচিত উপরোক্ত শ্লোক দুইটী পড়িয়া চৈতন্যদেব বিরক্তি সহকারে কেন ছিঁড়িয়া ফেলাইলেন, তাহা বুঝা যায় না। পত্র ছিঁড়িয়া ফেলার যদি কিছু অর্থ থাকে, ত সে এই যে, উহাতে গৌরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। গৌরচন্দ্র আপনাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিচয় দিতে ঘৃণা করেন। কিন্তু যদি তিনি ঘৃণা করিয়া পত্রই ছিঁড়িয়া থাকিবেন, তবে পূর্ব্বে শত শ্লোকে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতে অনুমোদন করা সম্ভব হয় না। আর যিনি ঈশ্বরাবতার রূপে বর্ণিত হইতে সঙ্কুচিত হন, তিনি ঈশ্বর পরিচায়ক ষড়্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখাইবেন, ইহাও অসম্ভব কথা।

তাইতে মনে হয়, ষড়্ভুজ রূপ প্রদর্শন ও ঠিক সেই সময়ে সার্ব্বভৌম-কৃত শতক রচনা অতিরিক্ত বর্ণনা। পরবর্ত্তী কালে সার্ব্বভৌম শতক রচিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। যাহা হউক, চৈতন্য ভক্তগণ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দুইটী ভক্তের কণ্ঠমণিহার; ইহাতে সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি বাদ্যের ন্যায় বিঘোষিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণাপথে—বাসুদেবোদ্ধার।

মাঘ মাসের প্রথমে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আগমন করেন ও ফাল্গুনের শেষে জগন্নাথের দোলযাত্রা দেখার পর চৈত্র মাসে সার্ব্বভৌমকে কৃপা করেন। বৈশাখের প্রথমে তাঁহার দক্ষিণ-দেশ পর্য্যটনের ইচ্ছা হইলে তিনি বন্ধুদিগকে ডাকিয়া বিনীত ভাবে সকলের হাতে ধরিয়া বলিলেন;—"তোমরা আমার প্রাণাধিক বন্ধু, প্রাণ ছাড়া যায়, তবু তোমাদের ছাড়িতে পারি না। তোমরা আমাকে এখানে আনিয়া জগন্নাথ দর্শন করাইয়া সত্য সত্যই বন্ধুর কার্য্য করিয়াছ। এখন তোমাদের নিকট আমি আর একটী ভিক্ষা চাহিতেছি। তোমরা অনুমতি কর, আমি দক্ষিণাপথে গমন করিব। জননীর নিকটে প্রতিশ্রুত আছি বিশ্বরূপের উদ্দেশে যাইতে; সে সত্য অবশ্যই পালন করিব। কিন্তু এবারে আমি একাকী যাইব, তোমাদের কাহাকেও সঙ্গে লইব না। সেতুবন্ধ হইতে যে পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসি, তোমরা সে পর্য্যন্ত এই স্থানে রহিবে।"

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ মহাদুঃখিত হইলেন এবং ম্লান মুখে নীরবে রহিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, "এ কেমন করিয়া হইতে পারে? তুমি একাকী যাইবে, ইহা কা'র প্রাণে সহ্য হয়? দক্ষিণের তীর্থপথ আমার সকলই জানা আছে, আমাকে আজ্ঞা দাও, আমি সঙ্গে যাইব। না হয়, আর দুই এক জন চলুক। বিপদসমাকুল পথে তোমার একাকী যাওয়া হইবে না। কি জানি কখন কি বিঘ্ন ঘটে?"

শ্রীচৈতন্য মৃদু মধুরস্বরে বলিলেন, "নিতাই! তুমি সূত্রধার আর আমি নর্ত্তক। তুমি যেমন নাচাও, আমি তেমনি নাচি। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমি কোথায় বৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, তুমি আমাকে অদ্বৈত ভবনে লইয়া গেলে। নীলাচলপথে আসিতে আসিতে আমার প্রিয়দণ্ড গাছটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। দেখিতেছি, তোমাদের গাঢ় প্রেমে আমার কার্য্য পণ্ড হইতেছে। আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, জগদানন্দ আমাকে

বিষয়ীর ন্যায় বিষয় ভোগ করাইতে চাহে। কি করি? সে যা' বলে, আমি ভয়ে তাই করি; না করিলে ক্রোধভরে আমার সঙ্গে তিন দিন কথা কয় না। আমি বৈরাগ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য শীতকালেও ত্রিসন্ধ্যা স্নান করি ও ভূমিতে শয়ন করি দেখিয়া মুকুন্দের দুঃখের সীমা নাই। সে মুখে কিছু না বলিলেও তাহার হৃদয়ের দুঃখে মুখ মলিন হয়। তাহার দুঃখে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। দামোদর ব্রহ্মচারী, আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সদাই আমাকে শিক্ষাদণ্ড দিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দামোদরের লোকাপেক্ষা নাই; আমি লোকাপেক্ষা ছাড়িতে পারি না। সেজন্য সে আমার স্বতন্ত্র ব্যবহার দেখিলেই ব্যবহার শিক্ষা দিয়া থাকে। ভ্রাতৃগণ! দিন কতক তোমরা নীলাচলে স্থির হইয়া থাক; আমি একেলা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসি।"

নিন্দাচ্ছলে শ্রীচৈতন্যের ভক্তদিগের স্তুতি ও বাৎসল্যপূর্ণ মধুর সম্ভাষণ শুনিয়া চারিজনই তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য কত অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন, "তোমার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য, ইহাতে আমাদের সুখ, দুঃখ, যাহা হয় হইবে। কিন্তু আমার আর একটী নিবেদন আছে; কর্ত্তব্য কিনা, বিবেচনা করিয়া দেখ। আর কিছু সঙ্গে না লইলেও কৌপীন, বহির্ব্বাস ও একটী জলপাত্র তো লইতে হইবে। তোমার দুই হাত নাম সংখ্যা গণনায় আবদ্ধ থাকিবে; এসব সামগ্রী কে বহিয়া যাইবে? বিশেষতঃ তুমি যখন প্রেমাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, তখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে? তাইতে বলি কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণকুমার তোমার জলপাত্র বস্ত্র বহিয়া পাছে পাছে যাউক। তোমার যাহা ইচ্ছা করিবে, এ কোন বিষয়ে কিছু বলিবে না।" শ্রীচৈতন্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বন্ধুদিগকে লইয়া সার্ব্বভৌম সদনে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ সঙ্কল্প বলিলে তিনি অতি কাতর ভাবে কতক দিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধে গৌরচন্দ্র কিছু দিনের জন্য যাওয়া স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় সার্ব্বভৌমগৃহে নিমন্ত্রণভোজনে ও হরি কথা নৃত্য কীর্ত্তনে গত হইল। পরে যাত্রার নিরূপিত দিন উপস্থিত হইলে, শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমের নিকট অনুমতি চাহিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমি তীর্থভ্রমণ ও বিশ্বরূপের উদ্দেশ

করিয়া নিরাপদে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিতে পারি।" সার্ব্বভৌম ভাবি বিরহশোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং চারিখানি নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস ও কতকগুলি মহাপ্রসাদান্ন ব্রাহ্মণ দ্বারা আলালনাথ পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া গৌরকে বলিলেন, "আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করিও, গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে উৎকল রাজ-প্রতিনিধি রামানন্দ রায় আছেন। তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিও। তিনি তোমার সঙ্গের যোগ্য পাত্র। তাঁহার ন্যায় রসিক ভক্ত আর দেখা যায় না। পাণ্ডিত্যের ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা একাধারে, তাঁহাতেই সামঞ্জস্যী-ভূত হইয়াছে। তাঁহার অলৌকিক ভাবচেষ্টা বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত বৈষ্ণব জ্ঞানে পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে কত পরিহাস করিয়াছিলাম। তোমার কৃপায় এখন আমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে। এখন তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিতেছি। তাঁহাকে শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা করিও না। অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলে তাঁহার মহিমা জানিতে পারিবে।' গৌরচন্দ্র এ কথা স্বীকার করিয়া জগন্নাথ মন্দিরে যাইয়া আশীর্ব্বাদ অনুমতি গ্রহণ করিয়া সমুদ্রকূলের পথ দিয়া দক্ষিণাপথ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। সার্ব্বভৌম স্বীয় পরিকর সঙ্গে সমুদ্র তীর হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। নিত্যানন্দাদি চারিজন ও গোপীনাথ আলালনাথ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে চলিলেন। পুরীর ৪ ক্রোশ দক্ষিণে আলালনাথ দেবমন্দির। শ্রীচৈতন্য স্বশিষ্যে মন্দিরের পুরোভাগে হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সে দেশবাসীগণ সন্ন্যাসীর অপরূপ ভাব, পুলকাশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ দেখিয়া একপ্রাণে শুনিতে ও দেখিতে লাগিল। ক্রমে জনতা গাঢ়তর হইল; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অপরূপ সন্ন্যাসী দেখিতে আসিল। নিত্যানন্দ ভক্তগণকে বলিলেন ;—"এইরূপে অগ্রে গ্রামে গ্রামে নৃত্য কীর্ত্তন হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস আরম্ভ হইল।" মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাচ ভিড় কমিল না দেখিয়া নিতাই গৌরকে মধ্যাহ্ন স্নান করাইবার জন্য লইয়া গেলেন এবং স্নানান্তে সঙ্গী কয়জনের সহিত মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ভোজনাদি সমাপন হইলে আবার দ্বার উন্মুক্ত হইল; আবার সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এবার জনতা আরও বাড়িয়া গেল। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনান্তে লোক সব হরিনাম গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। সকলেই গৌরের জীবন্ত ধর্ম্মভাবে

অনুপ্রাণিত হইয়া বৈষ্ণব হইয়া গেল। রজনী প্রভাতে গৌরচন্দ্র স্নানান্তে ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় হইয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস পাছে পাছে বস্ত্র, জলপাত্র, বহিয়া চলিলেন। ভক্তগণ গৌরের বিচ্ছেদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গৌরচন্দ্র তথাচ একবার ফিরিয়াও তাকাইলেন না। ভক্তগণ সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া পরদিন প্রাতে দুঃখিতান্তঃকরণে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে শ্রীচৈতন্য মত্ত সিংহের ন্যায় নিম্নলিখিত নামোচ্চারণ করিতে করিতে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্!
রাম রাঘব! রাম রাঘব! রাম রাঘব! রক্ষ মাম্!
কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব! পাহি মাম্!

এবারকার ভ্রমণে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম খুব প্রচার হইতে লাগিল। বক্তৃতা সংকীর্ত্তন বা উপদেশে নহে, কিন্তু তাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্মজীবনের প্রতিভায়। যাহারা তাঁহার নিকট আসিয়া তদীয় ভাব দেখিল, ও তাঁহার সঙ্গে একত্র থাকিয়া সদালাপ করিতে সুযোগ পাইল, তাহারা তাঁহার ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। সেই সকল লোক আবার স্ব স্ব গ্রামে যাইলে, তাহাদের দেখিয়া অন্য লোক সাধু হইতে লাগিল। তাহাদের দেখিয়া অপরে। এইরূপে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় রামের দেখিয়া শ্যাম, শ্যামের দেখিয়া নবীন, নবভক্তি বিধানের ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত প্রেম, নাম ও ভক্তি বিলাইতে বিলাইতে শচীনন্দন ভ্রমণ বিহার করিতে চলিলেন।

আলালনাথের পর গৌরচন্দ্র কূর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়া কূর্ম্ম বিগ্রহের বন্দনা প্রণাম করিলেন এবং সমাগত লোকমণ্ডলীকে নাম সংকীর্ত্তনের বন্যায় ভাসাইয়া কূর্ম্ম নামক বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। কূর্ম্ম তাঁহার প্রেমভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজা করিলেন; এবং পরদিন প্রাতে প্রাতঃস্নান করিয়া গৌর গমনোদ্যত হইলে, বিনীত ভাবে তাঁহার অনুগমন করিবার অভিলাষ জানাইলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে বলিলেন, "তাহা কখন হইতে পারে না, গৃহস্থাশ্রম পবিত্র সাধন ক্ষেত্র। গৃহে বসিয়া নাম সাধন কর, বিষয়তরঙ্গে কখন পড়িও না। ফিরিয়া আসিবার সময়ে আবার আমাকে এইখানে দেখিতে পাইবে।"

সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যেখানে যাহার গৃহে শচীনন্দন অতিথি হইয়াছিলেন, সেই সেই গৃহের গৃহস্বামীগণ তাঁহার প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গী হইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই গৌর তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া ঘরে বসিয়া ভজন সাধন করিতে বলিয়াছিলেন। কূর্ম্মকে বিদায় দিয়া শ্রীচৈতন্য শুভ যাত্রা করিয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বাসুদেব নামে এক গলিত কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্যের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার অভিলাষে কূর্ম্ম ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব পরম বিশ্বাসী ভগবদ্ভক্ত। তাঁহার অলৌকিক জীবে প্রেম শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ; ক্ষতস্থানে কীট সকল নিরন্তর অঙ্গের পুঁজ রক্ত পান করিতেছে। তাহাদিগকে দূরীভূত করা দূরে থাকুক, কোন কীট দৈবে খসিয়া পড়িলে তিনি তাহাকে উঠাইয়া আবার সযত্নে সেই স্থানে রাখিয়া দিতেন। বাসুদেব কূর্ম্মালয়ে আসিয়া যখন শুনিলেন যে গৌর চলিয়া গিয়াছেন, তখন সাধু দর্শন হইল না বলিয়া বিষাদে কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কে জানে, কি অলৌকিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গৌর সেই মুহূর্ত্তে সেখানে ফিরিয়া আসিলেন এবং বাসুদেবকে সপ্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সুখী করিলেন। কথিত আছে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে বাসুদেব কুষ্ঠ রোগ মুক্ত হইয়া সুন্দর সুস্থ দেহ লাভ করিলেন। গৌরের অলৌকিক কৃপা দেখিয়া তাঁহার মন প্রাণ গলিয়া গেল। তখন তিনি গৌরের চরণ ধরিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কত স্তব করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে রুক্মিণী প্রেরিত দরিদ্র ব্রাহ্মণে ভাগবতীয় উক্তি অনুসরণ করিয়া বলিলেন, 'কোথায় পাপী, দরিদ্র, কৃপাপাত্র আমি, কোথায় ঈশ্বরাবতার তুমি? আমার গলিত দেহে তুমি যে আলিঙ্গন করিলে, ইহা জীবে সম্ভবে না। আমার গায়ের দুর্গন্ধে, অতি জঘন্য লোক পলাইয়া যায়, তাহা তুমি কেমন করিয়া স্পর্শ করিলে? কিন্তু প্রভো! আমি ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া ভাল ছিলাম। এখন দেহগর্ব্বে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারে।' গৌর বলিলেন, 'সাধুদেহে অহঙ্কার আসিবে কেন? তুমি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণভজন কর ও নাম সংকীর্ত্তন প্রচার কর। তোমা হইতে এদেশে জীব নিস্তার হইবে।' এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য অন্তর্ধান হইয়া গেলেন। কূর্ম্ম ও বাসুদেব শোকাভিভূত হইয়া কাঁদি-

লাগিলেন। বাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্য তদীয় ভক্তসমাজে "বাসুদেবামৃতপদ" নাম পাইয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণাপথে—রামানন্দ সঙ্গোৎসব।

কূর্ম্মক্ষেত্র হইতে গৌরচন্দ্র জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে আসিয়া নৃসিংহ দেখিয়া স্তব বন্দনা করিলেন। এখানে ভূগর্ভে পাদমূল প্রোথিত নৃসিংহ মূর্ত্তি বিরাজমান। কথিত আছে, এক সরল বিশ্বাসী পুঁড়া গোয়ালের ঐ স্থানে শস্যক্ষেত্র ছিল। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গৃহে যাইবার সময় ক্ষেত্রে অন্য রক্ষক না রাখিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ক্ষেত্রগুলি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইত। কিন্তু দেখিতে লাগিল, প্রত্যহ রাত্রে কে তাহার শস্য নষ্ট করিয়া যায়। সে দুঃখিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল যে, যে তাহার শস্য নষ্ট করে, তাহাকে যেন সে দেখিতে পায়। এই বলিয়া রজনীতে এক স্থানে সে লুকাইয়া থাকিল। কিছুক্ষণ পরে দেখিল যে, ভীষণমূর্ত্তি এক বরাহ আসিয়া তাহার শস্য খাইতেছে। অমনি সে ধনুকে গুণ যোজনা করিয়া শূকরকে বিদ্ধ করিল, এবং শুনিতে পাইল, শূকর রাম! রাম! শব্দ করিয়া নিকটস্থিত পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করিল। তখন গোয়ালা বুঝিল যে, সে শূকর নহে; ভগবান্ তাহাকে ছলনা করিয়াছেন। ইহাতে সে নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে উপবাসী থাকিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত ভগবানের নিকট আত্মদোষের ক্ষমা চাহিয়া প্রার্থনা করিল। দৈববাণী হইল, 'তোমার অপরাধ নাই, ঘরে যাও।' পুঁড়া ছাড়িবার পাত্র নয়; বলিল, 'আমার দোষ ক্ষমা করিলে কেমন করিয়া বুঝিব, যদি কোন প্রসাদ চিহ্ন দেখিতে না পাই?' দৈববাণী উত্তর করিল, 'পাইবে'। পুঁড়া তখন দেশের রাজার নিকটে যাইয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলে রাজা বলিলেন, 'যদি তুমি দেখাইতে পার, তবে আমি তোমার ক্রীত দাস।' তখন রাজা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলে, দৈববাণী হইল, 'তুমি যে জাতিবুদ্ধি ছাড়িয়া আমার ভক্তের সম্মান করিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এইখানে দুগ্ধ সেচন কর, আশ্চর্য্য দেখিবে।' তখন রাজাজ্ঞায় সেই স্থানে দুগ্ধ সিঞ্চন হইতে লাগিল

এবং একটু একটু করিয়া ভূগর্ভ হইতে অপূর্ব্ব নৃসিংহ মূর্ত্তি উঠিতে লাগিল দর্শকবৃন্দ বিস্মিত হইয়া গেল। জানু পর্য্যন্ত উঠিলে আজ্ঞাবাণী হইল, 'আ উঠিবে না; নিরস্ত হও।' রাজা তখন মহানন্দে সেই স্থানে মন্দির নির্ম্মা করিয়া দিয়া মহা মহোৎসব করিলেন। কিছু দিন পরে জিয়ড় নামে এ সাধু মহাজন দুই পুরঙ্গনা সমভিব্যাহারে দেবমূর্ত্তি দেখিতে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে হঠাৎ তাঁহার সঙ্গিনী দুই জনকে পাষাণময়ী হইয়া দেবচর লাভ করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে রোদন করিতেছিলেন। দেবতা প্রসন্ন হই তাঁহাকে বলিলেন, 'রোদন ছাড়; তোমার রমণীদ্বয় সদ্গতিলাভ করিয় ছেন। আজি হইতে তোমার নামে আমার নাম হইল।' সেই অব জিয়ড় নৃসিংহ নাম প্রকাশ হইল। চৈতন্যদেব নৃসিংহ মন্দিরে যাইয়া এ কিম্বদন্তী শুনিতে পাইয়াছিলেন।

নৃসিংহ ক্ষেত্র ছাড়িয়া গৌরচন্দ্র কত দিন পরে গোদাবরী তীরে আসিয় উপনীত হইলেন। গোদাবরী দেখিয়া যমুনা ও তীরস্থ বন দেখিয়া বৃন্দাব স্মৃতি হওয়ায় তিনি অনুরাগ ভরে বনমধ্যে অনেকক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন ক লেন; এবং নদী পার হইয়া পরপারে আসিয়া স্নানাবগাহন সাঙ্গ করি ঘাটের কিছু দূরে জল সন্নিধানে বসিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলে এই নগরের নাম বিদ্যানগর বা রাজমহেন্দ্রী। উহা উৎকল রাজ্যের দা ণাত্য প্রদেশের রাজধানী। অল্পক্ষণ পরে মহাপ্রভু দেখিলেন যে, বহুলো সঙ্গে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে এক বিচিত্র দোলায় চড়িয়া কোন সম্ভ্র ব্যক্তি ঘাটে স্নানাবগাহন জন্য আসিলেন। তাঁহার সঙ্গের স্তাবক এ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। রাজপুরুষ বিধিমত স তর্পণ সমাধা করিলেন। শ্রীচৈতন্য মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই রাজা রামানন্দ রায়, যাঁহার কথা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়া দিয়াছে ইতিমধ্যে রাজপুরুষ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া প্রণাম করি গৌর উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি র রামানন্দ রায়?" আগন্তুক উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি সেই মন্দবুদ্ধি শূদ্রাধ বটে।" গৌর বলিলেন, "আমি নীলাচল হইতে আসিতেছি; সার্ব্বে ভট্টাচার্য্য আপনার গুণ বর্ণনা করিয়া আপনার সঙ্গে সা করিতে বলিয়া দিয়াছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জ আমার এখানে আসা; ভাল হইল যে অনায়াসে দর্শন পাইলাম।" গৌর

বাহু প্রসারিয়া রামানন্দ রায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। রায়ও তাঁহাকে আলিঙ্গিয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন। স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্যাতে উভয়ে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। ক্ষণকালের জন্য উভয়েই আত্মবিস্মৃত হইলেন। কে জানে ভক্তদিগের অন্তরে অন্তরে কি এক অদৃশ্য বৈদ্যুতিক তার আছে যে, পরিচয় না থাকিলেও দর্শন শ্রবণে পরস্পরকে চিনিতে বাকি থাকে না। দর্শক লোকেরা এই ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিল, "এই সন্ন্যাসীকে মহা তেজোময় দেখিতেছি; শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া ইনি কাঁদিতেছেন কেন? আর আমাদের মহারাজ পরম গম্ভীর ও পণ্ডিত; ইনিই বা কেন সন্ন্যাসীস্পর্শে অস্থির হইলেন?" যাহা হউক, উভয়েই ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের কথার উত্তরে বলিলেন, "সার্ব্বভৌম আমাকে ভৃত্য জ্ঞানে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন বলিয়া আমার উপকারের জন্য আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আজ আপনার দর্শন ও আলিঙ্গনে পবিত্র হইলাম। আমি অস্পৃশ্য রাজসেবী শূদ্রাধম; আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ হইয়াও আমাকে যে স্পর্শ করিলেন, সে আপনার কৃপার গুণ। মহৎদিগের স্বভাবই এই যে, নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও পামরদিগের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। আপনার প্রভাব সাক্ষাৎই দেখিতেছি আমার সঙ্গের এই সহস্রাধিক লোকও আপনাকে দেখিয়া হরিনাম পুলকাশ্রুতে দ্রবীভূত হইয়াছে। গৌর বলিলেন, "না, তা' নয়। আপনি ভাগবতোত্তম; আপনার মিলনে আমার প্রেমভক্তি লাভ হইবে বলিয়াই সার্ব্বভৌম এখানে আসিতে বলিয়া দিয়াছেন।" এইরূপ কথা বার্ত্তার মধ্যে রাজার ইঙ্গিতে এক বৈদিক বিপ্র মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিল। শ্রীচৈতন্য নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া রামানন্দ রায়কে বলিলেন, "আপনার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে বড় সাধ আছে। আবার যেন দর্শন পাই।" রায় বলিলেন, "যদি অধমকে তরিতে এখানে আসিয়াছেন, তবে পাঁচ সাত দিন থাকিয়া আমার দুষ্ট মনকে শোধন করুন।" এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া রাজা রামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে মহা সমারোহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীচৈতন্যও ব্রাহ্মণের সঙ্গে তদীয় গৃহে যাইয়া মধ্যাহ্নাদি সমাপন করিলেন।

রামানন্দ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই:—ভবানন্দ রায় নামে উড়িষ্যার

করণ বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পাঁচ পুত্র। গোপীনাথ পট্টনায়ক, বাণীনাথ পট্টনায়ক, রামানন্দ রায় এবং আর দুই জন, যাঁহাদের নাম জানা যায় না সপুত্র ভবানন্দ চিরদিন উড়িষ্যার রাজসংসারে উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মালজেঠ্যা দণ্ডপাঠ নামক প্রদেশে গোপীনাথ শাসন কর্ত্তা। রামানন্দ রায় গোদাবরী প্রদেশের শাসন কর্ত্তা; তাঁহার উপাধি রাজা। ভবানন্দ ও বাণীনাথ নীলাচলে উচ্চ উচ্চ পদে অভিষিক্ত শ্রীচৈতন্য নীলাচলে থাকার সময়ে এই গোষ্ঠি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহারই পরিকর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ভবানন্দের পাঁচ পুত্রের মধ্যে রামানন্দ রায় পরম পণ্ডিত ও রাধাকৃষ্ণের উপাসক; পরম ভক্ত এবং সর্ব্বোচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্ত ভক্ত জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ, তাঁহার জীবন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাজা রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্য স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে উভয়ের পুনর্ম্মিলনের উৎকণ্ঠায় সন্ধ্যা উপনীত হইল। শ্রীচৈতন্য সায়াহ্ন স্নান সমাপনান্তে নিভৃতে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন, এমন সময়ে রামানন্দ রায় এক মাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলে তিনি আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে ভৃত্যকে বাহিরে থাকিতে বলিয়া রহঃ স্থানে গিয়া নানা কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধ্য বস্তু কি? নির্ণয় করুন।"

রামানন্দ উত্তর করিলেন, "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণের ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ, এই চারি আশ্রমের ধর্ম্ম যেরূপ মন্বাদি ঋষিগণ নিরূপণ করিয়াছেন; স্ব স্ব অধিকার ভেদে তাহাই যাজনা করিয়া ভগবানের আরাধনা করা উচিত।" শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "এত বাহিরের কথা; নিগূঢ় কথা কি? বল।" রামানন্দ বলিলেন, "ভগবানে কর্ম্মার্পণই সাধ্যসার। পান, ভোজন, দান, তপস্যাদি যে কোন কর্ম্ম করা যায়; তাহার ফলাফলে উদাসীন থাকিয়া ভগবদিচ্ছার অনুগত হইয়া চলাই সার ধর্ম্ম।"

শ্রীচৈতন্য। 'এও বাহিরের ধর্ম্ম।'

রামানন্দ। তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগই শ্রেষ্ঠ; বর্ণাশ্রম নিরূপিত ও বেদ বিহিত সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কেবল মাত্র ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধক।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের কথা।

রামানন্দ। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধ্য শিরোমণি। যাঁহার অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় হইয়াছে; যাঁহাতে ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন ও যিনি ব্রহ্মে অবস্থিতি করেন; যাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া শুভ, অশুভ, রোগ, শোক, সম্পদ্, বিপদ্ সমজ্ঞান হইয়া চিত্ত নির্ম্মল ও প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে; তিনিই সর্ব্বত্র সমভাবে ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিয়া ব্রহ্মযোগরূপ পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের ধর্ম্ম; ইহার পর কি বল।

রামানন্দ। জ্ঞান শূন্যা ভক্তিই সাধ্যশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের পথ কুটিল, তাহাতে সর্ব্বদাই সংশয় আসিয়া আত্মাকে কলুষিত করে। বিশেষতঃ সকলের পক্ষে কিছু জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীতে কয় জন জ্ঞানী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়? আর জ্ঞানের সীমাই বা কোথায়? কে কতটুকু জ্ঞান লাভ করিতে পারে? মানবজ্ঞান তো অতি অকিঞ্চিৎকর। অসীম জ্ঞান বস্তুকে কি ক্ষুদ্র মানবজ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে? এই বিবেচনা করিয়া যিনি জ্ঞানানুসন্ধানে প্রয়াস না করিয়া সাধুমুখবিনিসৃত ভগবৎ কথা শ্রবণ ও তাহা কায়মনোবাক্যে অবলম্বন করিয়া থাকেন; অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও ভগবান্ প্রায় এরূপ লোকের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য। এ এক রকম বটে। কিন্তু ইহার পর কি? শুনিতে চাই।

রামানন্দ। প্রেমভক্তিই সর্ব্ব সাধ্যসার। প্রেমবিহীন কৃষ্ণপূজা-ক্রের কখনই সুখকর হয় না। এক মাত্র প্রেমভক্তি রস লাভই তাঁহার লোভনীয়। কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য বলেও ঐ লোভ পাওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্য। এও বটে। তার পর?

রামানন্দ। দাস্য প্রেমই সাধ্য শিরোমণি। যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র জগৎ পবিত্র হয়; সেই ভগবানের নিত্য দাসদিগের চে'য়ে আর সৌভাগ্যবান্ কে?

শ্রীচৈতন্য। এও বেশ; তা'র পর কি?

রামানন্দ। সখ্য প্রেমই সর্ব্ব সাধ্য সার। জ্ঞানীরা ব্রহ্ম সুখানুভূতিতে ও ভক্তগণ আরাধ্যরূপে যাঁহাকে প্রতীতি করেন; যদি কেহ তাঁহার সহিত

সখ্যতা করিয়া তাঁহার অপার পারমেশ্বরী শক্তি ভুলিয়া গিয়া সুখ দুঃখ সম্পা
বিপদের বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে ভাবিতে পারে, তবে সে সাধকের সম শ্রে
আর কে ?

শ্রীচৈতন্য। এ উত্তম কথা। ইহার পর আর কিছু আছে ?

রামানন্দ। আছে, বাৎসল্য প্রেমই সাধ্য সার। সকল ভুলিয়া গি
যাঁহারা ভগবান্‌কে আপনার সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে পারেন ; তাঁহাদে
তুল্য সাধক আর কে ? নন্দ যশোদার তুল্য কাহার সৌভাগ্য ?

শ্রীচৈতন্য। অতি উত্তম ; তার পর ?

রামানন্দ। তার পর কান্ত ভাব। ইহাই সকল সাধ্যের শ্রেষ্ঠ সাধ্য
ভগবানে আত্ম সমর্পণের ন্যায় আর কি আছে ? সতী স্ত্রী যেমন প্রি
পতিকে শরীর, আত্মা, প্রাণ, মন, সকলই সমর্পণ করেন ; তেমনি কান্তভা
ভক্ত সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্ব্যো
পঞ্চ ভূতের স্থায়িভাব যেমন পর পর ভূতে বৃদ্ধি হইতে হইতে ক্ষিতি
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, পাঁচটী তন্মাত্রই থাকিয়া যায় ; তেমনি শান্তে
অচঞ্চলতা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্বাস, বাৎসল্যের স্নেহ এবং কান্তে
আত্ম সমর্পণ, সকলই কান্তভাবে অন্তর্নিবিষ্ট। ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় ব
বিধ। যাহার যে পন্থা, তাহাই তাহার নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সূক্ষ্মরূ
দেখিতে গেলে কান্তপ্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্য প্রেমে ভগবান্‌কে পাও
গেলেও পরিপূর্ণ রূপে এক কান্ত প্রেমেই যাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'যত দূর বলিলেন, ইহাই সাধ্যের সীমা বটে ; কি
ইহার পর আর কিছু যদি থাকে, তবে বলুন।'

রামানন্দ উত্তর করিলেন, 'ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে এমন লো
জগতে আছে বলিয়া জানিতাম না। যাহা হউক, ইহার পরেও আছে
কি ? শ্রীরাধিকার প্রেমই সর্ব্ব সাধ্য শিরোমণি। কেন, জানেন না কি ? শ
কোটি গোপীর সঙ্গে রাসবিলাসে প্রবৃত্ত থাকিয়াও ভগবান্ রাধাপ্রে
এমনই মুগ্ধ যে, রাস ছাড়িয়া তাঁহাকে লইয়া বন মধ্যে লুকাইয়াছিলেন ?

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাতে রাধাপ্রেমের গৌরব হইল কৈ
গোপীদিগের সঙ্কোচে যখন রাধিকাকে লইয়া ভগবান্‌কে লুকাইতে হই
তখন সে প্রেমে অন্যাপেক্ষা হইল। তা'তে তো প্রেমের গৌরব হইল ন
যদি জানিতাম, ভগবান শ্রীরাধিকার জন্য সর্ব্ব সমক্ষেই গোপীদিগকে ত্যা

করিতে পারিতেন ; তবে বুঝিতাম, শ্রীরাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ। আপনার মুখ দিয়া অমৃতনদী প্রবাহিত হইতেছে ; বলুন এ কথার সামাধান কি ?

রামানন্দ বলিলেন, 'তা' নয়। রাধাপ্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাসমণ্ডলে যত গোপী নাচিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের পাশে এক এক কৃষ্ণমূর্ত্তি নাচিতেছিল। রাধার পাশেও এইরূপ এক মূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছিল। সাধারণ প্রেমে সর্ব্বত্র সমভাব দেখিয়া শ্রীরাধিকার অভিমান উপস্থিত হইলে তিনি রাসমণ্ডল ছাড়িয়া অভিমানিনী হইয়া চলিয়া গেলেন। নিগূঢ় প্রেমেই অভিমান হয় ; সাধারণ প্রেমে হয় না। শ্রীরাধিকার অভিমান এই নিগূঢ় কুটিল প্রেম নিবন্ধনই হইয়াছিল। তাহাতেই সে প্রেমের গভীরতা বুঝা যাইতে পারে। যাহা হউক, অভিমানিনী রাধার অন্বেষণ জন্য ভগবান্‌ও রাসমণ্ডল ছাড়িয়া নিবিড় নিকুঞ্জ বনে বেড়াইয়া তাঁহাকে পাইয়া কামনা উপভোগ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। শত কোটি গোপীতেও যে কাম নির্ব্বাপণ হইল না, একা রাধিকাতেই তাহা হইল। ইহাতেও শ্রীরাধার প্রেমের গভীরতা বুঝুন।"

শ্রীচৈতন্য মহা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আমি ধন্য হইলাম ; যাহা শুনিতে আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, তাহা সকলই শুনিলাম। এখন আর কয়টী প্রশ্ন আছে, তাহার উত্তর দানে কৃতার্থ করুন্। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার স্বরূপ কি ? রস কোন্ তত্ত্ব ? প্রেমই বা কি ? এই যে 'কাম' শব্দ বলিলেন, তাহাই বা কি ?"

রামানন্দ রায় উত্তর করিলেন, 'আমি এ সব তত্ত্বের কি জানি ? তুমি যাহা বলাইতেছ, শুক পাখীর ন্যায় তাহাই বলিয়া যাইতেছি। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ; হৃদয়ে প্রেরণা দিতেছ, জিহ্বায় তদুপযোগী কথাও ফুটাইতেছ। আর আমার মুখ, বীণা যন্ত্রের ন্যায় বাজিয়া যাইতেছে।'

শ্রীচৈতন্য রামানন্দের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—'আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তিতত্ত্বের কিছুই জানি না। সার্ব্বভৌমের সহবাসে আমার হৃদয় নির্ম্মল হইলে তাঁহাকে কৃষ্ণ ভক্তিতত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, রামানন্দ ব্যতীত কৃষ্ণভক্তি কেহ জানে না। তোমার মহিমা শুনিয়া তোমার নিকট ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিতে আসিয়াছি। তুমি এখন আমাকে সন্ন্যাসী দেখিয়া স্তুতি করিতেছ। এই কি তোমার উচিত ? সন্ন্যাসী পরম হংস হইলেই গুরু হয় না। যিনি শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানেন, তিনিই গুরু।

শূদ্রও কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হইলে পরম গুরুর পূজা পাইবার যোগ্য। আমা সন্ন্যাসী জ্ঞানে বঞ্চনা করিও না। রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব বলিয়া আমার অভিল পূর্ণ কর।'

রামানন্দ রায় মহাভাগবত ও প্রেমিক হইয়াও গৌরের ব্যাকুল ও অনুরাগ দেখিয়া ভাবপ্রেমে টলমল করিতে লাগিলেন এবং অনুরা ভরে বলিয়া উঠিলেন, 'বুঝিলাম তুমি সূত্রধার, আমি নট। তুমি যে নাচা'বে, আমাকে তেমনি নাচ্‌তে হ'বে। তুমি বীণাধারী, আমার জিহ্ বীণাযন্ত্র; তুমি যেমন বাজাইবে, তাহাকে তেমনি বাজিতে হইবে। শুন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, পরম ঈশ্বর, সর্ব্ব অবতারী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বমাধুর্য্য, সর্ব্বরস, পরিপূর্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার অপ্রাকৃত নব যৌবন; তিনি চির নূতন, পরম সুন্দর। অনন্ত বৈকু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত অবতার, সকলের আশ্রয়। যত ভক্ত, যত সাধ ও যত উপাসক, সকলের ভক্তি ও প্রীতির আশ্রয়ও বটেন ও বিষয়ও বটেন যত রস, যত ভক্তি, যত তত্ত্ব, সব তাঁহাতেই পর্য্যবসিত। তিনি পরম পুরু উজ্জ্বল শ্যাম রসময়। কি পুরুষ, কি যোষিৎ, কি স্থাবর জঙ্গম, সকলের চিত্তাকর্ষক। এমন কি আপনার মাধুর্য্যে আপনি বিভোর হইয়া আপনাকে আপনি আলিঙ্গিতে চাহেন।'

শ্রীচৈতন্য প্রেমাবেগে বলিলেন, 'বুঝাইয়া বল।'

রামানন্দ উত্তর করিলেন, 'সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের আনন্দেই সৃষ্টিলীলা শ্রুতি বলিতেছেন, আনন্দ রূপ ঈশ্বর হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ; আনন্দরূপে স্থিতি এবং আনন্দরূপেই পর্য্যবসান। তিনি তো আপন আনন্দে আপ মাতোয়ারা; তবে আবার লীলা কেন? ইহার উত্তর এই যে, জীবকে সে আনন্দের মধুর রস আস্বাদন করাইতে। শ্রুতি তাঁহাকেই 'রস' বলিয়া নির্দে করিয়াছেন। আনন্দরূপ, লীলাতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের সহিত প্রকটিত হইলেই রূপ নিষ্পন্ন হয়। যাহা খাঁটি রস, তাহাই অমৃত; আর যাহা অমৃত, তাহা চির নূতন; তাহাতে জরা, বার্দ্ধক্য, ক্ষয়, বিনাশ, কিছুই নাই। আবার যা লীলা; তাহাই পরমসুন্দর, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, পরম কল্যাণময়, অরূপ রূপমাধু পূর্ণ। এখন দেখুন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বচিত্তার্ষক, পরম সুন্দর, নবকিশোর, অপ্রাকৃ পুরুষ কিনা? আনন্দরূপ হইতে সৃষ্টিলীলা; ইহাতে বুঝা যায়, তিনি সকল বৈকু

কল ব্রহ্মাণ্ড ও সকল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। জড় জগতের অতীত ধামের াম শ্রীবৈকুণ্ঠ; তাহার তিনটী প্রকোষ্ঠ ভেদ আছে। মথুরা, জ্ঞানরাজ্য; ারিকা, ঐশ্বর্য্য ধাম; আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রজধাম, মাধুর্য্য পরিপূর্ণ। সেই ব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলার স্থান। সেখানে তিনি অপ্রাকৃত গোপবালক া শ্রীনন্দনন্দন, পিতা মাতার অকপট বাৎসল্যে ক্রীড়মান। সেখানে তনি পরম সুন্দর হৃদয় সখা; বিপদ্ সম্পদ্, রোগ শোকের একমাত্র ন্ধু। সেখানে ঐশ্বর্য্য বা চিদ্‌বিভূতির লেশমাত্র নাই; অথচ দাস্য সবার পরম পাত্র। আর সেখানে তিনি শৃঙ্গার রসময় নবনাগর। াঁহাতে আত্মা পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেও হৃদয়ের আবেগ যায় না; সকল িয়াও আর্ত্তি ফুরায় না। এই তো শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সংক্ষেপে বলিলাম। সহস্র হস্র জিহ্বা হইলেও কৃষ্ণের গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। বলিতে লিতে রায় রামানন্দ অধৈর্য্য হইলেন। গৌরও অবহিত চিত্তে শুনিতে াগিলেন।

রামানন্দ রায় বলিলেন, 'এখন শ্রীরাধিকার তত্ত্ব কিছু বলিতেছি। ীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান। যথা, চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি। প্রথমটী অন্তরঙ্গা, দ্বিতীয়টী বহিরঙ্গা ও তৃতীয়টী তটস্থা। হার মধ্যে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিই তাঁহার স্বরূপশক্তি। যে শক্তি ঈশ্বরস্বরূপে া থাকিলে, ঈশ্বরত্ব অসম্ভব হয়; তাহারই নাম চিচ্ছক্তি। এই শক্তি ঈশ্বর-ত্ত্বে ওতপ্রোত রূপে চিরবিরাজিত। জীবশক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি কখন শ্বরতত্ত্বে প্রকটিত থাকে, কখন বা অপ্রকটিত ভাবে থাকে; সেজন্য উহা টস্থা। আর মায়া শক্তি, ভগবান্ হইতে প্রকটিত হইয়া ভগবৎ স্বরূপে আপনার ভাব বিস্তার না করিয়া তাহার বাহিরে থাকে; এ জন্য তাহা বহিরঙ্গা। কথার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের পূর্ণ ও অনন্তশক্তি কিছু সমুদায় ার্য্যে নিযুক্ত হয় নাই। উহার অত্যল্পাংশ মাত্র বিশ্বরচনায় লিপ্ত । সৃষ্ট পদার্থমাত্রে অপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই অপূর্ণতা নিবন্ধনই মোহ, ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতার অধীন হইয়াছে। এই অজ্ঞানতার নামই ক্তি। সে যাহা হউক, সমুদায় চিচ্ছক্তিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত যাইতে পারে। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের 'সৎ বা 'নিত্যত্ব' প্রকাশিকা নাম সন্ধিনী। 'চিৎ' বা চৈতন্য প্রকাশিকা শক্তির নাম সম্বিৎ। আনন্দ বা আহ্লাদ প্রকাশিকা শক্তির নাম 'হ্লাদিনী'। শক্তির

সাহায্য ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব সম্যক্ জানা যায় না। সুতরাং এই সকল শক্তি বা প্রকৃতিই আমাদিগকে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া দিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের আনন্দরূপই লীলার মূল কারণ। আবার এই হ্লাদিনী শক্তিই কৃষ্ণকে আহ্লাদ দান করে; অথবা সুখরূপ কৃষ্ণ, হ্লাদিনী দ্বারা লীলা সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। ভক্তগণও এই হ্লাদিনী দ্বারা সুখরূপ কৃষ্ণের সুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন। অতএব জানা যাইতেছে, ভগবানের যাবতীয় শক্তির মধ্যে হ্লাদিনীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। হ্লাদিনীর সার অংশ অর্থাৎ হ্লাদিনী হইতে সুখাস্বাদন করিলে ভগবৎ হৃদয়ে বা ভক্ত হৃদয়ে যে স্থায়ীভাব অঙ্কিত হয়; তাহার নাম আনন্দ চিন্ময় রস; অপর নাম প্রেম। এই প্রেম আবার প্রগাঢ় হইলে যাহা স্থায়ী হয়; তাহার নাম মহাভাব। শ্রীরাধিকা এই মহাভাব স্বরূপিণী বই আর কিছু নন। এই মহাভাব সমস্ত চিন্তার সার চিন্তা বা চিন্তামণি। চিন্তামণিই শ্রীরাধিকার প্রকৃত স্বরূপ; আর ললিতাদি সখীনিচয় তাঁহার কায়ব্যূহ। শ্রীরাধিকার প্রাকৃত কায়া নাই। আবর্ত্তিত কৃষ্ণস্নেহই তাঁহার উজ্জ্বল বর্ণ। কারুণ্য রসের তারল্যে বা চিরনবীন রসের ও লাবণ্যরসের অমৃত জলে রাধারূপ যেন পুনঃ পুনঃ স্নাত হইয়াছে। লজ্জারূপ শ্যামসাটী ও কৃষ্ণানুরাগ রূপ রক্তসাটী পর্য্যায়ক্রমে রাধাদেহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রণয় বা মানকঞ্চুলিকায় বক্ষ সমাচ্ছাদিত। সৌন্দর্য্যকুঙ্কুমে, প্রণয়চন্দনে এবং স্মিত কান্তিকর্পূরে শ্রীঅঙ্গ বিলেপিত ও শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল রসমৃগমদে চর্চ্চিত। প্রচ্ছন্নমান তাঁহার বেণীবিন্যাস। আর রসশাস্ত্রে যাহাকে নায়িকার ধারাধীরাত্মক গুণ বলে, তাহা তাঁহার উত্তমাঙ্গের পট্টবাস। অনুরাগ, তাঁহার অধরের তাম্বূল রাগ। প্রেম কৌটিল্য, নয়নের কজ্জল। সুদীপ্ত সাত্বিক ভাব, হর্ষাদি সঞ্চারিভাব, ও কিল কিঞ্চিতাদি রসশাস্ত্রের বিংশতিভাব, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের ভূষণ। ত্রৈলোক্যে যত গুণশ্রেণি আছে, তাহা তাঁহার অঙ্গের পুষ্পমালা। সৌভাগ্য রূপ চারু তিলক ললাটে সমুজ্জ্বল; আর প্রেমবৈচিত্র্য রত্নাদিতে মণ্ডিত কলেবর। তিনি মধ্যবয়স্কা হইলেও কিশোরী। নিজাঙ্গ সৌরভ পর্য্যঙ্কে কৃষ্ণলীলা বিভাসিনী মনোবৃত্তি সখীনিচয়ে পরিবৃতা হইয়া শ্রীরাধিকা সদা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ চিন্তা করিতেছেন; কৃষ্ণনামগুণযশঃ শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি নিরন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উজ্জ্বল রসের মাধুর্য্য

আস্বাদন করাইতে যত্নবতী। রাধার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী কে? তাঁহার ন্যায় সুন্দরী ও কলাবতীই বা কে আছে? শ্রীরাধিকার গুণ শ্রীকৃষ্ণই সংখ্যা করিতে পারেন না; তা' জীব ছার কি বলিবে?'

শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন, 'ইহাতে কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণলীলার গৌরবই অধিক বুঝা যাইতেছে। লীলাময়ী শ্রীরাধিকা হইতে আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, লীলাসম্বন্ধীয় মধুররস আস্বাদন করিয়া বিভোর হইতেছেন; তাহাতেই শ্রীরাধার এত গৌরব। আচ্ছা এই যে কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি রূপ সখীর কথা বলিলেন, ইহা কোন্ তত্ত্ব?'

রায় রামানন্দ বলিলেন যে, 'সৃষ্ট জীবকে স্বীয় আনন্দরস আস্বাদন করান, লীলাপ্রকাশের যেমন এক উদ্দেশ্য; তেমনি লীলার উজ্জ্বল মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করিয়া স্বকীয় পূর্ণানন্দকে উচ্ছ্বসিত করা, অপর উদ্দেশ্য। বিন্দু, সিন্ধুসঙ্গমে যেমন সুখী হইবে, আবার সিন্ধুও বিন্দুর বিন্দু দান লইয়া ততোধিক সুখী হইবেন। জীবের প্রেম ভগবানে, ভগবানের প্রেম জীবে; এই বিনিময়ে কি অপূর্ব্ব আনন্দলহরীই উঠিয়া থাকে? পরা প্রকৃতি ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকা ভিন্ন এই সুখলহরী তুলিতে কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু কৃষ্ণলীলায় মহাভাবময়ীর বিকাশ তো সখীর সাহায্য ভিন্ন হইতে পারে না। মহাভাবকে পরিপুষ্ট করে কে? লীলাময়ের আনন্দ চিন্ময় রসের যত কিছু বৃত্তি আছে, তাহারা। মঙ্গল, সৌন্দর্য্য, শোভা, সুচিত্র, সুভাব, সুহাস্য, প্রণয়, অনুকূলতা, প্রভৃতি যাহা কিছু লীলাময়ী হৃদ্বৃত্তি; তাহারাই নিরন্তর মহাভাবের পরিপোষিণী। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীমিলনে মহানদী পরিপুষ্টা হইয়া প্রধাবিতা হয়; তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ চিন্ময় ভাবলহরী মহাভাবে সঙ্গতা হইয়া উহাকে নিরন্তর সম্বর্দ্ধন করিয়া থাকে। আনন্দরসের এই সকল খণ্ডই ললিতাদি সখী প্রকৃতি। ইঁহারা মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার পরিবারবর্গ হইয়াও তাঁহা হইতে অভিন্নাত্মিকা। বলিতে কি ইঁহারই শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ রূপিণী। রাধা-কৃষ্ণের সুখবিভু স্বপ্রকাশ হইলেও চিদ্‌বিভূতিরূপিণী সখীদিগের সাহায্য ব্যতীত ক্ষণকালও রসপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাই সখীতত্ত্ব বা গোপীতত্ত্ব।'

শ্রীচৈতন্য প্রেমবিহ্বল বাক্যে বলিলেন, 'এ সকল তত্ত্ব ত শুনিলাম। এক্ষণে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিলাস বর্ণন করিয়া অভিলাষ পূর্ণ কর।'

রামানন্দ উত্তর করিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত নায়ক; তিনি নানা রসে রসিক, নিত্য নবীন, পরিহাস বিশারদ এবং সদানন্দ। যখন নবজলধর শ্যামসুন্দর অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে হৃদয়ে উদিত হইয়া ডাকিতে থাকেন; তখন কি আর গৃহে মন ফিরিতে চায়? রাধা সঙ্গে নিরন্তর কামক্রীড়াই তাঁহার কার্য্য।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'উত্তম কথা; কিন্তু ইহার পর আর যদি কিছু থাকে, বর্ণনা করিয়া পরিতৃপ্ত কর।'

রায় উত্তর করিলেন, 'ইহার পর আর কি আছে জানি না; তবে প্রেমের বিবর্ত্ত বিলাস নামে যে এক লীলা আছে, তাহা শ্রবণে তুমি সুখী হইবে কি না, বলিতে পারি না। এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে লীলারূপী কামশিল্পী, পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের চিত্তজতুতে শ্রীরাধিকার মহাভাবময়ী প্রকৃতিজতু যখন উভয়ের নবানুরাগরূপ হিঙ্গুল বর্ণ প্রেমাগ্নি দ্বারা গলাইয়া অভিন্ন রূপে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলে; তখনই প্রেমের বিবর্ত্ত বিলাস হয়। বর্ষাকালীন প্রগল্‌ভা নদীর গৌরবর্ণ জল, জলধির সুনীল জলে মিশিয়া একাকার হইয়াও ঈষৎ রেখায় প্রতীয়মান হইতে থাকে।' এই বলিয়া রামানন্দ রায় প্রেমভরে স্বরচিত এক গীত গাইলেন।

'পহিল হি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল; অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল। না সো রমণ, না হাম রমণী; দুঁহু মনে মনোভব পেশল জানি। এ সখি! সে সব প্রেমকাহিনী; কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি। না খোঁজলু দূতি না খোঁজলু আন; দুঁহুকো মিলনে মধ্যেতে পাঁচ বাণ। অবশই বিরাগ তুহু ভেলি দূতি; সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি।'

এই গান শুনিতেই শ্রীচৈতন্য প্রেম বিহ্বলচিত্তে স্বহস্তে রায় রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন এবং প্রেমাবেগ সংযত হইলে কহিলেন, 'এখন কামতত্ত্ব কি? বলিলেই সাধ্যনির্ণয় সমাপ্ত হয়।' রামানন্দ রায় উত্তর করিলেন, 'লীলা সুখ আস্বাদন করিতে ভগবানের যে সুতীব্র কামনা, তাহারই নাম কাম। ইহা কেবল এক মহাভাবময়ী রাধিকাতেই পরিতৃপ্ত হয়; অন্যত্র তাহা তৃপ্ত হইতে পারে না। আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনাকে কাম বলা যায় বটে; কিন্তু তাহা আমাদের নরকের কারণ। ভগবৎসেবার জন্য যে সুতীব্র বাসনা বা লোভ; তাহার নাম 'কাম' নহে, উহা নির্ম্মল প্রেম। জীবকে কামে মজায়, প্রেমে তরায়। গোপীদিগের

নিঃস্বার্থ প্রেম কেবল কৃষ্ণকে সুখ দিতে। তাহাতে কামনার গন্ধ নাই; সুতরাং উহা প্রেম। ভগবান্‌ যখন গোপীদিগের ও শ্রীরাধিকার এই সুনির্ম্মল প্রেম আস্বাদন জন্য সুতীব্র লালসাযুক্ত হয়েন; তখনই তাঁহাকে শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি বলা যায়।'

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, 'সাধ্যবস্তু এই পর্য্যন্তই, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার অনুগ্রহে এ সব বুঝিলাম। কিন্তু সাধন বিনা তো সাধ্যবস্তু লাভ হইতে পারে না; অতএব কৃপা করিয়া উহা পাইবার উপায় বলিয়া দাও?'

রামানন্দ উত্তর করিলেন, 'আমি তোমার ক্রীড়ার পুতুল; যা' বলাইতেছ, তাই বলিতেছি। আমার মুখে তুমিই বক্তা; আবার তুমিই শ্রোতা। সাধনের রহস্য কথা বর্ণন করি, শুন। রাধাকৃষ্ণের এই গূঢ় লীলা, ঐশ্বর্য্য ভাবের তো কথাই নাই, মাধুর্য্য ভাবেও জানা যায় না। দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবেরও অগোচর। একমাত্র সখীদিগেরই ইহাতে অধিকার। সখীরাই এই লীলা পুষ্টি করিয়া বিস্তার করেন; আবার তাঁহারাই ইহা আস্বাদন করেন। সখীদিগের আনুগত্য ভিন্ন ইহা পাইবার উপায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সখীদিগের প্রেম, নিঃস্বার্থ। তাঁহারা কৃষ্ণলীলার সুখ আস্বাদন করিতে চাহেন না; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকার মিলন করাইয়াই অধিক সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীরাধা ব্রজকুমুদবিধু শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কল্পলতা; আর সখীগণ সেই লতিকার পত্রপুষ্প। লীলামৃত জলে এই লতিকা অভিসিঞ্চিত হইলে, পল্লবাদি তাহাতেই সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; তাহাদের জন্য পৃথক্‌ সিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না। এই নিঃস্বার্থ গোপীপ্রেম লাভ করিতে না পারিলে রাধাকৃষ্ণের যুগল ভাব লাভের উপায়ান্তর নাই। বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, জাতি, কুল, লজ্জা, মান, ভয়ভাবনা, যোগ তপস্যার আশা ছাড়িয়া দিয়া, সুতীব্র অনুরাগময়ী ভক্তিপথে সিদ্ধভাবময়ী কোন গোপীর ভাবে আপনাকে অনুভাবিত করিয়া, তত্তৎ গোপীভাবামৃত লাভ করিতে হয়। সাধক দেহে গোপীর সিদ্ধদেহ আরোপ করিয়া গোপীর আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। তবে কালে সিদ্ধিলাভ করিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগল ভাব লাভে সমর্থ হইতে পারা যায়।'

এই কথা ...

এবং প্রেমাবেশে উভয়ে গলাগলি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভাবের জমাটে কোন্ দিক্ দিয়া রাত্রি পোহাইয়া গেল, কেহ বুঝিতে পারিলেন না। বিদায়কালে রামরায় বলিলেন, "যদি আমাকে কৃপা করিতে এখানে আসিয়াছ, তবে দিন দশ থাকিয়া আমার পামর মনকে পরিশুদ্ধ কর।"

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, "তোমার গুণ শ্রবণে যেমন আসিয়াছিলাম, তেমনি রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম। বুঝিলাম, রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসের তোমাতেই সীমা। দশদিন কি, আমি যত দিন বাঁচিব, তোমার সঙ্গ ছাড়িতে পারিব না। নীলাচলে দুইজনে একত্র থাকিয়া মধুর কৃষ্ণ কথায় কাল কাটাইব। ইহার পর সেদিনকার জন্য রাজা রামানন্দ রায় বিদায় হইয়া গেলেন। পরদিন সন্ধ্যার পর উভয়ে আবার মিলিত হইলে অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিদ্যা মধ্যে কোন্ বিদ্যা সার?' রামানন্দ উত্তর করিলেন,—'কৃষ্ণ ভক্তি বিনা আর বিদ্যাই নাই।" শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোন্ কীর্ত্তি বড়?'

উত্তর। কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যার খ্যাতি।

প্রশ্ন। শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি কি?

উত্তর। যা'র রাধাকৃষ্ণ প্রেম আছে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী।

প্রশ্ন। দুঃখের মধ্যে গুরুতর কি?

উত্তর। কৃষ্ণভক্তি বিরহের ন্যায় আর দুঃখ নাই।

প্রশ্ন। মুক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর। যাহার কৃষ্ণপ্রেম আছে।

প্রশ্ন। গানের শ্রেষ্ঠ কি?

উত্তর। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি গীত।

প্রশ্ন। শ্রেয়ঃ কি?

উত্তর। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ বিনা জীবের শ্রেয়ঃ নাই।

প্রশ্ন। স্মৃতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?

উত্তর। কৃষ্ণনামগুণ লীলাই প্রধান স্মরণ।

প্রশ্ন। ধ্যেয়ের মধ্যে কি ধ্যান কর্ত্তব্য?

উত্তর। রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান।

প্রশ্ন। কোন্ স্থানে বাস কর্ত্তব্য?

প্রশ্ন। শ্রেষ্ঠ শ্রবণ কি ?

উত্তর। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই কর্ণরসায়ন।

প্রশ্ন। শ্রেষ্ঠ উপাস্য কি ?

উত্তর। রাধাকৃষ্ণ—যুগল নাম।

প্রশ্ন। মুক্তিবাঞ্ছাকারী ও ভক্তিবাঞ্ছাকারীর মধ্যে প্রভেদ কি ?

উত্তর। যেমন স্থাবর দেহে ও দেবদেহে। অরসজ্ঞ কাক নিমের তিক্ত ফল খায়, আর রসজ্ঞ কোকিল আম্র মুকুলের মাধুর্য্য পান করে; এই প্রভেদ।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর নৃত্য কীর্ত্তনে রজনী অবসান হইলে রামানন্দ রায় স্বস্থানে গমন করিলেন। আট দশ দিন এমনি করিয়া কাটিয়া গেলে রামানন্দ রায় গৌরের প্রেমাবেগ ও অপূর্ব্ব ভাবলহরী যতই দেখিতে পাইলেন, ততই তাঁহার অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। এক রাত্রিতে রামরায় গৌরচরণে নিবেদন করিলেন, "এই কয় দিনে কৃষ্ণ- ।, রাধাতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, কত তত্ত্বই আমার হৃদয়ে কাশিত হইল। আমি জন্মেও এত তত্ত্ব কখন জানিতাম না। বুঝিলাম, গবান্ নারায়ণ যেমন ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তুমি পা করিয়া অলক্ষ্যেতে এত তত্ত্ব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করিয়া দিয়াছ। এ ক্তি অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন কাহারও নাই। তিনি বাহিরে কাহাকে কছু না বলিয়া হৃদয়ে বস্তুতত্ত্ব উন্মীলিত করিয়া দেন। এখন আমার মনে কটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; কৃপা করিয়া তাহা অপনয়ন করিয়া দাও'।

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ?' রামানন্দ উত্তর করিলেন, 'বলিব ? প্রথমে তোমাকে সন্ন্যাসীরূপ দেখিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি যেন শ্যাম- প। আর যেন তোমার সম্মুখে এক কাঞ্চনময়ী পঞ্চালিকা রহিয়াছে; তাঁহার গৌরকান্তির আভায় তোমার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। আবার দেখিতেছি, যেন তুমি বংশীবদন শ্যামসুন্দররূপে ভাবময় সচঞ্চল আঁখিতে আমাকে খিতেছ। ইহার কারণ কি ? আমাকে অকপট ভাবে বল। এ যে দেখি ড়ই চমৎকার!' গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন, 'রাধাকৃষ্ণে তোমার কি না গাঢ় প্রেম, সেই জন্য এরূপ দেখিতেছ। প্রেমিক মহাজনগণ প্রেমনেত্রে বরজঙ্গমেও শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পান। স্থাবর জঙ্গমের মূর্ত্তি তাঁহাদের ত্রগোচর হয় না. সর্ব্বত্রই ইষ্টদেব স্ফুরণ হইয়া থাকে। শুধু তাই কি

শাস্ত্রে লিখিত আছে ভাগবতোত্তম ব্রহ্মরূপাধিষ্ঠানে সকলই পরিপূর্ণ দেখেন। তাঁহার নিকট তরুলতা, পত্রপুষ্প, সকলেই আপনাদের মধ্যে প্রকাশমান পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া যেন মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে। তুমি রাধাকৃষ্ণের প্রেমিক ভক্ত; সর্ব্বত্র রাধাকৃষ্ণ দর্শন করা তোমার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়।'

যখন এই আলাপ হইতেছিল, তখন উভয়েই প্রেমে ভরপূর। রামানন্দ কৃত্রিম কোপ প্রকাশিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'প্রভু! আমার কাছে আর চালাকি করিও না। আমি সব বুঝিয়াছি। শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া গূঢ়রূপে নিজ রস আস্বাদন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া আনুসঙ্গে ত্রিভুবন প্রেমে ভাসাইলে। এখানে আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়া আবার কপট ব্যবহার করিতেছ কেন?'

গৌরচন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, 'রামরায়! আমিও এক পাগল, আর তুমিও এক পাগল। আমরা উভয়েই সমান পাগল। আমার পাগ্‌লামি শুনিলে লোকে উপহাস করিবে, সে জন্য কোথায়ও কিছু বলি না। তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমার গৌরদেহ নয়; রাধাঙ্গস্পর্শ জন্য গৌরাঙ্গ হইয়াছে। শ্রীরাধিকা তো ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা আর কাহাকেও স্পর্শ করেন না। আমি তাঁহার ভাবে স্বীয় আত্মা অনুভাবিত করিয়া কৃষ্ণমাধুর্য্যরস আস্বাদন করিতেছি। এ কথা অন্যের নিকট গোপ্য হইলেও তোমার কাছে লুকাইতে পারি না। কথা গোপনে রাখিও, লোকে শুনিলে উপহাস করিবে।' এই বলিয়া গৌরচন্দ্র নাকি রামানন্দকে রসরাজ, মহাভাব, দুই রূপে বিবর্ত্তিত অপূর্ব্ব রূপ দেখাইয়াছিলেন। রামানন্দ সেরূপ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলে, গৌর তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ধরিয়া রাখিলেন। মূর্চ্ছাবসানে রামানন্দ রায় গৌরের সন্ন্যাসী রূপ দেখিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট রূপ স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় আশ্চর্য্য দর্শন ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন।

এইরূপ প্রেমালাপে, রসলীলা ও তত্ত্ব বিচারে, অপরূপ দর্শনে, কৃষ্ণ কথারঙ্গে, শ্রীচৈতন্য বিদ্যানগরে রাজা রামানন্দের সহিত দশরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, তামা, কাঁশা, রূপা সোনা, রত্ন চিন্তামণি মিশ্রিত কোন খনি পাইয়া খুঁড়িতে থাকিলে লোক যেমন ক্রমে ক্রমে উত্তম বস্তু লাভ করে; তেমনি রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এ কথা ও কথা হইতে হইতে কতই মূল্যবান তত্ত্বকথা আলোচিত হই

ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে তিনি চরিতামৃতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই ছায়া লইয়া এই পরিচ্ছেদের বৃত্তান্ত লিখিত হইল। রসরাজ মহাভাব মূর্ত্তি দর্শনে রামানন্দের মূর্চ্ছা ও রাধাঙ্গ স্পর্শনে গৌরচন্দ্রের আত্ম প্রকাশ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা, কি ভাবে হইয়াছিল, তাহা সুরসিক পাঠক আপন আপন আলোকে বুঝিয়া লইবেন।

দশম রাত্রির শেষে গৌরচন্দ্র রামানন্দের নিকট বিদায় চাহিয়া বলিলেন, 'তুমি বিষয় ছাড়িয়া নীলাচলে যাইবার উদ্যোগ কর; এদিকে আমিও তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অচিরে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। উভয়ে এক সঙ্গে থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ আলাপনে সময় কাটাইব।' পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনের পর রামানন্দ রায় বিদায় হইয়া গেলে গৌরচন্দ্র শয়ন করিলেন এবং রজনী অবসানে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে বিদ্যানগর পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় চলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণাপথে—তীর্থ দর্শন।

অতঃপর গৌরচন্দ্র যে সব তীর্থ দর্শন করিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা তাহার আনুক্রমিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই; সংক্ষিপ্ত রূপে ইতস্ততঃ উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে তৎকালে কর্ম্মী, জ্ঞানী, বৌদ্ধ, রামানুজ সম্প্রদায়, শ্রীবৈষ্ণব, মধ্বাচার্য্যমঠের তত্ত্ববাদী, প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের সকলকেই শ্রীচৈতন্য তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয়নিশান উড্ডীন করিলেন। বিদ্যানগরের পর শ্রীচৈতন্য গৌতমীগঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে মহেশ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। গোদাবরীর নামান্তর গৌতমী। বোধ হয়, গোদাবরীর শাখান্তর বৈনগঙ্গাই এখানে গৌতমীগঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহার পর তিনি আহোবালেম্ নগরে যাইয়া রামানুজ প্রতিষ্ঠিত মঠ ও নৃসিংহ বিগ্রহ দর্শন করিয়া সিদ্ধবট নামক স্থানে রামসীতা দেখিলেন। সিদ্ধবটে একটী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অতিথি সৎকার করিয়াছিল।

এই ব্রাহ্মণ [illegible]

স্কন্দক্ষেত্রে স্কন্দ দর্শন করিয়া ত্রিমঠে যাইয়া বামনমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ত্রিমঠ হইতে তিনি পুনর্ব্বার সিদ্ধবটে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত রামভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। কিন্তু এবারে এক আশ্চর্য্য দেখিলেন। ঐ বিপ্র তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত রামনাম ছাড়িয়া এখন নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপিতেছে। আহারান্তে চৈতন্যদেব তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ বলিল, "তোমার প্রথম দর্শনপ্রভাবে আমার চিরদিনের অভ্যাস ঘুচিয়া এই নূতন অভ্যাস হইয়াছে। তোমাকে কৃষ্ণনাম করিতে দেখিয়া আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক একবার 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়াছিলাম। সেই হইতে রাম নামের পরিবর্ত্তে আমার জিহ্বা হইতে কেবল কৃষ্ণনামই স্ফুরিত হইতেছে ও আমার চিরকালের স্বভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম বাচক রামনামের ও কৃষ্ণনামের মহিমা ব্যাখ্যা করিয়া কৃষ্ণনামের গৌরবাধিক্য বর্ণন করিল এবং বিনীতভাবে নিবেদন করিল যে, "আপনাকে কৃষ্ণ স্বরূপ মনে হইতেছে।" তখন শ্রীচৈতন্য তাহাকে কৃপা করিয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে বৃদ্ধ কাশীতে আসিয়া শিব দর্শন করিলেন। এবং তথা হইতে নিকটবর্ত্তী কোন এক সম্ভ্রান্ত গ্রামে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই গ্রামে তৎকালে ব্রাহ্মণ সজ্জন বহুবিধ লোকের বাস ছিল। তার্কিক, মীমাংসক, দার্শনিক, মায়াবাদী, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক, প্রভৃতি নানা পণ্ডিতগণ এখানে বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন। ইহা ভিন্ন এখানে বৌদ্ধদিগেরও এক আশ্রম ছিল। কথিত আছে, এই সকল পণ্ডিতদিগের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধিয়াছিল; এবং তিনি স্বীয় অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে সকলকে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গৌরের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়া লক্ষ লক্ষ লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিল। ইহা শুনিয়া বৌদ্ধাচার্য্য বিচারজিগীষু হইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে গৌরের নিকট আসিয়া নব প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার নয় প্রশ্নের বিচার্য্য বিষয় এই :—

১। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা নহেন, তিনি অনন্ত জ্ঞানবস্তু মাত্র। ২। জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহা অবিদ্যা সমুৎপন্ন। ৩। অহং তত্ত্ব কি? ৪। পরলোকের অস্তিত্ব সম্ভবে কি না? ৫। বুদ্ধ দৃষ্টি লাভের উপায় কি? ৬। নির্ব্বাণতত্ত্ব কি? ৭। বৌদ্ধ দর্শন। ৮। বেদাদি অপৌরুষেয় কি রূপে? ৯। সগুণ ও নির্গুণবাদের প্রকৃতি কি? লিখিত আছে

যে, শ্রীচৈতন্য স্বীয় অসাধারণ তর্কশক্তি প্রভাবে এই সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বৌদ্ধমতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দেখিয়া শুনিয়া উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী অবাক্ হইয়া গেলেন এবং বৌদ্ধাচার্য্য লজ্জায় অধোবদন হইলেন। গৌরের বিষ্ণুভক্তির কথা শুনিয়া কতকগুলি দুষ্ট বৌদ্ধ তর্কে হারিয়া গিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে নিভৃতে যুক্তি করিয়া এক থালিতে কতক অপবিত্র অন্ন পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিতে আনিতেছিল। কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীলা! হঠাৎ এক বৃহদাকার পক্ষী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া সেই থালি ঊর্দ্ধে তুলিতে গেলে বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় পড়িল। থালিখানি তের্ছে পড়াতে আচার্য্যের মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; আচার্য্য ধরায় পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। বৌদ্ধগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং শ্রীচৈতন্যের কোপে ঐরূপ হইয়াছে, মনে করিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া মিনতি করিয়া তাহাদের গুরুকে বাঁচাইতে বলিতে লাগিল। গৌর তাহাদিগকে আচার্য্যের কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে রামকৃষ্ণ, হরিনাম, উচ্চারণ করিতে বলিলে তাহারা ঐরূপ করিল। তখন বৌদ্ধাচার্য্য চৈতন্য লাভ করিয়া গৌরকে বিনয় মিনতি করিতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী দেখিয়া বিস্মিত হইল। এই প্রস্তাবের মূলে কতটুকু সত্য আছে, জানি না। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন; তাহাই এখানে উল্লিখিত হইল।

মহাপ্রভু উপরোক্ত স্থান হইতে ত্রিপদী ত্রিমল্লে যাইয়া চতুর্ভুজ বিষ্ণু বিগ্রহ দর্শন করিয়া ব্যঙ্কটগিরি হইয়া ত্রিপদী নগরে রামসীতা দেখিতে পাইলেন। মান্দ্রাজের উত্তর পশ্চিমে ত্রিপতির পর্ব্বত। ইহারই শৃঙ্গ বিশেষের নাম ব্যঙ্কটাদ্রি। ব্যঙ্কটগিরি মান্দ্রাজের ৩৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। শকাব্দার একাদশ শতাব্দীতে এখানে রামানুজাচার্য্য শিবমন্দির অধিকার করিয়া বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপিত করেন। ত্রিপদীনগর ত্রিপতির পাহাড়ে অবস্থিত। এখানেও রামানুজ প্রতিষ্ঠিত রামমূর্ত্তি রহিয়াছে। তাহার পর গৌরচন্দ্র পানা নরসিংহ দর্শন করিয়া শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে আসিয়া শিবপার্ব্বতী ও লক্ষ্মীনারায়ণ দেখিতে পাইলেন। মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বর্ত্তমান চিঙ্গলপট্টু জেলায় পেলার নদীর তীরে কঞ্জীভরম্ বা কাঞ্চীপুরম্ নগর এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাকেই বৈষ্ণবগ্রন্থে শিবকাঞ্চী

ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিম বর্ত্তমান চিঙ্গলপট্টু ও আর্কট জেলার স্থানে স্থানে এই সকল তীর্থ দর্শন করিলেন, যথা;— ত্রিমল্ল, ত্রিকালহস্তী, পক্ষতীর্থ, বৃদ্ধকাল, পীতাম্বর ও শিয়ালী ভৈরবী। তাঞ্জোরের উত্তরপূর্ব্বে শিয়ালী নগর দৃষ্ট হয়; এখানে ভৈরবীর মূর্ত্তি আছে। অনন্তর শচীনন্দন কাবেরী নদীর তীরে মহাবন, দেবস্থান, প্রভৃতি স্থানে মহাদেব দর্শন করিয়া শৈবদিগকে বৈষ্ণব করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে কুম্ভকর্ণ তীর্থ, পাপনাশন তীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া রঙ্গনাথ দর্শন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন। মাদুরার পূর্ব্বদিকে শ্রীরঙ্গ দ্বীপ কাবেরী নদীর দুইটী শাখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। কথিত আছে যে, রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক রঙ্গনাথ বিষ্ণুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীরঙ্গ-দ্বীপ রামানুজ বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থস্থান। রঙ্গনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন দেখিয়া বেঙ্কট ভট্টনামে সেই স্থানবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ গৌরের প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইলেন; এবং কীর্ত্তনাবসানে যত্নের সহিত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন। বেঙ্কটভট্ট শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক। তাঁহারা তিন সহোদর—ত্রিমল্ল ভট্ট, বেঙ্কট ভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী। বেঙ্কটের পুত্র গোপাল ভট্ট তৎকালে বালক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেম-চেষ্টা দেখিয়া বেঙ্কট এতই মুগ্ধ হইলেন যে, ভোজনান্তে তাঁহাকে বলিলেন 'সম্প্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত। এই চাতুর্ম্মাস্যে তীর্থ পর্য্যটন অসম্ভব। অতএব আমি নিবেদন করি যে, এই চারিমাস আপনি এখানে থাকিয়া সুখে সময়াতিপাত করুন্।' শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে বেঙ্কট ভট্ট নিজগৃহে তাঁহার বাসস্থানাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া অতিভক্তির সহিত গৌরের সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য ভট্টগৃহে চারিমাস কাল সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে কাবেরীতে স্নান করিয়া রঙ্গনাথ দর্শন করা, দুই সন্ধ্যায় সেখানে হরিনাম সংকীর্ত্তন ও নৃত্যাদি বিলাস করা, ভট্টের সহিত ভগবদ্বিষয়ক কথোপকথন ও হাস্য পরিহাস করা, তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। বেঙ্কটভট্টের স্বগোষ্ঠিবর্গ গৌরের অলৌকিক চরিত যতই দেখিতে লাগিল, ততই তাহাদের তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি হইতে লাগিল। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণসজ্জন ও অপরাপর লোক তাঁহা

সকলেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া গেল। শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রের ব্রাহ্মণগণ শ্রীচৈতন্যকে স্বস্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে নিমন্ত্রণ সংখ্যা এতই অধিক হইয়া পড়িল যে, চারি মাসকাল এক এক দিন করিয়া খাইয়াও গৌরচন্দ্র সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বালক গোপাল ভট্ট সর্ব্বদা গৌরের সঙ্গে কালযাপন করিতেন ও তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালনে তৎপর থাকিতেন। থাকিতে থাকিতে গৌরের অপরূপ রূপমাধুরী, অলৌকিক প্রেমভক্তি এবং সুমধুর ব্যবহার তাঁহার শৈশব অন্তঃকরণে চিরমুদ্রিত হইয়া গেল, আর অপনীত হইল না। ইহার পর ইনি পিতা মাতার স্বর্গারোহণে গৃহ, পরিজন ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনে যাইয়া রূপসনাতনের সঙ্গে মিলিত হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে গোপালভট্ট ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামীরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

রঙ্গনাথের মন্দিরে এক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন প্রাতে গীতা পাঠ করিত। ব্রাহ্মণ মূর্খ, ব্যাকরণজ্ঞানে বঞ্চিত; যাহা উচ্চারণ করিত, সকলই অশুদ্ধ ও বিকৃত। তাহা শুনিয়া কত লোক তাহাকে পরিহাস করিত, কেহ গালি দিত ও নিন্দা করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ সে সব গ্রাহ্য না করিয়া আবিষ্টচিত্তে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা যতক্ষণ সমাপ্ত না হইত, ততক্ষণ পড়িতে ছাড়িত না। আরও আশ্চর্য্য এই যে, সেই মূর্খ ব্রাহ্মণ যাহা পড়িত, তাহার এক বর্ণও সে যে বুঝিতে পারিত, তাহার পাঠ শুনিয়া ইহা কেহই মনে করিতে পারিত না। অথচ অধ্যয়নকালে তাহার নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভিজিয়া যাইত; পুলকে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইত; কম্প, হুঙ্কার, স্বেদ, প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ সকল দেখা যাইত। শ্রীচৈতন্য দেবালয়ে যাইয়া প্রতিদিন এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। এক দিন তাহার পাঠ সমাপ্ত হইলে গৌর তাহাকে নিভৃত স্থানে ডাকিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার গীতা পাঠে এত সুখ হয়, ইহার কারণ কি? আপনি ইহার কি অর্থ আস্বাদন করিয়া থাকেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 'আমি মূর্খ, শব্দার্থজ্ঞান আমার কিছুই নাই; অশুদ্ধ, শুদ্ধ কিছুই জানি না। কিন্তু যতক্ষণ পড়িতে থাকি, ততক্ষণ দেখি যেন অর্জ্জুনের রথে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া মৃদু মধুর বাক্যে অর্জ্জুনকে [illegible]

চ্ছ্বাস হয়। এই জন্য লোকের উপহাস সহিয়াও আমি গীতা পাঠ ছাড়িতে পারি না।"

শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের এই সরল ও অকৃত্রিম বিশ্বাসের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন "গীতাপাঠ আপনারই সার্থক! ইহাতে আপনিই শ্রেষ্ঠ অধিকারী"। এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমালিঙ্গন পাইয়া ব্রাহ্মণের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল; তাহার মন নির্ম্মল হইল এবং গৌরের মহিমা বুঝিতে পারিয়া চারি মাস কাল ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কৃতার্থ হইয়া গেল।

বেঙ্কট ভট্টের সঙ্গে গৌরের সখ্যভাব দিন দিন গাঢ়তর হইতে লাগিল। বেঙ্কট এক জন সোজা লোক; লক্ষ্মীনারায়ণে অগাধ বিশ্বাসী। গৌরচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে সময়ে সময়ে কত পরিহাসই করিতেন। এক দিন তিনি হাসিতে হাসিতে ভট্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি হইয়াও গোয়ালার ছেলে কৃষ্ণকে কেন ভজিতে চাহিয়াছিলেন? আর ইহাতে তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মই বা কিরূপে রক্ষা হইল?" ভট্ট গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই তত্ত্ব। কেবল কৃষ্ণেতে লীলাধিক্য, এই মাত্র। ইহাতে লক্ষ্মী নারায়ণের ভার্য্যা হইয়াও কৃষ্ণ ভজন করিতে চাহিলে তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের হানি হইতে পারে না। আমার মোটা বুদ্ধিতে তো এই বুঝি; ইহাতে পরিহাস করিতেছ কেন?"

শ্রীচৈতন্য ততোধিক পরিহাসব্যঞ্জক ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা তা যেন হ'লো; কিন্তু শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গে রাসকেলি করিতে অধিকার পান নাই। অথচ শ্রুতিগণ তপস্যা করিয়া রাসে অধিকারিণী হইয়াছিলেন। ইহার কারণ কি?"

ভট্ট এবারে কিছু মুস্কিলে পড়িলেন; দিশা না পাইয়া উত্তর করিলেন, "আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; ভগবানের অগাধ লীলার কি বুঝি? তুমি যদি বুঝাইয়া দাও, তবে কৃতার্থ হই।"

গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ মাধুর্য্য পূর্ণ ও সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এমন কেহ নাই যে, তাঁহাকে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে। অথচ মাধুর্য্যগুণে ব্রজবাসী জন, কখন পুত্র জ্ঞানে উদুখলে বাঁধে, কখন সখা জ্ঞানে খেলায় হারাইয়া কাঁধে

চড়ে, আবার কখন সামান্য নায়ক জ্ঞানে তাঁহাতে আসক্ত হয়; অথচ কেহই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না। ব্রজজন ভিন্ন এ লীলায় অন্যের অধিকার নাই। সেই জন্য শ্রুতিগণকেও ব্রজদেবীর শরীর লইয়া এই লীলা সুখের অধিকার লাভ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা না করিয়া দেবীদেহে রাসবিলাস অভিলাষ করিয়াছিলেন; তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। কৃষ্ণ আমার গোয়ালা; গোপীগণ তাঁহার প্রেয়সী। দেবী বা অন্য স্ত্রী, কৃষ্ণ অঙ্গীকার করেন না। এখন বুঝিলে তো, তোমার লক্ষ্মী কেন রাস পান নাই।"

বেঙ্কট ভট্টের মনে এত দিন এই অভিমান ছিল যে, নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহার ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এক্ষণে গৌরের মুখে নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবাধিক্য শুনিয়া তিনি ম্লানমুখে নীরব হইয়া থাকিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিয়া পরিহাসটীকে আরও গভীর করিবার জন্য বলিলেন "ভট্টজি! সন্দেহ করিও না। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্; নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যরূপ বিলাস বিগ্রহ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের এই অসাধারণত্ব হেতু নারায়ণের শক্তি লক্ষ্মীর কৃষ্ণের প্রতি এত তৃষ্ণা। অথচ নারায়ণ গোপীদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে একটুও সমর্থ নহেন। কোন সময়ে গোপীদিগকে কৌতুক করিতে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ ধরিয়াছিলেন। কিন্তু গোপীরা তাহা দেখিয়া মুখ ফিরাইয়াছিলেন।

এই সব কথায় বেঙ্কট ভট্টের মুখ শুকাইয়া গেল এবং কৃষ্ণ অপেক্ষা স্বীয় অভীষ্ট নারায়ণের অপকর্ষতা শুনিয়া তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। পরম কারুণিক শ্রীচৈতন্য তাঁহার দুঃখ নিবারণ জন্য পরিহাস রাখিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বন্ধো! দুঃখ করিও না; আমি তোমাকে পরিহাস করিয়াছি। নারায়ণে তোমার যেরূপ অবিচলিত বিশ্বাস; তাহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বাস্তবিক কথা এই যে, ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ বুদ্ধি করা মহা অপরাধের কথা। যেমন একই মণি আধারাদি ভেদে নীল, লোহিত, পীত, নানা বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া পৃথক্‌রূপে শোভা ধারণ করিয়া থাকে; তেমনি উপাসনাভেদে একই ভগবান্ নানা ভক্তের চিত্তে যথাসাধ্যরূপ নানা রূপে প্রতিভাত হইয়া দেখা দেন। ইহাতে লক্ষ্মী ও গোপী, কৃষ্ণ ও নারায়ণে ভেদ করিবার কোন কারণ নাই। পরিহাস করিয়া তোমার প্রাণে যে ক্লেশ দিলাম, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর।"

এই কথা শুনিয়া বেঙ্কট ভট্ট হর্ষোৎফুল্ল নয়নে গৌরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ হইয়া ও তাঁহার অসাধারণ ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, "আমি অতি পামর জীব; ধন্য আমি যে লক্ষ্মী নারায়ণের কৃপায় তোমার এখানে শুভাগমন হইয়াছে। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; তা'ই কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও ভক্তিতত্ত্ব শুনাইয়া কৃতার্থ করিলে।" ভট্ট এই বলিয়া গৌরের চরণে পড়িলেন ও গৌরও তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে সুখী করিলেন।

এইরূপে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ রঙ্গনাথ দর্শন করিয়া পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। বেঙ্কটভট্ট সগোষ্ঠিবর্গে কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। তখন শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং নীলাদ্রির শৃঙ্গ বিশেষ ঋষভ পর্ব্বতে আসিয়া নারায়ণ দর্শন করিলেন। এখানে আসিয়া গৌরচন্দ্র শুনিলেন যে, মাধবেন্দ্র পুরীর প্রধান শিষ্য ও তাঁহার গুরু ঈশ্বরপুরীর অধ্যাত্ম ভ্রাতা, পরমানন্দপুরী তথায় চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিতেছেন। গৌর অতি মাত্র ব্যগ্র হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং একত্র কৃষ্ণ-কথারঙ্গে তিন দিন যাপন করিলেন। পরমানন্দ পুরী বলিলেন, "আমি সম্প্রতি পুরুষোত্তম দেখিয়া বঙ্গদেশে গঙ্গাস্নানে যাইব।" গৌর বলিলেন, "আপনার নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে আমার ইচ্ছা; আপনি আমার প্রতি সদয় হইয়া বঙ্গদেশ হইতে যদি পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; তবে ভাল হয়। আমিও তত দিন সেতুবন্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার সহিত মিলিত হইতে পারিব।" ইহার পর পুরী মহাশয় পুরুষো-ত্তমে চলিয়া গেলেন এবং গৌরচন্দ্র শ্রীশৈলে আসিয়া শিবদুর্গা দর্শন করিয়া কামকোষ্ঠি বা বর্ত্তমান কম্বুকোনম্ নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই নগর তাঞ্জোরের উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত এবং একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। ইহা প্রাচীন কোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। কামকোষ্ঠি হইতে গৌরচন্দ্র দক্ষিণ মথুরা বা মাদুরা নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই নগর ভীগে নদীর তীরে। কিন্তু বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন যে, এখানে গৌরচন্দ্র কৃতমালা নামক নদীতে স্নানাবগাহন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ভীগের নামই কৃতমাল হইবে। সে যাহা হউক, এই নগরে একটী রামভক্ত ব্রাহ্মণ গৌরকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বভবনে লইয়া গিয়া বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাকা-দির কোনই আয়োজন করিলেন না। তাহা দেখিয়া শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞা-

করিলেন, 'পাক হইল না কেন?' ব্রাহ্মণ রামভাবে বিভোর ছিলেন, উত্তর করিলেন, 'কি করিব মহাশয়! আমার অরণ্যে বাস, বনের মধ্যে তো পাক সামগ্রী কিছু পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণ বন্যশাক, ফল মূল, আনিতে গিয়াছেন; আসিলে সীতা ঠাকুরাণী রন্ধন করিবেন।' গৌরচন্দ্র তাঁহার উপাসনার ভাব দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ আস্তেব্যস্তে পাক করিয়া অতিথিকে ভোজন করাইয়া নিজে উপবাসী থাকিলেন। গৌর সুধাইলে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন যে, "জগন্মাতা জগৎলক্ষ্মী সীতাদেবীকে রাক্ষসে স্পর্শ করিয়াছে; এও কি প্রাণে সয়? আমার জীবনে কাজ নাই, জলে প্রবেশিয়া মরিব?" চৈতন্যদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "আপনার বুঝিবার ভুল হইয়াছে; সীতার মূর্ত্তি প্রাকৃত নয়: উহা চিদানন্দময়ী। তাহা স্পর্শ করিবার শক্তি দূরে থাকুক, প্রাকৃত চক্ষু দর্শন করিতে সমর্থ নহে। রাবণের সাধ্য কি সীতাকে হরণ করিতে? সে সীতাকে স্পর্শ করিতে গেলে সীতা অন্তর্দ্ধান হইয়া ছিলেন। মায়াময়ী সীতাকৃতি রাবণ ছুঁইয়াছিল মাত্র। আমার এই ব্যাখ্যা ঠিক; আপনি বিশ্বাস করিয়া দুঃখ দূর করুন।" ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইলে গৌরচন্দ্র দুর্ব্বেসন নগরীতে রঘুনাথ, মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দেখিয়া সেতুবন্ধে যাইয়া ধনুতীর্থে স্নান করিলেন। কৃতমালার সাগরসঙ্গম স্থানে সেতুবন্ধ অবস্থিত। সেখানে নৌকায় উঠিয়া ধনুঃ প্রণালী পার হইয়া রামেশ্বর দ্বীপে যাইতে হয়। গৌরচন্দ্র রামেশ্বর শিব দর্শন করিয়া বিশ্রামান্তে বিপ্রসভায় কূর্ম্ম পুরাণ শুনিতে গেলেন। সেখানে পতিব্রতার উপাখ্যান মধ্যে রাবণ কর্ত্তৃক মায়া সীতাহরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া ও নিজের ব্যাখ্যার পোষক প্রমাণ পাইয়া তাঁহার পরিচিত রামভক্ত ব্রাহ্মণের জন্য সেই পুথি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। তদনন্তর তিনি পুনরায় দক্ষিণ মথুরায় আসিয়া সেই পুস্তক রামদাসকে দিলে তিনি অতি আনন্দিত হইলেন এবং নানা প্রকারে গৌরচন্দ্রের স্তব করিয়া সেদিন অতিথি সৎকার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। শ্রীচৈতন্য এখন তাম্রপর্ণী নদীর তীরে তীরে পাণ্ড্য রাজ্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই রাজ্য বর্ত্তমান টীনিভেলী জেলার অন্তর্গত; দক্ষিণমথুরা উহার রাজধানী ছিল। এই স্থানে বহুতর হিন্দুকীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। তৎপরে গৌরচন্দ্র এই সব স্থান দেখিলেন;— নয় ত্রিপদী, চিয়ড় তালা, তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্র মোক্ষণ, পানাগড়ি, চামতা-

পুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্ব্বতে অগস্ত্যাশ্রম, কন্যাকুমারী এবং আমলীতলা। ইহার পরে শ্রীচৈতন্য মালাবর উপকূলে মল্লার বা মালাবর দেশে আগমন করিলেন। এই দেশ এখন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটী জেলা; প্রধান নগর কালীকট। এখানে আসিলে গৌরের একটী বিপদ্ উপস্থিত হইল। তৎকালে এ দেশে ভট্টমারী বা ভর্ত্তৃহরি নামে এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় ছিল। উহারা ভর্ত্তৃহরিকে স্বীয় সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করে এবং স্ত্রী, পুত্র, অশ্বাদি পশু এবং অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল। ভট্টমারীগণ তাহাকে সুন্দরী স্ত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া ধন ঐশ্বর্য্য দিবে বলিয়া ভুলাইয়া আপনাদের দল মধ্যে আনিয়া রাখিয়া ছিল। শ্রীচৈতন্য জানিতে পারিয়া ভট্টমারীদিগের আড্ডায় গিয়া বলিলেন, "দেখ তোমরাও সন্ন্যাসী, আমিও সন্ন্যাসী। তবে আমার ব্রাহ্মণকে তোমরা আট্‌কাইয়া রাখ; এ কি ভাল হয়?" এই কথা শুনিয়া দস্যু প্রকৃতি ভট্টমারীগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহাকে মারিতে আক্রমণ করিল। কিন্তু কে জানে কি আশ্চর্য্য! তাহাদের অস্ত্র সকল হাত হইতে পড়িয়া পরস্পরের গায়ে আঘাত লাগিল। ইহাতে ভট্টমারীগণ কে কোন্ দিকে পলাইতে লাগিল। তাহাদের স্ত্রী পুত্র কাঁদিয়া ব্যাকুল হইল; একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এই সুযোগে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণদাসকে দেখিতে পাইয়া চুলে ধরিয়া বলে টানিয়া লইয়া দৌড়িতে লাগিলেন এবং সেই দিনেই পয়স্বিনী বা পাপনাশিনী নদীর তীরস্থ কোন ভদ্র গ্রামে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে আদিকেশবমন্দিরে শ্রীচৈতন্য নৃত্যকীর্ত্তন করিলে তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া বহু লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এখানে তিনি "ব্রহ্মসংহিতা" নামক ভক্তিপূর্ণ এক আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাইয়া অতি যত্নের সহিত লেখাইয়া লইলেন। পরবর্ত্তী সময়ে এই গ্রন্থ ও কৃষ্ণকর্ণামৃত তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার পক্ষে অমোঘাস্ত্র হইয়াছিল। ব্রহ্মসংহিতায় গোবিন্দমহিমা ও কৃষ্ণতত্ত্ব অতি বিশদরূপে বর্ণিত আছে। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" ইত্যাদি শ্লোক ব্রহ্মসংহিতার। দুঃখের বিষয় যে, এমন মূল্যবান্ গ্রন্থের প্রথম পাঁচ অধ্যায় ভিন্ন অবশিষ্টাংশ এখন পাওয়া যায় না। তৎপরে গৌরচন্দ্র মধ্বাচার্য্যের দীক্ষা স্থান অনন্তপদ্মনাভে আসিয়া অনন্তেশ্বর শিব দেখিলেন এবং

তথা হইতে শ্রীজনার্দ্দন দেখিয়া পয়োষ্ণি বা পুর্ত্তি নামক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত দেবস্থানে আসিলেন। ইহার পরে তিনি শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গপুরে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শিংহারী মঠে আসিলেন। এই স্থান কোচিন দেশে তুঙ্গভদ্রা নদী তীরে অবস্থিত এবং এখানে শঙ্করাচার্য্য সরস্বতীর পাদ-পীঠের নিকট ভারতী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ তুলব দেশে চতুঃসন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রধান স্থান উদিপী নগরে আসিয়া উড়ুপ কৃষ্ণ দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। এই স্থান সমুদ্র হইতে ১॥ ক্রোশ দূরে। উড়ুপ কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, কোন বণিকের অর্ণবপোত দ্বারিকা হইতে আসিতে তুলব দেশের উপকূলে সমুদ্রমধ্যে জলমগ্ন হয়। এই পোতে গোপীচন্দন মৃত্তিকার মধ্যে বাল গোপাল মূর্ত্তি লুক্কায়িত ছিল। মধ্বাচার্য্যকে স্বপ্নাদেশ হওয়ায় তিনি উহা আনিয়া উদিপী নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। মধ্বাচার্য্যের অনুবর্ত্তীগণকে তত্ত্ববাদী বলা যায়। তত্ত্ববাদীগণ গৌরকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী জ্ঞানে প্রথমে বড় একটা গ্রাহ্য করে নাই; পরে তাঁহার প্রেমভক্তির প্রভাব দেখিয়া সম্মান করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে সাধ্য সাধন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তত্ত্বাচার্য্য কহিলেন, "শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিয়া পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন।" গৌর তাঁহাদিগকে শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ ভক্তের পক্ষে কর্ম্ম ও মুক্তি দুইই পরিত্যাজ্য। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তিযোগে প্রেম ও সেবা লাভই পরম সাধন। তত্ত্ববাদীগণ বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ইহার পর গৌরচন্দ্র নিম্নলিখিত তীর্থগুলি দর্শন করিলেন;—ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ, বিশালা, পঞ্চাপ্সরা, গোকর্ণ শিব, দ্বৈপায়নি, সুপারক, কোলাপুরের দেবালয়াদি এবং পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুর। পাণ্ডারপুর বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ভীম নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা বিঠল বা বিথ্ল ভক্তদিগের প্রধান স্থান। এখানে বিঠল বা বিথ্ল দেবের মন্দির আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ মন্দিরে নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। বিঠল-ভক্তগণ বিঠলদেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাদিগকে এক প্রকার বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। পুণ্ডলিক নামক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সময়ে মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী ঐ গ্রামে কোন ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য এই শুভ বার্ত্তা

পাইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে পুরীকে দর্শন করিলেন এবং প্রেমাবেশে, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীরঙ্গপুরী গৌরের প্রেম, পুলক, অশ্রু, কম্প, দেখিয়া প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, "শ্রীপাদ! উঠ; তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যে, আমার ইষ্টদেবের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে; নইলে এরূপ প্রেম লক্ষণ তো অন্যত্র সম্ভবে না।" শ্রীচৈতন্য বিনীত ভাবে ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিলে উভয়ে প্রেমানন্দে গলাগলি নৃত্য কীর্ত্তন ও ভাবাবেশে ক্রন্দন করিলেন। এক দিন শ্রীরঙ্গপুরী তাঁহার জন্মস্থান কোথায়? জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নবদ্বীপের নাম করিলেন। পুরী উত্তর করিলেন, "আমি আমার গোঁসায়ের সঙ্গে একবার নদীয়ায় গিয়াছিলাম এবং জগন্নাথ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। জগন্নাথ পত্নী শচীদেবী রন্ধন কার্য্যে অদ্বিতীয়া। তিনি আমাদিগকে অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিলেন, তাহার আস্বাদ এখনও ভুলিতে পারি নাই। আহা! তাঁহাদের এক যোগ্য পুত্র অতি অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শঙ্করারণ্য নাম লইয়া দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে এই তীর্থে আসিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।" শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, "পূর্ব্বাশ্রমে শঙ্করারণ্য আমার ভ্রাতা এবং জগন্নাথ আমার পিতা।" কৃষ্ণকথা আলাপনে ও এইরূপ প্রসঙ্গে পাঁচ সাত দিন কাটিয়া গেলে শ্রীরঙ্গপুরী দ্বারকা তীর্থে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অনুরোধে আরও চারি দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া পর্য্যটনার্থে বহির্গত হইলেন এবং বর্ত্তমান হাইদ্রাবাদ রাজ্যে কৃষ্ণবিন্না নদীর তীরে তীরে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এক গ্রামে আসিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে "কৃষ্ণকর্ণামৃত" নামক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মধুর গ্রন্থ অধীত হইতেছে, শুনিতে পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন; এবং অনুসন্ধানে গ্রন্থকর্ত্তা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনের কথা শুনিতে পাইয়া আবিষ্ট হইলেন। অতি যত্নের সহিত তিনি ঐ গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। সিদ্ধান্ত বিষয়ক ব্রহ্ম সংহিতা এবং লীলা বিষয়ক কৃষ্ণকর্ণামৃত, এই দুই গ্রন্থ পাইয়া চৈতন্যদেব মহা আনন্দিত হইলেন এবং ভক্তদিগকে উপহার দিবেন বলিয়া অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দিলেন। তৎপরে তিনি কৃষ্ণার তীর হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে নানা রাজ্য ভ্রমণ করিতে করিতে তাপী বা তাপ্তী নদীর তীরে মাহেশ্বতীপুর নামক গ্রামে আসিয়া নদীতে অবগাহন

করিলেন। কৃষ্ণা হইতে তাপ্তী বহুদূরে; মধ্যে নানা জনপদ অবস্থিত। মাহে-শ্বতীপুরে আসিতে শ্রীচৈতন্য যে যে স্থান দিয়া আসিয়াছিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ নাই। বোধ হয় তিনি বর্ত্তমান হাইদ্রাবাদ রাজ্য ভ্রমণ করিয়া বেরার ও নাগপুরের মধ্য দিয়া তাপ্তী তীরে আসিয়া থাকিবেন। ইহার পর নানা দেশ পরিদর্শন করিতে করিতে গৌরচন্দ্র নর্ম্মদা তীরে আগমন রিলেন এবং ধনুতীর্থ দর্শন করিয়া নির্ব্বিন্ধ্যা বা বর্ত্তমান কালী সিন্ধু নদীতে নাবগাহন করিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি পৌরাণিক ঋষ্যমূখ পর্ব্বত খিয়া দণ্ডকারণ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানকার বনমধ্যে তিবৃদ্ধ, অতিস্থূল, ও অতিউচ্চ, সপ্ত তাল বৃক্ষ ছিল। কথিত আছে শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে আলিঙ্গন করায় তাহারা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। খান হইতে শ্রীচৈতন্য রামায়ণোল্লিখিত পম্পা সরোবরে স্নান করিয়া পঞ্চবটী নে গমন করিলেন এবং তথা হইতে বর্ত্তমান আহম্মদনগরের উত্তর পশ্চিমে াসিক ত্র্যম্বক বা নাসিক নগরে গমন করিয়া ব্রহ্মগিরি হইয়া গোদা-বরীর উৎপত্তি স্থান কুশাবর্ত্তে গমন করিলেন। এখানে গোদাবরীর সপ্ত শাখা মিলিত হইয়া গোদাবরী নামে প্রবাহিত হইতেছে। সপ্ত গোদাবরী দর্শন করিয়া গোদাবরীর ধারে ধারে নানা দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে চৈতন্য প্রভু পুনরায় বিদ্যানগর বা রাজমহেন্দ্রীতে আসিয়া রাজা রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পুনর্ম্মিলনে উভয়েই মহা আনন্দিত হইলেন এবং গৌরচন্দ্র রামানন্দকে স্বীয় তীর্থ বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণ-কর্ণামৃত উপঢৌকন দিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তুমি যে সব সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে মামাকে শুনাইয়াছ, এই দুই গ্রন্থ তাহাই সাক্ষ্য দিতেছে।' রামানন্দ ায় গৌরের সঙ্গে গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া সুখী হইলেন এবং নকল করিয়া লইয়া আসল গ্রন্থ গৌরকে ফিরাইয়া দিলেন। পুনরায় দুই বন্ধুতে পাঁচ সাত দিন রাত্রিতে নানা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। রামানন্দ বলিলেন, 'তোমার ইচ্ছানুসারে আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম। মহারাজ দয়া করিয়া আমাকে নীলাচলে যাইতে আদেশ দিয়াছেন। আমি যাইবার উদ্যোগ করিতেছি।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, 'আমিও তোমাকে লইতে এখানে আসিয়াছি।' রাজা বলিলেন, 'আমার এখনও সব কাজ সারা হয় নাই। বিশেষতঃ ামার সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য কোলাহল থাকিবে। তোমার তাঁহা

ভাল লাগিবে না। তুমি আগে যাত্রা কর, আমি দিন দুশেকের মধ্যে সকল সমাধান করিয়া তোমার অনুগমন করিতেছি।' শ্রীচৈতন্য বিদ্যানগর হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্ব পরিচিত পথে হাঁটিতে হাঁটিতে আলালনাথে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং সঙ্গী কৃষ্ণদাস দ্বারা নিত্যানন্দাদির নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া নিজে পাছে যাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিয়া পথমধ্যে দর্শন পাইয়া সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথের প্রধান পাণ্ডা ও উৎকলরাজের ইষ্টদেব কাশীমিশ্র প্রভৃতি বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোক সমুদ্রতীরে আসিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং সকলে একত্র জগন্নাথদর্শন করিলে শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমের আলয়ে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন ও বন্ধুগণের নিকট তীর্থ যাত্রা বৃত্তান্ত বলিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যের জীবনে এই তীর্থ ভ্রমণ এক মহাব্যাপার। যখন রেলওয়ে ছিল না, রাস্তা ঘাট ভাল ছিল না, বন্যজন্তু ও দস্যু তস্করে দেশ সমাকীর্ণ; সে সময়ে একাকী পদব্রজে দুর্গম পথে এত দেশ ভ্রমণ করা কম পুরুষত্বের পরিচায়ক নহে।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভক্ত সমাগম।

শ্রীচৈতন্য দক্ষিণাপথে গমন করিলে উৎকলরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র এক দিন কটক হইতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিলাম গৌড়দেশ হইতে এক মহাত্মা নীলাচলে আসিয়া আপনার গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন ও আপনাকে বহুকৃপা করিয়াছেন। আমি কি তাঁহার দর্শন পাইতে পারি না?" ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, "আপনি যাহা শুনিয়াছেন, সকলই সত্য। কিন্তু তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী নির্জ্জন স্থানে থাকেন। রাজদর্শন নিষিদ্ধ বলিয়া প্রাণান্তেও রাজসমীপে যান না। তথাচ কোন কৌশলে আপনাকে দেখাইতে পারিতাম; কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।"

রাজা বলিলেন, "জগন্নাথদর্শন ছাড়িয়া দক্ষিণে যাইবার কারণ কি?"

সার্ব্বভৌম উত্তর করিলেন, 'তিনি সামান্য মহাপুরুষ নহেন; সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, মনুষ্য দেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তীর্থ সকলকে পবিত্র করিতেই তিনি তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন।'

রাজা বলিলেন, 'আপনি মহাবিজ্ঞ ব্যক্তি; আপনি যখন তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিতেছেন, তখন আপনার কথা অবিশ্বাস করিতে পারি না। যাহা হউক, তিনি আসিলে যেন একবার দর্শন পাই।'

ভট্টাচার্য্য বলিলেন "তিনি অল্পকালেই প্রত্যাগত হইবেন; কিন্তু তাঁহার জন্য একটী বাসার প্রয়োজন। শ্রীমন্দিরের নিকট অথচ নির্জ্জনস্থান হইলে ভাল হয়। আপনাকে এরূপ একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে।"

রাজা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার ইষ্টদেব কাশীমিশ্রের বাড়ীতে তাঁহার সুন্দর বাসা হইতে পারিবে। আপনি আমার নামে মিশ্র মহাশয়কে বলিয়া সেই স্থান ঠিক করিয়া রাখুন।"

ভট্টাচার্য্য রাজসমীপ হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া রাজার ইচ্ছা কাশী-মিশ্রকে নিবেদন করিলে কাশী মিশ্র আপনাকে মহা ভাগ্যবান্ মনে করিয়া বাসার স্থান ঠিক্ ঠাক্ করিয়া রাখিলেন।

প্রতাপ রুদ্র গঙ্গাবংশের শেষ রাজা। ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি উড়িষ্যার সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ইনি প্রথম বয়সে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া ছিলেন। কিন্তু পরে বৈষ্ণব হইযা বৌদ্ধধর্ম্মকে একবারে উৎকল হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রভাবে ইঁহার ধর্ম্মানুরাগ আরও সুদীপ্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্য তীর্থযাত্রা হইতে আসিয়া প্রথম রজনী সশিষ্যে সার্ব্বভৌমের আলয়ে যাপন করিলেন। রজনীপ্রভাতে ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে জগন্নাথ দর্শন করাইয়া কাশীমিশ্রের ভবনে লইয়া যাইয়া বলিলেন, 'এই বাড়ী তোমার জন্য বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। ইহা তোমার পছন্দ হয় তো?'

শ্রীচৈতন্য বাসস্থান দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। বাড়ীটী যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনি নির্জ্জন; অথচ জগন্নাথমন্দিরের সন্নিকট। ভট্টাচার্য্য

বলিলেন, 'প্রভু! এই বাসা অঙ্গীকার করিয়া কাশীমিশ্রের আশা পূর্ণ কর।' এই সময়ে কাশীমিশ্র সগোষ্ঠি গ[illegible] তাঁহার চরণতলে পতিত হইলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে [illegible]লেন। এবং বলিলেন, 'আমার এই দেহ তোমাদেরই, তোমরা ই[illegible] যেমন করিয়া রাখিতে চাও, রাখ; আমার তাহাতে মতামত কি?'

এই সময়ে নীলাদ্রির প্রধান প্রধান লোক শ্রীচৈতন্যের নিকট পরিচিত হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একে একে এই সকল ব্যক্তির পরিচয় করিয়া দিলেন।

জগন্নাথের সেবক জনার্দ্দন, স্বুবর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস, লিখনাধিকারী শিখি মাহিতি, প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামে বৈষ্ণব, জগন্নাথের মহাসোয়ার দাস নামক ব্যক্তি, শিখি মাহিতির ভ্রাতা মুরারি মাহিতি, চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি নামক ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুদাস, প্রহররাজ মহাপাত্র এবং পরমানন্দ মহাপাত্র প্রভৃতি। এই সকল লোক এইক্ষণ হইতে শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনুগত হইয়া থাকিলেন। এই সময়ে রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায় চারি পুত্রসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলে ভট্টাচার্য্য তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। ভবানন্দ প্রণাম করিলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিতে লাগিলেন "রামানন্দের ন্যায় রত্ন যাঁহার পুত্র, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা কি? তুমি সাক্ষাৎ পাণ্ডু, তোমার স্ত্রী কুন্তীদেবী ও তোমার পাঁচ পুত্র, পঞ্চপাণ্ডব।" ভবানন্দ বলিলেন, 'আমি শূদ্রাধম, তাহাতে আবার বিষয়ী; তবে যে তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করিলে, সে কেবল তোমার ঈশ্বর লক্ষণ। যাহা হউক, পঞ্চপুত্র সহ তোমায় আত্মসমর্পণ করিলাম। এই বাণীনাথ তোমার সমীপেই থাকিবে। যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আপনার জন বিবেচনায় ইহাকে আদেশ করিও; সঙ্কোচ করিলে মহা দুঃখিত হইব।' মহাপ্রভু বলিলেন, "তোমাদের কাছে আর সঙ্কোচ কি? তোমরা তো আমার পর নও। দিন পাঁচেকের মধ্যে রামানন্দ আসিবেন। তখন আমার আনন্দ বাজার পূর্ণ হইবে।" ইহার পর ভবানন্দকে বিদায় দিয়া শ্রীচৈতন্য বাণীনাথকে নিকটে থাকিতে অনুমতি দিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ছাড়া আর সকল লোক বিদায় হইয়া গেলে শ্রীচৈতন্য তাঁহার দাক্ষিণযাত্রার সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে নিকটে ডাকাইলেন এবং ভট্টমারীতে তাঁহাকে ছাড়িয়া কামিনী কাঞ্চনের লোভে যেরূপে সে পলাইয়

গিয়াছিল ও তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে তিনি যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়া বলিলেন 'এখন আমি ইহাকে দেশে আনিয়া দিয়া বিদায় দিতেছি। উহার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক, আমার নিকট থাকিতে পাইবে না।' এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণদাস কাঁদিতে লাগিল। সে দিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। শ্রীচৈতন্য মধ্যাহ্ন করিতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

নিত্যানন্দাদি কৃষ্ণদাসের ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া নিকটে রাখিলেন এবং সময়ান্তরে শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, 'তোমার দক্ষিণ গমন সংবাদে শচীমাতা ও অদ্বৈতাদি নবদ্বীপের ভক্তসকল উৎকণ্ঠিত আছেন। তোমার আগমন বার্ত্তা দিতে গৌড়দেশে একজন লোক পাঠাইতে চাই; ইহাতে কি অভিপ্রায় হয়?' গৌরচন্দ্র বলিলেন 'তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর'। তখন প্রচুর মহাপ্রসাদ সঙ্গে দিয়া মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন সংবাদ দিতে নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে বঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতাকে ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে সংবাদ সহ মহাপ্রসাদ দিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যকে সমাচার প্রদান করিলেন। শুভ সংবাদ পাইয়া ভক্তগণের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, আচার্য্য রত্ন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, আচার্য্য নিধি, দামোদর পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, বিজয় দাস, খোলাবেচা শ্রীধর, রাঘব পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তমণ্ডলী এই আনন্দের সংবাদে আচার্য্য গৃহে উপনীত হইলে অদ্বৈতাচার্য্য এতদুপলক্ষে দুই তিন দিন উৎসব করিলেন। তখন সকলে নীলাচলে যাইতে যুক্তি দৃঢ় করিয়া একত্র নবদ্বীপে শচীমাতার ভবনে যাইয়া তাঁহার আজ্ঞা লইলেন। কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ, প্রভৃতি ও শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন, এই বার্তা শুনিয়া নীলাচলে প্রভু দর্শনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত একত্রিত হইলেন। গৌরবিরহে মৃতপ্রায় নবদ্বীপ যেন আবার নবজীবন পাইয়া উঠিল। ইহার কিছু পূর্ব্বে পরমানন্দপুরী দক্ষিণাপথ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া শচীগৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শচীমাতা তাঁহাকে পুত্রের সহিত সেবা করিতেছিলেন। তিনি গৌরের নীলাচলে আগমন শুনিতে পাইয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে গৌরের জনৈক ভক্ত কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া ভক্তমণ্ডলীর গমনোদ্যোগ

না হইতে হইতে অগ্রস্থচি চলিয়া গেলেন এবং অচিরে নীলাচলে পৌঁছিয়া গৌরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে পাইয়া মহানন্দে প্রণাম করিয়া বলিলেন 'আপনার সঙ্গে থাকিতে আমার বড় ইচ্ছা, আমায় কৃপা-করিয়া নীলাদ্রি আশ্রয় করুন।' পুরী উত্তর করিলেন 'বঙ্গদেশে তোমার আগমন বার্ত্তা পাইয়া শচীদেবী ও ভক্তগণ মহাসুখী হইয়াছেন। ভক্তগণ এখানে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহাদের বিলম্ব দেখিয়া আমি শীঘ্র চলিয়া আসিয়াছি।' তখন গৌরচন্দ্র পুরীর জন্য কাশীমিশ্রের সেই বাড়ীর মধ্যে নির্জ্জনে একখানি ঘর ও সেবার জন্য একটী কিঙ্কর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

দিন দিন কাশীমিশ্রের বাড়ী জমকাইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাতঃকালে সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য, পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নানা ভক্তগণ গৌরাঙ্গ সভায় বসিয়া নানা সৎপ্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। একদিন এমনি সময়ে স্বরূপ দামোদর আসিয়া গৌরের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইঁহার নিবাস নবদ্বীপে, পূর্ব্বাশ্রমে নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইলে ইনিও অনুরাগে বারাণসী নগরীতে যাইয়া শিখা সূত্র ফেলাইয়া সন্ন্যাসী হইলেন; কিন্তু যোগপট্ট গ্রহণ করিলেন না। ইনি পরম বিরক্ত শ্রীকৃষ্ণভক্ত এবং শ্রীচৈতন্যে একান্ত অনুরাগী। সন্ন্যাসাশ্রমে ইঁহার নাম স্বরূপ হইল। বেদান্তাদি অশেষ শাস্ত্রে ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত আর দেখা যায় না। ভক্তিশাস্ত্রে, রসশাস্ত্রে ও কাব্যশাস্ত্রেও ইনি অদ্বিতীয়। ইঁহার কণ্ঠ-স্বর অতি মধুর। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, ইনি সঙ্গীতশাস্ত্রে গন্ধর্ব্ব সম। শ্রীগৌরের নীলাচল আগমন সংবাদ পাইয়া গুরুর অনুমতি লইয়া এই সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি চৈতন্যচন্দ্রের দল আলোকিত করিতে মিলিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য, পদতলে পতিত স্বরূপকে তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করি-লেন এবং প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া ক্ষণকাল উভয়ে নীরবে অশ্রুমোচন করিতে-লাগিলেন। কতকক্ষণ পরে গৌর বলিলেন, 'তুমি যে আসিবে, তাহা আজ স্বপ্নে দেখিয়াছি। ভাল হ'ল। আমি অন্ধ ছিলাম, আজ চক্ষু-রত্ন লাভ করিলাম।'

স্বরূপ কাঁদিয়া বলিলেন, 'প্রভু! আমি তোমার চরণে ঘোর অপরাধী। তা'নইলে তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব কেন? আমি তোমাকে ছাড়িয়া ছিলাম বটে, কিন্তু তুমিতো আমাকে ছাড়িলে না; তাই কৃপাপাশ গলায়

জড়াইয়া বাঁধিয়া আনিলে। এখন আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া চরণে স্থান দাও।' তখন স্বরূপ দামোদর নিত্যানন্দাদির চরণ বন্দনা করিলে গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ও পরমানন্দপুরীর সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। স্বরূপ যথাযোগ্য সকলের পদবন্দনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য স্বরূপের জন্য কাশীমিশ্রের বাড়ীর নিভৃত স্থানে একখানি ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া পরিচর্য্যার্থ একটী ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এখন হইতে স্বরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের প্রধান সভাসদ্ হইলেন। কেহ কোন গীত, শ্লোক বা গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট দেখাইতে আনিলে, ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা স্বরূপ পরীক্ষা করিয়া না দিলে প্রভুর নিকটে যাইতে পাইত না। স্বরূপ সর্ব্বদা নির্জ্জন সাধনে রত থাকিতেন, বড় একটা কথা কহিতেন না। কেবল নিভৃতে বসিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দের সুললিত পদ মহাপ্রভুকে শুনাইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতেন। অল্পদিন মধ্যেই স্বরূপ সকল ভক্তগণের প্রিয়তম ও মহাপ্রভুর যেন দ্বিতীয় স্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

আর এক দিন গৌরচন্দ্র সভা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমার নাম গোবিন্দ, ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য। সিদ্ধি প্রাপ্তকালে পুরী গোঁসাই আমাকে কৃষ্ণ চৈতন্যের নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে আদেশ করিয়াছেন;' তাই আপনার নিকট আসিলাম। পুরীর অপর ভৃত্য কাশীশ্বরও তীর্থদর্শন করিয়া শীঘ্র আসিবেন।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'পুরীশ্বর নাকি আমাকে বড় কৃপা করেন, তাই তোমাকে পাঠাইয়াছেন।' সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'পুরী গোঁসাই মহাবিজ্ঞ হইয়া শূদ্রসেবক রাখিলেন কেন?' শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'ভগবৎপরায়ণ মহানুভবদিগের চরিত্র সাধারণের বোধগম্য নহে। তাঁহারা বেদধর্ম্ম হইতে প্রেমের ধর্ম্মই গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন, ও স্নেহসেবা পাইলে বেদমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না।' এই বলিয়া তিনি গোবিন্দকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ও সকলের সহিত যথাযোগ্য পরিচয় করিয়া দিয়া সার্ব্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভট্টাচার্য্য! বল দেখি এখন উপায় কি? গুরুর ভৃত্য আমার মান্য ব্যক্তি। তাঁহাকে কি প্রকারে আপন সেবায় নিযুক্ত করি? অথচ গুরুর আজ্ঞাই বা কিরূপে অবহেলা করি?' ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া গুরুর আজ্ঞাই পালনীয়

বলিয়া স্বীয় মত প্রকাশ করিলে শ্রীচৈতন্য গোবিন্দকে নিজ সেবকরূপে অঙ্গীকার করিলেন। সেই হইতে গোবিন্দ গৌরের মহা প্রিয়পাত্র ও প্রধান সেবক হইয়া সকল ভক্তের সমাধান করিতে লাগিলেন। রামাই ও নন্দাই নামে আর দুই ব্যক্তি ও ছোট হরিদাস ও বড় হরিদাস দুই কীর্ত্তনীয়া গোবিন্দের সাহায্যার্থে নিযুক্ত হইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

অপরদিনে মুকুন্দ দত্ত গৌরকে সংবাদ দিলেন যে, ব্রহ্মানন্দ ভারতী আসিয়াছেন। গৌরচন্দ্র সম্ভ্রমে বলিলেন, 'কোথায়? তিনি গুরু, আমিই তাঁহার নিকট যাইব।' এই বলিয়া মুকুন্দের সহিত তিনি ব্রহ্মানন্দের সমীপে যাইয়া উপনীত হইলেন। ভারতীর মৃগচর্ম্ম পরিধেয় দেখিয়া গৌরচন্দ্র মনে মনে কিছু দুঃখিত হইলেন এবং দেখিয়াও যেন দেখেন নাই এইরূপ ভাবে মুকুন্দকে কহিলেন 'তিনি কোথায়?' মুকুন্দ বলিলেন, 'এই দেখ সম্মুখে বিদ্যমান।'

গৌর বলিলেন, 'মুকুন্দ! তোমার কি বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে যে এক জনকে অন্যব্যক্তি বলিতেছ? ভারতীগোঁসাই চর্ম্মাম্বর পরিবেন কেন? এই কথায় গৌরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভারতী মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, 'সত্যই তো আমি বড় সন্ন্যাসী, এই মনে করিয়াই কি কেবল দাম্ভিকতার জন্য চর্ম্মাম্বর পরি না। ইহাতে ধর্ম্মপথে কিছু সাহায্য হয় না। তবে আর ইহা পরিব না।' এই ভাবিয়া ব্রহ্মানন্দ ভারতী তখনই মৃগচর্ম্ম ছাড়িয়া বহির্ব্বাস পরিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার পদবন্দনা করিলে তিনি গৌরকে আলিঙ্গন দিলেন। তখন উভয়ে শিষ্টাচার আলাপ হইতে লাগিল। ব্রহ্মানন্দ গৌরকে সচল ব্রহ্ম বলিয়া স্তুতি করিলে গৌরও তাঁহাকে সচল ব্রহ্ম বলিলেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে কৌতুক তর্ক বাধিলে সার্ব্বভৌম ভারতীর দিক্ হইয়া গৌরের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিলেন। গৌর বলিলেন, 'বিষ্ণু! বিষ্ণু! ভট্টাচার্য্য কি বলিতেছ? অতিস্তুতি সর্ব্বনাশের কারণ। সাবধান এরূপ স্তব আর করিও না।' এখন হইতে ব্রহ্মানন্দ গৌর সন্নিধানে বাস করিতে লাগিলেন ভগবান্ আচার্য্য ও রাম ভট্টাচার্য্য নামে দুই ব্যক্তিও সর্ব্বকার্য্য ছাড়িয়া গৌরের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কতকদিন পরে ঈশ্বর পুরীর অপর ভৃত্য কাশীশ্বর আসিয়া উপনীত হইলেন। ইনি অতি বলবা-

ছিলেন। লগুড় হস্তে লোকের ভিড় ঠেলিয়া গৌরকে জগন্নাথ দর্শন করান তাঁহার সেবার কার্য্য নিরূপিত হইল।

একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, 'যদি অভয় দাও, তাহা হইলে একটী নিবেদন করিতে চাই।' গৌর উত্তর করিলেন, 'নির্ভয়ে বল, উপযুক্ত হইলে শুনিব, নচেৎ নয়।' সার্ব্বভৌম সঙ্কিতভাবে বলিলেন 'রাজা প্রতাপ রুদ্র তোমায় দর্শন করিতে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।' শ্রীচৈতন্য কর্ণে হস্ত দিয়া বলিলেন, 'বিষ্ণু! বিষ্ণু! ভট্টাচার্য্য! এরূপ অযোগ্য কথা বলিলে কেন? আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী। আমার পক্ষে রাজদর্শন স্ত্রীদর্শনের ন্যায় অতীব গর্হিত।' সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'কিন্তু রাজা জগন্নাথ সেবক এবং পরমভক্ত।'

শ্রীচৈতন্য। তথাচ রাজা কালসর্পের ন্যায় পরিত্যাজ্য। কাষ্ঠনির্ম্মিত রমণীমূর্ত্তি দেখিলে যেমন বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা, তেমনি ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতিদর্শনে ধনতৃষ্ণা প্রবল হইয়া প্রলোভন জন্মিতে পারে। এরূপ কথা আর যেন তোমার মুখে না আইসে। পুনরায় বলিলে আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না।' সার্ব্বভৌম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেলেন।

কথিত আছে রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের দর্শন জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তিনি সার্ব্বভৌমকে এক পত্রে লিখিলেন যে, ভট্টাচার্য্য যেন গৌরভক্তদিগকে তাঁহার নামে অনুনয় করিয়া তাঁহাদের দ্বারা অনুরোধ করাইয়া মহাপ্রভুর সম্মতি করান্। এই পত্রে তিনি আরও লিখিলেন যে, যদি গৌরচন্দ্র তাঁহাকে দর্শন না দেন, তাহা হইলে তিনি রাজ্য ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবেন। সার্ব্বভৌম ঐ পত্র নিত্যানন্দাদিকে দেখাইলে তাঁহারা প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে কোন কথা গৌরকে জানাইতে সাহসী হইলেন না। পরে সার্ব্বভৌমের অত্যন্ত অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া গৌরের নিকট কেবল এই কথা বলিবেন মাত্র, কোন অনুরোধ করিবেন না, বলিয়া নিত্যানন্দ অঙ্গীকার করিলেন। তদনুসারে ভক্তবৃন্দ ঐ পত্রের কথা গৌরেব নিকট বলিলে তিনি রুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তবে তোমাদের ইচ্ছা যে আমি রাজসেবী হইয়া বিষয় ভোগ করি?' নিতাই কহিলেন, 'তা' নয়, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; কিন্তু রাজা বড় ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার উৎকণ্ঠা নিবারণ জন্য

তোমার একখানি বহির্ব্বাস পাঠাইতে চাই।' গৌর তাহাতে সম্মত হইলে একখানি বহির্ব্বাস রাজসমীপে পাঠান হইল। রাজা নাকি মহাপ্রভুর পরিধেয় বলিয়া সেখানিকে মাথায় রাখিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। ইহার পর রাজা রামানন্দ রায় দ্বারা পুনরায় অনুরোধ করিলে গৌর সেবার সম্মত হইয়া রাজার পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন; এবং রাজা সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাজা প্রতাপরুদ্র নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে রামানন্দ রায়ও আসিয়াছিলেন। রামানন্দ নীলাচলে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে গৌরসমীপে যাইয়া দণ্ডবৎ করিলেন। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন এবং সকল ভক্তের সহিত তাঁহার যথাযোগ্য মিলন করাইয়া দিলে রামানন্দ বলিলেন 'তোমার পরামর্শানুসারে বিষয় ছাড়িয়া নীলাচলে তোমার চরণে অবস্থিতি করিব। রাজাকে জানাইলে, রাজা তোমার নাম শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন। আমাকে আমার নির্দ্দিষ্ট বেতন দিবার অঙ্গীকার করিয়া তোমার চরণসেবা করিতে বলিয়াছেন। আর তিনি তোমার দর্শনলাভের জন্য কত মিনতি করিয়াছেন।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তুমি ভক্ত; তোমাকে যে রাজা এত অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করিবেন।' ইহার পর শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে জিজ্ঞাসিলেন, 'রায়! কমল নয়ন দেখিয়াছ তো?' রামানন্দ 'না' বলিলে গৌর বলিলেন, 'বড় অন্যায় করিয়াছ, আগে জগন্নাথ দেখিয়া এখানে আসা উচিত ছিল যাও এখন দর্শন করগে।' রামানন্দ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন 'কি করিব, চরণরথ, হৃদয়সারথি; যেখানে লইয়া যায়, জীবরথী সেই থানেই যায়।' এখন হইতে রামানন্দ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নীলাচলে আসিয়া রাজা প্রতাপ রুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার বিষয় প্রভুকে বলিয়াছিলে কি?' ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'হাঁ, কিন্তু তিনি রাজদর্শন করিবেন না। অধিকন্তু আবার যদি বলি, তাহা হইলে অন্যত্র চলিয়া যাইবেন; ইহাও বলিয়াছেন।'

ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং খেদ করিয়া বলিলেন

লাগিলেন, 'জগাই-মাধাই প্রভৃতি পাপীকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। কেবল প্রতাপরুদ্র ছাড়া আর সকলেই কি তাঁ'র দয়ার পাত্র? আচ্ছা, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমায় দর্শন দিবেন না। আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাঁহাকে না দেখিয়া ছাড়িব না।' সার্ব্বভৌম রাজার অনুরাগ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, 'দেব! বিষাদ ছাড়ুন; অবশ্যই আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে। তিনি প্রেমাধীন, আপনার গাঢ় প্রেমের নিকট অবশ্যই পরাজিত হইবেন। আজও রামানন্দ রায় আপনার জন্য বলিয়াছিলেন; তাহাতে মন অনেক নরম হইয়াছে। তবে আপনি এক কাজ করিবেন, রথযাত্রার দিনে প্রভু জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে যখন বিহার করিবেন, তখন দীনভাবে তাঁহার নিকটে যাইয়া ভাগবত আবৃত্তি করিবেন।' রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'স্নানযাত্রা কবে?' ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, 'আর তিন দিন বাকি আছে।' রাজাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া ভট্টাচার্য্য বিদায় হইয়া আসিলেন।

স্নানযাত্রা দেখিয়া শ্রীচৈতন্য, কে জানে কি ভাবিয়া ভক্তমণ্ডলী ছাড়িয়া বিরহ বিহ্বলচিত্তে একাকী আলালনাথে চলিয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম এই সংবাদ পাইয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিয়া 'গৌড়ের ভক্তগণ আসিতেছেন' ইত্যাদি অনুনয় বিনয় করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে বাসায় রাখিয়া রাজসমীপে উপনীত হইয়া গৌরের প্রত্যাগমন সংবাদ জানাইলেন। এই সময়ে গোপীনাথ আচার্য্য রাজসভায় আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভট্টাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বঙ্গদেশ হইতে মহাপ্রভুর দুইশত ভক্তবৈষ্ণব আসিয়া নগরে উপসন্ন হইয়াছেন; তাঁহাদের জন্য বাসার স্থান ও মহাপ্রসাদ চাই।' রাজা বলিলেন, 'পড়িছাকে আদেশ পাঠাইয়া দাও, সে যেন সব সরবরাহ করে।' এই বলিয়া প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে কহিলেন, 'মহাপ্রভুর ভক্তদিগকে একে একে আমাকে চিনাইয়া দাও দেখি।' সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'তবে চলুন, প্রাসাদশিখরে আরোহণ করা যাউক। গোপীনাথ সকলকে চিনাইয়া দিবেন। আমি কাহাকে চিনি না। ভক্তদল এই পথ দিয়াই যাইবেন।'

তখন প্রতাপরুদ্র, সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথ, তিনজনে অট্টালিকার উপর উঠিলেন। এমন সময়ে বৈষ্ণবদলও নিকটস্থ হইল। পথের অপর পার্শ্ব দিয়া স্বরূপদামোদর ও গোবিন্দ মালা ও মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহাদিগকে আগ-

বাড়াইয়া লইতে আসিলেন। স্বরূপ সর্ব্বপ্রথমে অদ্বৈতাচার্য্যের গলায় মালা দিয়া প্রণাম করিলেন ও গোবিন্দ মহাপ্রসাদ দিলেন। আচার্য্য গোবিন্দের দিকে তাকাইলে স্বরূপ তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। এইরূপে শ্রীবাস পণ্ডিত আদি সকলকেই মালা প্রসাদ দিয়া স্বরূপ গোঁসাই অগ্রসারি লইয়া চলিলেন। গোপীনাথ অট্টালিকার উপর হইতে রাজাকে একে একে সকলের পরিচয় দিয়া দিলে রাজা বলিলেন, 'এরূপ তেজঃপুঞ্জ বৈষ্ণব আর কোথায়ও দেখি নাই। ইঁহাদের প্রেমচেষ্টা, নৃত্যকীর্ত্তন, সকলই অদ্ভুত।'

সার্ব্বভৌম উত্তর দিলেন, 'এই প্রেমিকদল ও প্রেমসংকীর্ত্তন চৈতন্যের সৃষ্টি। কলিযুগের ধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া প্রভু এবারে পাপী আর রাখিবেন না।'

রাজা। যদি চৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ, তবে পণ্ডিতগণ তাঁহাতে বিতৃষ্ণ কেন?

ভট্টাচার্য্য। তাঁহার কৃপা ভিন্ন তো তাঁহাকে চেনা যায় না।

রাজা। আচ্ছা, এই সব বৈষ্ণব জগন্নাথ না দেখিয়া চৈতন্যের বাসার দিকে কেন চলিলেন?

ভট্টাচার্য্য। প্রেমের রীতিই এই। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। তাই আগে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করিবেন। এইরূপ আলাপের পর রাজা অট্টালিকা হইতে নামিয়া কাশীমিশ্র ও পড়িছাকে ডাকাইয়া ভক্তগণের জন্য বাসা ও মহাপ্রসাদ সরবরাহ করিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে ভক্তদল কাশীমিশ্রের ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সে হরিধ্বনি, হুঙ্কার, গর্জ্জন ও উৎসাহ, দেখিলে মৃতপ্রাণেও উৎসাহ সঞ্চার হয়। গোপীনাথ ও সার্ব্বভৌম রাজসমীপ হইতে বিদায় লইয়া ভক্তদলের অনুগমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য পথমধ্যে ভক্তদিগকে দর্শন দিলেন। তখন একটা যে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিল, তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে। শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণকে একে একে প্রেমালিঙ্গন ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া সুখী করিলেন।

মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ বাসুদেব দত্তকে শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তোমার জন্য ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত, দুই পুঁথি আনিয়াছি; উহা স্বরূপের নিকটে আছে; চাহিয়া লইয়া পাঠ করিও।' সকলের সঙ্গে প্রেমালাপ করিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'আমার হরিদাস কোথায়?' কোন ভক্ত উত্তর করিলেন

হরিদাস রাজপথে পড়িয়া কাঁদিতেছেন ও বলিতেছেন, 'আমি নীচ জাতি; মন্দিরের নিকটে যাইবার অধিকার নাই; কেমন করিয়া প্রভুর দর্শন পাইব?' এই সময়ে কাশীমিশ্র ও পড়িছা আসিয়া বলিলেন, 'ভক্তগণের বাসা ঠিক হইয়াছে ও মহাপ্রসাদান্ন প্রস্তুত।' শ্রীচৈতন্য গোপীনাথকে বলিলেন 'তুমি বৈষ্ণবদিগকে লইয়া বাসায় যাও। বাণীনাথ! তুমি মহাপ্রসাদ আনাইয়া আমার বাসায় রাখ; সকলে একত্র ভোজন করিব।' ভক্তদিগকে গৌর বলিলেন, 'এখন বাসায় গিয়া দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিয়া সমুদ্র স্নানান্তে আমার এখানে ভোজন করিতে আসিবে।' এই বলিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া তিনি রাজপথে যেখানে হরিদাস পড়িয়াছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস বলিলেন, 'ছি প্রভু! আমি নীচ জাতি, আমাকে ছুঁইও না।' শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'তোমাকে স্পর্শ করি পবিত্র হইতে।' এই বলিয়া কাশীমিশ্রকে বলিলেন, 'আমার বাসার নিকট পুষ্পোদ্যানের মধ্যে নির্জ্জনে একখানি ঘর আছে, আমাকে সেইখানি ভিক্ষা দিতে হইবে।' কাশীমিশ্র উত্তর করিলেন, 'তোমারই সব, যাহা ইচ্ছা লইবে। আমাকে জিজ্ঞাসা কেন?' তখন শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে সেই ঘরে লইয়া গিয়া বাসা দিলেন ও বলিলেন, 'এইখানে থাকিয়া হরিনাম করিবে। গোবিন্দ তোমার জন্য প্রত্যহ প্রসাদ দিয়া যাইবেন; আমাকেও এখানে রোজ দেখিতে পাইবে।' নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ প্রভৃতি হরিদাসকে পাইয়া মহা সুখী হইলেন।

এদিকে গৌরচন্দ্র সমুদ্রস্নান করিয়া বাসায় আসিয়া বৈষ্ণবদিগের ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাদিও বাসা লইয়া স্নানান্তে ভোজনের জন্য গৌরের আবাসে উপনীত হইলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে যথাক্রম করিয়া বসাইয়া স্বহস্তে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোস্বামী তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি না বসিলে কেহ খাইতে চাহেন না। নিত্যানন্দ, পুরী, ভারতী, সকলে তোমার অপেক্ষায় হাত তুলিয়া বসিয়া আছেন। তুমি ভোজনে ব'সো; আমি পরিবেশন করিতেছি।' শ্রীচৈতন্য তখন গোবিন্দের দ্বারা হরিদাসের জন্য প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়া ভোজনে বসিলে স্বরূপ, দামোদর, জগদানন্দ, পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সকলে হরিধ্বনি দিয়া মহানন্দে ভোজন করিয়া আচমন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে মাল্য চন্দন দিয়া বিশ্রামার্থে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া আপনিও বিশ্রাম

করিলেন। সায়াহ্নে সমস্ত বৈষ্ণব গৌরাঙ্গ সভায় সমাগত হইলে রামানন্দ রায় উপনীত হইলেন। গৌরচন্দ্র রামানন্দের সহিত অদ্বৈতাদি গৌড়ীয় ভক্তগণের পরিচয় করিয়া দিলে সকলে আনন্দে হরিকথায় ও প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর শ্রীচৈতন্য সর্ব্বভক্ত সঙ্গে জগন্নাথমন্দিরে গমন পূর্ব্বক সন্ধ্যারতি অন্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। আজ গৌরের উৎসাহ দেখে কে? বঙ্গীয় ভক্তগণের সঙ্গে উৎকলের ভক্তগণের মিলনে যে আনন্দ তরঙ্গ উঠিয়াছে, সেই তরঙ্গে গৌর আজ মাতোয়ারা হইয়া উল্লাসে কীর্ত্তনের চারিটী সম্প্রদায় বাঁধিয়া দিলেন। আটখান খোল ও বত্রিশ জোড়া করতাল বাজিতে লাগিল। কীর্ত্তনের স্বর নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। নিলাদ্রিবাসী নরনারী ধাইয়া দেখিতে আসিল; রাজা প্রতাপরুদ্র অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া অট্টালিকায় আরোহণ করিয়া দেখিতে শুনিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের সম্প্রদায় মধ্যে গৌরচন্দ্র জগন্নাথমন্দির বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিলেন এবং অশ্রু, কম্প, পুলকে ভাসিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। লোক সকল দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। নৃত্যাবসানে গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনের সম্প্রদায় লইয়া মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে দাঁড়াইয়া গান করিতে আদেশ দিলেন এবং নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস ও বক্রেশ্বরকে এক এক সম্প্রদায়ে নাচিতে বলিলেন। তাঁহাদের মহানৃত্যে মন্দিরের প্রাঙ্গণ যেন কম্পিত হইতে লাগিল। এই রূপে সে দিনকার সঙ্কীর্ত্তন শেষ হইলে শ্রীচৈতন্য বাসায় আসিয়া ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া স্ব স্ব বাসায় বিশ্রামার্থে বিদায় দিলেন। বৈষ্ণবেতিহাসে এই কীর্ত্তন বেড়াকীর্ত্তন নামে অভিহিত হইয়াছে।

নীলাদ্রির পবিত্র ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের হাট বসিয়া গেল। নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনে অল্প সংখ্যক ভক্ত লইয়া এত দিন যে লীলা হইয়া আসিয়াছে, তাহাই এখন বৃহদাকারে জগন্নাথক্ষেত্রে অভিনীত হইতে চলিল। চারিদিক্ হইতে নদীসকল প্রধাবিত হইয়া যেমন সমুদ্রে সন্মিলিত হয়, তেমনি ভারতের নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া উৎকলের জগন্নাথক্ষেত্রে গৌরসাগরে মিলিতে লাগিলেন। বঙ্গের ভক্তগণ এখন হইতে প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরুষোত্তমে আসিয়া ৪।৫ মাস গৌরের সঙ্গে একত্র থাকিয়া কার্ত্তিক মাসে দেশে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। যাবৎ গৌরচন্দ্র পৃথিবীতে ছিলেন, তাবৎ তাঁহাদের ইহা ব্রতের ন্যায় হইয়া গেল।

ইহার পর তাঁহাদের স্ত্রী, বালকগণও আসিতে লাগিলেন। ইহা ভিন্ন গদাধর, মুকুন্দ, হরিদাস, প্রভৃতি একেবারেই নীলাদ্রি আশ্রয় করিয়া থাকিলেন। ইচ্ছা করে, এই লীলার হাটে মিশিয়া জনমের মত আত্ম-বিক্রয় করিয়া থাকি।

দশম পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রবিলাস।

জগন্নাথের রথযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে শ্রীচৈতন্য কাশীমিশ্র, পড়িছাপাত্র ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনা করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। রথযাত্রার সময়ে যে মন্দিরে যাইয়া জগন্নাথ অবস্থিতি করেন, তাহার নাম গুণ্ডিচা মন্দির। ইহা শ্রীমন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দূরে, ইন্দ্রদ্যুম্ন দীর্ঘিকার তীরে অবস্থিত। ভট্টাচার্য্যাদি এই এক নূতন লীলা হইবে, মনে ভাবিয়া গৌরের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন ও তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে এক শত কলসী ও শত সম্মার্জ্জনী আনিয়া দিলেন। গৌরচন্দ্র দলের সমস্ত ভক্তগণকে ডাকিয়া স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিয়া সকলকে মাল্যচন্দনে সুশোভিত করিলেন ও প্রত্যেকের হস্তে কলসী ও সম্মার্জ্জনী দিয়া হরিধ্বনি করিয়া মহোৎসাহে গুণ্ডিচা মার্জ্জিতে চলিলেন। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ মহানন্দে মন্দির ঝাড়িয়া ও ধুইয়া নির্ম্মল করিলেন। ধুলা ঝাড়া, কাঁকর বাছা ও ঝুল ঝাড়ার ধুমই বা কত! ঘর ধুইবার সময়ে এক বঙ্গীয় যুবক জল আনিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণে ঢালিয়া কিঞ্চিৎ পান করিলে গৌর কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া স্বরূপকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ তো তোমার গৌড়িয়ার রীতি! সে আমার পাদোদক খাইয়া আমাকে পাতকী করিতে চাহে।' স্বরূপ সেই যুবককে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিলে গৌর তাহাকে ডাকিয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিলেন। প্রক্ষালনের পর শ্রীচৈতন্যের ইঙ্গিতে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল ও গৌর নাচিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে তিনি বেহুঁষ হইয়া গেলে

দলের মধ্যে এক বিশাল ভাবতরঙ্গ উছলিয়া উঠিল। নৃত্যান্তে দলবদ্ধ হইয়া গৌরচন্দ্র ইন্দ্রদ্যুম্নের জলে নামিয়া কতকক্ষণ জলক্রীড়া করিয়া স্নানান্তে নিকটবর্ত্তী উপবনে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে বাণীনাথ পাঁচ শত জনের উপযুক্ত নানাবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সকলকে ভোজন করিতে আহ্বান করিলেন। উদ্যান গৃহের পিঁড়ার উপর শ্রীচৈতন্য, পরমানন্দ পুরী, সার্ব্বভৌম, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, আচার্য্য রত্ন, প্রভৃতি সারি গাঁথিয়া ভোজনে বসিলেন। তাহার তলে, তাহার তলে, এইরূপ ক্রমে সেই বিশাল ভক্তগোষ্ঠি বসিয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্য হরিদাস! হরিদাস! বলিয়া ডাকিলে হরিদাস দূর হইতে বলিলেন, 'আপনি ভক্তসঙ্গে ভোজন করুন; আমি নীচ অন্ত্যজ, আমি এ সঙ্গে বসিব না। গোবিন্দ আমাকে প্রসাদ দিবেন।' শ্রীচৈতন্য তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া আর কিছু বলিলেন না। তখন স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোপীনাথ আচার্য্য, বাণীনাথ, শঙ্কর ও দামোদর, এই কয়জন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ হরিধ্বনি দিয়া, প্রেমালাপ ও আমোদকৌতুক করিতে করিতে ভোজন করিতে লাগিলেন। গোপীনাথ ভগিনীপতি, সার্ব্বভৌম শ্যালক। গোপীনাথ বলিলেন 'কি ভট্‌চায্‌! তোমার সাবেক চালচলন কোথায় গেল? আচ্ছা, বল দেখি, সে ভাল ছিল, কি, এ পরমানন্দ ভাল?' ভট্টাচার্য্য গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন 'আর আমাকে লজ্জা দিও না। তোমার প্রসাদেই তো আমার এ সম্পদ্‌ লাভ হইয়াছে।' অদ্বৈত নিত্যানন্দকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, 'আরে! এ অবধূতটার সঙ্গে খাইয়া আমার জাত গেল দেখ্‌ছি।' 'প্রভুর কি! উনি তো সন্ন্যাসী; উঁহার অন্নস্পর্শে দোষ নাই।' এইরূপ মহানন্দে সে দিনকার বনভোজন সমাপ্ত হইল।

রথযাত্রার দিন গৌরচন্দ্র প্রাতঃস্নান করিয়া ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া জগন্নাথের বিজয়োৎসব দর্শন করিলেন। বলিষ্ঠ দয়িতাগণ জগন্নাথ, সুভদ্রা, ও বলরামকে হাতাহাতি করিয়া মন্দিরের বাহিরে আনিয়া বিগ্রহগুলির কটিদেশে পট্টডুরি বাঁধিয়া সুসজ্জিত অত্যুচ্চ তিনখানি রথোপরে আরোহণ করাইল। চারিদিকে বাদ্য কোলাহল হইতে লাগিল। লোক সকল আনন্দোৎসাহে 'জয় জগন্নাথ! মহাপ্রভু! মণিমা!' বলিতে লাগিল। রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রে পরিবৃত থাকিয়া রথযাত্রার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন এবং আপনি সুবর্ণ সম্মার্জ্জনী ও চন্দনাক্ত জলের

পাত্র হাতে লইয়া রথের আগে আগে পথ পরিষ্কার করিয়া চলিলেন। স্বয়ং ভূপতি হইয়া তুচ্ছ সেবায় রত হইলেন। গৌড়গণ রথ টানিতে লাগিল। মহা ধূমধামের সহিত রথ গুণ্ডিচাভিমুখে চলিতে লাগিল। এদিকে শ্রীচৈতন্য, পুরী, ভারতী ও ভক্তবৃন্দকে স্বহস্তে মাল্য চন্দন পরাইয়া কীর্ত্তনের জন্য চারিটী দল বাঁধিয়া দিলেন। এক এক দলে একজন মূল গায়ক, পাঁচজন দোয়াড়, একজন প্রধান নর্ত্তক ও দুই খানি করিয়া মৃদঙ্গ নিযুক্ত থাকিল। প্রথম সম্প্রদায়ে স্বরূপ মূলগায়ক; দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত ও গোবিন্দানন্দ গায়ক; এবং অদ্বৈত, নর্ত্তক নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় দল শ্রীবাস প্রমুখ; গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান, শুভানন্দ, ও শ্রীরাম পণ্ডিত গায়ক ও নিত্যানন্দ নর্ত্তক হইলেন। তৃতীয় দলে মুকুন্দ গায়ক; বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি, শ্রীকান্ত ও বল্লভ সেন গায়ক ও হরিদাস ঠাকুর নর্ত্তক হইলেন। চতুর্থ দলে গোবিন্দঘোষ মূল গায়ক; অন্য হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, মাধব ও বাসুদেবঘোষ গায়ক, এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিত নর্ত্তক। ইহা ছাড়া কুলীন গ্রামের সত্যরাজ রামানন্দের এক দল, অদ্বৈত পুত্র অচ্যুতানন্দের আর এক দল এবং শ্রীখণ্ডের নরহরি, রঘুনন্দনের তৃতীয় দলও গাইতে লাগিল। রথাগ্রে চারি সম্প্রদায়, দুই পার্শ্বে দুই সম্প্রদায় ও রথের পশ্চাতে এক সম্প্রদায় মহোল্লাসে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং এই সাত স্থানেই চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাতে সাত সম্প্রদায়ের ভক্তগণই মনে করিতে লাগিলেন, 'প্রভু বুঝি আমাদের দলের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছেন'। প্রতাপ-রুদ্র কীর্ত্তনে প্রেমোল্লাস দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। কাশীমিশ্র ও সার্ব্বভৌম রাজাকে বলিলেন 'মহারাজ! আপনার ভাগ্যের সীমা নাই।' এইরূপে রথ কতকক্ষণ চলিলে শ্রীচৈতন্য, স্বরূপ প্রভৃতি প্রধান প্রধান দশ-জন গায়ককে সম্প্রদায়সমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আপনি "সেই তো পরাণনাথকে পাইনু; যাঁর লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু।' এই ধুয়া ধরিয়া গাইতে লাগিলেন; এবং ঊর্দ্ধমুখে প্রেমপূর্ণ নেত্রে 'জয়তি জননিবাসঃ' ইত্যাদি শ্লোকাবৃত্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন। নাচিতে, গাইতে, স্তবপাঠ করিতে করিতে গৌরের মহা-ভাবের উদয় হইল। স্বেদ, কম্প, পুলকাশ্রুতে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া জজ, গগ, গদ্‌গদভাবে কথা কহিতে লাগিলেন।

রথ ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। হঠাৎ ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্য নানা শ্লোক পড়িতে লাগিলেন।

গৌরের তাৎকালিকের রথাগ্রে নর্ত্তনের ভাব শ্রীরূপগোস্বামী এই কয়টী কথায় সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। "যিনি প্রভূত প্রেমতরঙ্গে ভাসমান হইয়া নীলাচলপতির রথাগ্রে মহোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িতেন; এবং যাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করিত; সেই চৈতন্যদেব আর কি আমার নয়নগোচর হইবেন ?"

এই সকল ভাবাবেশে বিভোর হইয়া শ্রীচৈতন্য বারম্বার ভূমিতে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দাদি তাঁহার দেহরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। একবার এইরূপে পড়িয়া গেলে ও নিত্যানন্দাদি কীর্ত্তনানন্দে একটু অন্যমনস্ক থাকিলে, রাজা প্রতাপরুদ্র সম্ভ্রমে যাইয়া দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া মহাপ্রভুকে তুলিয়া নিজের বহুদিনের মনের সাধ পরিপূর্ণ করিলেন। গৌরচন্দ্রও বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া রাজাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছি! ছি! ধিক্ আমাকে! আমার আজ বিষয়ীর স্পর্শ হইল ?" রাজা ভয় পাইয়া দূরে গেলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন "ভয় নাই, আপনি হাড়ীর ন্যায় হীনভাবে রথাগ্রে যে ঝাঁট দিতে দিতে যাইতেছেন, ইহাতে প্রভু আপনার উপর পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণ বিষয়ীসংস্পর্শে ভোগবিলাসী না হইয়া পড়ে, কেবল এই উদ্দেশে তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য ঐরূপ বলিলেন।" রাজা তাহাতে আশ্বস্ত হইলেন। এই সব গোলযোগে রথ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। গৌড়গণ বিধিমত বল প্রয়োগ ও টানাটানি করিয়াও চালাইতে পারিল না। কথিত আছে, মহাপ্রভু রথের পশ্চাতে যাইয়া মাথা দিয়া ঠেলিবা মাত্র রথ হড় হড় করিয়া চলিতে লাগিল ও অবিলম্বে বলগণ্ডি নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। এইস্থান শ্রীমন্দির ও গুণ্ডিচার প্রায় মধ্যপথে অবস্থিত। ইহার একপার্শ্বে জগন্নাথবল্লভ নামক সুপ্রশস্ত রাজকীয় পুষ্পোদ্যান ও বামপার্শ্বে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের নিবাসভূমি। এই স্থানের নিকটে জগন্নাথের মাসীর বাড়ী। মাসীর খুদের পিটা না খাইয়া জগন্নাথ গুণ্ডিচায় যান না। বলগণ্ডিতে রথ দাঁড়াইলে পূর্ব্বাপর নিয়মানুসারে বহুবিধ ভোগ প্রদত্ত হইতে লাগিল। রাজার, রাণীর, অমাত্যবর্গের, উৎকলবাসীদিগের এবং সামান্য যাত্রিকদিগের অবস্থোচিত পৃথক্ পৃথক্ ভোগদ্রব্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উৎসর্গ করা হইতে লাগিল। গৌর সদলে

এতক্ষণ রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। ভোগ দিবার জন্য লোকের অতিশয় ভিড় হওয়ায় উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্যানগৃহের পিঁড়ায় ভাবাবেশে শুইয়া পড়িলেন। পরিশ্রমজন্য শরীর দিয়া দর বিগলিতধারে ঘর্ম্ম পড়িতেছিল। পুষ্পোদ্যানের শীতলবায়ু সেবায় তিনি সুখানুভব করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও কেহ বৃক্ষতলে, কেহ দুর্ব্বাদলের উপরে, বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপদেশানুসারে মহারাজ প্রতাপরুদ্র সুযোগ বুঝিয়া দীনহীন বৈষ্ণবের বেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং ভক্তগণের অনুমতি লইয়া সাহসে ভর করিয়া শ্রীচৈতন্য যেখানে চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিলেন, সেইখানে যাইয়া তাঁহার পদযুগল ধরিয়া পাদসম্বাহন করিতে এবং সুমিষ্টস্বরে ভাগবতীয় রাসলীলার শ্লোকাবৃত্তি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তখন ভাবে বিভোর; শ্লোক শুনিয়া বড়ই সুখানুভব করিতে লাগিলেন। রাজা 'তব কথামৃতং' শ্লোকটী আবৃত্তি করিবামাত্র তিনি মহানন্দে উঠিয়া বসিলেন এবং 'তুমি আমাকে যে অমূল্যধন দিলে, আমার কি আছে যে তাহার প্রতিদান দিব? এই আলিঙ্গন লও' বলিয়া নৃপতিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং;
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃনন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।"

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন 'হে প্রিয়! তোমার কথামৃত, সন্তপ্তজনের জীবন, ব্রহ্মজ্ঞদিগের ভোগ্য, শ্রবণমঙ্গল, শান্তিপ্রদ এবং পাপনাশক। যাঁহারা উহা পান করাইতে পারেন, তাঁহারাই ভূরিদ অর্থাৎ প্রকৃত দাতা।'

প্রতাপরুদ্র বহুদিনের অভীপ্সিত আলিঙ্গন লাভ করিয়া হর্ষে প্রেমে গদ্গদ হইলেন; তাঁহার চক্ষুঃ দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। মহাপ্রভু ভাবোন্মত্ত; বারম্বার 'ভূরিদা! ভূরিদা!' বলিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রতাপরুদ্রকে চিনিতে পারিলেন না। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে যে আচম্বিতে এখানে আসিয়া আমাকে কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইলে?' ছদ্মবেশী রাজা উত্তর দিলেন, 'আমি তোমার দাসের দাস হইতে চাই।' কথিত আছে, প্রভু ঐশ্বর্য্য দেখাইলে রাজা কৃতার্থ হইয়া বিদায় হইলেন;

এবং ভক্তগণকে বন্দনা করিয়া উদ্যানের বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে রাজাজ্ঞায় বাণীনাথ বলগণ্ডিভোগের নানাপ্রকার ফলমূল মিষ্টান্নাদি বহুতর প্রসাদ আনিয়া উদ্যান পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন সমাপনান্তে ভক্তগণ সহ আনন্দে প্রসাদ ভোজন করিলেন। তাঁহাদের ভোজন হইলে বহুতর প্রসাদ উদ্বৃত্ত হইল দেখিয়া শ্রীচৈতন্য গরিব, দুঃখী, অন্ধ, আতুরদিগকে ভোজন করাইতে অনুমতি দিলেন। প্রায় হাজার লোক হরিধ্বনি দিয়া ভোজন করিল দেখিয়া প্রভু বড় প্রীত হইলেন এবং তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন।

অপরাহ্ন সময়ে গুণ্ডিচা মন্দিরে রথ আসিলে বিগ্রহদিগকে পট্টডুরি দিয়া মন্দিরে অবতরণ করান হইল। শ্রীচৈতন্য দলসহ পূর্ব্ববৎ রথের আগে আগে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে গুণ্ডিচায় আসিলেন; এবং যে নয় দিন জগন্নাথ গুণ্ডিচায় থাকিলেন, তিনিও সেই নয় দিন ভক্তগণসঙ্গে সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ নীলাচলের রাজা, রাজসেবায় থাকিতে ভাল না লাগিলে বৎসরান্তে একবার রথে চড়িয়া বনবিহারে বহির্গত হয়েন। ইহারই নাম রথমহোৎসব। এই বনবিহারের ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা স্মৃতিপথে উদিত হইলে শ্রীচৈতন্যের প্রেমানন্দ উথলিয়া উঠিল। এই নয়দিন তিনি কেবলই বৃন্দাবন ভাবে ডুবিয়া থাকিলেন। যাহা হউক, নৃত্য কীর্ত্তন সমাধান্তে সে দিনকার মত তিনি আইটোটায় যাইয়া সবান্ধবে বিশ্রাম করিলেন। এই নয়দিনে বৈষ্ণবদলের মধ্যে মহামহোৎসব লাগিয়া গেল। মুখ্য মুখ্য নয়জন ভক্ত প্রভুকে এক একদিন করিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়াইতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান ও জলকেলিতে, তৎপরে সবান্ধবে নানা উদ্যান ও বন ভ্রমণে, মধ্যাহ্নে আইটোটা পল্লীতে বন্ধুদিগের গৃহে নিমন্ত্রণ ভোজনে, সায়াহ্নে গুণ্ডিচা মন্দিরে নৃত্য সংকীর্ত্তনে এবং রজনীতে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে একত্র শয়ন ও কৌতুকে এই কয়দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কোন দিন ইন্দ্রদ্যুম্নে, কোন দিন বা নরেন্দ্র নামক বৃহৎ দীঘীতে জলকেলি হইতে লাগিল। সকলে মিলিয়া বৃহৎ এক মণ্ডলাকারে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মণ্ডলাকারে পরস্পরের প্রতি জল ফেলাফেলি কখন বা জলমণ্ডুকদিগের ডাকের সহিত করবাদ্য ও কখন দুই দুই জনে জলযুদ্ধ; এইরূপ বাল্যক্রীড়া হইতে লাগিল। অদ্বৈতে নিত্যানন্দে, বিদ্যানিধি স্বরূপে, মুরারিগুপ্তে মুকুন্দদত্তে, শ্রীবাসপণ্ডিত

গদাধরে, রাঘব পণ্ডিত বক্রেশ্বরে এবং সার্ব্বভৌম রামানন্দে জলযুদ্ধ হইল। গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সকলে শিশুর ন্যায় খেলা করিতে ও বিবাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য ঈষৎ হাসিয়া গোপীনাথকে বলিলেন 'দেখ! আর সকলের যা'হোক, সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ মহাগম্ভীর, পণ্ডিত ও পদস্থ লোক হইয়া বালকের ন্যায় চঞ্চলতা করিতেছেন; তুমি উঁহাদের নিষেধ করনা কেন?' গোপীনাথ উত্তর করিলেন, 'তোমার কৃপা একবিন্দু উচ্ছ্বসিত হইলে মেরুমন্দার প্রভৃতি পর্ব্বত ডুবিয়া যায়; তা' এ দুই খণ্ড শৈলের কি কথা?' আর সার্ব্বভৌমকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'শুক্‌নো তর্কের খইল খেয়ে মর্‌ছিলেন, এখন লীলামৃত পেয়েছেন; তাই পেটভরে খাচ্চেন।' তখন গৌর অদ্বৈতকে ডাকিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে উঠিলেন। আচার্য্য গৌরকে পৃষ্ঠে করিয়া সাঁতার দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভক্তগণ বলিলেন, প্রভু শেষশায়ী লীলা করিতেছেন।

জলক্রীড়ান্তে শ্রীচৈতন্য সে দিন পুরী ভারতীকে লইয়া অদ্বৈতের বাসায় নিমন্ত্রণ খাইলেন। ভক্তগণ প্রসাদ ভোজন করিলেন। সন্ধ্যায় গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল এবং কীর্ত্তনান্তে গৌরচন্দ্র এক একদিন এক এক ভক্তকে নাচাইতে লাগিলেন। যে দিনে নিজে গান করিয়াছিলেন ও বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচিয়াছিলেন, সেদিনকা'র দৃশ্যে সকলে দিশাহারা, জ্ঞানহারা হইয়া, প্রেমে উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছিল। বৃন্দাবনলীলার অনুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্য রজনীযোগে উদ্যানে উদ্যানে প্রতি বৃক্ষতলায় মনের সুখে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই নৃত্যের সময়ে বাসুদেবদত্ত ভিন্ন আর কেহ গাইতে পাইত না। স্বরূপ মৃদঙ্গ বাজাইতেন।

রথোৎসবের পঞ্চমীতিথিতে হোরাপঞ্চমী নামে জগন্নাথ মন্দিরে এক কৌতুকজনক উৎসব হইয়া থাকে। রাজা প্রতাপরুদ্র কাশীমিশ্রকে ডাকিয়া এবারে সেই উৎসব খুব জাঁকজমকের সহিত করিতে ও শ্রীচৈতন্যকে দেখাইয়া সুখী করিতে আদেশ করিলেন। নিরূপিত দিনে শ্রীমন্দির লোকে লোকারণ্য, নানা বাদ্যোদ্যম হইতেছে; এমন সময়ে মিশ্র মহাশয় ভক্তগণ পরিবৃত গৌরচন্দ্রকে আইটোটা হইতে ডাকিয়া আনিয়া উত্তম স্থানে বসাইলেন। জগন্নাথের প্রেয়সী লক্ষ্মীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরে আছেন। জগন্নাথ বনবিহারে গিয়াছেন, লক্ষ্মীকে লইয়া যান নাই। লক্ষ্মী বিরহবিধুরা হইয়া যে পাণ্ডাগণ জগন্নাথকে বনবিহারে বাহির করিয়া লইয়া

গিয়াছিল, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্য স্বীয় দাসীদিগকে হুকুম দিলেন। দাসীগণ পাণ্ডাদিগকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিয়া কটূক্তি করিতে লাগিল। পাণ্ডাগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া অঙ্গীকার করিল যে অতি শীঘ্র জগন্নাথকে আনিয়া দিবে। লক্ষ্মীঠাকুরাণী তখন তাহাদের মুক্তি দিয়া দেবদাসীদিগের সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। লক্ষ্মীবিগ্রহকে নানা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া দেবদাসীগণে পরিবৃত করাইয়া জাঁকজমক ও বাদ্যকোলাহলের মধ্যে বাহিরে আনিয়া উৎসবে এই রঙ্গ অভিনীত হইল। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তগণ দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন। যত কেন ক্ষুদ্র বিষয় হউক না, মহানুভব ব্যক্তিগণ তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ না করিয়া ছাড়েন না। তাই রসিকচূড়ামণি গৌরচন্দ্র এই ছেলেখেলার ন্যায় কৌতুকজনক ব্যাপার দেখিয়া স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন; 'জগন্নাথ সুন্দরাচলে বনবিহারে গিয়াছেন, লক্ষ্মীকে সঙ্গে লন নাই কেন?' স্বরূপ উত্তর করিলেন, 'জগন্নাথের বনবিহার কৃষ্ণের ব্রজলীলা বই তো নয়। ব্রজলীলায় গোপী ভিন্ন লক্ষ্মীর অধিকার নাই। লক্ষ্মীকে সেই জন্য লইয়া যাওয়া হয় নাই।'

শ্রীচৈতন্য। কিন্তু এ বনবিহারে ভ্রাতা বলদেব, ভগিনী সুভদ্রা সঙ্গে গিয়াছেন। গোপীদিগের সহিত ব্রজবিহার গুপ্তলীলা; তাহা ত প্রকট হইতে পারে না। তবে লক্ষ্মীর এত রাগ কেন?

স্বরূপ। প্রেমবতী কান্তার স্বভাবই এই যে, স্বামীর ঔদাস্যভাবে তাঁহার রাগ উপস্থিত হয়। কথায় কথায় ব্রজদেবীদিগের মানের কথা উঠিয়া পড়িলে, স্বরূপদামোদর ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা, মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা প্রভৃতি নায়িকালক্ষণ বিবৃত করিয়া শ্রীরাধিকার বাম্য, কৌটিল্য, কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, হর্ষ, সঞ্চারি, বিলাস, প্রভৃতি মহাভাবের উপাদানগুলি বর্ণনা করিলেন। মহাপ্রভু প্রেমে উন্মত্ত হইয়া 'বোল! বোল!' বলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত কৌতুক করিয়া স্বরূপকে বলিলেন, "দেখ, আমার লক্ষ্মীর কত ঐশ্বর্য্য! তোমার ঠাকুর রাজভোগ ছেড়ে বৃন্দাবনের ফল ফুল লইতে ও গোয়ালাবাড়ী দই দুধ খেতে গিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছেন?" শ্রীবাসের পরিহাস শুনিয়া ভক্তগণ হাসিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'পণ্ডিত! আপনার নারদস্বভাব; তাই বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য আপনার এত ভাল লাগে। কিন্তু স্বরূপ শুদ্ধ ব্রজবাসী।

বৃন্দাবনের মাধুর্য্যময় বিশুদ্ধ সম্পদ্ ভিন্ন ঐশ্বর্য্যসুখ ইহার ভাল লাগিবে কেন?' দামোদর তখন প্রগল্‌ভতা সহকারে ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকাবৃত্তি করিয়া বলিলেন 'শুন শ্রীবাস! মাধুর্য্যপূর্ণ চিন্ময় বৃন্দাবনধামের অলৌকিক কথা! সেখানকার একমাত্র রাজা পরমপুরুষ ভগবান্; কত শত শোভাময়ী লক্ষ্মীই সেখানকার কান্তাগণ; তাহার ভূমি চিন্তামণি; গৃহাদি দাসদাসীগণও চিন্তামণিময়; কল্পপাদপই বন; ভগবৎ সেবাবাসনাই কামধেনু; সেখানকার অধিবাসীরা ভগবদিচ্ছা পালন ও ভগবৎসেবা ভিন্ন অন্য ধনের প্রয়াসী নহে; সেখানে ভগবদ্‌বাণীরূপা বংশীই প্রিয়সখীর ন্যায় উপদেশ দেয়; প্রেমামৃতই সেখানকার জল, কণ্ঠধ্বনিই মধুর সঙ্গীত এবং সহজ গমনই নৃত্য। এক চিদানন্দ জ্যোতিঃ সেখানে চিরবিরাজিত।' শ্রীবাস এই কথা শুনিয়া আনন্দে বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিলেন, শ্রীচৈতন্য প্রেমভরে 'বোল! বোল!' বলিতে লাগিলেন; চারি সম্প্রদায় তখন মৃদঙ্গ করতাল যোগে সংকীর্ত্তন জুড়িয়া দিলে গৌর নাচিতে লাগিলেন; লোক সকল মুগ্ধ হইয়া গেল। বেলা তৃতীয় প্রহরে নৃত্যকীর্ত্তন থামিলে গৌরচন্দ্র নরেন্দ্রে স্নান করিয়া উদ্যানে যাইয়া বন্ধুগণ সহ ভোজন করিলেন।

এইরূপে আনন্দ আহ্লাদে, ভাবে, প্রেমে, আট দিন গত হইলে নিরূপিত সময়ে জগন্নাথের ভিতর বিজয় অর্থাৎ মন্দিরে প্রত্যাগমন হইল। গৌরচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় রথাগ্রে কীর্ত্তন করিতে করিতে গুণ্ডিচা হইতে নীলাচলে আসিলেন। যে সকল পট্টডুরী দ্বারা জগন্নাথকে বাঁধিয়া রথ হইতে অবতরণ করান হইল, জগন্নাথের ভরে তাহা ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া শ্রীচৈতন্য একগাছি ডুরী লইয়া কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খানকে দেখাইয়া আদেশ করিলেন, 'প্রতি বর্ষে দেশ হইতে এই আদর্শে খুব মজবুত করিয়া ডুরী নির্ম্মাণ করিয়া আনিয়া মহোৎসবে প্রদান করিবে। এই ডুরীতে অনন্তরূপী শেষ অধিষ্ঠিত আছেন জানিয়া ভক্তির সহিত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।' সেই অবধি কুলীনগ্রামী ভক্তের পট্টডুরী যোগান ব্রতের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেল।

রথোৎসবের গোলমাল চুকিয়া গেলে বঙ্গের ভক্তগণ গৌরচন্দ্রকে এক এক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব বাসায় ভোজন করাইতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্যের বাসায় কিছু অধিক পরিমাণে নিমন্ত্রণ হইত।

শ্রীচৈতন্য আচার্য্যের সঙ্গে কত হাস্য পরিহাস ও কৌতুক করিতেন। এক দিন অদ্বৈতাচার্য্য পুষ্পচন্দন লইয়া গৌরের বাসায় গিয়া তাঁহাকে পূজা করিলে গৌরচন্দ্র সেই কুসুমাদি কাড়িয়া লইয়া নাকি 'যোহসি সোহসি নমোস্তু তে' মন্ত্র পড়িয়া আচার্য্যের পূজা করিয়াছিলেন। আর এক সময়ে শ্রীচৈতন্য নিজ বাসায় অদ্বৈতের সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'আচার্য্য! কোথা হইতে আসিলেন?' অদ্বৈত উত্তর করিলেন, 'জগন্নাথদর্শন করিয়া।'

শ্রীচৈতন্য। কহ ত কিরূপে জগন্নাথ দেখিলে?

অদ্বৈত। কেন, দর্শনান্তে প্রদক্ষিণ করিলাম।

গৌর হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার হা'র।'

অদ্বৈত। কেন?

গৌর। আমি অমন করিয়া ঠাকুর দর্শন করি না। প্রদক্ষিণ করিতে যতক্ষণ ঠাকুরের দিকে পৃষ্ঠ দিতে হয়, ততক্ষণ তো দর্শন হয় না। আমি কেবল অনিমিষ নয়নে মুখপানে তাকাইয়া থাকি।

অদ্বৈত। এ কথার অধিকারী তোমাভিন্ন জগতে আর কেহ নাই। তা' আমি কেন? এ বিষয়ে তোমার নিকট সকলেরই হা'র মানিতে হয়। গৌরচন্দ্র কৌতুক করিয়াছিলেন। অদ্বৈতের উত্তর শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বঙ্গের ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া জগন্নাথের নানা মহোৎসবে প্রভুসঙ্গে নানা লীলা করিতে লাগিলেন। জন্মাষ্টমীদিনে শ্রীচৈতন্য ভক্তগণ সহ গোপবেশ ধারণ করিয়া দধি দুগ্ধের ভার স্কন্ধে লইয়া মহোৎসবের স্থানে আসিয়া নাচিতে লাগিলেন; কানাই খুঁটিয়া নন্দ ও জগন্নাথ মাহিতি যশোদা সাজিলেন। রাজা প্রতাপ রুদ্র, সার্ব্বভৌমাদিও দধি হরিদ্রার জলে অভিষিক্ত হইয়া মহোৎসবে যোগ দিলেন। অদ্বৈত, মহাপ্রভুকে বলিলেন 'কেমন গোয়ালা দেখিব, লগুড় ফিরাও দেখি!' শ্রীচৈতন্য এক বৃহৎ লগুড় হাতে লইয়া নানারূপ কৌশলে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভাঁজিয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিলেন। বিজয়া দশমীদিনে লঙ্কাবিজয় স্মরণ করিয়া মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া আপনি হনুমান সাজিলেন ও ভাবে আবিষ্ট হইয়া বৃহৎ এক বৃক্ষশাখা স্কন্ধে লইয়া লঙ্কার গড়ে যেন ফেলিয়া গড় ভাঙ্গিতেছেন মনে করিয়া

বলিতে লাগিলেন, 'কাঁহা রে রাবণ ? আরে পাপী ! জগন্মাতা সীতাকে হরণ করিয়াছিস্। আর কি তো'র রক্ষা আছে ? সবংশে মারিয়া ফেলিব।' দর্শকগণ প্রভুর ভাবাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া জয় জয় রবে গগন পূর্ণ করিয়া ফেলিল। দীপান্বিতা, রাসযাত্রা ও উত্থানদ্বাদশীদিনেও ইরূপ নানা আমোদ কৌতুকের সহিত মহোৎসব হইল। যাঁহারা র্ম সাধনকে শুদ্ধ কঠোর ব্যাপার মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা গৌরের ই সব লীলা কৌতুক দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে পান, ভোজন, য়নাদি নিত্যকর্ম্মের মধ্যে, আমোদ, আহ্লাদ, কৌতুক, মহোৎসবের ধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের যোগ রাখিতে পারিলে ঈশ্বর আরাধনা কমন সুখময় হইয়া উঠে ; জীবনযাত্রা কেমন আনন্দ সম্ভোগের ব্যাপার হইয়া যায়।

বঙ্গীয় ভক্তগণের স্বদেশ যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে গৌরচন্দ্র অদ্বৈতকে সম্মানপুরঃসর বলিলেন "প্রতিবৎসর ভক্তগণকে নীলাচলে আনিয়া গুণ্ডিচা মহোৎসব দেখাইবেন এবং চাতুর্ম্মাস্য আমার সহিত অবস্থিতি করিয়া আমাকে সুখী করিবেন। এক্ষণে দেশে ফিরিয়া যাউন এবং আচণ্ডালে হরিনাম ও হরিভক্তি দিয়া দেশ পবিত্র করুন, জন্ম সফল করুন্।' শ্রীবাস পণ্ডিতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৌর বলিলেন 'তোমার নে সঙ্কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব। কেবল তুমি দেখিবে, আর কেহ খিতে পাইবে না। আমার মাকে এই বস্ত্রখানি ও মহাপ্রসাদগুলি য়া আমার দণ্ডবৎ প্রণাম বলিবে ও আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে বে। আমি দুর্ম্মতির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সেবা ছাড়িয়া সন্ন্যাস রিয়াছি। তাঁ'র সেবা আমার পরমধর্ম্ম ; তাহা ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হওয়ায় মার ধর্ম্ম হওয়া দূরে থাকুক্, ধর্ম্ম নাশ করিয়াছি। বাতুল না হ'লে আর এমন কর্ম্ম কেহ করে ? মাকে বলো, বাতুল পুত্রের অপরাধ ন ক্ষমা করেন। সংসারের মধ্যে প্রেমের ন্যায় আর কি ধন আছে ? ই মাতৃপ্রেম ছে'ড়ে আমি সন্ন্যাস লইয়া কি করিব ? মা'কে বলো আমি র আজ্ঞাতেই নীলাচলে আছি ; এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার চরণ দর্শনে ইব। আর আমি নিত্যই তাঁর কাছে যাই, তিনি স্ফূর্ত্তি বিবেচনায় তা বলিয়া বুঝিতে পারেন না। কোন দিন তিনি উত্তম অন্নব্যঞ্জন পাক রিয়া 'নিমায়ের প্রিয় এসব তরকারী ; বাছা আমার ঘরে নাই, কে

খাইবে,' বলিয়া কতই কাঁদিয়া ছিলেন। আমি তখনই তাহা জানিতে পারিয়া গিয়া ভোজন করিয়াছিলাম। মা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শূন্যপাত্র দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া মনে করিলেন 'আমি কি তবে বাড়িতে ভুলিয়া গিয়াছি?' এই আশঙ্কায় পাকপাত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে ঐ সব পাত্রে অন্নব্যঞ্জন পূর্ণ রহিয়াছে। মনভ্রান্তি হইয়াছিল মনে করিয়া তিনি আবার অন্নাদি বাড়িয়া আমার উদ্দেশে সমর্পণ করিলেন। বিগত বিজয়া দশমীদিনে এইরূপ হইয়াগিয়াছে। মাকে এই সব কথা বলিয়া তাঁহার প্রতীতি করাইয়া দিও যে, আমি সর্ব্বদা তাঁহার সন্নিকটেই আছি।' গৌরচন্দ্র এই কথা বলিতে বলিতে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; কিন্তু বন্ধুদিগকে তাহা বুঝিতে না দিয়া অন্যান্য ভক্তগণকে মিষ্টালাপে বিদায় দিতে লাগিলেন। রাঘব পণ্ডিতের সরল বিশ্বাস ও সেবার আয়োজনের নিষ্ঠাভক্তি বর্ণন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শিবানন্দ সেনকে গৌরচন্দ্র বলিলেন 'প্রতিবর্ষে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া তুমি পথে প্রতিপালন করিয়া আনিবে। তুমি ইঁহাদের প্রতিপালক হইলে। আর তোমার গ্রামবাসী বাসুদেব দত্তের আয় ব্যয়-সম্বন্ধে তোমাকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাসুদেব পরম উদার, যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলেন। গৃহস্থ ব্যক্তির সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য; না করিলে কুটুম্বাদি প্রতিপালিত হয় না। ইঁহার আয়ব্যয় তোমার অজ্ঞাত নাই। তুমি ইঁহার সরখেল হইয়া সব সমাধান করিয়া দিও।' কুলীনগ্রামী সত্যরাজকে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিলেন 'প্রতিবর্ষে পট্টডুরী লইয়া আসিবে। গুণরাজ খাঁ বলিয়াছিলেন 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'। সেই এক কথায় তোমাদের বংশের নিকট আমি চিরবিক্রীত হইয়া আছি। তোমাদের ত কথাই নাই, তোমার গ্রামের কুকুর পর্য্যন্ত আমার যেমন প্রিয়, এমন আর কেহই নয়।' সত্যরাজ বলিলেন 'আমি গৃহস্থ বিষয়ী; সাধন ভজন কিছুই জানি না। আমার এখন কর্ত্তব্য কি? যদি শ্রীমুখে কিছু উপদেশ দেন, তবে কৃতার্থ হই।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'নিরন্তর হরিনাম সংকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণসেবা ও বৈষ্ণবসেবন করা তোমার কর্ত্তব্য।' সত্যরাজ বলিলেন 'বৈষ্ণব চিনিব কিরূপে?'

শ্রীচৈতন্য। যাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিলে কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি পায়,

তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিয়া সম্মান করিবে। এইরূপে নাম স্ফুরণ হইলে সংসারাসক্তি ছুটিয়া যাইবে এবং নববিধ ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে।' পরে শ্রীখণ্ডের মুকুন্দদাস, নরহরি ও রঘুনন্দনের দিকে তাকাইয়া প্রভু বলিলেন 'মুকুন্দ! রঘুনন্দন তোমার পুত্র, না তুমি তাঁহার পুত্র?' মুকুন্দ উত্তর করিলেন "রঘুই আমার পিতা, আমি তাহার পুত্র। কেননা আমাদের কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হইতে।" শ্রীচৈতন্য এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন 'ঠিক্ বলিয়াছ; যাঁহা হইতে ভক্তিলাভ হয়, তিনিই গুরু।' তখন গৌরচন্দ্র সর্ব্বজন সমক্ষে মুকুন্দের গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ইঁহার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে নির্ম্মল নিগূঢ় প্রেম দেখা যায় না। ইনি ম্লেচ্ছরাজের রাজবৈদ্য। এক দিন উচ্চ টুঙ্গিতে বসিয়া রাজা ইঁহার সঙ্গে চিকিৎসা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। শিখিপুচ্ছের আড়ানি দ্বারা সেবক রাজাকে ব্যজন করিতেছিল। শিখিপুচ্ছ দেখিয়া মুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হওয়ায় প্রেমে অজ্ঞান হইয়া টুঙ্গি হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া লোক দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বড় বেদনা হইয়াছে কি?' ইনি বলিলেন, 'না।' রাজা পুনরায় সুধাইলেন, 'এমন হইল কেন?' মুকুন্দ আসল কথা লুকাইয়া বলিলেন, 'আমার মৃগিব্যাধি আছে।' কিন্তু রাজা বুদ্ধিমান্; ভিতরকার কথা বুঝিতে পারিয়া ইঁহাকে মহাসিদ্ধ জ্ঞান করিলেন।' মুকুন্দকে গৌর বলিলেন, 'তুমি ধন উপার্জ্জনে ক্ষান্ত হইও না। রঘুনন্দন কৃষ্ণসেবা করিবেন ও নরহরি আমার ভক্তগণ সঙ্গে থাকিবেন।' সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতিকে একত্র দেখিয়া গৌর বলিলেন, 'সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ দারুব্রহ্মরূপে ও ভাগীরথী জলব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সার্ব্বভৌম দারুব্রহ্মের ও বাচস্পতি জলব্রহ্মের সেবা করিতেছেন।' মুরারি গুপ্তকে উদ্দেশ করিয়া প্রভু বলিলেন, 'ইনি রামচন্দ্রের একান্ত উপাসক; কিন্তু আমি এক সময়ে ইঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের গুণগরিমা কীর্ত্তন করিয়া ইঁহার মন ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। ইনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমার আজ্ঞাকারী, যাহা বলিবে তাহাই করিব।' কিন্তু রাত্রি কালে চিন্তা করিয়া প্রাতে কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিলেন, রামচন্দ্রের পদে আমি মাথা বেচিয়াছি, কোন্ প্রাণে তাঁহাকে ছাড়িব? আমি পারবো না।' এই বলিয়া ইনি বিহ্বল হইলেন। তখন আমি বলি

লাম, সাধু! সাধু! এইরূপ বিশ্বাস চাই ; নইলে কি ধর্ম্ম লাভ হয়? তুমি কেন রামচন্দ্রকে ছাড়িবে? আমি তোমার বিশ্বাস পরীক্ষার জন্য কেবল কৌতুক করিয়াছিলাম।' এই বলিয়া গৌর মুরারিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'তুমি আমার প্রাণসম।' গৌরচন্দ্র বাসুদেব দত্তের গুণের অনেক প্রশংসা করিলে দত্ত নিজ গুণ শুনিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 'প্রভু! তোমার চরণে আমার এক নিবেদন আছে ; জগতে জীবের দুঃখ আর দেখিতে পারি না। হরিবিমুখ জনের পাপক্লেশ দেখিয়া আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। আমার এই প্রার্থনা যে, তাহাদের সকল পাপ আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দাও ; তাহারা নিষ্পাপ হইয়া উদ্ধার হইয়া যাউক্। আমি তাহাদের হইয়া নরক যন্ত্রণা ভুগিব।' গৌরচন্দ্র বাসুদেবের ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন এবং সকরুণ বচনে বলিতে লাগিলেন, 'তুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের শক্তিধর। ভগবান্ ভক্তাধীন ; তুমি যখন এই প্রার্থনা করিলে, তখন অবশ্যই সকল জীব উদ্ধার হইয়া যাইবে। তোমাকে তিনি কেন নরকভোগ করাইবেন? ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি কি ভক্তের কাতর প্রার্থনায় ব্রহ্মাণ্ডের জীবকে উদ্ধার করিতে পারেন না? আর অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে যাঁ'র লীলা ; একটী ব্রহ্মাণ্ডের জীব উদ্ধার হইলে কি সৃষ্টি লীলার কিছু হানি হইতে পারে?' আর আর ভক্তগণকেও শ্রীচৈতন্য এইরূপে একে একে আলিঙ্গন প্রেমালাপ করিয়া বর্ষান্তে আসিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় দিলেন। ভক্তগণ বিষণ্ণচিত্তে দলবদ্ধ হইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হরিদাস ঠাকুর, গদাধর পণ্ডিত, পুরী, ভারতী, স্বরূপ, জগদানন্দ, দামোদর, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর এবং উৎকলের ভক্তগণ প্রভুর নিকটে থাকিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে যমেশ্বর টোটায় থাকিবার অনুমতি হইলে তিনি সেইখানে বাস করিলেন এবং গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিয়া সাধন ভজন করিতে লাগিলেন।

একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, 'এখন গৌড়ের ভক্তগণ চলিয়া গেলেন, তোমাকেও নিমন্ত্রণ খাওয়ার অবসর হইল। আমার গৃহে যদি মাসাবধি ভিক্ষা কর, তবে বড় সুখী হই।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'এক স্থানে অধিক দিন ভোজনে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হানি হয়। তোমার গৃহে এক মাসের নিমন্ত্রণ লইতে পারি না।'

সার্ব্বভৌম। তবে বিশ দিনের লও।

শ্রীচৈতন্য। তাও পারি না।

সার্ব্বভৌম। তবে ১৫ দিনের।

গৌর। না; তোমার বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ লইতে পারি। সার্ব্বভৌম অনেক মিনতি করিয়া ৫ দিনের জন্য সম্মত করাইলেন। এবং পুরী গোঁসাইকে আর পাঁচদিনের ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগকে দুই দুই দিনের নিমন্ত্রণ করিয়া এক মাস পূর্ণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'এক দিনে অধিক লোককে বলিলে ভাল করিয়া সেবা করিতে পারিব না; সেবাপরাধ হইবে। অতএব এক দিন এক এক জনকে ভোজন করাইয়া ক্রমে একমাসে ব্রত উদ্‌যাপন করিব।' যাহা হউক, ভট্টাচার্য্য সে দিন শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আসিয়া পাকের আয়োজন করিলেন। ভট্টাচার্য্যের এক কন্যা ছিল, তাহাকে ষাঠী বলিয়া ডাকিত। ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী ষাঠীর মাতা দুই প্রহরের মধ্যে বিবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদির সহিত অন্ন প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। পাকশালার দক্ষিণ দিকে দুই খানি নূতন ঘর ছিল। এক খানি শালগ্রাম বিগ্রহের ভোগ মন্দির, আর একখানি শ্রীচৈতন্যের ভোজনের জন্য নিভৃত স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার বাহির দিকে একটী দুয়ার এবং পাকশালার দিকে দ্বিতীয় দুয়ার। সেই গৃহে বৃহৎ কদলী পত্রে স্তূপাকারে অন্ন সজ্জিত হইয়া পীতবর্ণ সুগন্ধি গব্যঘৃতে সিক্ত হইল। তাহার চারিদিকে কেয়াপাতের ডোঙ্গা ও মোচার খোলায় সারি সারি বিবিধ ব্যঞ্জন সজ্জিত হইল। এক শাকই দশ প্রকার, কত তরকারী, ভাজা, দাইল, অম্ল, বড়া, পিষ্টক, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, রম্ভা প্রভৃতি ফল; নানা উপচারে খাদ্য সামগ্রী রক্ষিত হইল। বৃহৎ পিঁড়িতে নেত পট্টবস্ত্র মণ্ডিত করিয়া রাখা হইল এবং অন্ন ব্যঞ্জনের উপর তুলসী মুঞ্জরী দেওয়া হইল। শ্রীচৈতন্য অন্ন ব্যঞ্জন দেখিয়া খাইবেন কি, প্রেমে বিহ্বল হইলেন এবং ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন, 'তুমি ধন্য যে এইরূপ অন্নব্যঞ্জন শ্রীকৃষ্ণে ভোগ দিয়াছ? এত অল্প সময়ের মধ্যে কেমন ক'রে এত সামগ্রী প্রস্তুত করিলে? যাহা হউক, এত অন্ন খাইতে পারিব না; অন্ন কিছু কিছু তুলিয়া আমাকে স্বতন্ত্র স্থানে দাও।' ভট্টাচার্য্য বলিলেন, না খাইতে পার, পড়িয়া থাকিবে। ভোজনে ব'সো।'

শ্রীচৈতন্য তাঁহার খাতিরে ভোজনে বসিলেন। বাহির দিকের দুয়ার বন্ধ করা হইল। ভিতর দিকের দুয়ারে ভট্টাচার্য্য বসিয়া প্রভুকে খাওয়াইতে

লাগিলেন। অমোঘ ভট্টাচার্য্য নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত ষাঠী কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। সে ভট্টাচার্য্যের গৃহে ঘরজামাই থাকিত। পরনিন্দা করা অমোঘের স্বভাব। সে ভোজনগৃহের নিকট আসিয়া ঘরের মধ্যে উকি মারিয়া দেখিয়া বলিতে লাগিল, 'বাপরে! খাওয়া দেখ। ১০।১২ জনের ভাত সন্ন্যাসীটা একলা খা'চ্চে।' ভট্টাচার্য্য ক্রোধ-ভরে তাহার পানে তাকাইলে সে পলাইয়া গেল। ভট্টাচার্য্য হাতে লাঠী লইয়া তাহাকে মারিবার জন্য পিছে পিছে দৌড়িলেন, কিন্তু ধরিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়া নানা প্রকারে শাপ শাপান্ত ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। এ দিকে ষাঠীর মাতাও 'ষাঠী বিধবা হউক' বলিয়া গালি পাড়িতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের রকম দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, 'হয়েছে কি যে তোমরা এমন করে উহাকে গালি দিতেছ? অমোঘ তো কিছু অন্যায় বলে নাই। বাস্তবিক অন্নব্যঞ্জন তো অধিক পরিমাণে দিয়াছ।' এই বলিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে অধিক পরিমাণে ভোজন করিলেন। এবং আচমনান্তে মুখশুদ্ধি লইয়া গমনোদ্যত হইলে ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "হায়! নিন্দা করাইবার জন্য তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। আমাদের এ অপরাধ যে অমার্জ্জনীয়।' শ্রীচৈতন্য পতিপত্নীকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহার বাসা পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইয়া নানারূপে আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে পাঠাইলেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে আসিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন "চৈতন্যপ্রভুর যে নিন্দা করে, তাহাকে বধ না করিলে অথবা আত্মহত্যা না করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কিন্তু ব্রহ্মহত্যা মহাপাতক, তাহা করিব না; তবে ঐ নিন্দুকের আর মুখ দেখিব না। তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম। ষাঠীকে বল যে নিন্দুক ও পতিত পতিকে সে ছাড়ুক।" অমোঘ এ দিকে যে পলাইয়াছে, আর সে রাত্রে বাড়ীতে আসিল না। দৈবাৎ সেই রাত্রিতে অমোঘ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইল। ভট্টাচার্য্য প্রাতঃকালে সে সংবাদ শুনিয়া বলিলেন 'ঈশ্বরাপরাধের ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলিয়াছে। ভালই হইল, দৈব সহায় হ'য়ে আমার অভীপ্সিত কার্য্য করিয়া দিলেন।' এ দিকে গোপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুকে এই সংবাদ দিলে ও ভট্টাচার্য্য সপত্নীক উপবাসী আছেন জানাইলে, শ্রীচৈতন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া অমোঘকে নানারূপে

শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করিলেন ও সে নীরোগ হইলে তাহার বুকে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন 'ব্রাহ্মণের হৃদয় সহজেই নির্ম্মল, ভগবানের বসিবার উপযুক্ত আসন। তবে এই পবিত্র স্থানে মাৎসর্য্য চণ্ডালকে বসাইয়া কেন অপবিত্র করিলে? এখন অনুতাপ কর। উঠ! অবশ্যই ভগবান্ তোমায় কৃপা করিবেন।' অমোঘ অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া আপন গালে আপনি চড়াইতে লাগিল ও শ্রীচৈতন্যের চরণে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য প্রসন্নচিত্তে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি আমার পরম স্নেহপাত্র। তোমার কি আমি কোন অপরাধ লইতে পারি? আর দুঃখ করিও না। উঠ! নিরন্তর কৃষ্ণনাম লও ও কৃষ্ণ সেবা কর।' ইহার পর গৌরচন্দ্র অমোঘকে সঙ্গে লইয়া সার্ব্বভৌমের নিকটে যাইয়া বলিলেন 'অমোঘ বালক, আমাদের ছেলে; তা'র উপর কি রাগ করিয়া উপবাসী থাকিতে আছে? এই দেখ অমোঘ স্বীয় দোষ বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে। ইহাকে গ্রহণ কর। ভগবানের কৃপায় এ ভক্তি লাভ করিয়া পরম বৈষ্ণব হইবে।' এইরূপ নানা কথায় শ্বশুর জামাতায় মিলন করাইয়া দিয়া শ্রীচৈতন্য বাসায় আসিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গৌড়ে প্রত্যাগমন।

সন্ন্যাসের পর চারি বৎসর গত হইয়াছে। শচীনন্দন নীলাদ্রির পুণ্য ভূমিতে সুখে বাস করিতেছেন। ক্রমে দুই বৎসরে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তৃতীয় বৎসরে বৃন্দাবন গমনে ইচ্ছা হইলে রামানন্দ সার্ব্বভৌমকে মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। বিচ্ছেদের ভয়ে তাঁহারা আজ কাল করিয়া দুই বৎসর কাটাইয়া দিলেন। পঞ্চম বৎসরে বঙ্গদেশের ভক্তগণ রথযাত্রার পূর্ব্বে আসিয়া রথযাত্রা দর্শন করিয়াই দেশে প্রত্যাগমন করিলেন; অন্যান্য বর্ষের ন্যায় চাতুর্ম্মাস্য নীলাচলে থাকিলেন না। ভক্তগণ বিদায় হইয়া গেলে শ্রীচৈতন্য একদিন রামানন্দ রায়ের ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট বলিলেন, 'বৃন্দাবন যাইবার জন্য

আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আমার দুইটী প্রিয়তম বস্তু আছে; প্রথম জননী, দ্বিতীয় জাহ্নবী। তাঁহাদিগকে দর্শন করা নিতান্ত প্রয়োজন। তোমাদের দুই জনের বাধায় যাইব, যাইব, করিয়া দুই বৎসর কাটাইয়া দিলাম, যাইতে পারিলাম না। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমাকে যাইতে অনুমতি দাও। উভয়ে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, 'এখন বর্ষা সমাগত হইল, পথে যাইতে বড় ক্লেশ হইবে; আগামী বিজয়াদশমীদিনে যাত্রা করিবেন।' শ্রীচৈতন্য এই কথায় সম্মত হইলেন এবং বর্ষার কয়েক মাস কাটাইয়া দিয়া বিজয়ার দিনে শুভ যাত্রা করিলেন। জগন্নাথের প্রসাদ ও মালা চন্দন সংগ্রহ করিয়া লইয়া শচীনন্দন প্রাতঃকালে যাত্রা করিলেন। উৎকলবাসী সমস্ত ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিতে লাগিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে ডাকিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তোমার ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়া উচিত নয়, তুমি যাইও না।' পণ্ডিত উত্তর করিলেন, 'তুমি যেখানে, সেই নীলাচল। আমার ক্ষেত্র সন্ন্যাস রসাতলে যাউক।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'তোমার গোপীনাথের সেবা ছাড়া উচিত নয়।'

পণ্ডিত। তোমার চরণ দর্শনের কাছে কোটি সেবাও তুচ্ছ।

শ্রীচৈতন্য। ছি! ছি! অমন কথা ব'লো না। তুমি সেবা ছাড়িলে আমার অপরাধ হইবে। এখানে থাকিয়া সেবা কর, আমি সুখী হইব।

গদাধর পণ্ডিত রাগ ও অভিমানে উত্তর করিলেন, 'আমি তোমার সঙ্গেও যাইব না, তোমার জন্যে ও নয়। একাকী যা'বো—সঙ্কল্প, শচী মাতাকে দর্শন করা। ইহাতে প্রতিজ্ঞাসেবা ছাড়ার যে দোষ হয়, হইবে; আমি তাঁহার ভাগী। তবুও আমি যাইব।'

শ্রীচৈতন্য ইহার পর আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। গদাধর পণ্ডিত দল ছাড়া হইয়া একাকী পাছে পাছে যাইতে লাগিলেন। কতক দূর আসিলে গৌরচন্দ্র কতক লোককে বিদায় দিলেন। তথাচ প্রধান প্রধান ভক্তগণ সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। পুরী গোঁসাই, স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য্য, দামোদর পণ্ডিত, এবং রামাই, নন্দাই, প্রভৃতি সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। ভবানীপুরে আসিয়া সকলে অবস্থিতি করিলেন। এখানে রামানন্দ রায় ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দোলারোহণে আসিয়া মিলিত হইলেন। বাণীনাথ বাহক দ্বারা অনেক মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া ছিলেন। ভোজনান্তে

যাত্রীদল ভুবনেশ্বর হইয়া কটকে উপনীত হইলেন। শ্রীচৈতন্য সাক্ষীগোপাল দর্শনান্তে স্বপ্নেশ্বর নামক বিপ্রভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বকুলতলায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে রামানন্দরায় রাজপ্রাসাদে যাইয়া প্রতাপরুদ্রকে সংবাদ দিলে রাজা ব্যগ্রচিত্তে বকুলতলায় আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া অনেক দিনের মনের সাধ মিটাইলেন। কারণ ইহার পূর্ব্বে রথের সময়ে পুষ্পোদ্যানে যে দর্শন, সে প্রভুর অন্তর্দ্দশায় বিহ্বল অবস্থায়। শ্রীচৈতন্য সে সাক্ষাতে রাজাকে চিনিতে পারেন নাই। রাজা প্রেমগদ্গদচিত্তে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে শ্রীচৈতন্য কৃপাপরবশ হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া রাজাকে অকপট আলিঙ্গন দিলেন এবং রাজার নিষ্কপট প্রেম-ভক্তি দেখিয়া মহাসুখী হইলেন। নানারূপ কথাবার্ত্তায় রাজা ও অমাত্য বর্গকে সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিয়া গৌরচন্দ্র যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর গমনের সুবিধার জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন। সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ হইল, নানা প্রকার সামগ্রীসম্ভার আনিয়া প্রভুর সেবা করিতে। সৈন্যগণ বেত্র হস্তে সঙ্গে যাইতে, বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিতে ও বিনা ক্লেশে ঘাটাদি পার করিয়া দিতে আদিষ্ট হইল। হরিচন্দন ও মঙ্গরাজ নামক সচিবদ্বয় ও রাজা রামানন্দকে প্রভুর সঙ্গে যাইতে আদেশ হইল। এদিকে সহরের চিত্রোৎপলা নদীঘাটে পারে যাইবার জন্য উৎকৃষ্ট তরণী রক্ষিত হইল। নগরের পথে ও ঘাটে রমণীয় তোরণ ও স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। মহাপ্রভু সন্ধ্যাকালে যাত্রা করিবেন জানিতে পারিয়া রাজা বৃহৎ বৃহৎ হস্তীর উপরে পটমণ্ডপ রচনা করিয়া তাহার মধ্যে রাজমহিষী, পুরাঙ্গনা ও পরি-জনদিগকে লইয়া, যাইবার পথে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নিরূপিত সময়ে চৈতন্যদেব গণসহ নদীঘাটে আসিয়া স্নানাবগাহন করিলেন। এই সময়ে রাজা মহিষীদিগকে সঙ্গে লইয়া পাদবন্দনা করিলে গৌর কৃপা আশী-র্বাদ করিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে ডাকিয়া হাতে ধরিয়া গৌর বলিলেন, প্রতিজ্ঞাসেবা ছাড়িয়া আমার সঙ্গে আসিতে যে সঙ্কল্প করিয়া-ছিলে, তাহা তো সিদ্ধ হইল। সেবা ত্যাগ প্রথম অপরাধ, নিজের সুখ বাঞ্ছা করিয়া আমার সঙ্গে থাকিবার অভিলাষ, দ্বিতীয় অপরাধ। ইহাতে তোমার ধর্ম্ম হানি হইবে জানিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। অতএব আর কেন, নীলাচলে ফিরিয়া যাও। আমার শপথ লাগে যদি

আর আপত্তি কর।' এই বলিয়া চৈতন্যদেব সপার্ষদে নৌকায় উঠিলেন। গদাধর নদীতীরে সৈকত ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতকে সুস্থ করিয়া সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া গৌরচন্দ্র নদী পার হইয়া চতুর্দ্বার নামক স্থানে আসিয়া রজনী যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে রাজাজ্ঞায় নীলাচল হইতে অনেক মহাপ্রসাদ আসিয়া উপনীত হইল। গৌরচন্দ্র সদলে প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে প্রসাদ ভোজন করিয়া পথ অতিবাহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাজপুরে আসিয়া গৌরচন্দ্র রাজামাত্যদ্বয়কে বিদায় দিলেন, এবং রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা রঙ্গে রেমুণা (কোন মতে ভদ্রক) পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। যেখানে যান, সেইখানে রাজাজ্ঞায় গৌর মহাসুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ যোড় হস্তে তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

রেমুণা হইতে গৌরচন্দ্র রামানন্দরায়কে বিদায় দিলে রায়, শোকে বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ইহার পর গৌরচন্দ্র উৎকল রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলে রাজকর্ম্মচারী মহাপাত্র তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। দুই চারি দিন বিশ্রামের পর মহাপাত্র বলিলেন, 'ইহার পর পিছলদা পর্য্যন্ত সব দেশ মদ্যপ যবন রাজার অধিকার। সে ব্যক্তি অতি দুর্দ্দান্ত; তাহার ভয়ে কেহ পথে চলিতে ও নদীতে নৌকা বাহিতে পারে না। আপনি দিনকতক এখানে বিশ্রাম করুন্। আগে তাহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া লই; পরে আপনাদিগকে নৌকারোহণে দেশে পাঠাইব।' এই মদ্যপ যবনরাজ কে, তাহার সঠিক বৃত্তান্ত পাইবার উপায় নাই। অনুমান হয়, একজন পরাক্রান্ত মুসলমান ভূম্যধিকারী অথবা বঙ্গেশ্বরের সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইবেন। এই সময়ে যবনরাজের এক গুপ্ত চর ছদ্মবেশে উড়িয়া কটকে আসিয়া চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি, আচরণ ও প্রেমচেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল ও স্বীয় প্রভুকে যাইয়া নিবেদন করিল 'জগন্নাথ হইতে এক সন্ন্যাসী অনেক সিদ্ধ পুরুষ সঙ্গে আসিয়াছেন। সকলেই হাসে, কাঁদে নাচে, গায়, এবং কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া কি করে, তাহার ঠিকানা নাই। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া যাইতেছে।' এই বলিয়া সেই লোক পাগলের ন্যায় হাসিতে, কাঁদিতে

নাচিতে লাগিল, দেখিয়া যবনাধিপের মন ফিরিয়া গেল। তখন তিনি আপনি বিশ্বাসকে উৎকল রাজকর্ম্মচারীর সমীপে পাঠাইলেন। বিশ্বাস মহাপাত্রের নিকট যবনরাজের গৌরাঙ্গদর্শনে ব্যাকুলতা ও তাঁহার প্রতি বন্ধুতাভাব জানাইলে মহাপাত্র বলিলেন, 'নিরস্ত্র হইয়া কেবল মাত্র ৪।৫টী ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিতে অঙ্গীকার করিলে, আসিতে বলিও।' বিশ্বাস যবনশিবিরে প্রত্যাগত হইয়া এই সংবাদ জানাইলে, ম্লেচ্ছাধিপ হিন্দুর বেশ ধারণ করিয়া উড়িয়া শিবিরে আসিলেন ও চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহাপাত্র তাঁহাকে বহু সম্মান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। যবনরাজ শ্রীচৈতন্যকে বলিতে লাগিলেন, 'হায়! কেন আমি মুসলমান বংশে জন্মিয়াছিলাম? তা' না হলে তো তোমার চরণ সেবা করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতাম।' মহাপাত্র বলিলেন, 'প্রভু! তুমিই ধন্য! যে নাম গ্রহণে চণ্ডালও পবিত্র হয়, ইনি তোমার প্রভাবে সেই পবিত্র হরিনাম লইয়া যে ধন্য হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি? কে ইহার অন্তরে থাকিয়া মন ফিরাইয়া দিল?' শ্রীচৈতন্য যবনরাজকে কৃপা করিয়া হরিনাম দীক্ষা দিলেন। যবনরাজ বলিলেন, 'প্রভু! আমি ঘোর পাপী; কত যে পাপ করিয়াছি, তার সীমা নাই। যদি এই অধমকে কৃপা করিলেন; তবে আপনার সেবা করিতে অধিকার দেন, আমি ধন্য হইয়া যাই।' মুকুন্দ দত্ত সময় বুঝিয়া বলিলেন, 'বঙ্গ দেশে যাইতে প্রভুর বড় ইচ্ছা হইয়াছে; আপনি যদি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তবে বড় উপকার হয়।' ম্লেচ্ছপতি উত্তর করিলেন, 'এ আর একটা কঠিন ব্যাপার কি?' অতঃপর তিনি বৈষ্ণবগণের যথাযোগ্য পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইয়া গেলেন। উৎকলরাজপ্রতিনিধি যবনরাজের সহিত আলিঙ্গন কোলাকুলি করিয়া অনেক সামগ্রীসম্ভার দিয়া মিত্রতা স্থাপন করিলেন। উভয় রাজ্যে সন্ধি হইয়া গেল। পর দিন প্রাতে অনেক নৌকা সাজাইয়া যবনপতি বিশ্বাস পাঠাইয়া প্রভুকে দলসহ নিজ শিবিরে আনিলেন। মহাপাত্রও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ম্লেচ্ছরাজ প্রভুর পাদবন্দনা করিয়া এক সুবৃহৎ নূতন নৌকার রমণীয় প্রকোষ্ঠে গণ সহ উঠাইয়া দিয়া জলদস্যু ভয়ে আর দশখানি নৌকায় সৈন্য পূর্ণ করিয়া স্বয়ং সঙ্গে চলিলেন। শ্রীচৈতন্য উৎকল রাজপ্রতিনিধিকে আলিঙ্গন দিয়া বিদায় করিলে, মহাপাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে, মন্ত্রেশ্বর নামক দুষ্ট

নদী পার করাইয়া দিয়া যবনরাজ পিছলদা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিলেন এবং নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়াছেন জানিয়া প্রভুর পাদবন্দনা করিয়া সাশ্রু লোচনে বিদায় হইয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে মহাপ্রভু সেই নৌকারোহণে অচিরাৎ পানিহাটী বা বর্ত্তমান পেনেটী গ্রামে আসিয়া উপনীত হইয়া নাবিকদিগকে কৃপাসাটী পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। যে পথে গৌরচন্দ্র পেনেটী আসিলেন, ইহা কোন্ পথ, ঠিক্ জানা যায় না। অনুমান হয়, সুবর্ণরেখা নদীর মুখ দিয়া বঙ্গোপসাগর পার হইয়া ভাগীরথীতে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন। পানিহাটী গ্রামে গৌরভক্ত রাঘব পণ্ডিতের বাসস্থান। প্রভু আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া রাঘব পণ্ডিত স্বশিষ্যে যাইয়া মহা সমাদরে গৃহে আনিলেন ও নানা উপচারে গণসহ প্রভুর সেবা করিলেন। রাঘবের ভগিনী দময়ন্তী দেবী প্রভুর একান্ত ভক্ত; নানা খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইলেন। গৌর আসিয়াছেন শুনিয়া রাঘব-গৃহে মহা জনতা হইল। এঁড়িয়াদহ নিবাসী গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস ও রাঘবশিষ্য মকরধ্বজ করকে এইখানে মহাপ্রভু কৃপা করিলেন। নিত্যানন্দও এইখানে গৌরের সঙ্গে মিলিত হইলেন। রাঘব-গৃহে একদিন অবস্থিতি করিয়া গৌরচন্দ্র প্রাতঃকালে কুমারহট্ট বা বর্ত্তমান হালিসহর গ্রামে শ্রীবাস ভবনে আগমন করিলেন। গৌরের সন্ন্যাসগ্রহণ ও উৎকল যাত্রার কিছু পরেই শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপের বাস-পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে বাস করিয়াছিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে, গৌরের অনুপস্থিতিতে পণ্ডিতের উপর অত্যন্ত নির্যাতন হওয়ায় তিনি বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে নবদ্বীপে তাঁহার প্রবাস-বাটী ছিল; মধ্যে মধ্যে তথায় যাতায়াত করিতেন এবং সময়ে সময়ে থাকিতেন। চারি সহোদরের মধ্যে এখন কেবল শ্রীবাস ও শ্রীরাম জীবিত ছিলেন। গৌর, পণ্ডিতের অনেক পোষ্য ও সাংসারিক কষ্ট দেখিয়া ধন উপার্জ্জনের জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে বলিলে বিশ্বাসী শ্রীবাস হাতে তিন তালি দিয়া বলিলেন, 'যদি তিন উপবাসের পরও ভক্ষ্য দ্রব্য আপনা হইতে না আইসে, তাহা হইলে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিব, তথাপি উপার্জ্জনের চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিব না।" গৌরচন্দ্র শ্রীবাসের বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব দেখিয়া মহা সুখী হইয়া বলিলেন 'তোমায় কেন অর্থ উপার্জ্জ-

করিতে হইবে? কৃষ্ণ কৃপায় সব আপনা হইতে মিলিয়া যাইবে।' শ্রীবাসের গৃহে সঙ্কীর্ত্তনে, ভাগবত শ্রবণে ও পণ্ডিতের বিদূষক লীলায় মহানন্দে গৌরের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেনের নিবাসও কুমারহট্টে। গৌরচন্দ্র তাঁহাদের গৃহে যাইয়াও কত লীলা কৌতুক করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব শ্রীচৈতন্যের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। ইঁহারা তিন ভ্রাতাই অতি সুগায়ক; গৌরের আদেশে নীলাচল হইতে আসিয়া নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইঁহাদের পৈতৃক বাস কুমারহট্টে। গৌর বাসুদেবকে বলিয়াছিলেন, 'আমার শরীর পর্য্যন্ত তোমার। আমাকে তুমি যে হাটে বেচ, আমি সেই খানেই বিকাই।' আচার্য্য পুরন্দরের সহিত শ্রীবাস মন্দিরে সাক্ষাৎ হইলে গৌর ইঁহার পাদবন্দনা করিলেন। পাঠক মহাশয়ের মনে আছে, ইঁহাকে গৌর পিতৃসম্বোধন করিতেন। গৌরের নবদ্বীপ ত্যাগের পর ইনিও কুমারহট্টে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, কতক দিন শ্রীবাসগৃহে বিহার করিয়া ও শ্রীরাম পণ্ডিতকে শ্রীবাসের সেবা করিবার জন্য বিশেষ উপদেশ দিয়া গৌরচন্দ্র সশিষ্যে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। বিদ্যাবাচস্পতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ সহোদর ও নবদ্বীপের স্বর্গীয় মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। বোধ হয়, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পর বিদ্যাবাচস্পতি নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টের নিকটে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য লোক সংঘট্ট এড়াইতে ও নির্জ্জনে গঙ্গাবাস করিতে তাঁহার আলয়ে আগমন করিলেন। বাচস্পতি মহাশয় পরমানন্দিত হইলেন। কিন্তু সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপনে থাকে? গৌরের আগমন বার্ত্তা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় নবদ্বীপ অঞ্চল ও অন্যান্য অনেক স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক আসিতে লাগিল। বন, উপবন, মাঠ, ঘাট, লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কেহ বা নৌকায়, কেহ ভেলায়, কেহ কেহ বা ঘট বুকে দিয়া গঙ্গাপার হইয়া গৌরাঙ্গদর্শনে আসিতে লাগিল। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, প্রভৃতি মনুষ্যের গহনে ক্ষুদ্রগ্রামে স্থান হইল না। শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ দিয়া বিদায় দিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকের ভিড় তথাচ কমিল না। দিন দিন মহা জনতা হইতে লাগিল। গৌরচন্দ্র লোকের ভিড়ে উত্যক্ত হইয়া বাচস্পতির অজ্ঞাতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েক জন মাত্র বিশ্বাসী বন্ধু সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপের নিকট

কুলিয়া গ্রামবাসী মাধব দাস নামক ব্যক্তির গৃহে পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লই-লেন। এদিকে গৌরকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া আগন্তুক লোক সকল বাচস্পতিকে তিরস্কার ও নির্য্যাতন করিতে লাগিল। কিন্তু বাচস্পতি, গৌর কোথায় গিয়াছেন, কিছুই অবগত নহেন। সুতরাং লোক নির্য্যাতনে বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। পরে প্রভুর কুলিয়া গমনের সংবাদ শুনিতে পাইয়া বিদ্যা-বাচস্পতি আত্মদোষ ক্ষালনার্থ সেই সব লোক সঙ্গে লইয়া কুলিয়ায় আসিলেন ও চৈতন্য প্রভুকে অনুরোধ করিয়া সকলের সমক্ষে আনিয়া তাঁহাকে লুকা-ইয়া রাখার অযথা কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কুলিয়াতে জন-কোলাহল আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। অনন্ত অর্ব্বুদ লোক আসিয়া গ্রাম, প্রান্তর, বন, জঙ্গল ছাইয়া ফেলিল। ঘাটে বহুসংখ্যক নৌকা রাখিয়াও পারের সুবন্দোবস্ত হইল না! গ্রামে দোকানী পসারী বসিয়া এক মহা মেলা হইয়া গেল। কথিত আছে, যে সকল লোক গৃহস্থাশ্রমে থাকার সময়ে গৌরের নিন্দা কুৎসা রটাইত, তাহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার শরণাগত হইল। তিনি তাহাদিগকে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণভক্তি উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। কুলিয়াতে যে সকল লোককে শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে চাঁপাল গোপাল ও দেবানন্দ পণ্ডিত প্রধান। চাঁপাল গোপালের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে লিখিত হইয়াছে*। এই ব্যক্তি সাধু অপরাধের জন্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছিল। গৌরের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে একদিন গঙ্গার ঘাটে সে তাঁহার চরণে ধরিয়া-ছিল। গৌরচন্দ্র তখন তাহাকে প্রসন্ন হয়েন নাই। এক্ষণে তাঁহার কুলি-য়ায় আগমন সংবাদ পাইয়া সে ব্যক্তি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। গৌর প্রসন্ন বদনে ও করুণ বচনে তাহাকে বলিলেন, 'দেখ! শ্রীবাসের স্থানে তোমার অপরাধ আছে; দুষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তোমায় প্রসন্ন হইলে তোমার ব্যাধি দূর হইবে।' পরে সে শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রসন্নতা লাভ করিয়া ব্যাধি মুক্ত ও নিষ্পাপ হইয়াছিল।

দেবানন্দ পণ্ডিতের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।† ইনি সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের প্রতিবাসী; একজন পরম জ্ঞানী

* ২০৫ পৃষ্ঠা দেখ।

† পূর্ব্বভাগ, ৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।

ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ইঁহার যে অপরাধ ছিল, তাহার জন্য গৌর একদিন ইঁহাকে নবদ্বীপের রাজপথে দেখা পাইয়া অনেক মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। সে ভর্ৎসনা ইনি নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু পাপ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই। গৌরচন্দ্রের নীলাচলে অবস্থিতি করার সময়ে ভক্ত বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে ইহার পরিচয় হইয়াছিল। বক্রেশ্বর তাঁহার আলয়ে কিছু দিন বাস করিয়া ছিলেন। বক্রেশ্বরের অদ্ভুত প্রেম চেষ্টা, উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন দেখিয়া শুনিয়া দেবানন্দ প্রেমভক্তির আস্বাদন জানিতে পারিয়াছিলেন। গৌরের কুলিয়ায় উদয়ের পর বক্রেশ্বর এক দিন প্রেমে নাচিতে নাচিতে দেবানন্দের গলা ধরিয়া প্রভুর নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে অনুতপ্ত জানিয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রসাদ করিয়াছিলেন। দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাধুনিন্দা ও পরনিন্দা জনিত পাপ কিসে ক্ষয় হয়?'

চৈতন্য দেব উত্তর করিলেন, "নিন্দিত ব্যক্তির নিকট নিজ পাপ স্বীকার করা, তাঁহার স্তুতি করা, পুনরায় আর নিন্দা না করা এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা, ইহার প্রায়শ্চিত্ত।'

দেবানন্দ বলিলেন, 'আমি ভাগবত পড়াই বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ নিজে বুঝিতে পারি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভাগবতার্থ বুঝাইয়া দেন।' কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য সর্ব্বভক্তসমক্ষে ভাগবতের আদ্যন্তে ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজন, ব্যাখ্যা করিয়া দেবানন্দকে উপদেশ-ছলে সর্ব্বভক্তকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের কুলিয়াবিজয় স্মরণার্থে প্রতিবর্ষ কার্ত্তিক মাসে সেখানে এক মেলা বসিয়া থাকে। অম্বিকাকালনার নিকটে ভাগীরথী তীরে কুলিয়াগ্রাম অবস্থিত।

সাতদিন কুলিয়া গ্রামে অবস্থিতি করিয়া ও বহুবিধ লোককে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়া শ্রীচৈতন্য দলবল সহ শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে আচার্য্যভবনে একজন সন্ন্যাসী অতিথি হইয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কেশব ভারতী চৈতন্যের কে? অদ্বৈত তদুত্তরে 'গুরু' এই কথা বলিবা মাত্র অদ্বৈতের পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র অচ্যুতানন্দ দুঃখিত ও কুপিত হইয়া পিতাকে তিরস্কার করিলেন, "চৈতন্যই তো জগদ্গুরু, তাঁহার আবার গুরু কে? আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন?" অদ্বৈত শিশুপুত্রের ঈদৃশ চৈতন্যনিষ্ঠা দেখিয়া প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া

পুত্রকে কোলে করিয়া আঙ্গিনায় নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমন সময়ে শ্রীচৈতন্য সানন্দে হরিবোল দিয়া আচার্য্য সমক্ষে উপস্থিত হইলেন আচার্য্যের আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। হরিনামের ঘোর ঘটা পড়িয়া গেল ও মহা মহোৎসব লাগিয়া গেল। অদ্বৈত বাহক ও দোলা পাঠাইয়া নবদ্বীপ হইতে শচীদেবীকে আনিলেন। মাতা পুত্রের পুনর্ম্মিলনে সুখতরঙ্গ বহিতে লাগিল। শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া প্রাণের নিমাইকে খাওয়াইতে লাগিলেন। নবদ্বীপের সব ভক্ত আসিয়া একত্রিত হইলেন। প্রত্যাগমন কালে পুনরায় আসিবেন, বলিয়া গৌরচন্দ্র ভক্তগোষ্ঠি সহিত বৃন্দাবন দর্শনোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে অগণ্য লোক যাইতে লাগিল। পথে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, লোক সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল প্রত্যুম্নব্রহ্মচারী নামে গৌরের এক জন উড়িয়া ভক্ত সঙ্গে ছিলেন। ইনি নৃসিংহ উপাসক ছিলেন বলিয়া চৈতন্য তাঁহাকে আদর করিয়া নৃসিংহানন্দ বলিয়া ডাকিতেন। চৈতন্য প্রভুর মথুরায় যাইতে পথশ্রম না জন্মে এই জন্য ইহার মনে বড় সাধ হইয়াছিল যে, কুলিয়া গ্রাম হইতে মথুরা পর্য্যন্ত পথ রত্ন দিয়া বাঁধাইয়া দেন; তাহার উপরে নির্বৃন্ত কুসুমশয্যা পাতিয়া দেন; পথের দুই ধারে প্রস্ফুটিতকুসুম বকুল তরুরাজি পুঁতিয়া দেন; মাঝে মাঝে নির্ম্মলসলিলা পুষ্করিণী কাটিয়া দেন; তাহাতে জলচর নানা পক্ষী ক্রীড়া করে, পাদপচ্ছায়ায় সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং বকুল ডালে পাখী সব কলকণ্ঠে গান করিতে থাকে। ভক্ত মনে মনে এইরূপ করিয়া পথ বাঁধিয়া রাজমহলের নিকটবর্ত্তী কানায়ের নাট্যশালা পর্য্যন্ত আসিয়া, কে জানে কি জন্য, তাঁহার আর আগে যাইতে ইচ্ছা হইল না। তাহাতে মনোবলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এবার গৌরের বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে না; কানায়ের নাটশালা হইতে ফিরিতে হইবে। এই কথা তিনি নাকি ভক্তবৃন্দের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীচৈতন্য ভক্ত দল ও লোকসমাগম লইয়া অল্প দিন মধ্যে বঙ্গের তৎকালের রাজধানী গৌড় নগরের নিকটবর্ত্তী রামকেলি গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। সহর কোতয়াল গৌড়েশ্বরকে জানাইল এক সন্ন্যাসী বহুসংখ্যক লোক সঙ্গে আসিয়া নিরবধি ভূতের সংকীর্ত্তন করিতেছে *। সৈয়দ হুসেন খাঁ বা দ্বিতীয় আলাউদ্দীন

* পূর্ব্বভাগ, ৩০। ৩১ পৃঃ দেখ।

তখন বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি তাঁহার হিন্দু সভাসদ্‌গণকে সন্ন্যাসীসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, কেশবছত্রী, রূপ ও সাকর মল্লিক বা দবীরখাস আতঙ্কিত হইয়া উত্তর করিলেন, 'ভিখারী সন্ন্যাসী তীর্থ-পর্য্যটন করিতে যাইতেছে, তাঁহার সঙ্গে দুই চারি জন ভিক্ষুক চলিয়াছে। তাঁহার এমন কি শক্তি যে, হুজুরের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন। মুসলমান কর্ম্মচারীগণ আপনার নিকট ঠকামি করিয়াছে, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না।' এ দিকে তাঁহারা গোপনে চৈতন্য প্রভুকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, যবনজাতি ঘোর অবিশ্বাসী; যদিও মুখে ভাল কথা বলিতেছে, কি জানি কখন কি বিপদ্ ঘটায়? কিন্তু তাঁহাদের আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। কারণ সৈয়দ হুসেন সাহা শ্রীচৈতন্যের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা দূরে থাকুক, তাঁহার থাকিবার ও সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য; ও কাজীগণ তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে না পারে, তজ্জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন।

রূপ ও সাকর মল্লিকের বীরখাস ও দবীরখাস উপাধি ছিল। ইঁহারা কে, পাঠকমহাশয় জানিতে চাহেন কি? শ্রীচৈতন্যের প্রেমমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া ধূলির ন্যায় রাজকীয় পদমর্য্যাদা ও ধন সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া কন্থা করঙ্ক লইয়া চৈতন্যরঙ্গভূমিতে যাঁহারা রূপ, সনাতন বলিয়া খ্যাত; বৈরাগ্যের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি সেই মহাপুরুষদ্বয়ই গৌড়সচিব রূপ, সাকর মল্লিক। কর্ণপূর সত্য সত্যই তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

'যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাদ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈ দৃঢ়তর পরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ।'

যিনি প্রিয়তমের গুণে সমাকৃষ্ট হইয়া রামকেলিগ্রামে প্রেমালাপ ও আলিঙ্গনরূপা লাভ করিয়া সংসার মায়া হইতে মুক্তিলাভ করত মূর্ত্তিমান্ মধুর রসের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন, সম্প্রতি ভ্রাতা অনুপমের সহিত সেই রূপকে চৈতন্যদেব প্রয়াগে অনুগ্রহ করিলেন।

"গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণি স্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদ স্তদ্বিদাম্।"

রূপাগ্রজ এই সনাতন গৌড়েশ্বরের সভার অলঙ্কার ছিলেন। ইনি মহাসম্পত্তি রূপা লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া নবীনবৈরাগ্য লক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়াছেন। শৈবালাচ্ছাদিত মহা সরোবরের ন্যায় ইহার হৃদয় ভক্তিরসে পূর্ণ; কিন্তু বাহিরে অবধূত বেশ। ইনি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞদিগের প্রীতিপ্রদ।

কর্ণাটদেশে ভরদ্বাজগোত্রে সর্ব্বজ্ঞ নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। ইনি যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হইলেও সকল বেদে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ নামে তাঁহার পুত্র। অনিরুদ্ধের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর এবং কনিষ্ঠ হরিহর। রূপেশ্বর শাস্ত্রে ও হরিহর শস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। দুই পুত্রকে স্বীয় রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া পিতা অনিরুদ্ধ পরলোকে গমন করিলেন। কতক দিন পরে হরিহর জ্যেষ্ঠের রাজ্য কাড়িয়া লইল। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া আটটী অশ্বে আপনার পরিজনবর্গ ও কিছু ধন সম্পত্তি লইয়া স্বীয় বন্ধু পৌরস্ত্য দেশের শিখরেশ্বর রাজার আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন ও তদবধি সেই খানে বাস করিতে লাগিলেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ। ইনি যৌবন কাল হইতেই বেদাদি অশেষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং জগন্নাথ উপাসক ছিলেন। ইনি গঙ্গাবাস করিবার অভিপ্রায়ে শিখর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে নবহট্ট অর্থাৎ নৈহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন এবং পুরুষোত্তম মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া মহা মহোৎসবে প্রতিষ্ঠা করত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পদ্মনাভের অষ্টাদশ কন্যা এবং পাঁচটী পুত্র জন্মিয়াছিল। পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি, ও মুকুন্দ, এই পাঁচটী পুত্র। মুকুন্দের পুত্র কুমার বাল্যকাল হইতেই পরম ধার্ম্মিক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত আছে যে, দৈবাৎ যবন দর্শন হইলে ইনি সে দিন উপবাসী থাকিতেন ও প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পান ভোজন করিতেন না। ইনি অতি নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন; জ্ঞাতিদিগের দৌরাত্ম্যে নৈহাটীর বাস পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ

নামক গ্রামে উঠিয়া গেলেন এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য যশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নামক গ্রামে দ্বিতীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কুমার দেবের অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম রূপ, ও কনিষ্ঠ বল্লভ বা অনুপমই, বৈষ্ণব সমাজে সুবিখ্যাত। বল্লভের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। সনাতন ও রূপ বাল্যকাল হইতেই নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। তাঁহাদের প্রখর বুদ্ধি ও গূঢ় মন্ত্রণা কৌশলের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, গৌড়াধিপ যবন রাজ তাঁহাদের অসাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার কথা শুনিয়া ডাকিয়া আনিয়া উচ্চতম রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যবনের অধীনতা করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও অপমান ও নিষ্পীড়নের ভয়ে তাঁহাদিগকে রাজকার্য্য অঙ্গীকার করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের সাধু মন্ত্রণায় গৌড়াধিপের রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় বাদসাহ স্বল্প করে তাঁহাদিগকে অনেক জমিদারী দিয়াছিলেন। রামকেলিগ্রামে তাঁহারা বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং অল্পদিনেই খুব যশস্বী, প্রতাপান্বিত, দানশীল ও ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। নানা দেশ হইতে তাঁহাদের সভাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গায়ক, বাদক, নর্ত্তক, কবি সকল, আসিতে লাগিলেন। সভাতে নানা শাস্ত্রের বিচার চলিতে লাগিল। তাঁহারা মুক্তহস্তে দান করিয়া সকলকে সুখী করিতে লাগিলেন। নৈহাটী হইতে অনেক জ্ঞাতি কুটুম্ব আনাইয়া রামকেলিতে বাস করাইলেন এবং কর্ণাট দেশ হইতে পূর্ব্ব পুরুষদিগের অনেক জ্ঞাতি আনাইয়া ভট্টবাটী নামে গ্রাম তাঁহাদের বাস জন্য দিলেন। কথিত আছে, ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রে দুই ভ্রাতা অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ভট্টাচার্য্যগণের মধ্যে কোন বিষয়ে তর্ক বাধিলে তাঁহারা মীমাংসা করিয়া দিতেন। সনাতন একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যেন এক বিপ্র আসিয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ উপহার দিয়া গেলেন। তদবধি তিনি ভাগবত অধ্যয়নে একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। সনাতনকৃত দশম টিপ্পনীতে টীকাকার সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও বিদ্যাবাচস্পতিকে গুরু ও পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, রামভদ্র, ও বাণীবিলাস নামক ব্যক্তিত্রয়কে উপদেষ্টা বলিয়া বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, বিদ্যাচর্চ্চায় ইঁহারা তাঁহার গুরু ছিলেন। নবদ্বীপের বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাদের সভায় যাতায়াত করিতেন এবং বিদ্যাবাচস্পতি বৎসরের মধ্যে কতিপয় মাস রামকেলিতেই অবস্থিতি করিতেন।

রূপসনাতন পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। প্রথম হইতেই তাঁহাদের ধর্ম্ম পিপাসা অতি বলবতী দেখা গিয়াছিল ও সাধন প্রগাঢ় ছিল। বাড়ীর দিক এক নিভৃত স্থানে কদম্বাদি বৃক্ষচ্ছায়ায় রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড খনন করিয়া দুই ভাই বৃন্দাবনলীলা স্মরণ করিতেন ও নামাদি গ্রহণে রত থাকিতেন। অতুল রাজ্য, পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও রূপসনাতন মহাবিনয়ী ও দীন ভাবাপন্ন ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরপ্রণেতা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের পুরুষ পুরুষানুক্রমে পরম শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহাদের পিত ম্লেচ্ছ দর্শন হইলে অনুতাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেন, আর তাঁহার ম্লেচ্ছসেবী, ম্লেচ্ছ সঙ্গী ও ম্লেচ্ছ ব্যবহারে রত হইলেন ভাবিয়া দুই ভ্রাত আপনাদিগকে যবন হইতেও হীন মনে করিতেন। এবং তজ্জন্য সময়ে সময়ে তাঁহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনাদিগকে যে ম্লেচ্ছ বলিতেন, তাহা হইতেই অনেকে ভ্রমক্রমে তাঁহাদিগকে মুসলমান বলিয়া থাকেন। সে যাহ হউক, চৈতন্য লীলায় চারিজন ভক্তে চারি প্রকারের গুণ অতি পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। রামানন্দের জিতেন্দ্রিয়তা, দামোদরের নিরপেক্ষতা, হরিদাসের সহিষ্ণুতা ও রূপ সনাতনের দীনতা, সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

রূপসনাতনের ম্লেচ্ছত্ব সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বতোভাবে ভক্তিরত্নাকর প্রণেতার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। তাঁহারা যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও বৈরাগ্যগ্রহণের পূর্ব্বেই সংস্কৃতশাস্ত্রে অশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ম্লেচ্ছসেবা করিতেন বলিয়াই যে তাঁহারা আপনাদিগকে ম্লেচ্ছ মনে করিতেন, এরূপ মনে করিতে পারা যায় না। কারণ তাহা হইলে নীলাচলে যখন গমন করিয়াছিলেন, তখন কেবল তাঁহারাই কেন যবন হরিদাসের বাসায় থাকিতেন? যমেশ্বর টোটায় যাইবার সময়ে সনাতন গোস্বামী কেন যবনের নিষিদ্ধ পথ ছাড়িয়া তপ্তবালুকাময় সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন? এবং কেনই বা পংক্তি ভোজনে বসিতেন না? এই সকল কথার উত্তর ভাবিতে গেলে আপনা হইতেই মনে হয়, কোন প্রকারে তাঁহারা যবনভাবাপন্ন হইয়া থাকিবেন।

রাজদরবার হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রূপ ও সাকর মল্লিক চৈতন্য চন্দ্রের সাক্ষাৎ দর্শন মানসে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া রামকেলিতে লুকাইয়া যাত্রা করিলেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর লোক পরম্পরায় তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া তাঁহারা তৎপ্রতি একা

অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মধ্যে দুই একবার পত্র দ্বারা আপনাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ চাহিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য সেই সকল পত্রের উত্তরে একটীমাত্র সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাটী এই:—

'পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু
তমেবা স্বাদয়ত্যন্ত র্নবসঙ্গরসায়নম্।'

অর্থাৎ পরপুরুষে আসক্তা কুলনারী গৃহকর্ম্মে ব্যস্তা থাকিয়াও মনে মনে যেমন রসবিশেষ আস্বাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও ভগবানের রসামৃতে মন মগ্ন রাখিবে। দবীর খাস সেই অনুসারেই চলিয়া আসিতেছিলেন। এখন রামকেলিতে প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। দুই ভাই দন্তে তৃণ করিয়া প্রথমতঃ হরিদাস ও নিত্যানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তাঁহারা চৈতন্যের নিকট লইয়া গেলেন। রাজমন্ত্রীদ্বয় দর্শন পাইয়াই প্রভুর চরণতলে পড়িয়া বিনয় করিয়া কত কাঁদিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন 'উঠ! উঠ! ভয় নাই; মঙ্গল হইবে।' বীরখাস দবীরখাস স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! আমাদের ন্যায় পাপাত্মা আর নাই; আমাদের উদ্ধার কর। আমাদের কথা বলিতেই লজ্জা করে। জগাই মাধাই হইতেও আমরা ঘোর পাপী। একে ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী ও ম্লেচ্ছসেবী; তাহাতে বিষয়ের গভীরতমকূপে পড়িয়াছি। সেখান হইতে আমাদের তুলিয়া লয় তোমাভিন্ন এমন বলবান্‌ই বা আর কে আছে? তোমার অসীম দয়া; আমাদের যদি কৃপা না কর, তবে আর দয়া চরিতার্থই বা কোথায় করিবে? হে প্রভো! আমাদের কি এমন সুদিন হইবে; যখন বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্তর তোমার অনুচর ও কিঙ্কর-রূপে সেবাব্রত লইয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারিব?'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, 'বীরখাস! দবীরখাস! দৈন্য ছাড়, তোমাদের দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমরা আমার পুরাতন বন্ধু। পূর্ব্বে কত যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহাতেই'ত তোমাদের হৃদয় জানিতে পারিয়াছি। উত্তরে যাহা উপদেশ দিয়াছি, তাহাও ত জান। তোমাদের বড় ভালবাসি, তাই এখানে আসিয়াছি; নইলে রামকেলিতে আসার আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। তা ভাল হ'ল, তোমাদের দেখা পেলাম। এখন ঘরে যাও; শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তোমাদের অচিরাৎ উদ্ধার করি-

বেন।' এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য উভয় ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন ও মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং সকল ভক্তগণকে বলিলেন, 'সকলে কৃপা করিয়া এই দুই জনকে উদ্ধার কর।' তখন নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি ও বক্রেশ্বর, প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত দুই ভ্রাতার পরিচয় করিয়া দিলে, সকলে তাঁহাদের আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা ভক্তগণের পাদ বন্দনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'এখন হইতে ইঁহাদের যবন নামে কেহ ডাকিতে পাইবে না। ইঁহাদের নাম হইল রূপ ও সনাতন।' নৈশগগন বিদীর্ণ করিয়া হরিধ্বনি উঠিল রূপসনাতন চৈতন্যের শক্তিসঞ্চার হেতু নবজীবন পাইলেন। বিদায় হইয়া যাইবার সময় সনাতন চৈতন্যকে বলিলেন, 'প্রভু! শীঘ্র এস্থান হইতে চলিয়া যাও। নিষ্ঠুর ও খল যবন রাজকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। যদি সে এখন তোমাকে ভক্তি করিতেছে; কিন্তু কি জানি বিপদ্ ঘটাইতেই বা আটক কি? বিশেষতঃ তুমি শান্তি পাইবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইবে এত লোক সঙ্গে লইয়া যাওয়া কি ভাল? সাত্ত্বিক ধামে একাকী যাওয়া উচিত। অতএব নিবেদন করি, শীঘ্র এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর। শ্রীচৈতন্য পরদিন প্রত্যূষেই যাত্রা করিয়া কানায়ের নাটশালাগ্রামে চলিয়া আসিলেন এবং দিবাভাগে তীর্থদর্শন করিয়া রজনীতে সনাতনের উপদেশের বিষয় চিন্তা করিয়া বৃন্দাবন যাওয়া স্থগিত করিলেন। প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া পুনরায় তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখানে শচীমাতাকে আনাইয়া দশদিন পর্য্যন্ত মহা মহোৎসবে অতিবাহিত করিলেন। শচীদেবী স্বহস্তে পাক করিয়া পুত্রকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্যের গুরু শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর তিথি আরাধনা উপলক্ষে অদ্বৈত গৃহে মহামহোৎসব হইল। মুরারি গুপ্ত রাম ভক্ত। তিনি এক রামাষ্টক রচনা করিয়া ভাবে গদ্গদ হইয়া ভক্তমণ্ডলীর নিকট পাঠ করিলে গৌরচন্দ্র তাঁহার ললাটে 'রামদাস' নাম লিখিয়া দিলেন। রঘুনাথ দাস আসিয়া মহোৎসবে যোগ দিলেন এবং চৈতন্য প্রভুর নিকট উপদেশ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীচৈতন্য মাতা ও ভক্তদের নিকট বিদায় লইয়া ও সে বৎসর ভক্তদলকে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়া কেবলমাত্র বলভদ্র আচার্য্য ও দামোদর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। পথে বরাহনগরে ভাগবতপরায়ণ এ

ব্রাহ্মণের নিকট ভাগবত শুনিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া পাঠককে ভাগবতাচার্য্য উপাধি প্রদান করিলেন এবং যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া নীলাচলে চলিলেন। হরিদাসাদি ভক্তবৃন্দ পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র জানিতে পারিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পথে পরিচর্য্যা জন্য লোক রাখিয়াছিলেন। গৌর নীলাচলে আসিয়া বহুলোক সমাগমহেতু সনাতনের পরামর্শানুসারে বৃন্দাবন গমন স্থগিত করিয়া যে প্রকারে কানায়ের নাটশালা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে কথা, এবং রূপসনাতনের মিলনকথা সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের নিকট বর্ণনা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবন বিহার।

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে প্রত্যাগত হইয়া বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভক্তগণ বর্ষার কয়েক মাস প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া শচীনন্দন বর্ষাকাল নীলাচলে অবস্থিতি করিলেন। বর্ষান্তে একদিন তিনি স্বরূপ, রামানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমি রাত্রিযোগে একাকী শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিব; আমার সঙ্গে কেহ যাইতে পারিবে না। প্রাতঃকালে ভক্তদল যদি আমার অনুগমন করিতে চায়, তোমরা তাহাদের আটক করিও।'

স্বরূপ উত্তর করিলেন, 'তা' কেমন করিয়া হইবে? বনপথে তুমি একাকী কি প্রকারে যাইবে? তোমাকে পাক করিয়া কে দিবে ও জলপাত্র বহির্ব্বাসই বা কে বহিয়া যাইবে? আমি বলি একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ সঙ্গে যাউক্।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'কাহাকে সঙ্গে লইব? এক জনকে লইলে আর সকলেই মনক্ষুণ্ণ হইবে। তবে একজন নবাগত অথচ সৎস্বভাবান্বিত সঙ্গী জুটিলে লইতে পারি।'

স্বরূপ উত্তর করিলেন, 'কেন? বলভদ্রাচার্য্য সেদিন মাত্র তোমার সঙ্গে গৌড় হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারও তীর্থ ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা আছে। বিশেষতঃ তাঁহার এক ব্রাহ্মণ ভৃত্য সঙ্গে আছে। তাঁহারা সঙ্গে যাইলে

বেশ হইবে।' চৈতন্যদেব এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গী ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া কাহাকেও না বলিয়া রজনীযোগে নীলাচল হইতে শুভ যাত্রা করিলেন। প্রাতঃকালে প্রভুর অদর্শনে ভক্তদল কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন এবং বৃন্দাবন যাত্রার কথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অনুগমনে উদ্যত হইলেন। স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর মনের ভাব বলিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত করিলেন। শ্রীচৈতন্য লোক সমাগমের ভয়ে প্রসিদ্ধ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া উপপথে গমন করিতে লাগিলেন এবং কটক নগর ডাহিনে ফেলিয়া গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে এই পথ 'ঝারিখণ্ড' বনপথ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অনুমান হয় ছোটনাগপুর প্রদেশের বনপথেই শ্রীচৈতন্য গমন করিয়া থাকিবেন। বনের শোভা দর্শনে, কলনাদী বিহঙ্গগণের গান শ্রবণে, ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য দর্শনে, কুরঙ্গ মাতঙ্গদিগের ইতস্তত পাদসঞ্চারণে গৌরের বৃন্দাবন ভাব উথলিয়া উঠিল। তিনি অনবরত নাচিতে, গাইতে, মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র অনেকদিন উচ্চকণ্ঠে হরিসংকীর্ত্তন করেন নাই। এখন নির্জ্জন বন পাইয়া মনের সুখে সপ্তম স্বরে কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিলেন। বনপথে দলে দলে ব্যাঘ্র, হস্তী, শূকর, গণ্ডার, ভল্লুকগণ বিচরণ করিতেছিল; গৌরচন্দ্র নির্ভয়ে তাহাদের মধ্য দিয়া নাচিয়া গাইয়া চলিলেন। ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গী তদ্দর্শনে মহাভীত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কথিত হইয়াছে গৌরচন্দ্রের প্রেমবিহ্বলতা ও ধর্ম্মোন্মত্ততা দেখিয়া হিংস্র শ্বাপদেরাও এক পাশ হইয়া দাঁড়াইত। একদিন পথে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র শুইয়াছিল। আবেশে গৌর তাহার গায়ে পা দিয়াছিলেন। বাঘ দেখিয়া তিনি 'কহ কৃষ্ণ! কহ কৃষ্ণ!' বলিয়া হাতে তালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন; অমনি সেই হিংস্রপশুও নাকি তালে তালে নাচিয়া উঠিল। আর একদিন শ্রীচৈতন্য এক নদীতে স্নানাবগাহন করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক মত্তহস্তিযূথ জলপান করিতে আসিল। গৌর 'কৃষ্ণ কহ'! বলিয়া তাহাদের গায়ে জল ফেলাইয়া দিলে তাহারা তাহাদের স্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া নাচিতে, জড়াজড়ি করিতে, চীৎকার করিতে ও লুণ্ঠন দিতে লাগিল। পথ গমনকালে গৌরের মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া দলে দলে মৃগগণ আসিয়া গা চাটিতে লাগিল। গৌর তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাগবতীয়

নৈসর্গিক চিত্রের শ্লোকাবৃত্তি করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে, ব্যাঘ্র, মৃগ, শূকরগণ, পরস্পরের প্রতিহিংসা বৃত্তি ভুলিয়া গিয়া গৌরের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিয়াছিল ও পরস্পরের মুখ চুম্বন করিয়াছিল। বলভদ্র আচার্য্য দেখিয়া শুনিয়া চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলেন। ময়ূর ময়ূরীগণ নাচিতে লাগিল, তরুলতা ফল পুষ্প দিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিল; এবং হরিনামে সমস্ত বন যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নিবিড় বনভূমি উত্তীর্ণ হইয়া গৌরচন্দ্র সাঁওতাল ও ভিলদিগের জনপদে প্রবেশ করিলেন এবং হরিনাম দিয়া সব দেশ পবিত্র করিয়া তুলিলেন। বনপথে যাইতে সব দিন আহারীয় সামগ্রী মিলিত না। সে জন্য ভট্টাচার্য্যকে কখন কখন ২।৪ দিনের তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া লইতে হইত। বনমধ্যে বন্য-শাক ও ফলমূল তুলিয়া তিনি পাক করিতেন, গৌরচন্দ্র পরমসুখে ভোজন করিতেন। উষ্ণ প্রস্রবণের জলে স্নানে ও বন্য ভোজনে ও আরণ্য কাষ্ঠের অগ্নির তাপে শীত নিবারণ করিয়া তিনি সুখানুভব করিতে লাগিলেন। যে গ্রামে যান, গ্রামবাসীরা আতপতণ্ডুল, উদ্ভিদ্, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গুড় দিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে পূর্ব্বে যেমন হরিনাম দিয়া তদ্দেশবাসীদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ঝারিখণ্ডের অসভ্য লোকদিগকেও তেমনি বৈষ্ণব করিতে লাগিলেন। নির্জ্জন বন ভ্রমণে, বন্য-ভোজনে ও বলভদ্রের সেবায় গৌরচন্দ্র এতই সুখানুভব করিলেন যে, এক-দিন ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া বলিলেন;—'শুন ভট্টাচার্য্য! আমি অনেক দেশে বেড়াইয়াছি, কিন্তু এবারে তোমার সঙ্গে আসিয়া এই নির্জ্জন বনপথে যেমন সুখ পাইলাম, আমার জীবনে এমন সুখ আর পাই নাই। দেখ শ্রীহরি কেমন দয়ালু! আমি তো বঙ্গদেশে মাতা ও ভক্তগণকে দেখিয়া ভক্তবৃন্দের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইব মনে করিয়াছিলাম। সঙ্গে লক্ষ কোটি লোক চলিয়াছিল। ভগবান্ জানিতেন, আমার তাহাতে সুখ হইবে না। তাই সনাতনের মুখে বলিয়া আমাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে শিক্ষা দিয়া-ছিলেন। তিনি কৃপার সাগর! দীন হীনে এমন দয়া আর কাহারই বা আছে? তাঁর কৃপা বিনে কাহারও কি সুখ হইতে পারে?' এই বলিয়া গৌর ভট্টাচার্য্যের গলা ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন 'তোমার প্রসাদে আমার এই সুখ হইল। কি দিয়া তোমার উপকার করিব? আমার কি আছে?' বলভদ্র বলিলেন, 'আমি অধম; আমাকে দয়া করিয়া

যে সঙ্গে আনিয়াছ ও আমার হাতে খাইতেছ, এ কি তোমার কম দয়া? অধম কাককে তুমি গরুড়ের আসন দিয়াছ। আমি ধন্য হইয়াছি।’ এইরূপ কথাবার্ত্তায় যাত্রীদল মধ্যাহ্নসময়ে বারাণসীধামে আসিয়া উপনীত হইলেন; এবং মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নানাবগাহন জন্য গমন করিলেন। সে সময়ে তপনমিশ্র গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অপরূপ রূপমাধুরী সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমে কিছু বিস্মিত হইলেন ও অনেক দিনের পর দেখায় হঠাৎ চিনিতে পারিলেন না। পরে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস লইয়াছেন স্মরণ করিয়া ও তিনিই ইনি, মনে করিয়া আসিয়া পাদ বন্দনা করিলেন। গৌর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া স্নানাবগাহন করিয়া অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দেখিয়া মিশ্রের বাড়ীতে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন। পাঠক মহাশয় তপন মিশ্রকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? অধ্যাপনা কালে বঙ্গদেশে গমন করিয়া নিমাই পণ্ডিত যাঁহাকে উপদেশ দিয়া কাশী যাইতে বলিয়াছিলেন, ইনিই সেই ব্যক্তি।* মিশ্র মহানন্দে প্রভুকে ভোজন করাইয়া সপরিবারে ভোজনশেষ খাইলেন বলভদ্র আচার্য্য পৃথক্ পাক করিলেন। শ্রীচৈতন্য শয়ন করিলে মিশ্রের পুত্র বালক রঘুনাথ পাদ সম্বাহন করিলেন। এই রঘুনাথ উত্তরকালে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী নামে শ্রীচৈতন্যের ছয় গোস্বামীর অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তপন মিশ্রের চন্দ্রশেখর নামে এক বন্ধু কাশীতে বাস করিতেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য, ব্যবসা গ্রন্থ লেখা। সম্বাদ পাইয়া তিনি আসিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণ বন্দনা করিলেন। চন্দ্রশেখর বলিলেন, “আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তুমি আপনা হইতে কাশীতে আসিয়াছ। এখানে কৃষ্ণ কথা কেহ বলে না। কেবল মায়া, ব্রহ্ম, ষড়্দর্শন লইয়া বিচার বিতণ্ডা শুনিতে শুনিতে তিক্তবিরক্ত হইয়াছি। মিশ্র কৃপা করিয়া আমাকে কৃষ্ণ কথা শুনান। দুই বন্ধুতে নির্জ্জনে বসিয়া তোমার চরণ ধ্যান করি ও মনের দুঃখ পরস্পর বলাবলি করি।’ মিশ্র বলিলেন, ‘প্রভু! যতদিন কাশীতে থাকিবে, আর কোথায় নিমন্ত্রণ লইতে পাইবে না। আমার বাড়ীতে ভিক্ষা লইতে হইবে।’ এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তপন মিশ্রের বাটীতে আসিয়া কৃষ্ণচৈতন্যের রূপমাধুরী ও প্রেমচেষ্টা দেখিয়া বড়ই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিল। এই ব্যক্তি শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ

* পূর্ব্বভাগ, ১৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

স্বামীর নিকট বেদান্ত পড়িত। শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ তৎকালে বারাণসীস্থ সন্ন্যাসী পরমহংসদিগের অগ্রণী ছিলেন। বেদান্তে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও তিনি শঙ্করাচার্য্যপ্রদর্শিত মায়াবাদ মতের একজন প্রসিদ্ধ নেতা। তিনি বহু শিষ্য পরিবৃত হইয়া মঠে বসিয়া বেদান্ত পড়াইতেছিলেন, এমত সময়ে উপরোক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে 'জগন্নাথ হইতে কৃষ্ণচৈতন্য নামে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন; তাঁহার যেমন রূপ, তেমনি ভগবন্নিষ্ঠা, প্রেম চেষ্টা, ও গভীর সাধন। নিরন্তর তিনি কৃষ্ণনাম করিতেছেন, হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, নাচিতেছেন; দুই চক্ষে অবিরল প্রেমধারা ঝরিতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ।' প্রকাশানন্দ শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও উপহাস করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হাঁ! শুনিয়াছি বাঙ্গলা দেশীয় একজন ভাবুক সন্ন্যাসী নাকি ভাবকালি করিয়া লোক প্রতারণা করিয়া বেড়াইতেছে। সে ব্যক্তি কেশব ভারতীর শিষ্য, মহা ইন্দ্রজাল বিদ্যা জানে এবং লোক মুগ্ধ করিতে খুব মজবুত। কতকগুলা লোক জুটাইয়া এখন দেশে দেশে নাচিয়া বেড়াইতেছে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত; তিনিও নাকি তাহার সঙ্গে পড়িয়া পাগল হইয়া গিয়াছেন। তুমি তা'র নিকটে যাইও না। বেদান্ত শ্রবণ কর। উচ্ছৃঙ্খল লোকের সঙ্গে মিশে কি দুই কুল হারাবে? আর তাও বলি, কাশীপুরে তা'কে ভাবকালি বেচিতে হয় না।' ব্রাহ্মণ এই কথায় অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং সভা হইতে উঠিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট মনোদুঃখ নিবেদন করিয়া বলিল, 'কিন্তু প্রভো! এক আশ্চর্য্য দেখিলাম, তিনবার চেষ্টা করিয়াও সে কৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে পারিল না; কেবল চৈতন্য, চৈতন্য, বলিল। ইহার কারণ কি?' শ্রীচৈতন্য হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী কৃষ্ণাপরাধী; কাজেই তাঁহার জিহ্বায় নাম স্ফূর্ত্তি হইল না। চৈতন্য নাম না আসিবে কেন? ব্রহ্ম চৈতন্য, মায়া, অধ্যাস, ইত্যাদি শব্দ লইয়াই ত তাঁহাদের নাড়া চাড়া। জীবের যেমন নামে, দেহে ও স্বরূপে ঐক্য নাই; ভগবানের সেরূপ নহে। ভগবানের নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ একই; লীলাগুণ, সব সচ্চিদানন্দময়। নাম নামী, দেহ দেহী, সকলই লীলা, জ্যোতিঃপূর্ণ, লীলানন্দময়। কৃষ্ণের গুণানন্দ বা লীলানন্দের কাছে ব্রহ্মানন্দ কোন্ ছার বস্তু? আত্মারামগণও লীলানন্দে আকৃষ্ট না হইয়া পারেন না। মায়াবাদী সন্ন্যাসী লীলাসুখ কি বুঝিবে? তাই

লীলানন্দপূর্ণ রসময় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে নাই। আর আমি—আমি ত কাশীর হাটে ভাবকালি বেচিতে আসিয়াছি। গ্রাহক না জুটিলে আমার মাল বিকাবে না। কিন্তু বোঝাই বা টেনে বেড়াব কত? উচিত দাম না পাইলে অল্পস্বল্প মূল্যে ছেড়ে দিয়ে যাবো। তবু বোঝা বয়ে আর ফিরতে পারি না।' এই বলিয়া তিনি উচ্চ হাস্য করিলেন এবং মহারাষ্ট্রীকে কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন। চন্দ্রশেখর ও মিশ্রের সেবায় ও আগ্রহে, ইচ্ছা না থাকিলেও দশদিন কাশীতে অবস্থিতি করিয়া এবং প্রত্যাগমনকালে পুনরায় আসিবেন অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্য বলভদ্র আচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া প্রকাশ্য রাজপথে যাত্রা করিলেন।

কাশীতে অবস্থান সময়ে শ্রীচৈতন্য অনুতপ্ত সুবুদ্ধি রায়ের যে প্রকারে জীবনদান দিয়াছিলেন, তাহা অতি অদ্ভুত কথা। নিম্নে সে কথা বলিতেছি।

সুবুদ্ধি রায়ের সঠিক পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবগ্রন্থে এইমাত্র বর্ণিত আছে যে, তিনি কোন সময়ে গৌড় নগরে বিপুল ভূম্যধিকারী ছিলেন ও তৎকালে গৌড়ের ভাবী রাজা সৈয়দহুসেন সাহা তাঁহার অধীনে সামান্য চাকুরী করিতেন। সুবুদ্ধি রায় একটী দীঘী কাটাইবার ভার সৈয়দ হুসেনের উপর দিয়াছিলেন এবং ঐ কার্য্যে দোষ পাইয়া তাঁহাকে চাবুকের দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন। কালের বিচিত্র গতি। সংসারে চিরদিন কাহারও সমান যায় না। ভাগ্যলক্ষ্মী সৈয়দহুসেনের প্রতি প্রসন্ন হইল। তিনি গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থকার বলেন যে, সৈয়দ হুসেন সাহা অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। সুবুদ্ধি রায় যে তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া রায়কে খুব বাড়াইলেন এবং ধন সম্মানে বিভূষিত করিলেন। সৈয়দের রাণীর চিত্ত কিন্তু অন্যরূপ। স্বামীর নির্যাতন স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল; তিনি রায়কে মারিয়া ফেলিবার জন্য গৌড়াধিপকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সৈয়দ কহিলেন 'রায় আমার অন্নদাতা প্রতিপালক, তাঁহাকে কেমন করিয়া মারিয়া ফেলিব?' রাণী বলিলেন, 'তবে উহার জাতি নাশ কর।' রাজা উত্তর করিলেন, 'তাহা হইলে সে বাঁচিবে না।' রাণী নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলে রাজা অগত্যা স্বীকার করিলেন এবং কারোয়ার জল খাওয়াইয়া সুবুদ্ধি রায়ের হিন্দুয়ানি নষ্ট করিয়া দিলেন। রায় লজ্জায় ও অপমানে ও ধর্ম

নাশজনিত নির্ব্বেদে ম্রিয়মাণ হইয়া বিষয় বিভব, স্ত্রী পুত্র ফেলিয়া পাগলের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে বারাণসীধামে আগমন করিলেন। পণ্ডিতদিগকে প্রায়শ্চিত্ত বিধি জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, 'এ সামান্য পাপ নহে, তপ্ত ঘৃত গলাধঃকরণ করিয়া জীবনান্ত করা, ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।' রায় সে কথা শুনিলেন না; তাঁহার হৃদয়ে এ ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের বিধি স্থান পাইল না। তিনি পাগলের ন্যায় কাশীর রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতে লাগিলেন। এমন সময়ে শ্রীচৈতন্য কাশীতে আসিয়া হরিনামের মহিমা প্রচার করিলেন। সুবুদ্ধি রায় গৌরের শরণাপন্ন হইলেন এবং নিজ বৃত্তান্ত বলিয়া উপদেশ চাহিলেন। গৌর বলিলেন, 'বৃন্দাবনে গিয়া নিভৃতে বসিয়া হরিনাম জপ কর; এক নামে সব পাপ যাইবে, দ্বিতীয় নামে প্রেমভক্তির উদয় হইবে। এই তোমার পক্ষে উচিত প্রায়শ্চিত্ত।' রায়ের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল; তিনি চৈতন্য চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বৃন্দাবনে গমনোদ্দেশ্যে অযোধ্যা, প্রয়াগ হইয়া কিছুদিন নৈমিষারণ্যে বসতি করিতে লাগিলেন। এবং মথুরায় আসিয়া শুনিলেন যে গৌরচন্দ্র বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে চলিয়া গিয়াছেন। গৌরের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় রায় বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। এখানে তিনি এক অদ্ভুত সাধন আরম্ভ করিয়া দিলেন। বন হইতে কাষ্ঠ আনিয়া নগরে বেচিতে লাগিলেন এবং দিনান্তে এক পয়সার চানা চিবাইয়া বাকি পয়সায় দীন দুঃখী দরিদ্র পথিকদিগের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সারা নিশা হরিনাম-সাধন করিতে লাগিলেন। অচিরে সুবুদ্ধি রায় পরম ভক্ত হইলেন। বারাণসীর পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থায় যাঁহার প্রাণান্ত হইতেছিল, চৈতন্য কৃপায় তিনি আজ পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

অল্প দিনের পর শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণী স্নান ও বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। যমুনাদর্শনে তাঁহার বৃন্দাবন লীলা স্মৃতিপথে উদিত হইল। প্রভু দিশাহারা হইয়া যমুনায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলে ভট্টাচার্য্য ধরিয়া রাখিলেন। তিন দিন প্রয়াগে থাকিয়া যাত্রীগণ মথুরা উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে যেমন দাক্ষিণাত্যের পথে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে নাম প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন; পশ্চিমের পথে গ্রামে চৈতন্যদেব তাহাই করিতে লাগিলেন। পশ্চিমের লোক সব বৈষ্ণব হইতে লাগিল। মথুরায় আসিয়া গৌরচন্দ্র বিশ্রাম তীর্থে স্নান করিলেন, এবং কেশবমন্দিরে কেশব দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে হাসিতে কাঁদিতে ও নাচিতে নাচিতে

সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব চেষ্টা দেখিয়া বহুতর লোক সমাগত হইল। আগন্তুকদিগের মধ্যে এক ব্রাহ্মণও প্রেমাবেশে নাচিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য ভাবে বিভোর; তাঁহার গলা ধরিয়া কোলাকুলি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিলেন। নৃত্যাবসানে উভয়ে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কেশবপূজারী প্রভুর সৎকার অভ্যর্থনা করিল। শ্রীচৈতন্য আগন্তুক ব্রাহ্মণকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি যেরূপ সরল প্রেমিক, এরূপ ত অন্যত্র দেখিতে পাই না। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, এ প্রেমধন আপনি কেমন করিয়া কোথায় উপার্জ্জন করি-লেন?' ব্রাহ্মণ বলিল,'শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী যখন মথুরায় আসিয়া ছিলেন, কৃপা করিয়া তিনি আমার বাড়ীতে ছিলেন ও আমাকে দীক্ষিত করিয়া আমার হাতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। আমি সনোড়ীয়া ব্রাহ্মণ। সনোড়ীয়ার হাতে সন্ন্যাসীগণ আহার করেন না। কিন্তু শ্রীমন্মাধবেন্দ্র সে বিচার করেন নাই।'

পরিচয় পাইয়া শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, 'আপনি আমার গুরু স্থানীয়। আমাকে নমস্কার করিলেন কেন?'

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে প্রণত হইতে দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিল, 'আপনি ওরূপ করিতেছেন কেন? আমি গৃহী, আপনি সন্ন্যাসী হইয়া আমাকে প্রণাম করিলে আমার অপরাধ হইবে। কিন্তু আপনার প্রেম দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইতেছে যে আপনি মাধবেন্দ্রের কোন সম্বন্ধ রাখেন। এরূপ প্রেমচেষ্টা ত অন্যত্র সম্ভবে না।' বলভদ্র আচার্য্য কহিলেন, 'ইনি শ্রীমন্মাধ-বেন্দ্র শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য।'

ব্রাহ্মণ পরিচয় পাইয়া মহানন্দ মনে শ্রীচৈতন্যকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং বলভদ্র আচার্য্য দ্বারা বিধিমত পাক করাইয়া ভোজনার্থ প্রভুকে ডাকিলে তিনি বলিলেন, 'আপনি গুরু সম্পর্কীয়; বিশেষতঃ শ্রীমন্মাধবেন্দ্র আপনার হাতে খাইয়াছিলেন। আমাকে আপনি কেন স্বহস্তে ভিক্ষা দিবেন না?' বলভদ্রের প্রস্তুত করা অন্ন না খাইয়া শ্রীচৈতন্য সনোড়ীয়ার গৃহে ভোজন করিলেন; বলভদ্র ও তাঁহার বিপ্র পৃথক্ খাইলেন। শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক কথা নগরে রাষ্ট হইলে মথুরার বহু লোক, তাঁহার নিকট সমা-গত হইতে লাগিল। তিনি সকলকে নাম প্রেম উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। সনোড়ীয়া ব্রাহ্মণ প্রভুকে ক্রমে ক্রমে মথুরার তীর্থ সকল দেখাইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান করিয়া

স্বায়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘ, বিষ্ণু, ভূতেশ্বর ও গোকর্ণাদি তীর্থ দর্শন করিলেন। ইহার পর বৃন্দাবনীয় চৌরাশী ক্রোশ বিস্তীর্ণ দ্বাদশ বন দর্শনেচ্ছুক হইয়া শ্রীচৈতন্য বলভদ্র ও তাঁহার সেবক এবং সনোড়ীয়াকে সঙ্গে লইয়া মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বেহুলাবন, ভাণ্ডীরবনাদি বারটী বন দেখিতে লাগিলেন। নির্জ্জন বনস্থলীতে তিন চারিটী বন্ধু দিন রাত্রি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দিনমানে নির্ঝরিণীতে স্নান করেন ও বলভদ্র বৃক্ষমূলে বন্য ফলমূলে ভোজন দ্রব্য প্রস্তুত করেন; প্রভু পরমসুখে ভোজন করেন এবং রজনীতে বৃক্ষতলে শুইয়া যাপন করেন। গৌরের দিন এই নির্জ্জন শান্তি রসপূর্ণ বৃন্দাবনদর্শনে পরম সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। এ সময়ে তাঁহার ভাবাবেশ আর ছাড়িত না, অষ্ট প্রহর তিনি ভাবে মাতোয়ারা হইয়া প্রকৃতির নিরুপম সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া থাকিতেন; অভ্যাস গুণে স্নান ভোজন নির্ব্বাহ হইয়া যাইত। কথিত হইয়াছে যে, পুরুষোত্তমে গৌরের যে প্রেম ছিল, ঝারিখণ্ডপথে তাহা শতগুণ, মথুরা দর্শনে সহস্রগুণ ও বনলীলায় লক্ষগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্যে গৌরচন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গাভী সকল কে জানে কি ভাবে তাঁহাকে দেখিয়া উর্দ্ধপুচ্ছে ও হম্বারবে তাঁহার কাছে আসিয়া অঙ্গ চাটিতে লাগিল; তিনি তাহাদের গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিয়া মহাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। হরিণগণ দলে দলে তাঁহার সঙ্গে যাইতে লাগিল; কেহ গা চাটে, কেহ শৃঙ্গ দিয়া তাঁহার গা চুল্কাইয়া দেয় ও তিনি প্রেমে বিহ্বল হইয়া কখন কখন তাহাদের গলা ধরিয়া রোদন করেন। শিখীগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে লাগিল। পিকাদি বিহঙ্গগণ কলকণ্ঠে গাইতে লাগিল ও উড়িয়া তাঁহার মাথায়, স্কন্ধে ও হাতে বসিতে লাগিল। তাহারা মানুষের হিংসায় কখন প্রতারিত হয় নাই; বা ব্যাধের জালে কখন পড়ে নাই; তাই তাদের এত বিশ্বাস। বৃক্ষ লতাগণ যেন অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুকে পাইয়া অঙ্কুররূপ পুলক প্রকাশ করিয়া মধুরূপ অশ্রু ধারা বর্ষণ করিয়া ফলপুষ্প মুকুল ভরে নতশাখে আলিঙ্গন করিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদের আলিঙ্গন করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেলেন। পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া ধবল কৌমুদীবসনে বনস্থলীকে আবৃত করিয়া মধুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। সুখময়ী রজনীতে গৌরচন্দ্র তমালতরুতলে ধ্যানানন্দে বিভোর আছেন; হঠাৎ তাঁহার দুই স্কন্ধে শারীশুক উড়িয়া আসিয়া বসিল। তাহারা মনুষ্যের

ন্যায় কথা বলিতে পারে। শুক বলিল, 'আমাদের প্রভু জগন্মোহ
শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বসংসার রক্ষা করুন'। শারিকা বলিল, 'শ্রীরাধিকার প্রেম
সৌন্দর্য্য কেমন শোভা পাইতেছে দেখ? তিনি তোমার জগন্মোহনের
চিত্তমোহিনী।' শুক উত্তর করিল, 'শারিকে! কৃষ্ণ আমার বংশীধারী
চিত্তহারী ও মদনমোহন।'

শারিকা বলিল, 'মহাপ্রকৃতি রাধার সঙ্গে মদনমোহনই বল ও
মোহনই বল, সবই সাজে। নইলে ত তিনি নির্গুণ, ইচ্ছা শূন্য, অচেত
ও আপন মোহে আপনি মোহিত।'

শারী শুক উড়িয়া গেল। শ্রীচৈতন্য ধ্যানভঙ্গে শিহরিয়া উঠিলেন
এই সময়ে প্রত্যেক বস্তুতে গৌরের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইয়া নানা বিকার হই
লাগিল। কখন তিনি মূর্চ্ছিত হন, কখন কণ্টকাকীর্ণ বনভূমিতে লুণ্ঠন করে
অঙ্গ দিয়া রুধির ধারা পড়ে। বলভদ্র ও মাথুর ব্রাহ্মণ নানা প্রকা
তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শ্রীচৈতন্য আরিঠ নামক গ্রামে উপনীত হইয়া গোপবাল
দিগকে 'রাধাকুণ্ড কোথায়'? জিজ্ঞাসা করিলেন। দুইটী ধান্যক্ষেত্র প্রদর্শি
হইলে গৌরচন্দ্র তাহার জলে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলেন এবং কুণ্ডের
করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণলীলার তীর্থ সকল পূর্ব্ব হইতেই লুপ্ত হই
গিয়াছিল। চৈতন্যদেব এইরূপ অনুসন্ধান পন্থা অবলম্বন করিয়া লুপ্ত তী
উদ্ধার করিতে লাগিলেন। এখান হইতে তিনি সুমন সরোবর দর্শ
করিয়া গোবর্দ্ধন শৈলের নিকট গোবর্দ্ধন গ্রামে আসিয়া হরিদেব বিগ্র
দেখিলেন। গোবর্দ্ধনগিরি দেখিয়া সমুদায় কৃষ্ণলীলা তাঁহার স্মৃতিপ
উদিত হইল; তিনি ভাগবতীয় শ্লোকাবৃত্তি করিয়া গিরিরাজের স্তব করি
লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া পাক করিলে চৈতন্যদেব ভোজ
করিয়া হরিদেব মন্দিরে রাত্রি যাপন করিলেন। শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী প্রতি
ষ্ঠিত গোপাল বিগ্রহ গোবর্দ্ধন শৈলের উপরে অন্নকূট নামক পল্লী
স্থাপিত। গৌরচন্দ্র মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'আমি ত পবিত্র লীলাভূ
শৈলের উপরে উঠিব না; তবে গোপালের দর্শন পাই কি রূপে?' এ দি
সেই রাত্রিতে অন্নকূট গ্রামে একজন লোক প্রচার করিয়া দিল যে 'গ্রা
লুঠিতে তুড়ুকসোয়ার আসিতেছে, তোমরা সব পলাও'। গ্রামের লো
পলাইয়া নানাদিকে চলিয়া গেল; পূজারীগণ গোপাল লইয়া গাঁঠুলী গ্রা

লুকাইয়া রাখিল। গৌরচন্দ্র প্রাতঃকালে মানস গঙ্গায় স্নান করিয়া গোব র্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিবার সময় এই সংবাদ পাইয়া গাঁঠুলী যাইয়া গোপাল দেখিয়া প্রেমে গদগদ হইলেন। মাধবেন্দ্রের পবিত্র চরিত্র তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে মহাসুখী করিল। তিন দিন পর্য্যন্ত গোপাল দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য কাম্যবনে লীলাস্থান দর্শন করিলেন। এবং সেখান হইতে নন্দীশ্বর শৈলে পাবনকুণ্ডে স্নান করিয়া পর্ব্বতোপরি যাইয়া ব্রজেন্দ্র, ব্রজেশ্বরী ও কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সেখান হইতে তিনি খদির বনে শেষশায়ী ও খেলা তীর্থ দেখিয়া ভাণ্ডীর বনে আসিলেন। এখানে যমুনা পার হইয়া ভদ্রবন, শ্রীবন, লৌহবন, ও মহাবন হইয়া গোকুল নগরে যাইয়া ভগ্নমূল যমলার্জ্জুন দেখিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিলেন। এবং বন পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া পুনরায় মথুরায় আসিয়া সেই ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীচৈতন্যের সাধুতা ও প্রেমের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হওয়ায় নিত্য নিত্য অসংখ্য লোক তাঁহার দর্শনে আসিতে লাগিল। লোক ভিড়ে ত্যক্ত হইয়া তিনি যমুনার নিকট অক্রূর তীর্থে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অক্রূর তীর্থের নিকট কৃষ্ণলীলা সময়ের এক বৃহৎ তেঁতুল গাছ ছিল। তাহার মূলদেশ পিঁড়ির আকারে উত্তম বাঁধান। গৌর সেইখানে আপন আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া যমুনা দর্শন ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এখানেও বহুতর লোক সমাগম হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি প্রত্যূষে বৃন্দাবনের বনমধ্যে পলাইয়া যাইয়া সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। তৃতীয় প্রহরে তেঁতুল তলায় ফিরিয়া আসিয়া স্নানাবগাহনান্তে অক্রূরে যাইয়া ভোজন করেন। সেই সময়ে আগন্তুকদিগকে নানা উপদেশ দিতেন ও তাহাদের সঙ্গে সৎ প্রসঙ্গ করিতেন। কৃষ্ণদাস নামে এক ব্যক্তি রজঃপুত জাতি যমুনাপারে বাস করিত। সে এই সময়ে শ্রীচৈতন্যের উপদেশে বৈষ্ণব হইয়া পরিবারাদি ছাড়িয়া নিরন্তর তাঁহার নিকট বাস করিতে লাগিল।

এই সময়ে একটী রহস্যজনক ব্যাপার উপস্থিত হইল। যে সকল লোক চৈতন্য দর্শনে আসিত, তাহারা তাঁহার রূপলাবণ্য ও প্রেমচেষ্টা দেখিয়া এবং উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকে মানুষজ্ঞান করিতে পারিত না। তাই দেশময় এক জনরব উঠিয়া গেল যে পুনরায় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন। একদিন সন্ধ্যার সময়ে শ্রীচৈতন্য তেঁতুল তলার আসন হইতে

দেখিলেন, বহুতর লোক মহা কোলাহল করিয়া বৃন্দাবনে যাইতেছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, 'কালিদহের জলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়া রজনীতে কালিয় শিরে নৃত্য করিয়াছেন এবং কালিয়ে মস্তকমণি দীপ্তি পাইয়াছে। লোকে এই কথা বলায় আমরা দেখিতে যাইতেছি।' শ্রীচৈতন্য কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। বলভ ভট্টাচার্য্য সরল লোক। তিনি বলিলেন, 'প্রভু! অনুমতি করুন, একবা কৃষ্ণদর্শন করিয়া আসি।' শ্রীচৈতন্য তাঁহার গায়ে চাপড় মারিয়া উত্ত করিলেন "মূর্খদিগের কথায় তুমিও যে প্রতারিত হইলে দেখিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ কলিকালে প্রকাশিত হইবেন কেন? পাগ্‌লামি করিও না; চুপ ক' থাক। আচ্ছা, যাইতে হয়, না হয়, কাল রাত্রে যাইও।" পরদিন প্রাত: কালে পরিচিত কোন ভদ্রলোক নিকটে আসিলে শ্রীচৈতন্য হাসিতে হাসি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেমন কালিয়দহে কৃষ্ণ দেখিয়াছেন ত?' সে ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, 'প্রভু! সে রহস্য আর কি বলিব? কালিদহের জ নৌকায় চড়িয়া রাত্রি যোগে কৈবর্ত্ত মসাল জ্বালিয়া মৎস্য ধরিতেছিল মূর্খলোক না বুঝিয়া নৌকাকে সর্প, মসালকে মাণিক ও ধীবরকে কৃ বলিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছে।'

শ্রীচৈতন্য বলভদ্রকে বলিলেন, 'শুন্‌লে কেমন কৃষ্ণ প্রকট হয়েছেন?'

আগন্তুক ব্যক্তি বলিল, 'তা যা' হোক্ কথা মিথ্যা নয়। লোকে বৃন্দাব কৃষ্ণ দেখিতেছে, সত্য।'

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায়?'

আগন্তুক। কেন আপনি সন্ন্যাসী, জঙ্গম নারায়ণ। আপনি বৃন্দাব প্রকাশ হইয়াছেন, দেখিয়া লোক উদ্ধার হইয়া যাইতেছে।

শ্রীচৈতন্য। বিষ্ণু! বিষ্ণু! এ কি কথা! সাবধান আর এমন ক মুখে আনিও না। জীবাধমে কি কৃষ্ণজ্ঞান করিতে আছে? শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্ব পরিপূর্ণ জ্বলন্ত সূর্য্যের ন্যায়। সন্ন্যাসীই বল, আর জীবই বল, তাঁহা অত্যল্প কিরণ কলার সহিত তুলিত হইতে পারে না। যে জীবে ও ঈশ্ব সমবুদ্ধি করে, সে পাষণ্ড, ঘোর অপরাধী।

মথুরাবাসীগণ মাধবেন্দ্রশিষ্য সেই ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীচৈতন্যকে নিম করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য তাহার মধ্যে এক একটী নিমন্ত্রণ বাছি লইতে লাগিলেন। এক এক দিনে দশ বিশ নিমন্ত্রণ আসিতে লাগি

নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তি নানা দ্রব্য লইয়া অক্রূরে আসিয়া রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইতে লাগিল। এক দিন তেঁতুলতলায় বসিয়া শ্রীচৈতন্য 'অক্রূর এই ঘাটে বৈকুণ্ঠ দেখিয়াছিলেন' ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞান অবস্থায় যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস রজঃপুত নিকটে ছিল; সে চীৎকার করিয়া উঠায় ভট্টাচার্য্য দৌড়িয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া অনেক যত্নে প্রভুকে উঠাইলেন এবং নানা শুশ্রূষায় সুস্থ করিলেন। তখন বলভদ্র মথুরানিবাসী ব্রাহ্মণের সহিত যুক্তি করিয়া বলিলেন, 'আজ যেন আমি নিকটে ছিলাম, জল হইতে তুলিলাম; বৃন্দাবনের বনমধ্যে যাইয়া যদি যমুনায় ডুবেন, তবে কে তুলিবে? নিরন্তর লোক সমাগম ও নিমন্ত্রণের জঞ্জাল, তাহার উপর সর্ব্বদাই প্রভুর আবেশ। আমাকে গতিক ভাল লাগিতেছে না। এখান হইতে না যাইতে পারিলে অব্যাহতি নাই।' ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 'গঙ্গাতীরে প্রকাশ্য পথে সোরোক্ষেত্র দিয়া চল, প্রভুকে লইয়া প্রয়াগে যাই। সম্মুখে মকরযাত্রায় গঙ্গাস্নান করিব।' ভট্টাচার্য্য এই পরামর্শ জানাইলে শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তুমি আমাকে সঙ্গে আনিয়া বৃন্দাবন দেখাইলে; আমি তোমার এ ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।' পরদিন প্রাতঃকালে যমুনাস্নান করিয়া ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস ও মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ প্রভুকে নৌকায় পার করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত হইয়া পথমধ্যে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া শ্রীচৈতন্য অদূরে একদল গাভী চরিতেছে দেখিতে পাইলেন। বৃন্দাবন ছাড়িয়া যাইতেছেন ভাবিয়া মনে মনে কত কি আন্দোলন হইতেছে; এমন সময়ে এক গোপ বাঁশী বাজাইলে গৌরচন্দ্র কৃষ্ণাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার মুখ দিয়া লালা পড়িতে লাগিল, নিশ্বাস রুদ্ধ হইল, তিনি গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দিল্লীশ্বরের দশজন সম্ভ্রান্ত পাঠান সৈনিক পুরুষ অশ্বারোহণে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। সঙ্গের চারিজন লোক ধুতুরা খাওয়াইয়া যতির ধন সম্পদ্ হরণ করিবে বলিয়া অজ্ঞান করিয়াছে, এই সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত করিয়া সৈনিকগণ সঙ্গীদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল ও অসি নিষ্কাশিত করিয়া কাটিতে উদ্যত হইল। বাঙ্গালীর সাহস চিরকালই সমান। বলভদ্র ও তাঁহার সঙ্গী ব্যক্তি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু রজঃপুত কৃষ্ণদাস নির্ভীক্। সে বলিল, "দোহাই পাতসার! এ যতিকে আমরা ধুতুরা খাওয়াই নাই। ইনি

আমাদের গুরু। ইনি ব্যাধিগ্রস্ত, তাই অমন হইয়াছেন, এখনি উঠিবেন। আমাদের বাঁধিয়া রাখ, ইহার নিকট শুনিয়া তবে আমাদের কাটিও।" সৈনিক বলিল, 'এই গৌড়িয়া দুই জন কাঁপিতেছে কেন? ইহারা অবশ্যই ঠগ্। তোমরা পশ্চিমা তাই কাঁপিতেছ না।'

কৃষ্ণদাস এবার রাগিয়াছে; সে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া দেখাইয়া বলিল, 'ঐ গ্রামে আমার বাড়ী, একশত সোয়ার ও দুইশত কামান আছে। তোমার ঘোড়া পিঁড়া সব লুঠিয়া লইবে। তীর্থবাসী ব্রাহ্মণ বাঁধিতেছ ও মারিতে চাহিতেছ? গৌড়িয়া বাটপাড় না তোমরা বাটপাড়?' সৈনিকগণ এই কথায় একটু সঙ্কুচিত হইয়া সকলের বন্ধন খুলিয়া দিল। এ দিকে শ্রীচৈতন্য সংজ্ঞা পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। ভট্টাচার্য্য শুশ্রূষা করিলেন। ম্লেচ্ছগণ গৌরকে বলিলেন 'এই চারিজন কি তোমাকে ধুতুরা খাওয়াইয়াছে?' গৌর বলিলেন, "ইহারা আমার সঙ্গী, ইহারা আমাকে কেন ধুতুরা খাওয়াইবে? আর আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, আমার কি ধন আছে যে, ইহারা সেই লোভে আমাকে মারিবে? আমার মৃগী রোগ আছে, তাই মাঝে মাঝে অজ্ঞান হই।' সৈনিকগণের মধ্যে বিজুলী খাঁ নামে এক রাজকুমার ছিলেন। আর এক ব্যক্তি কোরাণাদি শাস্ত্রে মহ মৌলবী ছিলেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সম্ভাষণ ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয় তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় শাস্ত্রীয় বিচার উঠিয় পড়িল। পাঠানগণ কোরাণ প্রতিপাদিত ধর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিপা করিতে চেষ্টা করিলেন। শ্রীচৈতন্য তীক্ষ্ণ যুক্তিবলে তাঁহাদের তর্ক খ বিখণ্ড করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিলেন এবং নাম সংকীর্ত্তন প্রেমভক্তি লাভই যে একমাত্র মুক্তির উপায়, তাহা বুঝাইয়া দিলেন কথিত আছে যে, পাঠানদ্বয় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া প্রভুর নিক দীক্ষিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য মৌলবীর নাম পরিবর্ত্তনে 'রামদাস' না রাখিলেন। বিজলী খাঁ ও রামদাস অনুতাপে প্রভুর পদতলে পড়ি কাঁদিতে লাগিলেন এবং বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচা করিতে লাগিলেন। 'পাঠান বৈষ্ণব' নামে তাঁহারা সর্ব্বত্র পরিচি হইলেন। শ্রীচৈতন্য এই স্থান হইতে বিদায় লইয়া সোরোক্ষেত্র দি প্রয়াগ অভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কৃষ্ণদাস রজঃপুত, মাথুর ব্রাহ্মণ, বলভ ও তাঁহার সেবক চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রয়াগে—রূপানুগ্রহ।

প্রয়াগে আসিয়া শ্রীচৈতন্য সঙ্গীগণ সহ মকর যাত্রায় ত্রিবেণী স্নান করিয়া পূর্ব্বপরিচিত এক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বাসাটী অতি মনোহর স্থানে অবস্থিত। গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম স্থান ত্রিবেণী ঘাটের উপর পরিষ্কার একখানি ঘর; সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান। শ্রীচৈতন্য সেই ঘরে বাসা নির্দ্ধারণ করিলেন। প্রাতে ত্রিবেণীঘাটে স্নান করিয়া বিন্দুমাধব দর্শন, নৃত্য কীর্ত্তন ও সৎপ্রসঙ্গে পরম সুখে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার গুণের কথা চারিদিকে রাষ্ট হইয়া পড়িলে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে লাগিল। হরিনামের ও হরিপ্রেমের বন্যায় প্রয়াগ নগর ভাসিয়া গেল। তিনটী প্রবল নদীর সম্মিলিত তরঙ্গপ্রবাহ যে নগরকে ডুবাইতে পারে নাই, চৈতন্যের প্রেমবন্যায় আজ তাহা ডুবিয়া গেল। একদিন বিন্দুমাধবের প্রাঙ্গণে গৌর প্রেমোন্মত্ত হইয়া মহানৃত্য করিতেছেন, লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকটে যাওয়া দুষ্কর। দর্শকমণ্ডলী গৌরের ভাবাবেশ দর্শনে অবাক্ হইয়া চিত্রপুত্তলীর ন্যায় স্থির রহিয়াছে। এই লোকারণ্যের বাহিরে দীনবেশে দুইটী অপরিচিত পুরুষ, ভিড় ঠেলিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া যাইতে না পারিয়া নৃত্যান্ত অপেক্ষা করিতেছে। লোক দুইটীর মলিন মুখশ্রী ও মলিন বেশ হইলেও মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন ইহারা কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়; কি কারণে মলিন বেশে প্রয়াগে আসিয়াছেন ও কাহাকে যেন খুঁজিতেছেন। অনুরাগ, উৎসাহ ও বৈরাগ্য যেন মুখ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে গৌরচন্দ্রের ভাবাবেশ কমিয়া আসিল, নৃত্য কীর্ত্তন থামিল, লোক ভিড় আস্তে আস্তে কমিতে লাগিল। গৌর স্থৈর্য্যলাভ করিয়া বন্ধুগণসহ বাসায় আসিলেন। আগন্তুক দুইজনও তাঁহার অনুগমন করিয়া নীরবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। গৌর উপবিষ্ট হইলে তাঁহারা তাঁহার পদতলে পড়িয়া দণ্ডবৎ লুণ্ঠন করিলেন। গৌরচন্দ্র চিনিতে পারিয়া আনন্দভরে 'কে, রূপ? এস এস' বলিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইনি কে?' শ্রীরূপ উত্তর করিলেন, 'আমার কনিষ্ঠ, নাম শ্রীবল্লভ মল্লিক।' শ্রীচৈতন্য তাঁহাকেও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'দেখ রূপ! কৃষ্ণ কেমন দয়াল? বিষয়কূপ হইতে তোমাদের উদ্ধার করিলেন।'

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে, রামকেলিতে সাক্ষাতের সময় রূপ সনাতনের জিজ্ঞাসায় শ্রীচৈতন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ বিষয় হইতে তোমাদের অতি ত্বরায় উদ্ধার করিবেন; এখন রাজদরবারে ফিরিয়া গিয়া অন্তরে বৈরাগ্য লইয়া বাহিরে বিষয় সেবা করগে।" দুই ভাই গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তীব্র বৈরাগ্যের উত্তেজনায় নিভৃতে বসিয়া বিষয় ত্যাগের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এবং আস্তে আস্তে সম্পত্তি আদি ও পরিজনদিগকে কতক চন্দ্রদ্বীপের বাটীতে ও কতক ফতেয়াবাদে পাঠাইয়া দিলেন। রাজা বা রাজানুচরবর্গ তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল না। কথিত আছে, বিষয় বাসনার শেষগ্রন্থি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহারা ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ করাইলেন এবং হৃদয়ের গতি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। রূপের কর্ম্মস্থান মফস্বলে। সুতরাং তিনিই প্রথমে মনস্কামনা পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইলেন। বহু ধন সম্পত্তি ও নগদ টাকায় দুইখানি নৌকা সাজাইয়া তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার কালে দশ হাজার টাকা গৌড়ের কোন বিশ্বস্ত বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গেলেন। উদ্দেশ্য, আবশ্যক হইলে সনাতন তাহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। বাড়ী আসিয়া রূপ দুইজন বিশ্বস্ত চর নীলাচলে পাঠাইয়া উপদেশ দিয়া দিলেন যে; শ্রীচৈতন্য বনপথে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেই তাহার যেন সংবাদ তাঁহাকে দেয়। কিছু দিনান্তরে চর দুইজন ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর বৃন্দাবন যাত্রা জ্ঞাপন করিলে, রূপ অগ্রজ সনাতনকে গৌড় নগরে এক পত্র লিখিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে "প্রভু বৃন্দাবনে গিয়াছেন; আমরা দুই ভাই তাঁহার নিকট চলিলাম। আপনি যে কোন উপায়ে হউক শীঘ্র আসুন। টাকার প্রয়োজন হইলে—বণিকের নিকট সন্ধান লইবেন।' বল্লভকে সঙ্গে লইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ও পরিজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রূপ মল্লিক কন্থা করঙ্গ সার করিলেন। স্বর্গে জয় জয় শব্দ হইল, শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিবিধানপূর্ণতা লাভ করিতে চলিল এবং সংসারাসক্তি ও সুখ বিলাসের দুর্গের উপর বৈরাগ্যের বিজয় নিশান উড্ডীয়মান্ হইল।

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রূপ! সনাতনের সংবাদ কি?' রূপ উত্তর করিলেন, 'শুনিয়াছি, তিনি রাজদ্বারে বন্দী। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আসিয়াছি। বিশেষ সংবাদ কিছু বলিতে পারি না। তুমি কৃপা করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার না করিলে তাঁহার নিস্কৃতি নাই।' শ্রীচৈতন্য হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'তাঁহার উদ্ধার হইয়াছে; শীঘ্রই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।' ইহার পর গৌর রূপ, বল্লভ ও আর আর বন্ধুগণকে লইয়া ত্রিবেণীর ঘাটে মধ্যাহ্নাদি সমাপন করিলেন। বলভদ্র পাক করিলে শ্রীচৈতন্য আহার করিলেন। রূপ ও অনুপম সে দিন তথায় প্রসাদ পাইলেন। শ্রীচৈতন্যের বাসার পার্শ্বে ঘাটের উপর তাঁহাদের বাসা নির্দ্দিষ্ট হইল।

এদিকে শ্রীরূপের রামকেলি পরিত্যাগের পর সনাতন মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'বাদসাহ আমাকে যে অত্যন্ত প্রীতি করেন, তাহাই আমার বন্ধনের কারণ। কোন প্রকারে যদি তাঁহার বিরক্তিভাজন হইতে পারি, তবেই মঙ্গল। তাহা হইলে বিষয়জাল ছিন্ন করিতে পারিব।' এই ভাবিয়া তিনি অস্বাস্থ্যের ভাণ করিয়া রাজদরবারে গমনাগমন বন্ধ করিয়া দিবানিশি সাধন ভজন ও সৎপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর রাজমন্ত্রীর পীড়ার সংবাদে রাজকীয় বৈদ্য পাঠাইয়া দিলেন। চিকিৎসক দেখিয়া শুনিয়া রিপোর্ট করিলেন, মন্ত্রীর কোন পীড়া নাই। একদিন সনাতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে প্রবৃত্ত আছেন, হঠাৎ নকিব ফুকরাইয়া উঠিল; অনুচরবর্গের সহিত গৌড়েশ্বর সনাতনের বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত। দবীরখাস সসম্ভ্রমে উঠিয়া রীতিমত অভ্যর্থনা করিয়া রাজা অতিথিকে বসিতে আসন দিলেন। রাজা বলিলেন, 'হাকীম সাহেব রিপোর্ট দিয়াছেন, তোমার কোন অসুখ নাই। তবে ব্যাপার খানা কি?'

সনাতন বিনীত ভাবে বলিলেন, 'শরীরের অসুখ ত কিছু নহে। মনে সুখ নাই, কিছু ভাল লাগে না। তাই রাজদরবারে যাইতে পারি নাই।'

গৌড়েশ্বর উত্তর করিলেন, 'সামান্য মানসিক অসুখের জন্য কাজ কর্ম্ম বন্ধ করা কি ভাল হয়? দেখ, তোমার হাতেই আমার সব কাজ। তুমি কাজ ছাড়িলে যে আমার সব নষ্ট হ'য়ে যায়। তার কি বল? তোমার মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। খুলে বল, সেই মত বন্দোবস্ত করি।'

সনাতন তখন সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, 'জাঁহাপনা! অপ
মাপ করিবেন। আমার উপর আপনার অনুগ্রহ অসীম। এ
মনে হয়, এ অধমকে এত দয়া না করিলেই ভাল করিতেন। বলি
কি আমার মনের যে অবস্থা, তাহাতে বিষয় কার্য্য করা আমার প
অসম্ভব। অধীনকে বিদায় দিয়া অধীনের স্থলে আর একজনকে নি
করিলে নফরের প্রতি বিশেষ মেহেরবান হয়। আপনার দয়া ও অনু
এ অধীন এ জীবনে কখনই ভুলিবে না।'

গৌড়েশ্বর এ সব কথা শুনিয়া প্রথমে কিছু বিস্মিত হইলেন। পরে অ
নস্থ কর্ম্মচারীর এরূপ গোস্তাকি ক্ষমার্হ নহে ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলে
'এদিকে তোমার ছোট ভাই চাকলা সব ফেরার করিয়া দিলে; জী
পশু, মারিয়া ডাকাতের ন্যায় সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া পলাইল। আর তুমি ক
কামাই করিয়া সব নষ্ট করিতেছ।'

পাতসা রূপকে ডাকাত বলায় সনাতন মনে মনে বিরক্ত হইলে
তাঁহার এখন যে অবস্থা, তাহাতে মানুষকে আর ভয় নাই। সকল ভয়ের ভ
ভয়ানকের ভয়ানক যিনি, তাঁহাতে যে প্রাণ সঁপিয়াছে, সে কি বাদশ
হইতে ভয় পায়? তাই তিনি ধীর ও গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, 'হুজু
আপনি স্বাধীন রাজা। অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান্।'

গৌড়েশ্বর এই কথায় আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না; অনুচরবর্গ
ইঙ্গিত করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সিকদারগণ অমনি সনাতনের হা
হাতকড়ি দিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল; তাঁহার বিষয় সম্পত্তি রা
সরকারে জব্দ হইল। পৃথিবীর ধন, মান, পদগৌরবের দশাই এই প্রকা
ইহা জানিয়া শুনিয়াও লোক বিষয়মরীচিকায় এত ভ্রান্ত হয় কেন, বুঝা য
না। এই সময়ে উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে উৎকলরাজের সহিত গৌড়েশ্ব
তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল। যুদ্ধের ভীষণসংবাদ পাইয়া রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষে
যাইতে পরামর্শ স্থির করিলেন; এবং সনাতনকে বন্দীশালা হইতে আনি
মিষ্টভাষায় সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন দৃঢ়তাব্যঞ্জক স
উত্তর করিলেন, 'হুজুর! দেবতা ব্রাহ্মণে দুঃখ দিতে যাইবেন; আমি স
থাকিয়া কিরূপে তাহার সাহায্য করিব? এ বিষয়ে বান্দা নিতান্ত অ
জানিবেন।'

এই কথায় বাদসাহের ক্রোধের সীমা থাকিল না। কিন্তু সনাতন তাঁ

নিতান্ত প্রিয়। কি কারণে মাথা গরম হইয়া মতিভ্রান্তি হইয়াছে বিবেচনায় কোন অত্যাহিতের আজ্ঞা না দিয়া তাঁহাকে বন্দীশালায় পাঠাইয়া দিয়া নিজে সমরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যাইবার সময়ে সনাতনকে যত্নে রাখিবার জন্য গোপনে কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে আসিয়া এই সব সংবাদ বিশ্বস্ত চরমুখে পূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছিলেন।

প্রয়াগের অদূরে যমুনাপারে আম্বলীগ্রাম। আম্বলীগ্রামের বর্ত্তমান নাম আড়াইল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বল্লভ ভট্ট নামে কোন ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি তথায় বাস করিতেন। ভট্ট একজন পণ্ডিত ব্যক্তি; ভাগবতে তাঁহার খুব বিদ্যা ছিল। বল্লভ ভট্ট উত্তরকালে বল্লভাচারী নামে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বীয় সম্প্রদায়ে তিনি বল্লভাচার্য্য নামে বিখ্যাত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও গুজরাটে অনেক বল্লভাচারী বৈষ্ণব দেখা যায়। বল্লভাচারীগণ শ্রীচৈতন্যকে পরমগুরু বোধে ভক্তি করিয়া থাকেন। বল্লভ ভট্ট ইতিপূর্ব্বে লোক পরম্পরায় মহাপ্রভুর গুণচরিত্র শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। এখন প্রভু প্রয়াগে আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে হরিকথা হইতে লাগিল। বল্লভ ভট্ট শ্রীচৈতন্যের প্রেমচেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্য রূপ ও বল্লভের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। দুই ভাই ভট্টকে প্রণাম করিলে ভট্ট তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। 'আমরা নীচজাতি, ছুঁইও না' বলিয়া তাঁহারা পলাইয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্য কৌতুক করিয়া হাসিয়া ভট্টকে বলিলেন, 'ইহারা অতি হীনজাতি; তুমি মহা কুলীন বৈদিক ব্রাহ্মণ; ইহাদের ছুঁইও না।' বল্লভ ভট্ট প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেন, 'যখন ইঁহাদের জিহ্বাগ্রে হরিনাম বর্ত্তমান, তখন চণ্ডাল হইলেও ইঁহারা পূজ্যতম। ভগবানের নাম যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারাই ত বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ।' শ্রীচৈতন্য ভট্টের এই কথায় পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং প্রেমাবেশে শাস্ত্রীয় শ্লোক পাঠ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'সদ্ভক্তিরূপ প্রদীপ্তাগ্নি দ্বারা যাঁহাদের জাতিজনিত দুষ্কৃতি ভস্মীভূত হইয়া হৃদয় পবিত্র হইয়াছে; পণ্ডিতেরা এরূপ চণ্ডালেরও সম্মান করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভক্তিহীন হইলে তাঁহাদের নিকট সম্মান পায় না। প্রাণহীন পুত্তলি-

ক্ষাকে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করা যেমন বিড়ম্বনা মাত্র, তেমনি ভক্তি
ব্যক্তির সৎকুলে জন্ম, পাণ্ডিত্য,রূপ, পুরশ্চরণ,সকলই বৃথা।' বল্লভ ভট্ট
পর গণ সহিত গৌরচন্দ্র ও রূপ, বল্লভকে নিমন্ত্রণ করিয়া নৌকায় আরো
করাইয়া স্ব গৃহে লইয়া চলিলেন। যমুনার সুচিক্কণ নীল জল দেখিয়া
ভাবলহরী উথলিয়া উঠিল। তিনি আত্মহারা হইয়া মধ্য যমুনায়
দিয়া পড়িলেন; সঙ্গীগণ ভয় বিহ্বলচিত্তে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নৌ
উঠাইলেন; এবং বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রে
বেগ তখনও থামে নাই। তিনি নৌকার উপর নাচিতে লাগিলেন। নৌ
টলমল করিতে লাগিল। এইরূপে আম্বলীর ঘাটে নৌকা পৌঁছিলে ব
ভট্ট মধ্যাহ্ন করাইয়া অতিথিদিগকে গৃহে লইয়া গেলেন। এবং সকল
নূতন বহির্বাস কৌপীন, পাদ্য অর্ঘ্য, পুষ্প চন্দন, মাল্য দিয়া পূজা করি
ও ভট্টাচার্য্য দ্বারা পাক করাইয়া পরিতোষ রূপে ভোজন করাইলে
ভোজনান্তে শ্রীচৈতন্য বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে রঘুপতি উপাধ
নামে এক পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রঘুপতি ত্রি
দেশের লোক, মহা পণ্ডিত এবং ভক্তিপিপাসু পরম বৈষ্ণব। শ্রীচৈ
তাঁহার পরিচয় লইয়া সাদরে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, 'আ
কৃপা করিয়া আমাকে কিছু কৃষ্ণকথা শুনান্।' উপাধ্যায় স্বরচিত শ্লোক
বৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন :—

"সংসারতাপে সন্তাপিত হইয়া কেহ নির্গুণ ব্রহ্মের, কেহ বা ঐশ্বর্য্যশা
ঈশ্বরের কেহ বা পুরাণাদি সম্মত সাকার রূপের উপাসনা করিতেছে
আমি কিন্তু সৌভাগ্যশালী নন্দের শরণাপন্ন হই; কারণ তাঁহার প্রাঙ্গণে
ব্রহ্ম লীলা বিহার করিতেছেন।"

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'আর কিছু বলুন।' রঘুপতি আর একটী শ্লো
ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, 'পূর্ণব্রহ্ম গোপবধূদিগের মনশ্চোর রূপে বিরা
করিতেছেন; এ কথা কাহাকেই বা বলি, কেই বা বিশ্বাস করে।' উপাধ্যা
একজন প্রেমিক ভক্ত, কৃষ্ণলীলার নিগূঢ় তাৎপর্য্য জানেন মনে করি
শ্রীচৈতন্য নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রঘুপতি ব্যাখ্যা করিলে গৌ
জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?' রঘুপতি উত্তর দিলে
'শ্যামরূপ।'

চৈতন্য। কেন?

রঘুপতি। শ্যামরূপের ন্যায় স্নিগ্ধ, সুন্দর ও আনন্দপ্রদ আর কোন্ রূপ আছে? কাল রূপ বিভীষিকা উৎপন্ন করে; উজ্জ্বল শ্বেত, গৌর, কি অগ্নিরূপে চক্ষু ঝল্সাইয়া দেয়; উহা তেজ ও তীব্রতা ব্যঞ্জক হইতে পারে। কিন্তু নবজলধর শ্যামরূপ স্বতই মাধুর্য্যময়, আনন্দপূর্ণ, স্নিগ্ধ। সে রূপে যে না ডুবেছে, তাহার জন্মই বৃথা।'

শ্রীচৈতন্য। আহা! কি সুন্দর! আচ্ছা বলুন দেখি, শ্যামরূপের নিবাস ভূমি কোথায়? কোন্ পুরী শ্রেষ্ঠ?

রঘুপতি। তাও কি আবার বলিতে হবে? মাধুর্য্যপূর্ণ, সুখপূর্ণ ও রসপূর্ণ মধুপুরীই শ্যামরূপের অধিষ্ঠান ভূমি; সকল ধামের শ্রেষ্ঠ ধাম। শক্তি ধামে, ঐশ্বর্য্য ধামে, ভয়ানক ধামে, লীলাবৈচিত্র্য থাকিলেও মাধুর্য্য ধামের কাছে কেহ নয়। শ্যামরূপই মধুপুরী বা মধুপুরীতেই শ্যামরূপ।

শ্রীচৈতন্য। কৃষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরাবস্থার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ?

রঘুপতি। কৈশোর লীলার ন্যায় আর কি আছে? যৌবন সমাগমের পূর্ব্বাবস্থার নাম কৈশোর। কৈশোরে সকলই নূতন; অন্তরে নিত্য নবরস অঙ্কুরিত, বাহিরে নিত্য নবভাব বিকসিত। সে যে কি অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন, তাহা নবকিশোর না হইলে জানা যায় না। আর জানে সে, যে নবকিশোরে মজিয়া যায়। মাধুর্য্যময় শ্যামরূপই নবীন কিশোর, চির নূতন ও উপাদেয়; সহস্রবার দেখিলেও পুরাতন হইবার নহে।

শ্রীচৈতন্য প্রেমোন্মত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে কোন্ রস শ্রেষ্ঠ, যাতে মজিলে এ লীলা স্ফূর্ত্তি হয়?'

রঘুপতি। যা'তে আত্মসমর্পণ করায়, লাজ, কুলে জলাঞ্জলি দিয়া উন্মত্ত করিয়া তুলে, সেই মধুর রসই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য রসে কৃষ্ণের নিকট কিছু না কিছু সঙ্কোচ থাকিয়া যায়; আদিরসে সঙ্কোচ ভয় থাকিতে পারে না। থাকিলে আত্ম সমর্পণ অসম্ভব। আমি ভাল হই আর মন্দ হই, পাপী হই, বা পুণ্যবান্ হই, কুৎসিত হই বা সুন্দর হই, তোমারই নাথ! তোমারই। এই আমাকে লও, আত্মসাৎ কর; মধুর রসের ইহাই পরিণতি।

এই কথায় শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। আত্মহারা হইয়া উভয়ে কোলাকুলি করিয়া নাচিতে লাগিলেন। বল্লভ ভট্ট ও অন্যান্য দর্শকগণ স্তব্ধ হইয়া গেলেন। গ্রামের লোক শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক কথা শুনিয়া আসিয়া সাক্ষাৎ করিল; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলে তাঁহার প্রশংসা

করিতে লাগিল এবং সকল লোক হরিপ্রেম লাভ করিয়া বৈষ্ণব হইয়া গেল। ক্রমে জনতা বাড়িতে লাগিল দেখিয়া ভট্ট শ্রীচৈতন্যকে প্রয়াগে লইয়া আসি- লেন। ত্রিবেণী ঘাটের বাসায় দিন দিন লোকের ভিড় বৃদ্ধি ও সাধন ভজনের ব্যাঘাৎ উপলব্ধি করিয়া চৈতন্যদেব দশাশ্বমেধে যাইয়া নির্জ্জন স্থানে বসতি করিলেন এবং সেইখানে দশদিন পর্য্যন্ত শ্রীরূপ গোস্বামীকে তত্ত্ব উপদেশ দিয়া নিজ শক্তি সঞ্চার করিলেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উপক্রমণিকায় শ্রীরূপ এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। "অতি ক্ষুদ্র হইয়াও আমার হৃদয় যাঁহার প্রেরণায় রসবর্ণনে সমর্থ হইতেছে; সেই চৈতন্যদেবের বন্দনা করি।" যাহা হউক, পূর্ব্বে রায় রামানন্দের মুখে মহাপ্রভু যে সব তত্ত্ব শুনিয়াছিলেন, রূপকে সেই সব তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, কত তত্ত্বই, তাঁহার শ্রীমুখে স্ফুরিত লাগিল। রূপ গোস্বামী কৃতার্থ হইয়া গেলেন। পূর্ব্বজীবনে বাদসাহের চাকুরীতে যে অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন, এখন তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন, 'জীবনের পূর্ব্বভাগ কি অপকর্ম্মেই কাটাইয়াছি?' হীরক পাইলে কাহারই বা কাচে আগ্রহ হয়? শ্রীরূপের হৃদয়ে নানা জিজ্ঞাসা উঠিতে লাগিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'জীবের স্বরূপ কি? ভক্তিরস কাহাকে বলে?'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, 'শুন রূপ! ভক্তিরসসিন্ধু গভীর অনন্ত তাহার সকল কথা বলা যায় না। আচ্ছা, তোমাকে তার এক বিন্দু আস্বা- দন করাইতেছি। প্রথমে জীব লক্ষণ বলিতেছি। ভগবানের অনাদ্যনন্ত চিচ্ছরূপের অতি স্বল্প হইতে স্বল্পতর অংশ জীব। কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া তাহাকে শত সহস্র অংশ করিলে যেমন ক্ষুদ্র হয়, জীবের স্বরূপ তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম। অনেকে জীবকে অপরিমিত, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, ঈশ্বর হইতে অভিন্ন কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা কল্পনামাত্র। জীব সকল শরীরধারী, জনন মরণ ধর্ম্মশীল। সে স্বভাব পরিহার না করিয়াও কি সে আপনি আপনার নিয়ামক হইতে পারে? শাস্য শাসকের ধর্ম্ম কিরূপে পাইবে? শ্রুতি বলিয়াছেন, যে মনে করে আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি তাহার কিছুই জানা হয় নাই। ব্রহ্ম এমনি অনাদ্যনন্ত মহান্ ও পূর্ণ। ক্ষুদ্র অপূর্ণ জীব কি কখন তাঁহার সমান হইতে পারে? জীব বলিতে আমি স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় সৃষ্টি প্রকৃতিকে নির্দ্দেশ করিতেছি। সকলই পূ

চিচ্ছরূপের অত্যল্প চিৎকণ মাত্র। স্থাবর বাদ দিলে জঙ্গমকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তির্য্যক্, জলচর, ও স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মানুষের সংখ্যা আবার অতি অল্প। মানুষের মধ্যে আবার ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধই অধিকাংশ। অতি অল্প সংখ্যক বেদনিষ্ঠ। বেদনিষ্ঠের মধ্যে অধিকাংশই মুখে বেদ মানিয়া থাকে মাত্র, কার্য্যে ধর্ম্মের ধার ধারে না, কিছুই মানে না। ধর্ম্মাচারীর মধ্যে আবার অধিকাংশই কর্ম্মনিষ্ঠ, বাহিরের আড়ম্বর পূর্ণ অন্তঃসার শূন্য যাগযজ্ঞে রত। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে একটী জ্ঞানী পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ। জ্ঞানিগণের মধ্যে জীবন্মুক্তের সংখ্যা অতি অল্প। আবার কোটি কোটি মুক্ত পুরুষ খুঁজিলে একটী ভক্ত পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এক্ষণে বুঝিলে ভক্তি কেমন দুর্ল্লভ জিনিষ?'

বলিতে বলিতে গৌরের প্রেমাবেগ উচ্ছ্বসিত হইল, তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, 'শুন রূপ! যদি কোন ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণকৃপায় ভক্তিলতার একটী অতি ক্ষুদ্র বীজও লাভ করিতে পারেন ও শ্রবণ কীর্ত্তন জলে নিয়ত তাহা সেচন করিতে পারেন, তবে অবশ্যই তাহা অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া উঠিবে। পরব্যোম, ব্রহ্মলোক ও আসক্তি-শূন্য বিরজাক্ষেত্রও তাহাকে আট্‌কাইতে পারিবে না। কিন্তু গোঁড়াতে নিয়তই শ্রবণাদি জল ঢালিতে হইবে; বিরাম দিলে লতাটী শুকাইয়া যাইবে। সাবধান! সাধু অপরাধ হাতিমাতা যেন না জন্মে; জন্মিলে তোমার লতা মারিয়া ফেলিবে। আরও ভয় আছে, জল সেচন পাইয়া লতার গায়ে উপ-শাখা বাড়িতে পারে; ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা, সন্দেহ কুটিনাটী, লাভ প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা, ইত্যাদি বহুবিধ আগাছা বাড়িতে পারে। সাবধানে সে সব উন্মূলিত না করিলে ভক্তিলতা বাড়িবে না। কিন্তু এই লতা একবার বাড়িয়া উঠিলে আপনিই প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়া কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে জড়াইয়া ধরিবে। তখন উহাতে কত সুন্দর ফুল ফুটিবে, ফলভরে অবনত হইবে ও ফল আস্বাদন করিয়া মালী শ্রম সার্থক মানিবে। অবশেষে এই লতা ধরিয়াই মালী কল্পবৃক্ষে উঠিতে পারিবে।' এই ফলের নাম কি জান? প্রেম। ইহার নিকট চতুর্ব্বর্গ অতি তুচ্ছ।' গৌরচন্দ্র আত্ম সংবরণ করিয়া বলিলেন, "কথায় কথায় অবান্তর কথা আনিয়াছি। কি বলিতেছিলাম?'

শ্রীরূপ উত্তর করিলেন, ভক্তির লক্ষণ ব্যাখ্যা করিবেন, বলিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য কহিলেন "হাঁ, অন্যবাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য

লইয়া একাগ্রচিত্তে ও পবিত্র ভাবে যে ভগবদনুশীলন করা যায়, তাহার নাম ভক্তি। অথবা ভগবানের গুণ চরিত শ্রবণাদি হইতে সাগরাভিমুখী নদী গতির ন্যায় তাঁহাতে যে অবিচ্ছিন্না মনোগতি উৎপন্ন হয়, তাহাকেও 'ভক্তি' বলা যাইতে পারে। এই ভক্তি সাধন করিতে গেলে সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতে হইবে যেন ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা হৃদয়ে না থাকে।"

শ্রীরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই ভক্তি হইতে কিরূপে প্রেম প্রকাশ হইতে পারে?'

শ্রীচৈতন্য উত্তর দিলেন, 'ভগবৎ কৃপায় মানবহৃদয়ে স্বভাবতই কতক গুলি সুকোমল ভাবের বীজ নিহিত আছে। সেই গুলিকে হৃদয়ে উদ্দীপন করার নামই সাধন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন দর্শনাদির দ্বারা এই সাধন করিতে হয়। এই অবস্থায় ভক্তির নাম সাধন ভক্তি। সাধন ভক্তি আবার দুই প্রকার, বৈধী ও রাগানুগা। অনুরাগ-বিহীন হৃদয়ে কেবল শাস্ত্র ও গুরূপদেশ ধরিয়া যে ভাবসাধন করা যায় তাহার নাম বৈধী ভক্তি। আর অভিলষিত বস্তুতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনপেক্ষিত স্বাভাবিক প্রেমময় প্রগাঢ় তৃষ্ণার নাম রাগময়ী ভক্তি।

শ্রীরূপ। অনুরাগবিহীন ব্যক্তির ভাব সাধন কেমন করিয়া সম্ভবে?

শ্রীচৈতন্য। কেবল মাত্র শ্রদ্ধার উদয় হইলে হইতে পারে। শ্রদ্ধা ও অনুরাগে অনেক প্রভেদ। 'শ্রদ্ধা' অর্থ ভাল বলিয়া অনুমোদন করা। উহা হইতে সাধু সঙ্গ করিতে ইচ্ছা জন্মিতে পারে, সাধু সঙ্গ হইতে শ্রবণ কীর্ত্তনে মনোনিবেশ হয়। তাহা হইতে ক্রমে নিষ্ঠা, শ্রবণাদিতে রুচি, ও অবশেষে আসক্তি ও রতি জন্মে। রতি হইতে প্রেমলাভ হয়।

শ্রীরূপ। প্রেমের স্থায়িভাব কি?

শ্রীচৈতন্য। ভগবানে স্নেহ, মান, প্রণয়, অনুরাগ, সখ্যতা, প্রভৃতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমের স্থায়িভাব রসলীলা হইতে পারে।

শ্রীরূপ। এ সকলের কি কোন শ্রেণী বিন্যাস নাই?

শ্রীচৈতন্য। আছে বৈ কি? শুন নাই কি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতি কি রস যাই বল, প্রেমের স্থায়িভাব, এই পাঁচ প্রকার অবস্থায় প্রকাশ হইয়া থাকে। এই পাঁচটী স্থায়িরসে আগন্তুক বা আকস্মিক কারণে যদি হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস, সাতটী গৌণরসের যোগ হয়, তাহা হইলে ভক্তের প্রাণে অনন্ত রসভেদ ও লীলাবৈচিত্র

প্রকাশ হইতে পারে। উহাতে সাধককে কখন হাসায়, নাচায়, কাঁদায়, রাগায়, মৌনী করে এবং কত ভাব তরঙ্গে ভাসাইয়া ডুবাইয়া দেয়।

শ্রীরূপ। রতির যে পাঁচটী স্থায়িভাব বলিলেন, তদ্ভিন্ন আর কোন রূপ বিভাগ আছে কি না?

শ্রীচৈতন্য। আছে, দুই প্রকার ভক্তির প্রকৃতি ভেদে রতি দুই প্রকার। বৈধী ভক্তি যোগে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা ও রাগময়ী ভক্তিতে কেবলা রতি উৎপন্ন হয়। যে রসেরই ভক্ত হউন না কেন, ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্রা রতিতে প্রীতি সঙ্কুচিত হয়; ভয় বা সম্ভ্রম বৃদ্ধি পায়। যেমন বাৎসল্য রসে, শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে প্রণাম করিলে তাঁহাকে ঈশ্বর বোধে পিতা মাতার মনে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল। সখ্য রসে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের সখ্য-প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া মনে সম্ভ্রম ও ভয়ের উদয় হইয়াছিল এবং মধুররসে, কৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে রুক্মিণীকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া রুক্মিণীর ত্রাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু কেবলা রতিতে ঈশ্বরে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান থাকে না, কেবল শুদ্ধ প্রেমের উদয় হয়। নন্দ যশোদা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া সামান্য আত্মজ জ্ঞানে বাৎসল্য করিতেন। শ্রীদাম আদি রাখালগণ সখা জ্ঞানে তাঁহার কাঁধে চড়িতেন ও গোপাঙ্গনারা সামান্য নায়ক বিবেচনায় কত মত ভাল বাসিতেন। একস্থানে ভয় বা সম্ভ্রমযুক্ত প্রীতি, অপর স্থানে ঈশ্বরের অসীম ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা ভুলিয়া গিয়া নিতান্ত আত্মীয় জনের ন্যায় ব্যবহার, দুই প্রকার রতির এই দুই প্রকার প্রকৃতি। কেবলা রতিতে দাস্যভাব থাকিলেও তাহা ঐশ্বর্য্য জ্ঞান জনিত নহে, প্রেমজনিত সেবার দাসত্ব। স্বামীকে যেমন স্ত্রী দাসীর ন্যায় সেবা করেন, পুত্রকে পিতা মাতা যেমন স্নেহ সেবা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ।

শ্রীরূপ। পঞ্চরসের প্রকৃতি কি, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

শ্রীচৈতন্য। ভগবানে নিষ্ঠা বুদ্ধির নামই শম বা শান্তরস। ইহার দুইটী গুণ, যথা বাসনাত্যাগ ও কৃষ্ণে একাগ্রতা। আকাশের শব্দগুণ যেমন সকল ভূতেই বিদ্যমান, সেইরূপ শান্তরসের এই দুই গুণ পর পর সকল রসে থাকা অবশ্যম্ভাবী। ইহা ভিন্ন অন্যান্য রস সম্ভবে না। কিন্তু কেবল শান্ত রসে ঈশ্বরে গাঢ় মমতা হয় না, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ লীলাময় পুরুষরূপে প্রতীয়মান হয় না। শান্ত ভক্তের নির্ম্মল অন্তঃকরণে কেবল মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ বা সত্তা জ্ঞান প্রতিভাত হয়। তাহার পর দাস্য রতিতে শান্তের

বাসনা ত্যাগ ও একাগ্রতা ; অধিকন্তু প্রভু জ্ঞান বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হেতু সম্ভ্রম ও গৌরবজনিত সেবা। তৃতীয় সখ্য রতি। উহাতে শান্তের গুণ ও দাস্যের সেবার উপর পূর্ণ বিশ্বাস। ঈশ্বরসত্বায় বিশ্বাস নহে, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যেমন বিশ্রব্ধ ভাব, অগৌরব, অসঙ্কোচ এবং মমতা যুক্ত বিশ্বাস, তেমনি। চতুর্থতঃ বাৎসল্যরতি। শান্ত, দাস্য, ও সখ্যের গুণ ব্যতীত ইহাতে স্নেহের ভাব অর্থাৎ ভক্ত আপনাকে পালক ও শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং তাড়ন, ভৎর্সন, লালন, ও সেবা করিয়া আপনার বাৎসল্য রতি চরিতার্থ করেন। অবশেষে মধুর রতিতে প্রথমোক্ত চারি রসের সমস্ত গুণ ও তদ্ব্যতীত আত্ম সমর্পণ হইয়া রস লীলা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। যেমন আকাশের শব্দগুণ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ গুণ, অগ্নির শব্দ, স্পর্শ, ও রূপ, জলের শব্দ স্পর্শ, রূপ ও রস গুণ, সমস্তই পৃথিবীতে বিদ্যমান ; অধিকন্তু গন্ধগুণ তাহার বিশেষত্ব ; তেমনি শান্ত দাস্যাদির সমস্ত গুণ ও অধিকন্তু আত্মসমর্পণ মধুর রসে বিদ্যমান। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রতি। ইহার পর আর রস নাই, রতি নাই। এই সংক্ষেপে ভক্তি রসের বিষয় তোমাকে বলিলাম। ইহার বিস্তা বলিতে সময়ও নাই, শক্তিও নাই। ভগবান্ হৃদয়ে থাকিয়া তোমাকে স বুঝাইয়া দিবেন। তখন তুমি এ সব তত্ত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হইবে কৃষ্ণ-কৃপায় অতি মূর্খও মহা পণ্ডিত হয় ; অজ্ঞও ভবসিন্ধু পারে যায় এব অন্ধ আতুর তরিয়া যায়। দশ রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য এই রূপে শ্রীরূপে উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'আমি কল্য প্রাতে বারাণসী যাত্রা করিব।'

শ্রীরূপ উত্তর করিলেন, 'যদি আজ্ঞা হয়, আমিও সঙ্গে আসি। তোমা ছাড়িয়া কোথায় যাইব ও কেমন করিয়াই বা থাকিব ?'

শ্রীচৈতন্য রূপের মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, 'আমার আদেশ পাল করা তোমার কর্ত্তব্য। যদি আসিয়াছ, তবে যাহাতে তোমার হিত হয় তাহা করা আমার কর্ত্তব্য। এখন দুই ভাই বৃন্দাবনে যাও ; তাহার প বঙ্গদেশ দিয়া নীলাচলে আমার সহিত মিলিত হইবে।' শ্রীরূপ দ্বিরুক্তি ন করিয়া সম্মত হইলেন।

শ্রীচৈতন্য প্রভাতে নৌকারোহণে বারাণসী যাত্রা করিলেন। শ্রীরূ ও বল্লভ অন্য দিকে মাথুর ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাস রজঃপুত্রের সঙ্গে মথুরাভিমুখে গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কাশীধামে—সনাতন শিক্ষা।

শ্রীচৈতন্য বারাণসী নগরীর প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া দেখিলেন, চন্দ্রশেখর বৃক্ষমূলে বসিয়া যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। জিজ্ঞাসায় চন্দ্রশেখর বলিলেন, 'রজনীশেষে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন তুমি কাশীতে আসিয়াছ, তাই প্রত্যূষ হইতে এখানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছি।' শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলে সকলে শেখরের ভবনে গমন করিলেন। সেখানে তপন মিশ্র ও পূর্ব্বপরিচিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া লন। তপন মিশ্র নিমন্ত্রণ করিয়া যাত্রীদলকে আহার করাইয়া কে নিবেদন করিলেন যে কাশীতে অবস্থিতিকালে অন্যত্র যেন নিমন্ত্রণ লয়েন। শ্রীচৈতন্য পাঁচ সাত দিন মাত্র কাশীতে থাকিবেন বিবেচনায় ই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বাসা নির্দ্দিষ্ট হইল, বং তপন মিশ্রের গৃহে ভোজন করিতে লাগিলেন।

গৌড়ের বন্দীশালে সনাতন কারাবদ্ধ, তাঁহার হস্তে পদে লৌহশৃঙ্খল। গৌড়েশ্বর উৎকলে গিয়াছেন। এমন সময়ে সনাতন শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া কারামোচনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি কারাধ্যক্ষকে নির্জ্জনে দেখা পাইয়া অভিবাদন করিয়া বলিলেন, 'আপনি জিন্দাপীর! কেতাবসরিফে মহাপণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। কোরাণ রিফে লেখা আছে, নিজধন দিয়া যদি একটী বন্দীকেও কারামোচন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আল্লাতালা তাঁহাকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করেন। আমার দ্বারা পূর্ব্বে আপনি অনেক উপকার পাইয়াছেন। এক্ষণে আমাকে মুক্ত করিয়া প্রত্যুপকার করুন, এই আমার বিনীত প্রার্থনা। আমি আপনাকে পাঁচসহস্র টাকা দিব। আপনার পুণ্য ও অর্থ, দুই লাভ হইবে।' কারাধ্যক্ষ ভদ্রতা ব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করিলেন, 'আপনাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু দুর্দ্দান্ত রাজাকে বড় ভয় হয়।' সনাতন বলিলেন, 'রাজা দক্ষিণে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছেন। ফিরিয়া আসিবেন কিনা সন্দেহ। যদি আসেন, তাঁহাকে বলিবেন যে গঙ্গার নিকট বহির্দ্দেশে গিয়া সে শৃঙ্খল সহিত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, বহু অনু-

সন্ধানেও খোঁজ পাওয়া যায় নাই। আপনার ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। কেন না আমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। আমি এ দেশে থাকিব না। দরবেশ হইয়া মক্কায় যাইব।' ইহাতেও যবনের মন উঠিল না দেখিয়া সনাতন রূপ পরিত্যক্ত সাত হাজার টাকা আনাইয়া তাহার অগ্রে রাশীকৃত করিলেন। কারাধ্যক্ষ লোভে পড়িয়া টাকাগুলি আত্মসাৎ করিলেন এবং রজনী যোগে শৃঙ্খল কাটিয়া সনাতনকে গঙ্গাপার করিয়া দিলেন। বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশানকে সঙ্গে লইয়া প্রকাশ্য রাজপথ ছাড়িয়া রাজমন্ত্রী কাঙ্গাল বেশে উপপথে ধাইয়া চলিলেন। ধন্য অনুরাগ! তুমি রাজাকে পথের কাঙ্গাল, দাম্ভিককে তৃণসম নীচ এবং মানুষকে দেবতা করিতে পার। রাত্রি দিন চলিয়া চলিয়া শ্রীসনাতন পাতড়া নামক পর্ব্বতের নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে একজন ভূমিক থাকিত, সে ঘাটি ছাড়িয়া না দিলে পর্ব্বত পার হইবার উপায় নাই। এই ভূমিক দস্যু প্রকৃতির লোক। কথিত আছে, তাহার নিকট একজন গণক ছিল; সে হাত গণিয়া কাহার নিকট কত টাকা আছে বলিয়া দিত; ভূঞা তদনুসারে পথিকের প্রাণবিনাশ করিয়া লুঠিয়া লইত। সেই গণক কাণে কাণে ভূঞাকে বলিল যে, সনাতনের নিকট আটটী সুবর্ণ মোহর আছে। ভূঞা সনাতনকে বলিল, 'এক্ষণে স্নান ভোজন কর, রাত্রিযোগে লোক দিয়া পর্ব্বত পার করিয়া দিব।' এই বলিয়া বহু সমাদর করিয়া সনাতনের আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিল। সনাতন স্নান ভোজন করিয়া, ভূঞার ব্যবহারে কিছু সন্দিগ্ধ হইলেন, এবং ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার নিকট কিছু টাকাকড়ি আছে কি না? ঈশান এবারে মুস্কিলে পড়িল। কারণ তাহার নিকট সত্যই আটটী মোহর ছিল। সে ধনলোভ ছাড়িতে পারে না, অথচ মনিবের নিকট একেবারে মিথ্যা বলিতেও সাহসী হইল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া ঈশান বলিল, তাহার নিকট সাতটী মোহর আছে। সনাতন তাহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'এই কাল যম কেন সঙ্গে আনিয়াছ?' তখন ঐ সাতটী মোহর চাহিয়া লইয়া সনাতন গোঁসাই ভূঞাকে অর্পণ করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, 'এই সাত মোহর আমার নিকটে ছিল, ইহা আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে পর্ব্বত পার করিয়া দিউন। আমি রাজবন্দী, প্রকাশ্য সড়কে যাইতে পারি না আমাকে উদ্ধার করিয়া দিলে আপনার পুণ্য হইবে।'

ভূঞাজী হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আপনার ভৃত্যের অঞ্চলে আটটী

মোহর ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। এই মোহর আপনি না দিলে আমার লোক আজ রাত্রিতে আপনাকে মারিয়া ফেলিয়া লুঠিয়া লইত। তা' আপনার সরল ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হইলাম; মোহর লইব না। চারি জন লোক দিয়া আপনাকে পাহাড় পার করিয়া দিব।'

সনাতন ভুঞার কথায় কিছু ব্যথিত হইয়া বলিলেন 'আমার মোহরে প্রয়োজন নাই; বরং সঙ্গে থাকিলে উহার লোভে কে কখন প্রাণে মারিয়া ফেলিবে। আপনি উহা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করুন।' ইহার পর ভুঞার চারি জন পাইক সঙ্গে করিয়া সনাতন রাত্রে রাত্রে পর্ব্বত পার হইলেন এবং পর পারে যাইয়া ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'সত্য কি আর একটী মোহর তোমার নিকটে আছে?' সে 'আছে' কহিলে, সনাতন তাহাকে মোহর লইয়া স্বদেশে যাইবার অনুমতি দিয়া একাকী হাতে করোয়া ও স্কন্ধে ছিন্ন কন্থা লইয়া নির্ভয়ে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন। কতক দিন পরে তিনি বর্ত্তমান মজঃপুর জেলার অন্তর্গত হাজিপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া একটী উদ্যানে বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন হাজিপুরে গৌড়েশ্বরের রাজকর্ম্মচারীগণ থাকিতেন। শ্রীকান্ত নামে সনাতনের ভগিনীপতি, গৌড়াধিপের জনৈক কর্ম্মচারী। তিন লক্ষ টাকা লইয়া তিনি দিল্লীতে বাদসাহকে কর দিতে যাইতেছেন; সম্প্রতি হাজিপুরের রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি উচ্চ প্রাসাদ হইতে ফকীর বেশী সনাতনকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া রজনীযোগে একটী বিশ্বস্ত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দুইজনে অনেক কথা-বার্ত্তা হইল। সনাতন স্বীয় বন্ধন মোক্ষণের বিষয় বলিলে শ্রীকান্ত তাঁহাকে বৈরাগ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু মহাপুরুষের মন কিছুতেই টলিল না দেখিয়া শ্রীকান্ত দুই চারি দিন নিভৃতে রাজপ্রাসাদে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন তাহাতেও সম্মত না হইয়া বলিলেন 'এই মুহূর্ত্তেই চলিয়া যাইব, আমাকে তুমি গঙ্গাপার করিয়া দাও।' শ্রীকান্ত তাঁহার ছেঁড়া কাঁথা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং অগত্যা একখানি মূল্যবান্ ভোট কম্বল লইতে সম্মত করাইয়া বিশ্বস্ত লোক দ্বারা গঙ্গাপার করাইয়া দিলেন। সনাতন অদম্য উৎসাহে শ্রীচৈতন্যের মিলনাশায় ছুটিলেন। আর কতক দিনে বারাণসীনগরে আসিয়া সনাতন গোঁসাই লোকমুখে শ্রীচৈতন্যের আগমনবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া অনুসন্ধানে চন্দ্র-

শেখরের বাহির বাটীতে আসিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলেন। শ্রীচৈতন্য তখন ভিতর প্রকোষ্ঠে; বুঝিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন 'দেখ ত বাহিরে একজন বৈষ্ণব বসিয়া আছে কি না?' চন্দ্রশেখর বাহির বাটীতে দেখিয়া ফিরিয়া যাইয়া বলিলেন 'কৈ কোন বৈষ্ণব ত দেখিলাম না।' শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেহই কি নাই?' চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন, 'একজন দরবেশ আছে।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'তাঁহাকে ডাকিয়া আন।' চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিয়া আগন্তককে ডাকিয়া লইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মাত্র, চৈতন্য দেব পিঁড়া হইতে আস্তেব্যস্তে উঠানে নামিয়া আসিয়া সনাতনের গলা ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতন প্রেমাবিষ্ট চিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। দুইজনে অনেকক্ষণ গলা ধরাধরি করিয়া রোদন করিলে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে পিঁড়ার উপরে লইয়া গিয়া নিজ পার্শ্বে বসাইয়া স্বহস্তে তাঁহার অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। সনাতন বলিলেন 'ছি প্রভো! অস্পৃশ্য ঘৃণিত পাপীকে স্পর্শ করিও না।' চৈতন্য উত্তর দিলেন 'তোমার ন্যায় ভগবজ্জনের স্পর্শে আমি আজ পবিত্র হইলাম। মহাজনগণ পরম পবিত্র তীর্থ স্বরূপ। তাঁহাদের সংস্পর্শে তীর্থস্নানের পুণ্য হয়।'

সনাতন বলিলেন 'আমি যে অস্পৃশ্য যবন।'

শ্রীচৈতন্য। চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয় না। শ্বপচ ম্লেচ্ছও ভক্তিবলে ভগবানের প্রিয় অন্তরঙ্গ হইতে পারেন। দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁহারা কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ।

সনাতন। আমি ত আর ভক্ত নই, আমি যে মহাপাপী।

শ্রীচৈতন্য। তা' আমি বুঝিয়া লইব। কিন্তু সনাতন! দেখ, কৃষ্ণ কেমন দয়াময়। তোমাকে মহা রৌরব হইতে তুলিয়া আনিলেন। ধন্য শ্রীহরি! তোমার কৃপাই ধন্য। অপার গভীর তব কৃপার মহিমা আমি কি বুঝি?

সনাতন। আমি শ্রীকৃষ্ণ জানি না। তোমার কৃপাবলেই সংসারসাগর পার হইলাম, এই জানি।

তখন শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেমন করিয়া কারামুক্তি পাইলে?' সনাতন আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে গৌর বলিলেন 'তোমার ভাই রূপ ও বল্লভের সঙ্গে আমার প্রয়াগে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও কতক দিন তাঁহাদের সঙ্গে একত্র ছিলাম। তাঁহারা এখন বৃন্দাবনভ্রমণে গিয়াছেন।' তপন-

মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় করিয়া দিয়া শ্রীচৈতন্য চন্দ্রশেখরকে বলিলেন 'এখন ইঁহাকে ক্ষৌর ও স্নান করাইয়া ভদ্রবেশ করাইয়া দাও। দরবেশবেশ ভাল লাগে না।' সনাতন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে চন্দ্রশেখর তাঁহাকে নূতন বস্ত্র দিলেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। তপন মিশ্রের নিকটে এক পুরাতন ধুতি চাহিয়া লইয়া দুই খণ্ড করিয়া কৌপীন বহির্ব্বাস করিয়া পরিলেন। সেদিন তপন মিশ্রের গৃহে সকলের ভোজন হইল; সনাতন শ্রীচৈতন্যের শেষ প্রসাদ পাইলেন। অপরাহ্নে মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় হইলে তিনি গোঁসাইকে মহানিমন্ত্রণ করিলেন। মহানিমন্ত্রণের অর্থ সনাতন যাবৎ কাশীপুরে থাকিবেন, তাবৎ তাঁহার গৃহে ভোজন করিবেন। সনাতন তাহা স্বীকার না করিয়া মাধুকরী করিয়া উদর পোষণ করিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রী পথের ভিখারী হইলেন। শ্রীচৈতন্য সনাতনের কঠোর বৈরাগ্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু তাঁহার গায়ের বহুমূল্য ভোটকম্বল দেখিয়া মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট থাকিলেন। সনাতন তাহা বুঝিতে পারিয়া একদিন গঙ্গাস্নানে যাইয়া একজন দুঃখী কাঙ্গালীকে কম্বলখানি দিয়া তাঁহার ছেঁড়া কাঁথা লইয়া অঙ্গাবৃত করিয়া চৈতন্যের নিকটে আসিলেন। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার ভোটকম্বল কোথায়?' সনাতন আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে গৌর বলিলেন—'উহা আমি বুঝিয়াছি। ভগবান্ তোমার বিষয় ভোগ ঘুচাইয়া শেষ ভোগ রাখিবেন কেন? সদ্বৈদ্য রোগের চিকিৎসা করিয়া কি রোগশেষ রাখিয়া দেন? মূল্যবান্ কম্বল গায়ে মাধুকরী করা কি উপহাসের বিষয় নয়?' সনাতন বিনীতভাবে বলিলেন 'তোমার কৃপায় যে আমার কুবিষয় ভোগের শেষ ইচ্ছাটুকু গিয়াছে, ইহাতে কৃতার্থ হইলাম।'

ক্রমে ভগবৎ কৃপায় সনাতনের তত্ত্বজিজ্ঞাসা স্ফুরিতে লাগিল। দিনে দিনে তিনি শ্রীচৈতন্যকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য পাঁচ সাত দিনমাত্র কাশীতে থাকিবেন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু সনাতনের প্রশ্ন মীমাংসায় ও সৎপ্রসঙ্গে দুই মাস কাটিয়া গেল। সনাতনের জিজ্ঞাসা ও শ্রীচৈতন্যের মীমাংসা বৈষ্ণব সমাজে 'সনাতন শিক্ষা' নামে মহা সম্মানিত। পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে শ্রীচৈতন্য দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, রামানন্দ রায়ের নিকট শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধিকাতত্ত্ব যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন ও প্রয়াগে শ্রীরূপকে ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন,

সেই সকল তত্ত্ব ও ব্রহ্মবিচার প্রভৃতি বিষয় তিনি সনাতনকে শিক্ষা দিলেন। ষট্‌সন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে পরবর্ত্তী সময়ে রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী অতি বিস্তৃতরূপে এই সকল তত্ত্ব সমালোচনা করিয়াছেন। নিম্নে আমরা অতি সংক্ষিপ্তভাবে সনাতন শিক্ষার বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠকগণ দেখিবেন, এই শিক্ষায় চারিটী বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে। প্রথমতঃ তত্ত্ববিচার ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, দ্বিতীয়তঃ জীবতত্ত্ব, তৃতীয়তঃ জীবের কর্ত্তব্য কি? ও চতুর্থতঃ জীবের প্রাপ্য কি? জীবের কর্ত্তব্য ভগবানে ভক্তি করা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ইহাতে আনুষঙ্গিকরূপে জ্ঞানকর্ম্মাদির গৌণত্ব ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, তাহার মধ্যে আবার রাগানুগা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবের প্রাপ্য ভগবৎপ্রেম। উহা মুক্ত্যাদি চতুর্ব্বর্গ হইতেও লোভনীয়। বৈষ্ণব গ্রন্থে এই চারি বিষয়কে সাধ্য, সম্বন্ধ, অভিধেয়, ও প্রয়োজন, নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আমরাও যথাসাধ্য ঐ ভাষা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব।

সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের চরণ ধরিয়া দৈন্য বিনয় করিয়া বলিলেন 'আমি নীচ জাতি, নীচ সঙ্গে ও নীচ কর্ম্মে দুর্ল্লভ মানবজীবন বৃথা নষ্ট করিয়াছি। যদি কৃপা করিয়া কুবিষয় গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছ, তবে আমার কর্ত্তব্য কি, বলিয়া দাও। আমি কে? কি জন্য সংসারে আসিয়াছি? আমাকে কেনই বা ত্রিতাপে জর্জ্জরিত করিতেছে? কিসে আমার মঙ্গল হইবে? আমার প্রাপ্যবস্তুই বা কি? ও আশ্রয়দাতাই বা কে? এই সব প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া আমার উপকার কর।' শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা তোমার উপর। তুমি সকল তত্ত্বই জান। তোমাকে কি ত্রিতাপ ক্লেশ দিতে পারে? তুমি ভগবানের শক্তিধর। সাধু জনের স্বভাবই এই, সমুদায় জানিয়াও দৃঢ় নিশ্চয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আচ্ছা, আমি একে একে সব তত্ত্ব বলিয়া যাইতেছি, তুমি শুনিয়া যাও। জগতে ভক্তি প্রবর্ত্তন করিতে তুমিই যথার্থ যোগ্যপাত্র। তোমার নিকট এ সব কথা বলিব না, ত আর কাহাকে বলিব? প্রথমে তত্ত্ববিচার বলিতেছি, শ্রবণ কর।

তত্ত্ববিচার ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

এক অখণ্ড, অব্যয়, জ্ঞানবস্তুকেই তত্ত্ব বলা যায়। তিনিই সৃষ্ট্যাদির আদিকারণ, তাঁহার কারণ কেহ নাই। তাঁহার সত্ত্বাতেই জগতের সত্ত্বা,

তিনি না থাকিলে কিছুই থাকে না। তাঁহার তুল্যও কেহ নাই, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। তিনি শুদ্ধ, আনন্দ, চিন্ময়। শ্রুতি সকল তাঁহার কথা উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া শেষ করিতে পারে নাই। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সকলের আশ্রয় ও কিশোরশেখর রসরাজ মূর্ত্তি। আমি তাঁহাকেই ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছি। এই তত্ত্ব বস্তুর অনন্ত প্রকাশের মধ্যে তিনটী মুখ্য প্রকাশ আছে। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ তিনটী পৃথক্ বস্তু নহে, একই বস্তুর তিনটী প্রকাশ মাত্র। ব্রহ্মস্বরূপ নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময়; ইনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। অনন্ত বিশ্বসৃষ্টিতে যে জ্যোতিঃ প্রকাশিত, তাহা ব্রহ্মজ্যোতির ছায়া মাত্র। তাঁহার সত্বাতে সকলই সত্যবৎ প্রতীয়মান। বস্তুতঃ চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, কি অগ্নি, কিছুরই দ্বারা সে জ্যোতিঃ প্রকাশ হইবার নহে। একমাত্র বিশুদ্ধ তত্ত্ব জ্ঞানে কিঞ্চিন্মাত্র বুঝা যায়। নির্ব্বিশেষ উপাসকগণ জ্ঞানমার্গে এই ব্রহ্মজ্যোতিতে আনন্দে নিমগ্ন থাকেন। দ্বিতীয় পরমাত্মা। ইনি চৈতন্যময় অন্তর্যামী, আত্মারাম, অন্তরতর, অন্তরতম। হিরণ্ময়ে পরে কোষে ইঁহাকে ধ্যান করিয়া যোগিগণ নিমীলিত চক্ষে যুগযুগান্ত কাটাইয়া দেন। তৃতীয় ভগবান্, ইনি লীলাবিগ্রহ। নরলীলায় ও মানবইতিবৃত্তে তাঁহার দর্শন হইতে পারে। দীপশিখা হইতে যেমন তত্তুল্য দীপশিখা প্রজ্বলিত হয়; তেমনি ইনি কৃষ্ণের একদৈশিক প্রকাশ হইয়াও কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। লীলা ভিন্ন ভক্তি চরিতার্থের স্থান নাই। সুতরাং কেবল ভক্তিযোগেই ভগবানের বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অনন্ত রূপবৈচিত্রের মধ্যে ভগবানের তিনটী রূপ প্রধান। স্বয়ংরূপ, তদেকাত্ম রূপ ও আবেশ রূপ। আনন্দঘন ও প্রেমঘন ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ং রূপ *। শ্রীবৃন্দাবনে লীলাপ্রকাশ যোগমায়ার সাহায্যে কেবল ভক্তকে সুখ দিবার জন্য। নইলে এই রূপ নিত্যলীলায় নিত্যপ্রকাশ; কখন ইহার অপ্রকটাবস্থা নাই। এই রূপ অনাদিসিদ্ধ। যে উপায়ে ইহা আস্বাদন করা যাইতে পারে, তাহা পরে বলিব। স্বয়ং রূপ দুইভাবে প্রকাশ হয়। তাহার নাম প্রাভব বিলাস ও বৈভব বিলাস। প্রাভব বিলাসে একই বিগ্রহ বহুস্থানে বহু পরিমাণে লক্ষিত হয়; যেমন রাসমণ্ডলে। বৈভব বিলাসে সেই বিগ্রহ বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যেমন বলরামাদি। ভগবদাত্মায় অনুপ্রাণিত, অথচ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং রূপ হইতে বিভিন্ন রূপের নাম তদেকাত্ম রূপ। ইহার

* বিশেষ ব্যাখ্যা রামানন্দ উৎসবে সপ্তম পরিচ্ছেদে ৫৮ পৃঃ দেখ।

দুইটী প্রকার ভেদ, বিলাস ও স্বাংশ। তাহার মধ্যে বিলাস রূপের আবার বিলাস প্রকাশ ভেদে অনন্ত রূপ বৈচিত্র্য প্রকটিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই চারিটী প্রধান। ইহাদিগকে ব্যূহতত্ত্বও বলে। বাসুদেব অর্থাৎ নর লীলার আদি সূক্ষ্ম চিত্তত্ত্ব, সঙ্কর্ষণ, অহঙ্কার তত্ত্ব (Individuality), প্রদ্যুম্ন কাম অর্থাৎ প্রেমতত্ত্ব ও অনিরুদ্ধ, লীলাতত্ত্ব। এই চারিতত্ত্বের সহিত জড় সৃষ্টির কোন সংশ্রব নাই। ইহা মায়াতীত ধামে ভগবানের লীলাতত্ত্ব রূপে বিলসিত হইতেছে। স্বাংশ-বিলাসে ভগবৎস্বরূপ অনন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে পুরুষা-বতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশা-বতার প্রধান। যেমন উপক্ষয়শূন্য জলধি হইতে কোটি কোটি ক্ষুদ্র জল-প্রবাহ বহির্গত হইয়া থাকে, তেমনি সত্ত্বনিধি ভগবান্ হইতে অসংখ্য অব-তার এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে। সনাতন! লীলাময় ভগবানের অবতারের কথা কি বলিব? কেহ কেহ বলে, জড়রূপা প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি রাজ্যের প্রকাশ। ইহা মূর্খের কথা। অন্ধ জড়শক্তির এমন কি ক্ষমতা আছে যে, সর্ব্বসৌন্দর্য্য, সর্ব্বসুকৌশলপূর্ণ, এই অতুলনীয় বিশ্বসৃষ্টি প্রকাশ করিতে পারে? অগ্নির শক্তিতে উত্তপ্ত হইয়া লৌহ যেমন দাহিকাশক্তি লাভ করিয়া থাকে; তেমনি জড়ই বল আর পরমাণুই বল, বা প্রধান প্রকৃতিই বল, ঈশ্বরশক্তিতে অনুপ্রাণিত না হইলে তাহার সাধ্য কি যে সৃষ্টি প্রকাশ করিবে? স্থূলদর্শী লোক তলাইয়া না দেখিয়াই জড়প্রকৃতিকে আদিকারণ বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছে। অনন্ত শক্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান; ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাসুদেব জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা, সঙ্কর্ষণ ক্রিয়া ও ইচ্ছার অধিষ্ঠাতা। সঙ্কর্ষণ শক্তিতেই সমস্ত সৃষ্টিলীলা প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপে যে সকল শক্তি প্রপঞ্চরূপে অবতীর্ণ হইতেছে, তাহাদেরই সাধারণ নাম অবতার। বিশ্বে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে সে সকলই পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণবক্ষে লুকায়িত ছিল। পূর্ব্বোক্ত অবতার সকলের মধ্যে পুরুষাবতার তিন। কারণাব্ধিশায়ী বা প্রথম পুরুষ; গর্ভো-দকশায়ী বা দ্বিতীয়পুরুষ। বেদে ইহাকে কখন হিরণ্য গর্ভ, সর্ব্বান্তর্যামী ও কখন সহস্রশীর্ষা পুরুষ বলিয়াছেন। তৃতীয় ক্ষীরোদকশায়ী বা মহাবিষ্ণু ইনি পুরুষাবতার ও গুণাবতার উভয় শ্রেণির মধ্যেই সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকেন বিশ্বের আদিকারণে অবস্থিত চৈতন্যাংশের নাম কারণাব্ধিশায়ী। এই কার

একে ভগবানের সৃষ্টিবিষয়িণী ইচ্ছা অথবা মায়া বলা যায়। মায়াই জগতের নিমিত্ত কারণ। তদ্ভিন্ন ইহার আর একটী বৃত্তি আছে, যাহার নাম প্রধান বা উপাদান কারণ। কুম্ভকারের ইচ্ছা ঘটের নিমিত্ত কারণ, আর দণ্ডমৃত্তিকাদি উপাদান কারণ। কিন্তু জগৎস্রষ্টার ইচ্ছাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয়বিধ হেতু। অর্থাৎ তিনি বিনা উপাদানে কেবল ইচ্ছামাত্র এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ইচ্ছা বা মায়ার অভ্যন্তরে যে পুরুষ অর্থাৎ ভগবত্ত্ব অবস্থিত, তিনি স্বয়ং মায়াতীত হইয়াও সমুদায় মায়ার প্রবর্ত্তক। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টিবিষয়ক চৈতন্যাংশ অপূর্ণ হইলেও অপূর্ণতাজনিত অসত্য বা ভ্রান্তি জ্ঞান তাঁহাতে থাকিতে পারে না। কেননা উহা পূর্ণ পুরুষের সহিত অখণ্ডরূপে সংযুক্ত। ইনিই কারণাব্ধিশায়ী। ইহা হইতে মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে সমুদায় সৃষ্টি প্রকাশ হইয়াছে। ইনি কত বড় মহান্, তাহা এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যেমন গবাক্ষের দ্বারে ত্রাসরেণু গমনাগমন করে, তেমনি এই পুরুষের নাসারন্ধ্র দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন ও লয় পাইতেছে। কত কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইহার রচিত ব্রহ্মাণ্ডনিচয় শাসন করিতেছেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিসমষ্টির অভ্যন্তরে পুরুষরূপী যে ভগবদংশ স্থিতি করিতেছেন, তিনি দ্বিতীয় পুরুষ। আর যে বিরাট্ পুরুষ ব্যষ্টি জীবের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রত্যেকের সুখ, দুঃখ, সম্পদ্, বিপদ, আদি বিধান করিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি তৃতীয় পুরুষ বা মহাবিষ্ণু নামে পরিচিত। এক্ষণে লীলাবতারের কথা বলি, শ্রবণ কর। লীলার জন্য ভগবানের অসংখ্য অবতার। তাহার মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, অশ্ব, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও দেবতাদি প্রধান। স্রষ্টা স্বয়ং সৃষ্ট রূপে লীলা করিয়া থাকেন, এ অতি অদ্ভুত রহস্য! গুণাবতারের কথা শুন। রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণে অত্যল্প মাত্র চৈতন্যাংশ বিনিয়োগ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে যে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন, তাহারই নাম শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিষ্ণুকে পুরুষাবতার ও গুণাবতার, উভয়ই বলা গিয়া থাকে। এখন মন্বন্তরাবতারের কথা শ্রবণ কর। ব্রহ্মার এক দিনে ১৪ মন্বন্তর। তাহার এক এক মন্বন্তরে এক এক মন্বন্তরাধিপ। কাজেই ব্রহ্মার এক দিনে ১৪টী মন্বন্তরাবতার হইয়া থাকে। ব্রহ্মার জীবন ব্রহ্ম পরিমাণে ১০০ বৎসর। অতএব ব্রহ্মার জীবনে ৫০৪০০০ মন্বন্তরাবতার হয়। বুঝিয়া দেখ, মহাকাল

নাথের মহাকালে কত অবতার। এক্ষণে যুগাবতারের কথা বলি, শুনিয়া যাও। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারিযুগ। এই যুগ চতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে ভগবান্ শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত, এই চারি বর্ণ ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; এবং অধর্ম্ম দূরীভূত করিয়া ধ্যান ধারণা, যাগযজ্ঞ, পূজা অর্চনা ও নাম সঙ্কীর্ত্তন রূপ তত্তৎ যুগের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এইথানে সনাতন প্রশ্ন করিলেন, কলিযুগের অবতার কে? অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন।

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, অন্যান্য যুগের অবতার যেমন শাস্ত্রীয় লক্ষণ মিলাইয়া বুঝিতে হয়, কলিযুগের অবতারও তেমনি শাস্ত্র দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। পণ্ডিতগণ লক্ষণ বিচার করিয়া তাহা স্থির করিয়া দেন। অবতার নিজে কিছু 'আমি অবতার' বলেন না। আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের মহাজনানুসরণ করাই কর্ত্তব্য।

সনাতন। কি কি লক্ষণে তাহা স্থির হইতে পারে?

শ্রীচৈতন্য। স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণে। আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ লক্ষণ; কার্য্য দ্বারা যে জ্ঞান, তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ।

সনাতন। আপনি বলিলেন, কলিযুগের অবতারের পীতবর্ণ; তিনি নাম প্রেম প্রচার করিবেন। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি কে?

কূট রাজনীতি বিশারদ রাজমন্ত্রী সনাতন তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য এতক্ষণ যে কৌশলজাল বিস্তার করিতেছিলেন, সরলবক্তা শ্রীচৈতন্য এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন 'সনাতন! চাতুরী ছাড়; এখন শক্ত্যাবেশাবতারের কথা শুন।' যাহাতে ও যেখানে ভগবচ্ছক্তি প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই শক্ত্যাবেশাবতার। গৌণ ও মুখ্য ভেদে তাহা দুই প্রকার। যেখানে অত্যল্পমাত্র কৃষ্ণশক্তি প্রকাশ, তাহা গৌণ ও যেখানে জ্ঞানাদি বিশেষ বিশেষ শক্তি বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রকট হয়, তাহা মুখ্য শক্ত্যাবেশ। সনকাদিতে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তি, পৃথুতে পালনশক্তি ও পরশুরামে দুষ্টদমনশক্তি, ইত্যাদি প্রকাশিত বলিয়া তাঁহারা মুখ্য শক্ত্যাবেশান্তর্গত। এইরূপে লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণ অনন্তদেশে অনন্তকালে নিত্যলীলা করিতেছেন। সে লীলার আরম্ভও নাই, শেষও নাই, বিরামও নাই। জ্যোতিশ্চক্র যেমন অবিরাম মহাব্যোমে ঘুরিতেছে; কৃষ্ণলীলাচক্রও সেইরূপ অনাদিকাল হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমন ব্রহ্মাণ্ড নাই, যেখানে কোন না

কোন লীলা সংঘটিত হইতেছে না। তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাই পূর্ণতম; তিনি ব্রজে পূর্ণতমরূপে বিরাজিত। তদ্ভিন্ন অন্যত্র তাঁহার লীলা পূর্ণ ও পূর্ণতর শক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন 'ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম। তাঁহার তত্ত্ব ও স্বরূপ বিগ্রহের বিষয় কিছু বলুন।'

শ্রীচৈতন্য রায় রামানন্দের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, শাস্ত্রীয়প্রমাণ ও যুক্তির সহিত সনাতনের প্রশ্নের উত্তরে তাহাই বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। পুনরুক্তি ভয়ে আমরা তাহা এখানে লিখিলাম না। পাঠক সেই অংশ রামানন্দ উপাখ্যানে পাঠ করিয়া লইবেন।

সনাতন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন 'শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও লীলা-মহিমার কথা কিছু শুনিতে চাই।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'অনন্ত পুরুষের অনন্ত গুণলীলার কথা কে বলিতে পারে? তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, লীলারও অন্ত নাই, এবং লীলার স্থান ব্রহ্মাণ্ডেরও সংখ্যা হয় না। তিনি যোগমায়াশ্রিত হইয়া নিয়তই ক্রীড়া করিতেছেন। জড়াতীত ধামের নাম পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। এমন কত বৈকুণ্ঠ আছে, তাহার অন্ত নাই। এই সকল বৈকুণ্ঠের উপরে কৃষ্ণলোক অবস্থিত। বৈকুণ্ঠ সকল যেন দলশ্রেণি, কৃষ্ণলোক সেই দলের মধ্যে কর্ণিকার। কৃষ্ণলোককে ব্রজধাম বলা যায়। উহাই মাধুর্য্য লীলার স্থান। সেখানে অপ্রাকৃত মাতা, পিতা, সখা, প্রেয়সী ও পারিষদ্‌বর্গে বেষ্টিত হইয়া মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিয়তই মধুর লীলা করিতেছেন। পৃথিবীতে শত বর্ষের জন্য নরাকারে অবতরণ নিত্যলীলার ছায়াবলম্বনে মাত্র।

'ব্রজধামের নিম্নে বিষ্ণুলোক বা ঐশ্বর্য্যধাম। এখানে কৃষ্ণ বিষ্ণুরূপে বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া লীলা করিতেছেন। তাঁহার আজ্ঞায় কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যে কত ব্রহ্মাণ্ড শাসন করিতেছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। বিষ্ণু-লোকের নিম্নে বিরজার এ পারে বাহ্যাবাস। তাহারও অগণ্য প্রকোষ্ঠ। ইহার নাম দেবীধাম বা মায়াধাম। অনন্ত জীব ইহার অধিবাসী, আর মায়া তাঁহার দাসী হইয়া সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে। একটী শাস্ত্রীয় ইতিহাস বলিয়া কৃষ্ণের অনন্ত লীলার কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া-দিতেছি। যাহা বলিব, তাহা তাঁহার এক পাদ বিভূতি সম্বন্ধে; অবশিষ্ট ত্রিপাদ বিভূতি বাক্য মনের অগোচর।

'এক দিন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য ঐশ্বর্য্যধাম দ্বারিকায় আসিয়া দ্বারপালের দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন। দ্বারী ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসিল 'আপনি কোন্ ব্রহ্মা'? ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়া উত্তর পাঠাইলেন তিনি সনকপিতা চতুর্ম্মুখ। দ্বারপাল ব্রহ্মাকে কৃষ্ণসমীপে লইয়া গেলে ব্রহ্মা ভগবানের পদবন্দনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা বলিলেন 'তাহা পরে বলিব; সংপ্রতি জিজ্ঞাসা করি আমাকে 'কোন্ ব্রহ্মা' বলিলে কেন? ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আর ব্রহ্মা আছে কি?' ভগবান্ এই কথায় মৌন হইয়া কিছু কালের জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। পরক্ষণেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেখিলেন দশ, বিশ, শত, সহস্র, অযুত, কোটি, মুখযুক্ত অগণ্য ব্রহ্মা আসিয়া ভগবচ্চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন 'আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনি স্মরণ করিয়াছেন; দাসেদের প্রতি কি কোন আজ্ঞা আছে?' শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া উত্তর করিলেন 'না, তোমাদের দেখিতে ইচ্ছা হওয়ায় স্মরণ করিয়াছি। তোমরা ভাল আছ ত? তোমাদের ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ত এখন দৈত্য ভয় নাই?' ব্রহ্মাগণ বলিলেন 'তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্র মঙ্গল।' তাঁহারা বিদায় হইয়া গেলে সনকপিতা বড় ফাঁফরে পড়িয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'সনাতন! ইহাতেই বুঝিতেছ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য কত ও দ্বারিকার বিভূতিমহিমাই বা কি?' বলিতে বলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধুর্য্যরসে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি অনুরাগভরে মাধুর্য্য বর্ণন করিতে লাগিলেন।

'সনাতন! কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতরসের সাগর। সান্নিপাতী রোগীর ন্যায় আমার মন পিপাসার্ত্ত হইয়া তাহা শুষিয়া পান করিতে চায়। কিন্তু দুর্দ্দৈববৈদ্য চিকিৎসা করিতেছে কিনা; তাই এক বিন্দুও পান করিতে দিলে না। শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা আছে, তাহার মধ্যে নরলীলাই সর্ব্বোত্তম। নরবপু, গোপবেশ, নবকিশোর বয়স, ললিত ত্রিভঙ্গ, বংশীধারী, শিখিপিচ্ছচূড়াধারী, লাবণ্যামৃতসার, সুগোলদেহ, মদনমোহন রূপ, এই লীলার কেমন উপযোগী! বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী চিচ্ছক্তি যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়া ভগবান্ ভক্তদিগের মনের মতন করিয়া এইরূপ নিত্যলীলা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যের কথা দূরে থাক্, এ রূপ দেখিয়া ভগবান্ স্বয়ংই মুগ্ধ হইয়া আস্বাদান করিতে সতৃষ্ণ। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এরূপে আকৃষ্ট হইবে না কেন?

বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবনে সখাসঙ্গে গোচারণ, গোপীমনোরথে চড়িয়া বিবিধ-কামক্রীড়া, এবং পিতামাতার মধুর স্নেহে বাৎসল্যলীলা, মনে করিলে কা'র না হৃদয় উথলিয়া উঠে? ধন্য গোপীগণ! যাঁহারা নেত্রভরিয়া এই রূপ-রস নিরন্তর পান করিয়াছেন। এ মাধুরীর কি সমান আছে? পরব্যোম-বাসী দেবগণ ও লক্ষ্মীগণের এ মাধুর্য্য লাভ অসম্ভব। কর্ম্ম যোগ তপস্যা জ্ঞান জপ ধ্যানের ত কথাই নাই। বৈধীভক্তিতেও এ মাধুর্য্য পাওয়া যায় না। কেবল এক রাগময়ী ভক্তিতে ব্রজাশ্রিতজনের ভাগ্যে ইহা সুলভ। গোপীর ভাবরূপ দর্পণে কৃষ্ণের এই মাধুর্য্য মূর্ত্তি পড়িলে উভয়ই নিরন্তর বাড়িতে থাকে, কেহ কাহাকেও হারাইতে পারে না। গোপীভাবে অনু-ভাবিত না হইলে হৃদয়দর্পণে এ রূপ প্রতিবিম্বিত হয় না।

'সনাতন! দেখ, দেখ, কৃষ্ণাঙ্গে চাঁদের হাট বসিয়াছে। মণিরত্ন হইতে সুচিক্কণ দুই গণ্ড, দুই চন্দ্র ঝলমল করিতেছে; সুন্দর ললাটে চন্দনবিন্দু অষ্টমীর ইন্দু; করনখের চাঁদগুলি বাঁশীর উপর খেলিতেছে; আর পদনখের চাঁদগুলি নূপুরের নিচে নাচিতেছে; শ্রবণযুগলে যুগল চাঁদ মকর কুণ্ডলের সঙ্গে দুলিয়া বেড়াইতেছে; অধরচাঁদ স্মিত জ্যোৎস্নামৃত বিলাইয়া দিতেছে; এবং বিপুল আয়ত নয়নচন্দ্র দুইটী দৃষ্টিজ্যোৎস্নায় মদনের মাথা ঘুরাইয়া দিতেছে। আহা! লাবণ্যজলে সুখময় গোবিন্দবদন কেমন ভাসিতেছে! এ মুখ যে দেখিল না, তাহার ত বৃথা জন্ম। কোটি জন্মের পুণ্যফলে এ মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। হায়! বিধির কি অবিচার দেখ দেখি? যে কৃষ্ণানন দেখিবে, তাহাকে কি দুইটী চক্ষু দিতে হয়? দুই চখে কত টুকুই বা দেখা যায়। যদি কোটি চক্ষু পাইতাম, তবে জানিতাম এক প্রকার দর্শন হইল বটে।'

বলিতে বলিতে শ্রীচৈতন্য আত্মহারা হইয়া মাধুর্য্যসাগরে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার নিকট তখন সকলই মধুময় হইয়া গেল। তিনি ভ্রান্ত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন 'সনাতন! কৃষ্ণমুখ সুধাকর কি মধুর! তাহার লাবণ্য আবার মধুর হইতে সুমধুর। তাহার স্মিতজ্যোৎস্না সুমধুর হইতে সুমধুর, আবার তাহা হইতে সুমধুর! আর বংশীর ছিদ্রমধ্যে যখন অধরামৃত ও স্মিত কর্পূর শব্দামৃতের সঙ্গে প্রবেশ করে, এবং ধ্বনিরূপে পরিণত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠে ধাবিত হয়, বল দেখি তাহাতে কে মাতোয়ারা না হইয়া থাকিতে পারে? যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রের যোগ তপস্যা ভাঙ্গিয়া যায়, পতিব্রতা সতীর পাতিব্রত্য নষ্ট হইয়া

'যায়, লক্ষ্মীদিগকে বলে আকর্ষণ করে; তা' সরলা গোপীবালাদিগের দোষ কি? তাঁহাদের গৃহধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হইবে না কেন? তাঁহারা অভিসারিণী হইয়া কৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করিবেন না কেন?' বলিতে বলিতে চৈতন্যদেব নীরবে সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

জীবতত্ত্ব ও সম্বন্ধবিচার।

ক্ষণকাল পরে স্থৈর্য্যলাভ করিয়া চৈতন্য বলিলেন 'এক্ষণে জীবতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যেমন অখণ্ডচিৎ বা প্রভু চৈতন্য; জীব তেমনি তাঁহার অংশাংশ ক্ষুদ্র বা অনুচৈতন্য। একটী আশ্রয়, অপরটী আশ্রিত। সত্ত্বাগত উভয়ে এক হইলেও জীবের প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-দাস। অর্থাৎ তিনি মহান্ প্রভু; মায়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না; তিনি মায়ার অধীশ। আর জীব মায়ার দাস ও মায়াভিভূত। সর্ব্বদাই সে আপন দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছে। যতক্ষণ সে মায়াভিভূত, ততক্ষণ কৃষ্ণ যে তাহার প্রভু ও আশ্রয়, তাহা বুঝিতে পারে না, বা ভুলিয়া যায়। মায়া ছাড়িতে পারিলেই সে স্বীয় স্বরূপ ও সম্বন্ধ বুঝিতে পারে।'

সনাতন জিজ্ঞাসিলেন 'এই মায়া বস্তুটা কি? মায়ার প্রবর্ত্তক কে? ও জীব মায়াভিভূতই বা হয় কেন?'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'শাস্ত্রকারেরা মায়ার অনেক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও করিতে গিয়া মায়া সম্বন্ধে এতই মতভেদ ও গোলোযোগ করিয়াছেন যে, সহসা তাহা হইতে তত্ত্বনির্ব্বাচন করা বড় কঠিন ব্যাপার। মায়ার সাধারণ অর্থ ভ্রান্তিজ্ঞান। যাহা যা' নয়, তাহাকে তাই জ্ঞান করা। যেমন শরীরে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইয়া ঈশ্বর হইতে আমি স্বতন্ত্র, এই জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। এই ভ্রম জ্ঞানের প্রবর্ত্তক কে? ঈশ্বর? না—তা' বলিতে পারি না। যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, পরম কারুণিক, তিনি কেন ইচ্ছা করিয়া মানুষকে ভ্রমে ফেলাইবেন? তবে কথা এই, পূর্ণপুরুষ পূর্ণ শক্তিতে বিশ্ব সৃজন করেন নাই। এই লীলাকে এইরূপ করিবার জন্য যতটুকু শক্তিই বল, আর ইচ্ছাই বল, প্রয়োজন হইয়াছিল, বিনিয়োগ করিয়াছেন মাত্র এবং মানুষকে স্বাধীনভাবে শ্রেয়োমার্গে চলিবার জন্য উপদেষ্টা, শাস্ত্র ও

বিবেক দিয়াছেন। মানুষ যদি জানিয়া শুনিয়া গুরূপদেশ, শাস্ত্রবাক্য ও আত্মা বা বিবেকের কথা না শুনিয়া মোহের পথে যাইতে চায়, সে কাহার দোষ? মানুষের দোষ নয় কি? তবেই দেখ, মায়ার প্রবর্ত্তক মানুষ নিজেই কি না?'

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন 'পূর্ণ পুরুষ অপূর্ণ শক্তিতে সৃষ্টিলীলা না করিলে ত মায়ার উৎপত্তি সম্ভবিত না। এক হিসাবে তাঁহাকেই ত মায়ার প্রবর্ত্তক বলিতে হয়।' শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'তা, বটে; সৃষ্টিলীলাই ত মায়া বা অপূর্ণ শক্তির কার্য্য। কিন্তু সনাতন! দেখ, কৃষ্ণ তথাপি কেমন দয়াময়! জীব তাঁহাকে চিরদিন ভুলিয়া না থাকে, এ জন্য বেদপুরাণাদি অশেষ শাস্ত্র, শুক নারদ প্রভৃতি অগণ্য উপদেষ্টা দিয়াছেন ও সর্ব্বোপরি বিবেক শক্তিতে চৈত্ত্য গুরুরূপে স্বয়ং প্রতিনিয়ত প্রকাশমান থাকিয়া আমাদিগকে শ্রেয়ের পথে লইয়া যাইতেছেন।

'মনে কর কোন পিতা অনেক ধন ঘরে পুঁতিয়া রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। পুত্র তাহা জানিতে না পারিয়া খুব দারিদ্রে পড়িল। এমন সময়ে সর্ব্বজ্ঞ গণক আসিয়া তাহাকে বলিল যে, তাহার ঘরে পিতৃত্যক্ত অনেক ধন আছে। সে ব্যক্তি তখন সমস্ত ঘর খুঁড়িয়া ধনের উদ্দেশ করিতে লাগিল; কিন্তু তথাপি পাইল না। তখন সেই দয়ালু দৈবজ্ঞ বলিলেন, 'দক্ষিণ দিকে খুঁড়িও না, ভীমরুল বোল্‌তা আছে, দংশন করিবে; পশ্চিমে যক্ষ আছে; এবং উত্তরে কৃষ্ণ অজাগর আছে। পূর্ব্বদিকে অল্প মাটী তুলিলেই ধন পাইবে।' সেইরূপ সাধুগুরু ও শাস্ত্রের কৃপায় মানুষ জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগমার্গ ছাড়িয়া ভক্তি পথে গেলেই মায়া ছাড়িয়া অমূল্য প্রেমধন পাইয়া থাকে। যেমন ধন লাভের ফল সুখ ভোগ, তেমনি প্রেমলাভের ফল কৃষ্ণসম্ভোগ। মায়াত্যাগ প্রেমের সাক্ষাৎ ফল না হইলেও কৃষ্ণসম্ভোগ সুখোদয়ে মায়া আপনি ছাড়িয়া যায়। অপূর্ণ শক্তির আধার জীবকে মায়ার দাস করিয়াও ভগবান্ তাহাকে উহা হইতে উত্তীর্ণ করিবার জন্য দয়া করিয়া কেমন উপায় সকল করিয়া দিয়াছেন! জীব অনুচৈতন্য ও কৃষ্ণদাস; সে যখন তাহার প্রভু চৈতন্যকে জানিতে পারে, তখনই তাহার সম্বন্ধ তত্ত্বের অভিজ্ঞতা জন্মে।

'মোটের উপর শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বিষয়ে কথা এই দাঁড়াইতেছে যে, এক ভগবৎসত্ত্বা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই সত্ত্বা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব। যে অবস্থায় তিনি মায়াতীত স্বরূপ শক্তিতে অবস্থিতি করেন, সেই অবস্থায় তিনি

পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। যখন স্বাংশ শক্তিতে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহার নাম, প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণাদি বৃহতত্ত্ব ও নানা অবতারগণ। ইহারা মায়াতীত হইয়াও স্বরূপ শক্তির ন্যূনতা হেতু অপূর্ণ। আর যখন এই তত্ত্ব বিভিন্নাংশ শক্তিতে অবস্থিতি করেন, তখনই তিনি জীব। এই জীব দুই প্রকার। নিত্যমুক্ত। তাঁহারা কৃষ্ণের লীলার সহায় ও পারিষদ্। দ্বিতীয় বদ্ধজীব, মায়ার দাস। কৃষ্ণের কৃপায়, সাধু ও শাস্ত্রের প্রসাদে ও চৈত্ত্যগুরু বিবেকের উপদেশে ইহারা মায়ামুক্ত হইয়া ভক্তিলাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম পাইবার অধিকারী।

এখন বলি, মায়াও দুই প্রকার। পূর্ণ পুরুষ পূর্ণশক্তি সঙ্কোচ করিয়া স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে লীলা প্রকাশ করায় যে অপূর্ণ জ্ঞান জন্মে, তাহাকেও এক প্রকার মায়া বলা যাইতে পারে। এ মায়া জীবের সত্ত্বাগত। ইহাতে জীব, ঈশ্বর হইতে অভিন্ন জানিয়াও আপনার ক্ষুদ্রত্ব ও সেবকত্ব অনুভব করে। ইহা জীবপ্রকৃতি হইতে অপনীত হইবার নহে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মায়া জীবের স্বকর্ম্মার্জ্জিত। ইহাকে মোহ বা ভ্রমজ্ঞান বলা যাইতে পারে। ইহা শাস্ত্র, গুরু, ও ভগবানের কৃপায় অপনীত হইলে জীব কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইয়া থাকে।"

অভিধেয় তত্ত্ব।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'তত্ত্ববস্তু নির্ণীত হইলে এবং জীবতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মিলে, সম্বন্ধতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে উপায়ের দ্বারা এই সম্বন্ধের অনুশীলন হইয়া জীব আপনার অভীপ্সিত প্রাপ্য কি, জানিতে পারে, তাহার নাম অভিধেয়। সোজা কথায় শ্রীকৃষ্ণ ভজনের মুখ্য উপায়কেই অভিধেয় বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনা যে জীবের গত্যন্তর নাই, তাহা জননী রূপা কি শ্রুতিগণ, ভগিনীরূপা কি স্মৃতি সকল, আর ভ্রাতৃ স্বরূপ কি পুরাণাদি, একবাক্যে বলিয়া দিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ নানাপ্রকার উপায়কে ভজনের মুখ্যপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বর্ণাশ্রমাচরণে, কেহ কর্ম্মযোগকে, কেহ জ্ঞানপথকে, কেহ নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভকে, এবং কেহ বা ভক্তিমার্গকে প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে সুচতুর সাধক কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ পথ, বিচার করিয়া লইবেন। পরন্তু শ্রদ্ধা না জন্মিলে ভজনারম্ভ হইতে পারে না।

যাঁহার যেমন অধিকার বা শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহার সাধনপথও তদনুসারে উন্মুক্ত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা বা অধিকার ত্রিবিধ; উত্তম, মধ্যম, এবং অধম। যিনি শাস্ত্র যুক্তির সহিত স্বীয় বিশ্বাস মিলাইয়া অভিলষিত বস্তুতে সুদৃঢ় বিশ্বাসী, তিনি উত্তম অধিকারী। যিনি শাস্ত্র যুক্তি জানেন না, অথচ দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্, তিনি মধ্যম অধিকারী। আর যাঁহার কোমল শ্রদ্ধা, তিনি নিকৃষ্ট অধিকারী। সমস্ত অধিকারীগণের একই উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণভজন না করিয়া যিনি যে উপায়ই অবলম্বন করুন না কেন; তাহাতে কোন ফল হইতে পারে না। আর ভগবদুপাসক কোন বিশেষ পথ অবলম্বন না করিলেও পূর্ণ মনোরথ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? সে যাহা হউক, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি? একবার বিবেচনা করা যাউক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র, চারি বর্ণের ও ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ও ভিক্ষুক, এই চতুরাশ্রমের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের নাম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। বর্ণাশ্রমীগণ ভগবান্‌কে না ভজিয়া যুগযুগান্ত নির্দ্ধারিত নিয়ম প্রতিপালন করিলেও মায়ামোহের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মযোগ। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমের কর্ম্মানুষ্ঠান ও যত কিছু সাধুকর্ম্ম, এ সকলকেই কর্ম্মসংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। কর্ম্ম থাকিলেই তাহার কর্ত্তা থাকিবে; এবং কর্ত্তৃত্ববোধের সঙ্গে সঙ্গে অহং জ্ঞান থাকা অনিবার্য্য। 'এই সমুদায় সাধুকর্ম্ম আমি করিতেছি,' এবম্প্রকার অহংকারজনিত কর্ম্মকে কখনই ভগবল্লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলা যাইতে পারে না। তাহাতে লাভই বা কি? লাভের মধ্যে পুণ্যের বাসনা লইয়া কর্ম্ম করায় পুণ্যসঞ্চয় হইয়া স্বর্গসুখাদি ভোগ হইতে পারে; এবং ভোগান্তে আবার যোনিভ্রমণ করিতে হয়। তাহার পর জ্ঞান। বেদবেদান্তাদি ভূরি ভূরি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যাহারা মনে করে, 'আমরা জ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত', তাহাদের সকল শ্রম, তণ্ডুল লাভার্থে তুষাবঘাতীদের ন্যায় কি বৃথা হয় না? অহংকার যুক্ত শুষ্ক জ্ঞানে কি বাক্য মনের অতীত, সকল জ্ঞানের অতীত বস্তুকে ধরিতে পারা যায়? মানবীয় জ্ঞানের সীমাই বা কতটুকু? তদ্দ্বারা কে অসীম অনন্ত জ্ঞান তত্ত্ব আয়ত্ব হইতে পারেন? সসীম অসীমকে জানিবে কি প্রকারে? আর অসীম যিনি, তিনিই বা সসীম ক্ষুদ্র মানুষের ভ্রান্তি-জ্ঞানলব্ধ তত্ত্বকে বিচার করিবেন কিরূপে? তাহার পর নির্ব্বিকল্প সমাধি। 'সোঽহং' || আমিই ব্রহ্ম, এই সাধনা কি বিড়ম্বনার জন্য নয়? জীবপ্রকৃতি কি কখন ঈশ্বরপ্রকৃতি লাভ করিতে পারে? অথচ নির্ব্বিকল্প সমাধির লক্ষ্যই

'সোঽহং জ্ঞানলাভ। কিন্তু এই সকল সাধন যখন সুকোমল ভাবমুকুল ফুটাইয়া দিবার সাহায্য করে, তখনই তাহাদের সার্থকতা। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যখন ভগবদ্ভজনের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া সুকোমল শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেয়; কর্ম্মযোগ যখন কর্ম্মভোগের জন্য না হইয়া ভগবৎসেবার সাহায্য করে; নিজের ভোগ সুখের, বা স্বর্গ ভোগের বাঞ্ছা ছাড়িয়া ঈশ্বরপ্রীতি বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়; ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া যখন সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাতে অর্পিত হয়; নিরঞ্জন ব্রহ্মজ্ঞান যখন ভগবদ্ভক্তি উদ্দীপনার সাহায্য করে; নির্ম্মল তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহার নিরুপাধি সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দিয়া হৃদয়ের ভাব-কলিকা সকল ফুটাইয়া দেয়; যোগ যখন 'সোঽহং' উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হইয়া সেই আত্মারামের নির্ম্মলজ্যোতি আত্মায় বিকীর্ণ করাইয়া ভক্তি উন্মীলনের সাহায্য করে; তখনই তাহারা সার্থক। তখন ত জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, এরূপ নাম ভেদ থাকে না, সবই যে ভক্তিময় হইয়া যায়।

'আর ইহাও বলি যে, আত্মারাম মুনি সকলও ভগবানে ভক্তি করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। তবেই দেখ, বিশুদ্ধ ভক্তি ভিন্ন আর অন্য পথ নাই। ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী, বা অন্যকামীগণও গাঢ় ভক্তি-যোগে যদি একবার 'হে প্রভো! আমি তোমারই' বলিয়া শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার চরণলাভে সমর্থ হয়। ধ্রুব স্থানাভিলাষী হইয়া তপস্যা করিয়াও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ভক্তিলাভ সহজে হয় না। ভগবানের কৃপায় বহুকালে লাভ হইয়া থাকে। তখন স্বয়ং প্রভু অন্তরে অন্তর্যামীরূপে ও বাহিরে আচার্য্যরূপে তাহাকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তখন সাধকের সাধুসঙ্গ করিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। সনাতন! সাধুসঙ্গের গুণ আর কত বলিব? সাধুসঙ্গ লাভে সর্ব্বানর্থ নষ্ট হইয়া সিদ্ধিলাভ হয়।'

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাধু কি প্রকারে চেনা যায়?'

শ্রীচৈতন্য। সাধুতে এই সকল গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যকেই সার করিয়াছেন, সর্ব্বত্র সমদর্শন, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারী, শান্ত, অকাম, নিরীহ, স্থির, রিপুজয়ী, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী; এবং সর্ব্ব-প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশ্রয় করিয়াছেন। এমন সাধুসঙ্গ পাইলে ত হয়!'।

সনাতন জিজ্ঞাসিলেন 'কাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত?'

শ্রীচৈতন্য। অশান্ত, মূঢ়, দেহে আত্মাভিমানীগণের ও অভক্ত জনের, স্ত্রীসঙ্গে অনুরক্ত জনের এবং যাহারা ঐরূপ লোকের সঙ্গ করে, তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করা উচিত। অগ্নিদাহমধ্যে লৌহপিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল, তথাচ এরূপ লোকদিগের সহিত একত্র বাস করা উচিত নয়। তবেই দেখ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ না লইলে ভক্তিলাভের উপায় নাই। অকিঞ্চন শরণাগত হইতে হইবে; তাহা যেন মনে থাকে।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন 'শরণাগত ব্যক্তির লক্ষণ কি?'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'ভগবৎসেবার অনুকূল বিষয়ে সংকল্প, প্রতিকূল পরিত্যাগ, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তিনি রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস, তাঁহার রক্ষিতৃত্বে আত্মসমর্পণ, তাঁহার কার্য্যে আত্ম-বিসর্জ্জন ও তাঁহাতে নিষ্ঠামতি, এই ছয়টী শরণাগতের লক্ষণ। শুন সনাতন! এইরূপে সাধুসঙ্গ ও শরণাগতি লাভ হইলে সাধন ভক্তির আরম্ভ হইয়া থাকে। স্বভাবজ স্বতঃসিদ্ধ কতকগুলি ভাব মানবান্তরে নিহিত আছে, সেই গুলিকে উদ্দীপন করার নামই সাধন। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যদ্দ্বারা এই সকল ভাব সাধন করিতে পারা যায়, তাহারই নাম সাধন ভক্তি। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি তাহার ক্রিয়া। প্রেম তাহার ফল। মনে ভাবিও না যে, কৃষ্ণপ্রেম সাধনার যোগ্য। সাধন করিয়া কেহ সে প্রেম পাইতে পারে না। উহা নিত্যসিদ্ধ হইয়া মানবান্তরে রহিয়াছে। চিত্ত পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইলে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যোগে তাহা উদয় হয় মাত্র। দর্পণের ময়লা নিষ্ক্রান্ত হইলে উহাতে প্রতিবিম্ব যেমন আপনা হইতেই দেখা যায়, সেইমত। এই সাধন ভক্তি দুই প্রকার; এক বৈধীভক্তি, অপর রাগানুগা। অনুরাগবিহীন ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রাজ্ঞায় যে সাধন করেন, তাহারই নাম বৈধী ভক্তি। গুরুপদাশ্রয় প্রভৃতি ইহার চৌষট্টিটী অঙ্গ আছে। তাহার মধ্যে স্বধর্ম্মী ও আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুগণের সঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস, * এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনা, এই পাঁচটী প্রধান। এই সকল সাধনাঙ্গের মধ্যে কেহ এক, কেহ বা বহু অঙ্গ সাধন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। যেমন ভগবানের গুণলীলা শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে ব্যাসনন্দন শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদ সেবায়

* ভাবনাদ্বারা ভগবান্‌কে সমীপস্থ জ্ঞান করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনে মগ্ন হওয়ার নাম মথুরাবাস।

'লক্ষ্মী, পূজায় পৃথু রাজা, অভিবন্দনে অক্রূর, দাস্যে পবন তনয়, সখ্যে অর্জ্জুন, এবং আত্ম-নিবেদনে বলি রাজা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আর অম্বরী-ষাদি বহু অঙ্গ সাধন করিয়াছিলেন। কামনা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রাজ্ঞায় ভক্তিসাধন করিলে সাধক কখন পাপাচরণ করিতে পারেন না; প্রমাদ বশতঃ করিলেও অন্তর্যামী হরি তাঁহার অন্তরে থাকিয়া সংশোধন করিয়া দেন। এক্ষণে রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তির সাধন বলি, শ্রবণ কর। অভিলষিত বস্তুতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনপেক্ষিত স্বাভাবিক প্রেমময়ী প্রগাঢ় তৃষ্ণার নাম রাগ বা অনুরাগ। রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা, ও আবেশ বা লোভই, ইহার প্রাণ। কেবল ব্রজবাসী জনেই উহা সুস্পষ্ট বিরাজমানা। বৃন্দাবন লীলায় ইহার প্রকাশ; ললিতাদি সখীগণই ইহার অধিকারিণী ও শ্রীমতী রাধিকাই ইহার একমাত্র সম্ভোগত্রী। যে সব সাধক ব্রজবাসী জনের অনুগত হইয়া রাগাত্মিকার অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভক্তিকে রাগানুগা বলা যায়। তাঁহারা শাস্ত্র, যুক্তি, কিছুই মানেন না। রাগানুগা ভক্তির অনুসরণকারী সাধকের সাধন দুই প্রকার; বাহ্য ও অন্তর। বাহিরে সাধকদেহেতে বৈধী ভক্তি সাধনের ন্যায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি অঙ্গ আচরণ করা এবং অন্তরে ব্রজভাবের কোন একটী সখী, সখা, বা পিতামাতাকে, নিজ আদর্শ স্থানে রাখিয়া ও সেই আদর্শ ব্যক্তির সিদ্ধ-দেহ পাইয়াছেন, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, সেই ভাবে কৃষ্ণ সেবা করা। ইহা কিন্তু অন্যের অগোচরে খুব গোপনে করিতে হইবে। এই সাধনে ভক্ত ভগবান্‌কে পতি, পুত্র, সুহৃদ্‌, মনে করিয়া সেবা করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে এই অভিধেয় তত্ত্ব বলিলাম।'

প্রয়োজনতত্ত্ব।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ, চারিটী পুরুষার্থ বা অভীপ্সিত বস্তু শাস্ত্রে নিরূপিত থাকিলেও জীবের যথার্থ প্রয়োজন প্রেমে। উহাই তাহার লক্ষ্য, উহাই তাহার প্রাপ্য এবং উহাই তাহার নিয়তি। দৃঢ় অধ্যবসায় ও ব্যাকুলতার সঙ্গে ভক্তিসাধন করিতে পারিলে কালে উহা লাভ হইতে পারে। ভক্তিসাধনের প্রথম সোপান হইতে ক্রমে ক্রমে যেরূপে প্রেমলাভ হইতে পারে, তাহা বলিতেছি শুন।

'ভগবানের কৃপায় যখন জীবের সৌভাগ্য উদয় হয়, তখনই তাঁহাতে

তাহার একটু শ্রদ্ধা জন্মে। বিশ্বাস ও পবিত্র ভাবে ভগবচ্চরিত্র শুনিবার বা জানিবার যে ইচ্ছা, তাহার নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ লাভের বাসনা জন্মে। তখন জীব সাধুসঙ্গে থাকিয়া তাঁহার গুণলীলা শুনিতে ভালবাসে। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে ও তাঁহার গুণ লীলা শুনিতে শুনিতে আপনা হইতেই সাধনের দিকে মন যায়। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দনা, প্রভৃতি সাধনাঙ্গের অনুশীলন আরম্ভ হয়। সাধনের এমনই স্বভাব যে অনুশীলন করিতে করিতে নিজের পাপের দিকে দৃষ্টি পড়ে। কেন, তা' জান? তাঁহার গুণ চরিত্র শুনিতে শুনিতে, বলিতে বলিতে, ভাবিতে ভাবিতে, একটা জীবন্ত পবিত্র আদর্শ অন্তশ্চক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সেই আদর্শ-দর্পণে নিজের চরিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহার মলিনতা, পাপ, আবর্জ্জনা, চখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়। ক্রমে অভ্যস্ত পাপ ছাড়িতে মন হয়, রিপুসংযমে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হয়, শম, দম, তিতিক্ষা, শিক্ষা হয়; সংসারাসক্তির বন্ধন শিথিল হয় এবং সকল প্রকার অনর্থ দূরীভূত হইয়া যায়। এই অবস্থায় আসিলে, সাধকের মনে নিষ্ঠা জন্মে। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ও পবিত্রতা সহকারে সাধনপথে অবিচলিত থাকার নাম নিষ্ঠা। এতদিন ভাসা ভাসা, আল্‌গা আল্‌গা ভাব ছিল, এখন আর তাহা থাকে না। নিষ্ঠার পর যে ভাব সোপানে উঠিতে হয়, তাহার নাম রুচি। এতদিন যাহা রোগীর তিক্ত ঔষধ সেবনের ন্যায় কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে অনুষ্ঠিত হইত, সেই শ্রবণাদি এখন সুখময় হইয়া দাঁড়ায়। সাধন এখন প্রীতিকর ও সুখকর হইয়া জীবনের অন্নপান হইয়া যায়। তাহার পর আসক্তি জন্মে। নেশাখোরের নেশা খাওয়ার মত শ্রবণ কীর্ত্তন না হইলে আর প্রাণ বাঁচে না। আসক্তি যখন প্রগল্‌ভা আকার ধারণ করে; অর্থাৎ যখন এমন অবস্থা হয়, যে অবস্থায় ভগবৎ কথা ভিন্ন অন্য কথা বলিতে কি শুনিতে ভাল লাগে না, তাঁহার কাজ ভিন্ন অন্য কাজে মন বসে না, চক্ষু অন্য রূপ দেখিতে চায় না, মন অন্য চিন্তা করিতে ভালবাসে না; কেবলই তাঁহার কথা কহিতে, শুনিতে, তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, যেখানে তাঁহার কথা হয়, সেখানে থাকিতেই মন চায়; যে তাঁহার কথা বলে, তাঁহাকেই ভাল লাগে; তখন হৃদয় মধ্যে নানা সুকোমল ভাব কুসুম ফুটিয়া উঠে। জোয়ারের জলে যেমন পূর্ব্বের পঙ্কিল মাটি ধুইয়া গিয়া নবশক্তিশালিনী উর্ব্বরা পলি মাটী পড়িয়া থাকে; তেমনি সুভাবের তরঙ্গে কুভাব সব চলিয়া যায়; হৃদয় বিশুদ্ধ-

ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাকে পণ্ডিতেরা ভাবোৎপত্তি, রত্যঙ্কুর, বা, প্রীত্যঙ্কুর, বলিয়া থাকেন। যে ভাষাই দেওনা কেন, বস্তু এইরূপ।

'পলিমাটীর পর পলি পড়িয়া যেমন পুরু হয়; আর পূর্ব্বের পচা মাটী থাকে না; কুসুম সুঘ্রাণের লেপের পর প্রলেপ দিলে যেমন ঘন হয়, তেমনি যখন হৃদয়ে ভাবের পর ভাব, তাহার উপর ভাব পড়িয়া পড়িয়া জমাট হইয়া যায়, তখনই প্রেমোৎপত্তি হইয়া থাকে। ভাব বা রতি এবং প্রেম, কাছাকাছি হইলেও উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। উভয়ের প্রকৃতি এবং বিকাশ দুই বিভিন্ন।'

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিরূপ প্রভেদ? ভাঙ্গিয়া বলুন।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'যাঁহার হৃদয়ে ভাবাঙ্কুর জন্মিয়াছে, তাঁহাতে এই সব লক্ষণ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তিনি চির ক্ষমাশীল; মারিয়া ফেলিলেও নীরবে সহ্য করেন ও শত্রুকে ক্ষমা করেন। শারীরিক, মানসিক, কোন ক্ষোভেই তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না। যেমন রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষক-দংশনে নিকটে মৃত্যু জানিয়াও ভীত ও ক্ষুব্ধ না হইয়া অমাত্যবর্গকে হরি-গাথা গান করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া ভগবন্নামগানে ও ভগবৎ সেবায় নিরন্তর রত থাকেন। দিবানিশি বাক্যের দ্বারা স্তব করিয়া, মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া এবং শরীর দ্বারা সেবা করিয়াও পরিতৃপ্ত হন্ না, এবং অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়াও কিছু করা হইল না, মনে করেন। তাঁহার বিষয় বাসনা ও ভোগ-কামনা থাকে না। তাহার সাক্ষী মহারাজ ভরত, যখন ভোগ লালসা অত্যন্ত বলবতী হয়, সেই যৌবন কালেই অন্যের অভিলষণীয় ও দুস্ত্যজ স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, রাজ্য, ভগবানের জন্য অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি মহাবিনয়ী ও নিরভিমানী হন্। মহারাজ ভরত শত্রুদিগের গৃহে ভিক্ষা যাজ্ঞা করিতে ও অতি অন্ত্যজদিগকেও দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে অপমান বোধ করেন নাই। তাঁহার প্রাণে কখন নিরাশা আসে না, অপিচ ভগবান্‌কে নিশ্চয়ই পাইবেন, এই আশা সুদৃঢ় বদ্ধমূল হয়। ভগবানের মিলনাশায় তাঁহার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে। প্রেমিক ভক্ত বিল্বমঙ্গল তাহার সাক্ষী। তিনি মিলনাশায় কি না করিয়াছিলেন? মিলনের বিঘ্ন-কারী চক্ষুরত্নও উৎপাটিত করিতে একটুও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার নাম-গুণগানে রুচি ও অত্যন্ত আসক্তি জন্মে এবং কৃষ্ণলীলার স্থানে বসতি

করিতে অত্যন্ত আগ্রহ হয়। বালিকা রাধা সুমধুর স্বরসংযোগে যখন কৃষ্ণনামাবলি কীর্ত্তন করিয়া নীলোৎপল সদৃশ নয়ন দিয়া মুক্তাবলির ন্যায় অশ্রুবিন্দু ফেলিতেন, তাহা দেখিলে কাহার প্রাণ না বিদীর্ণ হইত? বিল্বমঙ্গল ঠাকুর 'হে প্রভো! তোমার সকলই মধুর; তুমি মধুর হইতেও মধুর, বড়ই মধুর' বলিয়া যে কাঁদিতেন, তাহাতেই নামাসক্তির প্রভাব বুঝা যাইতে পারে। ভাবাঙ্কুর বিকাশের চিহ্ন এই সব। এখন প্রেম বিকাশের কথা বলি শুন।'

সনাতন 'বলুন্' বলিলে শ্রীচৈতন্য বলিতে লাগিলেন 'যাঁহার হৃদয়ে নবপ্রেমা উন্মীলিত হইয়াছে, তাঁহার বাক্য, চেষ্টা, ভাব, ভজন, সকলই লোক বুদ্ধির অতীত। তিনি কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন গান করেন, কত কি বলেন, নৃত্য করেন, মৌনী হইয়া থাকেন, আবার কখন অত্যন্ত চীৎকার করেন। লোকে কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বাতিক-গ্রস্ত মনে করে। প্রেম যেমন সুকোমল, নির্ম্মল, ও স্নিগ্ধ; তেমনি মহা-মাদক, উগ্র এবং উত্তপ্ত। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই তাহার এক বিন্দু পান করিয়া থাকেন।'

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রেমের ও রতির কি বৃদ্ধি নাই? যদি থাকে, তবে তাহারা বাড়িয়া যে যে ভাব-বৈচিত্র্য প্রকাশ করে, তাহা বর্ণন করুন।'

শ্রীচৈতন্য। মূল ইক্ষুরস নির্ম্মল হইতে হইতে যেমন গুড়, খণ্ড, শর্করা, মিছরি, বিশুদ্ধ মিছরি, রূপে পরিণত হইয়া আস্বাদনের উৎকর্ষতা লাভ করে, তেমনি প্রেম বৃদ্ধি পাইয়া ঘনীভূত হইয়া স্নেহ, প্রণয়, মান, রাগ, অনু-রাগ, ভাব, ও মহাভাবে, পর্য্যবসিত হইয়া প্রেমিকের হৃদয়ে বিভিন্ন আস্বাদ উদ্দীপিত করে। পূর্ব্বে যে রতির কথা বলিয়াছি, সাধনা ও অধিকারী ভেদে তাহা পাঁচ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর। এই পাঁচ রসের বিষয় পূর্ব্বে প্রয়াগে তোমার ভাই রূপকে বলিয়াছি; তাহা আর পুনরুল্লেখ করিব না। তবে সেই পাঁচ রসের স্থায়িভাবকে যে পাঁচটী রতি বলে, তাহাই এখন বিবেচ্য বিষয়। শান্তরসের শান্ত রতির বৃদ্ধির সীমা প্রেম পর্য্যন্ত; তাহা আর বাড়ে না। সনক সনাতন প্রভৃতি শান্ত রসের ভক্ত। তাঁহাদের রতি বাড়িয়া কৃষ্ণপ্রেম পর্য্যন্ত হইয়াছিল, তাহার উপর যায় নাই। দাস্য রতি বাড়িয়া রাগ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, আর উঠে না।

'কৃষ্ণসারথি দারুকাদির রতি প্রেমের উপর এক সোপান উঠিয়া রাগ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। তাইতে দেখিতে পাওয়া যায় সেবক প্রভুকে স্নেহ ও প্রণয় বা অবস্থা বিশেষে অভিমানও করিতে পারেন। সখ্য ও বাৎসল্য রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু একমাত্র মধুর রতিই কেবল ভাব মহাভাবে উঠিয়া চরম সীমা পাইতে পারে। অন্য রতিতে তাহা সম্ভবে না। এ রতিতে ভক্তের ভগবানের উপর স্নেহ, মান, প্রণয়, কোপ, সকলই হইতে পারে। শান্ত ও দাস্য রতির কেবল দুইটী মাত্র প্রকার ভেদ; যোগ ও বিয়োগ। কিন্তু সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরের অনন্ত বিভেদ ও অনন্ত বৈচিত্র। মধুর রতি মহাভাবে পরিণত হইলে প্রধানতঃ উহাতে দুইটী বিভেদ হয়, রূঢ় ও অধিরূঢ়। দ্বারিকালীলায় মহিষী-দিগের রূঢ় ও ব্রজলীলায় গোপীদিগের অধিরূঢ় মহাভাব। অধিরূঢ় মহাভাব দুই প্রকার। সম্ভোগাবস্থায় মদন ও বিরহাবস্থায় মোহন নামে খ্যাত। মদনে স্পর্শ চুম্বনাদি অনেক বৈচিত্র। কিন্তু মোহনে উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প, দুইটী মাত্র প্রকার ভেদ। ভ্রমরগীতার দশটী শ্লোকে শ্রীরাধার যে দশদশা বর্ণিত হইয়াছে; তাহা চিত্রজল্পার চিত্র। উদ্‌ঘূর্ণা ভাবে বিরহ চেষ্টায় যে প্রেম বৈচিত্র জন্মে, তাহার নাম দিব্যোন্মাদ। এই বিরহভাবে সাধক সর্ব্বত্র ভগবৎস্ফূর্ত্তি লাভ করেন। এমন কি আপনাকেও কৃষ্ণ বলিয়া মনে ভ্রান্তি হইয়া থাকে।

'শুন সনাতন! এই সব কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়িভাব। এ ভাব পাইলে ভক্তের সুখের সীমা থাকে না। কিন্তু এই সব ভাবে যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী, চারিটী সাময়িক ভাব মিলিত হয়, তাহা হইলে যে কি অপূর্ব্ব রস উৎপন্ন হয়, তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। দধিতে যেমন খণ্ড, কর্পূর, মরিচ, ও লবণ, মিশাইয়া রসালা নামে অমৃতরস প্রস্তুত হয়, তেমনি। বিভাব দুই প্রকার; আলম্বন ও উদ্দীপন। প্রেমের বিষয় ভগবদ্দর্শনাদি, আলম্বন ও বংশীস্বরাদি শ্রবণ, সাময়িক উদ্দীপন। প্রিয়তমের হাস্য ও নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণে অনুভাব উত্তেজিত হইয়া থাকে। অঙ্গ-স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকের মধ্যে পরিগণিত। ও নির্ব্বেদ হর্ষাদি, তেত্রিশটী সঞ্চারী ভাব ব্যভিচারী। এই সমস্তের আংশিক বা পূর্ণ মিলনে, কি মনোহর রসলীলাই উৎপন্ন হইয়া থাকে! কিন্তু সনাতন! রসের আলম্বন, নায়ক নায়িকা ও আশ্রয়, ভক্ত। আলম্বন ও আশ্রয় ভিন্ন রসলীলা হয় না। পুরুষ শ্রেষ্ঠ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নায়করত্ন এবং পরাপ্রকৃতি মহাভাবময়ী শ্রীরাধাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়িকা। তাঁহাদের লইয়াই প্রেমলীলা। অন্য নায়ক নায়িকাকে কল্পনা করিলেও মহাপাতক হয়। গুণাধার কৃষ্ণের অনন্ত গুণ; ও ভাবময়ী রাধার অনন্ত গুণ। জীবে যে সকল গুণের অতি সামান্যাংশ অপরিস্ফুট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবানে সেই সকল গুণ অনন্ত ও পূর্ণরূপে পরিস্ফুট। লীলাবিহারীর রসলীলা তাইতে এত মধুর! পূর্ব্বে রূপকে আমি এই সব তত্ত্ব শিখাইয়া ভক্তি প্রচার করিতে বলিয়াছি। তুমিও এই সব তত্ত্ব লিখিয়া রাখ, সময়ে বৃন্দাবনে বসিয়া প্রচার করিও। এই পর্য্যন্ত প্রয়োজন তত্ত্ব।'

সনাতন অতি দীনভাবে গৌরের চরণ ধরিয়া বলিলেন 'আমি অতিনীচ মূর্খ, কুবিষয় গর্ত্তে পড়িয়াছিলাম। তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দেবাদির দুর্ল্লভ কত তত্ত্বই শিখাইলে। কিন্তু তোমার কৃপা ভিন্ন ত এ সকল তত্ত্ব আমার স্ফুর্ত্তি পাইবে না। আমার মাথায় চরণ দিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন এ সব কথা আমি যথাযোগ্য বর্ণনা করিতে সমর্থ হই।'

শ্রীচৈতন্য সনাতনের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন 'শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এ সব তত্ত্ব তোমাতে স্ফুরিবে, স্ফুরিবে।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আত্মারাম শ্লোকার্থ।

গৌড়রাজসচিব শ্রীসনাতন শ্রীচৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'শুনিয়াছি পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট তুমি ভাগবতীয় 'আত্মরাম' শ্লোকের আঠার প্রকার অর্থ করিয়া শুনাইয়াছ। কৃপা করিয়া সেই সব ব্যাখ্যা আমাকে শুনাইলে কৃতার্থ হই।'

শ্রীচৈতন্যদেব উত্তর করিলেন 'আমি পাগল, ভট্টাচার্য্যের নিকট কি পাগলামি করিয়াছিলাম, মনে নাই। ভট্টাচার্য্য বুঝি সে সব কথা সত্য মনে করিয়া লইয়াছেন? আচ্ছা দেখি, তোমার সঙ্গবলে কিছু অর্থ স্ফুর্ত্তি হয় কি না। সহজে আমার মুখে কোন ব্যাখ্যা স্ফুর্ত্তি হয় না'; ভক্তের সঙ্গে ও শক্তিতে যাহা কিছু বলিতে পারি। শ্লোকটী এই।

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিথম্ভূতগুণো হরিঃ।'

'আত্মা' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি, ও স্বভাব। এই সকলে যাঁহারা রমণ অর্থাৎ সুখে অবস্থিতি করেন, তাঁহারাই আত্মারাম। 'মুনি' শব্দে মননশীল; যথা তপস্বী, ব্রতী, যতী ও ঋষি মুনি।

'নির্গ্রন্থাঃ' অর্থ যাঁহাদের অবিদ্যা বা মায়াজনিত গ্রন্থি নাই। শাস্ত্রাদি জ্ঞান বিহীন, মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ, ধনসঞ্চয়ী ও নির্দ্ধনকেও নির্গ্রন্থা বলা যাইতে পারে।

'উরুক্রম' বলিতে যাঁহার বৃহৎ ক্রম। 'ক্রম' শব্দে পাদবিক্ষেপ, শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি ও আক্রমণ। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যিনি বিভু-রূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, সকলকে ধারণ ও পোষণ করিতেছেন, মায়া-শক্তিতে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সকল সৃজন করিতেছেন ও মাধুর্য্যশক্তিতে পর-ব্যোমে ও গোলোকাদিতে লীলা করিতেছেন।

'কুর্ব্বন্তি' পদ পরস্মৈপদী, এই জন্ত যে উপাসনার ফল ভগবানে অর্পণ।

'অহৈতুকী' শব্দে বাঞ্ছান্তর রহিত। ভুক্তি অর্থাৎ অনন্ত ভোগ, অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি ও পঞ্চ প্রকার মুক্তির বাঞ্ছাশূন্য।

'ভক্তি' শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি। রতিভেদে প্রেমভক্তি আবার নয় প্রকার।

'ইত্থম্ভূতগুণঃ' শব্দের তাৎপর্য্যার্থ সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, রসস্বরূপ, পূর্ণানন্দময়। কৃষ্ণের সৎ, চিৎ, আনন্দ, রূপের গুণ অনন্ত। অনন্তগুণে বিশ্ব-চরাচর স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ সকলেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ।

'হরিঃ' শব্দের নানার্থের মধ্যে দুইটী প্রধান। প্রথম, যিনি অমঙ্গল হরণ করেন; দ্বিতীয়, যিনি প্রেম ও করুণা দানে প্রাণ মন হরণ করিয়া লয়েন। অমঙ্গল হরণ প্রথমাবস্থায়, প্রাণ মন চুরি করা শেষাবস্থায়। তাঁহাকে যে স্মরণ করে, প্রথমে তাঁহার তিনি সর্ব্ববিধ তাপ ও অবিদ্যান্ধকার নাশ করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনে রুচি দেন। তাহা হইতে ক্রমে প্রেম প্রকাশ করিয়া শেষে তাহার আত্মা প্রাণ মনাদি হরণ করিয়া একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলেন।

'অপি' ও 'চ' দুই অব্যয় পদ; যেখানে যে অর্থ খাটে, তাহা করিতে

হইবে। 'চ' শব্দ একতর প্রাধান্যে, সমূহার্থে, ইতরেতর যোগে, সংযোগার্থে, যত্নে, পাদপূরণে, ও অবধারণে, ব্যবহৃত হয়। আর 'অপি' শব্দ সম্ভাবনা, প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, ভয়, নিন্দা, সংযোগ, উহ্যার্থ ও যথেচ্ছ ক্রিয়া সম্পাদন অর্থে, প্রযুক্ত হয়। শ্লোকের একাদশ পদের এই বিভিন্নার্থ। এক্ষণে যাহার যে অর্থ যেখানে লাগে, তাহা দিয়া শ্লোকের যত প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে, বলিতেছি, শ্রবণ কর।' এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্য সহকারে শ্লোকের একষট্টি প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন করিলেন। তাহাতে তিনি দেখাইলেন যে, কি ব্রহ্মোপাসক, কি পরমাত্মার উপাসক ও কি ভগবানের ভক্ত, জ্ঞানপথেই হউক, যোগ ভক্তি কি কর্ম্মপথেই হউক, অকামী হউন, মোক্ষকামীই হউন, কি সর্ব্বকামীই হউন, সাধুসঙ্গের গুণে ও ভগবানের কৃপায় কামাদি দুঃসঙ্গ অর্থাৎ কৈতব, আত্মবঞ্চনা, এবং মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মোপাসক ত্রিবিধ; সাধক, ব্রহ্মময়প্রাপ্ত, ও ব্রহ্মলয়। আত্মোপাসক ত্রিবিধ; মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, ও প্রাপ্তস্বরূপ। যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, ও প্রাপ্তসিদ্ধ, তিন প্রকার যোগী। এ সকলকে শেষে শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয় লইতে হয়। ইহাদের কথা দূরে থাকুক, সামান্য জীবগণ, ম্লেচ্ছাদি, কদাচারী ও পাপাচারীগণ; এমন কি স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী, সকলেই সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণ কৃপাগুণে ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। কেহই তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হয় না। ব্রহ্মাদি দেবগণও এই অহৈতুকী ভক্তির জন্য লালায়িত। অতঃপর শ্রীচৈতন্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের বহু প্রশংসা করিয়া তাহার সদর্থ সনাতনকে শিক্ষা দিয়া প্রচার করিতে উপদেশ দিলেন।

তখন সনাতন অতি বিনীত ভাবে বলিলেন 'আপনি যে সব তত্ত্ব আমাকে শিখাইয়া গ্রন্থকারে বর্ণন করিতে বলিলেন; আমার ভয় হইতেছে, আমা হইতে তাহা সম্পন্ন হইবে না। অতএব কৃপা করিয়া ভবিষ্যৎ গ্রন্থনিচয়ের সূত্র করিয়া দিউন।' শ্রীচৈতন্য হাসিয়া বলিলেন 'তোমা দ্বারাই কৃষ্ণ সব কাজ সম্পন্ন করিয়া লইবেন, তাহাতে কোন আশঙ্কা করিও না। তথাচ তোমার সন্তোষার্থ আমি কোন কোন গ্রন্থের সূত্র করিয়া দিতেছি।' এই বলিয়া গৌরচন্দ্র শ্রীমুখ হইতে কতক সূত্র রচনা করিয়া দিলেন। সনাতন গোঁসাই তাহা লিখিয়া লইলেন।

দুই মাস ধরিয়া শ্রীচৈতন্য সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী গোষ্ঠিতে।

কাশীতে অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্য ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ পরিহার করিতেন। প্রকাশানন্দ প্রমুখ পরমহংসগণ একে সর্ব্বদাই তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইত, তাহাতে উহাদের সভাতে গর্ব্বপূর্ণ আত্মশ্লাঘা ভিন্ন কোন সৎপ্রসঙ্গ হইত না, এই জন্যই চৈতন্যদেব তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতেন না। পরমহংসগণ ইহাতে অপমানিত জ্ঞান করিয়া পূর্ণমাত্রায় তাঁহার নানাবিধ নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র ও মহারাষ্ট্রী বিপ্র সেই সব নিন্দাবাদ শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইয়া একদিন তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন 'আর সহ্য হয় না; তোমার নিন্দা শুনিতে শুনিতে শ্রবণ ও প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে।' শ্রীচৈতন্য ঈষৎ হাসিলেন। এমন সময়ে একটী ব্রাহ্মণ হঠাৎ সেখানে আসিয়া গৌরকে বলিতে লাগিল 'আজ আমি কাশীবাসী সমস্ত সন্ন্যাসী পরমহংসদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া যদি একবার পদধূলি দেন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। আপনি সন্ন্যাসীসভায় যান না, তা' জানি। তবুও যদি আমাকে কৃপা করেন, বড়ই অনুগৃহীত হই।' এরূপ নিমন্ত্রণ গৌরচন্দ্র কতবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এবারে কিন্তু করিলেন না। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। কেন করিলেন, পরে প্রকাশ হইবে।

ব্রাহ্মণগৃহে মধ্যাহ্নে সন্ন্যাসীদিগের সভা বসিয়াছে। কাশীর সমস্ত দণ্ডী, সন্ন্যাসী ও পরমহংসই সে সভায় আসীন। সকলের অগ্রণী শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ স্বামী মধ্যে বসিয়া প্রগল্‌ভতা সহকারে বেদান্ত আলোচনা করিতেছেন; চৈতন্যদেব এমন সময়ে উপনীত হইয়া পাদপ্রক্ষালনান্তে সন্ন্যাসীদিগকে নমস্কার করিয়া নিম্নাসনে উপবেশন করিলেন। প্রকাশানন্দ গৌরকে মৌখিক সম্মান করিয়া বলিলেন 'শ্রীপাদ গোসাই! এদিকে আসুন, নীচে কেন বসিলেন?' গৌরচন্দ্র বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন 'আমি অতি হীন সম্প্রদায়, আপনাদের সঙ্গে বসিবার উপযুক্ত নই।'

তখন প্রকাশানন্দ স্বয়ং তাঁহার হাত ধরিয়া সভার মধ্যখানে আনিয়া বসাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারই নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য? আপনি কেশব ভারতীর শিষ্য?'

উত্তর। আজ্ঞে।

প্রশ্ন। আপনি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, এই গ্রামে থাকেন, অথচ আমা-

দিগকে দর্শন দেন না কেন? শুনিতে পাই, ভাবুকদিগের সঙ্গে মিশে ভাবুকের ন্যায় সর্ব্বদা নৃত্যকীর্ত্তন করেন। বেদান্ত পাঠ ও বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর পরম ধর্ম্ম; তাহা ছাড়িয়া ভাবুকতা করেন্ কেন?

শ্রীচৈতন্য প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপতার সহিত উত্তর করিলেন 'শুনুন্ ইহার কারণ। আমাকে অতি মূর্খ দেখিয়া গুরু বলিয়াছিলেন "তোর বেদান্তে অধিকার নাই; কৃষ্ণনাম জপ কর, তাহাতেই সিদ্ধমনোরথ হবি।" সেই আজ্ঞাক্রমে আমি নাম লইতে আরম্ভ করিলাম। নাম জপিতে জপিতে আমার মতিভ্রান্তি হইল; আমি দিশাহারা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে, গায়িতে, লাগিলাম। আবার একটু সাব্যস্ত হইয়া মনে মনে বিচার করিলাম "আমি কি পাগল হইলাম? কৃষ্ণনামে কি আমার মতিচ্ছন্ন হইল?" তখন গুরুপদে নিবেদন করিলাম—"মহাশয়! এ কি মন্ত্র দিলেন? আমি যে নাম-জপে পাগল হয়ে গেলাম।" গুরু বলিলেন "না বাপু! পাগল হও নাই। তোমার পরম ভাগ্য যে নামের ফলে তুমি প্রেমানন্দামৃত লাভে সমর্থ হইয়াছ। কৃষ্ণনামের ফলই এই প্রেম। ইহার নিকট চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ।" শুনিলেন শ্রীপাদ! আমার নাচিবার গাইবার কারণ। আমি কিছু ইচ্ছা-পূর্ব্বক নাচি না, গাই না।'

শ্রীচৈতন্যের সুচতুর ও সুমিষ্ট বচনভঙ্গি শুনিয়া সন্ন্যাসীগণ মুগ্ধ হইলেন। তখন প্রকাশানন্দ বলিলেন, 'আচ্ছা, তা যেন হ'ল, বেদান্ত শুনেন না কেন?'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'যদি দুঃখিত না হন্, তবে তাহার কারণ বলি।'

সন্ন্যাসীগণ বলিয়া উঠিলেন 'না, না, আপনি মহাতেজস্বী সন্ন্যাসী। আপনি যাহা বলিবেন, তাহা কখন অসঙ্গত নহে। যাহা ইচ্ছা হয়, বলিয়া যাউন।'

শ্রীচৈতন্য বলিতে লাগিলেন 'বেদান্ত সূত্র ঈশ্বরবাক্য, স্বয়ং নারায়ণ ব্যাসরূপে বলিয়াছেন। উহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, প্রভৃতি থাকিতে পারে না। উপনিষদ্‌তত্ত্ব পরম পবিত্রতত্ত্ব। কিন্তু শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য তাহার যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে সূত্রের মুখ্যবৃত্তি আচ্ছন্ন হইয়া গৌণার্থ কল্পিত হইয়াছে। শুনিলে পরমার্থ হানি হয়। আচার্য্যেরও দোষ নাই; তিনি ঈশ্বর প্রেরণায় বৌদ্ধদিগকে জয় করিবার জন্য ঐরূপ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।' এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের

নিকট যেরূপ ব্যাসসূত্রের ব্যাখ্যায় নির্ব্বিশেষবাদে দোষারোপ করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পরমহংসদিগকে চমৎকৃত করিলেন। সার্ব্বভৌমপ্রকরণে এই সব কথা লেখা হইয়াছে। পাঠক মহাশয় দেখিয়া লইবেন।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'মোটের উপর, ব্রহ্মস্বরূপ অতি বৃহৎ, বাক্য মনের অগোচর। জীব সামান্য চিদংশ মায়াবদ্ধ। তাহাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলার অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ কি হইতে পারে?'

প্রকাশানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসীগণ গৌরের অসাধারণ বিচারকৌশল ও যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। প্রকাশানন্দ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন 'আচ্ছা, আচার্য্যের ভাষ্য না হয় ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিলাম। কিন্তু বেদান্তের প্রকৃত অর্থ কি? আপনি ইহার কিরূপ ব্যাখ্যা করেন?'

তখন শ্রীচৈতন্য বেদান্তনিষ্পন্ন ব্রহ্মই যে পরমতত্ত্ব ও একমাত্র উপাস্য; জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন ও তাঁহার দাস; ও জীবের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ; তাঁহাকে পাইবার উপায় ও জীবের লক্ষ্য কি; তাহা একে একে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই সব কথা পূর্ব্বে সম্বন্ধ, অভিধেয়াদি তত্ত্বে, লিখিত হইয়াছে। সন্ন্যাসীগণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সেই দিন হইতে কাশীর সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জয় ঘোষণা হইতে লাগিল। কথিত আছে, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন এবং এখন সন্ন্যাসীসভায় শ্রীচৈতন্যের নিন্দার পরিবর্ত্তে সুখ্যাতি হইতে লাগিল। একদিন শ্রীচৈতন্য বিন্দুমাধবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভক্তগণ সহ নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রকাশানন্দ স্বশিষ্যে আসিয়া দর্শন শ্রবণে পুলকিত হইয়া চৈতন্যের পাদবন্দনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য অমনি নৃত্য বন্ধ করিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলেন 'এ কি! আপনি মহা পূজার্হ; আমি আপনার শিষ্যের যোগ্য নই; আমার প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণ করিতেছেন কেন?' প্রকাশানন্দ বলিলেন 'আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, লোক নিস্তার জন্য নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; পূর্ব্বে না বুঝিয়া যে নিন্দা করিয়াছি, তাহা মার্জ্জনা করুন।'

শ্রীচৈতন্য কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন 'বিষ্ণু! বিষ্ণু! আমি জীবাধম! আপনি জগদ্গুরু হইয়া আমাকে এমন বলিলে আমার অপরাধ হইবে।'

তখন উভয়ে অনেক শাস্ত্রালাপ হইল। কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ ও আপামর সাধারণ সকলেই এখন হরিসংকীর্ত্তন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইল। সমস্ত বারাণসীপুরী প্রেমে টলমল করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য বাসায় আসিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া ভক্তগণকে বলিলেন 'কেমন হে! কাশীতে ভাবকালি বেচিতে এসেছিলাম। গ্রাহক না থাকায় বিক্রী হয় নাই। তাহাতে তোমরা মনে বড় দুঃখিত হয়েছিলে; সেজন্য বিনামূল্যে বেচে গেলাম।' চন্দ্রশেখর প্রভৃতি হাসিতে লাগিলেন। অন্যদিনে প্রভাতে উঠিয়া সনাতনকে বৃন্দাবনে বিদায় করিয়া দিয়া বলভদ্র আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে যাত্রা করিলেন। তপন মিশ্র, রঘুনাথ, চন্দ্রশেখর, সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে বলিলেন 'যাঁহার ইচ্ছা হয়, পরে আমাকে দেখিতে আসিবে; এখন আমি একা যাইব।' তৎ পরে পূর্ব্ব আগত ঝারিখণ্ড পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন এবং যথাসময়ে নীলাচলে উপনীত হইয়া ভক্তগোষ্ঠির আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

সন্ন্যাস হইতে ছয় বৎসর কাল এইরূপে পর্য্যটনে, আলাপে, বিচারে, প্রচারে, শ্রীচৈতন্যের মর্ত্ত্যজীবন অতিবাহিত হইল। এই কালকে তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের প্রৌঢ়াবস্থা বলা যাইতে পারে। চরিতামৃতের এইখানে মধ্যলীলা শেষ হইয়াছে। ইহার পর অষ্টাদশ বর্ষ তিনি একাদিক্রমে নীলাচলে বাস করিয়া সাধন ভজনের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং অলৌকিক প্রেমবিকার দেখাইয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সে স্বর্গের ছবি যে দেখিয়াছে, সে মজিয়াছে। আমার লেখনীর সাধ্য নাই যে তাহা বর্ণনা করিতে পারে। তবে সাধুদিগের পদানুসরণ করিয়া যথা কথঞ্চিৎ সেই অলৌকিক কথা বলিতে এখন প্রবৃত্ত হইব।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরূপ সঙ্গোৎসব।

চৈতন্য জীবনের সন্ন্যাস হইতে নীলাচল প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের ঘটনা আমরা পূর্ব্বের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে একরূপ বর্ণনা করিলাম। তাঁহার মর্ত্ত্য জীবনের অবশিষ্ট অষ্টাদশ বর্ষ নীলাদ্রির পুণ্য ভূমিতে অতিবাহিত হয়।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আর কোথায়ও যান নাই; নিরন্তর সংকীর্ত্তন বিলাসে, ধর্ম্মালাপে, ভক্তি প্রচারে, ও ঈশ্বর সম্ভোগে, অনুরক্ত থাকিতেন। এই আঠার বৎসরকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম ছয় বৎসর ও শেষ বার বৎসর। প্রথম ছয় বৎসর নাম সংকীর্ত্তন, নৃত্য গীত, পাঠব্যাখ্যা, সৎপ্রসঙ্গ, হাস্য পরিহাস, নিমন্ত্রণ ভোজন, আচণ্ডালে প্রেমভক্তি প্রচার, ও গৌড়ের ভক্তগণ সঙ্গে বিবিধ লীলা কৌতুকে কাটিয়া যায়। এ ছয় বৎসরের ঘটনার মধ্যে শ্রীরূপের নীলাচলে আগমন ও এক বর্ষ স্থিতি, ছোট হরিদাসের দণ্ড, শ্রীচৈতন্যের প্রতি দামোদর পণ্ডিতের বাক্যদণ্ড, সনাতন গোস্বামীর নীলাচলে আগমন, নিত্যানন্দকে গৌড় দেশে প্রচারার্থে প্রেরণ, অদ্বৈতের বাসায় নিমন্ত্রণ ভোজনাদি, বল্লভ ভট্টের আগমন ও শিক্ষা, রামচন্দ্রপুরীর আগমন ও শ্রীচৈতন্যের ভিক্ষা-সঙ্কোচ, রায় রামানন্দ স্থানে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কৃষ্ণকথা শ্রবণ; গোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধার, হরিদাসের নির্ঝাণ, ও রঘুনাথ দাসের আগমন, প্রধান। এই সময়েই শ্রীচৈতন্য প্রচারিত প্রেমভক্তির কথা ভারতের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল এবং নানা দেশের নানা শ্রেণীর লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য সর্ব্বদা নীলাচলে আসিত ও তাঁহার কৃপোপদেশ লাভ করিয়া আনন্দমনে প্রত্যাগমন করিয়া স্ব স্ব দেশে নামপ্রেম প্রচারে ব্রতী হইত।

যে যে ভক্ত গৃহসংসার পরিত্যাগ করিয়া এই সময়ে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নীলাদ্রিতে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গদাধর পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস, জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নাম উল্লেখ যোগ্য। ক্ষেত্রবাসী রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শিখি মাইতি, কাশীমিশ্র, প্রভৃতি সংসারী হইয়াও নিরন্তর তাঁহার কাছে থাকিতেন।

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুরারি, প্রভৃতি বঙ্গের বহুসংখ্যক ভক্তমণ্ডলী প্রতিবর্ষে নীলাদ্রিতে আসিয়া চারিমাস চৈতন্যসঙ্গে অবস্থিতি করিয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া যাইতেন। সন্ন্যাসের পর ২৩ বৎসরের মধ্যে ইঁহারা বিংশতি বৎসর কাল অবাধে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের আদেশে বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, প্রভৃতি বাস করিয়া প্রেমভক্তি প্রচার করিতেছিলেন। কাশীতে

তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর, প্রভৃতি হরিনামের মহিমা ঘোষণা করিতেছিলেন; তাঁহারা কখন নীলাচলে আসেন নাই।

চৈতন্যজীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসরের ঘটনা অলৌকিক। দিনে দিনে বিরহ স্ফূর্ত্তি, প্রলাপ বাক্য কথন, এবং ভ্রমময়ী চেষ্টা, প্রকাশ হইতে লাগিল। রোমকূপে রক্তোদ্গম হইত, দন্ত নড়িত, শরীর কখন ক্ষীণ হইয়া যাইত, আবার কখন ফুলিয়া উঠিত। হস্ত পদের অস্থিসন্ধি বিশ্লেষ হইয়া যাইত, রাত্রে নিদ্রা হইত না, সর্ব্বদা হাহুতাস! ও ভাবে বিহ্বলতা। এই কালের প্রধান লীলার মধ্যে চটক পর্ব্বতে ভ্রমণ, সিংহদ্বারে পতন, কূর্ম্মানুকৃতি, সমুদ্রে পতন, ভিত্তিতে মুখসজ্ঘর্ষণ, উপবনে ভ্রমণ, গীতগোবিন্দাদির শ্লোকাস্বাদ, প্রলাপ কথনাদি, উল্লেখ যোগ্য। এখন আর প্রচার নাই, কেবলই আচরণ ও সম্ভোগ। এই সব মধুর কথা আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ সকলে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

রূপ গোস্বামী বল্লভের সঙ্গে প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যের কৃপা-উপদেশ লাভ করিয়া মথুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং সুবুদ্ধি রায়ের সহিত মিলিত হইয়া দ্বাদশবন ভ্রমণ করিলেন। সনাতনের কারামোচন ও বারাণসী আগমন সংবাদ শুনিতে পাইয়া একমাস মাত্র বৃন্দাবন বাসের পর রূপ ও বল্লভ গঙ্গাতীরের পথে জ্যেষ্ঠের অনুসন্ধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ওদিকে সনাতন গোস্বামী কাশীতে শ্রীচৈতন্যের নিকট উপদিষ্ট হইয়া শ্রীরূপের মিলনাশায় প্রয়াগে আসিলেন এবং তথা হইতে রাজপথ ধরিয়া অতি ত্রস্তভাবে মথুরায় চলিয়া গেলেন। রূপ ও বল্লভ প্রয়াগে আসিয়া শুনিলেন, সনাতন রাজসরান দিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছেন। সুতরাং ভাই ভাই সাক্ষাৎ হইল না। মথুরায় আসিয়া সনাতন সুবুদ্ধি রায়ের সহিত মিলিত হইলেন। সুবুদ্ধি তাঁহাকে অনেক স্নেহ মমতা করিতে লাগিলেন। সনাতন তাহাতে বৈরাগ্যের ব্যাঘাৎ হইবে মনে করিয়া বনমধ্যে চলিয়া গেলেন এবং মথুরামাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বনে বনে বেড়াইয়া বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ সকল উদ্ধার করিতে লাগিলেন ও মহা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কনিষ্ঠ বল্লভকে সঙ্গে লইয়া রূপ গোঁসাই বারাণসীতে আসিয়া তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদের মুখে সনাতনের প্রতি প্রভুর কৃপা, উপদেশ ও পরমহংসদিগের মধ্যে হরি-

নাম প্রচারের বিবরণ শুনিয়া সুখী হইলেন। প্রভুর নীলাচলে যাত্রার সংবাদ গৌড়দেশে পাঠাইয়া এবং দিন দশ কাশীতে বাস করিয়া দুই ভাই বঙ্গদেশে চলিলেন। বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে কৃষ্ণলীলার নাটক রচনা করিবার জন্য রূপের মনে ইচ্ছা হইয়াছিল এবং সেইখানেই গ্রন্থের সূচনা করিয়া তাহার মঙ্গলাচরণ শ্লোক লিখিয়াছিলেন। এক্ষণে পথে যাইতে যাইতে তিনি নাটকের ঘটনা ভাবিতে লাগিলেন ও দিবাভাগে যে কিছু রচনা হইত, সন্ধ্যাকালে প্রবাসাশ্রমে বসিয়া কড়চা করিয়া লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। গৌড়দেশে আসিয়া হঠাৎ জ্বরবিকারে বল্লভের গঙ্গালাভ হইল। তাঁহার চিকিৎসা, সেবা, ও অন্ত্যেষ্টি আদি, করিতে শ্রীরূপের নবদ্বীপে আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। সুতরাং তিনি নবদ্বীপে পৌঁছিয়া দেখিলেন, গৌড়ের ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর নীলাচলে আগমন সংবাদ পাইয়া ইতিপূর্ব্বে যাত্রা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইল না। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া একাকী উৎকলদেশে যাত্রা করিলেন।

এদিকে নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ দল বাঁধিয়া নীলাচলে যাইতেছেন। শিবানন্দ সেন তাঁহাদের তত্ত্বাবধায়ক। ঘাট পার করা ও পথে প্রতিপালন করার ভার তাঁহার উপর। তাঁহার সঙ্গে একটী কুকুর যাইতেছিল। সকলে নিদ্রা গেলে কুকুর প্রহরীর কার্য্য করিত। শিবানন্দ তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। নীলাচলের নিকটে এক রাত্রিতে তিনি পাচক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কুকুর ভাত পাইয়াছে ত?' এ অনুসন্ধান তিনি প্রতি রজনীতেই করিতেন। ভৃত্য বলিল 'না, তাহাকে আজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।' শিবানন্দ কহিলেন 'সে কি?' সে রাত্রি ও পরদিন প্রাতে অনেক অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কুকুরকে আর পাওয়া গেল না। যাহা হউক, সকলে ত্রস্তভাবে নীলাচলে আসিলেন। মহাপ্রভু সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বাসা দেওয়াইলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে পাইয়া মহানন্দিত হইলেন। পরদিন প্রাতে শিবানন্দ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের বাসায় যাইয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, তাঁহাদের সেই কুকুর প্রভুর অগ্রে বসিয়া প্রভুপ্রদত্ত নারিকেল শস্য খাইতেছে ও আনন্দে লেজ নাড়িতেছে। শ্রীচৈতন্য তাহাকে বলিতেছেন—'বল, রাম কৃষ্ণ হরি।' কথিত আছে, কুকুর দুই দিন পরে কুকুর দেহ ছাড়িয়া দিব্যদেহে বৈকুণ্ঠে গিয়াছিল।

রূপ গোঁসাই আজ সত্যভামাপুরে আসিয়া পথশ্রমে নিদ্রিত। স্বপ্নে দেখিতেছেন যে, এক দিব্যাঙ্গনা রমণীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া যেন বলিতেছেন 'আমার নাটক তুমি পৃথক্‌রূপে রচনা কর; আমার বরে সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে।' নিদ্রাভঙ্গে রূপ ভাবিলেন 'দেবী সত্যভামা আমাকে দ্বারিকালীলার নাটক পৃথক্ করিয়া লিখিতে বলিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্র বর্ণন করিব। তাহা হইল না, দুই প্রস্তাবনা, দুই নান্দী, দুই ঘটনা ও দুই নাটক করিতে হইবে। দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য।' এই ভাবিতে ভাবিতে রূপ গোস্বামী প্রভাত হইলে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং অচিরে নীলাচলে পৌঁছিয়া অনুসন্ধান করিয়া হরিদাসের বাসায় আসিয়া উপনীত হইলেন। হরিদাসের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বে রামকেলিতে অল্প পরিচয় ছিল; কিন্তু উভয়ে উভয়কে বিশেষরূপ জানিতেন। অতএব হরিদাস রূপকে পাইয়া যে খুব সুখী হইলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? শ্রীচৈতন্যের নিয়ম ছিল, প্রতিদিন জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া হরিদাসকে দেখিতে আসিতেন। এ দিন আসিলে হরিদাস ও রূপ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভু প্রথমতঃ রূপকে তত লক্ষ্য করেন নাই। হরিদাসকে আলিঙ্গন করিতে গেলে হরিদাস বলিলেন 'রূপ প্রণাম করিতেছেন।' মহাপ্রভু রূপের নাম শুনিয়া ও যুগপৎ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে মগ্ন হইলেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কাছে বসাইয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'সনাতন কোথায়?' রূপ উত্তর করিলেন 'তাঁ'র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; আমি গঙ্গাতীর-পথে আসিতেছি। প্রয়াগে আসিয়া শুনিলাম, তিনি রাজপথে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন।'

শ্রীচৈতন্য। অনুপম? চৈতন্যদেব আদর করিয়া বল্লভকে অনুপম বলিয়া ডাকিতেন।

রূপ। আসিতে আসিতে গৌড়দেশে তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। অনেক কথা বার্ত্তার পর রূপ গোঁসাইকে হরিদাসের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া মহাপ্রভু বিদায় হইয়া গেলেন। পরদিন অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর, রামানন্দ, স্বরূপ, প্রভৃতিকে সঙ্গে আনিয়া শ্রীচৈতন্য রূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন, এবং সকলকে বলিলেন 'তোমরা রূপকে কৃপা কর, যেন ইনি রসশাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ

'করিতে সমর্থ হন্।' রূপের বিনয় ও সৌজন্যে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। রূপ সকল ভক্তের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

রূপ গোস্বামী হরিদাসসঙ্গে নিভৃতে পরমসুখে বাস করিতেছেন। চৈতন্যদেব প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে প্রীতি-আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা করিয়া যান্। ক্রমে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা নিকটবর্ত্তী হইল। পূর্ব্বের ন্যায় গুণ্ডিচা মার্জ্জন, বন্য ভোজন, রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন, সকলই হইল। রূপ দেখিয়া শুনিয়া কৃতার্থ হইলেন। রথের সময় চৈতন্যদেব ভাবে বিভোর হইয়া সামান্য একটী আদিরসের শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া নাচিতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যে স্বরূপ ব্যতীত কেহই সেই শ্লোকের সঙ্গে প্রভুর মনের ভাবের যোগ কি, বুঝিতে সমর্থ হইল না। সকলেই মুখ চাওয়া-চাহি করিয়া ভাবিতে লাগিলেন 'প্রভু এরূপ শ্লোক কেন আবৃত্তি করিতেছেন?' সে শ্লোকটী এইঃ—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার লীলা-বিধৌ
রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে"।

কোন নায়িকা বলিতেছে 'সখি! যিনি কৌমার কালে আমার মন হরণ করিয়াছিলেন, এখনও তিনিই আমার কান্ত; সেই সকল মধুযামিনীও বর্ত্তমান; তখনকার মত বিকশিত মালতীসুরভি সম্পৃক্ত পরম সুখদ বসন্তানিলও প্রবাহিত হইতেছে; এবং সেই আমিও রহিয়াছি; তথাচ লীলাস্থান রেবাতীরের সেই বেতসীকানন মনে করিয়া আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।'

রথ ফুরাইয়া গেলে ভক্তগণ যে যাহার স্থানে চলিয়া গেলেন; রূপ গোস্বামী বাসায় আসিয়া চৈতন্যের মনের ভাবানুযায়ী সেই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া চালে গুঁজিয়া রাখিয়া দিলেন। রূপ-রচিত শ্লোক এই:—

'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি"।

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণসঙ্গে মিলিতা হইয়া শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন 'হে সখি! সেই বৃন্দাবনবিহারী প্রাণবল্লভ হরি এখানে উপস্থিত; আমিও সেই; রাধা মিলিতা হইয়াছি; আমাদের মিলনজনিত সুখও সেইরূপ; তথাপি শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ কাননোত্থিত মধুর মুরলী-ধ্বনি, যাহা যমুনা-পুলিন আন্দোলিত করিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত, মনে ভাবিয়া আমার মন উদ্বিগ্ন হইতেছে।'

জগন্নাথের রথযাত্রায় গুণ্ডিচা স্থিতি, রাধাকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রমিলনাভিনয় স্মরণ করিয়া মহাপ্রভুর ভাবপ্রবণ হৃদয় পূর্ব্বোক্ত আদি রসের শ্লোকাবৃত্তি করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছিল। সুচতুর রূপ বুঝিতে পারিয়া তাহা এই শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

পরদিন রূপ সমুদ্র স্নানে গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য হরিদাসের বাসায় আসিয়া ঊর্দ্ধে চাহিতে হঠাৎ তালপত্রে সেই শ্লোক দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। রূপ স্নানান্তে আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। চৈতন্য তাঁহার পৃষ্ঠে প্রেমের চাপড় মারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'আরে! তুই আমার মনের ভাব কেমন করিয়া জানিলি?' এবং ঐ শ্লোক স্বরূপকে দেখাইয়া বলিলেন 'বল দেখি, রূপ আমার মনের কথা কেমন করিয়া টের পাইল?'

স্বরূপ উত্তর করিলেন 'তোমার কৃপায়।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'প্রয়াগের প্রথম আলাপেই বুঝিয়াছিলাম, ইনি খুব উচ্চ প্রকৃতির লোক। যোগ্যপাত্র বিবেচনায় আমি ইঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছি। তুমিও তাঁহাকে রসশাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব সকল বলিয়া দিও।'

শ্রীরূপ গোস্বামী বাসায় বসিয়া আপন অভিলষিত নাটক লিখিতেছেন। হঠাৎ শ্রীচৈতন্য আসিয়া 'কি পুঁথি লিখিতেছ?' বলিয়া একটী পাতা তুলিয়া লইলেন। রূপের হস্তাক্ষর মুক্তা-পংক্তির ন্যায় পরম সুন্দর। গৌর দেখিয়া বড় সুখী হইলেন এবং ভাবাবেশে অক্ষরের স্তুতি করিতে লাগিলেন। অক্ষরের বিষয়, শ্লোক দেখিয়া তাঁহার প্রেমাবেগ আরও উথলিয়া উঠিল। তিনি পড়িতে লাগিলেন :—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলি-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।"

জানি না 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃত দিয়া গঠিত হইয়াছে? যখন ইহা রসনায় নৃত্য করিতে থাকে, তখন রসনাশ্রেণি লাভের জন্য বাসনা হয়। যখন কর্ণরন্ধ্রে অঙ্কুরিতা হয়, তখন দশকোটি কর্ণলাভের স্পৃহা বলবতী হয়, এবং চিত্তপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে সকল ইন্দ্রিয়-ব্যাপার স্তম্ভিত হয়।

শ্রীচৈতন্য নামানন্দে বিভোর হইলেন; হরিদাস নাচিতে লাগিলেন এবং শত মুখে শ্লোকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন 'এমন নাম মাহাত্ম্য ত কখন শুনি নাই।' গৌর উঠিয়া যাইবার সময় রূপকে ইসারায় বলিলেন 'রূপ! কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করিও না; কৃষ্ণ কখন ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র যান্ না। যদুবংশ সম্ভূত কৃষ্ণ অন্য ব্যক্তি; কিন্তু ব্রজেন্দ্র নন্দন কখন বৃন্দাবন ছাড়েন না।'

শ্রীচৈতন্য চলিয়া গেলে রূপ বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন 'পূর্ব্বে সত্যভামা দেবী স্বপ্নে দুই নাটক করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এখন দেখিতেছি, প্রভুর আজ্ঞাও তাহাই। আগে দুই নাটকের একত্র রচনা করিয়াছি। যাহা হউক, এখন দুই নান্দী, দুই প্রস্তাবনা ও দুই সংঘটনা পৃথক্ রচনা করিব।' এইরূপে রূপ গোঁসাই নাটক রচনায় গাঢ় মনোযোগ করিলেন।

একদিন শ্রীচৈতন্য, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রামানন্দ রায়, স্বরূপ, অদ্বৈত, গদাধর, নিত্যানন্দ, প্রভৃতি বহুবিধ ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া হরিদাসের কুটীরে আসিয়া সভা করিয়া বসিলেন। রূপ ও হরিদাস পিঁড়ার নীচে উপবেশন করিলে গৌর তাঁহার হৃদয়ানুবাদের শ্লোকটী পড়িয়া শুনাইতে রূপকে আদেশ করিলেন। রূপ লজ্জায় মৌনী হইলে স্বরূপ গোঁসাই সেই শ্লোক ভক্তবৃন্দকে শুনাইয়া সুখী করিলেন। শ্রীচৈতন্য রূপকে নাটকের নাম-মাহাত্ম্যের শ্লোক পড়িতে আদেশ করিলে রূপ তাহা প্রতিপালন করিলেন। ভক্তগণ শ্লোক শুনিয়া রূপের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রামানন্দ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি কোন গ্রন্থ রচনা করিতেছ?' স্বরূপ রূপের হইয়া উত্তর করিলেন 'হাঁ, পুরলীলা ও ব্রজলীলা বিষয়ক কৃষ্ণলীলাত্মক নাটক লিখিতেছিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় এখন গ্রন্থ খানিকে দু'ভাগ করিয়া ললিত-মাধব ও বিদগ্ধমাধব নামে দুই খানি প্রেমরসপূর্ণ উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতেছেন।' রায় কহিলেন 'নান্দী-শ্লোক পড় দেখি শুনি।'

রূপ তাহা পড়িলেন। রামানন্দ রায় একে একে প্রশ্ন করিয়া গ্রন্থের

অনেকাংশ শুনিয়া লইলেন। শ্রীরূপ গৌরের অনুমতি লইয়া মধুর ভাষায় পাত্রসন্নিবেশ, প্ররোচনা, প্রেমোৎপত্তি, পূর্ব্বানুরাগ, বিকারচেষ্টা, প্রণয়-পত্রিকা, ভাবের স্বভাব, সহজ-প্রেমের প্রকৃতি, মুরলীনিস্বন, ও দ্বিতীয় গ্রন্থের নান্দী প্রভৃতি অংশ আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করিলেন্ এবং অবশেষে অতি বিনীতভাবে রামানন্দ রায়কে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—'কোথায় সূর্য্য সম আপনি ? আর কোথায় ক্ষুদ্র খদ্যোতিক আমি ? আপনার আগে যে ধৃষ্টতা করিয়া মুখ-ব্যাদান করিলাম, অনুগ্রহ করিয়া সে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে।'

রায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'দ্বিতীয় নাটকের পাত্র-সন্নিবেশের অংশ বল দেখি ?' 'কলানিধি নাচিতে নাচিতে রঙ্গভূমি মধ্যে কিরাতরাজের প্রাণ-সংহার করিয়া যথা সময়ে তারার পাণিগ্রহণ করিবেন' শ্লোক আবৃত্তি করিয়া রূপ কহিলেন 'এ শ্লোক দ্ব্যর্থ। ইহাতে অব্যক্ত ভাবে নাটকের বিষয় সূচিত হইয়াছে। ইহার নাম উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনা।' রামানন্দ রায় তখন শ্রীচৈতন্যকে বলিতে লাগিলেন 'সহস্রমুখে রূপের কবিতার প্রশংসা করিতে হয়। অমৃতধারার ন্যায় ইহাতে কি মধুর প্রেমপারিপাট্যই বর্ণিত হইয়াছে! সে কবি কবিই নয়, আর সে ধানুকী বীরই নয়, যাঁহাদের কাব্য রচনা ও শস্ত্রনিক্ষেপ পরহৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তাহার মাথা না ঘুরাইয়া দেয়। রূপের কবিতা উহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছে।' রূপকে বলিলেন 'আচ্ছা, রূপ! একবার তোমার নাটকদ্বয়ে ইষ্টদেব বন্দনা শুনাও দেখি ?'

রূপ এবার মুস্কিলে পড়িলেন ও মাথা হেঁট করিয়া নীরবে থাকিলেন। গৌর বলিলেন 'লজ্জা কি ? বৈষ্ণবসমাজে গ্রন্থের ফল শুনাইবে; এ তো তোমার সৌভাগ্য!' রূপ অগত্যা পড়িলেন :—

"পূর্ব্বে যে মধুর রস জগতে আর কখন প্রদত্ত হয় নাই, সেই নিজ ভক্তি-সম্পদ্ প্রদান করিবার জন্য যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ও যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণকান্তি হইতেও সুন্দর, সেই শচীনন্দন হরি তোমা-দের হৃদয় কন্দরে প্রকাশিত হউন্।'

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই গৌর রোষাবেশে বলিয়া উঠিলেন—'আর না, ঢের হইয়াছে। হায়! কৃষ্ণরস-কাব্য-সুধাসিন্ধুর নির্ম্মল জলে অতিস্তুতি রূপ ক্ষারজল কেন মিশাইয়া ফেলিয়াছ ? ইহাতে সব যে নষ্ট হয়ে গেল!'

রামানন্দ রায় হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন—'না, তা কেন হবে ?

'রূপের অমৃত সুধারস কবিতার মধ্যে এক বিন্দু কর্পূরকণা প্রদত্ত হয়েছে বই ত নয়? ইহাতে আস্বাদনের আরও ঔৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।'

গৌর সেইরূপ বিরক্তির সহিত বলিলেন 'ছি! ছি! ইহাতেও তোমার আনন্দ? এ যে উপহাসের কথা! কোথায় লজ্জিত হইবে, না, আনন্দ প্রকাশ করিতেছ?'

রামানন্দ উত্তর করিলেন 'অভীষ্টদেবের বন্দনা কে না করিয়া থাকে? আপনি ইহাতে এত আশঙ্কাই বা কেন করিতেছেন? ইষ্টদেবতাকে কি কেহ কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতে পারে?'

গৌর নীরব হইলেন। ভক্তগণ বলিয়া উঠিলেন 'আমরা রূপের কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি।' রামরায় গৌরকে বলিলেন 'রূপ তোমার শক্তি পাইয়াছে, তাই এ সব রসলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছে।'

গৌর। তোমরা সকলে কৃপা করিয়া ইহাকে বর দাও, যেন ইনি প্রেমরসপূর্ণ ব্রজলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হন্। ইহার জ্যেষ্ঠভাই সনাতনের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি চক্ষে দেখা যায় না। তোমার ন্যায় তাঁহার বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, ও দৈন্য। ইহাদের দুই ভাইকে আমি বৃন্দাবনে ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিতে নিযুক্ত করিয়াছি।

রাম রায়। আপনার যখন ইচ্ছা হয়েছে, অবশ্যই তাহা পূর্ণ হইবে।

গৌর তখন রূপকে একে একে সকল ভক্তের পাদবন্দনা করিতে বলিলে রূপ তাহাই করিলেন।

সভাভঙ্গ হইল। ভক্তগণ বিদায় হইয়া গেলে হরিদাস রূপকে বলিলেন 'তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। যে সব তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছ, তাহা অতি দুর্ল্লভ।'

রূপ বলিলেন 'আমি সামান্য ব্যক্তি। আমি কি জানি? মহাপ্রভুর প্রেরণায় যে কিছু বলিতে পারি।'

চারিমাস পরে গৌড়দেশের ভক্তমণ্ডলী স্বদেশে চলিয়া গেলে রূপ গোঁসাই দোলযাত্রা পর্য্যন্ত নীলাচলে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যের সহিত জগন্নাথের দোলযাত্রা দর্শন করিলেন। তাহার পর চৈতন্যদেব রূপকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন 'বৃন্দাবনে যাও; দুই ভাই মিলিত হইয়া ভক্তি ও রসশাস্ত্র প্রচার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, ও কৃষ্ণসেবা করিও। আমার একবার তথায় যাইবার ইচ্ছা আছে। আর সনাতনকে একবার এখানে পাঠাইয়া দিও।' রূ

গোঁসাই গৌরকে প্রণামবন্দনা করিয়া, হরিদাস ও অন্যান্য ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া নীলাচল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বঙ্গদেশ দিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ছোট হরিদাসের দণ্ড।

শতানন্দ খাঁ নামে একজন লোক অতিশয় বিষয়াসক্ত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবান্ আচার্য্য বিষয়-বিমুখ বৈরাগ্যপ্রবণ চিত্ত। পিতার অযথা বিষয় পিপাসা দেখিয়া ভগবান্ বিরক্ত হইলেন এবং বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়া নীলাচলে যাইয়া শ্রীচৈতন্য চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন; এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভগবান্ পরম বৈষ্ণব ও সুপণ্ডিত; সুতরাং ক্রমে স্বরূপ গোস্বামীর সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় সখ্যতা জন্মিল। মহাপ্রভু ভগবান্‌কে বিশেষ কৃপা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সদ্‌গুণের মধ্যে ভগবান্ অতি সুপাচক ছিলেন। মাঝে মাঝে নানা সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। ভগবানের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম গোপাল ভট্টাচার্য্য। ইনি কাশীতে বেদান্ত পাঠ সমাপন করিয়া পুরুষোত্তমে জ্যেষ্ঠের নিকট আগমন করিলেন। ভগবান্ ভাইকে পাইয়া খুব সুখী হইলেন এবং শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত করিয়া দিয়া বেদান্ত-প্রসঙ্গ করিতে বলিলেন। গোপালের শারীরিক ভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া চৈতন্যদেব হৃদয়ে সুখ পাইলেন না। কিন্তু ভগবানের খাতিরে মুখেও কিছু প্রকাশ না করিয়া গোপালকে মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। অন্যদিনে ভগবান্ আচার্য্য স্বরূপ গোঁসাইকে বলিলেন 'এসো আজ সকলে মিলে গোপালের নিকট বেদান্ত ভাষ্য শুনিগে। গোপাল কাশী থেকে, বড় সুশিক্ষিত হয়ে এসেছে।'

স্বরূপ গোঁসাই প্রণয়কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন 'গোপালের সঙ্গে থেকে দেখ্‌ছি তোমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে; তাই মায়াবাদ ভাষ্য শুনিতে কৌতুক হয়েছে। মায়াবাদটা কি, তা কি জান না? তুমি, আমি, সকলই ব্রহ্ম; কৃষ্ণ যে সকলের সেব্য, তা' তা'তে নাই। এ হেন মায়াবাদ শুনে শেষে কি পরমার্থ খোয়াবে?'

ভগবান্ উত্তর করিলেন 'আমাদের কৃষ্ণগত প্রাণ; আমাদের মঃ কি শারীরিক ভাষ্য ফিরাইতে পারে?'

স্বরূপ বলিলেন 'তথাচ মায়াবাদ শ্রবণ বৈষ্ণবের নিষিদ্ধ। জীবজ্ঞা কল্পিত, ঈশ্বরে অজ্ঞান, এ সব কথা শ্রবণার্হ নয়।'

ভগবান্ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। দিন দুই পরে গোপাল দে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর একদিন ভগবান্ আচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে ভোজনের নিমন্ত্র করিলেন এবং নানাবিধ তরকারী পাক করিয়া ছোট হরিদাসকে বলিলে 'তুমি শিখি মাইতির ভগিনীর নিকট এক মোন উত্তম আতব চাউ ভিক্ষা করিয়া আনগে। তাঁহাকে বলিও, প্রভু ঐ চাউলের অন্ন ভোজ করিবেন।'

ছোট হরিদাসের নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যে একজন কীর্ত্তনীয়া; সুমিষ্ট কীর্ত্তনে প্রভুর চিত্তবিনোদন করিত এবং তাঁহা বাসায় অবস্থিতি করিত।

শিখি মাইতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী। তিনি বৃদ্ধা তপস্বিনী পরম বৈষ্ণবী। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং অনেক সময়ে তাঁহাকে শ্রীরাধিকার প চারিকার মধ্যে গণনা করিয়া বলিতেন 'জগতের মধ্যে সাড়ে তিন জন মা শ্রীরাধিকার প্রিয়পাত্র; স্বরূপ, রামানন্দ, ও শিখি মাহিতি, এবং অর্দ্ধে তাঁহার ভগিনী।' যাহা হউক, সরলমতি হরিদাস চাউল আনিয়া দি অন্ন পাক হইল। শ্রীচৈতন্য ভোজনে বসিয়া অন্নের রূপ দেখিয়া ও সুগ লইয়া খুব আনন্দিত হইয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এমন উত্ত তণ্ডুল কোথায় পেয়েছ?' আচার্য্য উত্তর করিলেন 'মাধবী দেবীর কা ভিক্ষা করিয়া আনাইয়াছি।' শ্রীচৈতন্য পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন 'কে ভি আনিতে গিয়াছিল?' আচার্য্য ছোট হরিদাসের নাম করিলেন। শ্রীচৈত আর কিছু প্রকাশ না করিয়া ভোজন করিলেন এবং বাসায় আসি গোবিন্দকে বলিয়া দিলেন 'আজ হইতে হরিদাসকে এখানে আসিতে দি না।' গোবিন্দ প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। ছোট হরিদাসে গৌরাঙ্গদর্শনে যাওয়া বন্ধ হইল। সরলমতি কীর্ত্তনীয়া তাহার অপর কি, বুঝিতে না পারিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইল এবং তিন দিন অনাহা থাকিয়া গৌরবিরহে দগ্ধ হইতে লাগিল।

স্বরূপাদি শ্রীচৈতন্যের নিকটে যাইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন ‘প্রভু! হরিদাস কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার জন্য দ্বার নিষিদ্ধ হইয়াছে? বেচারা তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাসী আছে।’

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন ‘গৃহত্যাগী বৈরাগী হইয়া যে প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, আমি তাহার মুখ দেখিতে চাই না। জান না কি আমাদের ইন্দ্রিয় সকল কেমন দুর্ব্বার? তা'তে আবার স্ত্রীসঙ্গ। কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তিও মুনি জনের মন টলাইয়া দিতে শুনা গিয়াছে। অন্য স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, বৈরাগীর পক্ষে মাতা, ভগিনী, কিম্বা কন্যার সঙ্গেও নির্জ্জনে থাকা উচিত নয়। এই সব ক্ষুদ্রপ্রাণী লোক নির্ম্মল বৈরাগ্য ধর্ম্মে কলঙ্ক দিতে বসিয়াছে; তাই মর্কট বৈরাগ্যের ছলনায় স্ত্রীসম্ভাষণ করিয়া ইন্দ্রিয় চালনার সুবিধা করিয়া লইতেছে।’

শ্রীচৈতন্য সঙ্গীদের উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া রোষভরে গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন।

অন্যদিনে অবসর পাইয়া বন্ধুগণ শ্রীচৈতন্যকে হরিদাসের জন্য নিবেদন করিলেন ‘তাহার বিলক্ষণ শিক্ষা হয়েছে। আর এমন কর্ম্ম করিবে না। আপনি প্রসন্ন হউন্।’

গৌর পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ়তা-ব্যঞ্জকস্বরে উত্তর করিলেন ‘কি করিব বল? আমার নিজের মন আমার বশ নয়। প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীকে সে দেখিতে চায় না। তোমরা নিজ নিজ কর্ম্ম করগে; এ কথা ছাড়িয়া দাও। পুনরায় এ কথা তুলিলে আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না।’

ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কাণে হাত দিয়া উঠিয়া গেলেন। এবারে সকলে যুক্তি আঁটিয়া পরমানন্দ পুরীকে ধরিলেন। পুরী গোঁসাই মহাপ্রভুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত। প্রভু প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন ‘কি জন্য আগমন হয়েছে? দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?’ পুরী একেবারেই বলিয়া বসিলেন ‘হরিদাসকে প্রসন্ন হও।’ এ কথা শুনিয়া চৈতন্যের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন ‘গুরুদেব! আপনি এই সব বৈষ্ণব লইয়া এখানে থাকুন; আমাকে আজ্ঞা দিন, কেবল মাত্র গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া আলালনাথে চলিয়া যাই।’ এই বলিয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া শ্রীচৈতন্য গমনোম্মুখ হইলেন। পুরী গোঁসাই মহা ফাঁফরে পড়িলেন এবং আস্তেব্যস্তে গৌরকে ফিরাইয়া বলিলেন ‘তোমার যাহা ইচ্ছা কর; তোমাকে কে

‘চালাইতে পারে? লোকের হিতের জন্য তুমি যাহা করিবে, আমাদের সাধ্য কি যে তাহার মর্ম্মাবধারণ করিতে পারি?’

তখন স্বরূপাদি ভক্তগণ নিরাশ্বাস হইয়া হরিদাসের নিকট যাইয়া বুঝাইতে লাগিলেন ‘শুন ভাই হরিদাস! আমরা যে তোমার বন্ধু, তাহা বিশ্বাস কর। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও মহাপ্রভুর মনের গতি ফিরাইতে পারিলাম না। ইহার উপর তুমি যদি রাগ করিয়া থাক, তবে আরও বিপদ্ বাড়িবে। অতএব স্নান ভোজন করিয়া এখন সুস্থ হও। সময়ে সব চুকিয়া যাইবে।’

হরিদাস স্নান ভোজন করিয়া শাপান্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। যখন শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ-মন্দিরে, বা সমুদ্রস্নানে যাইতেন অথবা অন্য কোন কারণে বাহির হইতেন, হরিদাস দূরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিত এবং একদৃষ্টে তাঁহার পানে তাকাইয়া থাকিত। চৈতন্যদেব কিন্তু ফিরিয়াও চাহিতেন না। গৌরের অন্তঃকরণ প্রেমময় হইলেও কর্ত্তব্য-পালন সময়ে অযথা স্নেহে তিনি কখনই দ্রবীভূত হইতেন না। ইহার প্রমাণ আমরা তাঁহার জীবনে ভূয়োভূয়ঃ দেখিয়াছি। হরিদাসের প্রতি যে তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু মণ্ডলীর হিতের জন্য ও লোক-শিক্ষা নিমিত্ত তাঁহাকে এই কঠোর ভাব অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। পাছে পবিত্র বৈরাগ্যের নামে কলঙ্ক দিয়া লোক সকল কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া পড়ে, এই ভয় তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। এবং তাহাই নিবারণ করিতে রাজদর্শন ও প্রকৃতি-সম্ভাষণ বিষয়ে তাঁহাকে এত কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এই সব নিয়ম সত্ত্বেও ছোট হরিদাসের ঘটনার ন্যায় মধ্যে মধ্যে যে দুই একটা ঘটনা ঘটিত, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, হরিদাসের দণ্ড দেখিয়া সঙ্গীগণ বড়ই ভীত হইল। এবং সে সময়ের জন্য কেহ আর স্বপ্নেও স্ত্রীর ছায়া স্পর্শ করিত না।

দেখিতে দেখিতে হরিদাসের এক বৎসর কাটিয়া গেল। তবুও শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ে দয়ার আবির্ভাবের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। হরিদাস নির্ব্বেদে, দুঃখে ও অনুতাপে ফাটিয়া যাইতে লাগিলেন। বর্ষান্তপূর্ণ দিনের রজনীশেষে বিশ্বাসী হরিদাস মনে মনে এক অলৌকিক সঙ্কল্প করিয়া ক্ষেত্র হইতে চলিয়া গেলেন এবং প্রয়াগে যাইয়া জন্মান্তরে গৌর-পদলাভ কামনা

করিয়া ত্রিবেণী-প্রবেশান্তর জীবন পরিত্যাগ করিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, মরণান্তে তিনি দিব্যদেহ লাভ করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে অন্তর্দ্দর্শনে থাকিলেন এবং অন্যের অজ্ঞাতে প্রভুকে গান করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য ভিন্ন এ সব রহস্য আর কেহ জানিতে পারিলেন না।

একদিন শ্রীচৈতন্য ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'হরিদাস কোথায়? তাহাকে লইয়া আইস।' সকলে উত্তর করিল 'অভিশাপের বর্ষপূর্ণ-দিনে সে রাত্রিতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না'। শ্রীচৈতন্য শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। অন্য দিনে জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, মুকুন্দ, প্রভৃতি দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্র স্নানে গিয়া শুনিতে পাইলেন, বিস্তীর্ণ সৈকত ভূমির দূরপ্রান্ত হইতে হরিদাসের কণ্ঠস্বরে কে যেন সুমিষ্ট সঙ্গীত করিতেছে। তাঁহারা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আরও অগ্রসর হইলেন এবং শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, হরিদাসই যেন গান করিতেছে; অথচ কাহারও শরীর লক্ষিত হইল না। গোবিন্দাদি অনুমান করিলেন যে, হরিদাস আত্মগ্লানিতে বিষ খাইয়া মরিয়াছে এবং সেই পাপে ব্রহ্ম-রাক্ষস হইয়া সমুদ্রের ধারে ধারে গান গাইয়া বেড়াইতেছে। স্বরূপ বলিলেন 'এ মিথ্যা অনুমান; যে ব্যক্তি আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন ও প্রভুর সেবা করিয়াছে এবং পুণ্যক্ষেত্র নীলাচলে দেহ রক্ষা করিয়াছে; তাহার কি কখন অসদ্গতি হইতে পারে? এ ঘটনা এখন অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ধারণা যে ইহা নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর ভঙ্গী। যাহা হউক, সময়ে সব প্রকাশ হইবে।'

হরিদাস সঙ্কল্প করিয়া যেখানে ত্রিবেণী-প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেখানে আর কয়েক জন বৈষ্ণব ছিল। তাহারা নবদ্বীপে আসিয়া ঐ বৃত্তান্ত শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে জ্ঞাপন করিয়াছিল। বঙ্গের ভক্তগণ শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে উৎকলে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন। শ্রীবাসপণ্ডিত হরিদাসের মরণ বৃত্তান্ত জানিয়া শুনিয়াও মহাপ্রভুর মন জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'হরিদাস কোথায়?'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্।'

তখন শ্রীবাস বৈষ্ণবদিগের মুখে হরিদাসের সঙ্কল্প ও ত্রিবেণীতে প্রাণান্তের বিষয় যেমন শুনিয়াছিলেন, সকল বিবৃত করিলে, শ্রীচৈতন্য প্রসন্নচিত্তে বলিয়া উঠিলেন 'প্রকৃতি দর্শন করিলে বৈরাগীর পক্ষে এই বিহিত প্রায়শ্চিত্ত।'

এই সব ঘটনা হইতে স্বরূপাদি সিদ্ধান্ত করিলেন, হরিদাস দিব্যদেহে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্দর্শন লাভ করিয়াছে।

নিতাইকে গৌড়ে প্রেরণ।

যে বৎসর শ্রীরূপ নীলাচলে আসিয়াছিলেন, সে বৎসর বঙ্গীয় ভক্তগণের সঙ্গে নিত্যানন্দও চৈতন্য দর্শনে আসিয়াছিলেন ; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চারি মাসকাল ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গে আনন্দ কৌতুকে কাটাইলেন। তাঁহাদের স্বদেশ যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে গৌরচন্দ্র একদিন নিত্যানন্দকে নিভৃত স্থানে ডাকিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া সমস্ত দিন পরামর্শ করিলেন। তাঁহাদের গুপ্ত মন্ত্রণার বিষয় কি ছিল, এ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কার্য্যের দ্বারা ভক্তগণ তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। বিদায়ের দিনে শ্রীচৈতন্য সমস্ত ভক্তগণকে একত্রিত করিলেন এবং নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন 'তুমি এখন গৌড়দেশে থাকিয়া নিরন্তর হরিনাম প্রচার করগে এবং প্রেমভক্তি বিলাওগে। ক্লেশ করিয়া বর্ষে বর্ষে তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। বঙ্গদেশ তোমাকেই অর্পণ করিলাম। বাঙ্গালী জাতির ধর্ম্মজীবন গঠন করা তোমারই হাতে। তোমার কার্য্যের সাহায্যের জন্য রামদাস, গদাধর দাস, বাসুদেব দত্ত, প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া দিলাম।' নিত্যানন্দের পরবর্ত্তী জীবনে দেখা যায়, ইহার পর তিনি দারপরিগ্রহ করিয়া খড়দহে বাস করিয়াছিলেন এবং গৃহস্থ বৈষ্ণবরূপে বঙ্গের নানা স্থানে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তবে কি শ্রীচৈতন্যের গুপ্ত মন্ত্রণার বিষয় ইহাই ছিল যে তিনি নিতাইকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন ? অন্যের পক্ষে হইলে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু যিনি আকুমার বিরক্ত সন্ন্যাসী, যিনি এত দিন গৌরের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় ফিরিতেছিলেন, তাঁহাকে এরূপ আদেশ কেন দেওয়া হইল ? ইহাই সমস্যা। গৌরের মনের ভাব কি ছিল, কে বলিবে ? আর নিতাই কেন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলেন ? ইহাও বড় রহস্যজনক।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যের প্রতি দামোদরের বাক্যদণ্ড।

পুরুষোত্তমে এক অল্পবয়স্কা পরমাসুন্দরী ব্রাহ্মণবিধবা বাস করিতেন। তাঁহার একটী সুকুমার বালক ছিল। বালকের নিরুপম সৌন্দর্য্যে শ্রীচৈতন্য মুগ্ধ হইয়া বালককে খুব ভাল বাসিতেন। বালকের অমিয়া-মাখা মধুর সৌন্দর্য্যে কাহার না মন গলিয়া যায়? শ্রীচৈতন্যের ন্যায় প্রেমিকের ত কথাই নাই। বালকের স্বভাব, যেখানে প্রেম পায়, সেই থানে থাকিতে ভাল বাসে। চৈতন্যদেবের ভালবাসা পাইয়া সে আর তাঁহার কাছ-ছাড়া হইতে চাহিত না। চৈতন্য পার্ষদের মধ্যে দামোদর পণ্ডিত বড় স্পষ্টবাদী। শ্রীচৈতন্যে তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি। যে কাজ বা কথা প্রভুর গৌরবের অত্যল্পমাত্রও অন্তরায়, তাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বিধবার পুত্রকে চৈতন্যদেব এত প্রেম করেন, ইহা পণ্ডিতের সহ্য হইল না। কিন্তু কি বলিয়াই বা নিষেধ করেন, তাঁহাও ঠিক করিতে পারিলেন না। একদিন বালকটী শ্রীচৈতন্যের আদর যত্ন লাভ করিয়া চলিয়া গেলে দামোদর আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন 'অন্যকে উপদেশ দিবার বেলায় গোঁসাই ঠাকুর মহা পণ্ডিত; কিন্তু নিজের বেলায় গোঁসাই, কেমন গোঁসাই, তা' এবার জানা যা'বে।'

শ্রীচৈতন্য শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'দামোদর কি বল্‌ছো?'

দামোদর উত্তর করিলেন 'তুমি স্বাধীন পুরুষ, নিজ ইচ্ছায় যাহা আচরণ কর, তাহার উপর কথা কয় এমন ব্যক্তি কে আছে? কিন্তু পৃথিবীর মুখে ত আর হাত দিতে পারিবে না? তুমি মহা পণ্ডিত; বিচার ক'রে দেখ দেখি, বিধবা যুবতীর বালককে অত্যধিক ভালবাসা দেখাইলে লোকে কি বলিবে? বিধবা যদিও তপস্বিনী, মহাসতী; কিন্তু তা'র দোষ এই যে সে পরমাসুন্দরী ও যুবতী। তুমিও পরম সুন্দর যুবা পুরুষ। লোকে কি এ কথা লইয়া কাণাকাণি করিতে ছাড়িবে?'

এই বলিয়া দামোদর মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। শ্রীচৈতন্য মনে মনে তাঁহার অকৃত্রিম প্রেমের প্রশংসা করিলেন এবং ভাবিলেন দামোদরের ন্যায় অন্তরঙ্গ বন্ধু অতি বিরল। সে দিন আর কিছু না বলিয়া চৈতন্যদেব সমুদ্র স্নানে চলিয়া গেলেন। অন্য সময়ে দামোদরকে নিভৃতে ডাকিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন :—

'বন্ধো! তুমি আমার যেমন আত্মীয়, এমন আর কেহ নাই। আমার ধর্ম্ম রক্ষার্থে নিরপেক্ষ ভাবে সে দিন আমাকে যে কথা বলিয়াছিলে, তাহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। নিরপেক্ষ হইয়া শিক্ষা না দিলে কি ধর্ম্ম রক্ষা হয়? আমার মনে ধারণা হইয়াছে যে তুমিই আমার জননীর উপযুক্ত রক্ষক। অতএব নবদ্বীপে যাও, মার নিকটে থাকিও এবং মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া আমারও সুখবর্দ্ধন করিও।' দামোদর সম্মত হইলে শ্রীচৈতন্য শচীদেবীকে যাহা যাহা বলিয়া আশ্বস্ত করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলেন এবং অনেক মহাপ্রসাদ আনাইয়া মাতাকে ও অদ্বৈতাদি ভক্তগণকে দিবার জন্য সঙ্গে দিলেন।

দামোদর যথা সময়ে নবদ্বীপে পৌঁছিয়া শচীদেবীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। অল্প সময়ে দামোদরের নিরপেক্ষতার কথা বৈষ্ণবমণ্ডলীতে রাষ্ট্র হইয়া গেল। তাঁহাকে দেখিয়া বৈষ্ণবগণ সঙ্কুচিত হইতেন। কেন না তিনি কাহাকেও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে দেখিলে বাক্যদণ্ড করিয়া মর্য্যাদা স্থাপন করিতেন।

বৎসরান্তে দামোদর পণ্ডিত নীলাদ্রি প্রত্যাগমন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইলেন এবং মাতা ও বন্ধুগণের কুশল সংবাদ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'ওহে বন্ধু! আমার মায়ের ত বিষ্ণু-ভক্তি অক্ষুণ্ণ আছে! ভক্তিপথে ত তিনি অগ্রসর হইতেছেন?'

দামোদর এই প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যকে শুনাইয়া দিলেন 'কি এমন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তোমার লজ্জা হয় না? শচীমাতার বিষ্ণুভক্তি নাই? আরে! তুমি কোথা হইতে ভক্তি পাইলে? অমন মায়ের গর্ভে জন্মিয়াছিলে, তাইতে ত তোমার ভক্তি? আহা! মা যে আমার নিরন্তর ভক্তি-সুধাসিন্ধুতে ডুবিয়া রহিয়াছেন! তাও কি জান না?'

শ্রীচৈতন্য মহা লজ্জিত হইয়া দামোদরকে গভীর প্রেমালিঙ্গন করিলেন এবং অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলেন।

কমলাকান্ত বিশ্বাস।

কমলাকান্ত বিশ্বাস নামে অদ্বৈতাচার্য্যের এক প্রিয় শিষ্য ছিল। ব্যক্তির পাগ্‌লাটে রকমের ভাব ছিল বলিয়া লোকে তাহাকে বাউলি বিশ্বাস বলিয়া ডাকিত। অদ্বৈতাচার্য্যের অগোচরে এ ব্যক্তি কোন সময় নীলাচলে মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিল

তাহাতে লেখা ছিল 'অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কিন্তু দৈবযোগে তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছে। তিন শত মুদ্রা হইলে ঐ ঋণ পরিশোধ হইতে পারে। অতএব মহারাজের নিকটে তিন শত টাকা যাচ্ঞা করিতেছি।' ঘটনা ক্রমে সেই পত্রী শ্রীচৈতন্যের হাতে পড়িল। পত্র পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্য মনে মনে বড় দুঃখিত হইলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে হাসিয়া ভক্তগণের সম্মুখে বলিতে লাগিলেন :—'অদ্বৈতাচার্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছে, তাহাতে আমি তত দোষ দিই না; কারণ আচার্য্য ঐশ্বর্য্যশালী মহাপূজনীয় ভক্ত। কিন্তু ঈশ্বরের ভান ও দৈন্য করিয়া যে অর্থ ভিক্ষা করিয়াছে, এ মহা অপরাধের কথা। এ জন্য তাহাকে আমি সমুচিত শিক্ষা দিব।' এই বলিয়া চৈতন্যদেব গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন 'কদাচ বাউলিয়া বিশ্বাসকে এখানে আসিতে দিবে না।'

কমলাকান্ত দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া মহাদুঃখিত হইল। কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্য উহাতে সুখী হইলেন। যখন বিশ্বাস অদ্বৈতের নিকটে কাঁদিতে লাগিল, তখন আচার্য্য তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন :—'তোমার ভাগ্যের সীমা নাই, প্রভু যখন তোমাকে দণ্ড করিয়াছেন। এই দণ্ড-প্রসাদ পাইবার জন্য পূর্ব্বে আমি কি না করিয়াছিলাম? অবশেষে জ্ঞানপক্ষে বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়া প্রভুর ক্রোধোদ্দীপন করিয়া দণ্ডলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। যে দণ্ড ভাগ্যবান্ মুকুন্দ পাইয়াছিলেন, যে দণ্ড ভাগ্যবতী শচীদেবী লাভ করিয়াছিলেন, সে দণ্ড-প্রসাদ কি যে সে লোক পায়? তাই বলি তোমার ভাগ্যের সীমা নাই।' এই বলিয়া আচার্য্য বিশ্বাসকে আশ্বস্ত করিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকটে আসিলেন এবং সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রভু! তোমার লীলা বুঝা ভার। আমি কি অপরাধ করিয়াছি, যে আমা অপেক্ষা কমলাকান্ত তোমার প্রসাদ-পাত্র হইল? আমি যে কত দিন তোমার দণ্ড প্রসাদ পাই নাই।'

শ্রীচৈতন্য হাসিয়া কমলাকান্ত বিশ্বাসকে ডাকাইলেন এবং ভক্তগণসমক্ষে তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। অভিপ্রায় যে সকলে সে উপদেশানুসারে চরিত্র গঠন করে। শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'বিশ্বাস! এমন পত্র কেন লিখিতে গিয়াছিলে? ইহাতে যে আচার্য্যের লজ্জা ও ধর্ম্মের হানি হইয়াছে, জান না কি? রাজার ধন প্রতিগ্রহ করিলে ও বিষয়ীর অন্ন খাইলে ভোগবিলাস লোলুপ হইয়া মন কলুষিত হয়। মন কলুষিত হইলে ভগবৎস্মরণ হয় না। যে ভগবদ্‌বিমুখ, তাহার জীবন বৃথা। অতএব এমন কর্ম্ম

আর কখন করিও না।' আচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া চৈতন্যদেব কমলা কান্তকে সেবারকার মত ক্ষমা করিলেন।

যিনি ছোট হরিদাসের সামান্য অপরাধে গুরুতর দণ্ড বিধান করিলেন তিনি কমলাকান্ত বিশ্বাসের সেইরূপ বা ততোধিক গুরুতর অপরাধ উপদেশে সংশোধন করিয়া ক্ষমা করিলেন কেন? এ প্রশ্ন কে মীমাংসা করিবে? কবিরাজ গোস্বামীও বোধ হয় এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই বলিয়াছেন 'কমলাকান্তের প্রস্তাবে অনেক বলিবার কথা থাকিলেও গ্রন্থ বাহুল্যভয়ে বলিলাম না।'

ক্ষেপা চৈতন্যদাস।

গৌরসন্ন্যাস-দিনে চাকন্দিগ্রামের গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য যেমন করিয়া ক্ষেপা চৈতন্যদাস নাম পাইয়াছিলেন, পাঠকের তাহা স্মরণ আছে। ইনি যাজিগ্রামের বলরাম পণ্ডিতের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে পরিণয় করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত লক্ষ্মীপ্রিয়ার কোন সন্তান জন্মায় নাই। চৈতন্যচন্দ্রের সন্ন্যাসের দৃশ্য দেখিয়া অবধি চৈতন্যদাস সংসার-বিরাগী হইয়া সর্ব্বদা সাধনভজনে নিযুক্ত থাকিতেন। যেমন স্বামী, তেমনি স্ত্রী। উভয়েই সকল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাসক্তরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কে জানে কি জন্য অল্প দিনের মধ্যে চৈতন্যদাসের মনে হঠাৎ পুত্র কামনার উদয় হইল? তিনি পত্নীর নিকট ঐ কথা প্রকাশ করিলে উভয়ে যুক্তি করিয়া শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। চৈতন্যদেব সবান্ধবে জগন্নাথ দর্শন করিয়া একদিন বাসায় আসিতেছিলেন, এমন সময়ে সপত্নীক চৈতন্যদাস তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। শ্রীচৈতন্য চিনিতে পারিয়া চৈতন্যদাসকে আলিঙ্গন করিলেন এবং গোবিন্দ দ্বারা তাঁহাদের থাকিবার বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া দর্শনাদি করাইলেন। আপনি বহু কৃপা করিলেন। একদিন নির্জ্জনে চৈতন্যদাস সস্ত্রীক যাইয়া শ্রীচৈতন্যের পদ বন্দনা করিয়া মনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া বলিলেন। চৈতন্যদেব হাসিতে হাসিতে তাঁহাদের 'কামনা পূর্ণ হইবে' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনতিকাল পরে চৈতন্যদাস স্ত্রীর সহিত দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিছুকাল পরে লক্ষ্মীদেবী গর্ভবতী হইয়া যথা সময়ে সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। শ্রীচৈতন্যের শক্তিধর শ্রীনিবাস আচার্য্যের এইরূপে জন্ম হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভিক্ষা-সঙ্কোচ।

রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্র পুরীর অনৈক শিষ্য। শ্রীচৈতন্যের ইষ্টদেব ঈশ্বর পুরীর ন্যায় কিন্তু রামচন্দ্র মাধবেন্দ্রের প্রীতি-আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। মাধবেন্দ্রের রোগশয্যায় ঈশ্বরপুরী সাবহিতে গুরুর পাদসেবা করিতেন, স্বহস্তে মলমূত্রাদি মার্জ্জন করিতেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইতেন। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরপুরীকে বর দিলেন 'তোমার কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হউক।' এই গুরুকৃপাই তাঁহার প্রেমভক্তি-লাভের কারণ হইয়াছিল। মাধবেন্দ্র শেষাবস্থায় ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতেন 'হে দীন দয়াল! কবে আমি মথুরাধামে যাইব! তোমাকে না দেখিয়া আমার হৃদয় বড় কাতর হইয়াছে। হে প্রিয়! কবে তোমাকে দেখিয়া সুস্থির হইব?'

রামচন্দ্রপুরী এ সময়ে গুরুকে সান্ত্বনা করা দূরে থাকুক, মহাবিজ্ঞের ন্যায় উপদেশ করিলেন 'ব্রহ্মবিৎ হ'য়ে তুমি কাঁদ্ছো কেন? পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ স্মরণ কর।'

মাধবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর করিলেন 'দূর হ' মূর্খ! আমি কৃষ্ণ না পে'য়ে, মথুরা না পে'য়ে, আপন মনোদুঃখে মর্ছি, তুই আবার জ্বালাতে এলি কেন? তো'র মুখ দেখিতে চাই না; তুই যেখানে ইচ্ছা চলে যা। আমাকে আর ব্রহ্ম উপদেশ দিতে হবে না।'

কথিত আছে গুরুর অভিশাপে রামচন্দ্রের হৃদয় শুকাইয়া গেল; উহাতে আর প্রেমভক্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিল না। রামচন্দ্রের পরনিন্দা-রূপ আর একটী মহৎ দোষ জন্মিল। তিনি নাকি স্থানে স্থানে সাধু মহাজন-দিগের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন। এই রামচন্দ্রপুরী দেশ-পর্য্যটন করিতে করিতে নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং স্বীয় গুরুভাই পরমানন্দ পুরী ও ভ্রাতৃশিষ্য শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পরমানন্দ বড় ভায়ের চরণবন্দনা, চৈতন্যদেব জ্যেষ্ঠতাতকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে পরস্পর প্রীতি-আলাপ হইতে লাগিল। চৈতন্যদেব রামচন্দ্রের স্বভাব জানিয়াও বহু সমাদর ও ভক্তির সহিত তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন এবং প্রিয় সুহৃদ্ জগদানন্দ পণ্ডিতের বাসায় পুরীর

আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। জগদানন্দ পাকবিদ্যা-পারদর্শী ছিলেন। নানাবিধ উপকরণে পুরীকে পরিতোষ ভোজন করাইলেন। পুরীও আহারান্তে জগদানন্দকে আগ্রহ করিয়া 'এটী খাও, উটী খাও' করিয়া বসিয়া বসিয়া খুব খাওয়াইলেন এবং আচমন শেষ হইলে বলিতে লাগিলেন:— 'শুনিয়াছিলাম চৈতন্যগণ অপরিমিত আহার করে, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। বাপ্‌রে! এত খাওয়াইয়া সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস-ধর্ম্মের দফারফা করিয়া দেয় ও নিজেও আকণ্ঠ পুরিয়া কতকগুলা খাইয়া বৈরাগ্য হানি করে। এমন স্থানে কি আসিতে আছে?'

জগদানন্দ এ কথা মহাপ্রভুকে জানাইলেন। রামচন্দ্র নীলাচলে এইরূপে কিছুদিন কাটাইতে লাগিলেন। নিজে মহা বিরক্ত, যেথানে সেথানে অনিমন্ত্রিত ভিক্ষা করিয়া বেড়ান, এবং কোন্ বৈরাগী কত খায়, তাহারও সন্ধান লইয়া থাকেন। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, আচরণ, সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ছিদ্র পাইলেন না। শ্রীচৈতন্যের ভিক্ষার জন্য চারি পণ কড়ির মহাপ্রসাদ আসিত; তাহাতে গোবিন্দ, কাশীশ্বর ও তিনি, এই তিন জন খাইতেন। রামচন্দ্র তাহাতেও কিছু বলিবার না পাইয়া এক অদ্ভুত নিন্দা তুলিয়া দিলেন যে সন্ন্যাসী হইয়া মিষ্টান্নভোজন করা নিষিদ্ধ; তাহাতে জিহ্বার লাম্পট্য জন্মে এবং ইন্দ্রিয় দমন হয় না। শ্রীচৈতন্য মিষ্টান্ন খাইয়া থাকেন। চৈতন্যদেব পরম্পর এ কথাও শুনিলেন। রামচন্দ্র প্রতি দিন প্রাতে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন শ্রীচৈতন্য উপেক্ষা করা দূরে থাকুক, গুরুবুদ্ধিতে রামচন্দ্রকে মহাভক্তি করিতেন ও আদর সম্ভ্রম দেখাইতেন।

একদিন প্রাতে পুরী শ্রীচৈতন্যের বাসায় বসিয়া পিঁড়ার উপরে কতকগুলি পিপ্‌ড়া দেখিতে পাইয়া সংস্কৃতভাষায় বলিয়া উঠিলেন 'রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসা। *' এবং কাহাকেও আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এই নিন্দাবাক্যে চৈতন্যদেব বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, মনে মনে একবার আত্মালোচনা করিয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন 'আ

* রাত্রিতে এথানে মিষ্টান্ন আসিয়াছিল; তাহাতে এত পিপ্‌ড়া বেড়াইতেছে। হা বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এ কি ইন্দ্রিয় লালসা!

হইতে আমার জন্য পিণ্ডাভোগের এক চৌঠী ভাত ও পাঁচ গোণ্ডার ব্যঞ্জন আনিবে; অধিক আনিলে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না। আর তুমি ও কাশীশ্বর ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ণ করিবে।' গোবিন্দ তাহাই করিলেন এবং এই কথা ভক্তমণ্ডলী মধ্যে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। শুনিয়া ভক্তগণের মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলেই একবাক্যে রামচন্দ্র পুরীকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। এক চৌঠী ভাত ও পাঁচ গোণ্ডার ব্যঞ্জন যাহা আসিতে লাগিল, শ্রীচৈতন্য তাহার অর্দ্ধেক খাইয়া অবশিষ্ট গোবিন্দের জন্য রাখিয়া দিতেন। গোবিন্দ সেই অবশেষ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন ও কাশীশ্বর ভিক্ষা করিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্দ্ধাশনে শ্রীচৈতন্য দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ-শ্রী মলিন হইয়া পড়িল। তাহাতে গৌরগত-প্রাণ ভক্তগণের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা প্রভুর অর্দ্ধাশনে অর্দ্ধাশন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র পুরী এ সব কথা শুনিতে পাইয়া একদিন শ্রীচৈতন্যের নিকট আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন 'অতিশয় পান ভোজনে ইন্দ্রিয় তর্পণ করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নয়। সে জন্য সে দিন আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। দেখিতেছি তুমি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছ। শুনিলাম না কি অর্দ্ধ ভোজন করিয়া থাক? সেও কিন্তু বৈরাগ্যের বিরোধী। এরূপ শুষ্ক বৈরাগ্যও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া রামচন্দ্র পুরী ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৬। ১৭ শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিলেন 'অতি ভোজন শীল, একান্ত অনশন শীল, অতি নিদ্রালু এবং নিতান্ত জাগরণ শীল, ব্যক্তির যোগ হইতে পারে না। কিন্তু যাহার আহার, বিহার (গতি), কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত; তিনিই যোগ সাধনে সমর্থ। তুমি বিষয় ভোগ না করিয়া এইরূপ যুক্তাহার অবলম্বন কর; এই আমার ইচ্ছা।' শ্রীচৈতন্য বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন 'আমি আপনার অজ্ঞ বালক-শিষ্য; আমাকে যে আপনি শিক্ষা দিলেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য।'

রামচন্দ্র পুরী উঠিয়া গেলে ভক্তগণ পরমানন্দ পুরীকে মুখপাত্র করিয়া চৈতন্যসমীপে বলিতে লাগিলেন:—'রামচন্দ্র পুরী নিন্দুক স্বভাবের লোক; তাঁ'র কথায় অন্ন ছাড়া কি কর্ত্তব্য? উনি মানুষকে যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া ও নিজেও যথেষ্ট খাইয়া পরে নিন্দা করিয়া থাকেন। অপরের আহার,

'ব্যবহার, অশন, বসন, সম্বন্ধে ছিদ্রানুসন্ধান করাই তাঁহার কাজ। শাস্ত্রে যে পরনিন্দার এত নিষেধ আছে, তাহাই উঁহার অবলম্বন। অতএব তাঁর কথায় অন্ন ছাড়িও না। আমাদের কথা রাখ; উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া আমাদের প্রাণে বাঁচাও।'

কৃষ্ণচৈতন্য উত্তর করিলেন 'পুরীর নিন্দা কেন করিতেছ? উনি ত সহজ ধর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছেন। বাস্তবিক জিহ্বার লাম্পট্যে যতিধর্ম্ম কি বজায় রাখা যায়?'

ভক্তগণের অনেক অনুনয়ে শ্রীচৈতন্য চারি পণের অর্দ্ধেক দুই পণ কড়ির প্রসাদ আনাইতে সম্মত হইলেন। উহাতে কখন দুই জন, কখন তিন জনের ভোজন হইতে লাগিল। আর জগদানন্দ, ভগবান্ আচার্য্য, ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, যাঁহাদের গৃহে নিমন্ত্রণ ভোজন করিতেন; তাঁহারা যেমন দিতেন, তেমনি খাইতেন।

কতকদিন পরে রামচন্দ্রপুরী চলিয়া গেলে ভক্তগণের মাথা হইতে যেন পাথর নামিল। তখন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে যথেচ্ছ নিমন্ত্রণ করিয়া পান ভোজন করাইতে লাগিলেন ও নৃত্য কীর্ত্তন হইতে লাগিল।

প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথা শ্রবণ।

নৃসিংহোপাসক প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কথা পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে। ইনি কৃষ্ণচৈতন্যের একজন গৃহস্থ অনুচর। চৈতন্যদেব আদর করিয়া ইহাকে নৃসিংহানন্দ বলিয়া ডাকিতেন। যখন শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশ হইয়া বৃন্দাবনে যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তখন ইনি শ্রীচৈতন্যের দুর্গমপথ-ভ্রমণে ক্লেশ না হয়, এই উদ্দেশ্যে মনে মনে কানায়ের নাটশালা পর্য্যন্ত পথ বাঁধাইয়া দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ ও জলাশয় খনন করিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইনি একদিন চৈতন্যের নিকট যাইয়া কৃষ্ণ-কথা শুনিবার আগ্রহ জানাইলেন। শ্রীচৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন 'তুমি বড় ভাগ্যবান্, যে কৃষ্ণকথায় তোমার রুচি জন্মিয়াছে। কিন্তু আমি ত কৃষ্ণ-কথা জানি না। তুমি রামানন্দ রায়ের নিকট যাও; তিনি কৃষ্ণ-কথা বলিয়া তোমাকে সুখী করিবেন। পূর্ব্বে আমাকে কৃপা করিয়া তিনি অনেক তত্ত্ব বলিয়াছিলেন।'

মিশ্র রামানন্দ-ভবনে আসিলেন। ভৃত্য তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া

কিছু কাল অপেক্ষা করিতে বলিল। মিশ্র জিজ্ঞাসা করিলেন 'রায় কি করিতেছেন?' ভৃত্য উত্তর করিল 'মহারাজ সম্প্রতি যে নাটক রচনা করিয়াছেন; দুইটী পরমা সুন্দরী ও নৃত্যগীতে নিপুণা যুবতী দেবদাসীকে তাহার অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন। আপনি বসুন্: তিনি এখনই আসিবেন।'

যে বাড়ীতে রামানন্দ রায় তৎকালে বাস করিতেছিলেন, তাহা একটী সুশোভন উদ্যান বাটিকা। আবার মিশ্র যে স্থানে বসিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেখান হইতে রায় যে স্থানে রমণীদ্বয়কে শিক্ষা দিতেছিলেন, তাহা দেখা যায়। মিশ্র দেখিতে লাগিলেন, রাম রায় প্রথমতঃ স্বহস্তে দেব-দাসী দুইটীর অভ্যঙ্গাদি মর্দ্দন, গাত্র মার্জ্জন করিয়া, স্নান করাইয়া পরে গন্ধ বিলেপন ও মাল্য এবং সুশোভন বস্ত্র অলঙ্কার পরাইলেন এবং স্বরচিত গীতগুলি অভ্যাস করাইয়া তাহার প্রকৃত অভিনয় করিয়া শিখাইতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে যেমন করিয়া নাচিতে হইবে, যেখানে সাত্ত্বিকী, সঞ্চারী বা স্থায়ীভাবের অভিনয় দেখাইতে হইবে, নিজে নাচিয়া, গাইয়া, নানা ভাবাভিনয় করিয়া, ও হাতে ধরিয়া তালে তালে নাচাইয়া, যুবতীদ্বয়কে দেখাইয়া দিলেন। অবশেষে তাহাদের নানা প্রকার সুখাদ্য খাওয়াইয়া নিভৃতে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া বাহিরে আসিলেন এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে অত বেলা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অতি বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া বলিলেন 'আপনি যে আসিয়া বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহা আমাকে কেহ বলে নাই; আপনার চরণে আমার বড় অপরাধ হইয়াছে। আজ্ঞা করুন, কি উদ্দেশ্যে পদধূলি দিয়া আমার গৃহ পবিত্র করিলেন।' মিশ্র থতমত খাইয়া উত্তর করিলেন 'আপনার দর্শনে পবিত্র হইব বলিয়া আসিয়াছিলাম; তা' বেলা অধিক হইয়াছে, অনুমতি করুন, এখন বিদায় হই।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বায়ংকালে গৌরাঙ্গ-সভায় আসিলে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হে মিশ্র! রাম রায়ের নিকট কেমন কৃষ্ণ-কথা শুনিলে?'

মিশ্র একটু দুঃখিতভাবে উত্তর করিলেন 'আজ্ঞে সে সৌভাগ্য ঘটনা হয় নাই।' শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসিলেন 'কেন?' মিশ্র আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিবৃত করিলে চৈতন্যদেব বলিলেন 'ইহাতে কি তোমার রামানন্দের প্রতি অশ্রদ্ধা হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে তুমি মহা অপরাধী। রাম রায়ের ন্যায় নির্ব্বিকার ভক্ত আর কে আছে? তরুণী-স্পর্শে কে স্থির থাকিতে পারে?

'আমাকে ত তোমরা সন্ন্যাসী দেখিতেছ? স্পর্শ দূরে থাকুক, যুবতীদর্শনেও আমার মনে বিকার সমুপস্থিত হয়। কিন্তু রাম রায় অতি আশ্চর্য্য লোক! তাঁহার দেহ মন যেন কাষ্ঠ-পাষাণে নির্ম্মিত। দেবদাসীর ত কথাই নাই, দিব্যাঙ্গনা অপ্সরীরাও তাঁহার মন টলাইতে পারে, এমন সাধ্য নাই। তুমি যে যুবতীদের সেবা করিতে দেখিয়াছ, তাহার নিগূঢ় কথা শুনিবে? রামানন্দ আপনাকে সেবক ও তাহাদের সেব্য ভাবিয়া কৃষ্ণ-সেবার ন্যায় সেবা করিয়া থাকেন। এই যে অত্যুচ্চ অধিকার, তাহা কেবল তাঁহারই আছে। তাইতে বলি তাঁহার দেহ-মন অপ্রাকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতে শুনিয়াছি, ভগবান্ অচ্যুতের ব্রজবধূগণ সহ ক্রীড়া যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করেন, তিনি অচিরে হৃদয়ের রোগরূপ কামকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আমার মনে হয়, রামানন্দই যথার্থ এ কথার উদাহরণস্থল। তোমরা জান না, রায়ের ভজন রাগানুগা-মার্গে। তাঁহার দেহ ও মন সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।'

শ্রীচৈতন্য ভক্তগুণ ব্যাখ্যা করিয়া ক্ষণকাল নীরব হইলে সভাসদ্ ভক্তবৃন্দ আশ্চর্য্য হইলেন এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্র স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া তাহা মোচনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন 'তুমি শীঘ্র রামরায়ের নিকট পুনরায় যাও, নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং আমার নাম করিয়া বলিও যে আমি তোমাকে তাঁহার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে পাঠাইয়াছি।'

পরদিন প্রাতে প্রদ্যুম্ন মিশ্র রামানন্দের বাটীতে যাইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে রাম রায় হাসিয়া উত্তর করিলেন 'শ্রীচৈতন্যের চতুরালি আপনি কি বুঝিতে পারেন নাই? আমি কৃষ্ণ-কথার কি জানি? তিনি হৃদয়ে বসিয়া যে প্রেরণা দেন, তাহাই বলিয়া থাকি মাত্র। যাহা হউক, আজ্ঞা করুন, এখন কি কথা বলিব?'

মিশ্র উত্তর করিলেন 'পূর্ব্বে বিদ্যানগরে মহাপ্রভুর নিকট যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলুন। আমি মূর্খ, প্রশ্ন করিতে জানি না। আপনিই প্রশ্ন উঠাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়া শুনান্।' তখন রামানন্দ রায় ইষ্টদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব, ভাব, মহাভাব, প্রেমতত্ত্ব, ও বিবর্ত্ত-বিলাস প্রভৃতি নানা কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে তিনি ভাবাবেগে উন্মত্ত প্রায় হইলেন, বাহ্য স্মৃতি লোপ হইল। তাঁহার স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া

প্রদ্যুম্ন মিশ্র অবাক্ হইয়া গেলেন ও স্বীয় অপরাধের জন্য কতই অনুতাপ করিতে লাগিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহর হইল, তথাচ বক্তা ও শ্রোতা আত্মহারা হইয়া কৃষ্ণকথা-সুধাসাগরে ডুবিয়া আছেন। ভৃত্য আসিয়া উভয়কে না জানাইলে হয় তো সে রাত্রিও কাটিয়া যাইত। যাহা হউক দিনশেষে প্রদ্যুম্নমিশ্র বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং সন্ধ্যার পর গৌরাঙ্গ-সভায় যাইয়া সকল কথা জানাইলেন।

গৌর বলিলেন 'তবে কৃষ্ণ-কথা শুনিয়া খুব সুখী হইয়াছ, কেমন?' মিশ্র উত্তর করিলেন 'আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তোমার কৃপায় কৃষ্ণ-কথামৃতসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। রামানন্দ রায় মানুষ নহেন, মনুষ্য দেহে সাক্ষাৎ কৃষ্ণভক্তি-রসময়। রায় আর এক কথা আমাকে বলিয়াছেন, যে তুমি না বলাইলে তিনি বলিতে পারেন না? এ কি সত্য কথা?'

গৌর হাসিয়া উত্তর করিলেন 'রামানন্দের বিনয় তুমি বুঝিতে পার নাই? তিনি নাকি অতি বিনীত ব্যক্তি; তাই নিজের কথা পরের মাথায় চাপাইয়াছেন। মহানুভব ব্যক্তিগণ নিজের গুণ কখনই স্বীকার করেন না।' মিশ্র বলিলেন 'যাহা হউক, আমি কৃতার্থ হইলাম। তুমিই আমাকে এ হেন অমৃত পান করাইলে। আমি চিরদিনের জন্য তোমার চরণে আত্ম-বিক্রয় করিলাম।'

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন এইরূপ ঘটনায় শ্রীচৈতন্যের নিগূঢ় মনের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তৎকালে সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ অতিশয় গর্ব্বিত ছিলেন। প্রাণান্তেও তাঁহারা নীচ ও শূদ্রজাতির নিকটে ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের কথা প্রকাশ করিতেন না। তাঁহারা এই মত ভাব প্রকাশ করিতেন, যেন নীচ ও শূদ্রজাতীয়গণ অশেষ গুণান্বিত হইলেও ধর্ম্মের মধুর রসের অধিকারী নয়। এ সকল যে কেবল ধর্ম্মের ব্যবসায় চালাইবার নিমিত্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্যদেব তাঁহাদের এই গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য নীচ শূদ্র বংশোদ্ভব রামানন্দ রায়কে ভক্তিতত্ত্বের আচার্য্যপদে বরণ করিয়া নিজে তাঁহার নিকট শিক্ষা করিলেন ও সুব্রাহ্মণ প্রদ্যুম্নমিশ্রকে শুনিতে উপদেশ দিলেন। যবনকুলোদ্ভব হরিদাস দ্বারা হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন এবং যবন-ভাবাপন্ন রূপ ও সনাতনের দ্বারা ব্রজ-প্রেমলীলা ও ভক্তি-সিদ্ধান্ত লেখাইয়া ব্যাখ্যা করাইলেন। এ সব বৃত্তান্ত গৌর-চরিত্রের সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।



বিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীসনাতন সঙ্গোৎসব।

শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচল হইতে গৌড়দেশে নিজ বাসগ্রামে গমন করিলেন। সেখানে সঞ্চিত অর্থ কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ, ও দেবালয়ে বিভাগ করিয়া দিতে, গৌড়নগরে ভ্রাতৃদ্বয়ের যে বিষয়-বৈভব ছিল, তাহা আনাইয়া বণ্টন করিতে ও অন্যান্য বিষয় কর্ম্মের সুবন্দোবস্ত করিতে, তাঁহার এক বৎসর কাটিয়া গেল। সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর দর্শনাশয়ে মথুরা হইতে ঝারিখণ্ড পথ দিয়া নীলাচলে আসিলেন। ঝারিখণ্ডের দূষিত জলে সনাতনের অঙ্গে চর্ম্মরোগ জন্মিল এবং ক্ষত হইয়া তাহা দিয়া অনবরত রস রক্ত পুঁজ পড়িতে লাগিল। দুর্গন্ধে মানুষ তাঁহার কাছে যাইতে পারে না। সনাতন শারীরিক যন্ত্রণায় অস্থির-মতি হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন 'মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া ও চন্দ্রমুখ দেখিয়া জগন্নাথের রথের চাকায় দেহ-পাত করিয়া জীবনান্ত করিব।' নীলাচলে আসিয়া অনুসন্ধানে তিনি হরিদাসের বাসায় উপনীত হইলেন এবং হরিদাসকে প্রণাম বন্দনা করিয়া শ্রীচৈতন্যের আগমন প্রতীক্ষায় থাকিলেন। ক্ষণকাল পরে চৈতন্যদেব উপলভোগ দেখিয়া সপার্ষদে হরিদাসের বাসায় আসিলে হরিদাস ও সনাতন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। চৈতন্যদেব সনাতনকে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন। সনাতন দূরে পলাইয়া গিয়া বলিলেন 'আমাকে ছুঁইও না, তোমার চরণে মিনতি করি। একে নীচ জাতি, তাহাতে আবার সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধময় রস পড়িতেছে।' শ্রীচৈতন্য সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার অঙ্গে সনাতনের পুঁজ রক্ত রস প্রচুর পরিমাণে লাগিল। সনাতন লজ্জিত হইয়া পিঁড়ার নিচে বসিলেন। গৌর উপস্থিত ভক্তগণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করিয়া দিয়া কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সনাতন উত্তর দিলেন 'যখন শ্রীচরণ দেখিলাম, তখন সকলই মঙ্গল।' গৌর মথুরা বাসী বৈষ্ণবদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন 'রূপ এখানে দশ মাস ছিলেন, আজ দশদিন মাত্র তিনি চলিয়া গিয়াছেন। অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তির সংবাদ কি শুনিয়াছ? তাঁহার রামচন্দ্রে সুদৃঢ় ভক্তি ছিল।'

সনাতন ভ্রাতৃ-বিয়োগের সংবাদে শোকার্ত্ত হইলেন এবং কনিষ্ঠের গু

স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন 'বল্লভ শিশুকাল হইতে রামোপাসক ছিলেন; নিরবধি রামনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে ও রামচন্দ্র-ধ্যানে সময় অতিবাহিত করিতেন। আমি ও রূপ কোন সময়ে তাঁহার মন পরীক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে লওয়াইয়াছিলাম। আমাদের খাতিরে তিনি কৃষ্ণমন্ত্র লইয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত রজনী "রঘুনাথের চরণ আমি কেমন করিয়া ছাড়িব?" বলিয়া কাঁদিয়া প্রাতঃকালে আমাকে কহিলেন "আপনাদের খাতিরে আমি কৃষ্ণ-ভজন লইয়াছি বটে, কিন্তু রামচন্দ্রের চরণে যে আমার মাথা বিক্রীত হইয়া রহিয়াছে; তাহা কেমন করিয়া টানিয়া আনিব? রামচন্দ্রকে ছাড়িব মনে হইলেও, যে প্রাণ ফাটিয়া যায়!' তখন আমরা তাঁহার ভক্তির প্রশংসা করিয়া স্বীয় সাধন পথে অবিচলিত থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলাম।"

গৌর বলিলেন 'আমিও মুরারি গুপ্তকে পূর্ব্বে এমনি করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। সেই ভক্তই ধন্য, যে আপনার প্রভুকে না ছাড়ে; আর সেই প্রভুই প্রভু, যিনি স্বভক্ত অন্য স্থানে যাইলেও, ফিরাইয়া আনিয়া চরণে স্থান দেন।'

তৎপরে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে হরিদাসের সহিত কৃষ্ণনামাস্বাদন ও কৃষ্ণ-ভক্তিরস পান করিতে উপদেশ দিয়া উঠিয়া গেলেন এবং গোবিন্দ দ্বারা উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আর প্রত্যহ আসিয়া উভয়ের সঙ্গে কৃষ্ণকথালাপে অনেক সময় যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন গৌরচন্দ্র আসিয়া হঠাৎ সনাতনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'শুন সনাতন! দেহত্যাগে কখন কৃষ্ণধন লাভ হয় না। যদি হইত, তবে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি কোটিবার দেহ ছাড়িতে পারিতাম। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় একমাত্র ভক্তি। ভক্তিতে প্রেম জন্মে; তবে শ্রীকৃষ্ণ কি পদার্থ, জানা যায়। দেহত্যাগাদি তামসিক ধর্ম্ম। তামসিক ও রাজসিক ধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন অসম্ভব। সত্য বটে গাঢ় অনুরাগী ভক্তের বিচ্ছেদ ঘটিলে মরিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু আমি বলি সেও তামসিক ধর্ম্ম। অতএব কুবুদ্ধি ছাড়িয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনে মনোনিবেশ কর; অচিরাৎ প্রেমধন লাভ হইবে। নীচ জাতি হইলেই যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য ও সৎ-কুলবিপ্র যোগ্য, কদাচ তাহা মনে স্থান দিও না। সকল জাতি, ছোট বড়, তাঁহার ভজনে সমান অধিকারী। আর যে ভজে, সেই বড়। যে তাঁহাতে বিমুখ, সে উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব হইলেও অতি নীচ। শুন নাই কি? যে অকিঞ্চন দীন, তাহাকেই তাঁহার বড় দয়া।'

স্বীয় নিগূঢ় মানসিক সঙ্কল্প কেমন করিয়া প্রভু জানিতে পারিলেন ? মনে করিয়া সনাতন গোঁসাই অতীব বিস্মিত হইলেন; এবং গৌরের চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন 'বুঝিলাম তুমি সর্ব্বজ্ঞ। নইলে আমার মনের কথা জানিলে কেমন করিয়া ? আর তুমি পরম কৃপালু, নইলে আমার ন্যায় নির্ঘৃণ অন্ত্যজ পাপীর জীবন রক্ষার জন্য এত আগ্রহ করিতেছ কেন ? তা' বুঝিলাম, আমি কেবল কাষ্ঠ পুত্তলিকা। তুমি যেমন নাচাইবে, আমাকে তেমনি নাচিতে হইবে। তবে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে বাঁচাইলে তোমার লাভ কি ?'

শ্রীচৈতন্য ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন 'মনে নাই, তুমি যে আমাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ ? তোমার দেহ যে এখন আমার সম্পত্তি। নিজ সম্পত্তি রক্ষার যত্ন কে না করে ? আর তোমারই বা এ কোন্ ধর্ম্ম, যে তুমি পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাও ? তোমার শরীরে আমি কি করিব ? শুন। কি করিব ? তোমার দেহ দ্বারা আমাকে বহু প্রয়োজন সাধিতে হইবে। ভক্তি-তত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, বৈষ্ণবাচার, বৈষ্ণবকৃত্য, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৈরাগ্য-শিক্ষা, এতগুলি বিষয় তোমার দেহ দ্বারা আমাকে প্রচার করিতে হইবে। মথুরা বৃন্দাবনে বসিয়া এ সব প্রচার না করিলে হইবে না। কিন্তু আমি মাতৃ-আজ্ঞায় নীলাচলে বাস করিতেছি; নিজে সেখানে থাকিয়া এ সব করিতে অক্ষম। তুমি না করিলে, এ সব কাজ কে করিবে ? যে শরীরে আমি এত গুলি কর্ম্ম সাধন করিব, সে শরীর তুমি ছাড়িতে চাও, এ কি সহ্য হয় ?'

সনাতন বলিলেন 'তোমার চরণে কোটি প্রণাম। কে তোমার মনোভাব বুঝিতে পারে ? যাহাকে যেমন করিয়া নাচাও, সে তেমনি নাচে।'

হরিদাসের দিকে তাকাইয়া গৌর বলিলেন 'শুন হরিদাস! ইনি পরের স্থাপ্যধন বিনাশ করিতে চাহেন। নিষেধ করিও, যেন সেরূপ অন্যায় কাজ না করেন।'

হরিদাস সরলভাবে উত্তর করিলেন 'তুমি কাহার দ্বারা কোন্ কাজ করাইবে, তুমি না জানাইলে কে জানিতে পারে ? ইহাকে যে তুমি এতদূর অঙ্গীকার করিয়াছ, এ কি ইহার কম সৌভাগ্য ?'

ইহার পর শ্রীচৈতন্য মধ্যাহ্ন করিতে চলিয়া গেলে হরিদাস সনাতনকে বলিলেন 'তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। কেন না তোমার শরীরকে প্রভু নিজ সম্পত্তি বলিয়াছেন ও ঐ শরীর দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিবেন।

'হায়! আমার এ দেহ বৃথায় ধরিয়াছিলাম? ভারত ভূমিতে ইহা কোন কাজেই লাগিল না।'

সনাতন বলিলেন 'আপনার তুল্য ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কি আর দ্বিতীয় আছে? এ বিধানে হরিনাম প্রচারই সার ধর্ম্ম। চৈতন্য-প্রভু সেই কার্য্য আপনার দ্বারা করিয়া লইতেছেন। আপনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম কীর্ত্তন করেন ও সকলের সমক্ষে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকেন। আপনার দ্বারা আচার ও প্রচার, দুই কার্য্যই হইতেছে। কেহ বা কোন ধর্ম্ম আচরণ করেন ও কেহ বা প্রচার করিয়া থাকেন। একাধারে আচার-প্রচার অতি কম লোকই করিয়া থাকে। আপনি তাহাই করিতেছেন।'

বৈশাখ মাসে সনাতন নীলাদ্রিতে আসিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠমাসে তাঁহার একটী পরীক্ষা হইয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীচৈতন্য গদাধর পণ্ডিতের আশ্রম যমেশ্বর টোটা নামক অদূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরস্থ স্থানে যাইয়া একদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত গোস্বামীর অনুরোধে তথায় ভোজন করিয়াছিলেন। পুরী হইতে যমেশ্বর টোটায় যাইবার দুইটী পথ। একটী শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার দিয়া, অপরটী সমুদ্র-তীরের বালুকাময় ভূমির উপর দিয়া। প্রথম পথটী খুব সোজা এবং বৃক্ষচ্ছায়ায় সুশীতল। দ্বিতীয়টী বাঁকা ও উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে ছায়াহীন স্থান দিয়া। শ্রীচৈতন্য মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রভু ডাকিয়াছেন, শুনিবামাত্র সনাতন গোস্বামী সমুদ্রতীরের বাঁকা পথে তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া চলিলেন। একে জ্যৈষ্ঠমাসের প্রখর রবি-কিরণে সনাতনের শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল; তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তপ্ত বালুকা-কণায় তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িল। তথাচ তাহা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। প্রভু ডাকিয়াছেন এই আনন্দে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়া চলিলেন। যখন তিনি আশ্রমে উপনীত হইলেন, তখন শ্রীচৈতন্য ভোজনান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। গোবিন্দপ্রদত্ত ভুক্ত-শেষ প্রসাদান্ন খাইয়া সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোন্ পথে আসিলে?'

সনাতন উত্তর করিলেন 'সমুদ্রতীরের পথে।'

শ্রীচৈতন্য। উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্য দিয়া কেমন ক'রে এলে? সিংহ-দ্বারের শীতল পথে এলে না কেন? আহা! তপ্ত বালুকাতে তোমার পায়ে যে ব্রণ হয়েছে।

সনাতন। বড় বেশি দুঃখ হয় নাই। পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে, বুঝিতে পারি নাই। সিংহদ্বারের পথে আমি কেমন করিয়া আসিব? আমি যে নীচ জাতি, বিশেষতঃ গা দিয়া রস রক্ত পড়িতেছে। আমার ত সেখানে যাইবার অধিকার নাই। ঠাকুরের সেবকগণ সেখানে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছেন। কি জানি দৈবে কাহাকেও স্পর্শ হইলে, আমার যে সর্ব্বনাশ হইত।

শ্রীচৈতন্য এই উত্তরে খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন 'যদিও তুমি পরম পবিত্র, তোমার স্পর্শে দেবতা ও মুনিগণও পবিত্র হন্; কিন্তু মর্য্যাদা রক্ষা করা সাধুর স্বভাব। মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে লোকে উপহাস করে; ও ইহ-পরলোকে প্রত্যবায় হইয়া থাকে। তোমার ন্যায় ব্যক্তি মর্য্যাদা না রাখিলে, আর কে রাখিবে? আমি ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি।' এই বলিয়া নিষেধ সত্ত্বেও চৈতন্যদেব বার বার সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতনের অঙ্গনিঃসৃত ক্লেদে তাঁহার শরীর পূর্ণ হইয়া গেল।

একদিন জগদানন্দ পণ্ডিত সনাতনের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণকথা-লাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কথা-প্রসঙ্গে সনাতন আপনার মনোদুঃখ পণ্ডিতের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন 'এখানে আসিয়াছিলাম প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া আপন মনোবাঞ্ছা সাধিব বলিয়া। প্রভু তাহা করিতে দিলেন না। আমার গায়ের ক্লেদরস নিত্যই গৌর-অঙ্গে লাগিতেছে। নিষেধ করিলেও তিনি শুনেন না; বল প্রকাশে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। ইহাতে যে আমার অপরাধ হইতেছে, তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব? বিশেষতঃ জগন্নাথ-দর্শনে আসিলাম, তাহাও হইল না। আমি নীচ জাতি, শ্রীমন্দিরে যাইতে আমার অধিকার নাই। নিজের হিতের জন্য এখানে আসিলাম, এখন দেখিতেছি সব বিপরীত হইল। কি করিলে ভাল হয়, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'

জগদানন্দ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন 'তুমি রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে যাও। সেই তোমার যোগ্যস্থান, কেননা প্রভু তোমাকে সেখানে থাকিয়া ভক্তি-প্রচার করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।'

সনাতন বলিলেন 'বেশ বলিয়াছ, আমি তাহাই করিব।' জগদানন্দ উঠিয়া গেলে ক্ষণকাল পরে গৌর আসিয়া দর্শন দিলেন। হরিদাস প্রণাম বন্দনা করিলেন। সনাতন দূরে থাকিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে শ্রীচৈতন্য

তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। সনাতন পলাইতে লাগিলেন। গৌর বলে ধরিয়া তাঁহাকে কোল দিলে, সনাতন নির্ব্বিণ্ণ হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন 'হিতের জন্য এসে দেখ্‌ছি সব বিপরীত হইল। কোথায় তোমার সেবা করিব ? না নিত্য নিত্য অপরাধ সঞ্চয় করিতেছি। একে আমি নীচ জাতি, দুষ্ট পাপাশয়, কোন মতেই তোমার স্পর্শ যোগ্য নই ; তা'তে আমার শরীর দিয়া দুর্গন্ধ রস রক্ত পুঁজ পড়িতেছে ; তুমি বল করিয়া আলিঙ্গন কর, সে সব তোমার অঙ্গে লাগে। আমার যে তাহাতে কত অকল্যাণ হইতেছে, তাহার সীমা নাই। সেজন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি রথ দেখিয়া বৃন্দাবনে যাইব। তুমি প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি কর। জগদানন্দ পণ্ডিতকে আমি এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনিও আমাকে এই উপদেশ দিয়াছেন।'

শ্রীচৈতন্য এই কথা শুনিয়া জগদানন্দের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন 'কাল্‌কের প'ড়ো হয়ে জগা এমনি গর্ব্বিত হয়েছে যে, তোমাকে উপদেশ দিতে সাহসী হয়েছে। ব্যবহারে ও পরমার্থে তুমি তাহার কেন ? আমারও গুরু তুল্য মান্য ব্যক্তি। সে ছোঁড়ার এত বড় সাহস, যে তোমার সঙ্গে মুখ তু'লে কথা কয় ?'

সনাতন এবারে সুযোগ পাইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন :—'যা' হোক আজ জগদানন্দের সৌভাগ্য ও আমার দুর্ভাগ্য জানিতে পারিলাম। জগদানন্দের ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কে আছে ? তাহাকে তিরস্কার করিয়া আত্মীয়তা-সুধারস পান করাইলে ও আমাকে গৌরব-স্তুতি ক'রে নিম-নিষিন্দা তিক্তরস দিলে। হায় ! আজিও আমি তোমার আত্মীয় হইতে পারিলাম না।'

গৌরচন্দ্র মনে মনে খুব লজ্জিত হইয়া প্রকাশ্যে বলিতে লাগিলেন 'জগদানন্দ কিছু আমার তোমা হইতে প্রিয় নয়। তুমি মনে করিতেছ, তোমাকে বহিরঙ্গ জ্ঞানে আমি স্তুতি করিতেছি ও জগদানন্দকে অন্তরঙ্গজ্ঞানে তিরস্কার করিলাম। বাস্তবিক তাহা নহে। আমি মর্য্যাদা-লঙ্ঘন কখনই সইতে পারি না। তুমি মহা বিজ্ঞ, পণ্ডিত ও গুণশালী ব্যক্তি। আমিও তোমার নিকট কত শিখিয়াছি। জগা ত কালিকার ছোঁড়া ; সে তোমাকে বুঝায়, এমন তা'র কি শক্তি ? বিশেষতঃ এক ব্যক্তি অনেক লোককে ভাল বাসিলে সর্ব্বত্রই যে তা'র প্রেমের ব্যবহার এক রকম হইবে, তাহা কে বলিল ? প্রীতির স্বভাবই বৈচিত্রতাময়। পাত্র-বিশেষে নানা ভাবোদয় হওয়াই

'স্বাভাবিক। তোমাতে আমার প্রেম যে ভাবে প্রকাশ হইবে, জগদানে ঠিক্ সেরূপ না হইতে পারে।'

সনাতন কিছু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন 'সে জন্য এত কুণ্ঠিত হইবে কেন?'

গৌর সে কথায় মনোযোগ না করিয়া বলিয়া চলিলেন; 'তুমি তোমা শরীরকে বীভৎস মনে করিতে পার; কিন্তু আমার নিকট উহা অমৃতময় তোমার দেহ প্রাকৃত হইলেও আমার উপেক্ষার সামগ্রী হইত না; কিন্তু উ যে চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহ। অপ্রাকৃতে ত ভদ্রাভদ্র, ভালমন্দ, বিচা সম্ভবে না। আর এক কথা; আমি সন্ন্যাসী, সর্ব্বত্র সম-দর্শন করাই আমা ধর্ম্ম। চন্দন, পঙ্ক, আমার নিকট সমজ্ঞান হওয়া উচিত। এজন্যও আমি তোমার দেহে ঘৃণা করিতে পারি না। করিলে আমার ধর্ম্ম থাকে কই?'

হরিদাস বলিয়া উঠিলেন 'তোমার এ বাহ্য প্রতারণা আমি শুনিতে চাই না। আমার ন্যায় অধমকে স্বীকার করাতেই তোমার দীন-দয়া নাম প্রচার হইয়াছে।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন; 'শুন হরিদাস! সকলই শ্রীকৃষ্ণের লীলা সনাতনকে চর্ম্ম-রোগ দিয়া আমার পরীক্ষা জন্য তিনিই পাঠাইয়া দিয়াছেন ঘৃণা কি করিতে পারি? করিলে যে তাঁ'র ঠাঁই অপরাধী হইতাম।'

হরিদাস উত্তর করিলেন; 'দয়াল! কে তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিবে গলৎকুষ্ঠী কীটদষ্ট বাসুদেবের শরীর আলিঙ্গন করিয়া তুমি কন্দর্পের ন্যা কেন করিয়াছিলে, এ কৃপা তোমার আমরা কি বুঝিতে পারি?'

শ্রীচৈতন্য তখন ভাবপ্রেমে বিভোর হইয়া বলিতে লাগিলেন; 'শুন হরিদাস! শুন সনাতন! তোমাদের ন্যায় আমার হৃদয়বন্ধুদিগের সম্বে আমার মনের ভাব কিরূপ? আমি আপনাকে অতি অমান্য হীন মনে করি। তোমরা আমার সেব্য, আমি তোমাদের সেবক। তোমাদে সেবা করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করি। শিশুর সেবা কা জননীর গায়ে যদি বালকের মল মূত্র লাগে, তা'তে কি মায়ের ঘৃণা হয় বস্তুতঃ সনাতনের রস রক্ত আমার নিকট চন্দনের ন্যায়। প্রথম দিনে আমি তাহাতে চতুঃসোমের গন্ধ পাইয়াছিলাম।'

সনাতন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন 'এমন দয়াল প্রভু আর কোথা পাইব?'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন; 'রথযাত্রার পর তোমার যাওয়া হইবে না। এ বৎসর তুমি আমার নিকটে থাকিবে; আগামী বর্ষে তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইব।' শ্রীচৈতন্য প্রেমাবেগে আবার সনাতনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে তাঁহার কণ্ডুরসা কোথায় চলিয়া গেল? তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গ উজ্জ্বল ও সুঠাম হইল। দেখিয়া উভয়ে চমৎকৃত হইলেন। হরিদাস বিকৃত স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন:— 'বুঝিলাম এ সব তোমারই ভঙ্গী। তুমি ঝারিখণ্ডের দূষিত জল খাওয়াইয়া ইঁহার পরীক্ষার জন্য চর্ম্মরোগ দিয়াছিলে; আবার পরীক্ষান্তে তুমিই তাহা ভাল করিয়া দিলে।'

'সকলই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উঠিয়া মধ্যাহ্ন করিতে গেলেন।

এইরূপে শ্রীসনাতন নীলাচলে হরিদাসের কুটীরে বৎসরাবধি বাস করিতে লাগিলেন। রথযাত্রায় বঙ্গের ভক্তগণ আগমন করিলে শ্রীচৈতন্য সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর, বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর, পুরী, ভারতী, স্বরূপ, সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে-প্রীতি অনুগ্রহ করিলেন।

বর্ষার চারিমাস পরে বঙ্গের ভক্তগণ চলিয়া গেলেন। সনাতন দোলযাত্রা দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সনাতন গোঁসাই একে একে সকল ভক্তের পাদ-বন্দনা করিয়া ও হরিদাসের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন। তৎকালে শ্রীচৈতন্য সনাতনের বিচ্ছেদে আকুল হইয়া পড়িলেন। যাইবার পূর্ব্বে গোস্বামী ভগবান্ আচার্য্যের নিকটে ঝারিখণ্ড-পথে শ্রীচৈতন্য যে যে স্থানে লীলাবিলাস করিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়া লইলেন, এবং পথে যাইতে যাইতে সেই সব গ্রাম, নগর, বন, উপবন, নদী, বৃক্ষ, দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া বৃন্দাবনোদ্দেশে যাইতে লাগিলেন।

সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে আসিবার কিছুদিন পরে রূপ গোঁসাই বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া মিলিত হইলেন। তখন দুই ভ্রাতা শ্রীচৈতন্যের আদেশ মত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহার পর অনুপমের পুত্র ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীও নিত্যানন্দাদেশে তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া

মিলিত হইলেন এবং পিতৃব্য-ভ্রাতষ্পুত্র তিন জনে নানা গ্রন্থ প্রণয়ন, ভ
ও প্রেম প্রচার দ্বারা শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বিধান পূর্ণ করিতে কৃতস
হইলেন।

গোস্বামীগণ যে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ না কর
এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিতে পারিলাম না। সনাতন গোস্বামী চারিখা
বৃহৎগ্রন্থ লিখিয়া যান। সটীক ভাগবতামৃত, খণ্ডদ্বয়। বৈষ্ণবাচার
স্মৃতিসংহিতা হরিভক্তি-বিলাস ও তাহার দিক্ প্রদর্শিনী নাম্নী টীকা।
গ্রন্থ সনাতন গোস্বামী গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নামে প্রচার করে
সুতরাং হরিভক্তি-বিলাস এখন গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত ব
প্রকাশিত। ভাগবতের দশমস্কন্ধের বৈষ্ণব-তোষণী নামে টীপ্পনী। ইহা
লীলাস্তবও বলে। বৈষ্ণব-তোষণী রচনা করিয়া সনাতন শ্রীজীব
সংশোধন করিতে দিয়াছিলেন। শ্রীজীব লঘু তোষণী নামে তাহ
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী ষোলখানি গ্রন্থ লিখিয়া ভক্তি প্রচার করিয়াছিলে
হংসদূত কাব্য, উদ্ধব সন্দেস, কৃষ্ণজন্মতিথি-বিধান, গণোদ্দেশদীপিকা, বৃ
ও লঘু; স্তবমালা, ললিতমাধব ও বিদগ্ধ মাধব নাটক এবং দানকে
কৌমুদী ভাণিকা, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি রসগ্রন্থ, প্রযুক্তাখ
চন্দ্রিকা, মথুরা মহিমা, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা এবং লঘুভাগবতামৃত।

শ্রীজীব গোস্বামী পঁচিশখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। হরিনামা
ব্যাকরণ, সূত্র-মালিকা, ধাতু সংগ্রহ, কৃষ্ণার্চ্চা-দীপিকা, গোপাল-বির
বলী, রসামৃতশেষ, মাধব-মহোৎসব, সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষ, ভাবার্থ-সূচকচ
গোপালতাপনীও ব্রহ্ম সংহিতার টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলম
টীকা, যোগসারস্তবের টীকা, অগ্নিপুরাণীয় গায়ত্রী-বিবৃতি, পদ্মপুরাণে
শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, গোপালচম্পূ, এবং সপ্ত সন্দর্ভ, অর্থাৎ তত্ত্ব-ভগবৎ-পরম
কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি ষট্ সন্দর্ভ ও ক্রম সন্দর্ভ।



একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথদাস-মিলন।

সপ্তগ্রাম প্রদেশে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামক দুই সহোদর সৎ-কায়স্থ-কুলোদ্ভব, বারলক্ষ মুদ্রা সদরজমার জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের বিষয় এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। ইঁহারা উভয় ভ্রাতা অতি-বদান্য, সদাচারী, বিনয়ী ও ধার্ম্মিক। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ সজ্জন তাঁহাদের অন্নে প্রতিপালিত। কাহাকেও অর্থ, কাহাকেও ভূমি দান দিয়া রক্ষা করা তাঁহাদিগের নিত্য ব্রতের মধ্যে ছিল। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও জগন্নাথ মিশ্রের তাঁহারা অনুগত ছিলেন। চক্রবর্ত্তী তাঁহাদিগকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাঁহারা অপরিচিত ছিলেন না। জ্যেষ্ঠ হিরণ্য দাস অপুত্রক। কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের এক মাত্র পুত্র রঘুনাথ দাস। গৌড়াধিপের নিকট এই প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী মজুমদার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের অদূরে চাঁদপুর গ্রামে মজুমদারদিগের পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের বাস। শৈশবকালে বালক রঘুনাথ পাঠার্থে বলরামের গৃহে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে রামচন্দ্র খানের দুর্ব্ব্যবহারে ভক্ত হরিদাস বেণাপোল হইতে তাড়িত হইয়া এই বলরাম আচার্য্যের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এই খানে রঘুনাথের তরুণ হৃদয়ে হরিদাসের ভক্তিভাব চিরমুদ্রিত হইয়া যায়। সাধুসঙ্গের এমনি গুণ যে বালক হরিদাসের নিকট নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়া, হরিনাম ও হরি-ভক্তির একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

রঘুনাথের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বৈরাগ্য ও ভক্তি শুক্লপক্ষের শশীকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। অতুল ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া ও অশেষ ভোগবিলাসে পরিবৃত থাকিয়াও ধন ও বিলাসকে তাঁহার বিষের ন্যায় ভয়াবহ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক হইলেও বিষয়াসক্ত-চিত্ত। তাঁহাদের ধর্ম্মের আদর্শ রঘুনাথের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। বৈরাগ্য কাহাকে বলে, তাঁহারা জানিতেন না এবং ভোগাসক্তি ও ধনসম্পদের সহিত সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করাকেই তাঁহারা পরম পুরুষার্থ মনে করিতেন। সুতরাং রঘুনাথের বাল্য-

বৈরাগ্য ও বিষয়ে ঔদাসীন্য তাঁহাদের ভাল লাগিবে কেন? তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের জন্য বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং কেমন করি তাঁহার হাতে গলায় শৃঙ্খল দিয়া সংসার-বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিবেন, তাহা উপায় উদ্ভাবনে কৃতসংকল্প হইলেন। সকলে পরামর্শ আঁটিয়া এক পরম সুন্দরী কন্যার সহিত রঘুর বিবাহ দিলেন এবং অশেষ ভোগবিলাস ভৃত্য পরিচারকে পুত্রকে এমন ভাবে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন, যাহা তিনি বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম চিন্তা করিতে অবসর না পান। নৃত্যগীত, আমো প্রমোদ, নর্ত্তকী, ভাঁড়, পান, ভোজন, প্রভৃতি কোন আয়োজনেরই ক্র রইল না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রঘুনাথ এ সকলের পা ফিরেও তাকাইলেন না।

কোন ঔষধই ধরিল না। দিন দিন রঘুনাথের হৃদয়ে বৈরাগ্যান প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সর্ব্বদা মনে হা হুতাস, ভোগবিলা বিষদৃষ্টি, বিষাদ-দৈন্য তাঁহার কোমল হৃদয়কে অধিকার করিল। অন প্রাণ ছুটিয়া চলিল; সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন তাঁহাকে আটকাইবে কে করিয়া? 'কি যেন চাই, পাই না; তাহা না পে'লেও প্রাণ বাঁচে না; কো যাইব? কি করিব? কি করিলে শান্তি পাইব?' এ সব চিন্তায় তিনি ব্যাকু হইয়া উঠিলেন। শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে, কার্য্যে, কিছুতেই পাইতেন না। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পিতা মাতা, পিতৃব্য, আত্মী স্বজন, সকলেরই মনে ভীতি-সঞ্চার হইল এবং পাছে বংশধর পুত্র বা হইয়া চলিয়া যান, এই ভয়ে পিতা তাঁহাকে এক প্রকার অবরুদ্ধ ক রাখিতে বাধ্য হইলেন। প্রহরীগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। ভ ভাল বৈদ্য দ্বারা রঘুনাথের রোগ পরীক্ষা করান হইল। কবিরাজগণ ব লেন তাঁহার বায়ুরোগ জন্মিয়াছে; তিনি বিকৃতমনা হইয়াছেন। সুত তাঁহার নানারূপ চিকিৎসা হইতে লাগিল। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যা গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে আসিলে রঘুনাথ কোন সুযোগে যাইয়া তাঁ পদ বন্দনা করিলেন। রঘুনাথের পিতা-পিতৃব্য অদ্বৈতাচার্য্যের প্রিয় ছিলেন। আচার্য্য রঘুনাথের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশিয়া চৈত সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন এবং তাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ দিয়া পরি করিলেন। চারি পাঁচ দিন রঘুনাথ চৈতন্য সকাশে থাকিয়া তাঁহার কৃ উপদেশ লাভ করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

চৈতন্যচন্দ্রের তৎকালের বৈরাগ্য ও ভক্তির আবেগ দেখিয়া এবং ভক্ত-দলের উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন শুনিয়া রঘুনাথের বৈরাগ্য-প্রবণ হৃদয় একেবারে দুর্নিবার হইয়া উঠিল। তিনি প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে পাগল হইয়া নীলাচলে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিতা লোকজন দিয়া বারম্বার তাঁহাকে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া স্বতন্ত্র গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বলিষ্ঠ পাইকগণ দ্বাররক্ষা করিতে লাগিল এবং দুইটী ভৃত্য ও দুইটী ব্রাহ্মণ নিয়ত তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইল। তিনি নীলাচলে যাইতে না পাইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বন্দীর ন্যায় পিতৃগৃহে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এক বৎসরের অধিককাল কাটিয়া গেলে রঘুনাথ দাস একদিন শুনিতে পাই-লেন শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশে রামকেলি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শান্তিপুরে আচার্য্য-গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার প্রাণধন শ্রীগৌরাঙ্গ এত নিকটে আছেন শুনিয়া, হৃদয়ে দর্শন-লালসা অতীব বলবতী হইল; এবং নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া তিনি পিতৃসমীপে আপন মনোগত ভাব জানাইলেন যে চৈতন্য-চরণ দর্শন বিনা তিনি বাঁচিবেন না। বরং গৌরকে দেখিয়া আসিলে ও শ্রীমুখের কথা শুনিলে তাঁহার চিত্ত-বৈকল্য উপশম হইবে ও তিনি সুস্থ হইয়া সংসারে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবেন। কর্ত্তৃপক্ষ পুত্রের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বহু লোকজন ও অনেক দ্রব্য-সামগ্রী উপঢৌকন দিয়া পুত্রকে চৈতন্য-দর্শনে পাঠাইয়া দিলেন। যখন অদ্বৈত-ভবনে মাধবেন্দ্র পুরীর তিথি-আরা-ধনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে; সেই সময়ে ধনীর পুত্র রঘুনাথ বিচিত্র দোলায় আরোহণ করিয়া বহু লোক সমভিব্যাহারে আসিয়া উপনীত হইলেন। এবং অদ্বৈতাচার্য্যের চরণ বন্দনা করিয়া শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। সাতদিন পর্য্যন্ত রঘুনাথ শান্তিপুরে গৌর-সহবাসে থাকিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদাই এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন 'রক্ষকদিগের হাত হইতে আমি কিসে পরিত্রাণ পাইব ও কেমন করিয়া প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাইব?' শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন :—'পাগলামি করিও না; সুস্থির হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন কর। একেবারেই কিছু ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। বাহিরের মর্কট বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে বৈরাগ্য রক্ষা কর, চিত্ত শুদ্ধ কর এবং অনাসক্ত চিত্তে যথাযোগ্য বিষয় উপভোগ কর। বাহিরের

'লৌকিক ব্যবহার সমুদায় বজায় রাখিয়া যদি গোপনে অন্তরে অন্তরে ভ
সাধন করিতে পার, তাহা হইলে করুণাময় কৃষ্ণ শীঘ্র তোমাকে বি
হইতে উদ্ধার করিবেন। বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আমি যখন নীলাচ
প্রত্যাগত হইব, তখন কোন সুযোগে তুমি আমার নিকটে যাইও, এ
নয়। সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আপনিই সুযোগ ঘটাইয়া দিবেন। যাহার প্র
তাঁহার কৃপা হয়, তাহাকে কি কেউ আটকাইয়া রাখিতে পারে?' উপদে
লাভ করিয়া রঘুনাথদাস গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শিক্ষানুসা
দুর্দ্দমনীয় বৈরাগ্যকে অন্তরে আবদ্ধ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে বিষয় সেব
মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া পিতা, পিতৃ
খুব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ক্রমে বিষয়-কার্য্যের গুরুভার তাঁহার উপর অ
করিয়া কার্য্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সপ্তগ্রাম প্রদেশের চৌধুরী উপাধি-ধারী জনৈক মুসলম
রাজকর্ম্মচারীর বিষয় সম্পত্তি হিরণ্য দাস কোন সুযোগে ডাকিয়া লইলে
সে ব্যক্তি তাহাতে মজুমদারদিগের ভয়ানক শত্রুপক্ষ হইয়া দাঁড়াই
'হিরণ্যদাস বিশ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া রাজাকে বার লক্ষ বই কর দে
না,' এইরূপ এক কৈফিয়ত রাজসরকারে দাখিল করিয়া সে ব্যক্তি উজীর
সরেজমিনে আনাইল। ইহা শুনিয়া হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন পলাইলেন। মুস
মানগণ রঘুনাথকে বাঁধিয়া ফেলিয়া জ্যেষ্ঠতাত ও পিতাকে হাজীর করিয়া
দিলে প্রাণদণ্ড করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু রঘুনা
সুন্দর চেহারা ও বিনীত আচরণ দেখিয়া বিশেষতঃ হিরণ্যদাস কায়স্থ, কে
বুদ্ধি ফাঁদিয়া কি বিপদ্ ঘটায়, মনে করিয়া মারিতে পারিল না। রঘুনা
সুচতুর বুদ্ধিমান্। মনে মনে চিন্তা করিয়া চৌধুরীকে নিবেদন করিলেন:
'আমার পিতা ও জ্যেঠা আপনার ভাই হন। আপনারা ভাই ভাই ক
কলহ করেন ও কখন প্রীতি-ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখন যেন বি
হইতেছে, আবার কালই সদ্ভাব হইবে। আমি যেমন তাঁহাদের, তে
আপনারও পুত্র। আমি পাল্য, আপনি আমার পালক হইয়া কেন আ
নির্যাতন করিতেছেন? আপনি সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা জিন্দাপীর হইয়া
সুবিচার করিতেছেন না?' বালকের মিনতি শুনিয়া ম্লেচ্ছের দয়ার আ
র্ভাব হইল এবং উজীরকে অনুরোধ করিয়া রঘুনাথের বন্ধন মোচন ক
দিল। আর নিভৃতে লইয়া গিয়া প্রীতিভাবে বলিতে লাগিল 'তো

'জ্যেঠা নির্ব্বোধ; আরে! আটলক্ষ টাকা খাইতেছে; আমি ভাগী, আমাকেও কিছু দিতে হয়। যাও, জ্যেঠাকে ডাকিয়া আনগে। আমি তাঁহাকেই ভার দিলাম, তিনি ইহার যাহা হয়, একটা মীমাংসা করিয়া দিউন।' তখন রঘুনাথ হিরণ্যদাসকে আনিয়া ম্লেচ্ছের সহিত মিলন করিয়া দিলেন। উভয়ে রফা নিষ্পত্তি করিয়া লইলে সব গোলযোগ চুকিয়া গেল।

এইরূপ ভাবে রঘুনাথের এক বৎসর কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসরে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল আগমনের সংবাদ পাইয়া তিনি পলাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার রক্ষকগণ তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল। এইরূপে বার বার তিনি পলাইয়া যান, বার বার ধরা পড়েন। এক দিন তাঁহার মাতা গোবর্দ্ধন দাসকে বলিলেন 'ছেলে পাগল হয়েছে, শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখ।' গোবর্দ্ধন দুঃখিতান্তঃকরণে উত্তর করিলেন 'ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরার ন্যায় স্ত্রী যাহাকে বাঁধিতে পারিল না, সামান্য দড়ির বাঁধনে তাহাকে কয় দিন রাখিবে? যার যাহা প্রারব্ধ, তাহা কেহ খণ্ডাইতে পারে না। রঘুনাথকে চৈতন্যচন্দ্র পাগল করিয়াছেন। কাহার সাধ্য যে তাহাকে আটক করিয়া রাখে?'

এই সময়ে নিত্যানন্দ সদলে পানীহাটী গ্রামে সংকীর্ত্তন প্রচার করিতেছিলেন। রঘুনাথ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পানীহাটীতে আসিলেন; এবং গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। নিতাই বলিলেন 'আরে চোরা! আসিয়াছিস্? আয়, আজ তোর দণ্ড করিব। আমার এই সঙ্গীগণকে দধি চিড়া খাওয়াইতে হইবে।'

রঘুনাথ দাস আনন্দিত মনে কর্ম্মচারীদিগকে ইঙ্গিত করিলে তখনই তখনই মহা আয়োজন হইতে লাগিল। দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ, কদলী, চিনি, বাতাসা, চিঁড়া, রাশি রাশি আসিয়া উপস্থিত হইল; মৃৎকুণ্ডিকা, কদলীপত্র, ও মালসা, কতশত আসিল। গঙ্গাতীরে পুলিন-ভোজন হইবে জানিতে পারিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণ, সজ্জন, অন্যান্য লোক দলে দলে আসিতে লাগিল। চারিদিক হইতে দোকানি পসারী নানা দ্রব্যের আমদানী করিতে লাগিল। নিত্যানন্দ প্রভু সদলে স্নানাবগাহনান্তে সারি সারি হইয়া চবুতরা উপরে বসিয়া গেলেন। তাঁহার পাশে রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধর দাস, মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস, মহেশ, গৌরী দাস, কৃষ্ণদাস হোড়, ও উদ্ধারণ দত্ত,

প্রভৃতি ভক্তগণ বসিয়া গেলেন। চারিদিকে অগণ্য ব্রাহ্মণ সুজ্জন ও ইত লোক বসিয়া গেল। এক এক জনের সম্মুখে দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা, একটীতে দ চিড়া, অপরটীতে ঘনাবর্ত্ত গরম দুগ্ধে চিড়া, নানা উপকরণে সজ্জিত হইল নিত্যানন্দের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশে দুই মৃৎকুণ্ডিকা সাজান হইল নিত্যানন্দের আদেশে সকলে হরিধ্বনি দিয়া মহানন্দে পুলিন-ভোজন করি লাগিলেন। সকলের ভোজন সমাপ্ত হইলে রঘুনাথ দাস প্রসাদ পাইলেন এবং সেবক দ্বারা তাম্বূল ও মাল্যচন্দন দিয়া সকলের প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন

পানীহাটীগ্রামে রাঘবপণ্ডিতের বাস। সেদিন তাঁহার বাড়ীতে নিত্যানন্দের সদলে ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। রাঘব গঙ্গাতীরে চিড়া দধি মহোৎসব দেখিয়া নিতাইকে বলিতে লাগিলেন 'তুমি এখানে বেশ উৎসব করিতেছ; কিন্তু আমার ঘরে প্রসাদ গুলির কি হইবে?' নিতাই উত্তর করিলেন 'এ বেলা চিঁড়া খাই, ও বেলা তোমার গৃহে ভাত খাইব। তুমি জান, আমি গোয়ালা জাতি, পুলিন ভোজনে আমার বড় সুখ হয়।' সত্য সত্যই ভক্তগণ ভাবে বিভোর হইয়া গঙ্গাকে যমুনা ও পুলিন ভোজনে ব্রজ-রাখালগণ বসিয়াছেন, জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার সময়ে রাঘব-মন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। রঘুনাথ তাহাতে যোগ দিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে বৈষ্ণবগণ প্রসাদ ভোজনে বসিলেন। রাঘবের স্ত্রী দেবতা-লব্ধ বরে অদ্বিতীয়া পাচিকা। কথিত আছে স্বয়ং রাধিকা তাঁহার গৃহে রন্ধন করিতেন। অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন ও পায়স পিঠা বৈষ্ণবগণ আকণ্ঠ পুরিয়া খাইয়া হরি-ধ্বনি দিতে লাগিলেন। কথিত আছে রাঘবের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইয়া অলক্ষ্যেতে প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন। রঘুনাথ অবশেষ পাত্র পাইয়া তথায় রাত্রিযাপন করিলেন।

প্রাতঃস্নানান্তে নিত্যানন্দ সদলে গঙ্গাতীরের বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন। রঘুনাথদাস তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন 'বামন যেমন চন্দ্র ধরিতে সাহসী হয়, আমি পামর জীবাধম হইয়াও চৈতন্য-চরণ পাইতে ইচ্ছা করিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। যতবার পলাইয়া যাই, পিতা ততবার ধরিয়া আনেন। তোমার কৃপাভিন্ন কেহই চৈতন্য পাইতে পারে না। আমার প্রার্থনা অযোগ্য হইলেও তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি অচিরে চৈতন্যচরণে আশ্রয় পাই।'

নিতাই হাসিয়া ভক্তগণ সমক্ষে বলিলেন 'ইঁহার বিষয়সুখ ইন্দ্রের তুল্য হইলেও ইঁহাকে তাহা ভাল লাগে না। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-গন্ধ যে জন পাইয়াছে, ব্রহ্মলোকের সুখ পর্য্যন্ত তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, যেন অচিরে ইঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।' রঘুনাথকে নিকটে ডাকিলে তিনি নিতায়ের চরণ তলে লুণ্ঠিত হইলেন। নিতাই বলিলেন 'অচিরে তোমার বিষয়-বন্ধন মুক্ত হ'বে; তুমি নীলাচলে চৈতন্যচরণে স্থান পাইবে।' ইহার পর রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দের অজ্ঞাতে রাঘবের সহিত পরামর্শ করিয়া ভৃত্যের নিকট একশত মুদ্রা ও সাততোলা স্বর্ণ দিলেন; নিত্যানন্দ-সঙ্গীদিগকে ব্যক্তি বিবেচনায় পঞ্চাশ, দশ, বিশ, পোনর, মুদ্রা দান করিলেন এবং রাঘব পণ্ডিতের জন্য একশত মুদ্রা ও দুই তোলা স্বর্ণ রাখিয়া নিজ গৃহে আগমন করিলেন। সেই হইতে রঘুনাথ দাস আর অভ্যন্তরে গমন করিতেন না; বাহিরে দুর্গামণ্ডপে শুইয়া থাকিতেন। প্রহরীগণ তাঁহার অদূরে থাকিত।

এই সময়ে গৌড়দেশের ভক্তগণ গৌরাঙ্গদর্শনে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। রঘুনাথ শুনিতে পাইয়া একবার মনে করিলেন 'এই সঙ্গে যাত্রা করি; কিন্তু তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে রাজপথ দিয়া যাইতেছেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গ লইলে নিশ্চয়ই ধরা পড়িব' বিবেচনায় সে সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরন্তু দৈব তাঁহার অনুকূল হইয়া আর এক সুযোগ আনিয়া দিল। যদুনন্দন আচার্য্য নামে ব্রাহ্মণ রঘুনাথের গুরু। এ ব্যক্তি নিত্যানন্দ-শিষ্য বাসুদেব দত্তের অনুগৃহীত, ও অদ্বৈতাচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য। অদ্বৈতের আজ্ঞায় ইনি চৈতন্য-চরণে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছেন। রজনী চারিদণ্ড থাকিতে কোন দিন যদুনন্দন দুর্গামণ্ডপের প্রাঙ্গণে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে রঘুনাথ উঠিয়া আসিয়া প্রণাম দণ্ডবং করিলেন। তখন প্রহরীগণ প্রগাঢ় নিদ্রিত। যদুনন্দন বলিলেন তাঁহার কোন শিষ্য-ব্রাহ্মণ তাঁহার বাটীতে ঠাকুর সেবা করিত, কি কারণে কয়েকদিন সেবা ছাড়িয়াছে। তিনি বলিলে সে শুনে না; আর ব্রাহ্মণও পাওয়া যায় না। রঘুনাথ যেন তাহাকে ঠাকুর সেবা করিতে বলিয়া দেন। এই বলিয়া আচার্য্য রঘুকে হাতে ধরিয়া লইয়া সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে রঘুনাথ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন :—'আমার এই সুযোগ। এখন হইল তো হইল; নইলে হওয়া দুষ্কর।' প্রকাশ্যে গুরুকে বলিলেন 'আপনি গৃহে

'গমন করুন্ ও আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি সাধ্যসাধনা করিয়া ব্রাহ্মণকে আপনার নিকটে পাঠাইয়া দিব।' যদুনন্দন কে জানে কি ভাবিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্বগৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। রঘুনাথ উদ্দেশে, চৈতন্যচরণে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বমুখে ছুটিতে লাগিলেন এবং পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন কেহ তাঁহার অনুগমন করিতেছে না। তখন পথ ছাড়িয়া উপপথে ও বনে বনে যাইতে লাগিলেন। একদিনে পঞ্চদশ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া রঘু সন্ধ্যাকালে এক গোয়ালের বাথানে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। গোপ তাঁহাকে উপবাসী জানিয়া কিছু দুগ্ধ পান করিতে দিলে তাহা পান করিয়া রাত্রিতে তথায় পড়িয়া রহিলেন।

প্রাতঃকালে রক্ষকগণ রঘুনাথকে না দেখিয়া ভীত হইল। যদুনন্দন আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন 'ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিব' বলিয়া তিনি বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তখন আর সত্য ছাপা থাকিল না। সকলেই জানিল রঘুনাথ পলাইয়া গিয়াছেন। 'গৌড়ের ভক্তগণ সঙ্গে রঘুনাথ চলিয়া গিয়াছেন' অনুমান করিয়া পিতা তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য দশজন লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং শিবানন্দ সেনকে বিনীত ভাবে পত্র লিখিলেন যেন তিনি তাঁহার পুত্রকে লোকসঙ্গে পাঠাইয়া দেন। ঐ দশ ব্যক্তি ঝাঁকরা পর্য্যন্ত যাইয়া ভক্তদলের নাগাইল পাইল। শিবানন্দ সেন পত্রের উত্তর দিলেন রঘুনাথ তাঁহাদের সঙ্গে নাই। লোক দশজন নিরাশ-মনে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ জানাইল।

এদিকে রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া পূর্ব্বমুখ ছাড়িয়া দক্ষিণ মুখে চলিলেন এবং কুগ্রাম ও কুপথ দিয়া ছত্রভোগে সাগরসঙ্গম পার হইয়া দ্রুতপদে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যাহার প্রাণে কৃষ্ণানুরাগ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার কি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ও কুপথে বাধে? কখন চর্ব্বণ, কখন রন্ধন, ও কখন দুগ্ধমাত্র পান, করিয়া বারদিনে রঘুনাথ দাস সপ্তগ্রাম হইতে পুরুষোত্তমে উপনীত হইলেন। পথে তিনদিন মাত্র তিনি রন্ধন করিয়া খাইয়াছিলেন।

স্বরূপ, মুকুন্দদত্ত, প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীচৈতন্য বাসায় বসিয়া কৃষ্ণ-কথা কহিতেছেন, এমত সময়ে রঘুনাথ প্রাঙ্গণে দূরে থাকিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মুকুন্দদত্ত তাঁহাকে প্রথম দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন 'এই রঘুনাথ আসিয়াছেন!' শ্রীচৈতন্য 'এস' বলিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলে

তিনি চরণ ধরিয়া পড়িয়া রহিলেন এবং স্বরূপাদি ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'সকল অপেক্ষা কৃষ্ণ-কৃপাই বলবতী; নইলে কি তুমি বিষয়-গর্ত্ত হইতে উঠিয়া আসিতে পারিতে?'

রঘুনাথ বলিলেন 'কৃষ্ণকে আমি চিনি না; তোমার কৃপাই আমাকে আনিয়াছে, আমার বিশ্বাস।'

শ্রীচৈতন্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'ওহে রঘুনাথ! চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে তোমার বাপ ও জ্যেঠা আমার আজা হন; আমি তাঁহাদের পরিহাস করিতে পারি। তাঁহারা কিন্তু বিষয়-বিষ্ঠার কীট; বিষয়েই তাঁহাদের সুখ, বিষয়ই তাঁহাদের সারসর্ব্বস্ব। যদিও তাঁহারা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের ভক্ত বটেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলা যায় না। তাঁহারা বিষয়ান্ধ; সুতরাং এমন সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যাহাতে ভব-বন্ধন আরও কশিয়া লাগিয়া যায়। এ হেন বন্ধন হইতে তুমি নিস্কৃতি পাইয়াছ। দেখ দেখি কৃষ্ণ কৃপার মহিমা কত?'

রঘুনাথের মুখ মালিন্য দেখিয়া শ্রীচৈতন্য করুণার্দ্রচিত্তে স্বরূপকে কহিলেন 'আমি রঘুনাথকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। তুমি ইহাকে পুত্র-ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করিয়া শিক্ষা প্রদান কর। আমাদের দলে তিন রঘুনাথ আছেন। আজ হইতে ইনি স্বরূপের রঘু বলিয়া পরিচিত হইবেন।' এই বলিয়া শ্রীহস্তে রঘুনাথের কর ধরিয়া স্বরূপের হাতে সমর্পণ করিলেন।

স্বরূপ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রঘুনাথকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন। গোবিন্দের দিকে চাহিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'পথ-ক্লেশে ইনি অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছেন; দিন কতক তুমি ইহাকে ভাল করিয়া সন্তর্পণে রাখ।' রঘুনাথকে বলিলেন 'তুমি এখন সিন্ধুস্নান করিয়া জগন্নাথ দর্শনান্তে ভোজন বিশ্রাম করগে।'

পাঁচদিন পর্য্যন্ত রঘুনাথ গোবিন্দের নিকট ভোজন ও যত্ন লইয়া ষষ্ঠ দিনে শ্রীচৈতন্যের বাসা হইতে চলিয়া গেলেন এবং রাত্রি দশ দণ্ডের সময় পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া সিংহদ্বারে ভোজনের জন্য দণ্ডায়মান থাকিলেন। পুরীতে এইরূপ নিয়ম আছে যে অযাচবৃত্তি নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ সমস্ত দিন ভজন সাধন করিয়া রাত্রি দশ দণ্ডের সময় সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান হইলে জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহার ভোজ্যান্ন দিয়া থাকেন। রঘুনাথ সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। গোবিন্দ এই কথা শ্রীচৈতন্যকে জানাইলে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া

বলিতে লাগিলেন 'রঘুনাথ বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছে। বৈরাগী কেন পর-মুখাপেক্ষী হইবে? বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন করা ও শাক পত্র ফল মূল, যাহা পাইবে, ভিক্ষা করিয়া উদর ভরণ করা। বৈষ্ণব হইয়া যে জিহ্বার লালসে এখানে সেখানে বেড়াইয়া বেড়ায়, সে শিশ্নোদর পরায়ণের কৃষ্ণলাভ হয় না।'

রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের নিকট মুখ তুলিয়া কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিতেন। একদিন তিনি স্বরূপের দ্বারা শ্রীচৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমার এখন কর্ত্তব্য কি? আপনি শ্রীমুখে উপদেশ করুন্।'

শ্রীচৈতন্য হাসিয়া উত্তর করিলেন 'স্বরূপকে তোমার উপদেষ্টা করিয়া দিয়াছি; তাঁহার নিকটে সাধ্যসাধন তত্ত্ব শিক্ষা কর। তিনি যত জানেন, আমি তত জানি না। তথাচ আমার কথায় যদি তোমার শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে আমি এই বলি যে গ্রাম্য কথা বলিবে না ও শুনিবে না। ভাল খাওয়ার, ভাল পরার, ইচ্ছা পোষণ করিবে না। আপনাকে তৃণাপেক্ষা হীন মনে করিয়া সদা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবে ও ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবা করিবে। আর আর বিশেষ উপদেশ স্বরূপ বলিয়া দিবেন।'

এইরূপে রঘুনাথ দাস স্বরূপের সঙ্গে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবায় সময় যাপন করিতে লাগিলেন। এ দিকে রথযাত্রা নিকটবর্ত্তী হইলে গৌড়ের ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ একে একে তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে অনেক অনুগ্রহ করিলেন। শিবানন্দ সেন রঘুনাথের পিতা রঘুকে ধরিবার জন্য তাঁহার নামে পত্রী দিয়া যেরূপে দশজন লোক ঝাঁকরা পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছিলেন ও তিনি সে পত্রের যে উত্তর লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। গুণ্ডিচা মার্জ্জন, ভক্তগণসঙ্গে বন্য-ভোজন ও রথাগ্রে চৈতন্য-নর্ত্তন, রঘুনাথ সবই দেখিলেন।

চারিমাস পরে ভক্তগণ নীলাদ্রি হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিলে, রঘু-নাথের পিতা পুত্রের সংবাদ জানিবার জন্য শিবানন্দ সেনের নিকট লোক পাঠাইলেন। শিবানন্দ রঘুনাথের কুশল বার্ত্তা জানাইয়া তাঁহার পিতাকে তাঁহার অহর্নিশি নাম সঙ্কীর্ত্তনের কথা, তাঁহার বৈরাগ্যের কথা, কখন উপ-বাস, কখন চর্ব্বণ ও অযাচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাত্রি দশদণ্ডের সময়ে সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকার বৃত্তান্ত, সকলই লিখিয়া পাঠাইলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে যেরূপ স্নেহ করেন, ভক্তগণের তিনি যেরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছেন,

তাহাও লিখিতে ত্রুটি করিলেন না। পত্র পড়িয়া পিতা মাতার প্রাণ ফাটিয়া গেল। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া পুত্রের জন্য চারিশত মুদ্রা, দুইটী ব্রাহ্মণ ও দুইটী ভৃত্য, পাঠাইবার অভিপ্রায়ে শিবানন্দের নিকট প্রেরণ করিলেন। 'লোকগুলি স্বয়ং পক্ষে যাইলে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না, আমরা আগামী বর্ষে যখন যাইব, আমাদের সঙ্গে গেলে লইয়া যাইব' বলিয়া শিবানন্দ সেন লোক ও মুদ্রা গোবর্দ্ধন দাসের নিকট প্রতিপ্রেরণ করিলেন।

পরবর্ষে ভক্তগণ সঙ্গে পিতার প্রেরিত মুদ্রা ও সেবক রঘুনাথের নিকটে পৌঁছিলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তাহারা অনেক যত্ন করিলে পিতার পরিতোষার্থ রঘুনাথ মাসে দুই দিন করিয়া শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। তাহার জন্য চারি পণ কড়ির প্রয়োজন হইত। সেই কড়ি মাত্র পিতার প্রেরিত লোকের নিকটে লইতে লাগিলেন।

দুই বর্ষকাল নিমন্ত্রণ করার পর রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই মাস কাল যখন নিমন্ত্রণ হইল না, তখন একদিন চৈতন্যদেব স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'রঘুনাথ আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ করিল কেন?'

স্বরূপ উত্তর করিলেন 'রঘুনাথ বলিয়াছেন যে বিষয়ীর অর্থে প্রভুকে নিমন্ত্রণ খাওয়ান অবৈধ, বিবেচনায় ছাড়িয়া দিয়াছি। বিষয়ীর অর্থ লইতে আমারও মন প্রসন্ন হয় না, মহাপ্রভুও কেবল আমি দুঃখিত হইব বলিয়াই উপরোধে ভোজন করিয়া থাকেন; সুতরাং এরূপ নিমন্ত্রণ না করাই ভাল। ইহার ফল কেবল লোক-প্রতিষ্ঠা মাত্র।'

শ্রীচৈতন্য হাসিয়া বলিলেন 'বিষয়ীর অন্ন রাজস নিমন্ত্রণ। রাজস-নিমন্ত্রণে দাতা, ভোক্তা, উভয়েরই মন মলিন হয়। মন মলিন হইলে কৃষ্ণস্মৃতি হয় না। এত দিন আমি কেবল রঘুনাথের সঙ্কোচে কিছু বলিতে পারি নাই। তা' ভাল হইল, সে বুঝিতে পারিয়া আপনা হইতে ছাড়িয়া দিয়াছে।'

দিন কতক পরে রঘুনাথ সিংহদ্বারের ভিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্ন-কালে ছত্রে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে লাগিলেন এবং নিরন্তর নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া নিজের ব্যবহারের বস্তু গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জা মালা তাঁহাকে প্রদান করিয়া সেবা করিতে উপদেশ দিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে ঐ শিলা ও গুঞ্জামালা আনিয়া গৌরকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য স্মরণ-সময়ে মালা গাছটী গলায় পরিতেন, এবং শীলা লইয়া হৃদয়ে নেত্রে স্পর্শ করিতেন এবং

নাসায় ঘ্রাণ লইতেন। শিলাকে গৌরচন্দ্র আদর করিয়া কৃষ্ণ-কলেবর বলিতেন। তিন বৎসর ব্যবহারের পর এই শিলা ও মালা রঘুনাথকে দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিতে উপদেশ দিলেন। রঘুনাথ প্রভুর স্বহস্ত-প্রদত্ত মালা শিলা পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন 'শিলা দিয়া প্রভু আমাকে গোবর্দ্ধন আর মালা দিয়া শ্রীরাধিকার চরণ প্রদান করিয়াছেন। আমার ভাগ্যের সীমা নাই।' তদবধি জল তুলসী দিয়া তিনি শিলা ও মালার সেবা করিতে লাগিলেন।

এখন হইতে রঘুনাথের সাধন অতি কঠোর ভাব ধারণ করিলে। অষ্ট-প্রহর দিবা রাত্রির মধ্যে সাড়ে সাত প্রহর তিনি ভজন সাধনে কাটাইতেন, চারিদণ্ড কাল নিদ্রা যাইতেন। ছিন্ন নেকড়া ও কন্থা তাঁহার পরিধান; সুস্বাদরস যুক্ত আহার তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন এবং সাবধানে শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। প্রাণ ধারণের জন্য আহার প্রয়োজন। সেই আহারের এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিলেন। আনন্দ-বাজারে দোকানীদের যে সকল ভাত বিক্রয় হইত না, পচিয়া যাইত; তাহা তাহারা সিংহদ্বারে তৈলঙ্গী গাভীর ভোজনের জন্য ঢালিয়া দিত। তাহার মধ্যে আবার যে গুলি পচিয়া দুর্গন্ধময় হইত, গাইগণ তাহা খাইত না। রঘুনাথ রাত্রিযোগে সেই পচাভাত আনিয়া জল দিয়া ধুইয়া তাহার মধ্য হইতে শক্ত ভাত বাছিয়া বাহির করিয়া লইতেন এবং একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন। এক দিন শ্রীচৈতন্য তাহা দেখিতে পাইয়া এক মুঠা লইয়া খাইয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন 'এমন অমৃত তুমি রোজ রোজ খাও, আমাকে দাও না কেন?' চৈতন্যদেব আর এক গ্রাস লইতে গেলে স্বরূপ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন 'আপনার যোগ্য নয়, আপনি ইহা খাইবেন না।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'আমি সত্য বলিতেছি; এমন সুস্বাদু প্রসাদ আমি কখন খাই নাই। ভক্ত-স্পর্শে কি সকলই অমৃতময় হয়?'

রঘুনাথ দাস শেষ-জীবনে চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষ নামে শ্রীচৈতন্যের গুণানু-কীর্ত্তন করিয়া এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি নিজের উদ্ধার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

'মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।

'উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি।'

'আমি কুজন হইলেও যিনি কৃপা করিয়া মহাসম্পদ্ ও দারা হইতে উদ্ধার করিয়া স্বীয় আত্মীয় স্বরূপের নিকট আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন; যিনি হৃষ্ট হইয়া স্বীয় বক্ষের প্রিয় গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধন শিলা আমাকে দিয়াছিলেন; সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া এখনও আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।'

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন রঘুনাথ দাস স্বরূপ গোস্বামীর সহিত ষোল বৎসর চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সেবা করিয়া মহাপ্রভুর ও স্বরূপের অন্তর্ধানে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। ১৪৫৫ শকে চৈতন্যদেব আত্ম-সঙ্গোপন করেন। তাহা হইতে ১৬ বৎসর বাদ দিলে ১৪৩৯ শকাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের আট বৎসর এবং বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের দুই বৎসর পরে রঘুনাথের বৈরাগ্যের কাল নিরূপিত হয়।

শেষাবস্থায় শ্রীচৈতন্যের ও স্বরূপ গোস্বামীর শোকে অভিভূত হইয়া রঘুনাথ দাস এই সঙ্কল্প করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন যে তথায় রূপ সনাতন দুই ভ্রাতার চরণ বন্দনা করিয়া গোবর্দ্ধন হইতে ভৃগুপাত অর্থাৎ লম্ফ দিয়া পড়িয়া জীবনান্ত করিবেন। কিন্তু রূপ সনাতনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা দুই ভাই রঘুনাথকে ভীষণ সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন, এবং আপনাদের কনিষ্ঠ ভাই করিয়া নিকটে রাখিলেন। তাঁহাদের স্নেহে রঘুনাথ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন না। রূপ ও সনাতন রঘুনাথের নিকট মহাপ্রভুর নিগূঢ় লীলা সকল নিরন্তর শুনিতে লাগিলেন। রঘুনাথ রাধাকুণ্ড তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অতি কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘোলের মাঠা পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং অন্য কথা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। প্রতিদিন এক-সহস্র লোককে প্রণাম করা, এক লক্ষ হরিনাম জপ করা, তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে স্নানকরা, ব্রজবাসীদিগের সম্ভাষণ ও তত্ত্বাবধান করা, দিবা-রাত্রি চিন্তা ও ধ্যান যোগে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবা করা এবং এক প্রহর কাল মহাপ্রভুর গুণ-চরিত্র বলা, তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইল। অষ্ট প্রহর দিবা রজনীর মধ্যে সাড়ে সাতপ্রহর ভজন-সাধনে যাইত, চারিদণ্ড কাল তিনি নিদ্রা যাইতেন। রাধাকুণ্ডে অবস্থিতি কালে

রঘুনাথ দাস চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে শিষ্যত্বে গ্রহ করিয়াছিলেন এবং চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষ বা স্তবমালা, দানচরিত ও মুক্তাচরিত নামে তিন খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বল্লভভট্টের আগমন।

বল্লভ ভট্টের কথা পাঠকের স্মরণ আছে। শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে ইহা নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া নৌকাযোগে ইহার বাসগ্রাম আম্বলী-গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। আম্বলী গ্রামের বর্ত্তমান নাম আড়াইল; এখানে বল্লভা চার্য্যের এখনও আসন আছে। বল্লভভট্ট বা বল্লভাচার্য্য একই ব্যক্তি ইনি বল্লভাচারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, গুজ রাটে ও বোম্বাই প্রদেশের অনেক স্থানে অনেক বল্লভাচারী বৈষ্ণব দেখ যায়।

বল্লভ ভট্ট শ্রীচৈতন্যের মিলনাশায় নীলাচলে আসিয়া পাদ বন্দনা করি লেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলে ভ বলিতে লাগিলেন 'বহুদিন হইতে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল আজ তাহা পূর্ণ হওয়ায়, ধন্য হইলাম। তোমাকে স্মরণ করিলেও জীব পবিত্র হয়; দর্শনের ত কথাই নাই। কলিযুগের ধর্ম্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণশক্তি ভিন্ন তাহা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। তাহা যখন তুমি প্রবর্ত্তন করিয়াছ তখন তোমাতে যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই তুমি মহা প্রেমিক; যে তোমারে দর্শন করে, সেই প্রেমসিন্ধুতে ভাসিতে থাকে।'

বল্লভ ভট্ট এই সব বিনয় বাক্য বলিলেও তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান ছিল যে তিনি যেমন ভক্তি সিদ্ধান্ত জানেন, তেমন কেহ জানে না; তিনি যেমন ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এমন কেহ পারে না। কৃষ্ণচৈতন্য ইহা জানিতে পারিয়া ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ভঙ্গী করিয়া উত্তর দিলেন 'শুন ভট্ট মহামতি! আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী; ভক্তিতত্ত্বের কিছুই জানি না। অদ্বৈতাচার্য্যের সমান সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা কৃষ্ণভক্ত কেহ নাই তাঁহার সঙ্গগুণে ম্লেচ্ছেরও কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। নিত্যানন্দ অবধূত মহা-

ভাবে উন্মত্ত ও কৃষ্ণপ্রেমের সাগর। ষড়দর্শন-বেত্তা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় মহাভাগবত আর কে আছে? কৃষ্ণরসের খনি রামানন্দ রায়ের ন্যায় রসিক ভক্ত জগতে নাই। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, রসে তিনি অগ্রগণ্য? রাগাত্মিকা-ভক্তিমার্গে তাঁহার ভজন; ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন কেবলা রতিতে তাঁহার অনুরাগ। স্বরূপদামোদর মূর্ত্তিমান্ মধুর রস এবং ব্রজ-দেবীর কাম-গন্ধহীন শুদ্ধ প্রেমের অধিকারী। হরিদাস ঠাকুর নাম-মাহাত্ম্যে অগ্রগণ্য; তিন লক্ষ নামগ্রহণ তাঁহার নিত্যব্রত। এবং আচার্য্য রত্ন, আচার্য্য নিধি, জগদানন্দ, দামোদর, প্রভৃতি ভক্তগণ, কেহ গৌড়ে, কেহ উৎকলে, অবতীর্ণ হইয়া জগতে প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া জীবোদ্ধারের উপায় করিতেছেন। এই সকল মহাভাগবতদিগের সঙ্গে আমার যাহা কিছু শিক্ষা।'

ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ সব বৈষ্ণব কোথায় আছেন? কি প্রকারে আমি তাঁহাদের দর্শন পাইব?'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'কেহ গঙ্গাতীরে, কেহ এখানে, বাস করেন। সম্প্রতি রথযাত্রা দেখিতে সকলেই এ স্থানে একত্রিত হইয়াছেন। তুমি এখানেই তাঁহাদের দর্শন পাইবে?'

পর দিনে শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের সঙ্গে ভট্টের পরিচয় করিয়া দিলে ভট্ট বৈষ্ণবগণের তেজ ও বৈষ্ণবতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে করিতে লাগিলেন 'না জানি এ সব ভক্ত কেমন, যাঁহাদের নিকট শ্রীচৈতন্য শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।' ইহার পর বল্লভ ভট্ট সপার্ষদে শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন ও মালা চন্দন পরাইয়া সকলের প্রীতি বর্দ্ধন করিলেন। রথযাত্রায় গুণ্ডিচা মার্জ্জন, সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর ভাবাবেশ দেখিয়া ও সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া ভট্ট চমৎকৃত হইলেন এবং কতকদিন নীলাচলে বাসের পর সশিষ্যে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

বারান্তরে বল্লভ ভট্ট পুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণ বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন 'আমি ভাগবতের এক টীকা প্রস্তুত করিয়াছি, তুমি শুনিলে, কৃতার্থ হই।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'ভাগবতার্থ বুঝিতে আমার অধিকার নাই। আমি কেবল বসিয়া কৃষ্ণ নাম জপ করিয়া থাকি? তাও সংখ্যা-নাম পূর্ণ হয়

না।' ভট্ট বলিলেন 'আমি কৃষ্ণ নামের অর্থ বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যান করিয়াছি তুমি শুনিলে বুঝিতে পারিবে।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন, ভিন্ন কৃষ্ণনামের অ অর্থে আমার অধিকার নাই।'

বল্লভভট্টের ব্যাখ্যা সব 'বল্‌গু' 'ফল্‌গু'র ন্যায় হাস্যাস্পদ জানিয়া শ্রীচৈত উপেক্ষা করিয়া শুনিলেন না। ভট্ট অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন অন্তরে অন্তরে শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাঁহার ভক্তি কিছু শিথিল হইল। শ্রীচৈত বল্লভ ভট্টের ব্যাখ্যা শুনেন নাই, একথা শীঘ্রই নীলাচলের বৈষ্ণবমণ্ডলীত প্রচার হইয়া গেল। ভট্ট যেখানে যান, সেই খানেই মুখ পান না। ইহাতে তি অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া এক দিন গদাধর পণ্ডিতের নিকটে যাই মনোদুঃখ বলিতে লাগিলেন :—'সকলেই ত আমার প্রতিকূল হইয়াছে এক্ষণে তোমার শরণ লইতেছি। তুমি যদি আমার ব্যাখ্যা শ্রবণ কর তবেই আমার লজ্জা নিবারণ হয়।' পণ্ডিত গোস্বামী কি করিবেন, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া মৌনী হইয়া থাকিলেন। বল্লভ ভট্ট জোর করি স্বীয় ব্যাখ্যা তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। গদাধর ভদ্রতার অনুরোধে তাঁহার গৌরবে নিষেধ করিতে না পারিয়া মনে মনে 'কৃষ্ণ! রক্ষা কর, সঙ্কটে উদ্ধার কর' বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এবং ভাবিত লাগিলেন 'মহাপ্রভুকে তত ভয় নাই; তিনি সব অবস্থা বুঝিতে পারি আমাকে ক্ষমা করিবেন; কিন্তু বিষম তাঁহার গণের হাতে কিছুতেই রক্ষ নাই।' ফলে তাহাই হইল; গৌর ভক্তগণ এ বৃত্তান্ত জানিতে পারি পণ্ডিতের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন।

বল্লভ ভট্ট প্রতিদিন গৌরাঙ্গসভায় যাইয়া লঘু, গুরু, সকলের সঙ্গে বিচার-তর্ক লাগাইয়া দেন। ভক্তগণ চারিদিক্ হইতে তাঁহার কথ প্রতিবাদ করিয়া টিট্‌কারি দিতে থাকেন। ভট্ট হংসমধ্যে বকের ন্য বসিয়া থাকেন। একদিন তিনি অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আচ্ছ বলুন দেখি জীব-প্রকৃতি কৃষ্ণকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহ নাম করে কেন? পতিব্রতা নারী কখন ত পতির নাম লয় ন আপনারা কৃষ্ণনাম লইয়া কেমন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন আচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন 'তোমার আগে মূর্ত্তিমান্ ধ বিরাজ করিতেছেন, উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর পাইবে।' শ্রীচৈতে

ভট্টকে বলিলেন 'তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝ নাই। স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করা পতিব্রতার প্রধান ধর্ম্ম। পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁহার নাম লইতে। সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ভক্ত নাম লইয়া থাকেন।'

বল্লভভট্ট নিরুত্তর হইয়া দুঃখিত মনে বাসায় আসিলেন; এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 'এই সভায় নিত্যই আমার কথা খণ্ডিত হয়। একদিন যদি সকলকে হারাইয়া লজ্জা দিতে পারি, তাহা হইলে আমার সুখ হয়। যাহা হউক, আর একবার চেষ্টা করিব।' পরদিন সভায় যাইয়া শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করিয়া তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিতে লাগিলেন 'শ্রীধর স্বামীর ভাগবতের টীকা অগ্রাহ্য। তাহা খণ্ডন করিয়া আমি নূতন টীকা রচনা করিয়াছি। স্বামী যেখানে যেমন, সেখানে তেমন ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আগাগোড়ায় সামঞ্জস্য নাই। সেজন্য তাঁহার টীকা মানিতে পারি না।'

শ্রীচৈতন্য ইহা শুনিয়া বিরক্তির হাসি হাসিয়া 'যে স্বামীকে মানে না, তাহাকে ত বেশ্যার মধ্যে গণনা করিতে হয়' বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। বল্লভভট্ট স্বীয় অভিমানে বাধা পাইয়া রোষকষায়িত মনে বাসায় আসিলেন। এবং রাত্রিতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন 'ইনি ত পূর্ব্বে প্রয়াগে আমাকে বহু কৃপা করিয়াছিলেন; আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমার আশ্রমে গিয়াছিলেন; এখন কেন এত নিগ্রহ করিতেছেন?' বল্লভ ভট্ট বুদ্ধিমান্ ও ভক্ত; মনশ্চাঞ্চল্য অপনীত হইলে নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিলেন। 'আমি জ্ঞানের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া মহানুভব সাধুদিগকে বিচারে পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অভিমানে অন্ধ হইয়া আমিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও বিজ্ঞ, ইহা জানাইতে গিয়াছি; জগৎপূজ্য শ্রীধরস্বামীকে অবজ্ঞা করিয়াছি; এমন কি, শ্রীচৈতন্যকেও তুচ্ছ মনে করিয়াছি। এ সব অপরাধ বুঝিয়া আমাকে সংশোধন করিবার জন্যই কি তিনি অপমান করেন নাই? ইনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী; আমি মূর্খ, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, এখন দূর হও অভিমান! দূর হও জ্ঞানগর্ব্ব! হায়! আমি কি ঘোর অপরাধী! ভক্তাপরাধ হইতে আমি কিসে পরিত্রাণ পাইব?' এইরূপ চিন্তা করিয়া বল্লভ ভট্ট প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যের নিকটে আসিয়া চরণে ধরিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং ক্ষমা যাচ্ঞা করিয়া বলিলেন 'তোমার কৃপায় এখন আমার গর্ব্বান্ধকার চলিয়া গিয়াছে; কৃপা করিয়া উপদেশ দাও, যাহাতে আমার হিত হয়।'

শ্রীচৈতন্য প্রেমভাবে উত্তর করিলেনঃ—'তুমি মহাপণ্ডিত ও প
ভাগবত। যেখানে এই উভয় গুণ থাকে, সেখানে ত গর্ব্বপর্ব্বত
পায় না। তবে কেন গর্ব্বিত হইয়া শ্রীধরস্বামীকে নিন্দা করিয়াছ? শ্রী
জগদ্‌গুরু; তাঁহার কৃপা ভিন্ন ভাগবতার্থ জ্ঞান হয় না। তাঁহাকে লঙ
করিয়া যে ভাগবতের টীকা লিখিতে যাইবে, তাহার ব্যাখ্যা কেহ মানিবে ন
আর শ্রীধরের অনুগত হয়ে যে অর্থ করিবে, সেই অর্থ পরম সুখদ হইবে
যাও, অভিমান পরিত্যাগ ক'রে স্বামীর অনুগত হ'য়ে টীকা লেখ গে;
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। সাধু-অপরাধ মহাপাপ; এ পাপ থাকিতে শ্রীকৃ
ভজন হয় না। সে অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া নিরভিমান চিত্তে কৃষ্ণভ
করগে; অচিরে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবে।'

বল্লভ ভট্ট গৌরের প্রসন্নতা লাভ করিয়া ও ভক্তগণের নিকট আত্মদো
ক্ষালন করিয়া সকলকে মহাপ্রসাদ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। গৌরচ
তাঁহাকে সুখদিতে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সদলে পরমানন্দে ভোজ
করিলেন।

বল্লভ ভট্ট বালগোপালের উপাসক। কিন্তু গদাধর পণ্ডিতের স
থাকিতে থাকিতে তাঁহার মন পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি কিশো
গোপালের উপাসনা গ্রহণ করিবার জন্য পণ্ডিতের নিকট মন্ত্রদীক্ষা চা
লেন। গদাধর উত্তর করিলেন 'এ কর্ম্ম আমা হইতে হইবে না; আমি
স্বাধীন নই। প্রভু গৌরচন্দ্র আমার পরিচালক; তাঁহার আজ্ঞা ব্যতী
আমার কোন কিছু করিবার সাধ্য নাই। তুমি যে আমার নিকট যাতায়
কর, তাহাতেই আমি তিরস্কৃত হইয়া থাকি।'

বৈষ্ণবীয় ধর্ম্মে শক্তি ও ভাবের অবতরণ সমর্থিত হইয়াছে। বিশে
বিশেষ পাত্রে, বিশেষ বিশেষ ভাব ও শক্তি অবতীর্ণ হইয়া ভগবল্লীলা
সহায়তা করে, এ সত্য কে না স্বীকার করিবে? যেমন সনকাদিতে শা
ভাব, ধ্রুব প্রহ্লাদে দাস্যভাব, রুক্মিণী সত্যভামায় প্রেমভাব অবতীর্ণ; তে
আবার সনকাদির শান্তভাব শাক্যসিংহ প্রভৃতিতে, প্রহ্লাদের দাস্যভাব
হরিদাসে ও রুক্মিণী সত্যভামার ভাব গদাধরপণ্ডিত ও জগদানন্দ পণ্ডিতে অ
তীর্ণ। পরন্তু রুক্মিণী ও সত্যভামা উভয়েরই প্রেমভাব হইলেও উভয়ের প্রে
প্রকৃতিগত তারতম্য অনেক। সত্যভামার প্রেম বাম্য স্বভাব, কুটিল; ত
প্রণয় কলহে ও খটমট-কোন্দলে পরিস্ফুট। জগদানন্দ এই ভাবের গো

শ্রীচৈতন্যের সহিত তিনি অনুদিন প্রেমের ঝগরা করিয়া থাকেন। কিন্তু রুক্মিণীর প্রেম অন্য ধরণের। তাহা বিশুদ্ধ ও প্রগাঢ়। দাক্ষিণ্যে অর্থাৎ আত্মসমর্পণ ও সহিষ্ণুতায় তাহার প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ উপহাস করিয়া ছাড়িয়া যাইব বলিলে রুক্মিণীর ত্রাসের সীমা ছিল না। গৌরে গদাধরের প্রেম সেই প্রকারের। শ্রীচৈতন্য পরীক্ষা করিবার জন্য দিন কতক গদাধরের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলেন নাই। গদাধর নীরবে তাহা সহ্য করিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের সভায় যাতায়াত বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া নির্জ্জনে সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। যে দিন বল্লভ ভট্টের বাসায় ভক্তগণের মহাপ্রসাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; সেদিন স্বরূপ ও জগদানন্দ দ্বারা শ্রীচৈতন্য গদাধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পথে আসিতে আসিতে স্বরূপ বলিলেন 'তোমাকে যেমন তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন; তুমি নীরবে সহ্য না করিয়া দশকথা শুনাইয়া দিলে না কেন?' গদাধর উত্তর করিলেন 'তাও কি পারি? তাঁহার সঙ্গে ঝগ্‌রা করা কি ভাল? রাগের মাথায় না হয় দু'কথা বলেছেন। ইহার পর বুঝে আপনিই কৃপা কর্‌বেন।'

শ্রীচৈতন্যের সমীপে আসিয়া গদাধর রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য মধুর বচনে বলিলেন 'আমি তোমাকে কতই বলেছি; কিন্তু তুমি একটী কথারও উত্তর না দিয়া নীরবে সহ্য করিয়াছ। জগদানন্দ হ'লে আমাকে কতই শুনাইয়া দিত। যাহা হউক, তোমার এই সরল সুদৃঢ় প্রেমে আমি চির-ঋণী থাকিলাম।'

গদাধরে গৌরের প্রেম দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গৌরকে 'গদাধরের প্রাণনাথ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; এবং উভয়ের নাম একত্র যোগ করিয়া 'গদাই-গৌরাঙ্গ' নাম প্রকাশ করিলেন। পণ্ডিত গদাধর ইহার পর সভক্ত গৌরচন্দ্রকে একদিন নিমন্ত্রণ খাওয়াইলেন। সেইদিন গৌরের আজ্ঞায় বল্লভ ভট্ট গদাধরের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইয়া আপন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

গোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধার।

পরমসুখে শ্রীচৈতন্যের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। দিনমানে নানা দেশীয় পণ্ডিত ও ভক্তমণ্ডলীর সহিত সৎপ্রসঙ্গ, জগন্নাথদর্শন এবং

নৃত্য-কীর্ত্তন; এবং রজনীতে রামরায় ও স্বরূপের সহিত কৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করিতেন।

দিন দিন গৌরের বিরহ চেষ্টা বাড়িতে লাগিল। তিনি ব্যাকুল ও অধৈর্য্য হইতে লাগিলেন। কিন্তু রাত্রিতে স্বরূপ রামানন্দ ভিন্ন সে ভাব অন্য কেহ দেখিতে পাইত না। এই সময়ে নানা দিগ্‌দেশীয় নর নারী ও পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। তিনি সুমিষ্টালাপে ও হরি-সঙ্কীর্ত্তন উপদেশ দিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন।

এক দিন বাসায় বসিয়া শ্রীচৈতন্য হরিনাম করিতেছেন, এক জন লোক আসিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে সংবাদ দিল 'বড় জানা গোপীনাথ পট্টনায়ককে চাঙ্গের উপর হইতে নিচে শাণিত খড়্গ পাতিয়া ফেলিয়া দিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আপনি রক্ষা না করিলে নিস্তার নাই। ভবানন্দ রায় সবংশে আপনার সেবক; তাঁহার পুত্রকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।' শ্রীচৈতন্য শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন'কি কারণে তাহার প্রাণ দণ্ড হইতেছে?"

আগন্তুক সমুদায় বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিল:—'গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ রায়ের সহোদর। আপনি জানেন মালজেঠ্যা-দণ্ডপাট প্রদেশে মহারাজা তাঁহাকে শাসনের ভার দিয়াছিলেন। নিকাশে দুই লক্ষ কাহন কড়ি তাঁহার নিকট বাকি হওয়াতে মহারাজ তাহা তলপ করিয়া ছিলেন। নগদ কড়ি দিতে না পারিয়া গোপীনাথ বারটী ঘোড়া দিয়া মূল্য করিয়া লইতে এবং অবশিষ্ট ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম জানাকে ঘোড়ার মূল্য করিতে মহারাজ ভার দিলে বড় জানা ঘোড়ার মূল্য কম করিয়া ধরিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমের গ্রীবা উচ্চ, ঊর্দ্ধ মুখে চাহিয়া ও গ্রীবা ফিরাইয়া কথা কহা তাঁহার প্রকৃতি। ঘোড়ার কম মূল্য শুনিয়া গোপীনাথ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন "রাজকৃপা লাভ করিলে কি ধর্ম্মভয় থাকে না? আমার ঘোড়ার গ্রীবা উচ্চ বটে, কিন্তু তাহারা ত ঊর্দ্ধদিকে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে পারে না; তাইতে বুঝি দাম কম হইল?" এই কথায় রাজপুত্র পুরুষোত্তম ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার নিকট ঠকামি করিয়া কহিল "গোপীনাথ রাজকড়ি না দিবার মতলবে দুষ্টামি করিয়া বেড়াইতেছে; যদি হুকুম দেন ত তাহাকে চাঙ্গে চড়াইয়া কড়ি আদায় করি।" রাজা বলিলেন "যে উপায়ে কড়ি আদায় হয়, তাহাই কর।" এই বলিয়া আগন্তুক বলিল এই জন্য 'অত্যুচ্চ চাঙ্গ বাঁধিয়া তাহার নীচে

'সুশাণিত খড়্গ সকল পাতিয়াছে আমি দেখিয়া আসিয়াছি; গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইয়া খাঁড়ার উপর ফেলিয়া দিবে।'

শ্রীচৈতন্য বিরক্ত হইয়া বলিলেন 'রাজার কড়ি দিবে না, রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন না ত কি? রাজ-ভয় নাই; রাজ-বিলাত সাধিয়া খাইয়া নর্ত্তক নর্ত্তকী ও দাঁড়ী মাঝিকে দিয়া অর্থের অপব্যয় করিবে; আর দণ্ড লইবার সময় যাহাকে তাহাকে দিয়া অনুরোধ করাইতে চাহিবে। যাও! আমি এ সব কিছু শুনিতে চাই না।'

এই সময়ে আর এক ব্যক্তি ত্রস্তভাবে আসিয়া জানাইল 'বাণীনাথ প্রভৃতিকে সবংশে বাঁধিয়া লইয়া গেল।'

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'বন্ধনাবস্থায় বাণীনাথ কি করিতেছেন?'

দ্বিতীয় আগন্তুক বলিল 'তিনি হরিনাম জপ করিতেছেন।'

শ্রীচৈতন্য মনে মনে বাণীনাথের নাম-নিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন 'রাজা আপন প্রাপ্য লইবেন; আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাহার কি করিব?'

তখন স্বরূপাদি ভক্তগণ বলিলেন 'রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠি সব তোমার আশ্রিত দাস; তুমি এ বিষয়ে উদাসীন হইলে তাহারা কি প্রকারে বাঁচিবে?'

শ্রীচৈতন্য এবারে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যঙ্গভাবে বলিলেন 'তবে তোমরা সকলে আমাকে আজ্ঞা দাও, আমি রাজার নিকট হইতে অঞ্চল পাতিয়া দুই লক্ষ কাহন কড়ি ভিক্ষা করিয়া আনি। কেমন, এই ত তোমাদের মত? কিন্তু চাহিলেই বা পাঁচ গোণ্ডার ভিখারীকে দুই লক্ষ কাহন দিবেন কেন?

এই সময়ে তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া জানাইল 'গোপীনাথকে খড়্গোপরে ফেলিয়া দিবার জন্য চাঙ্গে তুলিতেছে।'

স্বরূপাদি তখন ব্যস্ত সমস্তভাবে শ্রীচৈতন্যকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'আমি ভিক্ষুক, আমা হইতে কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। তোমরা সকলে মহাভক্ত হ'য়ে, যাঁহাকে ডাকিলে কোন বিপদ থাকে না, সেই বিপদভঞ্জন হরিকে কেন না ডাকিতেছ? তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর, উপযুক্ত হইলে তিনি অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।'

এ দিকে রাজমন্ত্রী হরিচন্দন রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট যাইয়া বলিলেন 'গোপীনাথ প্রভৃতি সবংশে মহারাজের কিঙ্কর, তাহার প্রাণদণ্ড করা কি কর্ত্তব্য? বিশেষতঃ তাহার নিকট অনেক অর্থ প্রাপ্য রহিয়াছে। প্রাণদণ্ড

হইলে তাহা ত আদায় হইবে না। নিরর্থক রাজকোষের অর্থ ক্ষয় হইবে। আমার বিবেচনায় যথার্থ মূল্যে তাহার ঘোড়াগুলি লইয়া অবশিষ্ট অর্থের একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইলে ভাল হয়।'

রাজা উত্তর করিলেন 'তাহার প্রাণ লইতে আমি আদেশ দিই নাই। বড় জানা বলিয়াছিলেন প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইলে সে কড়ি দিবে; তাহাতেই সম্মতি দিয়াছিলাম। তুমি যাও, তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়া আমার প্রাপ্য যাহাতে পাই, তাহা করগে।'

তখন রাজপাত্র হরিচন্দন বড় জানাকে রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলে গোপীনাথকে চাঙ্গ হইতে নামান হইল। হরিচন্দন যথার্থ মূল্যে তাঁহার ঘোড়া কয়টী লইয়া ও বাকী কড়ির জন্য অঙ্গীকারপত্র লেখাইয়া লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে কাশীমিশ্র শ্রীচৈতন্যের কাছে আসিলে গৌর বলিলেন 'আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব। নানা প্রকার উপদ্রবে আমি শান্তি পাইতেছি না।'

কাশীমিশ্র জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হইয়াছে?'

চৈতন্যদেব বলিলেন 'ভবানন্দের গোষ্ঠি নানা প্রকারে রাজ-বিষয় অপচয় করিয়া থাকে; নিকাশে দায়ী হইয়া অর্থ দিতে পারে না। রাজার কি দোষ? তিনি আপন ন্যায্য অর্থ লইবেন না কেন? কিন্তু তা'দের কি স্বভাব যে আমি নির্জ্জনবাসী ভিক্ষুক সন্ন্যাসী; আমাকে তা'দের কথা বলে দুঃখ দেয় কেন? গোপীনাথকে আজ চাঙ্গে তুলিয়াছিল, ক্রমাগত চারিজন লোক এসে আমাকে জানাইল। আজ যেন জগন্নাথ তাহাকে রক্ষা করিলেন; কাল আবার এমনি হইলে কে রক্ষা করিবে? এই সকল বিষয়ী লোকের কথায় আমার মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাইতে বলি, এখানে থাকার আমার প্রয়োজন নাই।'

কাশীমিশ্র চৈতন্যের চরণে ধরিয়া মিনতি করিলেন 'তুমি এ সকল কথায় ক্ষুব্ধ হও কেন? তুমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, তোমার সঙ্গে কা'র সম্বন্ধ? যে ব্যক্তি বিষয় লোভের জন্য তোমার সেবা করে, তা'র মত মূঢ় আর কে? দেখ, তোমার জন্য রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ করেছেন; সনাতন উজীরী ছেড়েছেন; রঘুনাথ দাস অতুল সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য ছেড়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছেন; তাঁ'দের ছেড়ে তুমি কোথায় যা'বে? আমার মনে হয় গোপীনাথও তোমা

হইতে বিষয় বাঞ্ছা করেন না; তাঁ'র বিপদ দেখে বোধ হয় তাঁ'র ভৃত্যগণ অনন্যোপায় হইয়া তোমাকে জানাইয়াছিল। আমার অনুরোধ, আলালনাথে যাইও না। তোমাকে আর কেহ বিষয়ীর কথা শুনাবে না।'

রাজা প্রতাপরুদ্র যখন পুরুষোত্তমে বাস করিতেন, তখন তিনি প্রতিদিন মধ্যাহ্ন সময়ে অভীষ্টদেব কাশীমিশ্রের পদসেবা করিতে আসিতেন এবং তাঁহার মুখে জগন্নাথের সেবার সংবাদ লইতেন। সে দিন পাদ-সম্বাহনকালে মিশ্র বলিলেন 'দেব! আর এক দুঃখের কথা শুনেছেন? মহাপ্রভু পুরুষোত্তম ছেড়ে আলালনাথে যাইবেন?' রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কাশীমিশ্র গোপীনাথের বৃত্তান্ত আমূল বিবৃত করিলেন। রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন 'চৈতন্য প্রভুর দর্শনলাভ জন্য আমি সমুদায় বিষয় ছাড়িতে পারি; দুই লক্ষ কাহনের ত কথাই নাই। আমার রাজ্য ও প্রাণ তাঁহার পদে উৎসর্গ করিতেছি। আপনি কৃপা করিয়া যাহাতে তিনি এখানে থাকেন, তাহা করুন্।'

কাশীমিশ্র। তিনি বিষয়ের অভিলাষী নহেন, তাহা আপনি জানেন। এবং গোপীনাথকেও যে আপনি কড়ি ছাড়িয়া দেন, এ তাঁহার অভিপ্রায় নহে। বরং রাজস্বাপহারী চোর, মহাপাপী; রাজার বৃত্তিভোগী হইয়া রাজধন অপহরণ করে, বলিয়া তিনি নানা প্রকারে গোপীনাথের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি বলি তা'দের যেন কোন শারীরিক কষ্ট না দেওয়া হয়।

রাজা। তাহার প্রাণদণ্ড করা কখনই আমার অভিপ্রায় ছিল না। গোপীনাথ পুরুষোত্তম জানাকে বিদ্রূপ করিয়াছিল; তিনি তাহাকে প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইয়াছিলেন মাত্র। যা'হোক, এই আমি তাহার সমুদায় কড়ি ছাড়িলাম; আপনি দেখুন যাহাতে মহাপ্রভু এখান থে'কে চ'লে না যান্।'

কাশীমিশ্র। আপনি কড়ি ছাড়িলে চৈতন্যদেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন।

রাজা। তাঁহার খাতিরে আমি অর্থ ছাড়িলাম, এ কথা তাঁহাকে বলিবেন না। ভবানন্দ রায় আমার আত্মীয় ও গৌরবান্বিত ব্যক্তি। তাঁ'র পুত্রগণকে আমি সহজেই ভাল বাসি। তাহাদের বিষয় কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া কোন নিকাশ লই না। রামানন্দকে রাজমাহীন্দ্রের রাজা করিয়া দিয়াছিলাম; যাহা দিয়াছে, না দিয়াছে, তাহার কোন হিসাব লই নাই।

গোপীনাথ সম্বন্ধেও এমন ব্যবহার কতবার করিয়াছি। রাজা কাশীমিশ্রকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং পুরুষোত্তম জানার দ্বারা গোপীনাথকে ডাকিয়া আনিয়া হিসাবের দায় হইতে মুক্তি দিলেন, মালজেঠ্যা দণ্ডপাটে পুনরায় অধিকার দিলেন, ও তাঁহার বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া এবং নেতধটি-খেলাত পরাইয়া দিয়া বলিলেন 'সাবধান! ভবিষ্যতে আর কদাচ রাজধন নষ্ট করিও না। বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলাম এই জন্য যে আর তোমার অর্থের অভাব হইবে না। যাও, চৈতন্য প্রভুর আজ্ঞা লইয়া স্বীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওগে।'

এদিকে কাশীমিশ্র চৈতন্য-সকাশে আসিয়া রাজার ব্যবহারের কথা নিবেদন করিলে শ্রীচৈতন্য কিছু দুঃখিত হইয়া বলিলেন 'মিশ্র! তুমি কি করিয়াছ? আমাকে রাজপ্রতিগ্রহ করাইলে?'

কাশীমিশ্র উত্তর করিলেন 'না, মহারাজ স্পষ্ট বলিয়াছেন, আপনার খাতিরে হিসাবের অর্থ ছাড়েন নাই। ভবানন্দের গোষ্ঠি তাঁহার আত্মীয়; সে জন্য তাহাদের দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। পুরুষোত্তম জানার সঙ্গে বিবাদ না হইলে কোন গোলযোগই হইত না।'

শ্রীচৈতন্য এ কথায় সন্তুষ্ট হইলেন। এ দিকে গোপীনাথ প্রভৃতি পঞ্চ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ভবানন্দ রায় চৈতন্যসকাশে আসিয়া আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে চৈতন্যচরণ বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন 'এ মহাবিপদে রক্ষা করিয়া তুমি অনুগত বাৎসল্যগুণ প্রকাশ করিলে।'

রাজ-প্রসাদ নেতধটি মস্তকে করিয়া গোপীনাথ প্রণত হইলেন এবং রাজার কৃপা বৃত্তান্ত বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন 'কোথায় চাঙ্গের উপর হইতে ভীষণ মৃত্যু, আর কোথায় দায় হইতে অব্যাহতি, দ্বিগুণ বেতন লাভ ও স্বপদে প্রতিষ্ঠা; এ সব তোমারই কৃপায় হইল। কিন্তু তোমার কৃপার ত এ ফল হইতে পারে না। তোমার কৃপায় যে নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি লাভ হয়। রামানন্দ ও বাণীনাথ নির্ব্বিষয় হইয়া ভক্তি পাইয়াছেন; আমার সে দিন কবে হবে যে দিন বিষয় ছাড়িতে পারিব?'

শ্রীচৈতন্য হাসিয়া বলিলেন 'পাঁচ ভাই সন্ন্যাসী হইলে তোমাদের বিশাল পরিবার কে প্রতিপালন করিবে? সন্ন্যাসীই হও, আর বিষয়েই থাক, আমার এই উপদেশ যেন ধর্ম্মপথ হইতে কখন বিচলিত হইও না। তোমরা চিরদিন আমার প্রেম-পাত্র বলিয়া বলিবার অধিকার আছে; তাই বলিতেছি

'যেন রাজধন কখন অপহরণ করিও না। ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থে ধর্ম্মকর্ম্ম করিও, কদাচ অসদ্ব্যয় করিও না। ধনও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ; তাহার অযথা ব্যয় করিলে ইহকালে পরকালে দণ্ড পাইতে হয়।'

এই প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যের ন্যায়নিষ্ঠা, ভক্তরক্ষা, ও নিরপেক্ষতা, অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাঘবের ঝালি।

প্রতিবর্ষে রথযাত্রার পূর্ব্বে বঙ্গের ভক্তদল নীলাচলে মহাপ্রভুর মিলনাশয়ে গমন করিয়া থাকেন। পানীহাটীর রাঘবপণ্ডিত সেই দলের একজন প্রধান। রাঘবপত্নী দময়ন্তীদেবী প্রতিবৎসর শ্রীচৈতন্যের জন্য নানারূপ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেন। সে সকল দ্রব্য চৈতন্যদেব সম্বৎসর ধরিয়া পরমাদরে উপভোগ করিয়া থাকেন। এই সকল খাদ্য এইরূপ, যে বৎসরাবধি থাকিলেও নষ্ট হইবার নহে। দময়ন্তীদেবী অতি শ্রদ্ধার সহিত বহুদিন ধরিয়া উহা প্রস্তুত করিতেন। আম্রকাশন্দি, আদা-কাশন্দি, ঝালকাশন্দি, আমসি, আমসত্ত্ব, তৈলাম্র, লেবু-আদায় মিশ্রিত আচার বিশেষ, পৃথক্ পৃথক্ হাঁড়িতে মুখবন্ধ করিয়া সজ্জিত করিয়া দিতেন। উদর পীড়া নিবারণের জন্য সুক্তাপাতা দেবী দময়ন্তী অতি যত্নের সহিত সাজাইয়া দিতেন। ধ'নে, মউরী, ও তণ্ডুল চূর্ণের চিনি পক্ক নাড়ু, আমপিত্ত-নাশকারী শুণ্ঠিনাড়ু, নারিকেলের নাড়ু, গঙ্গাজল নাড়ু, বাতাসা, ফেনী ও স্থিরস্থায়ী খণ্ডবিকার, চিরস্থায়ী ক্ষীরনাড়ু, সূক্ষ্ম আতব চিড়া ও হুড়ুমের চিনি-পক্ক সুবাসনাড়ু, তণ্ডুল-ভাজাচূর্ণ ঘৃত ও চিনিপক্ক ও এলাচিকর্পূরাদি মসলা মিশ্রিত, উত্তম খই ঘৃতে ভাজা ও চিনির রসে পাক করা, ঘৃতে ভাজা ফুটকলাই-চূর্ণ এবং গন্ধ-মিশ্রিত খণ্ড খণ্ড গঙ্গামৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ মৃৎপাত্রে এবং নূতন বস্ত্রের কুথলিতে পূর্ণ করিয়া সজ্জিত হইত। পরে সুন্দর সুন্দর ঝালি পেটারাতে বদ্ধ করিয়া উপরে ছাব মোহর দিয়া চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইত। প্রত্যেক ঝালি বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য রাঘবপণ্ডিত তিনটী করিয়া বাহক নিযুক্ত করিয়া দিতেন। আবার

সমস্ত ঝালি ও বাহকগণের উপর রাঘবশিষ্য মকরধ্বজকর মুন্সিব নিযুক্ত হইয়া প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করিয়া পানীহাটী হইতে পুরুষোত্তমে লইয়া চলিতেন।

এই সকল দ্রব্য অতি অকিঞ্চিৎকর জানিয়াও শ্রীচৈতন্য পরম প্রীতির সহিত ভোজন করিতেন। যে স্নেহে উহা প্রস্তুত ও বহু দূরদেশ হইতে প্রেরিত হইয়াছে, তাহার মূল্য নাই, ভাবিয়া তাঁহার উল্লাসের সীমা থাকিত না। গুরুতর ভোজনে পেটে আম জন্মাইলে সুক্তাপাতার জলে তাহা নিবারণ হইতে পারিবে, মনে করিয়া স্নেহময়ী দময়ন্তী সুক্তা পাঠাইতেন। ভক্তের এই স্বর্গীয় প্রেম মনে করিয়া ভাবগ্রাহী শ্রীচৈতন্য সুক্তা ভোজনে যে সুখ পাইতেন, অন্যের পঞ্চামৃতে তেমন অনুভব করিতেন না। যাহা হউক প্রতি বর্ষে রাঘবপণ্ডিত এইরূপ ঝালি সাজাইয়া লইয়া যাইতেন বলিয়া বৈষ্ণব জগতে 'রাঘবের ঝালি' নামে উহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

পরিমুণ্ডা নৃত্য।

যখন নরেন্দ্রের জলে জগন্নাথের জললীলা হইতেছিল, একবৎসর বঙ্গের ভক্তগণ সেই সময়ে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণ বন্দনা করিলেন। ভক্তগণের সহিত জল ক্রীড়া করিয়া চৈতন্যদেব বাসায় আগমন করিলেন এবং পরিতোষরূপে ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ খাওয়াইয়া যে যাহার নির্দ্দিষ্ট বাসায় বিশ্রামার্থ পাঠাইয়া দিলেন। রাঘবপণ্ডিত গোবিন্দের নিকট ঝালি অর্পণ করিলে গোবিন্দ পূর্ব্ববৎসরের ঝালি আজার করিয়া গৃহান্তরে রাখিয়া নূতন ঝালি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রক্ষা করিলেন।

স্নানান্তে শ্রীচৈতন্য সাত সম্প্রদায়ে বেড়া-কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। সকল সম্প্রদায়ই মনে করিতেছে প্রভু আমাদের দলে। ক্ষেত্রবাসীগণ অবাক্ নিষ্পন্দভাবে দেখিয়া শুনিয়া কৃতার্থ হইতেছে। রাজা, রাজপত্নীগণ, মন্ত্রী ও অনুচরবর্গ পৃথক্ পৃথক্ স্থানে দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন। হঠাৎ শ্রীচৈতন্য স্বরূপকে বলিলেন তুমি উড়িয়া পদ গাও। স্বরূপ জিজ্ঞাসিলেন 'কোন্ পদ'?

শ্রীচৈতন্য বলিলেন :—'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ'। এই পদ।

সাত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন থামিল; স্বরূপ একা মধুরস্বরে এই পদ গাইতে লাগিলে শ্রীচৈতন্য 'বোল' 'বোল' বলিয়া বাহু তুলিয়া প্রেমাবেগে নাচিতে লাগিলেন। লোক সব আনন্দ উৎসাহে উচ্চ হরিধ্বনি দিতে লাগিল।

শ্রীচৈতন্যের ভাব পূর্ণ মাত্রায় চড়িয়া উঠিল। তিনি সিংহ গর্জ্জনে হুঙ্কার দিতে লাগিলেন। পুলকে তাঁহার অঙ্গ শিমুলতরুর ন্যায় কণ্টকিত হইল, প্রতিরোমে স্বেদ ও রক্তোদ্গম হইতে লাগিল, ক্রমে তাঁহার বাক্যের জড়তা হইয়া আসিল। তিনি 'জগমোহন' পদ আবৃত্তি করিতে, 'জজ' 'গগ,' 'পরি,' 'মম,' বলিতে লাগিলেন; দন্ত সকল এরূপভাবে নড়িতে লাগিল, যে লোকে মনে করিল যেন তাহা পড়িয়া যাইতেছে, এবং অঙ্গ সকল কখন ফুলিয়া উঠে ও কখন সরু হইয়া যায়। তথাচ গৌর সিংহের আবেশ ও আনন্দ নৃত্য থামিল না। বেলা তৃতীয় প্রহর হইল; তখনও আ অহারা হইয়া তিনি ভাবসাগরে নিমগ্ন; কেবলই নাচিতেছেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি তাঁহার অতিরিক্ত দৈহিক শ্রম হইতেছে, বুঝিতে পারিয়া নৃত্য থামাইবার উদ্দেশে গীত বাদ্য থামাইয়া দিলেন। তিনি কিছু বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলে নিত্যানন্দ বলিলেন 'বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে ও ভক্তগণ পরিশ্রান্ত হইয়াছেন।' শ্রীচৈতন্য তখন নৃত্য কীর্ত্তন সমাপন করিয়া সভক্ত সিন্ধু-স্নান ও প্রসাদ-ভোজনান্তে বিশ্রামার্থ গম্ভীরার দ্বারে শুইয়া পড়িলেন।

গোবিন্দের নিয়ম ছিল যে চৈতন্যদেব ভোজনান্তে শয়ন করিলে তিনি পদ সেবা করিয়া তবে ভোজন করিতেন। প্রভু গম্ভীরার দ্বারে শুইয়াছেন; গোবিন্দ ভিতরে যাইতে পথ না পাইয়া বলিলেন 'এক পাশ হও, ঘরে যাইব।'

শ্রীচৈতন্য শ্রান্তি জানাইয়া উত্তর করিলেন 'অঙ্গ চালাইবার শক্তি নাই।'

গোবিন্দ। পদ সম্বাহন করিতে চাই; পথ দাও।

শ্রীচৈতন্য। কর, বা, না কর, তোমার ইচ্ছা। আমার নড়িবার সাধ্য নাই।

সেবক গোবিন্দ তখন তাঁহার বহির্ব্বাস চৈতন্যের উপরে রাখিয়া প্রভুকে লঙ্ঘন পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং পাদ সম্বাহন করিয়া কটি, পৃষ্ঠ, চাপিতে লাগিলেন। সুন্দর মর্দ্দনে শ্রীচৈতন্যের শ্রান্তি দূর হইল, তিনি সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। দণ্ড দুই পরে নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে চৈতন্যদেব দেখিলেন গোবিন্দ তখনও বসিয়া পা চাপিতেছে। তিনি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'আজ এখনও বসিয়া আছিস্ যে? আমি নিদ্রা গেলে ভোজনে যা'স্ নাই কেন?'

গোবিন্দ উত্তর করিল 'তুমি দুয়ার চে'পে শুইয়া আছ, আমি বাহিরে যাই কোন্ পথে?'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'যেমন ক'রে ভিতরে এসেছিস্, তেমনি ক'রে যেতে পারিস্ নি?'

গোবিন্দ শেষ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নীরব হইল ও মনে মনে ভাবিতে লাগিল :—'সেবার নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য সহস্র অপরাধ গ্রাহ্য করি না; নরকে গমন করিতে হইলেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু নিজের সুখের জন্য অপরাধের আভাসেও মনে ভয় হয়।'

সেবাই সেবকের একমাত্র কর্ত্তব্য। সেবা না করিয়া সেবক থাকিতে পারে না; কেননা সেবাই তাহার প্রকৃতি। যাহার আত্মসুখ উদ্দেশ্য, তাহা সেবা নহে। আপনাকে উৎসর্গ করিয়া প্রভুর প্রীতি বর্দ্ধনের নামই সেবা। সেবক জানে না যে সেবা করিলে আবার ধর্ম্ম হয়। সে জানে যে সে সেবা করিতেই আসিয়াছে; না করিলে সে বাঁচে না। সুতরাং এরূপ সেবার জন্য সেবক না করিতে পারে, এমন কাজই নাই। পাপ, যন্ত্রণা, নরক-ভয়, কি তাহাকে সেবা হইতে পশ্চাৎপদ করিতে পারে? পাঠক মহাশয়! ভক্তি-শাস্ত্রের এই নিগূঢ় উপদেশ; এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে লঙ্ঘন করিয়া গোবিন্দের সেবার, এই নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

ভক্ত দত্তাস্বাদন।

ভক্তগণ যিনি যাহা উত্তম বস্তু পাইতেন, চৈতন্যের ভোজনের জন্য গোবিন্দকে দিয়া যাইতেন। গোবিন্দ জানাইলে শ্রীচৈতন্য তাহা রাখিয়া দিতে বলিতেন। এমনি করিয়া রাখিতে রাখিতে অনেক খাদ্য-সামগ্রী রাশীকৃত হইল। এ দিকে অদ্বৈত প্রভৃতি দাতাগণ গোবিন্দকে নিয়ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্য প্রভু খাইয়াছেন কি না? গোবিন্দ কোন কিছু বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে লাগিলেন। ভোজন-কালে এক দিন গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন 'আচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ তোমার খাইবার জন্য নানা দ্রব্য দিয়াছেন। তুমি তাহা খাও না; তাঁহারাও আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়েন না, তুমি খাইয়াছ কি না? আমি আর তাঁহাদের কত বঞ্চনা করিব? ভক্তগণের নিকট ইহাতে যে আমার মহাপরাধ হইতেছে।'

শ্রীচৈতন্য হাসিয়া বলিলেন 'আরে! তো'র দুঃখ কিসের? আচ্ছা, কে কি দিয়াছেন, আন্ দেখি।'

গোবিন্দ তখন একে একে ভক্তগণের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত খাদ্য দিতে লাগিলেন। অনেক দিনের পুরাতন খাদ্য; পচিয়া গেলেও ভক্ত-দত্ত বলিয়া শ্রীচৈতন্য তাহা অম্লান বদনে খাইতে লাগিলেন। কথিত আছে, সে দিন শুক্না নারিকেল পর্য্যন্তও বাদ যায় নাই। সব দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'আর কিছু আছে?'

গোবিন্দ উত্তর দিল 'রাঘবের ঝালি মাত্র অবশিষ্ট।'

শ্রীচৈতন্য 'আচ্ছা, তাহা আর এক দিন দেখা যাইবে' বলিয়া হাসিতে হাসিতে আচমন করিলেন।

নিমন্ত্রণ ভোজন।

জগন্নাথের প্রসাদান্ন কিনিয়া শ্রীচৈতন্যের নিত্য ভোজন হইত। উহার মূল্য প্রথমে চারি পণ কড়ি নিরূপিত ছিল; পরে রামচন্দ্র পুরীর কথায় কমাইয়া যেরূপে দুই পণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা জানেন। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে ঐ মূল্য দিতে হইত; অথবা কেহ প্রসাদ ক্রয় করিয়া তাহার উপর গৃহে কিছু রন্ধন করিয়া মিশ্রিত ভোজন করাইতেন। কেহ বা প্রসাদ না আনিয়া কেবল গৃহে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন। গদাধর পণ্ডিত, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, জগদানন্দ পণ্ডিত, ভগবান্ আচার্য্য, গোপীনাথ আচার্য্য, কাশীশ্বর, রাম ভট্টাচার্য্য, শঙ্কর ও বক্রেশ্বর, এই কয় জন ক্ষেত্র-বাসীর গৃহে শেষোক্তরূপে ভোজন হইত। তন্মধ্যে গদাধর ও সার্ব্বভৌমের মাসিক নিমন্ত্রণের দিন নিয়মিত ছিল। অপর ভক্তেরা মধ্যে মধ্যে অনিয়মিত-রূপে নিমন্ত্রণ করিতেন।

যে চারিমাস বঙ্গের ভক্তগণ উৎকলে থাকিতেন, সেই সময়েই নিমন্ত্রণের ঘটা কিছু অধিক হইত। তাঁহাদের গৃহে মিশ্রভোজন বা প্রসাদমাত্র ভোজন হইত। যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে জানা যায়, যে সকলের গৃহে চৈতন্য-দেব ঘরভাতে নিমন্ত্রণ খাইতেন না। ব্রাহ্মণেতর জাতির ত কথাই নাই, ব্রাহ্মণের মধ্যেও ভোজ্যান্ন বিপ্র ভিন্ন, অন্যের অন্ন খাইতেন না। তাঁহার যেরূপ উদার ভাব দেখা যায়, তাহাতে জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা যে তাঁহার মধ্যে ছিল, তাহা কখনই বিশ্বাস হয় না। তবে লৌকিকাচারকে তিনি অনেক

সময়ে লঙ্ঘন করিতেন না। এই লৌকিকাচারের বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় তাঁহাকে এরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক, চারিমাস কাল নিমন্ত্রণ খাইয়াও চৈতন্যদেব সকল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতেন না। কারণ চারিমাসের মধ্যে সকলের নিমন্ত্রণ রক্ষার সময়ে কুলাইত না। অদ্বৈতাচার্য্যের নিমন্ত্রণের ঘটা কিছু অধিক মাত্রায় হইত। গৌরকে পুনঃপুনঃ নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়াও আচার্য্যের আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ হইলে তাঁহার সঙ্গে পুরী, ভারতী, প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ গমন করিতেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, যে অনেক সময়ে তাঁহার আহার হইত না। তাহাতে নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তি মনে মনে বড় অসুখী হইতেন। একদিন অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 'আজ যদি কোন গতিকে সন্ন্যাসীগণের আসা না হয়, তাহা হইলে মনের সাধে প্রভুকে ভোজন করাই।' মধ্যাহ্নকাল সমাগত হইলে গৌরচন্দ্র একাকী অদ্বৈতের বাসায় উপনীত হইলেন। আর আর ভক্তগণ স্নানাদি করিতে তখন সমুদ্রে গিয়াছিলেন; হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় আসিয়া জুটিতে পারিলেন না। তখন অদ্বৈতাচার্য্য অভীষ্ট সিদ্ধ হইল দেখিয়া মহানন্দে ইন্দ্রের স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন এবং অশেষ প্রকারে গৌরকে ভোজন করাইলেন। সে দিন না কি, গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের পাক করা সমস্ত দ্রব্য খাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেন প্রভৃতি তাঁহাকে প্রসাদ খাওয়াইতেন। শিবানন্দ একদিন মূল্যবান্ ও অতি উৎকৃষ্ট ঘৃতপক্ব প্রসাদ সকল খাইতে দিলে শ্রীচৈতন্য সেনের গৌরবে তাহা খাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন প্রসন্ন হইল না। শিবানন্দের বালক পুত্র চৈতন্যদাস তথায় ছিল। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'ইহার নাম কি রাখিয়াছ?' সেন উত্তর দিলেন 'চৈতন্য দাস'।

গৌর বলিলেন্ 'এরূপ নাম কেন রেখেছ? বুঝিতে পারিলাম না।'

সেন জবাব দিলেন 'এত শত জানি না; যাহা মনে এসেছে; তাহাই রেখেছি।'

চৈতন্য দাস শিশু হইলেও, গুরু ভোজন যে প্রভুর প্রীতিকর হইতেছে না, বুঝিতে পারিল।

অন্যদিনে চৈতন্য দাসের ইচ্ছায় শিবানন্দ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া

কেবল আদা, লেবু, ফুলবড়ি ভাজা, দধি, লবণ, ও অন্ন খাইতে দিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রীত হইয়া সেনকে জিজ্ঞাসিলেন 'আজ গুরু পাক দ্রব্য আন নাই কেন?' সেন লজ্জিত হইয়া বলিলেন 'চৈতন্যদাসের ইচ্ছা যে আজ তুমি এইরূপ খাও।'

শ্রীচৈতন্য 'বালক আমার মন বুঝিয়াছে, তুমি বুঝিতে পার নাই' বলিয়া সন্তুষ্ট হইয়া উচ্ছিষ্ট দই-মাখা ভাত শিশুকে খাইতে দিলেন।

চৈতন্য বিজয়।

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ বর্ষান্তে নীলাচলে আসিয়া চারিমাস অবস্থিতি করিতেছেন। অদ্বৈতের প্রবাসবাটীতে প্রতিদিন সন্ধ্যাসময়ে সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে। শ্রীবাসাদি সকল ভক্ত মিলিত হইয়া মৃদঙ্গ করতালযোগে সুমধুর হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। চৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শনান্তে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দেন। একদিন সংকীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বে অদ্বৈত বলিলেন 'আজ আর অন্য নাম গাইব না। নব অবতারের নব পদে গোরাগুণ গাইয়া ধন্য হইব। তোমরা সকলে মণ্ডলাকারে কীর্ত্তন কর; আমি মনের সাধ মিটাইয়া নাচিয়া লই।'

ভক্তগণ আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। শ্রীবাস বলিলেন 'কিন্তু ভয় হয়; প্রভু শুনিয়া বিরক্ত হইবেন। তিনি সর্ব্বদাই আত্মগোপনে ব্যস্ত। আজ একটা কিনা করিয়া ফেলেন।'

অদ্বৈত আনন্দোৎসাহে বলিলেন 'আরে! রে'খে দাও প্রভুর ক্রোধ। তিনি চিরদিনই আত্ম-গোপন করুন্। আর আমরাও তাঁহাকে লুকাইয়া রাখি। তবে জীব নিস্তারের কি হইবে? আর সকল বিষয়ে তাঁ'র আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কেবল এই বিষয়ে নয়।'

ভক্তগণ অদ্বৈতের সাহসবাক্যে সাহসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন 'আজ্ আমরা তাঁহাকে ডরাইব না।'

তখন খোল করতাল বাজিয়া উঠিল। অদ্বৈত-বিরচিত এই পদ গাইয়া ভক্তগণ প্রমত্তভাবে মণ্ডলাকারে নাচিতে লাগিলেন। অদ্বৈত নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া মণ্ডলমধ্যে নৃত্য করিলেন।

'শ্রীচৈতন্য! নারায়ণ! করুণাসাগর!
দুঃখিতের বন্ধু প্রভো! মোরে দয়া কর।'

চৈতন্যদেব যখন কীর্ত্তনস্থানে আসিলেন, ভক্তগণ তখন উন্মত্তপ্রায় হইয়া

গাইতেছেন, নাচিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ ভীত বা সঙ্কুচিত হইলেন না। চৈতন্যদেব হরিগুণানুকীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে নিজ নামগুণযুক্ত গান শুনিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন এবং দুঃখে, ঘৃণায়, ও নিরাশায়, গম্ভীরামধ্যে শুইয়া থাকিলেন।

ভক্তগণ চৈতন্য-বিজয় গান সমাধা করিয়া যখন শান্ত হইলেন, তখন তাঁহাদের মনে হইল প্রভু কীর্ত্তনস্থানে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন; গান শুনেন নাই। কেহ কেহ কিছু উদ্বিগ্নও হইলেন। তখন সকলে দলবদ্ধ হইয়া চৈতন্যদর্শনে আসিলেন। গোবিন্দ ভক্তগণের আগমন বার্ত্তা জানাইলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। ভক্তগণ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলে তিনি মুখ আচ্ছাদন করিয়া যেমন শুইয়া ছিলেন, অনেকক্ষণ সেইভাবে থাকিলেন। ভক্তদল নীরবে বসিয়া, সাড়া নাই। চৈতন্যদেব হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসিলেন :—

'ওহে শ্রীবাস! ওহে বৈষ্ণবগণ! আজ সকলে মিলিয়া কি গান করিতেছিলে? কৃষ্ণগুণ গান ছাড়িয়া আজ্ কাহার নাম গাইয়া এত নৃত্য হইতেছিল? তা'তে কি কিছু সুখ পাইতেছিলে? কিছু কি লাভ হইয়াছে? বুঝিলাম এখন তোমরা স্ব স্ব প্রধান, সকলেই শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক। আমার কথা শুনিবে কেন? কিন্তু পৃথিবী কি তোমাদের কথায় চলিবে? হরিনাম ছাড়িয়া মানুষের নাম গাইতে কি লজ্জা হইল না? আমি যে লজ্জায়, ঘৃণায়, মরিয়া যাইতেছি। হায়! বুঝিলাম আমার সকল শ্রম পণ্ড হইল। তোমরা কেহই মানুষ হইলে না।'

সম্মুখে শ্রীবাসপণ্ডিত বসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের বাক্যাবসানে তিনি বলিয়া উঠিলেন 'ঈশ্বরশক্তি বিনে জীবের ত স্বতন্ত্র শক্তি নাই। এ কথা তোমার শ্রীমুখেই ত কতবার শুনিয়াছি। তিনি যাহা করান, যা যাহা বলান্, জীব তাহাই অনুসরণ করে। আজ্ ভগবান্ আমাদের মুখ দিয়া যাহা বলাইয়াছেন, আমরা তাহাই বলিয়াছি। তুমি নিরন্তর আপনাকে লুকাইতে চাও; তিনি আমাদের মুখ দিয়া তোমাকে প্রকাশ করিয়া দিলেন।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'যদি তাহাই বুঝিয়া থাক, তবে যে লুকায়; তাহাকে বাহির করিতে চাও কেন?'

শ্রীবাসপণ্ডিত আকাশের দিকে হস্ত তুলিয়া নীরবে বসিয়া থাকিলেন। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন 'ও আবার কি সঙ্কেত করিতেছ?

শ্রীবাস হাসিয়া বলিলেন 'হাত দিয়া সূর্য্য ঢাকিলাম।'

এই সময়ে বাহির দ্বারে শ্রীহট্ট-চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা-বাসী বহুসংখ্যক নরনারী 'জয়! জয়! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব! জয় শচীদুলাল! পরম কারুণিক! তুমি স্বয়ং নারায়ণ! সন্ন্যাসীরূপে জীব উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। প্রভো! আমাদের দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শ্রীবাস সুযোগ পাইয়া বলিলেন 'এখন কি করিবে? সকল সংসার যে গাইতেছে; তাহাদের কেমন করিয়া আটক্ করিবে? এ সব লোককে আমি কি শিখাইতে গিয়াছি?'

শ্রীচৈতন্য পূর্ব্বের ন্যায় বিরক্তি সহকারে উত্তর করিলেন 'না শিখাইলেও উহারা তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছে। তোমরা পণ্ডিত হইয়া যাহা করিবে, এ সকল লোক তাহাই অনুকরণ করিয়া চলিবে; ইহাতে আশ্চর্য্য কি?'

শ্রীচৈতন্য বাহিরে আসিয়া ঐ সকল নরনারীকে দর্শন দিয়া কৃষ্ণনামের উপদেশ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাস নির্ব্বাণ।

এই ভবের বাজারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যাহার আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই চলিয়া যাইবে। অনিত্য সংসারের ধন, জন, যৌবন, শরীর, মন, সকলই অনিত্য। নিত্য কেবল ধর্ম্ম, নিত্য কেবল প্রেম ভক্তি, আর নিত্য কেবল অকুলের কাণ্ডারী হরিনাম। হায়! মানুষ ইহা বুঝিয়াও কেন বুঝিল না? হাতে তুলিয়া কেন বিষয় গরল পান করিল? হাতে তুলিয়া কেন পাপের কালি মুখে মাখিল?

এই যে চৈতন্যচাঁদের প্রেমের হাট বসিয়াছে, ইহা কি নিত্য? ইহা কি চিরকাল থাকিবে? থাকিবে, আবার থাকিবে না। অপ্রাকৃত চিদানন্দ বস্তু কি নষ্ট হইতে পারে? নষ্ট হইবে কেবল মায়া চক্ষুর দ্রষ্টব্য প্রেমের হাটের পসারীদের মায়াময় দেহ। চিদানন্দ অপ্রাকৃত দেহের ত নাশ নাই। সংসারের ভাষায় মৃত্যু, দেবভাষায় জীবন। সংসারের ভাষায় আজ ভক্ত হরিদাস মরিলেন, প্রেমাকাশের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া

পড়িল, হরিনামের জীবন্ত বিগ্রহ অপ্রকট হইল এবং শ্রীচৈতন্যের প্রেম-বিধানের একটী মূল্যবান রত্ন অন্তর্ধান হইল। কিন্তু দেবভাষায় আজ ভক্ত-পরিবারে একটী নূতন ভক্তের জন্ম হইল, দেবগণ আনন্দে দুন্দুভি নিনাদ করিলেন এবং অপ্রাকৃত হরিদাস হরিনামের জ্যোতিষ্মান্ মুকুট শিরে পরিয়া দেবসভা উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন।

হরিদাসের ভোজনের জন্য শ্রীচৈতন্য গোবিন্দ দ্বারা প্রতিদিন প্রসাদান্ন পাঠাইয়া দিতেন। একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ দিতে যাইয়া দেখিলেন যে ঠাকুর হরিদাস শয়ন করিয়া মৃদুমন্দ-স্বরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। গোবিন্দ তাঁহাকে উঠিয়া প্রসাদ ভোজন করিতে অনুরোধ করিলে, হরিদাস বলিলেন 'আজি আমি লঙ্ঘন করিব। সংখ্যা নাম পূর্ণ হয় নাই; ভোজন করিতে পারিব না।' তবে মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, উপেক্ষা করিতে পারি না; একটী দাও, গলাধঃকরণ করি।'

পর দিন প্রাতে শ্রীচৈতন্য হরিদাসের বাসায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'হরিদাস সুস্থ আছ ত?'

হরিদাস প্রণামান্তে উত্তর করিলেন 'আমার শরীর সুস্থ আছে; কিন্তু মন বড় অসুস্থ।'

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসিলেন 'বল ত, কি ব্যাধি?'

হরিদাস। সংখ্যা-নাম পূর্ণ হইতেছে না কেন?

শ্রীচৈতন্য। এখন বৃদ্ধ হ'য়েছ। সংখ্যা কেন অল্প কর না? সিদ্ধিলাভ করিয়াও সাধনের জন্য এত আগ্রহ কেন? নামের মহিমা প্রচার ক'র্‌তে এসেছিলে; সে কার্য্য ত করিয়াছ। তোমার নিকট নাম শু'নে কত লোক উদ্ধার হ'য়ে গিয়েছে। এখন বৃদ্ধ বয়সে অল্প সংখ্যায় নাম সঙ্কীর্ত্তন কর।

হরিদাস বিনয়ে ও বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন 'শুন প্রভু! আমার এক নিবেদন আছে। অতি হীন জাতি, অধম পামর হইলেও আমাকে তুমি অঙ্গীকার ক'রে বৈকুণ্ঠে তুলিয়াছ, বহু কৃপা করিয়া অনেক নাচাইয়াছ, এবং ম্লেচ্ছ হইয়াও ব্রাহ্মণ-প্রাপ্য শ্রাদ্ধপাত্র খাইতে দিয়াছ। মনুষ্য জন্মের যাহা সুখ, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। আর এক ইচ্ছা আমার আছে; তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আমার মনে হ'চ্ছে, অচিরে তুমি মানব-লীলা সম্বরণ করিবে। কিন্তু তা' যেন আমাকে দেখিতে না হয়। তাহার পূর্ব্বেই এই নিন্দ্য কলেবর ছাড়িতে চাহি! তোমার পদযুগল

হৃদয়ে ধরিয়া চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে ও কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে তোমার সম্মুখে শরীর রাখি, এই আমার প্রার্থনা। প্রার্থনা পূর্ণ কর।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'হরিদাস! তুমি ভক্ত। ভক্তের প্রার্থনা ভক্তবৎসল হরি অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। কিন্তু দেখ, আমার যত কিছু সুখৈশ্বর্য্য; তোমাদের লইয়া। তোমার কর্ত্তব্য নয় আমাকে ছাড়িয়া যাইতে।'

হরিদাস বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন 'তোমার পায়ে ধরি প্রভু; আর মায়া বাড়াইও না। আমার মাথার শিরোমণি কত শত সাধু-ভক্ত মহাশয় তোমার লীলার সহায়। আমার ন্যায় একটা ক্ষুদ্র কীট মরিলে কি হানি হইতে পারে? একটী পিপীলিকা মরিলে পৃথিবীর কি কোন ক্ষতি হয়? আজ মধ্যাহ্ন করিতে যাও, কিন্তু কাল অবশ্য দর্শন দিবে।'

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্য সমুদায় ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া হরিদাসকে দেখিতে আসিলে হরিদাস সকলের পদ বন্দনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য ভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসিলেন 'হরিদাস! সমাচার কি?'

হরিদাস সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন 'তোমার যেমন অভিরুচি।'

তখন চৈতন্যচন্দ্র প্রাঙ্গণে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করিতে লাগিলেন; স্বরূপাদি ভক্তগণ হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন গাইতে লাগিলেন। তাহার পর শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌম রামানন্দাদির নিকটে পাঁচ মুখে হরিদাসের মহাপরীক্ষা, অটল বিশ্বাস, সরল ভক্তি, ও নামনিষ্ঠাদির গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হরিদাস সকল ভক্তের পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া গৌরচন্দ্রকে নিজাগ্রে বসাইলেন এবং নিজ নয়নরূপ ভৃঙ্গ দুইটী প্রভুর মুখপদ্মে লাগাইয়া মুখমাধুরী পান করিতে লাগিলেন; আর চরণ দুই খানি স্বহৃদয়ে রাখিয়া যুগপৎ হরিনাম ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নামের সঙ্গে দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রামণ করিয়া ফেলিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন হরিদাস মহাযোগেশ্বর; তাইতে ভীষ্মের ন্যায় ইচ্ছামৃত্যু মরিতে পারিয়াছিলেন।

ভক্তগণ হরি হরি ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া তুলিলেন; শ্রীচৈতন্য প্রেমে শোকে বিহ্বল হইয়া হরিদাসের মৃতদেহ কোলে লইয়া সেই মহাসঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে উদ্দণ্ড নাচিতে লাগিলেন; এবং চারিদিকে লোক সব হরিদাসের গুণ কীর্ত্তন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। স্বরূপ গোস্বামী এক বিমান প্রস্তুত করিয়া পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া আনিলে হরিদাসের মৃত

দেহ তাহাতে রাখিয়া ভক্তগণ স্কন্ধে করিয়া বহিয়া সমুদ্র তীরে চলিলেন। শ্রীচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তনের দলের আগে আগে নাচিতে গাইতে চলিলেন। সাগর-জলে শবকে স্নান করাইলে ভক্তবৃন্দ ভক্তদেহের পাদোদক পান ও পদধূলি মস্তকে লইলেন। চৈতন্যদেব বলিলেন 'আজ হইতে সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।' তাহার পর ভক্তগণ নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাসে গন্ধপুষ্প ও পুষ্পমালায় ভক্ত-দেহ সজ্জিত করিয়া জগন্নাথের ডোর, কড়ার বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ সঙ্গে দিয়া সমুদ্র তীরের বালুকারাশির মধ্যে গভীর গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে শায়িত করি-লেন। শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে অগ্রে বালুকা নিক্ষেপ করিলে বন্ধুগণ বালুকা দিয়া শব প্রোথিত করিলেন; এবং উপরে বেদি বাঁধাইয়া দিয়া বেদির চারিধার অন্য প্রকারে আবৃত করিলেন। তখন মৃদঙ্গ করতাল যোগে বেদি প্রদক্ষিণ করিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। পরে স্নানান্তে সকলে হরিবোল বলিতে বলিতে ও হরিদাসের গুণ গাইতে গাইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

হরিদাসের বিজয়োৎসবের দিনে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং সিংহদ্বারে যাইয়া আঁচল পাতিয়া বসিয়া ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পসারীগণ পসরা পসরা প্রসাদ দিতে আসিল। স্বরূপ গোস্বামী প্রভুকে বাসায় বিদায় করিয়া দিয়া প্রত্যেক দোকানীর নিকট এক এক পোয়া মাত্র ভিক্ষা লইলেন; এবং চারিজন বাহক দ্বারা গৃহে আনিয়া ভক্তগণকে ভোজন করাইলেন। শ্রীচৈতন্য এ দিন স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া এক এক জনের পাত্রে প্রচুর খাদ্য দিতে লাগিলেন এবং আরও দাও, আরও দাও, বলিয়া উৎসাহে চীৎ-কার করিয়া ভক্ত বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। নিমন্ত্রিতগণকে মাল্য, চন্দন, ও তাম্বূল, উপহার দিয়া চৈতন্যদেব হরিদাসের মহিমা বলিয়া শোক করিতে লাগিলেন :—'কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাকে যে অমূল্য সঙ্গী জুটাইয়া দিয়াছিলেন, আজ তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। ধন্য তাঁহার ইচ্ছা! চিরদিন তাহাই জয় যুক্ত হইবে। আমাদের ক্ষুদ্র ইচ্ছা তাঁহার মহতী ইচ্ছার নিকট পরাস্ত হইবে। আমার ত হরিদাস হেন সঙ্গীকে বিদায় দিতে ইচ্ছা ছিল না; রাখিতে পারিলাম কই? আর সেই সাধু! তাঁহার ইচ্ছারই বা বল কত? এক ভীষ্মের মৃত্যু শুনিয়াছি, আর আজ হরিদাসের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিলাম স্বেচ্ছায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে।

'হরিদাস পৃথিবীর শিরোমণি ছিলেন। তাঁ'র মৃত্যুতে আজ জগৎ রত্ন শূন্য

হইল। বন্ধুগণ! শুন, হরিদাসের বিজয়োৎসব আজ যিনি দর্শন করিলেন, যিনি ইহাতে নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন, যিনি তাঁহার মহোৎসবে ভোজন করিলেন, আর যিনি সেই পবিত্র শরীরে বালুকা নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণ-প্রেম পাইবেন। অতএব বন্ধুগণ! জয়! জয়! হরিদাস! যিনি নাম মহিমা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, বলিয়া আজ জয়ধ্বনি কর, হরিনাম কীর্ত্তন কর, আপনারা পবিত্র হও।' তখন সহস্র মুখ হইতে 'জয় হরিদাস! জয় হরিদাস! জয় হরিনাম! জয় জয় পতিতপাবন হরিনাম! শব্দ উঠিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য হর্ষে, বিষাদে, বিচ্ছেদে, প্রেমে, পূর্ণ হইয়া অবিরলধারে অশ্রুধারা মোচন করিতে লাগিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিরহ-বিকার।

এখন হইতে শ্রীচৈতন্যের বিরহ-বিকার দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি অধৈর্য্য হইয়া 'হা কৃষ্ণ প্রাণধন! হা ব্রজেন্দ্রনন্দন! কোথা গেলে তোমায় পাব? কেমন ক'রে তোমার নিরূপম সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া থাকিব? কবে নিরন্তর তোমার মধুর মুরলীরবে আমার শ্রবণ যুগল জুড়াইবে?' বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দিবানিশি প্রাণের মধ্যে স্বাস্থ্য নাই; বিরহ-বেদনায় হৃদয় জর্জ্জরিত। দিবাভাগে এ ক্লেশ তিনি প্রকাশ করিতেন না বটে; কিন্তু রজনীতে নির্জ্জনে আসিলে তাঁহার কষ্টের সীমা থাকিত না; তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। সারা রাত্রি ছটফট করিতেন। স্বরূপ ও রামানন্দ ভিন্ন তখন কেহ নিকটে যাইতে পারিত না। তাঁহারা সময়োচিত গান গাইয়া, শ্রীকৃষ্ণের গুণ চরিত্রের কবিতা ব্যাখ্যা করিয়া এবং অনুরূপ প্রবোধ বাক্য শুনাইয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতেন।

জিজ্ঞাসা উঠিতেছে যে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মজীবন ত এখন দিন দিন পূর্ণতার দিকে ছুটিয়াছে; তবে এত বিরহ ব্যথা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির দেওয়া অসম্ভব। যে অগ্নিময়ী ভাবজ্বালা তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইত; যাহারা তাহা অনুভব করে নাই, তাহারা কেমন করিয়া উহার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে? তবে একটা কথা

মনে হয়, যে অনন্ত মাধুর্য্যের খনি ভগবান্‌কে যে যত জানে, সে তত জানে না; যে যত পায়, সে তত পায় না। আবার জানা ও পাওয়ার মাত্রা ভেদে বিরহের প্রখরতারও তারতম্য হইয়া থাকে। যাঁহার যত প্রেম, নিমেষ-বিরহে তাঁহার তত বেদনা। আমরা তাঁহাকে জানিও না, ভালও বাসি না; তাঁহার সম্বন্ধে বিচ্ছেদ বোধ সুতরাং আমাদের নাই।

গৌড়ীয় ভক্তগণের সস্ত্রীক আগমন।

এ বৎসর অদ্বৈত, শ্রীবাস, শিবানন্দ, আচার্য্য রত্ন, প্রভৃতি ভক্তগণ স্ত্রীপুত্র লইয়া চৈতন্য ভেটিতে চলিলেন। নবদ্বীপে শচীমন্দিরে প্রথমে ভক্তগণ সপরিবারে মিলিত হইয়া সেখান হইতে দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিলেন। আচার্য্যের স্ত্রী পুত্র, শিবানন্দের স্ত্রী ও তিন পুত্র, শ্রীবাসপত্নী মালিনীদেবী, আচার্য্য রত্নের পত্নী, প্রভৃতি বৈষ্ণবরমণীগণ চৈতন্যানুরাগে ব্যাকুল হইয়া মাসেকের পথ হাঁটিয়া চলিলেন। ধন্য গৌর! তোমার প্রেমের আকর্ষণ ধন্য!

নিত্যানন্দকে পুরুষোত্তমে যাইতে গৌরচন্দ্র নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি সে নিষেধ না মানিয়া আবেগে ধাইয়া চলিলেন। পাঠক মহাশয় জানেন শিবানন্দ সেন সকলের রক্ষকস্বরূপে খাওয়াইয়া ও ঘাটী সমাধান করিয়া লইয়া যাইতেন। পথে একদিন যাত্রীদিগকে রাজার ঘাটীওয়ালা প্রাপ্য করের জন্য বসাইয়া রাখিলে শিবানন্দ সকলের প্রতিভূ হইয়া ছাড়াইয়া দিলেন; ও হিসাব করিয়া পয়সা দিবার জন্য পশ্চাতে থাকিলেন। যাত্রীগণ অগ্রসর হইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল কিন্তু শিবানন্দ না থাকায় বাসা স্থির করিতে না পারিয়া বৃক্ষমূলে বসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে। যাত্রীগণ রৌদ্রতাপে ও পথ-শ্রান্তিতে ক্লিষ্ট ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। 'বাসা পাইলাম না; ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ যায়; শিবে কোথায়? এখনও এলো না; তার তিন বেটা মরুক!' বলিয়া নিত্যানন্দ ব্যাকুল হইয়া গালি দিতে লাগিলেন। শিবানন্দ আসিলে তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন 'বাসা না পে'য়ে গোঁসাই আমার বেটা কে'টে গালি দিতেছেন; এ তাঁ'র কোন বিচার?' শিবানন্দ হাসিয়া উত্তর করিলেন 'উঁহার তিরস্কারে কি কাঁদিতে আছে? ও যে আশীর্ব্বাদ।'

শিবানন্দ নিত্যানন্দের নিকটে আসিলে নিতাই উঠিয়া সজোরে তাঁহার

বক্ষে পদাঘাত করিলেন। শিবানন্দ তাহাতেও মহানন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন 'সত্যসত্যই আজ আমার মহা সৌভাগ্য। কেন না আজ আমাকে তুমি ভৃত্য ব'লে স্বীকার করিলে।' তখন বাসা ঠিক করিয়া দিয়া তিনি যাত্রীগণের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্তসেন মাতুলের অপমানে দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন 'আমার মাতুল চৈতন্যপার্ষদ; তাঁহাকে নাথি মে'রে আজ গোঁসাই কি ঠাকুরালিই করিলেন?' শ্রীকান্ত বিরক্ত হইয়া যাত্রীসঙ্গ ছাড়িয়া মাতুলের অজ্ঞাতে একাকী নীলাচলে চলিয়া গেলেন এবং পেটাঙ্গী গায়ে শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করিলে, গোবিন্দ পেটাঙ্গী ছাড়িয়া প্রণাম করিতে উপদেশ দিলেন। শ্রীচৈতন্য হাসিয়া গোবিন্দকে বলিলেন 'আহা! বালক মনোদুঃখ পাইয়া আসিয়াছে; ইহাকে কিছু বলিও না, যাহা ইচ্ছা, করুক্।' এবং শ্রীকান্তকে সকলের কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলে শ্রীকান্ত নাথি মারার কথা গোপন রাখিয়া আর সব বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। যথা সময়ে ভক্তগণ আসিয়া চৈতন্য দর্শন করিলেন। মহিলাগণ দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শন-প্রণাম করিয়া মহাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সকলে স্ব স্ব বাসায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ স্বীয় পুত্র তিনটীর পরিচয় করিয়া দিলে চৈতন্যদেব কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কি? হইয়াছে জিজ্ঞাসিলেন। শিবানন্দ উত্তর করিলেন 'আপনার আজ্ঞানুসারে পরমানন্দ দাস রাখিয়াছি।' শ্রীচৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন 'ইহাকে পুরীদাস বলিয়া ডাকিও' এবং আদর করিয়া স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ বালকের মুখে দিলে বালক তাহা চুষিতে লাগিল। চৈতন্যদেব গোবিন্দের প্রতি বৈষ্ণব মহিলাদের যত্ন ও সেবা করিতে আদেশ করিলেন। শিবানন্দের গোষ্ঠিকে প্রভু নিজ পরিবার বলিয়া স্বীকার করিলে ভাগ্যবান্ শিবানন্দ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

এক ব্যক্তি 'মুই পরমেশ্বরা' বলিয়া প্রণাম করিলে চৈতন্যদেব দেখিলেন তাঁহার বালককালের পরিচিত পরমেশ্বর মোদক। ইহার বাড়ী নবদ্বীপে, গৌরের গৃহের নিকটে। বাল্যকালে তিনি তাহার কতই মোয়া, নাড়ু, সন্দেস, খাইয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসিলেন 'পরমেশ্বর! ভাল আছ ত? বেশ হ'য়েছে, জগন্নাথ দেখিতে আসিয়াছ।' পরমেশ্বর বলিলেন, 'মুকুন্দার মাও এসেছে।'

মুকুন্দার মাতার নাম শুনিয়া শ্রীচৈতন্য কিছু সঙ্কুচিত হইলেন। সে উদ্ধত পাগল; কিন্তু বালককাল হইতে তাঁহাকে বড় ভালবাসিত। সে তাঁহার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম মান্য করিয়া দূরে থাকিবার লোক নহে।

এবারেও পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত লীলা হইল। অধিকন্তু মালিনী দেবী প্রভৃতি মহিলাগণ স্বহস্তে বিবিধ অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া গৌরকে নিত্য নিমন্ত্রণ খাওয়াইতে লাগিলেন।

পুরীদাস যখন সাত বৎসরের বালক, পিতা মাতার সঙ্গে আর একবার চৈতন্য দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে বলিলে বালক নীরবে থাকিল, কোন উত্তর দিলে না। চৈতন্যদেব হাসিয়া বলিলেন 'আমি কতশত লোককে কৃষ্ণনাম দিলাম; আর এ বালককে বলাইতে পারিলাম না।' স্বরূপ গোঁসাই উত্তর করিলেন 'আমার মনে হয়, বালক তোমার নিকট কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা পাইয়া প্রকাশ করিতেছে না।' অন্য সময়ে গৌরচন্দ্র বালককে শ্লোক পড়িতে বলিলে পুরীদাস কৃষ্ণগুণ বর্ণনা করিয়া সংস্কৃতভাষায় এক শ্লোকাবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আশ্চর্য্য করিয়াছিলেন। এই পুরীদাসই উত্তরকালে চৈতন্যচরিতের প্রধান আখ্যাতা কবিকর্ণপুর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

চারিমাস পরে গৌড়ীয় ভক্তগণের দেশে যাইবার সময় উপস্থিত হইলে চৈতন্যদেব প্রেমে গদ্গদ হইয়া তাঁহাদের বিদায় দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন:—'প্রাণের বন্ধুগণ! তোমরা বর্ষে বর্ষে আমাকে দেখিতে আসিতে কতই কষ্ট পাও। তোমাদের ক্লেশ মনে হইলে আসিতে নিষেধ করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু তোমাদের সঙ্গসুখ লোভে বলিতেও পারি না। নিতাইকে নিষেধ করিয়াছি, তবু আসিতে ছাড়েন না। আচার্য্য গোঁসাই বৃদ্ধাবস্থায় স্ত্রীপুত্র পরিবার ফেলিয়া দুর্গম পথ অতিবাহিত করিয়া প্রতিবর্ষে আসিয়া থাকেন। আর এই মহিলাগণ নানা ক্লেশ সহিয়া এত দূর আসিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আমি এখানে স্বচ্ছন্দে বসিয়া আছি; তোমাদের জন্য আমাকে কোন ক্লেশ করিতে হয় না। আমি ফকীর-মানুষ, কি ধন আছে তোমাদের প্রেমের ঋণ পরিশোধ করি? একমাত্র শরীর আছে; তাহা ত তোমাদের সমর্পণ করিয়াছি।' ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের প্রেমবাক্যে মুগ্ধ হইয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথ ভট্টের মিলন।

তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের কথা পাঠকের মনে আছে। শ্রীচৈতন্য কাশীধামে তপনগৃহে যখন দুই মাস কাল অবস্থিতি করিয়া সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তখন বালক রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের পদসেবা করিতেন, উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভোজন করিতেন এবং বর্ত্তনাদি পরিষ্কার করিতেন। রঘুনাথ যৌবনে পদার্পণ করিয়া পিতা মাতার আজ্ঞা লইয়া শ্রীচৈতন্যকে দেখিতে গৌড়দেশ দিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পথে রামদাস বিশ্বাস নামে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশোদ্ভব ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল। রামদাস সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ, বিশেষতঃ কাব্যপ্রকাশাদি অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক। ইনি রামোপাসক পরম ভক্ত, দিবানিশি সাধনভজনে অনুরক্ত; সম্প্রতি সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতে যাইতেছেন। রামদাস রঘুনাথের চরণে পড়িয়া তাঁহার ভৃত্যত্ব যাচিয়া লইলেন। এরূপ প্রবীণ ব্যক্তির পরিচর্য্যা লইতে সঙ্কুচিত হইয়া রঘুনাথ বার বার তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু রামদাস নিবৃত্ত হইবার লোক নহেন; বলপূর্ব্বক তাঁহার তল্পী মাথায় করিয়া বহিয়া চলিলেন।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য পুরুষোত্তমে পৌঁছিয়া চৈতন্যচরণ বন্দনা করিলে, শ্রীচৈতন্য প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। পরে পরিচয় পাইয়া পরমাদরে আলিঙ্গন করিলেন; মিশ্রের ও শেখরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং স্বরূপাদি ভক্তগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়া সে দিন নিজ বাসায় রাখিয়া পরমযত্নে মহাপ্রসাদ খাওয়াইলেন। পরদিন গোবিন্দ একটী স্বতন্ত্র বাসা করিয়া দিলে রঘুনাথ তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রামদাস বিশ্বাস চৈতন্যচরণ বন্দনা করিয়া নীলাচলবাসী হইলেন এবং পট্টনায়কের পুত্রদিগকে কাব্য প্রকাশ পড়াইতে লাগিলেন।

রঘুনাথ ভট্ট আট মাস কাল পুরুষোত্তমে বাস করিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সকল বৈষ্ণবের সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইয়া, সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার বিনয়, বৈরাগ্য ও ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া প্রীত হইলেন। রঘুনাথ অল্পবয়সেই পাকবিদ্যা-বিশারদ; মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া সুস্বাদু খাদ্য সকল খাওয়াইতে লাগিলেন।

বিদায়কালে শ্রীচৈতন্য রঘুনাথকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া পিতা

মাতার সেবা করিতে ও বৈষ্ণবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পড়িতে উপদেশ দিলেন, এবং এক কণ্ঠমালা তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিয়া আলিঙ্গন করিয়া বারাণসী পাঠাইলেন। রঘুনাথ ভট্ট গৃহে আসিয়া সাবধানে চারি বৎসর কাল বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করিতে লাগিলেন এবং এক বৈষ্ণবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া পারদর্শিতা লাভ করিলেন। পিতা মাতার কাশীলাভ হইলে রঘুনাথ উদাসীনের ব্রত লইয়া পুনরায় নীলাচলে আসিলেন এবং আর আটমাস কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া চৈতন্যদেবের বিশেষ কৃপা লাভ করিলেন। শ্রীচৈতন্য রঘুনাথকে বলিলেন, 'তুমি আমার আজ্ঞায় বৃন্দাবনে যাইয়া রূপ সনাতনের সহিত মিলিত হইয়া সাধন ভজন করগে। সর্ব্বদা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে ও কৃষ্ণনাম জপ করিলে, অচিরে কৃতার্থ হইয়া কৃষ্ণপদ লাভ করিতে পারিবে।' যাইবার কালে শ্রীচৈতন্য রঘুনাথকে চৌদ্দ হাত লম্বা তুলসীমালা ও জগন্নাথের ছুটাপান বিড়া ভেট দিয়া বিদায় দিলেন।

রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়া চৈতন্যের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া কঠোর সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রূপ সনাতন তাঁহাকে আপন সহোদরের ন্যায় যত্ন করিয়া নিকটে রাখিলেন। রঘুনাথ ভট্ট ছয় গোস্বামীর অন্যতর গোস্বামী।

দেবদাসীর গান।

জগন্নাথ-মন্দিরে দেবদাসীগণ নিত্য সঙ্গীত করিয়া থাকে। একদিন যমেশ্বর টোটা যাইতে যাইতে, শ্রীচৈতন্য তানলয়যুক্ত সুমধুর স্বরে সঙ্গীত হইতেছে, শুনিতে পাইলেন। গীতগোবিন্দের পদ-বিশেষ গুর্জ্জরীরাগে গীত হইতেছে শুনিতে পাইয়া তাঁহার ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল। তিনি আত্মহারা হইয়াও সঙ্গীতের ধ্বনির বশবর্ত্তী হইয়া জগমোহনের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। পথে সিজের বেড়া ছিল; তাহার কাঁটা গায়ে লাগিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; তথাচ তাঁহার জ্ঞান নাই। তিনি আবেশে ধাইয়া গিয়া গায়িকাকে যেই আলিঙ্গন করিবেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে 'রমণীর গান' 'রমণীর গান' বলিয়া কে তাঁহাকে বলে ধরিয়া কোলে করিয়া লইল। 'স্ত্রী' নাম শুনিয়া তাঁহার বাহ্য জ্ঞান হইল; ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তিনি গোবিন্দের কোলে। প্রভুভক্ত গোবিন্দ তাঁহার ভাবাবেগ বুঝিতে পারিয়া ও উপস্থিত বিপদের আশঙ্কা করিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে দৌড়িয়া আসিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব বলিলেন 'গোবিন্দ! আজ তোমার জন্য আমার প্রাণ রক্ষা হইল। রমণী-সংস্পর্শ হইলে আমি দেহপাত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতাম। তোমার এ ঋণ আমি শোধিতে পারিব না।'

গোবিন্দ উত্তর করিলেন 'আমি ত কিছু করি নাই। জগন্নাথ তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'বৎস! আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দেহ রক্ষা করিবে। আমার ত হোঁস থাকে না। তুমি আমাকে সাবধান করিয়া দিবে।'

স্বরূপাদি ভক্তগণ এ বৃত্তান্ত শুনিয়া মহাভীত হইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জগদানন্দ পণ্ডিত।

পণ্ডিত জগদানন্দের অনেক কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যে ইঁহার প্রেমচেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণে সত্যভামার প্রেমের ন্যায় কুটিল। সনাতন গোস্বামীকে পণ্ডিত বৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ দিলে চৈতন্য দেবের ভৎর্সনায় তাহা কতক প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি বৈষ্ণব জগতে সত্যভামার অবতার বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীচৈতন্য শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার জন্য কোন সময়ে মহাপ্রসাদাদি সঙ্গে দিয়া পণ্ডিত জগদানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। জননীর তত্ত্ব-তল্লাস করিতে মাতৃ-ভক্ত চৈতন্য কখনই ভুলিতেন না। জগদানন্দ শচীমাতাকে পুত্রদত্ত উপহার দিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে এবং মধুর চৈতন্য-কথায় তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দ জগদানন্দকে পাইয়া এবং প্রভুর অন্তরঙ্গ জানিয়া পরমানন্দিত হইলেন। কতিপয় মাস নবদ্বীপে থাকিয়া পণ্ডিত অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে শান্তিপুরে গেলেন। আচার্য্য তাঁহাকে পাইয়া মহাহৃষ্ট হইলেন। সেখান হইতে জগদানন্দ যে যে গ্রামে চৈতন্যভক্ত ছিলেন, সে সমস্ত গ্রামই ভ্রমণ করিলেন এবং চৈতন্যের সুখকথায় সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। কুমারহট্ট গ্রামে শিবানন্দ সেনের বাস। সেন মহাশয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। পণ্ডিত মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া চৈতন্যদেবের ব্যবহারের জন্য এক পাক সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল

প্রস্তুত করিয়া লইলেন। উদ্দেশ্য—উৎকট সাধনভজনে প্রভুর বায়ুপিত্তের প্রকোপ হইলে এই তৈল কিঞ্চিৎ অঙ্গে ও মস্তকে লাগাইলে স্নিগ্ধ হইতে পারিবেন। কলসীর মুখ বন্ধ করিয়া অতি যত্নে বাহক দিয়া পণ্ডিত আগমন কালে ঐ তৈল নীলাচলে আনিলেন এবং গোবিন্দের নিকট দিয়া চৈতন্য-দেবের অঙ্গে মর্দ্দন করিয়া দিতে উপদেশ দিলেন।

গোবিন্দ তৈলের কথা শ্রীচৈতন্যকে জানাইলে তিনি বলিলেন 'সন্ন্যাসীর তৈল মর্দ্দন নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ সুগন্ধি তৈলের ত কথাই নাই। এক কাজ কর, জগন্নাথের প্রদীপে ঐ তেল জ্বালাইয়া দাও। পণ্ডিতের পরিশ্রম সফল হইবে।' গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছা পণ্ডিতকে জানাইলে পণ্ডিত দুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিলেন; কিছু উত্তর করিলেন না। গোবিন্দ দিন দশ পরে শ্রীচৈতন্যকে আবার বলিলেন 'পণ্ডিতের নিতান্ত ইচ্ছা, আপনি তৈল ব্যবহার করেন।'

চৈতন্যদেব এবারে ক্রোধ করিয়া উত্তর দিলেন, 'তবে একজন মর্দ্দনীয়া নিযুক্ত কর; নইলে তৈল মাখাইবে কে? এই সুখের জন্যই কি আমি সন্ন্যাস করিয়াছি? আমার সর্ব্বনাশ হ'লে তোমাদের সুখ হ'বে কি?'

গোবিন্দ আর কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। পর দিন প্রাতঃকালে জগদানন্দ আসিলে গৌর প্রেমভাবে বলিলেন 'পণ্ডিত! অনেক যত্নে তেল আনিয়াছ। আমি সন্ন্যাসী, তৈলে আমার অধিকার নাই। জগন্নাথের দীপে জ্বালাইয়া তোমার শ্রম সফল কর।'

জগদানন্দ ব্যঙ্গভাবে বলিয়া উঠিলেন 'কে তোমায় মিথ্যা কথা বলেছে? আমি ত বাঙ্গলা হইতে তৈল আনি নাই।' এই বলিয়া গৃহ হইতে তৈল-পূর্ণ কলসী আনিয়া চৈতন্যের অগ্রে আছাড় দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এবং আর কিছু না বলিয়া নিজ বাসায় যাইয়া ঘরে কপাট দিয়া শুইয়া থাকিলেন।

দুই দিন কাটিয়া গেল, পণ্ডিত গৃহাভ্যন্তরে শুইয়া আছেন, দুয়ার খোলেন নাই। গোবিন্দ ও শ্রীচৈতন্য অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পণ্ডিতের রাগ পড়ে নাই। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে চৈতন্যদেব মনে মনে যুক্তি স্থির করিয়া তাঁহার দ্বারে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'আজ আমি এখানে খাইব। পণ্ডিত! উঠিয়া পাক কর; মধ্যাহ্ন সময়ে ভোজনে আসিব' বলিয়া জগন্নাথ দর্শনে চলিয়া গেলেন।

রোগের উপযুক্ত ঔষধ পড়িয়াছে। পণ্ডিত আর থাকিতে পারিলেন না; উঠিয়া স্নানান্তে বিবিধ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া অন্ন প্রস্তুত করিলেন। যথাসময়ে চৈতন্যদেব আসিয়া আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'দ্বিতীয় পাত কর, তুমি আমি একত্র ভোজন করিব।' জগদানন্দ উত্তর করিলেন 'আপনি ভোজন করুন, আমি পরে খাইব। তোমার আজ্ঞা কি লঙ্ঘন করিতে পারি?'

শ্রীচৈতন্য খাইতে খাইতে বলিলেন 'ওহে! রাগে রাগে যে পাক করিয়াছ, তাহার তুলনা নাই। না জানি সহজ থাকিলে আর কি হইত?'

জগদানন্দ এমন করিয়া ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিলেন যে, গৌরচন্দ্র আর খাইয়া উঠিতে পারেন না। এক দ্রব্য না ফুরাইতেই আবার দেন। এক দ্রব্য দশবার করিয়া পরিবেশন করাতে গৌরের অত্যন্ত অধিক ভোজন হইল। তথাচ তিনি উঠিতে পারিলেন না, পাছে জগদানন্দ রাগ করিয়া আবার উপবাস করে; ভয়ে ভয়ে খাইতে লাগিলেন। অবশেষে চৈতন্য দেব প্রেমপূর্ণ ভাবে বলিতে লাগিলেন 'এক গুণের স্থানে দশগুণ খাওয়াইলে; এখন অনুমতি কর, উঠিয়া আচমন করি।'

আচমনান্তে পণ্ডিত গন্ধমাল্য পরাইয়া গৌরকে মুখবাস দিলেন। গৌরচন্দ্র বলিলেন 'আমি এই খানে বসি, তুমি আমার সম্মুখে ভোজন কর।'

জগদানন্দ উত্তর করিলেন 'আপনি বিশ্রাম করুন গিয়া। রামাই ও রঘুনাথ রসুয়ের পরিচর্য্যা করিয়াছেন; তাঁহাদের অন্ন ব্যঞ্জন দিয়া পরে আমি খাইব।'

শ্রীচৈতন্য গোবিন্দকে বলিলেন 'তুমি এখানে থাক; পণ্ডিতের ভোজন শেষ হইলে আমাকে সংবাদ দিও'। চৈতন্যদেব বিশ্রামার্থ চলিয়া গেলে পণ্ডিত গোবিন্দকে তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীচৈতন্যও 'পণ্ডিত খাইলেন কি না' জানিয়া আসিবার জন্য গোবিন্দকে ফেরত পাঠাইলেন। গোবিন্দ 'জগদানন্দের আহার হইয়াছে' সংবাদ দিলে তবে তিনি নিদ্রা যাইতে পারিলেন।

সন্ন্যাসের পর হইতে শ্রীচৈতন্য কলার বাসনা বিছাইয়া শয়ন করিতেন, অন্য শয্যা লইতেন না। কলার বাসনার আস্তরণে শুইয়া তাঁহার অঙ্গে ব্যথা হইত, জানিতে পারিয়া জগদানন্দ কোন সময় [illegible]

প্রস্তুত করিয়া গোবিন্দের নিকট দিয়াছিলেন, ও স্বরূপকে বলিয়া দিয়াছিলেন 'আপনি দেখিবেন যাহাতে প্রভু ইহা অঙ্গীকার করেন।' তোষক বালীশ দেখিয়া চৈতন্য দেব ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ কা'র কাজ?' উত্তরে জগদানন্দের নাম শুনিয়া কলহের ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেও সে শয্যা তুলিয়া ফেলিয়া কলার বাসনাতে শুইলেন। স্বরূপ বলিলেন 'পণ্ডিত জানিতে পারিলে কিন্তু ভারি দুঃখিত হইবেন।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'তবে একখান খাট আনিয়া দাও। জগদানন্দের কি ইচ্ছা, আমি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছে'ড়ে বিলাসীর মত বিষয়সুখ উপভোগ করি?'

জগদানন্দ এ কথা শুনিয়া খুব মনঃকষ্ট পাইলেন; কিন্তু মনোদুঃখ প্রকাশ না করিয়া বৃন্দাবনে যাইবার জন্য চৈতন্যদেবের আজ্ঞানুমতি চাহিলেন। সুচতুর শ্রীচৈতন্য তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আমার উপর রাগ ক'রে মথুরায় গিয়ে কি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে?' জগদানন্দ চৈতন্যের চরণ ধরিয়া গম্ভীরভাবে নিবেদন করিলেন, 'না তা নয়; অনেক দিন থেকে আমার বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা, তোমার আজ্ঞা ভিন্ন তো যে'তে পারি না।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তোমার এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য।' জগদানন্দ মৌন হইলেন। অন্যদিনে পণ্ডিত স্বরূপ গোস্বামীকে মনোবাঞ্ছা জানাইয়া অনুরোধ করিতে বলিলে স্বরূপ গৌরকে বলিলেন 'পণ্ডিতের পূর্ব্ব হইতেই বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা হয়েছে। তোমার অনুমতি চাহিলে তুমি রাগ করিয়া যাইতেছে বলিয়া, যাইতে দাও না। কিন্তু আমি বলি, একবার অনুমতি দাও, উনি বৃন্দাবন দেখিয়া আসুন।'

চৈতন্যদেব তখন জগদানন্দকে ডাকিয়া সরল মনে অনুমতি দিয়া এই সকল উপদেশ দিতে লাগিলেন:—'বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাইবে, পথে কোন ভয় নাই। কিন্তু তাহার পরে সঙ্গীভিন্ন পথ চলিও না। বাঙ্গালী দেখিলে দস্যুগণ লুটপাট করিয়া লইয়া মারিয়া ফেলে। মথুরায় সনাতনের সঙ্গে একত্র থাকিয়া বনাদি দর্শন করিও; কিন্তু গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিও না। মথুরার স্বামীদের আচরণ দেখিয়া হাসিও না; কেননা তাহা আমাদের আচার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সনাতনকে বলিও, আমিও একবার সেখানে যাইব; আমার জন্য যেন একটু স্থান করিয়া রাখেন। আর সেখানে অনেক দিন থাকিও না, শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।'

জগদানন্দ সকলের পাদবন্দনা করিয়া যাত্রা করিলেন; বনপথে বারাণসী পৌঁছিয়া তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে পরিচয় করিলেন; যথা সময়ে মথুরা আসিয়া সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইয়া দ্বাদশ বনাদি ভ্রমণ করিলেন; এবং গোকুলে যাইয়া দুইজনে নির্জ্জন গোফায় বাস করিয়া কৃষ্ণ কথায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত দেবালয়ে পাক করেন। সনাতন মহাবন হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া পণ্ডিতের আহার্য্য সরবরাহ করিয়া দেন। আর পণ্ডিত কোন কোন দিন সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান।

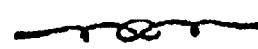
একদিন সনাতন গোঁসাই, মুকুন্দ সরস্বতী নামক জনৈক সন্ন্যাসীপ্রদত্ত একখানি রক্তবর্ণের বহির্ব্বাস মস্তকে বাঁধিয়া দ্বারে বসিয়া আছেন। জগদানন্দ তখন পাককার্য্যে নিযুক্ত। পণ্ডিত জিজ্ঞাসিলেন 'রক্তবস্ত্র কোথায় পে'য়েছ?' সনাতন মুকুন্দ সরস্বতীর নাম করিলে জগদানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া ভাতের হাঁড়ি তুলিয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন এবং পরক্ষণেই লজ্জিত হইয়া হাঁড়ি চুলার উপর রাখিয়া বলিতে লাগিলেন 'তুমি মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ ও প্রিয়তম বন্ধু। তুমি অন্য সন্ন্যাসীর বহির্বাস মাথায় বাঁধিলে কাহার সহ্য হয়?'

সনাতন পণ্ডিতের চৈতন্য-নিষ্ঠা প্রশংসা করিয়া নিজ দুষ্কার্য্যের জন্য ক্ষমা চাহিলেন।

দুইমাস কাল বৃন্দাবনবাসের পর সনাতনের নিকট বিদায় লইয়া জগদানন্দ পণ্ডিত নীলাচলে প্রত্যাগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সনাতন মহাপ্রভুর জন্য রাসস্থলীর বালুকা, গোবর্দ্ধনশিলা, গুঞ্জামালা, ও শুষ্ক পক্ক পীলুফল ভেট পাঠাইলেন; এবং বলিলেন 'প্রভুকে এখানে আসিতে বলিও, তাঁহার জন্য দ্বাদশাদিত্য-ঢিলায় একটী সুন্দর মঠ নির্দ্দিষ্ট থাকিল। মঠের নিকটে রসুই জন্য এক চালাও বাঁধাইয়া রাখিলাম।' জগদানন্দ সনাতনের চরণ বন্দনা করিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট পথে নীলাচলে আসিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে পাইয়া খুব তুষ্ট হইলেন। পণ্ডিত সনাতনের প্রদত্ত ভেট উপঢৌকন দিলে শ্রীচৈতন্য পীলুফল ভক্তগণকে খাইতে দিলেন। যাঁহারা সন্ধান জানিতেন, তাঁহারা ফলের ত্বক্ বাদ দিয়া আঁঠি চুষিয়া মিষ্টস্বাদ পাইলেন। কিন্তু যাঁহারা অনভিজ্ঞ, তাঁহারা চর্ব্বণ করিতে যাইয়া মহাবিপদে পড়িলেন; ঝালে প্রাণ ওষ্ঠাগত ও মুখ দিয়া লালা ভাঙ্গিতে লাগিল। রসিক চূড়ামণি শ্রীচৈতন্য তাহা দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইলেন।

উড়িয়া রমণী।

এখন হইতে শ্রীচৈতন্যের ভাববিকার গভীরতর হইতে লাগিল। এক দিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যেন যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিতেছেন। পৌর্ণমাসীর শুভ্র কৌমুদীপ্রভায় যমুনাসৈকত ধপ ধপ করিতেছে; মধ্যে রাধাকৃষ্ণ ও চারিদিকে গোপরামাগণ মণ্ডলীবদ্ধে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য ভাবে বিভোর হইয়া বৃন্দাবনে সত্য সত্যই 'কৃষ্ণ পাইয়াছি' বিবেচনায় নিমগ্ন হইয়া থাকিলেন। গোবিন্দ সেদিন তাঁহার দীর্ঘ নিদ্রা দেখিয়া জাগাইয়া দিলে স্বপ্নসুখে বঞ্চিত হইয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তথাচ ভাবের নেশা একবারে ছুটিল না। নিত্যকৃত্য সমাধানান্তে চৈতন্যদেব জগন্নাথমন্দিরে গেলেন এবং গরুড়ের সম্মুখে নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। এই দিন মন্দির মধ্যে লোকের বড় ভিড় হইয়াছিল। এক বৃদ্ধা উড়িয়া রমণী স্থান না পাইয়া গরুড়ে আরোহণ করিয়া নিমগ্নভাবে ঠাকুর দেখিতেছে। তাহার পদদ্বয় আলম্বিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের দুই স্কন্ধে যে পড়িয়াছে, তাহা তাহার জ্ঞান নাই। গোবিন্দ স্ত্রীলোকটীকে ভর্ৎসনা করিয়া নামাইয়া দিতে গেলে ভাবুকাগ্রগণ্য শ্রীচৈতন্য গোবিন্দকে বলিলেন 'বৎস! এমন কর্ম্ম করিও না। ইহার দর্শন-সুখে বাধা দিও না।' রমণী মহাপ্রভুকে দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে নামিয়া চরণ বন্দনা করিল। চৈতন্যদেব জগন্নাথে তাহার চিত্তের আবেশ লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আহা! এই রমণী কি ভাগ্যবতী! ইহার চরণ বন্দনা করি। ইহার কৃপায় যদি এমনি নিবিষ্ট-চিত্ততা পাইতাম, তবে কৃতার্থ হইয়া যাইতাম। জগন্নাথ ত জগন্নাথ নহেন, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন মুরলীবদন। আহা! এ জ্ঞান আমার কবে হইবে?' বাসায় আসিয়া চৈতন্যদেব যেমন প্রাপ্ত রত্ন হারাইলে লোক বিষণ্ণ হয়, তেমনি বিষণ্ণ মনে অধোবদনে বসিয়া নীরবে ভূমি লিখিতে লাগিলেন; দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তিনি এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কেবল 'বৃন্দাবনচন্দ্রে পাইয়া হারাইয়া ফেলিলাম; কে আমার কৃষ্ণধন হরণ করিয়া লইল? হায়! আমি কি করিব?' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।



ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দিব্যোন্মাদ।

ভক্তি-শাস্ত্রে দিব্যোন্মাদের লক্ষণ এইরূপে নিরূপিত হইয়াছে। প্রেম বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। মহাভাব দুই প্রকার, রূঢ় ও অধিরূঢ়। অধিরূঢ় মহাভাব কেবল গোপবালাগণেই সম্ভবে। ইহার প্রকার ভেদ দুই; মাদন ও মোহন। গভীর সম্ভোগাবস্থায় যে ভাববৈচিত্র্য দেখা যায়; তাহার নাম মাদন। আর বিরহাবস্থায় যে অনির্ব্বচনীয় ভাববৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়; তাহার নাম মোহন। চিত্রজল্পা ও উদ্‌ঘূর্ণা, তাহার দুই প্রকার ভেদ। ভ্রমরগীতার দশ শ্লোকে শ্রীমতী রাধার যে ভাবদশা বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে চিত্রজল্পার প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। বিরহে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইয়া যে ভ্রমময়ী বৈচিত্রী উৎপাদন করিয়া দেয়, তাহারই নাম দিব্যোন্মাদ।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের গানে কৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীর যে দশদশা বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের যে বিরহচেষ্টায় ভাববৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, ও পুরাণাদি অশেষ শাস্ত্রে যে চিত্র আরও ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, সেই সকল আশ্চর্য্যভাব দিন দিন শ্রীচৈতন্যের জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। উদ্ধব দর্শনে শ্রীরাধা যে প্রকার বিলাপ করিয়াছিলেন, দিব্যোন্মাদের অবস্থায় তিনি তেমনি বিলাপ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি সর্ব্বতোভাবে আপনাকে শ্রীরাধিকা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া বিরহ দশায় কৃষ্ণরূপসাগরে ডুবিয়া গেলেন।

বিরহ দশায় সম্ভোগ সম্ভবে কি? পাঠক বলিবেন, সে আবার কি? বিরহে কি কখন সম্ভোগ হইতে পারে? তাহা হইলে, তাহাকে বিরহ বলিব কেন? আমরা বলি তাহা হয়। যখন বিচ্ছেদের সুতীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় প্রাণ বিদ্ধ হইতে থাকে; তখন কি প্রিয়তমের প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায় না? তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রতিকার্য্য, হাবভাব, গতিবিধি, হাস্য পরিহাস, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, আচার ব্যবহার, রূপলাবণ্য, কথাবার্ত্তা; যে দিন যে কথাটী বলেছেন, বা কাজটী করেছেন, এমন কি তৎসম্বন্ধের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সকলও কি তখন মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে না? মনে হয় না কি, এই তিনি আমার চক্ষে চক্ষে ঘুরিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, অন্তরে বাহিরে

জাগিতেছেন ও মনে মনে কথা কহিতেছেন? সে বিরহ, বিরহই নয়, যা'তে এইরূপ তন্ময়ত্ব আনিয়া না দেয়। তন্ময়ভাব সম্ভোগ নয় ত আর কি? ভগবানের রূপ ত প্রাকৃত নহে। উহা অরূপ সচ্চিদানন্দ বা অপ্রাকৃত মদন-মোহন রূপ, সম্পূর্ণ আত্ম-প্রত্যক্ষের বিষয়। সুতরাং সেরূপে নিমগ্নভাবকে ত সম্ভোগ বলিবই, তা' ছাড়া তীক্ষ্ণ বিরহ-দশায় তন্ময়ত্বভাবকে সম্ভোগ ভিন্ন আর কি বলিব? তবে প্রথমোক্তে সেই রূপে ডুবিতেছি বোধ, প্রথমাবধিই থাকে; শেষোক্তে তাঁহাতে ডুবিতেছি জানিয়া মন নিমগ্ন হয় না। বিরহে ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া পরে ভক্তের অজ্ঞাতে নিমগ্নভাব আনিয়া দেয়। যে বিরহে ভক্ত মিলন সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, সে সামান্য বিরহ নহে। প্রেমিকগণ মিলন হইতে সেই বিরহই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। পদ্যাবলীতে শ্রীরূপ গোস্বামী এ সম্বন্ধে যে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা-তেও আমাদের কথা সমর্থিত হইবে। যথা,—

"সঙ্গম বিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্য।
একঃ সএব সঙ্গে ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥"

মিলন ও বিচ্ছেদ, ইহার কোন্‌টী বাঞ্ছনীয়? বিকল্প স্থলে মিলনাপেক্ষা বিচ্ছেদই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। কারণ মিলনে কেবল তিনিই সঙ্গে। কিন্তু বিরহে ত্রিভুবন তন্ময় হইয়া যায়। গৌরের বিরহ এই শ্রেণীর।

চিন্তা, অনিদ্রা, উদ্বেগ, ক্ষীণতা, অঙ্গমালিন্য, প্রলাপ, পীড়া, উন্মত্ততা, মোহ, এবং নিস্পন্দতা, এই দশ প্রকারের ভাব দিব্যোন্মাদে প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহাকে দশদশা বলে। শাস্ত্রে শ্রীরাধার এই অবস্থা বর্ণিত আছে। শ্রীমন্মহা প্রভুর সেই সব চিহ্ন প্রকাশ হইতে লাগিল। সুতরাং মহাভাবরূপিণী রাধা হইতে যে তিনি অভিন্ন প্রকৃতি, তাহাতে সন্দেহ কি? স্বরূপগোস্বামী ও রঘুনাথ দাস স্বীয় স্বীয় কড়চাতে এ সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তৎকালে শ্রীচৈতন্যের নিকটে থাকিয়া গুপ্তসেবাদি করিতেন এবং যখন যাহা অনুভব করিতেন, তাহা সংক্ষিপ্তরূপে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সুতরাং তাঁহাদের কড়চাবলম্বনে কবিরাজ গোস্বামী যাহা লিখিয়া গিয়াছেন; তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কারণ কি আছে?

এখন হইতে শ্রীচৈতন্য তিন অবস্থায় সময় যাপন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণভাবাবেশে তাঁহার আত্মস্ফূর্ত্তি অর্থাৎ ভগবান্ হইতে স্বাতন্ত্র্য একে-বারেই থাকিল না। তিনি কখন ভাবে নিমগ্ন হইয়া একেবারে বাহ্

স্ফূর্ত্তি হারাইয়া ফেলিতেন; ইহাকে অন্তর্দ্দশা বলিত। কখন অর্দ্ধবাহ্য স্ফূর্ত্তিতে ভাব সাগরে ডুবিয়া থাকিতেন ও কত কি প্রলাপ বলিতেন। আবার সময়ান্তরে বাহ্যস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াও অন্তরে কৃষ্ণরূপে ডুবিয়া থাকিতেন; বাহিরে দেহস্বভাবে স্নান, ভোজন, দর্শনাদি হইত। এই শেষোক্ত ভাবকে ভক্তগণ নিপটবাহ্য বলিতেন।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের শেষভাগে উল্লিখিত হইয়াছে যে 'কৃষ্ণধন পাইয়াও হারাইয়া ফেলিলাম; কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাইব?' বলিয়া সায়ং সময়ে শ্রীচৈতন্য বাসায় বসিয়া কৃষ্ণগুণ স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। যত রাত্রি বাড়িতে লাগিল, তাঁহার বিরহচেষ্টা ততই প্রবল হইতে লাগিল। তিনি স্বরূপ রামানন্দের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এইরূপ প্রলাপ বকিতে লাগিলেন :—

'বন্ধুগণ! কৃষ্ণ মাধুরীর অপরূপ শক্তির কথা শুনিবে? ঐ মাধুরী লোভে লুব্ধ হইয়া আমার মন বেদবিহিত ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া যোগী সেজে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। আহা! যোগীর সাজই বা কি অদ্ভুত! শুক কারিকর কৃষ্ণলীলা রূপ যে শঙ্খকুণ্ডল গড়িয়াছেন, সে তাহা কর্ণে পরিয়াছে; তৃষ্ণা-লাউ ও আশার ঝুলি স্কন্ধে ঝুলাইয়াছে; চিন্তা কন্থা গায়ে দিয়া দ্বাদশ উদ্বেগ হাতে লইয়া ও লোভের ঝুলনী মাথায় বাঁধিয়া ব্যাস শুকাদির রচিত কৃষ্ণলীলার তর্জ্জা পড়িতেছে; কিন্তু ভিক্ষাভাবে তাহার ক্ষীণ কলেবর। মন যোগী বড় সুচতুর; তাই দশেন্দ্রিয়কে শিষ্যত্বে বরণ ক'রে, আমার শরীররূপ গৃহে বিষয় ভোগ ছাড়িয়া দিয়া মহা-বাউল নাম লইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছে ও সেখানে স্থাবর জঙ্গম বৃক্ষ লতা প্রভৃতি প্রজাবৃন্দের নিকট ফল মূল পত্রাদি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণরস, কৃষ্ণের মধুর ধ্বনি, কৃষ্ণের সৌরভ ও স্পর্শসুখ রূপ সুধারস গোপীগণ নিরন্তর আস্বাদন করিতেছেন। আমার মন-যোগীর ইন্দ্রিয় শিষ্যগণ তাঁহাদের ভুক্তশেষ প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিয়া গুরুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। মন আমার কৃষ্ণ-বিয়োগে দুঃখিত হইয়া সাক্ষাৎ দর্শন মানসে যোগী সাজিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছে বটে; কিন্তু নিরঞ্জন কৃষ্ণাত্মার দর্শন না পাইয়া শূন্য কুঞ্জে বসিয়া যোগ ধ্যানে রাত্রি জাগরণ করিতেছে এবং বিরহে ব্যাকুল হইয়া দশদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। হায়! এখানে আমার শরীররূপ আলয় যে শূন্য পড়িয়া রহিল!'

রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্যের উদ্বেগ বৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সময়োচিত শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ; আর স্বরূপ সুমধুর স্বরে সঙ্গীত করিলেন। তাহাতে চৈতন্যদেব বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া কিছু সুস্থ হইলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে ভিতর প্রকোষ্ঠে শোয়াইয়া রামানন্দ রায় স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ দ্বারদেশে শুইয়া রহিলেন এবং প্রভু উচ্চ করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বরূপ জাগরিত হইয়া কোন শব্দ শুনিতে না পাইয়া সন্দিগ্ধ হইলেন এবং প্রদীপ লইয়া গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া মহাপ্রভুকে না দেখিয়া একেবারে বিস্মিত ও ভীত হইলেন। এবং গোবিন্দকে জাগাইয়া মসাল জ্বালিয়া অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে অন্বেষণে বাহির হইলেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বাড়ীর তিন প্রকোষ্ঠের দ্বার যেমন তেমনি অর্গল বদ্ধ রহিয়াছে ; অথচ চৈতন্যদেব অভ্যন্তরে নাই। যাহা হউক, খুঁজিতে খুঁজিতে, সিংহদ্বারের উত্তর দিকে স্বরূপাদি দেখিলেন, চৈতন্য গোঁসাই অতি দীর্ঘাকার ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ ভয়াকুল হইলেন। অচেতন দেহ, নাশার শ্বাস নাই, হাত পা গুলি তিনহাত পরিমিত দীর্ঘ, হস্তপদাদির গ্রন্থি সকল বিতস্তি প্রমাণ শিথিল, উপরে চর্ম্মমাত্র রহিয়াছে ; উত্তান নয়ন, মুখে লালা ও ফেণা ভাঙ্গিতেছে। স্বরূপাদি ভক্তগণ হৃদয়বিদারক এই দশা দেখিয়া দুঃখে বিদীর্ণ হইলেন এবং যুক্তি করিয়া উচ্চ করিয়া তাঁহার কর্ণমূলে কৃষ্ণনাম ডাকিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে, হরিবোল বলিয়া চৈতন্যদেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন। অস্থিসন্ধি সকল তখন পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক হইল। সিংহদ্বারে আছেন দেখিয়া, শ্রীচৈতন্য বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এখানে কেন ? কি করিতেছ ?' স্বরূপ উত্তর করিলেন 'বাসায় চল, সকল বলিব।'

বাসায় আসিয়া স্বরূপের মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীচৈতন্য বলিতে লাগিলেন 'আমার কিছুই মনে নাই। কেবল শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখা দিয়া বিদ্যুতের ন্যায় অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছিলেন, এই দেখিয়াছি মাত্র।'

রঘুনাথ দাস চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষে এই লীলা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

'ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি সুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথৎ শ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিক দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ

লুঠন্ ভূমৌ কা কা বাণ্যা বিকলং গদগদ বচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি।'

কোন সময়ে কাশীমিশ্রের আলয়ে কৃষ্ণের প্রবলবিরহে যাঁহার অঙ্গ-সন্ধি সকল শিথিল হইয়া হস্তপদ অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছিল, যিনি 'কা' 'কা' বলিয়া ভূমিতে লুণ্ঠন করিতে করিতে গদগদ বচনে ও বিকলচিত্তে কত রোদন করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ এখনও হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষোন্মত্ত করিতেছেন।

চটকগিরি গমন।

এক দিন চৈতন্যচন্দ্র সমুদ্রস্নানে যাইবার কালে দূরস্থ চটকগিরির শোভা দেখিয়া আবিষ্ট চিত্তে গোবর্দ্ধন গিরি জ্ঞানে তাহার দিকে ছুটিয়া চলিলেন। গোবিন্দ পশ্চাতে যাইতেছিলেন; প্রভুর ভাবাবেশ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ও বিপদ্‌পাতের আশঙ্কা করিয়া অত্যুচ্চরবে স্বরূপাদি ভক্তগণকে ডাকিতে ডাকিতে, তাঁহার পাছে পাছে দৌড়িতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রথমে বাতাসের ন্যায় ছুটিতেছিলেন; পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ চলৎশক্তি হীন হইয়া স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। গোবিন্দ যখন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন; তখন তিনি অজ্ঞান, রোমাবলি কদম্ব-কেশরের ন্যায় উদ্গত, রোমকূপগুলি মাংসব্রণের আকার ধরিয়াছে, তাহা দিয়া রুধিরধারা পড়িতেছে, কণ্ঠ ঘর্ঘর করিতেছে, শরীর বিবর্ণ হইয়াছে, যেন রক্ত-শূন্য; কেবল মুদিত নয়নযুগল দিয়া অনবরত অশ্রুধারা পড়িতেছে। প্রভুভক্ত গোবিন্দ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হস্তস্থিত করঙ্গের জল সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন করিতে এবং বহির্ব্বাস দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নগরে একটা মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। ভক্তগণ যিনি যেখানে ছিলেন, চারিদিক্ হইতে পর্ব্বতাভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন। স্বরূপ, জগদানন্দ, রঘুনাথ, গদাধর পণ্ডিত, রামাই, নন্দাই, নিলাই, শঙ্কর পণ্ডিত, পুরী গোঁসাই, ও ভারতী গোঁসাই, প্রভৃতি সকলেই গোবিন্দের চীৎকার শুনিয়া অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া শশব্যস্তে যাইতে লাগিলেন। স্বরূপাদি আসিয়াও শ্রীচৈতন্যকে তদবস্থই দেখিলেন। নানা শুশ্রূষা হইতে লাগিল। স্বরূপ

তাঁহার শ্রবণ মূলে উচ্চৈঃস্বরে নাম ডাকিতে লাগিলেন। তিনি অনেক ক্ষণ পরে 'হরিবোল' বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন জগন্মঙ্গল হরিনামে ভক্তগণ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সকলের মুখেই আনন্দ ও উৎসাহ-চিহ্ন দেখা গেল। চৈতন্যদেব চেতনা পাইয়াও নিপট বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই; অর্দ্ধ বাহ্যজ্ঞানে এ দিক্ ওদিক্ চাহিয়া কি যেন দেখিতেছিলেন; দেখিতে পাইতেছেন না, মনে করিয়া স্বরূপকে বলিতে লাগিলেন 'আজ আমি আবার কৃষ্ণ দর্শনে গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম; সেখান হইতে কে আমায় এখানে আনিল? আহা! গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়াই দেখিলাম, কৃষ্ণ গোধন চরাইতে চরাইতে মুরলী নিস্বন করিলে সখীসঙ্গে রাধা ঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত। কৃষ্ণ তখন রাধায় লইয়া গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন; সখীগণ পুষ্প চয়ন করিতে চলিয়া গেলেন। এমন সময়ে তোমরা গোলমাল করিয়া আমায় এখানে আনিলে। হায়! কৃষ্ণলীলা দেখিয়াও দেখিতে পাইলাম না! তোমরা আমায় সে সুখে বঞ্চিত করিলে কেন?' বলিয়া চৈতন্যদেব কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময়ে পুরী ভারতীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তিনি বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাদের বন্দনা করিলেন। তাঁহারা প্রেমালিঙ্গন করিলে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসিলেন 'এত দূরে আসিয়াছেন কেন?'

পুরী হাসিয়া উত্তর দিলেন 'তোমার নৃত্য দেখিতে।'

শ্রীচৈতন্য লজ্জিত হইয়া সকলের সঙ্গে তখন সমুদ্রস্নান ও মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া বাসায় বিশ্রাম করিতে গেলেন। রঘুনাথের স্তবকল্পবৃক্ষে এ লীলা এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নীলাদ্রির সমীপে চটকগিরি দেখিয়া 'এখান হইতে আমি বৃন্দাবনগোষ্ঠে গোবর্দ্ধন দর্শন করিতে যাই' বলিয়া যিনি উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইলে পশ্চাদাগত নিজগণ কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন, আহা! সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় হর্ষোন্মত্ত করিতেছেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যান-বিহার।

চক্ষুরাদি পাঁচ ইন্দ্রিয় জীবাত্মার জ্ঞানোপার্জ্জনের দ্বার; রূপাদি পাঁচটী জ্ঞানের বিষয়। পাঁচে পাঁচের যোগে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ভগবল্লীলাসুধ্যান। পাঁচে

পাঁচের অনুকূল যোগে জীবের সুখের জ্ঞান; প্রতিকূল যোগে দুঃখানুভব। কিন্তু যে আত্মা প্রতিকূল পাঁচকে বিবেক ও বৈরাগ্যের দ্বারা অনুকূল করিয়া লইয়া সর্ব্বত্র সমান ভাবে ভগবৎস্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিয়াছেন; তিনিই ধন্য! যোগ রাজ্যের লোভনীয় স্থান তাঁহারই অধিকৃত হইয়াছে। আবার যিনি পাঁচে পাঁচের যোগে ব্রহ্মাণ্ডের আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতে লীলারসময় শ্রীহরির নিরুপাধি রূপ, সুমধুর বাণী, সুশীতল স্পর্শ, অপ্রাকৃত রস, এবং সৌরভময় অঙ্গগন্ধ পাইয়া মহাভাবে বিভোর হইয়া যাইতে পারেন, তিনি মহাভক্ত; মহাপ্রেমিক। এরূপ ভগবদ্ভক্ত জগদ্বাসীর উদ্ধারের জন্যই কেবল অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে শ্রীমতী রাধিকার এই মহাদর্শন বর্ণিত আছে। আজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের ইন্দ্রিয় দুয়ার খুলিয়া গিয়া হৃদয়ে সেই মহাদর্শনের ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। তাই তিনি স্বরূপ রামানন্দের কণ্ঠ ধরিয়া মনের কথা বলিতে বলিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন:—

'শুন বন্ধুগণ! আমার কষ্টের কথা। পাঁচজনের টানাটানিতে পড়িয়া আমার মন অশ্বটী আর বাঁচিল না। পাঁচটী ইন্দ্রিয় অতিশয় বলবান্; তাহারা যুগপৎ অশ্বটীর উপর চড়িয়া পাঁচ দিকে টানিতেছে। বেচারা কোন্ দিকে যায়, বল দেখি? অথবা ইন্দ্রিয় পাঁচজনেরই বা দোষ দিই কেন? কৃষ্ণরূপাদি পাঁচটী বিষয় তা'দের নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছে। এ মহাকর্ষণের বলে তাহারা যে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আশ্চর্য্য কি? কোন্ ইন্দ্রিয়ের এমন শক্তি আছে, যে এই মহাকর্ষণের টানে স্থির থাকিতে পারে? নিরুপম কৃষ্ণরূপ সাগরের এক বিন্দুতে কত কত ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া যায়; তা' আমার ক্ষুদ্র নয়ন দুইটীর অপরাধ কি? বচনমাধুরীর কি অন্যায় দেখ দেখি! ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন কাণের কাছে নিরন্তর ডাকিয়া ডাকিয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। সুশীতল অঙ্গস্পর্শের কথা কি বলিব? আমার স্পর্শেন্দ্রিয়কে একেবারে মাতাইয়া দিয়াছে। আর শ্রীঅঙ্গ সৌরভেরই বা বিক্রম কত? উহা নাশার মধ্যে যেন বাসা পাতিয়া সুগন্ধে বিভোর করিয়া তুলিয়াছে। রসময় অধরামৃতের লোভে আমার রসনা আর সব রস ছাড়িয়া উহা আস্বাদনেই মাতিয়া গিয়াছে। তাইতে বলি, ইন্দ্রিয়গ্রামের দোষ কি? তা'রা সামান্য শক্তিসম্পন্ন বইতো নয়। ওহে স্বরূপ! ওহে রায়! আবার তাও বলি, ইন্দ্রিয় সকলেরই বা সার্থকতা কি, যদি তাঁহাতে না মজিল? বল দেখি সে নয়ন থাকার ফল কি, যে নয়ন সে মদনমোহন রূপ-

সাগরে না ডুবিল ? অশেষ লাবণ্যের আকর সে মুখচন্দ্র না হেরিল ? সে কাণ কি কাণাকড়ির ছিদ্রের ন্যায় ব্যর্থ নয়, যে শ্রবণে তাঁহার অমৃত-তরঙ্গিণী মধুর বাণী প্রবেশ না করিল ? রসময় বাঁশীর গান মধুধারা ঢালিয়া না দিল ? সে জিহ্বা ত ভেকের জিহ্বার ন্যায় নীরস, যে জিহ্বা তাঁহার সুধা-সার অধরামৃত আস্বাদন না করিল ; তাঁ'র রসে মজিয়া না গেল ? সে নাসিকা ভস্ত্রাযন্ত্রের ন্যায় জীবনহীন ; তাহার মৃত্যুই বা হয় না কেন, যে নাসিকা শ্রীঅঙ্গ পরিমলে মাতিয়া না যায় ? সে শরীর কি লোহার মত কঠিন নয়, সে কঠিন শরীরে জীবনই বা থাকে কেন, যে শরীর কোটিচন্দ্র হইতেও সুশীতল, স্পর্শমণি হইতেও সুখস্পর্শ, তাঁহার চরণস্পর্শে বঞ্চিত ?

'শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে করিতে আমার কি হ'য়েছিল, জান ? যখন নয়ন-চকোর সেই রূপ-সাগরে ডুবিয়া সুধাপান করিতেছিল, তখন দুইটা শত্রু এসে আমার মনকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। আমি অনেক যত্নেও রাখিতে পারিলাম না। শত্রু দুইটার নাম দর্শনলালসা ও দর্শনানন্দ। এ দুইটা কৃষ্ণ-দর্শনের বিষম বৈরী। এবারে যদি ভাগ্যে কখন দর্শন পাই ; তাহা হইলে সেই শুভ ঘটিকা, দণ্ড, বা পলকে, আমি রত্নালঙ্কারে সাজাইয়া চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিব। আনন্দ ও লালসা-বৈরীকে আর আসিতে দিব না।'

স্বরূপ গান করিলেন, রামানন্দ কর্ণামৃত বিদ্যাপতি ও গীতগোবিন্দের অংশ বিশেষ পড়িয়া শ্রীচৈতন্যকে অনেকসুস্থ করিলে তিনি সমুদ্রতীরে ভ্রমণার্থে বাহির হইলেন এবং পথপার্শ্বে প্রমোদোদ্যান দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। ভাগবতোক্ত রাসলীলার ছবি মনে পড়িয়া তাঁহাকে একেবারে আত্মহারা করিয়া তুলিল। রাসমণ্ডলী হইতে ভগবান্ শ্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলে বিরহ-বিধুরা গোপ-রামাগণ যেমন করিয়া নিকুঞ্জকানন, গিরিগোবর্দ্ধন ও যমুনাপুলিনের প্রতি তরু লতাকে জীবন্ত মনে করিয়া প্রাণনাথের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিলেন ; শ্রীচৈতন্য সেইভাবে বিভোর হইয়া ভাগবতের শ্লোকাবৃত্তি করিতে করিতে উদ্যান মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

হেচুত ! পিয়াল ! পনস ! কোবিদার ! পীতরসাল ! জম্বু ! অর্ক ! বিল্ব ! বকুল ! আম্র ! কদম্ব ! নীপ ! তোমরা তীর্থবাসী, পরোপকারের জন্যই তোমা-দের জন্ম। আমি কৃষ্ণবিরহে বড় ব্যাকুল হইয়াছি। তাঁকে কি তোমরা

দেখেছ? তাহারা কোন উত্তর করিল না দেখিয়া, মুগ্ধ গৌর মনে করিলেন, ইহারা পুরুষজাতি, কৃষ্ণের সখা। ইহারা সখাকে পাইয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে; আমাকে সংবাদ বলিবে কেন? ভাবিয়া সম্মুখে মল্লিকাদি লতা দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন 'হে মালতি! মল্লিকে! তুলসি! যূথি! মাধবি! তোমরা ত আমার প্রিয়সখী; মাধব কোথায় বলিয়া আমার প্রাণ রাখ।' এবারেও কোন উত্তর না পাইয়া ভাবিলেন 'বুঝিয়াছি, ইহারা কৃষ্ণদাসী। প্রভুর ভয়ে তাঁহার উদ্দেশ বলিতেছে না। দেখি দেখি এই হরিণী কিছু বলিয়া দেয় কি না?' এই ভাবিয়া উন্মত্তা গোপবালাদিগের ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন:— 'সখি হরিণি? বল দেখি কৃষ্ণকান্তার সহিত কৃষ্ণ এখানে আসিয়া তোমার নয়ন রঞ্জন করিয়াছিলেন কি না? আমরা কিশোরীর প্রিয়সখী, আমাদের নিকটে ত তাঁর অঙ্গগন্ধ লুকাইবে না। এই যে কুঙ্কুম সংস্পৃক্ত কুন্দমালা পড়িয়া রহিয়াছে; ইহা হইতে যে তাঁ'র অঙ্গ সৌরভ বাহির হইতেছে।' কোন উত্তর না পাইয়া শচীনন্দন ভাবিলেন 'কৃষ্ণশোকে এ বিরহিণী; তাই কিছু বলিতেছে না। আচ্ছা, দেখি ফলপুষ্প ভরে অবনত-শাখ এই তরুগণ কিছু বলে কি না? ইহারা কৃষ্ণদর্শন না পাইলে এরূপ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিত না। অবশ্যই তাঁহার সন্ধান জানে।' অগ্রবর্ত্তী হইয়া গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন, 'ওহে বৃক্ষগণ! ভাই বল ত লীলাকমল হাতে লীলাময় এখানে আসিয়াছিলেন কি না? তোমাদের অভিবাদন কি তিনি স্বীকার করিয়াছেন? তাহারাও নীরব দেখিয়া চৈতন্যচন্দ্র ধাইয়া সাগরকূলাভিমুখে যাইয়া উপকূলস্থিত কদম্ব তরুতলে 'কৃষ্ণ দেখিলাম' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বাঙ্গে পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক প্রকাশ পাইল; কিন্তু তিনি অন্তরে আনন্দ আস্বাদ করিতে লাগিলেন। স্বরূপাদি শীঘ্র তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলে তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন:—'বন্ধুগণ! মুরলীবদনের অপার সৌন্দর্য্যে আমার চিত্ত মন ডুবিয়া গিয়াছে। এখনই সে অপরূপ রূপ দেখিলাম। হায়! আবার কোথায় লুকাইল?' শ্রীচৈতন্য আর এক শ্লোকাবৃত্তি করিয়া শ্রীরাধার বাক্যানুসরণে রূপ বর্ণনা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন:—'বন্ধুহে! কৃষ্ণ-রূপ অদ্ভুত বলাহক না দেখিয়া আমার প্রাণচাতকী পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে। সুমন্দ স্মিততায় চিক্ চঞ্চলা সৌদামিনী, ভক্তশ্রেণী বকপংক্তি, সুরঞ্জিত ভাবময় ময়ূর পাখা ইন্দ্রধনু, মুরলীর গভীর গর্জ্জন জীমূতধ্বনি এবং অকলঙ্ক লাবণ্য চন্দ্রোদয় তাহাতে হাসিতেছে! এই নব ঘন লীলামৃত-জল

বর্ষণ করিতে করিতে আমার চিত্তক্ষেত্রে দেখা দিবা মাত্রই দুর্দৈব ঝঞ্ঝাপবন তাহা উড়াইয়া লইয়া গেল। চাতকী জল পানে বঞ্চিত হইয়া পিপাসায় ছট্‌ফট করিতেছে।'

শ্রীচৈতন্য 'পড়' 'পড়' করিয়া রামানন্দকে অনুরোধ করিলে, রামরায় শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য অনেক বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন :—কৃষ্ণ অতি চঞ্চল, একস্থানে অনেকক্ষণ তিষ্ঠিয়া থাকেন না। এই এখনি দেখা দিয়া আমার কপাল দোষে কোথায় চলিয়া গেলেন! স্বরূপ! এমন একটী গীত গাও, যাহাতে আমি চিত্তের স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারি।'

স্বরূপ গোঁসাই সুমধুর স্বরসংযোগে গীতগোবিন্দের পদ গাইতে লাগিলেন।

'রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্।'

গান শুনিয়া শ্রীচৈতন্যের ভাবসিন্ধু আবার উথলিয়া উঠিল। তিনি 'বোল' 'বোল' বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। অষ্টসাত্ত্বিক মহাভাবে হর্ষাদি সঞ্চারী ভাব মিশিয়া ভাবে ভাবে মহা যুদ্ধ বাধিয়া গেল। পুনঃ পুনঃ গাওয়াইয়া, পুনঃ পুনঃ শুনিয়া ও পুনঃ পুনঃ নাচিয়াও তাঁহার আশা মিটিল না। স্বরূপ গোঁসাই তাঁহার শ্রম জানিয়া আর গাইলেন না। তখন অগত্যা তিনি বসিতে বাধ্য হইলেন।

কালীদাসে প্রসাদ।

বর্ষান্তরে বঙ্গের ভক্তগণ নীলাচলে আসিলে, শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের সঙ্গে বাহ্যস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতিখুড়া কালিদাস নামে এক ভক্ত বৈষ্ণব এ বৎসর পুরুষোত্তমে আসিয়াছিলেন। ইনি ধনবান্ হইলেও সরল প্রেমিক ও উদার প্রকৃতির লোক। ক্রীড়াদিতেও ইনি হরিনাম ভিন্ন করিতেন না। পাশা খেলাইতে হইলেও 'হরে কৃষ্ণ বলিয়া' পাশা ফেলাইতেন। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে ইঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। সাধু সজ্জন জানিতে পারিলেই জাতিবিচার না করিয়া ইনি উত্তম উত্তম খাদ্য লইয়া উপঢৌকন দিতেন এবং ভোজন করাইয়া ভুক্তশেষ খাইতেন। কেহ প্রসাদ দিতে স্বীকার না করিলে ইনি কিছুতেই ছাড়িতেন না। লুকাইয়াও উচ্ছিষ্ট খাইতেন। ভূমিমালী জাতীয় ঝড়ু

নামক ব্যক্তি সরল বৈষ্ণব ছিলেন। কালিদাস একদিন সুমিষ্ট পাকা আম তাঁহাকে ভেট দিয়া ভোজন করিতে ও ভুক্তশেষ দিতে বলিলে ঝড়ু কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। অগত্যা প্রসাদ পাওয়ার দাবি পরিত্যাগ করিয়া কালীদাস ঝড়ু ও তাঁহার স্ত্রীকে পরিতোষরূপে আম খাওয়াইলেন। তাঁহারা অষ্টিবল্কলাদি বাড়ীর নিকটস্থ গর্ত্তে ফেলাইয়া দিলেন। কালিদাস কতকক্ষণ পরে বিদায় হইয়া আসিয়া যখন দেখিলেন, ঝড়ু গৃহাভ্যন্তরে গিয়াছেন, আর তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না, তখন আস্তে আস্তে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে নামিয়া সেই ভুক্তশেষ আমের আঁটি ভক্তির সহিত চুষিতে লাগিলেন এবং প্রেমাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে স্বগৃহে আগমন করিলেন।

কালিদাস নীলাচলে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের বহুকৃপা লাভ করিলেন। চৈতন্যদেব স্বীয় পাদোদক বা ভুক্তশেষ সহজে কাহাকেও দিতেন না; কালিদাসের ভক্তিতে বাধ্য হইয়া তাহাও দিয়াছিলেন।

দ্বাররক্ষকের সঙ্গে।

বর্ষান্তে বঙ্গের ভক্তগণ দেশে চলিয়া গেলে শ্রীচৈতন্যের বাহ্যস্ফূর্ত্তি লুপ্ত হইয়া আসিল; তিনি আবার কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন ভাবে বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া চৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছেন। সিংহদ্বারের দলই বা প্রধান দ্বারপাল আসিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে মুগ্ধ গৌরচন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন 'ওহে ভাই! আমার প্রাণনাথ কোথায়? তুমি কি কৃষ্ণধনকে আমায় দেখাইতে পার?' তাঁহার ভাবরহস্য বুঝে দলয়ের সাধ্য কি? সে সরলভাবে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া জগমোহনে গরুড়ের পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া জগন্নাথের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল; 'ওই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম! তুমি এখানে দাঁড়াইয়া নয়ন ভরিয়া দেখ।' শ্রীচৈতন্য স্তম্ভিতভাবে জগন্নাথ দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ-রূপসাগরে ডুবিয়া গেলেন। এই লীলা দাসগোস্বামীর স্তব-কল্পবৃক্ষে উল্লিখিত আছে।

এই সময়ে জগন্নাথের গোপীবল্লভনামে অমৃতরসাস্বাদ পূর্ণ ভোগ সরিল। আরতি হইয়া গেলে সেবকগণ চৈতন্যদেবের গলায় পুষ্পমালা দিয়া কিছু প্রসাদ খাওয়াইতে যত্ন করিল। গৌরচন্দ্র অল্পমাত্র খাইলেন; অব-

শিষ্ট গোবিন্দ বাঁধিয়া লইল। প্রসাদের আস্বাদন পাইয়া প্রেমিক গৌর প্রেমে পুলকিত হইলেন; নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন :—'কৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত না হইলে এই সব প্রাকৃত দ্রব্যে এত আস্বাদ কথনই সম্ভবিত না। আহা সুকৃতিবান্ লোকেই ফেলামৃত পাইয়া থাকেন।'

পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিল 'ফেলামৃতের অর্থ কি?' শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, 'কৃষ্ণের ভুক্তশেষকে ফেলা বলে। তাহার এক লবও যাহার তাহার ভাগ্যে লাভ হয় না।' উপলভোগ দেখিয়া চৈতন্যদেব স্নান ভোজনাদি করিলেন বটে; কিন্তু সেদিন তাঁহার অন্তরে কেবলই কৃষ্ণাধরামৃত স্ফুরিতে লাগিল। তিনি সেইভাবে নিমগ্ন থাকিলেন।

ফেলামৃত।

সন্ধ্যাসময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অন্তরঙ্গবন্ধুগণ সঙ্গে নিভৃতে বসিয়া কৃষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। সেদিন তাঁহার অন্তরে কেবলই ফেলামৃত জাগিতে-ছিল। গোবিন্দ তাঁহার ইচ্ছা বুঝিযা পাণ্ডাপ্রদত্ত গোপীবল্লভ প্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। পুরী ভারতীর জন্য তাহার কিছু পাঠাইয়া দিয়া অবশিষ্ট রামানন্দাদিকে শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে বাঁটিয়া দিলেন। সকলে আস্বাদন করিয়া প্রসাদের গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলে চৈতন্যদেব বলিতে লাগিলেন 'এই প্রাকৃত দ্রব্যে এত অলৌকিক স্বাদ কোথা হইতে আসিল? চিনি, মিছরি, গব্য ও মসলা, যাহাতে এ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার আস্বাদের কথা বলিতেছি না; সে আস্বাদ কে না জানে? কিন্তু ইহাতে যে অলৌকিক রসমাধুর্য্য ও সৌরভ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা কোথা হইতে আসিল? সেজন্য মনে হয়, ইহাতে কৃষ্ণাধর সংস্পর্শ হইয়াছে। এই অধরামৃত মহামাদক; অল্প খাইলেও অন্য আস্বাদন ভুলাইয়া মত্তভাব আনিয়া দেয়।'

প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ প্রমত্তভাবে 'হরি' 'হরি' বলিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য সময়োপযোগী শ্লোক পড়িতে বলিলে রামানন্দ রায় পড়িতে লাগিলেন :—

'সুরতবর্দ্ধনং শোকনা . . .
স্বরিত বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।

ইতররাগ বিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্।'

হে বীর! তোমার অধরসুধা আমাদের বিতরণ কর। উহা সম্ভোগেচ্ছা বাড়াইয়া দেয়, শোক তাপ নষ্ট করে, এবং অন্যানুরক্তি ভুলাইয়া দেয়। আহা! মধুর মুরলী বাজিতে বাজিতে যখন উহা চুম্বন করিয়া থাকে, তখন কি লোভনীয় শোভাই হয়?

শ্রীচৈতন্য শ্লোক শুনিয়া ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণের অধররস, ভুক্তশেষ ও মুরলীকে লক্ষ্য করিয়া গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ যে প্রলাপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ:—

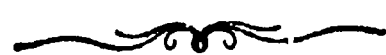
'হে রসরাজ! তুমি রসস্বরূপ; তোমার রসপ্রকৃতিই তোমার অধর চরিত। এই অধর রস পান করাইয়া ত্রিভুবন বশীভূত কর, সে জন্য তুমি বীর। তোমার অধরসুধা পান করিলে সুরতলোভ বা তোমার সম্ভোগেচ্ছা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। মধুময়ী ভক্তি পরিমার্জ্জিত কোমলহৃদয়া গোপীদিগের ত কথাই নাই, শুষ্ক ও কঠিন-হৃদয় জ্ঞানী ও সংসার-মুগ্ধ অজ্ঞান জীবদিগকেও উন্মত্ত করিয়া তুলে। হাস্যময়ী আদেশবাণীই তোমার মধুর মুরলী। তাহা তোমার অধরামৃত বা রসপ্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া জোর করিয়া গোপীদিগকে লজ্জাধর্ম্মে কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া ও গুরুজনশাসন ত্যাগ করাইয়া তোমার দাসী করিয়া দেয়। আর তোমার অধরোচ্ছিষ্টের বা ফেলামৃত প্রসাদেরই বা বল কত? গোপীদিগের মুখরূপ আলবাটীতে তাহার মধুর সৌরভকণা সকল লাগিয়া থাকিয়া আর সব রস-সৌরভ ভুলাইয়া দেয়। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা তোমার ফেলামৃত আস্বাদন করিতে পারিয়াছেন! কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যোগ্য ব্যক্তিও পায় না; সময়ে অযোগ্যও তাহা লাভ করিয়া থাকে।'

শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে আর একটী শ্লোকাবৃত্তি করিতে বলিলে রামরায় বিরহ-বিহ্বলা গোপীদিগের আক্ষেপোক্তি, ভাগবতের রাসাধ্যায় হইতে উদ্ধার করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

'গোপ্য কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু
র্দামোদরাধর সুধামপি গোপিকানাং;
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচু স্তরবো যথার্য্যাঃ।'

জানি না কৃষ্ণের রসময়ী যে অধরসুধা কেবল গোপীভোগ্যা, তাহা এই বেণু কি পুণ্যবলে একা পান করিতেছে ? কুলবৃদ্ধ আর্য্যেরা স্ববংশে ভগবদ্ভক্ত জন্মিলে যেমন পুলকিত হইয়া অশ্রুমোচন করেন ; তেমনি যাহাদের জলে এই বেণু পুষ্ট হইয়াছিল ; সেই নদীগণ কমল বিকাশ করিয়া আহ্লাদে যেন রোমাঞ্চিত হইয়াছে। আর যাহাদের বংশে সে জন্মিয়াছিল, সেই তরুগণও যেন কুসুম হইতে মধুধারা বর্ষণ করিয়া আনন্দাশ্রু ফেলিতেছে।

চৈতন্যদেব উৎকণ্ঠায় ও অনুরাগে ইহারও গভীর ভাবময়ী ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার সকল প্রলাপেই নিত্যলীলার আভাস পাওয়া যায়। ভাগবতের স্থানে স্থানে বেণু যোগমায়া নামে অভিহিত হইয়াছে। ভগবান্ যোগমায়াশ্রিত না হইলে লীলা সম্ভবে না। আবার লীলাতেই রসপ্রকৃতির উদ্ভাবন। সুতরাং লীলাময় ভগবানের অধরসুধা নিরন্তরই বেণু বা যোগমায়া একাকী পান করিতেছে। ইহারই আভাস এই প্রলাপে পাওয়া যায়।



একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কূর্ম্মানুকৃতি।

স্বরূপ রামানন্দাদির সহিত অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করিয়া চৈতন্যদেব শয়ন করিয়াছেন ; গোবিন্দ দ্বারদেশে শুইয়াছে। শেষ রজনীতে গোবিন্দ উঠিয়া তাঁহাকে গৃহে না দেখিয়া ভীত হইয়া স্বরূপাদিকে জাগাইল এবং সকলে মসাল জ্বালিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে যাইয়া সিংহদ্বারে তৈলঙ্গদেশীয় গাবীগণ মধ্যে তাঁহাকে অচৈতন্যাবস্থায় পাইলেন। এবারে তাঁহার শরীর অতি ভয়ানক ভাব ধরিয়াছে। হস্তপদ পেটের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় তিনি কচ্ছপের মত হইয়া গিয়াছেন। মুখে ফেনা নির্গত হইতেছে, রোমাঞ্চ হইয়াছে ও নেত্রে জলধারা পড়িতেছে। বাহিরে জড়িমা হইলেও অন্তরে তিনি যে বিমলানন্দ সম্ভোগ করিতেছিলেন, তাহা বেশ বুঝা গেল। গাভীগণ তাঁহার অঙ্গ সুঁকিতেছিল, তাড়াইলেও যাইতে চাহে না। ভক্তগণ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বাসায় আনিলেন। উচ্চসংকীর্ত্তন শুনাইতে শুনাইতে চৈতন্যদেব চেতনা পাইলেন। হস্তপদ বাহির

হইয়া পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক শরীর হইল। তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমি সঙ্কেত বেণু ধ্বনি শুনিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস দেখিতে বৃন্দাবনে নিকুঞ্জকাননে গিয়াছিলাম। কৃষ্ণের ভূষণশিঞ্জিত, গোপীসহ মধুর হাস্যপরিহাসধ্বনি, অমৃতময় মুরলীনিস্বনে মিশিয়া আমার কর্ণকুহরে মধুধারা বর্ষণ করিতেছিল। তোমরা কেন আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া সে সুখে বঞ্চিত করিলে? কর্ণতৃষ্ণায় যে এখন মরি!'

স্বরূপগোস্বামী তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া তদুপযোগী শ্লোক পড়িলেন। গভীর রজনীসময়ে মধুর মুরলীরবে আকৃষ্ট হইয়া গোপীগণ নিধুবনে কৃষ্ণসম্মুখে উপস্থিত। বেদবিহিত ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া ও কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কুলকামিনীগণের অভিসার করা নিতান্ত অনুচিত বলিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মধুর ভৎর্সনা করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলে গোপীগণ যে ভাবে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, গৌরচন্দ্র সেইভাবে বিভোর হইয়া গোপীদিগের ভাষায় প্রলাপ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন :—'হে কপট! তোমার মত নিষ্ঠুর আর কে আছে? যদি আমাদের অঙ্গীকার করিবে না, তবে এই সুখময়ী রজনীতে অমন করিয়া বাঁশী বাজাইলে কেন? আমরা ত অবলা; বল দেখি ও বাঁশী শুনিয়া কোন্ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র স্থির থাকিতে পারেন? এখন যেই আমরা ধর্ম্মপথ ছেড়ে অভিসারিণী হলেম; কূল ছেড়ে অকূলে ভাসিলাম, এখন কিনা তুমি মহাধার্ম্মিকের ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ দিতে বসিয়াছ! ওহে শঠ! তোমার মনে যাহা, কথায় তাহা প্রকাশ পায় না; আবার আচরণ সম্পূর্ণ বিপরীত। তুমি যেন পরিহাস করিতেছ, কিন্তু আমাদের যে সর্ব্বনাশ হয়, দেখিতেছ না? তোমার ভূষণশিঞ্জিত অমৃত, মিষ্ট কথা অমৃত, আর বাঁশীর গান অমৃত। এই তিন অমৃতে আমাদের প্রাণ, মন, কাণ, আত্মহারা হয়ে তোমার বশীভূত হইয়াছে। এখন ত আর কূলে ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই; কি করি বল দেখি?'

ভাব পরিবর্ত্তনে চৈতন্যদেব বিলাপ করিয়া স্বরূপকে বলিলেন 'সখে! যে কাণ কৃষ্ণের শব্দামৃত চতুষ্টয় পানে বঞ্চিত, সে কাণের ছিদ্র কাণাকড়ির ন্যায় ব্যর্থ; সে কাণের জন্ম হইল কেন? কৃষ্ণের বেণুনাদ নব ঘন ধ্বনি অপেক্ষাও গম্ভীর এবং কোটি কোকিল কণ্ঠাপেক্ষাও সুমিষ্ট, তাহার কণামাত্র শুনিলে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড মুগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহার শ্রীমুখ-ভাষিত কোটি শ্রুতি-ভাষ্য হইতেও অমৃতময়। যখন আবার তাহা সুরস হাস্য ও লীলা

নর্ম্ম সংযুক্ত হয়, তখন তাহাতে না ডুবে কোন কাণ? এই চারি শব্দামৃত আমার কর্ণ চকোরের জীবন, সৌভাগ্যক্রমে যখন সে পান করিতে পায়, তখনই বাঁচে। এখন আমার মন্দ কপাল; না পাইয়া তৃষ্ণায় মরিয়া যাইতেছে।'

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্বেগ, বিষাদাদি ভাব চরম সীমায় উঠিল। তিনি ধৈর্য্যহীন, ও সামর্থ্যহীন হইয়া আলুলায়িত ভাবে কর্ণামৃতে শ্রীরাধার চরম দশা যেমন বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি দশায় উপনীত হইলেন এবং বাহ্য জ্ঞানে থাকিয়াও অন্তর রাজ্যের সুখভোগ করিতে লাগিলেন। উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, মর্ষ, ত্রাস, চিন্তা, প্রভৃতি ভাব একটীর পর একটী ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি অনুরাগে প্রলাপ বকিতে লাগিলেন:—

'শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমার উদ্বেগ ক্ষণে ক্ষণে বাড়িয়া উঠিতেছে; এখন আমি কি করি? কোথায় যাই, কোথায় গেলে প্রাণনাথকে পাই? কাহাকেই বা তাঁ'র উদ্দেশ জিজ্ঞাসা করি? এক উপায় আছে; তাঁ'র আশা কেন ছেড়ে দিই না? তাঁ'র কথা ছেড়ে ও তাঁ'কে ভুলে অন্য কথায় মন দিলে ত সুখী হ'তে পারি। কিন্তু হায়! ছাড়িব কেমন করে? তিনি যে আমার হৃদয় গুহাশায়ী! না; ছাড়িতে পারিব না। তিনি আমার সুখের নিধি, মন ও নয়নের উৎসব! তাঁহাকে ছাড়িলে বাঁচিব কেমন করিয়া? জল ছাড়িলে কি মাছের প্রাণ বাঁচে? হা প্রাণ ধন! হা সদ্গুণসাগর! শ্যামসুন্দর, রাসবিলাস! বল তুমি কোথায় আছ? আমি সেইখানে যাই।' বলিতে বলিতে শচীনন্দন উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলে স্বরূপ ধরিয়া কোলে লইয়া গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাপতির পদাবলি গান করিয়া শুনাইয়া সুস্থ করিতে লাগিলেন।

নিপট বাহ্য লাভ করিয়া শ্রীচৈতন্য খেদ করিতে লাগিলেন:—'হায় প্রভু! তোমার দর্শন বিনা আমার দিন কাল বৃথা নষ্ট হইতেছে। যে দুঃখে সময় কাটাইতেছি, অন্তর্যামিন্ তোমার ত অবিদিত নাই। হে করুণাসিন্ধু! এ জীবনে সুখই বা কি, যদি তোমাকে না পাইলাম? হে নাথ! আমি যে মহাকপটী তা' কি তুমি জান না? অন্যে না জানুক, তুমি ত জান যে জগতের কাছে মহাপ্রেমিক বলিয়া পূজা পাইবার আশায়, কপট কান্না কাঁদি। হায়! তোমাতে একবিন্দু প্রেম থাকিলেও কি সেইরূপ আত্ম-

সুখ-কামনা আমার মনকে স্পর্শ করিতে পারিত? তোমার প্রেম পবিত্র গঙ্গা-জলের ন্যায় নির্ম্মল, তা'তে ত আত্ম-গৌরব কামনা নাই। ধোপ কাপড়ে কালী বিন্দুর ন্যায় সে শুভ্র পবিত্র অনুরাগে ত পাপ লুকাইয়া থাকিতে পারে না। আমার প্রাণ যে আত্ম-সুখেচ্ছায় পূর্ণ; তাইতে বুঝিয়াছি যে তোমাতে আমার একটুও প্রেম হয় নাই। লোকে বিশ্বাস করুক্ আর না করুক্, আমি জানি যে সে প্রেমের এক বিন্দু পাইলেও জগৎ ডুবাইতে পারিতাম।

হে নাথ! তবে উপদেশ দাও, কি করিলে আমি তোমার প্রেমধন পাইব? আমার চঞ্চল মনের চপল গতি তোমার অবিদিত নাই। এখন যাহাতে তোমার মধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সে চপলতা ছাড়িতে পারে, তাহা কর। তোমাভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তাই চরণতলে এত প্রার্থনা করিলাম।'

ভাবে ভাবে চৈতন্যদেবের হৃদয়ভূমিতে মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল। মদমত্ত মাতঙ্গগণ যেমন ইক্ষুবন দলন করিয়া থাকে, তেমনি ভাব-হস্তী সকল তাঁহার হৃদয় তোলপাড় করিয়া দিল। শরীর মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি সমর্থহীন হইয়া একেবারে হর্ষাদিভাবের অধীন হইয়া পড়িলেন এবং চিত্ত শান্তির জন্য চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ ও জগন্নাথ বল্লভ নাটকের গীত শুনিতে লাগিলেন। পরমানন্দ পুরীর শুদ্ধ বাৎসল্যে, রামানন্দের সরল সখ্যপ্রেমে ও স্বরূপ জগদানন্দ গদাধরের মধুর ভাবে তাঁহার দিন সুখে যাইতে লাগিল।

কূর্ম্মানুকৃতি-লীলা চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে রঘুনাথ দাস এইরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 'কাশীমিশ্রের আবাসে অর্গল বদ্ধ দ্বার ত্রয় উন্মোচন না করিয়া তিনটী অত্যুচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক যিনি কৃষ্ণের মহাবিরহে শরীর-সঙ্কুচিত কমঠের ন্যায় কলিঙ্গ দেশীয় গোগণ মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মহাহর্ষ প্রদান করিতেছেন।'

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সমুদ্রে পতন।

ভক্তহৃদয়ে ভগবানের প্রেমলীলার অনন্ত বৈচিত্র্য! ভক্তের প্রেমের গাম্ভীর্য্য উহার বিবিধ গতি, নানা দশা সুখ, দুঃখ, বিকার, চেষ্টা, অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ভগবান্‌ও সম্যক্ অনুভব করিতে অসমর্থ। তাই লোকে বলে, তাঁহাকে বিষয় জাতীয় প্রকৃতি পরিহার করিয়া আশ্রয় জাতীয় ভক্তদেহ ও ভক্তপ্রকৃতি অঙ্গীকার করিতে হইয়াছিল। ধন্য প্রেম, জগতে তুমিই ধন্য! তুমি আপনি নাচ, ভক্তকে নাচাও, ও ভগবান্‌কে নাচাও। আবার তিন জনে একত্র নাচ। কে তোমার বিকার বৈচিত্র্য বুঝিবে?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেম বিকারের এই এক স্বভাব যে, যখন যে ভাব হৃদয়ে উঠিত, পূর্ণিমার জোয়ারে সাগরোচ্ছ্বাসের ন্যায় তাহার উচ্ছ্বাস না হইয়া থামিত না। বাহিরের সামান্য কারণেও উদ্দীপনা হইলে মহাপ্লাবন হইত। শেষজীবনে তিনি রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোকগুলি একে একে শুনিয়া নানাভাবে বিলাপ করিতেন। ইহার মধ্যে যে দিন যে ভাবটী মনে একটু বেশি লাগিত, সেদিন আর রক্ষা থাকিত না। আজ মহারাসে কৃষ্ণের গোপীসঙ্গে যমুনার জল লীলার শ্লোক শুনিয়া তিনি সমস্ত দিন, সেই ভাবে বিভোর আছেন। আজ বা কি হয়?

চন্দ্রোদয় হইয়াছে। শুভ্র চন্দ্রকিরণ সমুদ্রের নীল জলে পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া নাচিতেছে; সমুদ্রবক্ষ যেন সুবর্ণ-মণ্ডিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃষ্ণের জললীলা ভাবিতে ভাবিতে বন্ধুদিগের অজ্ঞাতে হঠাৎ আইটোটায় আসিয়া সিন্ধুশোভা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ভাবসমুদ্রও উছলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে দিশাহারা করিল। কার্ত্তিকের পৌর্ণমাসী রজনীতে যমুনাবক্ষে হেমাব্জরূপিণী গোপী পরিবৃত কৃষ্ণনীলাব্জ ভাসিতেছেন মনে করিয়া তিনি একেবারে সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন জোয়ারের তেজ ছিল। কখন ভাসিতে ভাসিতে, কখন ডুবিতে ডুবিতে কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় তিনি তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কোণারকের দিকে যাইতে লাগিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন যে

মূর্চ্ছা মূর্চ্ছা নয়, কৃষ্ণের জলবিহার রঙ্গ নিমগ্নাবস্থায় আস্বাদন করিতেছিলেন।

এদিকে স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে না দেখিয়া নানাস্থান খুঁজিতে লাগিলেন। জগন্নাথ মন্দিরে, গুণ্ডীচামন্দিরে, নরেন্দ্রে, চটক পর্ব্বতে, চিরায়ু পর্ব্বতে; যে সব উদ্যানে তিনি যাইতেন, সে সব উদ্যানে উদ্যানে, সিংহদ্বারে ও সাগরকূলে ভক্তগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সমস্ত নিশা অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রজনী শেষে যখন সমস্ত অন্বেষণ তাঁহাদের ব্যর্থ হইল, তখন প্রভু অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন মনে করিয়া ভক্তদল কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু স্বরূপ গোঁসাই একেবারে নিরাশ্বাস ও অধৈর্য্য হইলেন না, জনকতক সাহসী লোক সঙ্গে মসাল জ্বালিয়া সমুদ্রের কূলে কূলে কোনারকের দিকে চলিলেন।

জগন্নাথ মন্দিরের পূর্ব্বদিকে প্রায় ৩ মাইল দূরে কোনারক। ইহা সমুদ্রের কোল। জোয়ারের জল সরিয়া গেলে ভাটার সময় ধীবরগণ এখানে মাছ ধরিয়া থাকে। কতক দূর গিয়া স্বরূপাদি দেখিলেন, এক জালিয়া জাল কাঁধে করিয়া পাগলের ন্যায় হাসিতে কাঁদিতে নাচিতে, গাইতে ও হরি হরি বলিতে বলিতে আসিতেছে। নিকটবর্ত্তী হইলে স্বরূপ জিজ্ঞাসিলেন ‘ওহে ভাই’ এদিকে কোন লোক দেখিয়াছ কি? তোমার এরূপ দশা হইল কেন? সে উত্তর করিল, কোন মানুষ আমি দেখি নাই। কিন্তু জাল উঠাইতে আমার জালে এক মৃত দেহ উঠিয়াছে। আমি বড় মাছ মনে করিয়া খুলিতে যাইয়া দেখি ৫।৭ হাত এক দীর্ঘশরীর, তিন তিন হাত লম্বা হাত পা, অস্থিসন্ধি শিথিল হইয়া চামরা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু দুইটা খুলিয়া উপর দিকে তুলিয়াছে ও ক্ষণে ক্ষণে গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। ছোঁবা মাত্র আমাকে ভাই সেই ভূতে পাইল, সেই হইতে আমার এই দশা হইয়াছে। আমি ভূত ছাড়াইতে ওঝার নিকট যাইতেছি। নইলে আমি মরিলে আমার স্ত্রীপুত্র বাঁচিবে কেমনে? স্বরূপ সে ব্যক্তির ভয়-বিহ্বলতা দেখিয়া ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি, তোমাকে ঝাড়িয়া দিতেছি, বলিয়া হরিনাম করিয়া ২।৩ চাপড় মারিলেন, এবং ভূত পলাইল বলিয়া সাহস দিলে ধীবর প্রকৃতিস্থ হইল। তখন স্বরূপ বলিলেন, তুমি যাঁহাকে জালে তুলিয়াছ, তিনি ভূত নহেন, কৃষ্ণচৈতন্য প্রভু। কৃষ্ণ বিরহে সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন।

ধীবর উত্তর করিল 'আমি কি আর প্রভুকে চিনি না? সে কেন প্রভু হইবে? সে হয় ভূত, না হয় ব্রহ্মদৈত্য। স্বরূপ বলিলেন, প্রেমবিকারে তাঁহার অস্থিসন্ধি ছাড়িয়া যাওয়ায় তিনি অতি বিকৃতাকার হন। যাহা হউক, তুমি শীঘ্র আমাদের তাঁর কাছে লইয়া চল।

তখন ধীবরের সঙ্গে ভক্তগণ অনতিদূরে যাইয়া সৈকতময় আর্দ্র ভূমিতে শ্রীচৈতন্য অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন দেখিয়া হর্ষ বিষাদে কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ জলে থাকায় তাহার শরীরও মুখশ্রী শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, সমস্ত অঙ্গ বালুময়ও কর্দ্দমযুক্ত। অস্থিসন্ধি বিশ্লেষ হওয়ায় অতি দীর্ঘও কদাকার হইয়াছেন, দেখিলে চেনা যায় না। স্বরূপ গোঁসাই শুষ্ক বস্ত্র পাতিয়া তাঁহাকে শোয়াইলে শ্রবণ মূলে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে গৌরসিংহ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। অস্থিসন্ধি জোড়া লাগিয়া পূর্ব্ববৎ সুন্দর দেহ হইল।

তিনি অর্দ্ধবাহ্য দশা লাভ করিয়া চারিদিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় মহারাসান্তে মদমত্ত করীর ন্যায় কৃষ্ণমত্ত করিণী গোপীদিগকে লইয়া যেমন করিয়া যমুনা জলে জলকেলি করিয়াছিলেন, ক্রীড়ান্তে যেমন করিয়া তীরে বসিয়া বন্য ভোজন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে কুঞ্জকুটীরে শ্রম নিবারণার্থে শয়ন করিয়াছিলেন, ভাগবতের ভাষায় তাহা বর্ণন করিয়া চৈতন্যচন্দ্র যে মহাপ্রলাপ বাক্য রচনা করিলেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য। উহাতে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলের আভাস পাওয়া গিয়াছে। বাক্যগুলি ভ্রান্তিময় অসম্বদ্ধ হইলেও উহা যে উচ্চ অঙ্গের ভাবে পরিপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা তাহার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিলাম। কালিন্দী বা বিরজার পারে লীলাধাম বৃন্দাবন। এখানে ভাবময়ী সখীগণ ভগবানের লীলার সহায়; তাঁহার সহিত লীলাজলে নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন। সাধনসিদ্ধ ভক্তগণ এইলীলা দেখিয়া সুখী হইতেছেন। পরাপ্রকৃতি রাধার সহিত পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণের যে রস ক্রীড়া, তাহাই মহারাস; তাহা প্রাকৃত কামময়ী চেষ্টা নহে। এই রাসাবসানে ভগবান্ পবিত্রতার সূক্ষ্ম বর্ণন পরিয়া সৃষ্টির লীলা জলে পরা প্রকৃতি রাধা ও শক্তি রূপা সখীদিগকে লইয়া জলকেলি করিয়া থাকেন। লীলা শেষ হইলে পরম পুরুষ আবার সশক্তি নিত্য ধামে যোগ নিদ্রাবলম্বনে শয়ন করিয়া থাকেন। ইহাই বস্ত-

ভোজন ও কুঞ্জে স্থিতি। ভাগ্যবান্ ভক্তের মাধুর্য্যপূর্ণ চিত্ত-বৃন্দাবনে প্রেম-যমুনার জলে মহাভাবময়ী রাধা ও মনোবৃত্তি সখীনিচয়ে পরিবৃত হইয়া মহারাসে প্রবৃত্ত হইলে লোকলজ্জার বস্ত্রাচ্ছাদনাদি খসিয়া পড়ে। ভক্ত তখন লৌকিক ধর্ম্মের অতীত হন। তাঁহার সম্ভোগের অবস্থা, ভাব চেষ্টা ও কার্য্যকলাপ বুঝিতে না পারিয়া লোকে তাঁহার নিন্দা রটনা করিয়া দেয়।

প্রলাপের শেষ ভাগে চৈতন্যদেব বলিয়াছেন, 'জলকেলি সময়ে পৃথক পৃথক্ চক্রবাক্ জল হইতে উদ্গত হইয়া মণ্ডলাকারে স্থিতি করিতে লাগিল; এবং পৃথক্ পৃথক্ পদ্মমণ্ডল বৃত্তাকারে উহাকে ঘিরিয়া ফেলিল; তাহার বাহিরে আবার পৃথক পৃথক রক্তোৎপল তৃতীয় মণ্ডলাকারে পদ্মমণ্ডলকে বেষ্টন করিল। পদ্ম ও রক্তোৎপল অচেতন আর চক্রবাক সচেতন। পদ্ম চক্রবাকের বন্ধু; রক্তোৎপলও পদ্মের বন্ধু, কিন্তু চক্রবাকের অপরিচিত। পদ্ম অচেতন হইয়াও সচেতন চক্রবাকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং চক্রবাক্‌কে আচ্ছাদন করিয়া আত্মসাৎ করিতে উদ্যত। রক্তোৎপল তাহা করিতে না দিয়া অপরিচিত চক্রবাক্‌কে তাহার বন্ধুর লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিতে উদ্যত। শ্রীকৃষ্ণ জললীলায় এই অতিশয়োক্তি ও বিরোধাভাস অলঙ্কার দেখাইয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।'

এই প্রলাপের ব্যাখ্যা মোটামুটি এইরূপে করা যাইতে পারে। প্রত্যেক জবান্তর্যামী পরমাত্মাই চক্রবাক্ মণ্ডল; জীব মণ্ডলই পদ্মমণ্ডল, উহা পরমাত্মার উপরে প্রতিষ্ঠিত; আবার জীব প্রকৃতির বাহিরে বারিতে মহত্তত্ত্বাদি, তাহা রক্তোৎপল কেননা রাগাদিতে জড়িত। মহত্তত্ত্ব মায়াচ্ছন্ন জড়ীয়, সেজন্য সে অচেতন আর জীব সচেতন হইয়াও অচেতন, কেননা প্রভু চৈতন্য বিনা তাহার স্বতন্ত্র চৈতন্য নাই। জীব আসক্তিবিহীন হইলেই পরমাত্মাকে লুঠিয়া আত্মসাৎ করিতে চায়, কিন্তু মহত্তত্ত্বাদি তাহা করিতে দেয় না, এজন্য উহাদের মধ্যে বিবাদ চলিতে থাকে। জীবরূপা প্রকৃতি পুরুষরূপী ঈশ্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাই স্ত্রীপুরুষের উল্টা স্থিতি। জীব মহত্তত্ত্বাদি আবরণে আবৃত, এ জন্য উভয়ে সহবাসী বন্ধু আর জীব পরমাত্মার বন্ধু দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়েতি শ্রুতি কিন্তু মহত্তত্ত্বাদি মায়িক বলিয়া ঈশ্বরের অপরিচিত অর্থাৎ মহত্তত্ত্বভগবৎ স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না অথচ জীব আসক্তি শূন্যাবস্থায় ঈশ্বরকে আত্মসাৎ করিতে গেলে অপরিচিত

মহত্তত্ত্ব তাহা করিতে দেয় না। ইহা বিরোধাভাস অলঙ্কার। ভগবান্ একই হইয়াও অনন্ত জীব প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত চক্রবাক্ বা অন্তর্যামী রূপে আছেন, এজন্য তাহা অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

নিপট বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া চৈতন্য দেব স্বরূপ গোঁসাইকে বলিলেন, তোমরা আমাকে এখানে আনিলে কেন? স্বরূপ সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া কহিলেন, "তুমি সমুদ্রে পড়িয়া মূর্চ্ছাবস্থায় বৃন্দাবনে জলক্রীড়া দেখিতেছ, আর আমরা সারা রাত্রি জাগিয়া তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।"

শ্রীচৈতন্য লজ্জিত হইলেন এবং স্নানান্তে বন্ধুগণ সহ বাসায় আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বিরহাবস্থায় কৃষ্ণলীলা আলোচনা করিতে করিতে চৈতন্যদেব মহাভাবে মগ্ন হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া চিদ্ঘন আনন্দ রাজ্যে প্রবেশ করিতেন। তাহাকে মহাযোগ বা মহাসমাধি যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে। কেহ যেন মনে না করেন যে, এই অবস্থা বেদান্তোক্ত সুষুপ্তির অবস্থা হইতে অভিন্ন। বাস্তবিক তাহা নহে; সুষুপ্তিতে আত্মজ্ঞান থাকে না, উহা মহা নির্ব্বাণ বা অনস্তিত্বের অবস্থা। ভক্ত সে অবস্থা পাইতে ইচ্ছা করেন না। সচৈতন্যাবস্থায় ভগবানের আনন্দঘন সম্ভোগ করাই ভক্তের লক্ষ্য। সে অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আমি সম্ভোগ করিতেছি, এ জ্ঞান থাকিবে না, এরূপ নহে।

এ পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যের যে সকল বিরহবিকার বর্ণনা করা গেল; পাঠক মহাশয় দেখিবেন যে, নামে বিরহ হইলেও তাহা ঈশ্বর সম্ভোগের অতি উচ্চ অবস্থা। যে কারণে বিচ্ছেদে তন্ময়ত্ব জ্ঞান হইয়া এই অবস্থা লাভ করা যাইতে পারে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, কেবল মাত্র ভগবান্কে পাইলেই সম্ভোগ লাভ হইতে পারে, কিন্তু বিরহে যে স্থানে বা যে অবস্থায় থাকা যায়, তাহাতেই তাঁহার অনন্ত গুণ ও লীলা স্ফূর্ত্তি হইয়া তন্ময়ত্ব লাভ হইয়া যায়।

এ জন্য অনেক সময়ে ভক্তেরা সম্ভোগ অপেক্ষা বিরহই ইষ্টজনক মনে করিয়া থাকেন। পদ্যাবলির উদ্ধৃত শ্লোক আমাদের কথা প্রমাণ করিবে।

'সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ ন সঙ্গমস্তস্য
একঃ সএব সঙ্গে ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।'

সঙ্গম ও বিরহ, ইহার কোনটী প্রার্থনীয় সংশয়স্থলে সঙ্গম অপেক্ষা বিরহই ইষ্টজনক বলিতে হইবে। কারণ, সঙ্গমে তিনি একাকীমাত্র সঙ্গে থাকেন ; কিন্তু বিরহে ত্রিভুবন তন্ময় হইয়া যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বৈশাখী পূর্ণিমা।

বৈশাখের পৌর্ণমাসী রজনীতে শ্রীচৈতন্য সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া জগন্নাথ বল্লভ নামক রাজোদ্যানে বিচরণ করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রিকালোকে উপবন ঝলমল করিতেছে, তরু লতা, ফুল ফল সব যেন কৌমুদী বসন পরিয়া বসন্তোৎসবে মাতিয়াছে, মলয় পবন কুসুম সৌরভ লইয়া উদ্যানময় নাচিয়া বেড়াইতেছে ; ছোট ছোট ফুলগাছগুলি হেলিয়া দুলিয়া যেন তাঁহার নিকট নৃত্য শিক্ষা করিতেছে ; শুক শারী, পিক, ভৃঙ্গ প্রফুল্লিত তরু বল্লীতে উড়িয়া উড়িয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। সব যেন নিধুবনের শ্রী ধরিয়াছে। দেখিতে দেখিতে শ্রীচৈতন্যের ভাবের কপাট খুলিয়া গেল। তিনি স্বরূপ রামানন্দকে গীত গোবিন্দের 'ললিত লবঙ্গ লতা' পদ গাইতে বলিয়া আপনি স্বদলে প্রতি তরুতলে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পূর্ণিমার নৈশ গগনে সেই নৃত্য গীতের লহরী তরঙ্গায়িত হইয়া সমস্ত উদ্যানকে কাঁপাইয়া তুলিল।

সম্মুখে সারি সারি অশোক তরু গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্প বিকাশ করিয়া হাসিতেছে ; পূর্ণিমার চাঁদের আলো ফুটন্ত ফুলে পড়িয়া সে হাসি আরও ফুটাইয়া দিয়াছে ; ও কি ও ! অশোক তলায় দাঁড়াইয়া কে ? শ্রীচৈতন্য দেখিলেন, শ্যামসুন্দর মদনমোহন ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াইয়া হাসি মুখে বাঁশী বাজাইতেছেন। 'এই আমার প্রাণের কৃষ্ণ পাইয়াছি বলিয়া গৌর সেই ভুবনসুন্দরকে ধরিতে ছুটিলেন ; কৃষ্ণ অন্তর্ধান হইলেন, গৌর অশোক তলায় মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বন্ধুগণ চৈতন্য সম্পাদন করিলে তিনি অৰ্দ্ধবাহে কৃষ্ণাঙ্গপরিমলের মধুর আঘ্রাণ পাইলেন। নিরন্তর নাসিকারন্ধ্রে সে সৌরভ প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল।

উদ্যানের যে অংশে বেড়াইতে লাগিলেন, সেই খানেই সে অপ্রাকৃত সৌরভ যেন তাঁহাকে অনুগমন করিতে লাগিল। তিনি শ্রীরাধিকার কথায় প্রলাপ করিতে লাগিলেন :—

সখি হে! কৃষ্ণাঙ্গপরিমলের নিকট অগুরু, কুঙ্কুম, কস্তুরী, কর্পূর, মৃগনাভি নীলোৎপলের সৌরভ অতি ছার। ত্রিজগতের মধ্যে এমন ধীরব্যক্তি কে আছে যে, সে আঘ্রাণে উন্মত্ত হয় না। নেত্র, নাভি, বদন, কর, চরণ আটটী পদ্ম শ্রীঅঙ্গ সরোবরে শোভা পাইতেছে। তাহা হইতে যে অপ্রাকৃত সুরভি নিরন্তর বাহির হইতেছে, তাহার আগে কোন্ নাসা স্থির থাকিবে? আমরা অবলা স্ত্রী, আমাদের ত কথাই নাই। এ গন্ধ পাইয়া এলোথেলো বেশে পাগলের ন্যায় নাচিয়া বেড়াইতেছি, কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছি, প্রাণ মন দেহ অর্পণ করিয়াছি, তবুও কি নাসার আশা মিটিল? পিব, পিব করিয়া সে যে তৃষ্ণায় মরিয়া যাইতেছে।

হায়! হায়! কেনই বা কুটিল কৃষ্ণপ্রেমে ঝাঁপ দিয়াছিলাম? এত প্রেম নয়, এ যে তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ। মিষ্ট লাগে ফেলিতেও পারি না, গরম লাগে গিলিতেও ত পারি না। এত প্রেম নয়; এ যে লৌহ শৃঙ্খল; আমার হাতে গলায় বেঁধে চরণ তলে ফেলাইয়া দিয়াছে; পলাইব কেমন করিয়া? এত প্রেম নয়; এ যে ভয়ানক কামাগ্নি; যত সম্ভোগ করি, ততই যে শত গুণে জ্বলিয়া উঠিয়া আমাকে দগ্ধ করে। এ ত প্রেম নয়; এ যে জ্বালাময়ী দীপশিখা; দূর হইতে আমার প্রাণ পতঙ্গীকে আকর্ষণ করিয়া পোড়াইয়া মারিতেছে। এ ত প্রেম নয়, এ যে ভীষণ রোগ; শরীর, মন, প্রাণ, খুলিয়া খাইতেছে; তথাচ প্রাণে মারিয়া ফেলে না। 'শ্রীকৃষ্ণ কৃপা অসীম, আমাকে চিরদিন এ দুঃখে রাখিবেন না অবশ্যই সুখী করিবেন' তোমরা আমাকে কি এই আশ্বাস বচন বলিতেছ। হায়! আমার দুঃখ বুঝিলে না; তাই এই অসার সান্ত্বনায় প্রতারিত করিতে চাও। ভবিষ্যতের আশায় কি প্রাণে শান্তি হয়? বর্ত্তমানে যদি মরি তবে ভবিষ্যৎ আমার কোন্ কাজে লাগিবে? দেখ পদ্মপাতের জলের মত জীবের জীবন অতি চঞ্চল, কখন আছে, কখন নাই। এতে ভবিষ্যতের আশার উপর কি নির্ভর করা যাইতে পারে? তোমরা কি জান না যে, অকৈতব প্রেম এ জগতে প্রায়ই লাভ হয় না। সৌভাগ্য ক্রমে লাভ হইলে তাতে কি আর বিরহ হইতে পারে? আর সে প্রেমে বিরহ হলেই বা কে বাঁচে?"।

এই রূপ বিলাপে, গানে, নৃত্যে, ও অঙ্গ গন্ধাঘ্রাণে পূর্ণিমার নিশা কেমন করিয়া পোহাইয়া গেল, কেহ টের পাইলেন না।

সুখসঙ্ঘর্ষণ।

মাতৃভক্ত শ্রীচৈতন্যের মাতৃভক্তি একদিনের জন্যও মলিন হয় নাই। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, সন্ন্যাসের প্রাক্কালে তিনি মাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার সন্ন্যাস পরিত্যাগের জন্য নয়; কিন্তু কৃষ্ণেচ্ছা পরিপূর্ণ করিবার জন্য; আর তিনি সন্ন্যাস করিয়াও মায়ের ঐহিক পারমার্থিক সমস্ত ভার বহন করিবেন। এ প্রতিজ্ঞা হইতে তিনি একদিনও বিচলিত হন নাই। জননীর সুখ স্বচ্ছন্দতা ও ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেও তত্ত্ব তল্লাস লইতে তিনি কখনই উদাসীন ছিলেন না। প্রতি বৎসর সময়ে সময়ে তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগকে জননীর নিকট পাঠাইয়া নানা সান্ত্বনা বাক্যে উপদেশ দিতেন। দামোদর পণ্ডিত ও জগদানন্দকে অনেক সময়ে নবদ্বীপে থাকিতে হইত।

১৪৫৫ শকে শ্রীচৈতন্যদেবের মর্ত্ত্যজীবনের শেষ বৎসর; এ বৎসরও, তিনি বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জননীর সেবার জন্য জগদানন্দ পণ্ডিতকে নবদ্বীপে পাঠাইলেন। দিব্যোন্মাদের ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেও জননী সেবা ভুলিলেন না। যাইবার সময়ে জগদানন্দকে তিনি এই সব কথা বলিয়া দিলেন। প্রিয় সুহৃদ্! আমার হইয়া জননীর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া বলিও, তাঁহার স্নেহের ঋণ আমি জন্মেও শোধিতে পারিব না। আমার দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল যে, তাঁহার পদ সেবা ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি। যেন মা পাগল সন্তানের সে অপরাধ মার্জ্জনা করেন। তাঁহার আজ্ঞাতে আমি নীলাচলে থাকিয়াও লোক চক্ষুর অন্তরালে সতত তাঁহার নিকটে আছি এবং তাঁহার স্নেহের দেওয়া ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া থাকি। জগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপে যাইয়া শচীমাতার সঙ্গে কিছু কাল বাস করার পর আচার্য্যাদি ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। আসিবার সময়ে আর আর সংবাদের সহিত অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে ইঙ্গিতে এই তরজা বলিয়া পাঠাইলেন।

'বাউলকে কহিও লোক হইল আউল;
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল,
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল,
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।'

জগদানন্দ তরজার অর্থ না বুঝিয়াও উহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন এবং যথা সময়ে নীলাচলে আসিয়া শ্রীচৈতন্যকে নিবেদন করিলেন। চৈতন্যদেব প্রহেলিকাপূর্ণ আচার্য্য বাক্য শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া 'এই তাঁহার আজ্ঞা' বলিয়া মৌন হইলেন।

স্বরূপ তরজার অর্থ জিজ্ঞাসিলে তিনি ইঙ্গিতে বলিলেন; 'আচার্য্যের মনের ভাব কি তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমি স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তবে মনে হয়, তিনি একজন প্রধান দেবপূজক; আবাহন করিয়া দেবতার আরাধনা করেন, পরে বিসর্জ্জনের মন্ত্র পড়িয়া ঠাকুর বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন।'

কথা শুনিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন; স্বরূপ বিমনা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেবও সেই দিন হইতে কৃষ্ণ-বিরহে রাধা ভাবে ভাবান্বিত হইয়া দ্বিগুণ উন্মত্ততার সহিত নিরন্তর প্রলাপ বলিতে লাগিলেন। এবং উদ্‌ঘূর্ণা দশায় রামানন্দের গলে ধরিয়া স্বরূপকে নিজ সখীজ্ঞানে জিজ্ঞাসা করিলেন 'বল সখি! যাঁহাকে না দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়, সেই জীবনের জীবন হরি কোথায়? যাঁহার উদয়ে কামার্কসন্তাপ চিন্তা ব্রজবধূ কুমুদিনীগণ উল্লাসিতা হয়, সে চন্দ্রমা কোথায়? যাঁহার রূপ নয়নে লাগিলে নিরন্তর হৃদয়ে জাগিতে থাকে, ভুলিতে দেয় না, সে কান্ত আমার কোথায়? যাঁহার মধুর মুরলী একবার বিপিনে বাজিলে তৃষিত চাতকের ন্যায় শ্রবণ ভরিয়া পান করিতে ব্রজজন ধাইয়া বনে চলে, সে সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণ কোথায়? যিনি আমার জীবন রক্ষার মহৌষধি, সুহৃত্তম ও হৃদয় রমণ, সে কলানিধি কই? তাঁহা বিনা এ জীবন এখনও দেহে রহিয়াছে; রে জীবন তোরে ধিক্! আর নিষ্ঠুর বিধি! যে বাঁচিতে চায় না তাহাকে কেন বাঁচাস্, তোকে ধিক্!'

বিধাতার উপর শ্রীচৈতন্যের ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি বিধিকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন :—

"ওরে বিধি! তুই বড় নিষ্ঠুর। নইলে কি বালকের ন্যায় খেলা করিস্? প্রেমের মর্ম্ম না বুঝিয়া আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলি; তোর দেখা পেলে খুব শিক্ষা দিতে পারিতাম। যদি প্রেমের পূর্ণতাই হ'তে দিবি না, তবে রে অকরুণ বিধি! কেন তুই কৃষ্ণানন দেখাইয়া আমার লোভ বাড়াইলি; কেনই বা দত্তাপহারীর ন্যায় একটু না পান করিতে করিতে কাড়িয়া নিলি!

তোরেই বা দোষ দিই কেন ? তুই পর বইতো নহিস্। যিনি আমার প্রাণনাথ, নিরন্তর যাঁর সঙ্গে একত্র বাস, সব ছেড়ে যাঁরে সার কর্‌লেম্, তিনিই যখন নিষ্ঠুর হ'য়ে প্রাণে মার্‌লেন, যাঁর জন্য আমি মরিতেছি, তিনিই যখন একবারে ফিরিয়াও চাহিলেন না; একদণ্ডে প্রেমের হাট ভেঙ্গে দিলেন, তখন তোর কি দোষ ! আর কৃষ্ণেরই বা দোষ দিই কেন, এ যে আমার কপালের দোষ, আমার পাপের ফল যে পূর্ণ মাত্রায় পাকিয়াছে, নইলে যিনি চিরদিন আমার প্রেমাধীন, আমায় কত ভালবাসেন, তিনি কেন উদাসীন হইবেন ?

এই ভাবে শ্রীচৈতন্য, কৃষ্ণ মথুরায় গেলে ব্রজগোপীগণ যেরূপে "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব' বলিয়া কাঁদিয়া ছিলেন, সেই নাম ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ রাত্রি কাটিয়া গেলে রামানন্দ রায় তাঁহাকে গম্ভীরার মধ্যে শোয়াইয়া বাসায় গেলেন, স্বরূপ ও গোবিন্দ দ্বারদেশে শুইলেন, মহাপ্রভু প্রেমাবেশে গর গর হইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তনে নিশা জাগরণ করিতে লাগিলেন, স্বরূপ গোবিন্দ ঘুমাইলে ভীষণ বিরহে ব্যাকুল হইয়া তিনি উঠিয়া বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দ্বাররুদ্ধ থাকায় যাইতে না পাইয়া দেওয়ালে নাক, মুখ, গণ্ড ঘষিতে লাগিলেন; ক্ষত হইয়া দরদরিত ধারে রুধির ধারা পড়িতে লাগিল; তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার আত্মা যেন আনন্দ রসে নিমগ্ন, কিন্তু রক্ত মাংসের শরীর সহিবে কত ?, দেয়ালে মুখ ঘষিতে ঘষিতে তিনি পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ শব্দ শুনিয়া ত্রস্তভাবে উঠিয়া গোবিন্দকে জাগাইলেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। তখন দুই জনে ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া তাঁহাকে সুস্থ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, দেখি দেখি কি করিয়াছ ?

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, 'উদ্বেগে ঘরে থাকিতে না পারিয়া বাহিরে যাইতে ছিলাম; দুয়ার খোলা না পাইয়া ভিতে মুখ লাগিয়াছিল। ক্ষত হ'য়ে রক্ত পড়িয়াছে জানিতে পারি নাই।'

স্বরূপাদিভক্তগণ চৈতন্যদেবের এই সকল শারীরিক দুরবস্থা দেখিয়া বড়ই ভীত হইলেন ও আশঙ্কা করিতে লাগিলে উন্মাদ দশায় তাহার মনের ঠিক্ থাকে না, কখন কি অত্যাহিত ঘটে, তাহার ঠিকানা নাই। তিনি যেরূপ আত্মহারা হইয়া পড়েন, তাহাতে জীবন নাশের অসম্ভাবনা

নাই। দিবা ভাগে ভক্তগণের মধ্যে কেহ না কেহ সর্ব্বদা কাছে থাকিতেন, রজনীতেই বিশেষ আশঙ্কার কারণ। সেজন্য সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর কাছে শুইয়া থাকিবে। চৈতন্যদেবও তাহাতে সম্মত হইলেন। তদবধি শঙ্কর পাদমূলে শয়ন করিতেন, শ্রীচৈতন্য তাঁহার উপরে পাদ প্রসারণ করিতেন। সেই হইতে বিদুরের ন্যায় চৈতন্যগণের মধ্যে প্রভুপাদোপধান বলিয়া শঙ্করের খ্যাতি হইয়াছিল। শঙ্কর এ দিকে এমনি সতর্ক যে, পাদসম্বাদন করিতে করিতে বিবস্ত্র হইয়া ঘুমাইয়া পড়িত, চৈতন্য দেব লজ্জায় স্বীয় কাঁথা চাপা দিয়া তাঁহাকে আবৃত করিতেন। তবে গুণের মধ্যে শঙ্কর যেমন শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িতেন, তেমনি অল্পেতেই জাগিয়া উঠিতেন। যাহা হউক, শঙ্করের জন্য চৈতন্য প্রভু আর বাহিরে যাইতে কি ভিত্তিতে মুখ ঘষিতে পারিতেন না। ভক্তগণ ইহাতে কতক পরিমাণে নিঃশঙ্ক হইলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা-শ্লোক।

শিক্ষাশ্লোকের অধিকাংশ এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও আনুক্রমিক বর্ণনার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। দিব্যোন্মাদের অবস্থায় স্বরূপ রামানন্দের সঙ্গে রসাস্বাদন করিতে করিতে লোক শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য যে সকল শ্লোক বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাই বৈষ্ণব সমাজে শ্রীমুখের শিক্ষাশ্লোক বলিয়া সমাদৃত। এই সব শ্লোক এত মিষ্ট ও সুন্দর যে, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলেও ক্লেশ বা বিরক্তি হয় না।

এক দিন ধর্ম্মালোচনা ও রসবিশেষ আস্বাদন করিতে করিতে চৈতন্যদেব হর্ষোৎফুল্ল নয়নে রামানন্দকে বলিলেন, 'শুন রায়, শ্রীকৃষ্ণ সাধনে নাম সংকীর্ত্তনকেলিই শ্রেষ্ঠ উপায়। কলিযুগে সংকীর্ত্তন রূপ মহাযজ্ঞে যে সকল লোক আরাধনা করিবে, তাহারাই তাঁহার চরণাশ্রয় লাভ করিবে।

"চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং

আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্।”

যাহা চিত্তরূপ দর্পণের মলা বিদূরিত করিয়া দেয়; যাহা সংসার দাবাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে সক্ষম, যাহা শ্রেয়ো মঙ্গল রূপ শ্বেতোৎপলের শুভ্র কৌমুদী তুল্য; যাহা পরা বিদ্যা বধূর জীবন স্বরূপ; যাহার শ্রবণে আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠে; যাহার প্রতিপদে অমৃতাস্বাদন পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত; এবং যাহা আত্মাকে রসভাবে স্নান করাইয়া দিয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তিসুখ আনিয়া দেয়; শ্রীকৃষ্ণের সেই সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হইতেছে।

‘দেখ, সংকীর্ত্তন হইতে প্রথমে পাপান্ধকার ও সংসার বাসনা ক্ষয় হয়; ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইয়া সাধন আরম্ভ হয় এবং ভক্তি ও প্রেমোদ্গম হইয়া প্রেমামৃতাস্বাদনে সাধককে অধিকারী করে। পরে কৃষ্ণচরণ লাভ করিয়া ভক্ত সেবামৃত সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যান্।’ বলিতে বলিতে চৈতন্যচন্দ্র বিষাদদৈন্যে শ্লোক পড়িতে লাগিলেন—

“নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা, ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশ মিহাজনি নানুরাগঃ।”

হে ভগবন্! তোমার এমনই কৃপা যে, তুমি আমাদের জন্য নানা নাম প্রকাশ করিয়া তাহাতে অশেষ শক্তি অর্পণ করিয়াছ, এবং নামগ্রহণের জন্য যথেষ্ট অবকাশও দিয়াছ। নামগ্রহণের কালাকাল নিয়ম বিধি কিছু কর নাই, খাইতে শুইতে যে সে প্রকারে নাম লইলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়, কিন্তু হায় প্রভো! আমার দুর্দ্দৈবে এমন নামে আমার অনুরাগ হইল না।

শুন রাম রায়! যে ভাবে নাম লইলে প্রেমধন লাভ হইতে পারে—

“তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুণা
অমানিনা, মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।”

সাধক-শ্রেষ্ঠ হইলেও আপনাকে তৃণাধম মনে করিবেন এবং বৃক্ষের ন্যায় দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা আচরণ করিবেন। কাটিলেও বৃক্ষ যেমন নীরবে সহ্য করে, এবং শুকাইয়া গেলেও কাহারও নিকট এক গণ্ডূষ জল চাহে না বরং বাত্যা বৃষ্টি সহিয়াও আপন ছায়া দানে অপরকে রক্ষা করে, তদ্রূপ আপনি নিরভিমানী হইয়া ভক্ত সর্ব্বজীবে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান

জানিয়া যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। এমন হইয়া নাম লইতে না পারিলে নাম গ্রহণের কোন ফল নাই, বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজ বিরহদশা মনে করিয়া খেদ করিলেন—

"ন প্রেম গন্ধাস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্য ভরং প্রকাশিতুং।
বংশী বিলাস্যানন লোকনং বিনা
বিভার্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা।"

হরিতে আমার একটুও প্রেম নাই; তবে যে কাঁদি, আমি প্রেমিক বলিয়া লোকপূজ্য হইবার উদ্দেশে। সে কপট রোদনের ফল কি? তাঁহাতে যদি আমার একটুও প্রেম থাকিত, তবে কি খাইয়া পরিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে প্রাণ ধারণে সমর্থ হইতাম। এতো প্রেম নয়, এ যে কাম; নইলে কি দেহে এত অনুরাগ হইতে পারে। তাঁর প্রেম যে সুনির্ম্মল; তাহাতে নিজ সুখ লক্ষ্য থাকিবে কেন? আত্মবলিদান ভিন্ন কি সে প্রেম লাভ হয়? হায় সে পবিত্র প্রেমের এক বিন্দু আমার কবে লাভ হবে? এই বলিয়া সুদীন ভাবে অহেতুকী ভক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন:—

"নধনং নজনং নসুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মমজন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।"

'হে জগদীশ! তোমার নিকটে আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী বা কবি-শক্তি, এ সকলের কিছুই চাহি না। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্ম জন্মান্তরে তোমাতে আমার অহৈতুকী শ্রদ্ধাভক্তি হয়।'

শ্রীচৈতন্য মহা প্রেমিক; তবে আবার ঈশ্বরের নিকট প্রেম চাইলেন কেন? ইহার উত্তর এই, যাহার প্রেম আছে সেই ভাবে, আমার বিন্দু মাত্রও নাই। যাহার নাই, সে তাহা ভাবিতে পারে না। অভাব না থাকিলে প্রার্থনাও অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অকিঞ্চন হইয়া আবার প্রার্থনা করিতেছেন—

'অয়িনন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলি সদৃশং বিচিন্তয়।

হে নন্দনন্দন! তোমার এই দাস তোমাকে ভুলিয়া বিষম ভব সমুদ্রে পড়িয়া বড় যাতনা পাইতেছে। কৃপা করিয়া তোমার পদ ধূলির ন্যায় কর, যেন আমি তোমার সেবা করিতে সক্ষম হই।

উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে পুনরায় প্রার্থনা করিলেনঃ—

'নয়নং গলদশ্রু ধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈ র্নিচিতং বপুঃ কদা তবনাম গ্রহণে ভবিষ্যতি।'

হে প্রভো! প্রেম বিনা আমার জীবন বিফল। অতএব দাস করিয়া আমাকে প্রেম ধন বেতন দাও, যেন তোমার নাম লইতে লইতে আমার নয়ন দিয়া অশ্রু গলিয়া পড়ে, কণ্ঠ রোধ হইয়া গদ্গদ বাক্য বাহির হয় এবং পুলকে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। রসান্তরাবেশে বিরহস্ফূর্ত্তি হইলে প্রলাপ বলিতে লাগিলেনঃ—

'যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণমে।'

গোবিন্দ বিরহে ত্রিভুবন শূন্য হইল; বিরহের দিন যায় না, তাইতে নিমিষ কাল যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে এবং বর্ষার জল ধারার ন্যায় নয়ন দিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে।

বিরহ চিন্তায় ক্রমে ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, বিনয় বাড়িতে লাগিল, শ্রীরাধিকোক্ত শ্লোক পড়িয়া চৈতন্য প্রভু বিলাপ করিতে করিতে আপনি তত্তদ্ভাবময় হইয়া উঠিলেন।

'আশ্লিষ্যবা পাদরতাংপিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু সএব নাপরঃ।'

তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পদ সেবার দাসীই করুন, বা মহাদুঃখে ফেলাইয়া নিষ্পেষিতাই করুন, অথবা দর্শন সুখে বঞ্চিত করিয়া মর্ম্মহতাই করুন, কিম্বা বহুজনের নাথ হইয়া যেখানে সেখানে বিহারই করুন, তিনি পর নহেন, আমারই প্রাণবল্লভ।

ব্রজধামের শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমের ছবি এই প্রলাপে অঙ্কিত। যে প্রেমে নিজ সুখের গন্ধমাত্র নাই, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষ্ণসেবা, যাহার চরমে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়া সুখময় কান্তসেবা লাভ, সেই আদর্শ প্রেমেই শচীনন্দনের প্রাণ মন, দেহ আত্মা কাড়িয়া লইয়াছিল। কান্তভাবে এই আত্মবলিদানই তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ, মধ্য শেষ। ইহাতেই তাঁহার জীবন মরণ সকলই। হে গৌরাঙ্গ সুন্দর! দীনহীন অভাগ্য আমি কবে

তোমার কৃপায় এই প্রেমের কণা পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যাইব। যে প্রেমে নিজ সুখের গন্ধমাত্র আছে, তাহা বিষ, তাহা গৌরের নহে। ভগবান্ করুন, আমরাও যেন তাহার ত্রিসীমায় না যাই।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্তর্ধান।

গৌরের অন্তর্ধানের কথা কেমন করিয়া লিখিব? যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পূজ্যপাদ গোস্বামীগণ পারেন নাই, সেই নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য, এই ক্ষুদ্র, তাঁহাদের চরণধূলিরও অযোগ্য ব্যক্তির উপর পড়িল, এ অতি অদ্ভুত রহস্য। এ হৃদয়-বিদারক কথা না বলিবারই ইচ্ছা, কিন্তু কি করি, আমি যে আদিষ্ট; আমার তো এড়াইবার উপায় নাই। বিধাতার লীলা অতি আশ্চর্য্য, তাহা না হইলে এমন নিদারুণ কাজে কি মানুষ হাত দেয়?

জগতে যাহার আবির্ভাব আছে, তাহারই তিরোধান নিয়মিত হইয়াছে। যাহার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার শেষ হইবেই হইবে। বৃক্ষে বীজ আছে, কালে তাহা হইতেই আবার ফল ফুল শোভিত নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়; সে আবার প্রাচীন হইয়া ভবিষ্যদ্বংশের জন্য নূতন শক্তি রাখিয়া চরমাবস্থা লাভ করে। মানুষের মধ্যেও মনুষ্যত্বের কেন দেবত্বের বীজ আছে, তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া জগত ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত থাকে, জগতের মানুষ নিত্যধামে চলিয়া যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম বিধানেও তেমনি পরবর্ত্তী বিধানের বীজ অন্তর্নিহিত থাকে। সময় হইলে সে পরবর্ত্তীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া জগদ্দ্যবনিকার অন্তরালে সরিয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্ত সাধুর জীবনও সেইরূপ। জীবনাধার পাঞ্চভৌতিক দেহ কালে পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় বটে, কিন্তু সে জীবনের অবিনশ্বর সাধুতা, বিশ্বাস, বৈরাগ্য, প্রেম উত্তরাধিকারের ন্যায় মানবজাতির ইতিহাস-ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত থাকে। চর্ম্ম মাংসের নশ্বর রূপেরই ধ্বংস হয়, কিন্তু অবিনশ্বর চিন্ময় রূপের তো বিনাশ নাই। চিরদিন তাহা মানবাত্মার জ্যোতির্ম্ময় রূপে ঝলমল করিয়া জ্বলিতে থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গের সম্বন্ধে একথা পূর্ণমাত্রায় খাটে। চারিশত বৎসরের অধিক

হইল, গোরার দৈহিক রূপ জগতের জড় চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছে বটে, কিন্তু সেই অপ্রাকৃত গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি, যাহা নামে, প্রেমে, বিশ্বাসে, বৈরাগ্যে, পুণ্যে, পবিত্রতায়, ভাবে, মহাভাবে, সঙ্কীর্ত্তনে, মৃদঙ্গ করতালে ঝলমল করিয়া এখনও সৌভাগ্যবান ভক্ত চক্ষুর প্রীতি বর্দ্ধন করিতেছে, তাহার কি আর বিনাশ আছে? সে চিদ্ঘন অমর চৈতন্য এখনও যে প্রাণে উদিত হইয়া আমাদিগকে হর্ষোন্মত্ত করিতেছেন। বৃন্দাবন দাস মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন;

'অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।।'

গৌরের অন্তর্ধান বর্ণিতে ইহাই আমার পরম সান্ত্বনা। এ সান্ত্বনা না থাকিলে লিখিতে পারিতাম কিনা ভগবান্‌ই জানেন।

পূজ্যপাদ বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ এ সম্বন্ধে একটী কথাও বলেন নাই। সকলেই যেন পরামর্শ করিয়া অতীতের গভীর গহ্বরে রহস্যটী নিক্ষেপ করিয়া নিস্তব্ধতা পাথর চাপা দিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় কি ছিল, অনুমান করা কঠিন। তাঁহারা সকলেই গৌরগত প্রাণ; হয় তো গৌরের হৃদয়-বিদারক শরীরত্যাগের কথা লিখিতে শোকে দুঃখে লেখনী-চালনা করিতে পারেন নাই। অথবা শ্রীগৌরাঙ্গ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার। শ্রীকৃষ্ণে ও তাঁহাতে পার্থক্য নাই। চিন্ময় দেহ জড়ীয় দেহের ন্যায় ধ্বংসশীল নয়। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের দেহ ধ্বংস হইতে পারে না; সে দেহের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। অতএব তাঁহার শরীর নাশের কথা লিখিবেন কেমন করিয়া। যে কারণেই হউক, বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে শ্রীচৈতন্যের স্বর্গারোহণের স্পষ্ট কোন কথা পাওয়া যায় না। তাঁহাদের গ্রন্থনিচয়ের এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত অস্পষ্ট ইঙ্গিত ও জনশ্রুতির উপরই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে।

চৈতন্যদেবের আত্মসঙ্গোপন সম্বন্ধে চারিটী জনপ্রবাদ দেশমধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম, দারুময় জগন্নাথ বিগ্রহে তিনি বিলীন হইয়া যান; দ্বিতীয়, অন্যের অজ্ঞাতে পলাইয়া গিয়া আউলে মহাপ্রভুরূপে কাঁচরাপাড়ায় প্রকাশ হইয়াছিলেন; তৃতীয়, পণ্ডিত গদাধর-প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহে লয়প্রাপ্তি; চতুর্থ, সমুদ্রে পতন। জগন্নাথ বিগ্রহে তিনি যে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, এ অনুমানের পক্ষে আদৌ কোন প্রমাণ নাই। প্রমাণ থাকিলেই বা তাহা বিশ্বাস করে কে? দারু বিগ্রহে রক্তমাংসময় জড় শরীর কেমন করিয়া মিশিয়া যাইবে? এই বৈজ্ঞানিক যুগে এ কথা কে মানিবে? অনুমান হয়, পাণ্ডাগণ জগন্নাথের মহিমা বাড়াইবার অভিপ্রায়ে এই জনরব তুলিয়া দিয়া থাকিবে। এদেশের কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ই দ্বিতীয় মতের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা বলেন, অদ্বৈত আচার্য্যের তরজা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম

হাটে বিকায় নাই; তাঁহার অভিপ্রায় না বুঝিতে পারিয়া লোকে বাউল অর্থাৎ পাগল হইয়াছে। নানা লোক নানা প্রকারে পবিত্র বৈরাগ্য ও প্রেমের নামে কলঙ্ক দিতেছে। সুতরাং যে ভাবে ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে আর কিছু হইবার আশা নাই, সব শ্রম পণ্ড হইল; উপায়ান্তর উদ্ভাবন না করিলে নাম প্রচার হইবে না, ইত্যাদি ভাবিয়া তিনি গোপনে পলাইয়া গিয়া কিছুদিন পরে কাঁচরাপাড়ায় কর্ত্তাভজার প্রবর্ত্তক হইয়া প্রকাশ হইয়াছিলেন। আচার্য্যের তরজা পড়িয়া মনে একটা নিরাশ ভাব আসা স্বাভাবিক হইলেও, শ্রীচৈতন্য যে আউলে মহাপ্রভু হইবার উদ্দেশ্যে আত্ম গোপন করিয়া পলাইয়া যাইবেন, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। কেননা, কুমারহট্ট প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রামে তাঁর বহু অনুচর তৎকালে জীবিত ছিলেন। তাঁহারা কি তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না? আর এরূপে আত্ম গোপন করা মহাপুরুষদের প্রকৃতি নয়। কর্ত্তাভজাগণ আপনাদের সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধির জন্য যে এই অমূলক কথা রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশিষ্ট থাকিতেছে, শেষ দুইটী জনশ্রুতি; গোপীনাথ বিগ্রহে লীন হওয়া ও সমুদ্রে পতন। পাষাণময়ী মূর্ত্তিতে মনুষ্য দেহ লীন হওয়ার যুক্তি, প্রথমটীর ন্যায় অসম্ভব হইলেও, শেষোক্ত প্রবাদের সঙ্গে যে সেটীর গভীর সংযোগ আছে, তাহা আমরা দেখাইতেছি।

গদাধর পণ্ডিতের সহিত শ্রীচৈতন্যের অতিশয় ঘনিষ্ট সখ্য ছিল, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের আদেশে পণ্ডিত গোস্বামী পুরুষোত্তমে গোপীনাথ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সেবা করিতেন। যে স্থানে এই মন্দির অবস্থিত ছিল, তাহার নাম যমেশ্বর টোটা। টোটা শব্দের অর্থ বাগান। অতি সুপ্রশস্ত কুসুমোদ্যানে পণ্ডিতের আশ্রম। এ উদ্যানে যে কেবল ফুলগাছই ছিল, তাহা নহে; আম, কাঁটাল, জাম, তেঁতুল, অশ্বত্থ জাতীয় বৃহৎ বৃহৎ তরুরাজি বাগানটীকে নিকুঞ্জ কাননের ন্যায় নির্জ্জন ও সুশীতল করিয়া রাখিত। শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে পণ্ডিত গোস্বামীর জীবদ্দশায় শ্রীনিবাস আচার্য্য পুরুষোত্তমে যাইয়া গোপীনাথের পুষ্পবাটী অতি মনোহর দেখিয়াছিলেন।

'শ্রীগোপীনাথের পুষ্পবাটী মনোহর;
দেখাইল, এথানে রহেন গদাধর।' ভক্তিরত্নাকর, ৩য় তরঙ্গ।

ইহার অত্যল্পকাল পরে পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোধানের পর যখন নরোত্তম ঠাকুর পুরুষোত্তমে গিয়া এই বাগানে বেড়াইতেছিলেন, পণ্ডিতের প্রিয় শিষ্য মামু গোস্বামী তাঁহাকে পুষ্পবাটিকার রম্যস্থান দেখাইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন;

'ওহে নরোত্তম এই টোটা নিরখিতে,
নিরন্তর কাঁদে প্রাণ নারি নিবারিতে,

দেখ! এ আরাম মধ্যে অতিরম্য স্থান;
এথা যে কৌতুক তাহা দেখিল ভাগ্যবান্।
মোর প্রভু গদাধর বসিয়া এথায়,
পড়িতা শ্রীভাগবত বিহ্বল হিয়ায়।
এথা বসি শুনিত সে ব্যাখ্যার মাধুরী;
গদাধর প্রাণনাথ প্রভু গৌর হরি॥' ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ।

স্থানান্তরে :—

'এথা সে তণ্ডুল শ্রীপণ্ডিত কৈল পাক;
করিল ব্যঞ্জন টোটা হৈতে তুলি শাক।
কোমল তিন্তিড়ী পত্রাম্বল শীঘ্র কৈল।
অন্নের সৌগন্ধি সব টোটায় ব্যাপিল।'

যমেশ্বর টোটা আরামের নিকটেই সুবিস্তীর্ণ নিরনিধি উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত। একবার আইটোটার নিকটস্থ সমুদ্র তরঙ্গে শ্রীচৈতন্য ঝাঁপ দিয়া নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে ধীবরের জালে উঠিলে স্বরূপাদি বন্ধুগণের যত্নে ও চেষ্টায় সেবার তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

'এইমতে মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে;
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে।'

চরিতামৃত। ১৮শ পরিচ্ছেদ।

যমেশ্বর টোটার এহেন রম্য উদ্যানে চৈতন্যদেব যে অনেক সময়ে বিহার করিতেন; একাকী বা বন্ধুগণ সঙ্গে ভ্রমণ করিতেন, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং তাহার অনেক প্রমাণও আছে। কখন বৃক্ষমূলে বসিয়া গদাধরের নিকট ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রেমে গদ গদ হইতেন, কখন গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া যাইতেন, কখন গোপীনাথের মন্দির মধ্যে কপাট দিয়া একাকী বসিয়া থাকিতেন এবং কখন বন্ধুগণের অলক্ষিতে বাহির হইয়া গিয়া সমুদ্রতটে বিচরণ করিতেন। পাঠক দেখিয়াছেন, শেষ জীবনে তাঁহার ভাবের এত প্রবলতা হইয়াছিল যে, তাহার প্রভাব রক্ত মাংসের শরীর সহ্য করিতে পারিত না; ভাবে পাগল হইয়া তিনি কি করিতেন কি বলিতেন, তাহার কিছুই ঠিকানা থাকিত না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বরূপাদি ভক্তগণ এ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কা করিয়াই সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতেন। কিন্তু টোটার বাগানে আসিলে তাঁহাদের মনোযোগ কিছু শিথিল পড়িত। তাহার কারণও ছিল; তাঁহারা জানিতেন, টোটায় গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী সশিষ্যে বাস করিতেন; তিনি গৌরের শরীর রক্ষায় কখন অমনোযোগী হইবেন না। কথাও তাই। গৌর টোটায় আসিলে পণ্ডিত গোস্বামীর উদ্বেগের সীমা থাকিত না। কখন কি বিপদ্ ঘটে; এ আশঙ্কায় তিনি শশব্যস্ত হইয়া পড়িতেন; এবং শিষ্যদিগকে তাঁহার

প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া দিয়া ও সমুদ্রতীরে বা অন্যত্র একাকী যাইতে না পারেন, নিষেধ করিয়া দিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু এ সকল সাবধানতা সত্ত্বেও যাহা সকলে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। গৌরপাখী দেহপিঞ্জর কাটিয়া অনন্ত আকাশে উড়িয়া গেলেন, কেহ আট্‌কাইতে পারিল না। মানুষের চেষ্টা যত্ন সব বিফল হইয়া গেল; কিছুতেই কিছু কুলাইয়া উঠিল না। বিধাতার নির্ব্বন্ধের কাছে মানুষের চালাকি খাটে না; চক্রীর ঘটনা-চক্রে বাধা দিবে যে ক্ষুদ্র মানুষ তোমার কি সাধ্য?

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, এক দিন অপরাহ্ন সময়ে ভাবোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তখন পণ্ডিত গোঁসাই সুশীতল বৃক্ষমূলে বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরেও গৌর যখন বাহির হইলেন না, তখন পণ্ডিত গোঁসাই আস্তে ব্যস্তে মন্দির মধ্যে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। শিষ্যগণ অনেক খুঁজিয়াও কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না; গদাধরের মন্দ আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল; তিনি খেদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,

'কি করিব, কোথা যাব, বাক্য নাহি সরে;
গোরাচাঁদে হারাইলাম গোপীনাথের সনে।'

কয়েকদিন পরে, শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট শোক-বিহ্বল গদাধর পণ্ডিত যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাতেও গৌরের আকস্মিক ঘটনায় প্রাণ হানি হওয়াই বুঝা যায়।

'ভাগবত পড়িতে তোমার ছিল সাধ।
পড়াইতে তোমারে আমারও ছিল সাধা;
কারে কি কহিব হৈল বিপরীত বাধা।' ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ।

মামু গোস্বামী নরোত্তম ঠাকুরকে যে বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন, তাহাতে আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়;—

'ন্যাসি শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার;
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার।
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে;
হৈলা অদর্শন পুনঃ না আইলা ফিরে। ভক্তিরত্নাকর। ৮ম তরঙ্গ।

এই সকল কথা দ্বারা অকাট্যরূপে সাব্যস্ত হইতেছে যে, গোপীনাথ মন্দিরে প্রবেশ করার পর চৈতন্যচন্দ্রকে কেহ এ পৃথিবীতে আর দেখিতে পায় নাই। গোপীনাথ বিগ্রহে বিলীন হইয়া যাওয়া প্রবাদটুকু উত্তর কালে যে এই ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা, কি গদাধর পণ্ডিতের কথায়, কি তাঁহার শিষ্য মামু পণ্ডিতের কথায়, ইহার প্রসঙ্গ মাত্র নাই। পণ্ডিত গোঁসাই এই মাত্র বলিয়াছিলেন যে, "গোপীনাথের মন্দিরে গৌরকে হারাইলাম।" মামু কহিয়াছিলেন যে;

মন্দির মধ্য হইতেই তিনি অদৃশ্য হইয়া যান, আর বাহিরে আইসেন নাই; ভক্তগণ কেহই চৈতন্যচন্দ্রকে মানুষ মনে করিতেন না; গোপীনাথও তাঁহাদের কাছে পাষাণময়ী মূর্ত্তি নহেন। সুতরাং গোপীনাথের অঙ্গে তাঁহার লীন হইয়া যাওয়া অনুমান করা ভক্তগণের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, গোপীনাথের মন্দির হইতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে গৌরচন্দ্র বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতটে যাইতে পারিতেন কি না? ভাবতরঙ্গে তিনি যেরূপ আত্মহারা হইয়া যাইতেন; সামান্য উদ্দীপনায় বৃন্দাবনলীলা-স্মৃতি হইয়া তিনি যেরূপ সর্ব্বত্র বৃন্দাবন দেখিতেন, তাহাতে প্রথমবারের মত সাগরের নীলজলে যমুনাভ্রান্তি এবং রাধাকৃষ্ণের জললীলা সন্দর্শন করা তাঁহার পক্ষে খুব সহজ ছিল কি না? যদি থাকে, তবে তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া অচৈতন্যাবস্থায় স্রোতের টানে সুদূর সমুদ্রে যাইয়া প্রাণ হারান সম্ভব হয় কি না? এই সব প্রশ্নের নিতান্ত সহজ সিদ্ধান্ত যাহা, আমাদের মতে তাঁহার জীবন নাশের কারণও তাহাই। গভীর সাগর জলে দেহ পড়িলে, মানুষের সাধ্য কি যে পাইতে পারে? একবার ভাগ্যক্রমে যেন কোলারকে গিয়া পড়িয়াছিলেন, বারে বারে যে তাহা হইবে, কে বলিবে? আমাদের মতে, দ্বিতীয়বার সিন্ধুপতনে শ্রীচৈতন্যের যে জীবনান্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

মাঘমাসের শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিবার জন্য জাজিগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া যাজপুরের নিকটে আসিয়া তাঁহার অন্তর্ধানের সংবাদ শুনিতে পান। সুতরাং অনুমান হইতে পারে যে, প্রায় পূর্ণিমার সময়ে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন। সেই ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা, আর এই ১৪৫৫ শকের মাঘ মাসের পূর্ণিমা। এই ৪৮ বৎসর চৈতন্যচন্দ্রের মর্ত্ত্যে স্থিতি।

তবে যাও, চৈতন্যচন্দ্র, বঙ্গ আকাশ আঁধার করিয়া অনন্ত রাজ্যে উদিত হওগে; তবে যাও ভক্তবৎসল, ভক্তচকোরগণকে সংসার-পিপাসায় ফেলিয়া, গোলোক ধামে চিন্ময় ভক্তমণ্ডলীকে সুখ দিতে? তবে যাও শচীদুলাল! শচী মাতার হৃদাকাশ অন্ধকার করিয়া চিন্ময়ী মাতার কোমল কোল আলো করিতে। তবে যাও বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ, দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার আশার মুখে ছাই দিয়া নিত্যধামে সখীদের সঙ্গে নিত্যলীলা করিতে, যেখানে স্ত্রীপুরুষে প্রভেদ নাই, যেখানে মিলনে বিচ্ছেদ নাই। তবে যাও বঙ্গের গৌরব, বঙ্গবাসীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে নরনারীকে কাঁদাইয়া; তবে যাও যুগাবতার, নাম প্রেমের যুগধর্ম্ম বিধান পরিপূর্ণ করিয়া যুগধর্ম্মপতির নিকট পুরস্কার লইতে। তবে যাও অনন্তের পুত্র, ভূমা পুরুষের প্রেমমণ্ডলীতে, যেখানে নিত্যলীলার, নিত্য প্রেমের মহোৎসব; যেখানে ভক্তমণ্ডলী সচ্চিদানন্দ পুরুষের সঙ্গে হাসিয়া, কাঁদিয়া, নাচিয়া, গাইয়া নিত্য প্রেমে বিভোর; যেখানে জাতি, বিদ্যা,

ধন, মর্য্যাদার ভেদাভেদ নাই, দেশ কাল পাত্রের গৌরব নাই, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি সব একত্র মিশিয়া হরিপাদপদ্ম ধোয়াইয়া দিতেছে। আমরা এখনে তোমার জন্য চিরদিনই কাঁদি ও আর দুইবার আসিবে যে বলিয়া গিয়াছ, সেই আশায় আশান্বিত হইয়া কালের কুটিল গতির দিকে চাহিয়া থাকি।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সঙ্গোপনান্তে।

শ্রীচৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের অব্যবহিত পরে তদীয় প্রধান প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গগণ কোথায় কিভাবে ছিলেন, এবং কে কবে অপ্রকট হন, আমরা এই পরিচ্ছেদে তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ শেষ করিব। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে উদ্ধব বৃন্দাবনে যাইয়া ব্রজবাসীদের যেমন অবস্থা দেখিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের আত্ম সংগোপনের অব্যবহিত পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য পুরুষোত্তমে যাইয়া ভক্তমণ্ডলীর তেমনি দশা দেখিয়া শোকে বিহ্বল হইয়াছিলেন। নীরব অশ্রু ধারায় সকলের বুক ভাসিয়া যাইতেছে, পাষাণময় বিগ্রহ বা দণ্ডায়মান বৃক্ষের ন্যায় নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট; কেবল মধ্যে মধ্যে হা গৌরাঙ্গ বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করায় জীবন থাকার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি হীন হইয়া মৃতকল্পের ন্যায় জীবনভার বহিতেছেন; আর সে মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি নাই; আর সে ভাগবত-ব্যাখ্যা হয় নাই; আর বাসায় বাসায় প্রীতিভোজনের ধূম নাই। সকলেই মলিন, বিবর্ণ ও শক্তিহীন। যে শক্তিতে তাঁহাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, যে সুখ-তারার মুখপানে চাহিয়া সকলে সুখে জীবন সাগরে ভাসিতেছিলেন, যে চাঁদকে ঘিরিয়া অগণ্য তারা বিরাজ করিতেছিল, তাঁহার অভাবে আজ সব অন্ধকার, সব এলোমেলো। পাঠক এ দৃশ্য কল্পনা করুন, আমাদের সাধ্য নাই যে অঙ্কিত করি।

প্রভাতকালীন নক্ষত্রের ন্যায় একে একে ভক্তগণ অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। গৌরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণ চলিয়া গিয়াছিল, কেবল রক্ত মাংসময় শরীর পড়িয়াছিল, তাহাও অদৃশ্য হইতে লাগিল। প্রাণের গৌরাঙ্গ! এত সাধ করিয়া হাট বসাইয়াছিলে, তাহা যে ভাঙ্গিয়া গেল, একবার আসিয়া দেখ। গৌরের আত্মসঙ্গোপনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বরূপ সখা শয্যাশায়ী হইলেন, আর উঠিলেন না। স্বরূপের পর, রঘুনাথ গৌরের ও স্বরূপের শোকে অধীর হইয়া গোবর্দ্ধন হইতে ভৃগুপাত করিয়া জীবন ত্যাগ করিবেন বলিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশাতেই পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অবসর লইয়াছিলেন এবং সার্ব্বভৌম রামানন্দের সঙ্গে সাধন ভজন করিতেছিলেন।

এক্ষণে গৌরের অপ্রকটে শোকে বিহ্বল হইয়া দূরস্থ পল্লীগ্রামে যাইয়া অজ্ঞাতবাসে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। গদাধর পণ্ডিত সেই কাল দিন হইতে আর কাহাকেও মুখ দেখান নাই, নির্জ্জনে একাকী বসিয়া মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিন পরে মনোরথ সিদ্ধি করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। রামানন্দ, সার্ব্বভৌম উভয়ে এক নির্জ্জন কুঠরীতে বসিয়া গোরাগুণগান করিয়া শোকাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে সময় কাটাইতে লাগিলেন। পরমানন্দ পুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতীরও এই দশা। বক্রেশ্বর পণ্ডিত, শিখি মাইতি, কানাই খুটিয়া, বাণীনাথ পট্টনায়ক, মাধবী দেবী, গোবিন্দ, শঙ্কর, গোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি পুরুষোত্তম-বাসী চৈতন্য-শিষ্যগণ একই শোকে একই ভাবে মগ্ন হইয়া দিনমানের চাঁদের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়াছেন। দেখিলে কেহ পূর্ব্বের সেই মানুষ বলিয়া চিনিতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে শ্রীনিবাসাচার্য্য কাটোয়ার সমীপস্থ জাজিগ্রাম হইতে পুরুষোত্তমে যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন চৈতন্যদেব জীবিত ছিলেন। যে কয়দিন তাঁহার পথ পর্য্যটনে লাগিয়াছিল, সেই কয়দিন পরেই নীলাচলে যাইয়া শ্রীনিবাস যে অবস্থা দেখিয়াছিলেন, তাহাই উপরে বিবৃত হইল। আচার্য্য প্রভু নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীখণ্ডে এক দিনমাত্র অবস্থিতি করিয়া পণ্ডিত গোস্বামীর সহিত পুরুষোত্তমে পুনঃ সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্য আবার যাইতেছিলেন; কিন্তু যাজপুরে যাইয়া গদাধর পণ্ডিতের তিরোধানের কথা শুনিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি পথে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের স্বর্গারোহণের কথা শুনিতে পাইয়া শোকসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তবেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, চৈতন্যান্তর্ধানের অতি অল্পকাল পরেই এই অলোক-সামান্য ভক্তদ্বয়ও ভবধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস এবারে বঙ্গদেশ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। নবদ্বীপে যাইয়া তিনি শচীমাতাকে দেখিতে পান নাই। বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে প্রিয়-পুত্রের অদর্শনের কথা শুনিয়া পুত্রবৎসলা জননী শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া তখন জীবিতা, কঠোর বৈধব্য আচরণ করিয়া কানমতে সময় কাটাইতেছিলেন। বংশীবদন ঠাকুর নামে তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও পরোলোক-

বাসিনী হয়েন। চৈতন্য পার্ষদের মধ্যে সে সময়ে নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিত দামোদর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, দাস গদাধর, সঞ্জয় নির্ম্মদাস আখরিয়া ও শ্রীবাসপত্নী মালিনী দেবী জীবিত ছিলেন। শান্তিপুরে আচার্য্যের পুত্রগণ ও পত্নী সীতাদেবী এবং খড়দহে নিত্যানন্দের বিধবাদ্বয় বসু জাহ্নবী ও পুত্র কন্যাগণ, কুমারহট্টে শিবানন্দ সেন ও পুত্রগণ শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন জীবদ্দশায় ছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের দুর্দ্দশার সীমা নাই। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কথা শুনিয়াই সনাতন গোস্বামী, দেহত্যাগ করিলেন। তাহার কিছুকাল পরে রূপ গোস্বামীও অগ্রজের অনুগামী হইলেন। রঘুনাথ ভট্ট ও (কাশীশ্বর যিনি চৈতন্যাজ্ঞায় বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ব্রজে যাইয়া শোকসন্তপ্ত শ্রীজীব গোস্বামী বেঙ্কটনন্দন গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও রঘুনাথ গোস্বামীকে মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারাও গৌরাঙ্গ শোকে নিষ্প্রভ মণির ন্যায় কোন মতে বাঁচিয়াছিলেন। আর শোকদুঃখের কথা না লিখিয়া; আর গৌরগণের তিরোধান না বর্ণিয়া, শ্রীজীব ও শ্রীনিবাসের হাতে গৌরাঙ্গের প্রেমের ধর্ম্ম প্রচারের ভার ন্যস্ত দেখিয়া, গৌরলীলা ভাবিতে ভাবিতে, হরিবোল বলিতে বলিতে এইখানেই আমরা চৈতন্যলীলামৃত সমাপ্ত করিলাম।

গৌরের অপার লীলা, অনন্তভাব, কাহার সাধ্য সম্যক্ বর্ণন করিতে পারে? ভগবানের কৃপায় বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি মহাত্মাগণের পদানুসরণ করিয়া ও উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণ করিয়া এ ক্ষুদ্র লেখনী যাহা লিখিল, তাহাতেই ধন্য হইলাম।



সমাপ্ত।